গল্প-ভারতী

পৌষ সংখ্যা—১৩৬১

সম্পাদক :

শ্রীবিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত

সহঃ সম্পাদক : শ্রীকল্যাণ রায়

মূল্য এক টাকা

শ্রীসুধাংশু কুমার রায় চৌধুরী কর্তৃক ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেড ২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত এবং কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

নতুন **নির্মল** হাফ-বার সাবানে
কাচলে আপনার কাপড়চোপড় হবে

ধবধবে ফরসা
ঝলকা সুগন্ধে ভরপুর

এই সংখ্যায়

এই প্রথম—নীড় ভাঙা ঝড়—গীতা সেন ৭৮৯

অমৃত কথা ও কাহিনী— ৭৯৮

বিশ্ব-সাহিত্য—

সাহিত্য ও সাহিত্যিক—ডরোথী পার্কার—মিত্তির সিংহ ৮০০

ভারত ভ্রমণে— ৮০২

একজন আর কয়েকজন—অনিলকুমার ভট্টাচার্য ৮০৩

দেশ-বিদেশ— ৮০৭

খেলাধূলা— ৮১৫

বর্ষশেষ বাংলার সংস্কৃতি—সচিত্র-সংযোজন

পূর্বাভাষ ১

বাংলার চড়ক : চিরদিনের চৈত্র-সংক্রান্তি—অমুযাত্রিক ৫

বাংলার ব্রত—হাসি ভট্টাচার্য ১১

গম্ভীরা—মনিপদ্ম ১৫

চৈত্র মাসের সং—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ১৮

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে

মুক্তহস্তে দান করুন

ভীমচন্দ্র নাগ

কলিকাতা

সংক্রমণ প্রতিরোধে নির্ভরযোগ্য

কাটা-ছেঁড়ায়, পোকার কামড়ে আশুফলপ্রদ, কুলকুচি ও মুখ ধোয়ায় কার্যকরী। ঘর, মেঝে ইত্যাদি জীবাণুমুক্ত রাখতে অত্যাবশ্যক।

এ্যানটল

১১, ১১০, ৩৩০ সিসি বোতলে ও ৪.৫ লিটার টিনে পাওয়া যায়।

বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী।

গল্প-ভারতী

অষ্টাদশ বর্ষ,
পৌষ ১৩৬১

স্বামী বিবেকানন্দ :

"স্বামীজীর জন্মতিথি উপলক্ষে দেশের নানা কেন্দ্রে চিরাচরিত প্রথায় পূজা-উৎসবের অনুষ্ঠান হয় ইহা দীর্ঘকাল দেখিয়া আসিতেছি। ভারতের ধর্ম-সাধনার ধারায় অগণিত মহাপুরুষ আসিয়াছেন, গিয়াছেন; তাঁহাদের মতবাদ এবং বিশিষ্ট সাধনপ্রণালী হিন্দুসমাজকে বা হিন্দুধর্মকে বহু বৈচিত্র্যময় উপধর্মে বিভক্ত করিয়াছে। মোক্ষমার্গিক সেই সকল মহাপুরুষের সহিত স্বামী বিবেকানন্দের তুলনা করা সঙ্গত হইবে না, কেননা প্রাচীন ধারা হইতে তিনি একেবারেই পৃথক। তাঁহার গুরু ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতের বহু বিচিত্র সাধনধারাকে আত্মসাৎ করিয়া সর্বধর্মসমন্বয়ের সার্বভৌমিক আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বহু ধর্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিলেন। একদা তিনি ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন, "গেড়ে ডোবায় দল বাঁধে।" বদ্ধ জলাশয় যখন পঙ্কিল হইয়া উঠে তখনই শৈবালদল তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। ভারতের সমাজ জীবন এই ভাবেই বহু সম্প্রদায় ও শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া কতকগুলি বাহ্য অনুষ্ঠানের গণ্ডির মধ্যে আবিল হইয়া উঠিয়াছিল। বৈরাগ্যের নামে জন্মালসের ভণ্ডামী, অক্ষম দুর্বলের পারিবারিক ও সামাজিক কর্তব্য এড়াইবার জন্য মোক্ষ চিন্তা এবং কায়ক্লেশে শূদ্রধর্ম পালন করিয়া গতানুগতিক জীবনযাত্রা। নিস্তরঙ্গ পঙ্কিল পরিবেশের মধ্যে নূতন ভাবধারা বহাইয়া দিবার জন্য বিবেকানন্দ শ্রীগুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অদ্বৈত বেদান্তের সিংহনাদে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় ভূখণ্ডে এক প্রচণ্ড আলোড়ন তুলিলেন।

বিবেকানন্দের মত সন্ন্যাসী, ভারত আর দেখে নাই। তিনি মোক্ষের নামে, সহজে মুক্তিলাভের নামে জনগণকে আহ্বান করিলেন না, বিদেশে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্য প্রচার করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া তিনি বলিলেন, এই শূদ্র-প্রধান দেশের শূদ্রধর্মের তামসিকতা হইতে আমি তোমাদিগকে রজোগুণের সৃষ্টির কাজে আহ্বান করিতেছি। আমি চাই, ছাত্রের অধ্যয়নাগার হইতে মৎস্যজীবীর কুটির পর্যন্ত বেদান্তের মহান তত্ত্বগুলি আলোচিত এবং গৃহীত হোক। স্বামিজী স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর ভারত পরিভ্রমণ করিয়া যে বক্তৃতাবলী দিয়াছিলেন, তাহা আজ পর্যন্ত ছাপার হরফেই রহিয়া গেল। সেগুলি কর্মের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার মত লোক অর্ধশতাব্দীর মধ্যেও দেখা গেল না। 'মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই, আমার রক্ত'—ভাবের আবেশে দুলিয়া দুলিয়া এই কথাগুলি আবৃত্তি করিতে একটা সাময়িক

মোহ আসে কিন্তু কর্মক্ষেত্রে স্বামীজীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার মত লোক কত অল্প। ভগবান বিষ্ণু তৃতীয় অবতারে পৃথিবীকে যেমন প্রলয় পয়োধি হইতে ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়া ছিলেন তেমনি জ্ঞানে বিবেকানন্দ একদিন তাঁহার রসাতলগামী জাতিকে গভীর অধঃপতন হইতে টানিয়া তুলিবার জন্য বলিষ্ঠ বাহু বিস্তার করিয়া ছিলেন। কঠোর পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া গেল। শতাব্দীচক্রের অচলায়তন নড়াইবার মত সহকর্মী উত্তরসাধক তিনি পাইলেন না। জীবন সায়াহ্নে তাঁহার মনে গভীর নৈরাশ্যের ছায়াপাত হইয়াছিল। কেহ আসিল না, দীন দরিদ্র, পতিত উৎপীড়িতের উন্নয়ন-সেবাব্রত কেহ লইল না। তাই মেহেরকার পূর্বদিন অপরাহ্নে বেলুড় মঠ-প্রাঙ্গণে পদচারণা করিতে করিতে তিনি আপন মনেই বলিয়াছিলেন,—"আজ যদি আর একটা বিবেকানন্দ থাকিত তাহা হইলে সে বুঝিত বিবেকানন্দ কি করিয়া গেল।"

ইউরোপের জনজীবন দেখিয়া স্বামীজী বুঝিয়াছিলেন, শিক্ষাবলেই আত্মপ্রত্যয়, শিক্ষাবলেই উন্নতি কিন্তু ভারতের মত দরিদ্র দেশে শিক্ষালয় গড়িয়া তুলিতে অধিকাংশ লোকই আসিবে না। সেই কারণেই তিনি একদল শিক্ষাব্রতী যুবক যুবতী চাহিয়াছিলেন যাহারা গ্রামে গ্রামে, হাটে বাজারে, কৃষকের কুটীরে, শ্রমিকের বস্তিতে গিয়া লৌকিক জ্ঞান প্রচার করিবে। তাহা হইলেই জাতিগঠনের প্রাথমিক বনিয়াদ প্রস্তুত হইবে। বিবেকানন্দ এ সকল বিষয় কেবল চিন্তা করেন নাই, এমন বহু পরিকল্পনা তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, যাহা বাস্তবে পরিণত হইবার জন্য কর্মবীরের প্রতীক্ষা করিতেছে। আজ যুগাবতার বলিয়া পূজা ও ভক্তি নিবেদনের পরিবর্তে আমরা ভারতে শক্তির সহিত স্বামীজীর আদর্শ গ্রহণ করিবার মত নরনারী দেখিবার আশায় বাঁচিয়া আছি। আজকের দিনে আমরা এই আবেদন করিব, শিক্ষিত জ্ঞানবান যুবক যুবতী, তোমরা রাজনৈতিক আন্দোলনের নীরস খোসা চর্বণে কিছু কালের জন্য ক্ষান্ত হইয়া স্বামীজীর অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা লইয়া প্রতি পল্লী নগরে লোকসাধারণের মধ্যে সাম্য মৈত্রী ও উন্নয়নের বাণী প্রচার কর, হতমান জাতিকে আত্মস্থ হইবার পথ দেখাও। তাহা হইলেই নব্য ভারতের যথার্থ স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করা হইবে।"

উদাত্ত আহ্বান

যক্ষরূপী ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে যে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটি এই—'কঃ পন্থাঃ' অর্থাৎ পথ কি? যুধিষ্ঠির উত্তর করিয়াছিলেন, 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ' অর্থাৎ মহাজন যে পথে গমন করেন, সেই পথই যথার্থ পথ। এখানে 'মহাজন' কথাটির অর্থ লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কোন কূটতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া আমরা প্রচলিত অর্থেই 'মহাজন' কথাটিকে গ্রহণ করিব। মহাজনেরা দীপশিখা-স্বরূপ, তাঁহারা আমাদের অন্ধকার পথকে আলোকিত করেন, তাঁহাদের বাণী আমাদিগকে কল্যাণের পথের নির্দেশ দেয়। জাতির জীবনে যখন আপৎকাল বা সঙ্কটমুহূর্ত উপস্থিত হয়, জাতি যখন মোহে আচ্ছন্ন বা তন্দ্রায় অভিভূত হয়, তখন তো তাঁহাদেরই কণ্ঠে আমরা অভয়ের বাণী শুনিতে পাই। তাঁহারা মরদেহ ত্যাগ করিলেও তাঁহাদের কণ্ঠ কখনও নীরব হয় না। আমাদের অন্তর যখন নৈরাশ্যে পীড়িত, বিষাদে আচ্ছন্ন, তখনও দিব্যধাম হইতে তাঁহারা 'মাভৈঃ' বাণী উচ্চারণ করেন, সে বাণী শুনিয়া আমরা তন্দ্রাচ্ছন্ন চক্ষু মুছিয়া জাগিয়া উঠি। অবশ্য, যাঁহারা মনীষী বা মনস্বী ব্যক্তি অথবা লোকোত্তর পুরুষ, তাঁহাদের বাণী কোন বিশেষ দেশ বা কালের মধ্যে আবদ্ধ নয়, কেননা, তাঁহারা সমগ্র মানবজাতির। তাঁহাদের চিন্তাধারা শুধু পুঁথিতে নিবদ্ধ থাকে না, উহা মানুষের জীবনে রূপায়িত হয়, মানুষ তাঁহাদের বাণীর মধ্যে নবজন্ম লাভ করিয়া ধন্য হয়।

পৃথিবীতে সেই জাতি পরম ভাগ্যবান, যে জাতির মধ্যে বহু মহৎ ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু পরম দুর্ভাগ্য সেই জাতির, যে জাতি মহান পিতৃপুরুষগণের বাণী বিস্মৃত হয়। আমরা ভারতবাসী পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভাগ্যবান ও হতভাগ্য জাতি। আমাদের সকলের শক্তি সমান নয়, এ কথা সত্য, কিন্তু আমরা যদি যথাশক্তি জন্মভূমির সেবা করি বা মাতৃভূমির সঙ্কটমোচনের চেষ্টা করি, তবেই সার্থকতায় মণ্ডিত হইবে আমাদের জীবন। রবীন্দ্রনাথের একটি ক্ষুদ্র কবিতা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

'কে লইবে মোর কার্যা? কহে সন্ধ্যারবি।
শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি॥
মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল, স্বামি,
আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা' আমি।'

পৃথিবীর প্রায় সকল মহৎ ব্যক্তির চরিত্রের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করি। তাঁহারা একই সঙ্গে স্বদেশপ্রেমিক ও মানব-প্রেমিক। মাতৃভূমির লাঞ্ছনা বা দুর্গতিতে যাহার অন্তর ক্রন্দন করে না, সে স্বার্থপর বা আত্মকেন্দ্রিক, তাহাকে পরিপূর্ণ মানুষের মর্য্যাদা দেওয়া চলে না।

যাহাকে আপাতদৃষ্টিতে অমঙ্গল বলিয়া মনে হয়, তাহার পশ্চাতেও বিধাতার মঙ্গলময় অভিপ্রায় থাকে। আজ ভারতে যে অপ্রত্যাশিত বিপর্য্যয় ও অভাবনীয় সঙ্কট দেখা দিয়াছে, তাহার ফলে সমগ্রজাতি সংহত ও ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে। 'শান্তির ললিত ক্রোড়ে লীন থাকিবার কাল অতিক্রান্ত হইয়াছে, এখন রণগুরুর নিকট অস্ত্রে দীক্ষা গ্রহণের কাল সমাগত।' আজ যদি আমরা জাতীয় সঙ্কটে মনুষ্যত্বের দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারি, চরিত্রবলে বলীয়ান হইতে পারি, ভারতের অতীত ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইতে পারি, তবেই বিশ্ববিধাতার অভিপ্রায় সার্থক হইবে।

আমরা আজ উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, বালগঙ্গাধর তিলক, স্বামী অভেদানন্দ ও ঋষি অরবিন্দের উদাত্ত কণ্ঠের আহ্বান শুনিব। আমাদের প্রত্যেকের অন্তর হইতে বীর সাধক গুরুগোবিন্দের কামনা ধ্বনিত হউক—

'চারিদিক হতে আমর জীবন,
বিন্দু বিন্দু করি আহরণ,
আপনার মাঝে আপনারে আমি,
পূর্ণ দেখিব কবে ?'

—রবীন্দ্রনাথ

স্বদেশবাসী ভ্রাতা-ভগিনীগণ! তোমরা জাগ্রত হও। তোমরা অমৃতের পুত্র—এই সত্যজ্ঞান লাভ করিয়া বলীয়ান হও। একবার মোহনিদ্রা ত্যাগ করিয়া দেশের দুর্দশার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। আত্মপ্রত্যয় যাহাতে তোমাদের আইসে তজ্জন্য যত্নবান হও। তোমাদের জাতীয়তা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। জাতীয় শিক্ষার অভাবে তোমাদের সন্তানসন্ততিগণ তোমাদের পূর্বপুরুষদিগের গৌরব ও মহিমা ভুলিয়া যাইতেছে। সিংহশাবক মেষশাবকরূপে পরিণত হইতেছে। জাতীয় ধর্মের উচ্চ আদর্শগুলি বক্ষে ধারণ করিয়া নির্ভিকচিত্তে অগ্রসর হও এবং নিজ জীবন গঠিত কর। জগন্মাতা তোমাদিগকে ডাকিতেছেন—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত।" তাঁহার বিশ্ববাণী শ্রবণ কর, হৃদয়ঙ্গম কর, ধ্যান কর। একতাবদ্ধ হইয়া আপন পায়ে দাঁড়াইতে শিক্ষা কর। জগন্মাতা তোমাদের ভিতর অসীমশক্তি ও শুভাশীষ দান করিয়া কর্মক্ষেত্রে চালাইবেন। এবিষয়ে সমস্ত সন্দেহ দূর করিয়া সাহসের উপর ভর করিয়া 'মাভৈঃ' রবে জগৎকে মাতাইয়া তোল। ধর্মই ভারতের মেরুদণ্ড। ধর্মই আমাদের রাজনীতি। ধর্মপথে চলিয়া তোমরা নিজ নিজ চরিত্র গঠন কর এবং জগতের মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হও। গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে গমন করিয়া জরা ব্যাধি এবং অন্নকষ্ট দূর করিয়া জাতীয় জীবনে নবশক্তি সঞ্চার কর। ব্রহ্মচর্য্য চাই। ব্রহ্মচর্য্য চাই-ই চাই। ব্রহ্মচর্য্যে মহাশক্তির বিকাশ হয়। উপনিষদের ঋষিদিগের মত আমাদিগকেও ঈশ্বরের নিকট সদাসর্ব্বদা প্রার্থনা করতে হবে।—ওজো সহি মে, বীর্য্য সহি মে, তেজো সহি মে। যে নির্বীর্য্য সে পৃথিবীর ভার স্বরূপ—তাহার দ্বারা জগতের কল্যাণসাধন হইবে না।

—স্বামী অভেদানন্দ

৬১-তম জন্মোৎসব উপলক্ষে বালগঙ্গাধর তিলক বলিয়াছেন—"সম্মুখে বিপুল জাতীয় কর্মক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। সেই জাতীয় কর্মক্ষেত্রে আমাদের সকলকে একই সময়ে একযোগে নামিতে হইবে, একযোগে কর্ম করিতে হইবে। আপনারা আমার উৎসাহের প্রশংসা করেন—অধ্যবসায়ের গুণগান করেন। কিন্তু আমার সেই উৎসাহ এবং অধ্যবসায় হইতেও বিশুণ তেজে সকলকে এই জাতীয়

কর্মক্ষেত্রে অবতরণ হইতে হইবে। জাতির মঙ্গলের জন্য যে কাজের আবশ্যক তাহা তো কুদ্র তাড়িদ্যের নহে। দেখুন, আমাদের জননী জন্মভূমি আমাদিগের প্রত্যেককে কাজে লাগিবার জন্য ডাকিবেন। যাঁহারা মায়ের সন্তান তাঁহারা যে মায়ের এই ডাক শুনিবেন না—তাহা আমি মনেই করিতে পারি না। আপনারা প্রত্যেকেই এই ভাবে কাজ করিতে আরম্ভ করুন, যেন প্রত্যেকেই শ্রেষ্ঠ কর্মী বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। এ জীবনে যদিই বা আমরা কর্মের ফল না পাই তবু নিরাশ হইবার কারণ নাই। কারণ আমরা ফল না পাইলেও এই কর্মের ফল আমাদের ভাবী বংশধরেরা পাইবেই।"

—বালগঙ্গাধর তিলক

ভগবান যখন ভারতকে জাগাইলেন, তখন সেই জাগরণের প্রথম আবেগে জাতীয় ভাবের উদ্দীপনার আত্মময়ী শক্তি জাতির শিরায় শিরায় খরতর বেগে বহিতে লাগিল। তাহার সহিত স্বদেশপ্রেমের উন্মাদকর আবেশ যুবকবৃন্দকে অভিভূত করিল। আমরা পাশ্চাত্য জাতি নহি, আমরা এসিয়াবাসী, আমরা ভারতবাসী, আমরা আর্য্য। আমরা জাতীয় ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু তাহার মধ্যে স্বদেশপ্রেমের সঞ্চার না হইলে আমাদের জাতীয় ভাব পরিস্ফুট হয় না। সেই স্বদেশপ্রেমের ভিত্তি মাতৃপূজা। যেদিন বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' গান বাহেন্দ্রিয় অতিক্রম করিয়া প্রাণে আঘাত করিল, সেইদিন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে স্বদেশ-ভগবান জাগিল, মাতৃমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। স্বদেশ মাতা, স্বদেশ ইষ্টদেবী, এই বেদান্ত-শিক্ষার অন্তর্গত মহতী শিক্ষা জাতীয় অভ্যুত্থানের বীজস্বরূপ। যেমন জীব ভগবানের শক্তির অংশ, তাহার শক্তি ভগবানের অংশ, তেমন এই সপ্তকোটী বঙ্গবাসী, এই ত্রিংশ কোটী ভারতবাসীর সৃষ্টি সর্ব্বব্যাপী বাসুদেবের অংশ। এই ত্রিংশ কোটীর আশ্রয় শক্তি-স্বরূপিণী বহুভুজান্বিতা, বহুবলধারিণী ভারত-জননী ভগবানের একটি শক্তি, মাতা, দেবী, জগজ্জননী কালীর দেহ-বিশেষ। এই মাতৃপ্রেম, মাতৃমূর্ত্তি জাতির মনে প্রাণে জাগরিত করিবার জন্য এই কয় বর্ষের উত্তেজনা, উদ্যম, কোলাহল, অপমান, লাঞ্ছনা, নির্য্যাতন ভগবানের বিহিত ছিল। সেই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। তাহার পরে কি ?

তাহার পরে আর্য্যজাতির সনাতন শক্তির পুনরুদ্ধার। প্রথম আর্য্যচরিত্র ও শিক্ষা, দ্বিতীয় যোগশক্তির পুনর্বিকাশ, আর্য্যোচিত জ্ঞানভক্তি ও কর্ম্মশক্তির দ্বারা নবযুগের আবশ্যক সামগ্রী সকল এবং কয় বর্ষের উন্মাদিনী শৃঙ্খলিত ও স্থির লক্ষ্যের অভিমুখী করিয়া মাতৃকার্য্যোদ্ধার।

—শ্রীঅরবিন্দ

I swear by the moon and the sun that I have heard in my heart of hearts this message of freedom. As the tree in winter gets a new life with the touch of the breeze of spring, as you feel joy at the return of love, as the heart of a hero dances to the call of the trumpet of war, so a feeling has throbbed in my heart.

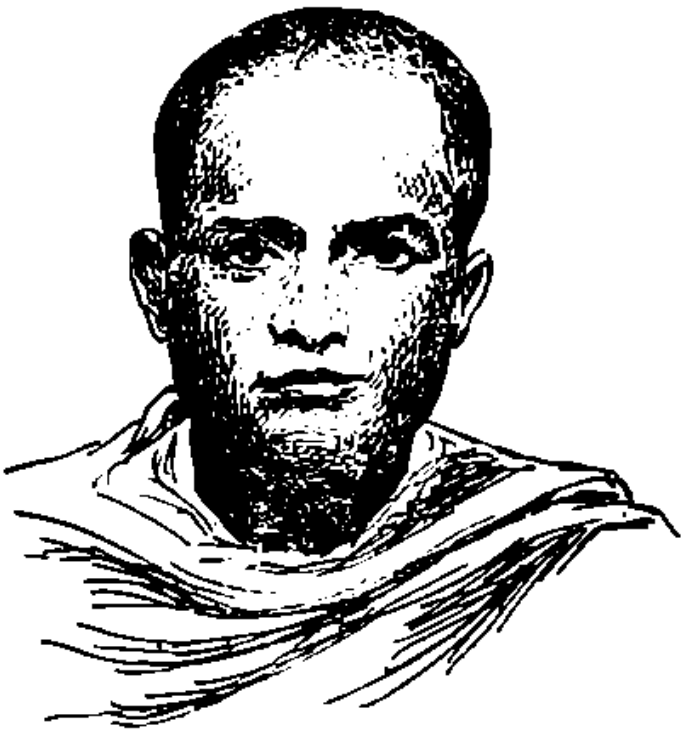

Noble India we want. Golden India, the India of Kapila and Gautama. Vasishta and Vyasa, Raghu and Dilip. Rama and Yudistira. And for the creation of such an India, freedom from slave mentality is necessary. Political Independence there must be but it is not possible if there be a slave mentality. As long as the inferiority-complex is present, slavery will follow. Pratap's belief in the Rajputs, Shivaji's faith in the Hindus made them declare their wars of Independence.

—Brahmabandhab Upadhyay

যে কথা আপনিও ভাবছেন

একা বসিয়া অনেক কথাই ভাবিতেছিলাম। ভাবিতেছিলাম স্বাধীন ভারতের ভাগ্যাকাশে যে দুর্যোগের ঘনঘটা দেখা দিয়েছে সেই দুর্যোগের কথা, জাতির সঙ্কট-মুহূর্তে সমগ্র দেশের অভূতপূর্ব জাগরণের কথা, স্বামিজীর আবির্ভাব—শতবার্ষিকী সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপনের কথা। ভাবিতেছিলাম, কোন্ পাপের ফলে শান্তিকামী ভারতের ভাগ্যে এই বিপর্যয় দেখা দিল। মনে পড়িল, স্বামিজীর উক্তি: 'জগতে যদি কিছু পাপ থাকে, তবে সে দুর্বলতা, ভীরুতা, কাপুরুষতা। এই দুর্বলতার অর্থ যে অত্যন্ত ব্যাপক, তা সহসা দিবালোকের মত স্পষ্ট হইয়া উঠিল। এই দুর্বলতার অর্থ শুধু দেহের দুর্বলতা নয়, মনের দুর্বলতা, চারিত্রিক দুর্বলতা, মনুষ্যত্বহীনতা। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, দম্ভ, ঈর্ষা এই দুর্বলতারই ফল। জাতির চরিত্রে যখন আলস্য, ঔদাস্য, বিষাদ, দীর্ঘসূত্রতা প্রভৃতি দোষ প্রবল হয়, তখনও বুঝিতে হইবে, জাতি দুর্বলতাকে বা তামসিকতাকে আশ্রয় করিয়াছে। জাতি যখন পৌরুষের চর্চা ছাড়িয়া দিয়া নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতিতে অতিমাত্রায় মাতিয়া ওঠে (ভগবান মনু এগুলিকে কামজ দোষ বলিয়াছেন), যখন অধিকাংশ সাহিত্যিক কল্যাণের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পাঠকবর্গের কামনানলে ইন্ধন যোগায়, যখন গৃহের পবিত্র বন্ধন শিথিল হইয়া যায় অর্থাৎ গৃহে সকলেই স্ব স্ব প্রধান হয়, তখনই বুঝিতে হইবে জাতির জীবনে দুর্বলতা প্রশ্রয় পাইয়াছে। স্বামিজী চাহিয়াছিলেন একদল বলিষ্ঠ, দৃঢ়চিত্ত, মেধাবী যুবক, তিনি জানিতেন, এইরূপ একদল তরুণ পৃথিবীতে অসাধ্য সাধন করিতে পারে। তিনি বলিয়াছেন—I want to preach a manmaking religion. স্বামিজীর শতবার্ষিক উৎসব যদি সাফল্য-মণ্ডিত করিতে হয়, তবে তাঁহার বাণীর অনুসরণ করিতে হইবে।

ভারতের বিপর্যয় একটি সাময়িক ঘটনা, বিধাতার কৃপায় অচিরে ইহার অবসান ঘটিবেই, কিন্তু আমাদের জীবনের চরম অভিশাপ আমাদের আদর্শভ্রংশ, প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ। উপনিষদের সেই ঋষিবাক্য আমরা ভুলিয়াছি, 'সত্যাৎ ন প্রমদিতব্যম্', 'ধর্মাৎ ন প্রমদিতব্যম্' 'কুশলাৎ ন প্রমদিতব্যম্'। আজ আমরা ভ্রষ্ট হইয়াছি সত্যের আদর্শ হইতে, ধর্মের আদর্শ হইতে, কুশলের আদর্শ হইতে। তাই আমাদের অন্তরে বিরাজ করিতেছে সীমাহীন রিক্ততা ও হাহাকার।

আজ আমাদের তরুণদের শ্রদ্ধাহীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার কথা চিন্তা করিয়া অনেকে শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু এজন্য শুধু তাহাদের দায়ী করিলে চলিবে না। পিতা-মাতা, শিক্ষকবৃন্দ, সমাজের নেতা কেহই এ দায়িত্ব এড়াইতে পারিবেন না। যে পর্যন্ত সমাজে সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশ গড়িয়া না উঠিবে, সে পর্যন্ত স্বামিজীর স্বপ্ন সফল হইবে না। কিন্তু কেহ যেন মনে না করেন যে আমরা ছাত্র-সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দিতেছি।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেও বাংলা দেশে বহু বিদ্যার্থী ব্রহ্মচর্য, ত্যাগ ও দেশসেবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, এ যুগে ব্রহ্মচর্য ও ত্যাগ এই দুইটি কথা শুধু বিদ্রূপের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ, এ কথা কি সত্য নয় যে, সংযম, ত্যাগ ও বিলাসবিদ্বেষই ভারতের সনাতন আদর্শ। যাহারা কায়মনোবাক্যে শুদ্ধ, শুধু তাহারাই দেহ ও মনে অপরিসীম শক্তি অর্জন করিতে পারে।

কিভাবে দেশের মধ্যে মানুষ গড়ার অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করা যায়, সে সম্পর্কে আমরা ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা করিব। অনেকে আমাদিগকে স্বপ্নদ্রষ্টা বলিয়া উপহাস করিবেন, তাহা জানি, তথাপি আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় আছে যে, আমাদের কথাগুলি নিতান্তই অরণ্যে রোদন হইবে না।

চিঠি শুধু চিঠি নয়!

ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিত

৬৩, সেণ্ট জর্জেস রোড, লণ্ডন

৭ই জুন, ১৮৯৯

প্রিয় মিস্ নোব্‌ল,

আমার আদর্শকে বস্তুত অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করা চলে, আর তাহা এই-মানুষের কাছে তাহার অন্তর্নিহিত দেবত্বের বাণী প্রচার করতে হবে এবং সর্বকার্যে সেই দেবত্ব বিকাশের পন্থা নির্ধারণ করে দিতে হবে।

কুসংস্কারের নিগড়ে এই সংসার আবদ্ধ। যে উৎপীড়িত, সে নর বা নারীই হোক—তাকে আমি করুণা করি; আর যে উৎপীড়ক সে আমার অধিকতর করুণার পাত্র।

এই একটি ধারণা আমার কাছে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সকল দুঃখের মূলে আছে অজ্ঞতা, তা ছাড়া আর কিছু না। জগৎকে আলোক দেবে কে? আত্মবিসর্জনই ছিল অতীতের কর্মমন্ত্র এবং হায়! যুগ যুগ ধরে তাই চলতে থাকবে। যাঁরা জগতে সর্বাধিক সাহসী ও বরেণ্য তাঁদিগকে চিরদিন বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় আত্মবিসর্জন করতে হবে। অনন্ত প্রেম ও করুণা বুকে নিয়ে শত শত বুদ্ধের আবির্ভাবের প্রয়োজন আছে।

জগতের ধর্মগুলি এখন প্রাণহীন ব্যাখ্যামাত্রে পর্যবসিত হয়েছে। জগতের এখন যা একান্ত প্রয়োজন, তা হচ্ছে চরিত্র। জগৎ এখন তাঁদের চায়, যাঁদের জীবন প্রেমদীপ্ত এবং যাঁরা স্বার্থহীন। সেই প্রেম প্রত্যেকটি বাক্যকে বজ্রের ন্যায় শক্তিশালী করে তুলবে।

এটা আর তোমার কাছে কুসংস্কার নয় নিশ্চিত। তোমার মধ্যে একটা জগৎ-আলোড়নকারী শক্তি আছে, আর ধীরে ধীরে আরো অনেকে আসবে। আমরা চাই আলোময়ী বাণী, তদপেক্ষা আলোময় কর্ম। হে মহাপ্রাণ, উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত! জগৎ দুঃখে খাক হয়ে যাচ্ছে—তোমার কি নিদ্রা সাজে? এস, আমরা ডাকতে থাকি, যতক্ষণ না নিদ্রিত দেবতা জাগ্রত হন, যতক্ষণ না অন্তরের দেবতা বাহিরের আহ্বানে সাড়া দেন। জীবনে এর চেয়ে বড় কি আছে, এর চেয়ে মহত্তর কোন কাজ আছে? আমার এগিয়ে চলার সাথে সাথেই আনুষঙ্গিক খুঁটিনাটি সব এসে পড়বে। আমি খাঁটিখাঁটি রেখে কোন কাজ করিনা। কার্যপ্রণালী আপনি গড়ে ওঠে ও নিজের কার্য সাধন করে। আমি শুধু বলি—ওঠ, জাগ।

তুমি চিরকাল আমার অন্তরের আশীর্বাদ জানবে।

ইতি—শুভাশীর্বাদক বিবেকানন্দ

এবার সুবোধ বুঝে
আমরা নূতন সাজে সেজেছি মা!

না না-সিপাইজী আপ ভুল কিয়া
এটা ঠাকুর ঘর
.....এখন পূজা হোতা।

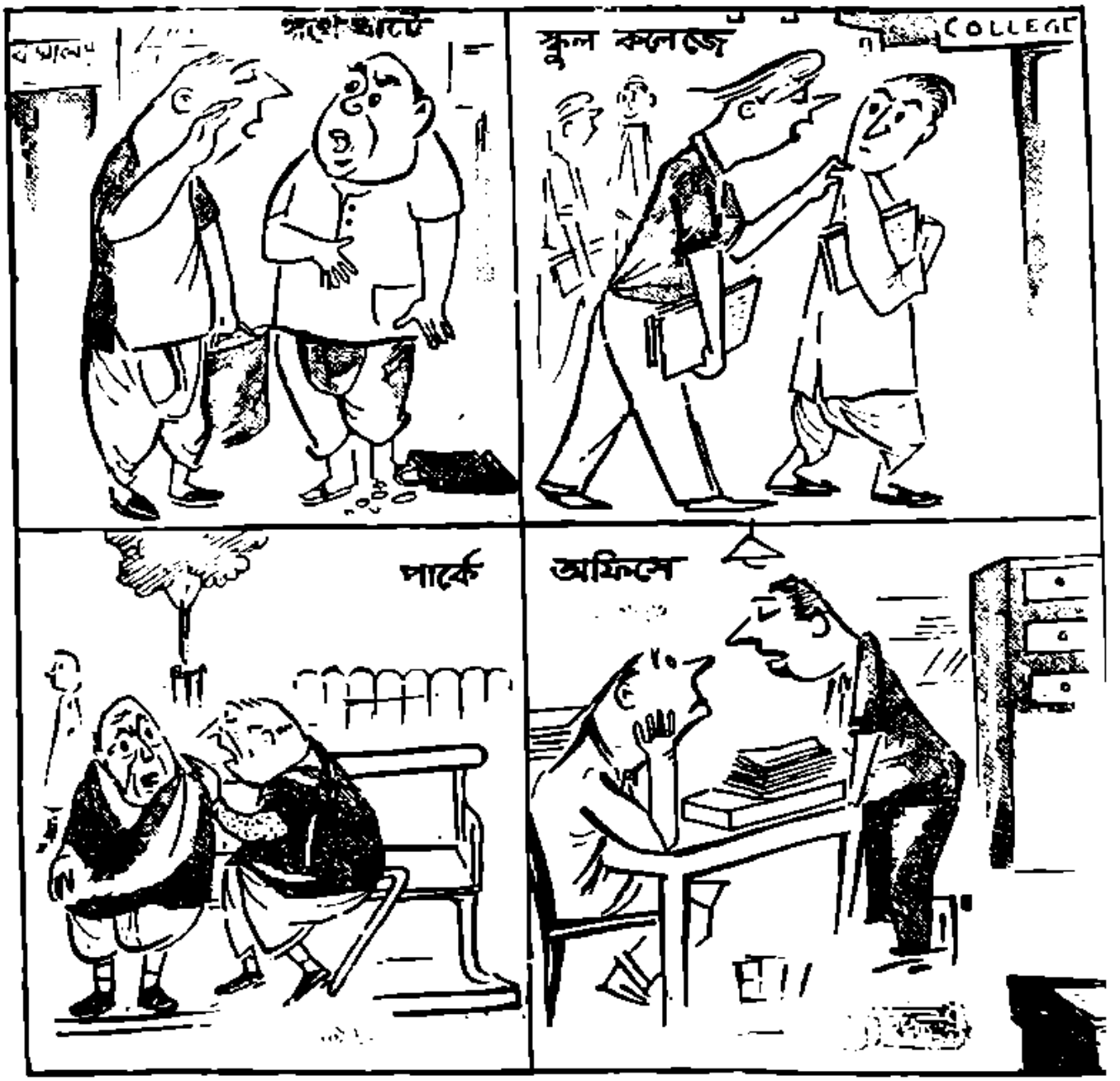

সব চাইতে বেশী ক্ষতি করে গুজব
গুজবে কখনও কান দেবেন না
বা গুজব রটাবেন না।

দেশের সর্বনাশ করলো অশ্লীল সাহিত্য
যাঁরা লেখেন বা যাঁরা প্রচার করেন
তাঁরা সমান দোষী।

যখন বলছে স্বভাব বদলাবে, তখন আর কেন……

ও সব কথা ছাড়, স্বভাব কখনও বদলায় !

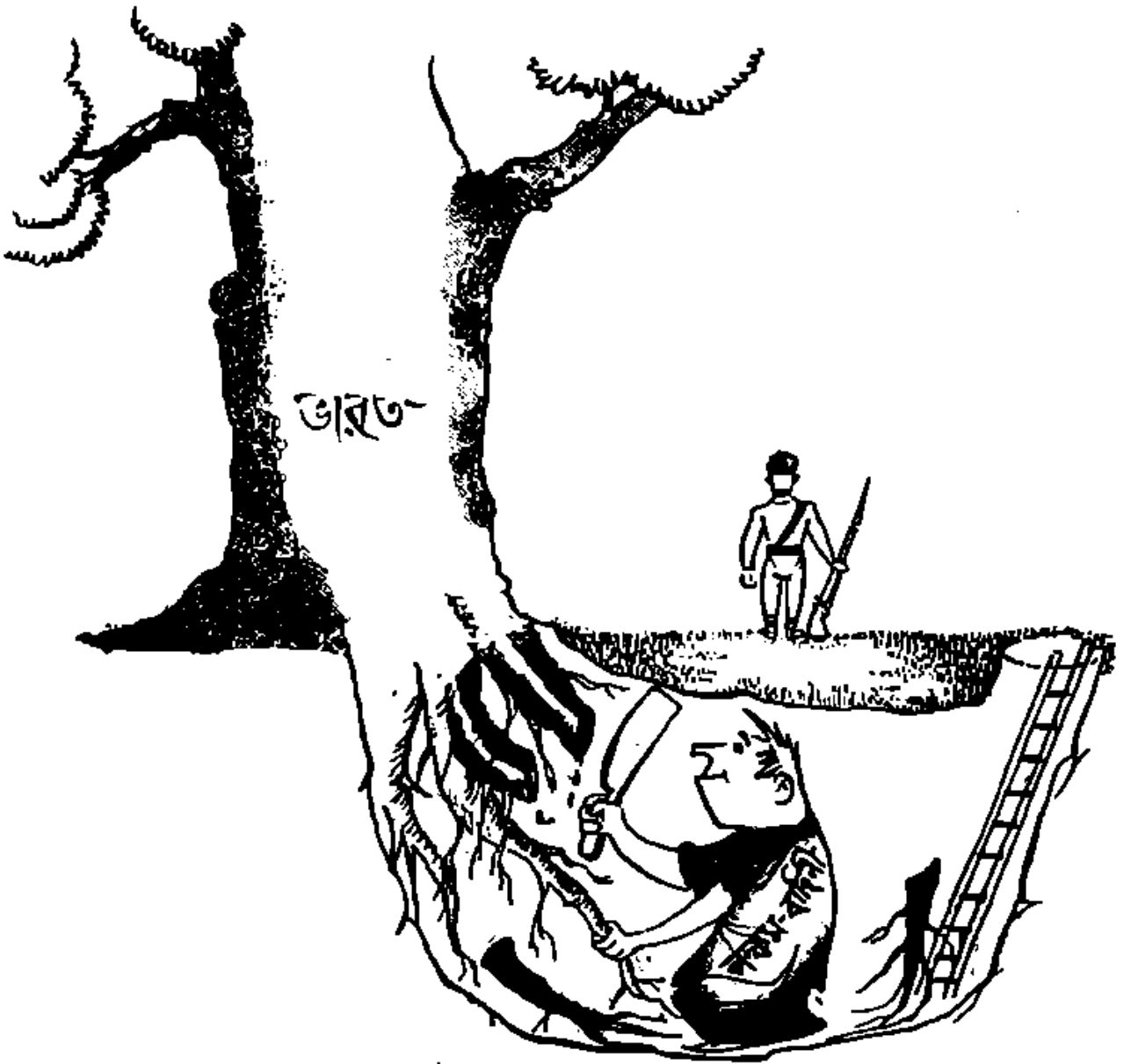

এরাই দেশের শত্রু

সাবধান !

জগদ্গুরু শ্রীশ্রী বিজয়কৃষ্ণ

জীবন কাহিনী ॥

শান্তিসুন্দর সেনগুপ্ত

কত আয়গায় প্রচারের কাজে গিয়েছে বিজয়।

বাস ঝাঁচড়া থেকে চলেছে শিলাইদহ। পথে সন্ধে হতেই ফুলতলায় এক মুদির দোকানে এসে উপস্থিত হল।

কে বলে দিল মুদিকে, শান্তিপুরের গোঁসাই।

মুদি তো মহাখুশি গোস্বামী প্রভুর প্রসাদ পাবে। অকল্পণ সৌভাগ্যের উদয় আজ তার জীবনে।

'আপনি বিশ্রাম করুন, আমি আপনার আহারের ব্যবস্থা করি।'

তক্তপোশের উপর পরিপাটি বিছানা করে দিল মুদি। রান্নার আয়োজনে তৎপর হয়ে উঠল।

'শোনো। আমি শান্তিপুরের গোঁসাই তা সত্যি, কিন্তু আমি ব্রহ্মজ্ঞানী।' বিজয় বললে স্নিগ্ধ স্বরে।

মুদি আহতের মত তাকিয়ে রইল।

'তার মানে আমার জাত নেই। আমি জাত মানিনা। আমি সকল জাতের ভাত খাই।' বিজয় স্নিগ্ধতর হল: 'তোমাকে জানিয়ে রাখা ভালো, কী বলো?'

'তা হলে আপনাকে কী করে আমার ঘরে স্থান দিবি?' মুদির স্বপ্নের প্রাসাদ ভেঙে গেল। 'আপনি অন্যত্র দেখুন।'

'তা যদি না পাই আমার পথ আছে। তুমি আমার জন্যে ভেবোনা।' বিজয় দোকান ছেড়ে বেরিয়ে গেল। 'আমার আর কিছু না থাক সত্য আছে।'

এক বটগাছের নিচে রাত কাটাল বিজয়।

কুমারখালিতে এসে দেখা হল কাঙাল হরিনাথের সঙ্গে। প্রচারসভায় বিজয়ের বক্তৃতার আগে গান ধরল হরিনাথ।

প্রাণমাতানো গানপাগলানো গান।

হে হৃদয়রঞ্জন তুমি আমার হৃদয়ে এসে বসো। আমার কাছাকাছি হও। তুমি আমার কাছে, আমি তোমার কাছে। তোমাকে দিয়ে হৃদয় পূর্ণ করে রাখি। তোমার নয়নে আমার নয়ন মিলিয়ে দেখি তোমাকে প্রাণ ভরে, দেখি অনিমেষে। আমার মাঝেই তোমার আবির্ভাব।

শান্তিপুরে এল বিজয়। অশান্ত মনকে শান্ত করতে।

মন অশান্ত কেন?

ব্রাহ্মসমাজে কপটতার প্রাদুর্ভাব হয়েছে। পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ ঢুকেছে। অন্তরে সহিষ্ণুতা নেই। কে কাকে কোণঠাসা করবে শুধু তার প্রচেষ্টা। মন শুকিয়ে যাচ্ছে, দীর্ঘকাল উপাসনায় আবিষ্ট থাকা যাচ্ছে না। রুক্ষ হয়ে যাচ্ছে অশান্তিতে।

প্রকৃতির স্পর্শ ছাড়া মনকে শান্ত করে কে? জাহ্নবীর মত কে আছে আর মনহারিণী?

নির্মল সলিলা গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে, আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। আকাশে এক, নদীর ঢেউয়ে টুকরো টুকরো, কে এই সুধার ভাণ্ডার চাঁদকে সৃষ্টি করেছে? নীল নয়ন আকাশকে? এই সমীরণে কার স্পর্শ? তরঙ্গমালায় এ কার কলস্বর?

নির্জনে বসে চিন্তা করতে লাগল বিজয়। যাদের ঈশ্বর যে হাতে প্রকৃতিপুঞ্জ সৃষ্টি করেছেন সেই হাতেই আমাকেও সৃষ্টি করেছেন? তবে আমার মধ্যে কেন এত গ্লানি, এত শূন্যতা? শান্তি আসে আবার কেন চলে যায়?

হরিমোহন প্রামাণিকের সঙ্গে দেখা করো।

'কে হরিমোহন?'

বিশুদ্ধ বৈষ্ণব। অমায়ীমানদ। খালি পায়ে হাঁটেন। খোলা মনে কথা কন।

বিজয়কে বললেন, 'চৈতন্য চরিতামৃত পড়ো, মনের সমস্ত দারিদ্র্য সমস্ত দুর্বলতা কেটে যাবে।'

'আমি যে ব্রহ্মজ্ঞানী।'

হরিমোহন হাসলে। বললেন, 'আমিও ব্রহ্মজ্ঞানী।'

'আপনি?'

'হ্যাঁ।' বললেন হরিমোহন, 'শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ আর শ্রীমতী রাধিকা মহাভাব। সুতরাং প্রভু, আমিও ব্রহ্মজ্ঞানী।'

রুক্ষ হৃদয়ে প্রেমবারি সিঞ্চন করল হরিমোহন। বিজয় চৈতন্য চরিতামৃত সংগ্রহ করে পড়তে লাগল। মহাপ্রভুর কী বিনয় আর ভক্তি, অনুরাগ আর ব্যাকুলতা। কেমন তাঁর ঈশ্বর দর্শন, কেমন তাঁর ঈশ্বরসম্ভোগ। এ দেহ পাওয়াই তো ঈশ্বরসম্ভোগের জন্যে। আর ঈশ্বরসম্ভোগের জন্যেই তা ঈশ্বরসাধন।

উন্নতাত্মা চৈতন্যদেবকে শুষ্ক বলে ভক্তি না করে থাকতে পারল না বিজয়। 'জীবে দয়া ও নামে রুচি'-র তত্ত্ব বুঝি হৃদয়ঙ্গম হতে লাগল।

বিজয় আবার চলল পূর্ববঙ্গে। সঙ্গে এবার অঘোর গুপ্ত আর কেশব সেন।

ব্রজসুন্দরের বাসি বাড়িতে আছে তারা। ভুবনমোহন সেন এসেছে দুধ নিয়ে। কেশব বিজয় গাইছে আর কেশব গান সাজছে। চাকরবাকর জুটছেনা কোথাও।

তিন বন্ধুই সমানে বক্তৃতা আর উপাসনা চালাচ্ছে। কেশব কখনো বা ইংরিজিতে। ঢাকা শহর উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে।

এক বক্তৃতা সভায় বিখ্যাত বৈষ্ণব লক্ষ্মিদাস কমলদাস উপস্থিত ছিল। বক্তৃতা শুনে সে কেঁদে ফেলল অঝোরে।

সে কী কথা? ব্রাহ্মর বক্তৃতা শুনে বৈষ্ণবের কান্না? কৈফিয়ৎ দিল বাবাজী।

বাবাজী বললে, 'বক্তৃতায় যে ওরা প্রহ্লাদের নাম করেছিল, প্রহ্লাদের ভক্তির কথা বলেছিল, আমি না কেঁদে থাকতে পারলাম না।'

সাধু, সাধু! এর চেয়ে আর বড়ো কৈফিয়ৎ কী হতে পারে?

অঘোর ব্রাহ্ম এখ-ই ইস্কুলের শিক্ষকতা করছে আর কেশব নৌকাযোগে চলে গেল ময়মনসিং। কুমিল্লায় ব্রজসুন্দরকে চিঠি লিখল বিজয়: 'আমি আপনার প্রশস্ত ভবনে একা আছি। একা কিন্তু একাকী নই। যাঁর সঙ্গে কোনোকালে বিচ্ছেদ হবেনা সেই চিরজীবনের সখাই আমার সঙ্গী।'

ঢাকা থেকে বরিশাল গেল বিজয়। উঠল উকিল দুর্গামোহন দাসের বাড়ি।

পৌষমাস, প্রবল শীত, কিন্তু বিজয়ের কোনো গাত্রবস্ত্র নেই। দুর্গামোহন তাকে একখানা দামী আলোয়ান কিনে দিল।

পরদিন ঠাহর হল সেই আলোয়ান নেই। চুরি করে নিয়ে গেল নাকি কেউ? না, প্রচারে বেরিয়ে পথে এক শীতার্ত দরিদ্রকে সে আলোয়ান দিয়ে দিয়েছে বিজয়।

খবর শুনে অপরিমাণ খুশি হল দুর্গামোহন।

আরেক খানা শীতবস্ত্র কিনে দিল বিজয়কে। ঠিক প্রথমের অনুরূপ।

সেখানাও আগের পথ ধরল। এখন উপায়? দুর্গামোহন বুঝলেন শীতবস্ত্র যা দেবেন গোস্বামী প্রভুকে তাই দরিদ্রের গায়ে উঠবে। সুতরাং কিছু অল্প মূল্যের অনেক শীতবস্ত্র কেনা হোক তারপর বিলোনো হোক যথেচ্ছ।

তাই হোক। প্রসন্ন হলেন গোসাইজি। দয়া যে করবে, বিচার করে করবে। হ্যাঁ, দয়াতেও বিচার চাই। বলছেন গোস্বামী প্রভু, বিচারহীন কখনো হবেনা। যতটুকু সাধ্য কর্তব্য ততটুকু মাত্র দয়া করবে। অতিরিক্ত দয়া করতে গিয়ে অনেক বড় বড় সাধু মারা পড়েছেন। যোগী যখন দেখবে এ লোককে এ পরিমাণে দয়া করলে ঠিক-ঠিক উপকার হবে তখনই সে দয়া করবে।

বরিশাল থেকে নৌকাযোগে বিজয় চট্টগ্রামের দিকে চলল। সীতাকুণ্ডের কাছে এসে ক্লান্তিতে পর্বত পার্শ্বেই ঘুমিয়ে পড়ল। আশ্চর্য স্বপ্ন দেখল। দেখল আকাশ তারা জ্যোতিষ্ক সমস্ত ঘোরবেগে ঘুরছে, তার পেছনে এক মহান পুরুষ। কে তুমি? আমি পুরুষ, আর বাকি যা সব দেখছ সমস্ত প্রকৃতি। যে বীণ দেখছ তা প্রকৃতি আর বীণসত্তা বা যাহিকাশক্তি যার তেজে বীণ বলছে তাই পুরুষ। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মই পুরুষ।

'প্রতিদিনই কিছু দান করবে।' বলছেন গোস্বামী প্রভু, 'দয়া বা সহানুভূতি থেকেই প্রকৃত দান। প্রতিদিনই কারু না কারু প্রেম দূর করতে চেষ্টা করবে। অন্য কিছু না পারো কাউকে অন্তত দুটো মিষ্টি কথা বলবে—তাও দান।'

কিন্তু চটির লোকটা একটা মিষ্টি কথাও বলল না, তাড়িয়ে দিল। বললে, 'বিদেশী লোকের আশ্রয় নেই এখানে। একবার কটাকে আশ্রয় দিয়ে ঠকেছি। সিন্দুক ভেঙে তিনশো টাকা চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে।'

'সকলেই কি আর—'

'তুমি যে সাধু তার প্রমাণ কী? চোরেরাও অমন সাজে।'

নিরুপায়ের আশ্রয়, বৃক্ষতলে এসে বসল বিজয়। দীর্ঘ পথ হেঁটে-হেঁটে ক্লান্তিতে ডুবে যাচ্ছে, সমস্ত শক্তি তিমিত হয়ে এল। কে জানে, অজ্ঞান হয়ে পড়ল শেষ পর্যন্ত।

পথপ্রান্তে বৃক্ষতলেই বুঝি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে বিজয়। হাটের ভিড় আর ভরসা কী।

কোথা থেকে গ্রামা এক পাগল এসে হাজির। চটির মালিক দোকানদারকে যাচ্ছেতাই বকে কাঠ খড় আর আগুন সংগ্রহ করে চলল সেই গাছের নিচে। আগুন করে বিজয়কে তপ্ত করতে লাগল। জ্ঞান ফিরে পেয়ে বিজয় চোখ চাইল। বললে, 'তুমি কে?'

'বলছি—'

'তুমি আমাকে বাঁচালে।'

'আমি না, ঐ দোকানদারই তোমাকে বাঁচিয়েছে। তারই কাঠ বাঁশ আগুন।'

'কিন্তু কে তুমি?'

'বলছি'—বলে হঠাৎ কোথায় চলে গেল পাগল।

তাড়াতাড়ি চটিতে ছুটে এল বিজয়। বলতে পারো কে ঐ পাগল? কী নাম? কোথায় বাড়িঘর?

'কিছুই জানিনা।' দোকানদার হতভম্বের মত বললে, 'কেউই কিছু জানেনা।'

চট্টগ্রামে কোন এক পাহাড় শিখরে উঠছেন; হঠাৎ এক দাবানল তাঁকে গ্রাস করতে এল। চারদিক থেকে ঘিরে ধরল বেড়া আগুন। পালাবার আর পথ নেই বিজয়ের। চোখ বুজে অগ্নি আলিঙ্গনের প্রতীক্ষা করতে লাগল।

কিন্তু একে সুশীতল! কে এক বিরাট পুরুষ বিজয়কে হঠাৎ কোলে তুলে নিল। লাফ দিয়ে পড়ল এক নিরাপদ জায়গায়। কে তুমি? চেঁচিয়ে উঠল বিজয়। বা, আমি আবার কে। তুমি নিজেই লাফ দিয়েছ।

চট্টগ্রাম থেকে কুমিল্লায় এল বিজয়। ব্রজসুন্দরের বাড়ি এসে উঠল। কালীকচ্ছের আনন্দ বক্সী দীক্ষা নিল বিজয়ের কাছে। কুমিল্লার লোক খেপে গেল। ঠিক করল বিজয়কে মেরে গঙ্গা পার করে দেবে।

সন্ধ্যায় যথারীতি কীর্তন আর উপাসনা হচ্ছে, প্রায় একশো লোক লাঠি হাতে এগিয়ে এল সভা আক্রমণ করতে।

দাঁড়াও, দু মিনিট পরে হামলা কোরো। কীর্তনটা শেষ হোক।

কী গাইছেরে গানটা। বেড়ে গাইছে কিন্তু। কথাটা কী?

'হরায় নাম বল রসনা অবিশ্রাম।'

হ্যাঁরে, গৌসাই কোন জন?

ঐ যে তন্ময় হয়ে নামে ডুবে আছে, সে। কী সুন্দর দেখতে, তাই না?

মায়েদের কথার কথা ভুলে গেল সকলে। কারু কারু বা চোখের পাতা ভিজে উঠল।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া হয়ে আবার বরিশাল। বরিশালের নবদীক্ষিত তেজস্বী ব্রাহ্মদের চেষ্টায় এক পত্তিতার বিয়ে হয়ে গেল।

বরিশাল থেকে কলকাতায়।

কলকাতায় ফিরে ব্রজসুন্দরকে চিঠি লিখছে বিজয়। পরস্পর অনটন বশত আপনাকে চিঠি লিখতে পারিনি। এবার বেয়ারিং লিখছি। আমার স্ত্রী অসুস্থ। রীতিমত ওষুধ পথ্য দিলে সেরে যেতেন নিশ্চয়। কিন্তু কোথায় কী ওষুধপথ্য। শুধু একা আমার নয়, প্রত্যেক প্রচারকের ঘরেই এই দুর্দশা। মরুক সকলে শুষ্ক কণ্ঠে অনাহারে, রোগবিকারে, কেবল ঈশ্বরের জন্যেই প্রাণত্যাগ করুক, তবু যেন কেউ ব্রাহ্মধর্মের জয় ঘোষণা করতে ক্ষান্ত না হয়।'

ব্রাহ্মরা কেশব সেনকে খৃষ্টান বলে গাল দিতে আরম্ভ করেছে। সুরু হয়েছে নানান গোল-যোগ। বিতণ্ডার তাণ্ডব।

শান্তির আশায় বিজয় আবার চলে গেল শান্তিপুর।

তারপর সটান শ্রীপাট কালনায় সিদ্ধ ভগবান দাস বাবাজীর আশ্রমে। কোথায় বিজয় প্রণাম করবে, তা নয়, বাবাজীই সাষ্টাঙ্গ হল। বসতে আসন দিল এগিয়ে।

বিজয় বললে, 'বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল খাব।'

বাবাজী নিজের কমণ্ডলু ধুয়ে পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল এনে ধরলেন সামনে।

বিজয় কুণ্ঠিত মুখে বললে, আমি যার তার হাতে খাই, জাতটাত মানিনে। আমি ব্রহ্মজ্ঞানী। আমাকে আরেক পাত্রে জল দিন।'

বাবাজী কাতর ভাবে করজোড়ে বললেন, 'প্রভু আমার আকাঙ্ক্ষায় বাধা দেবেন না। জাত-কুল থাকতে কি কখনো ভক্তিলাভ হয়? ব্রহ্মজ্ঞানই তো সমস্ত ধর্মের মূল। দয়াকরে এই পাত্রেই জল পান করুন।'

জল খেয়ে কমণ্ডলুটা রাখতেই বাবাজী সেটা নিয়ে কপালে ঠেকালেন। কপালে ঠেকিয়েই কমণ্ডলুর বাকি জলটুকু খেয়ে নিলেন এক চুমুকে।

কয়েকজন ভদ্রলোক বসে ছিলেন সেখানে, একজন বিরক্ত হয়ে বললেন, 'একী করলেন? ইনি যে পৈতে ফেলে দিয়েছেন, ব্রাহ্মসমাজে ঢুকেছেন, কিছুই মানেন না।'

'আমার অদ্বৈতেরও পৈতে ছিলনা। ব্রাহ্মসমাজে ঢুকেছেন, তাই না?' বাবাজী গর্বের ভাব করলেন 'কিন্তু মনে রেখ সেখানে আমার গৌসাই-ই আচার্য।'

ভদ্রলোক কথার সুরে বাঁজ মেশালেন। 'তা আচার্যই বটে। যেমন ধুতি-চাদর, তেমন জামা-জুতো। চমৎকার।'

শুনে বাবাজীর চোখে জল এল। বললেন, 'আহা, প্রভুকে সাধ্য না পরিপাটি করে, মনের মত করে। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা পারলাম না সাজাতে। প্রভু নিজের দরকারী জিনিষ নিজেই সংগ্রহ করে নিচ্ছেন। কই আমরা সেই অল্পেই আনন্দ করব, তা নয় আমাদের ভাগ্য মন্দ, বলে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলেন বাবাজী।

ভগবান দাসকে বলত সিদ্ধ ভগবান দাস। সিদ্ধ শুনলেই কেমন ভয় করে। কিন্তু সিদ্ধ মানে তো নরক। ভগবানদাস সেই নম্রতার অবতার। কারু দোষ দেখতে পাননা কিছুতেই। দোষের কথা কেউ বললে তিনি কাঁদতে বসেন। বলেন, ওরে আমি যে সকলের চেয়ে হীন।

এখানেই সর্বপ্রথম নাম-ব্রহ্মের পট দেখে বিজয়। হিন্দুদের মাঠ-মন্দিরে সাধারণত দেবদেবীর মূর্তিই থাকে, নয়তো শালগ্রাম বা শিবলিঙ্গ কিন্তু ভগবান দাসের আশ্রমে নামব্রহ্মের পট প্রতিষ্ঠিত।

নামব্রহ্মের পট কী?

একটি পটে লেখা মহাপ্রভু-নির্দেশিত হরিনাম মাহাত্ম্য।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

তারপর বিজয় চলল নবদ্বীপ। সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজীকে দেখে আসি।

বাবাজীর এমনি নিষ্কিঞ্চন ভাব কুকুর বেড়ালকেও ভূমিষ্ঠ হয়ে নমস্কার করে। সম্পত্তির মধ্যে একখানি ছেঁড়া কাঁথা, একটি নারকেল মালা আর একটি মাটির কমণ্ডলু। আর মৈত্রের নির্ঝর।

অপরিচিত অতিথিকে দেখে সাদর অভিনন্দন করলেন বাবাজী।

কিছুক্ষণ আলাপ করবার পর বিজয় জিগ্যেস করল, 'বাবাজী ভক্তি কিসে হয়?'

প্রশ্নশ্রবণে ক্ষমকালেন বাবাজী। একদৃষ্টে বাবাজীর দিকে চেয়ে থেকে থর থর করে কাঁপতে লাগলেন। রোষাকে মাথার শিখা খাড়া হয়ে উঠল। হুঙ্কার করে উঠলেন, 'কী বললে গোঁসাই, কী বললে? ভক্তি কিসে হয়? তুমি আমাকে প্রতারণা করতে এসেছ? নচেৎ, তুমি বললে কিনা ভক্তি কিসে হয়?' বলতে বলতে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন।

সমাধিভঙ্গের পর বাবাজী সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করে করজোড়ে বললেন, 'প্রভু, আশীর্বাদ করুন, যেন নিষ্কিঞ্চন কাঙাল হতে পারি। তা না হওয়া পর্যন্ত তো ভক্তির নাম-গন্ধও নেই। কিন্তু যাই বলুন, আমি আপনার ললাটে তিলক, মাথায় জটাভার আর গলায় তুলসীর মালা দেখছি। ভক্তি তো আপনারই ভাণ্ডারের জিনিস। আমার অদ্বৈতের ভাণ্ডারে কি ভক্তির ভাব আছে?'

বিজয় কি তখন জানত যে সত্যিই তাকে একদিন তিলক মালা নিতে হবে?

'অন্তরে একবিন্দু অহঙ্কার থাকতে ভক্তিলাভ অসম্ভব। জলস্রোত যেমন ঊর্ধ্বে ওঠেনা ভক্তিও তেমনি আসেনা অহঙ্কারে।' বাবাজী আরো বললেন।

বিজয়ের ভয় করতে লাগল। ভাবল, আমার স্বভাব অত্যন্ত উদ্ধত, সহিষ্ণু—আমার মত ক্রুদ্ধ হতে পারে এমন কজন আছে সংসারে? এই গর্বের পর্বত চূর্ণ করা সোজা নয়। তার মানেই আমার বোধহয় কোনোদিন ভক্তিলাভ হবে না। কিন্তু বাবাজী বলছেন কী? ভক্তি আমার ভাণ্ডারের জিনিস!

বিজয়কে খেতে দিলেন বাবাজী। খেয়ে থালাটা একবারে ধোয়েছে বিজয়, অমনি বাবাজী ভুক্তাবশিষ্ট তুলে নিয়ে মুখে পুরলেন।

'এ কী করছেন?' বিজয় লাফিয়ে উঠল। 'আমি ব্রাহ্ম হয়েছি।'

'তুমি যাই হও, তুমি অদ্বৈতবংশে জন্মেছ।' বললেন বাবাজী, তোমার প্রসাদ খাব না? একশোবার খাব। চিত্রগুপ্ত সাক্ষী, আজ আমার প্রভু-সন্তানের প্রসাদ পেলাম।'

কলকাতায় ফিরে এল বিজয়।

মন খালি বলছে, শুধু জ্ঞান নয়, ভক্তির কথা হোক। মন আর শুষ্ক থাকতে চাইছেনা, চাইছে স্নিগ্ধ হতে।

বিজয়ের দাদা ব্রজগোপাল ভালো গাইছে। কথকতায়ও ওস্তাদ। কলকাতায় বিজয়ের বাড়িতে এসে রয়েছে। সে দিন সে কীর্তন ধরল।

কানু পরশমণি আমার।
কর্ণের ভূষণ আমার সে নাম শ্রবণ
নয়নের ভূষণ আমার সে রূপ দরশন
বদনের ভূষণ আমার সে রূপ গায়ন
হস্তের ভূষণ আমার সে পদসেবন
(ভূষণের আরকি বাকি আছে!)
আমি কৃষ্ণচন্দ্র হার পরেছি গলে॥

এ কীর্তন শুনে সকলে মুগ্ধ তো বটেই অভিভূত হল। বিজয় কেশবকে গিয়ে বললে, 'আমাদের সমাজে কীর্তন চালু করি, কী বলো? আমার তো মনে হয় ভীষণ জমবে।'

'আমারও সেই মত।' কেশব সময় দিল।

উল্টোডিঙির মনোহর দাস বাবাজীকে ডাকানো হল। আমাদের সভায় গারবে কীর্তন গাইতে? কেন পারবনা? কোন খানা গাইবে বলো তো? মনোহর বললে সুর করে, 'প্রেম পরশমণি শ্রীশচীনন্দন বিলাইয়াছেন প্রেমসুধা দেখি দীন হীনরে।'

খুব ভালো লাগল বিজয়ের। কেশবেরও। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে কি চলবে?

যেমনই বলুক, ভক্তিছাড়া উপায় নেই। শুধু শাস্ত্রে শুধু ব্যাখ্যায়-বক্তৃতায় হবেনা। গান চাই। আর কীর্তন ছাড়া গান কই? আর কৃষ্ণ ছাড়া কীর্তন কই? আর শচীনন্দনই তো কৃষ্ণ। এটুকু সহ্য করে যেতে হবে।

বিজয়ই প্রথম কীর্তন ঢোকালো ব্রাহ্মসমাজে। নিজেই গান বাঁধল।

পাপে বলিল মোরা চল সবে ভাই
পিতার চরণ ধরি কাঁদিয়ে লুটাই।

তারপর ক্রমে ক্রমে নগরপাড়ে নগর-সঙ্কীর্তনে বেরুল ব্রাহ্মরা। কেশব বিজয় চিরঞ্জীবশর্মা। আরো অনেকে। খোল করতাল মৃদঙ্গ বাজতে লাগল তালে-মানে। গান ত্রৈলোক্য সান্যালের রচনা।

এতদিনে দুঃখের নিশি হল অবসান,
নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম॥

মেতে উঠল কলকাতা।

অনেক ব্রাহ্ম কীর্তনে আপত্তি জানাল। ওসব হিন্দুয়ানি অচল।

ব্রাহ্মধর্ম কি হিন্দুত্বছাড়া? আর বিদেশ-বিভূঁই ভোলাতে কীর্তনের মত আছে কী?

চলো কীর্তনে যাই। শরীরে ঈশ্বর স্পর্শের শিহরণ আনি।

'ধর্মলাভের সর্বপ্রধান উপায় শরীর। বলছেন গোস্বামী প্রভু, 'সর্বাগ্রে এই শরীরকেই রক্ষা করতে হয়। দুধে ঘিয়ে শরীরের যে পুষ্টি তা আমার। আসল পুষ্টি বীর্যধারণে। আহারটি খুব পবিত্র ভাবে না হলে বীর্যধারণ হবেনা। আর শরীর যদি খুব পবিত্র না হয় সাধন করবে কী নিয়ে?'

'কিছুতেই যাচ্ছে না কামেচ্ছা। স্বপ্নেও এসে উপস্থিত হয়।'

'কে বললে? দুটি ঘন্টা খুব স্থির হয়ে বসে নাম করো দেখি, কেমন সে আসে।'

'কিন্তু সিদ্ধি কত দিনে?'

'সিদ্ধি কী?' বললেন গোস্বামী প্রভু, 'ষড়ৈশ্বর্য লাভ সিদ্ধি নয়। মাত্র একটি বৎসর যদি বীর্যধারণ করে সত্য বাক্য সত্য চিন্তা ও সত্য ব্যবহার করতে পারো, অনেক ঐশ্বর্যশক্তি লাভ হবে। কিন্তু তাকে সিদ্ধি বলেনা। যখন দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয়, সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রতিক্ষণে আপনা আপনি ভগবানের নাম করবে তখনই যথার্থ সিদ্ধিলাভ হয়েছে জানবে। কোন একটি বিষয়ে লোভ বা আসক্তি থাকতে সে অবস্থা আসবেনা। সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্লোভ ও অনাসক্ত হলেই আসবে। তখনই সত্যিকার নামে রুচি। আর নামে রুচিই প্রকৃত সিদ্ধি।'

(ক্রমশ)

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে মার্চ তারিখে বাংলাদেশের একটি পত্রিকায় কোন এক নবীন কবির কাব্য সম্বন্ধে সম্পাদকের মন্তব্য প্রকাশিত হোল: হুগলী কলেজের ব চ চ ছাত্র পাত্র ভাল বটেন, তাঁহার কবিতা অনেকের অপেক্ষাই উত্তম হয়, কিন্তু খেদের বিষয় এই যে, অদ্যাবধি আত্মরস ভিন্ন অন্য কোন রসের গন্ধ প্রেরণ করেন নাই!

একেবারে প্রকাশ্যে অনুযোগ, প্রচ্ছন্ন উপদেশ, অন্তরঙ্গের সাধনাও করতে হবে।

ব চ চ অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মাথায় তুলে নিলেন ঈশ্বর গুপ্তের উপদেশ।

মহৎ ভাবাদর্শের প্লাবন এলো দেশে। আমরা সৃষ্টিকেই জানি, জানি না স্রষ্টার কি অক্লান্ত পরিশ্রম ছিল সৃষ্টির পশ্চাতে, জানি না সংবাদ প্রভাকর পত্রিকা কেমন ভাবে একটি প্রতিভার উন্মেষ সাধনে সহায়তা করেছিল।

॥ সাত ॥

অপছন্দ হবার মত ছেলে নয়। উমেশ ঠিকই বলেছে।

সুন্দর একটি সাজানো বাগানের সামনে চমৎকার একখানি বাংলোর মত একতলা বাড়ী।

প্রকাশের বয়স খুব বেশি নয়। দেখলে মনে হয় না যে একবার তার বিয়ে হয়েছিল—বৌ মরে গেছে।

একাই থাকে বাড়ীতে। সরমার সঙ্গে মানাবেও ভাল।

জয়নারায়ণবাবু দেখলেন, মেয়ের বিয়ে যদি দিতে হয় তো এইখানেই দেওয়া উচিত। এরকম পাত্র তিনি কোথায় আর পাবেন না।

বাধা মাত্র ওই একটি। গোপন রাখতে হবে আসল কথাটাই। বলা চলবে না সরমা সন্তানবতী।

কথাটা তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না। তেহট্টপুরা থেকে বাড়ী ফেরার পথে জয়নারায়ণবাবু আবার বললেন, 'আচ্ছা উমেশ, গোপন না করলেই চলবে না, না?'

'সে তো আপনি ছেলের সঙ্গে কথা বলেই বুঝতে পারলেন বাবু।'

'হুঁ' বলে জয়নারায়ণবাবু চুপ করে রইলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'সেই যে আর একজায়গায় আমাদের যাবার কথা ছিল?'

উমেশ বললে, 'সেইখানেই তো যাচ্ছি আমরা।

—'সেটা কি অনাথ-আশ্রম?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। এদের বড় আপিস কলকাতায়। এটা হলো গিয়ে তার ব্র্যাঞ্চ।'

জয়নারায়ণবাবু বললেন, 'এইখানেই রাখতে হবে অবশ্যকে?'

উমেশ বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। সে তো আপনাকে বলেছি। ছোট ছোট ছেলেরা এখানে বেশ আরামেই থাকে। আমি দেখে গেছি। আপনি ভাববেন না।'

'ভাববেন না বললেই কি আর ভাবনার হাত থেকে নিস্তার আছে? আচ্ছা চলুন।' বলে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও জয়নারায়ণবাবু এগিয়ে চললেন।

বাড়ীখানা মস্ত বড়। ঢুকেই দেখলেন, উঠোনে ছোট বড় নানা বয়েসের কয়েকটি ছেলে ছুটে ছুটে খেলা করছে।

উমেশকে দেখেই এক ভদ্রলোক দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করলেন। বললেন, 'আসুন, আপনি চলে যাবার পরই কলকাতা থেকে আমাদের কর্ত্তা এসে গেছেন। ভালই হলো, তাঁরই সঙ্গে আপনি কথা কয়ে নেবেন।'

এই বলে তিনি ওপরে ওঠবার সিঁড়িটা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'সোজা চলে যান। গিয়ে দেখুন, সুমুখের ঘরেই তিনি বসে আছেন।'

উমেশ বললে, 'আপনিও একটু আসুন না দাদা, পরিচয় করিয়ে দেবেন।'

কিন্তু সে ভদ্রলোক তখন তাঁর মুখখানা কেমন যেন কাঁচুমাচু করে বাইরে যাবার দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। বললেন, 'আমি পারব না মশাই। এখান থেকে আমার চাকরি চলে গেছে। আমার এখন মাথায় মাথায় ভাবনা।'

উমেশ বললে, 'কেন মশাই, চাকরি গেল কেন?'

ভদ্রলোক বললেন, 'এখান থেকে আশ্রম উনি তুলে দেবেন বলছেন। ছোঁড়াগুলোকে কলকাতায় নিয়ে যাবেন। কিন্তু এই আমি বলে রাখলাম মশাই, ও-সব ছেলে হচ্ছে গিয়ে—যা-বাপ-খেকো ছেলে। ওদের ভাল কি কখনও করা যায় নাকি? টেরটা পাবেন উনি সেখানে গিয়ে। আচ্ছা চলুন আপনারা, বলছেন যখন, দেখাটা ওঁর সঙ্গে করিয়েই দিই।'

বলে তিনি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলেন।

সুমুখের ঘরে গৈরিক বস্ত্রধারী সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসীর মত একজন লোক বসে বসে কি যেন ভাবছিলেন, আগন্তুকদের আসতে দেখে মুখ তুলে বললেন, 'আসুন।'

ইনিই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। গৌরমোহন।

অনেকক্ষণ ধরে তাঁদের কথাবার্ত্তা চললো। গৌরমোহন বললেন, 'রাস্তার ধারে একদিন এই এতটুকু একটি ছেলে কুড়িয়ে পাই। আমি তখন সন্ন্যাস নিয়েছি। সেই থেকে সেই ছোট্ট ছেলেটিকে নিয়ে নিঃসম্বল অবস্থায় কলকাতার একেবারে এক প্রান্তে আমি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করি। আশ্রম না চাই, ছেলেটার মায়ায় বন্দীভূত হয়ে গোলপাতার ছোট্ট একটি ঘরে এতটুকু ওই ছেলেটার সেবা শুশ্রূষা করেই আমার দিন কাটতে লাগল। ছোট্ট একটি হরিণ শিশুর জন্যে ভরতমুনির কি অবস্থা হয়েছিল জানেন তো?'

এই বলে একটু হেসে তিনি বললেন, 'আমারও হলো তাই। তারপর বিধাতার কি অভিপ্রায় জানি না, একটি একটি করে' অনেকগুলো অনাথ শিশুই এসে জুটলো আমার কাছে। দেখতে দেখতে এমন হলো, আমার সেই গোলপাতার কুঁড়ে ঘরে আর কুলোলো না, চারিদিক থেকে সাহায্যও এসে গেল, সেখান থেকে উঠে এলাম একটি বাড়ীতে—পঁচিশটি অনাথ ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। এখন আমার সে আশ্রমে কত ছেলে আছে জানেন?'

জয়নারায়ণবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কত?'

সৌরমোহন বললেন, 'তিনশ। কলকাতা যদি যান্ তো দয়া করে একবার পায়ের ধুলো দেবেন আমার অনাথ-আশ্রমে। দেখে আসবেন।'

যাই হোক্, অনাথ-আশ্রমের ইতিবৃত্ত তাঁরা শুনতে আসেন নি, তাঁরা এসেছেন যে-জন্যে, সে-কথা তাঁকে বলতে হবে। জয়নারায়ণবাবু উমেশকে চোখের ইসারা করলেন।

উমেশ বললে, 'আচ্ছা শুনুন এবার। আমরা যে-জন্যে এসেছি—বলি।'

সৌরমোহন বললেন, 'বলুন!'

উমেশ রেখে ঢেকে বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু জয়নারায়ণবাবু স্পষ্ট পরিষ্কার বলে বললেন, 'না, না, ও বলতে পারবে না। আমি বলি শুনুন।'

এই বলে আরম্ভ করে তিনি তাঁর একমাত্র যুবতী কন্যা সরমার কথা, সরমার অকাল বৈধব্যের কথা, তার সেই শিশু সন্তানটির কথা—সবই তিনি খুলে বললেন। তারপর বললেন, 'আমি মশাই বড় একজেদি মানুষ, ওই এতটুকু মেয়ে বিধবা হয়ে গেল, যতদিন বাঁচবে ততদিন মুখ ভারি করে' কেঁদে কেঁদে আমার চোখের সুমুখে ঘুরে বেড়াবে, এ আমি সহ্য করতে পারব না। বিয়ে যখন তার আবার দেবো বলেছি তখন দেবোই। আজ একটি পাত্র দেখে এলাম, বেশ ভাল পাত্র। কিন্তু মশাই, বিধবা মেয়ে সে বিয়ে করবে না। ছেলে থাকলে ত করবেই না। কাজেই সেখানে আমাকে সব কথা গোপন করতে হচ্ছে, সোজাসুজি কথা মশাই, রেখে ঢেকে কথা বলতে আমি জানি না।'

সৌরমোহন বললেন, 'বুঝতে পেরেছি। আপনার সেই নাতিটিকে আমার আশ্রমে লুকিয়ে রাখতে চান। এই ত?'

ঘাড় নেড়ে জয়নারায়ণবাবু বললেন, 'আজ্ঞে হাঁ, আপনি ঠিক বুঝেছেন।'

সৌরমোহন চোখ বুজে কি যেন খানিক ভাবলেন। তারপর বললেন, 'চলুন আপনার সেই নাতিটিকে একবার দেখে আসি।'

এই বলে' তক্ষুনি তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

বাড়ী ফিরে জয়নারায়ণবাবু সরাসরি ওপরে উঠে যাচ্ছিলেন। অন্যমনস্কের মত কি যেন ভাবতে ভাবতে সিঁড়ির মাঝামাঝি গিয়ে হঠাৎ তিনি পেছন ফিরে তাকালেন। দেখলেন, উমেশ আর সৌরমোহন দু'জনেই নীচে দাঁড়িয়ে আছেন—বোধকরি অনুমতির অপেক্ষায়। ওপরে উঠতে উমেশের কোনোদিনই অনুমতির প্রয়োজন হয় না, কিন্তু আজ তার সঙ্গে রয়েছেন একজন সদ্য-পরিচিত আগন্তুক, তাই সে নিজেও আজ বন্ধুকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। জয়নারায়ণবাবু বললেন, 'আসুন, আসুন, সৌরমোহন বাবু, আসুন। দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন?' সৌরমোহনকে নিয়ে উমেশ ওপরে উঠে গেল। বসবার ঘরে তাঁদের বসতে বলে জয়নারায়ণবাবু ডাকলেন, 'সরমা! খোকাকে নিয়ে একবার আয়ত' মা।'

সরমা তাঁদের তিনজনকেই আসতে দেখেছিল। ভাবলো, হয়ত' বা এই নতুন মানুষটি একবার দেখতে চান অজয়কে। তাই সে তাড়াতাড়ি অজয়ের মুখ হাত মুছিয়ে ভাল একখানা জামা পরিয়ে দিতে বললে, 'খোকাকে বাবার কাছে দিয়ে এসো মালতী।'

কথাটা জয়নারায়ণবাবু শুনতে পেলেন। বললেন, 'না না, তুই দিতে আয় সরমা, তোকেও ডাকছি।'

বাধ্য হয়ে সরমাকেও যেতে হলো। মাথা হেঁট করে ছেলের হাত ধরে' সে তার বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

জয়নারায়ণবাবু একবার সরমার দিকে, একবার সৌরমোহনের দিকে তাকালেন।

সৌরমোহন চোখ বুজে কি যেন ভাবলেন, তারপর অজয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'এসো খোকা, তুমি আমার কাছে এসো।'

নতুন অপরিচিত মানুষের কাছে সহজে যেতে চায় না অজয়। কিন্তু আশ্চর্য্য ক্ষমতা সৌরমোহনের।

সম্মোহন মন্ত্র জানেন নাকি সৌরমোহন?

অজয় তাঁর কাছে যেতে এতটুকু আপত্তি করলে না।

লম্বা কালো কালো দাড়ি আর গোঁফে উমেশের মুখখানা ঢাকা। তার ওপর গায়ের রংটাও অসম্ভব রকম কালো। আর সেইজন্যই বোধহয় অজয় কোনদিনই তার কাছে যেতে চায় না। উমেশের ধারণা, বুঝি অপরিচিত লোক দেখলে ছেলেটা ভয় পায়। কিন্তু আজ সে তার ব্যাপার দেখে একটুখানি অবাক হয়ে গেল। বললে, 'বাঃ, আপনার কাছে বেশত' এলো! আমার কাছে কিছুতেই আসে না।'

সৌরমোহন একটু হাসলেন। বললেন, 'ছেলে মানুষ করে করে' ওদের ধরণ ধারণ অনেক খানি আয়ত্ত করে' ফেলেছি। বুঝলেন? এই ছেলে যদি আমার কাছে একদিন থাকে ত' দেখবেন তার পরদিন থেকে ও আর আমার কাছছাড়া হতে চাইবে না।'

এই বলে অজয়কে তিনি কোলে বসিয়ে পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে তার সঙ্গে গল্প সুরু করে দিলেন। মাঝখানে একবার মুখ তুলে সরমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যাও মা, যাও তুমি, আর এখানে দাঁড়িয়ে কেন, তুমি যাও!'

জয়নারায়ণবাবু বললেন, 'না না, শোন সরমা, অজয়কে ওঁর আশ্রয়ে রেখে যেতে ভাবছি। বেশ ভাল থাকবে। যখন ইচ্ছে রেখে আসবি। আর তারপর আজ আমরা—উমেশ আর আমি—'

এই পর্য্যন্ত বলে তিনি আর বলতে পারলেন না। একটা ঢোঁক গিলে বললেন, 'আচ্ছা থাক্, সে সব অনেক কথা আছে, বলব এর পর। এখন যা তুই।'

সরমা চলে গেল।

সৌরমোহন জিগ্যেস করলেন, 'এখনও ওকে কিছু বলেন নি বুঝি?'

জয়নারায়ণবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, 'না। তবে ও এক রকম বলাই ধরে নিন। আর আপনি দেখলেন ত' স্বচক্ষে, ওইত' এইটুকু মেয়ে—এরই মধ্যে বিধবা হলো, আর এমনি করে চিরদিন ও আমার চোখের সামনে ঘুরবে তা আমি হতে দেবো না কিছুতেই। বিয়ে আমি ওর দেবো যখন বলেছি তখন দেবোই।'

সৌরমোহন হেঁটমুখে অজয়ের মুখের পানে তাকিয়ে চুপ করে রইলেন।

জয়নারায়ণবাবু জিগ্যেস্ করলেন, 'চুপ করে রইলেন কেন? কিছু বলুন।'

সৌরমোহন বললেন, 'ভাবছি।'

'কি ভাবছেন?

'ভাবছি মেয়ে আপনার রাজি হবে কিনা।'

জয়নারায়ণবাবু বললেন, 'ওর আবার রাজি হওয়া-হওয়ি কি? ওকি আর মুখ ফুটে বলবে কোনোদিন?'

গৌরমোহন বললেন, 'ছেলেপুলে থাকলে আমাদের মেয়ের মেয়েরা আবার বিয়ে করতে রাজি বড় একটা হয় না।'

জয়নারায়ণবাবু কট করে' রেগে উঠলেন। এবং রাগলে তাঁর নিজ মূর্তি ধারণ করতে বেশি দেরি হয় না। বললেন, 'থামুন মশাই, থামুন, আপনি সন্ন্যেসী মানুষ, মেয়েদের মনের কথা আপনি কিছু জানেন না।'

গৌরমোহন প্রতিবাদ করলেন না। শুধু একটুখানি হাসলেন শুধু। হেসে বললেন, 'বেশ ত। রাজি হলেই ভালো। মেয়ের বয়স কম, বিয়ে দেওয়া উচিত তা আমিও বুঝি, কিন্তু ওর মত ত' একবার নিতে হবে, না—তাও নেবেন না?'

জয়নারায়ণবাবু গম্ভীর ভাবে ঘাড় নেড়ে বললেন, 'না! মত নিতে হবে না।'

এইবলে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'ছেলে মানুষের মত কি যে ধরেন তার ঠিক নেই।'

গৌরমোহন চুপ করেই রইলেন। জয়নারায়ণবাবু কিন্তু চুপ করলেন না। তিনি আবার বললেন, 'বিয়ে আমি দেবো বলছি—বাস্, কারও কথা শুনব না, কাউকে জিগ্যেস করব না; বিয়ে আমি দেবোই। আমার জেদ আপনি জানেন না মশাই, জানলে ও-কথা বলতেন না কখনও।'

উমেশ বললে, 'ওরে বাবা, সেবার সেই তিন ওয়াগন্ কয়লা আনতে গিয়েই বুঝেছিলাম। এক ব্যাটা মস্ত ধনী কারবারী বললে, 'হুজুর আমি পাঁচ হাজার টাকা এ্যাডভান্স দিচ্ছি আমাকে কয়লা দিন।' উনি বললেন, 'দেবোনা যখন বলেছি তখন পাঁচ হাজার ছেড়ে পাঁচ লাখ দিলেও দেবো না। 'লোকটা পায়ে হাতে ধরতে লাগলো, কিন্তু বাবুর সেই এক কথা। শেষে পাঁচ হাজার টাকার নোটের তাড়া উনি রাগ করে ঠিক কাগজের মতন ঘরের মেঝের ওপর ছড়িয়ে ফেলে দিলেন। তা ছাড়া আর একবার সেই—'

বলে উমেশ জয়নারায়ণবাবুর আর একটা জেদের দৃষ্টান্ত গৌরমোহনকে শোনাতে যাচ্ছিল। ঘন ঘন ঘাড় নেড়ে কথাগুলো সে খুব জোরে জোরেই বলছিল। তাই না দেখে অভয় ভয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গিয়ে উঠে দাঁড়াল। বললে, 'যার কাছে যাব।'

জয়নারায়ণবাবু তার হাত ধরে দরজার কাছ পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'যাও।'

তারপর কারও মুখে কোন কথা নেই। ঘরের মধ্যে একটা অবাঞ্ছিত নীরবতা বিরাজ করতে লাগল।

প্রথমেই কথা বললে উমেশ। বললে, 'তাহলে কি হবে বলুন এবার।'

জয়নারায়ণবাবু বললেন, 'হবে আবার কি। যা ভেবেছি তাই হবে।'

এই বলে তিনি গৌরমোহনের মুখের পানে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'কবে আপনি কলকাতায় ফিরে যাবেন মনে করেছেন?'

'কাল রাত্রে।'

'বেশ, তাহলে কালরাত্রেই অজয়কে আপনি নিয়ে যাবেন কলকাতায়। কিন্তু শুনুন, অজয়ের সঙ্গে আমাদের একটা কি থাকবে। খরচ-পত্র যা লাগে তা ত' দেবোই তা ছাড়া আপনার আশ্রমের জন্যে মাসে মাসে কত দিতে হবে বলুন।'

উমেশ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আহা হা হা, সে কথা ত' আগেই আমাদের হয়ে গেছে। মাসে মাসে পঁচিশটি করে' টাকা দেবেন। বাস্, ছুটি।'

গৌরমোহন বললেন, 'কারও কাছ থেকে কিছুই আমরা নিই না, নেবার নিয়মও নেই। নিচ্ছি আপনি বড়লোক বলে—চাঁদা হিসেবে। এর ওপর ভুলুম চলে না। আপনার যা-খুশী তাই দেবেন।'

জয়নারায়ণবাবু হট্ করে যেমন তাড়াতাড়ি হেসে ওঠেন, তেমনি তাড়াতাড়ি রাশ তাঁর পড়েও যায়। এবং রাশটা কমে গেলে মনে হয় তিনি যেন একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেছেন। গৌর-মোহনের কথা শুনে তাই তিনি একটুখানি হেসে বললেন, 'চাঁদা হিসেবে পঁচিশ কেন, আশ্রমের জন্যে পঞ্চাশটাকাই ধরে' রাখুন। মাসে মাসে মণি-অর্ডার করে' আমি পাঠিয়ে দেবো।'

গৌরমোহন বললেন, 'তাহলে আজ আমি উঠি।'

বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

উমেশ তাড়াতাড়ি হাত দুটো কপালে ঠেকিয়ে বললে, 'নমস্কার!'

'নমস্কার।'

গৌরমোহন চলে গেলেন এবং তিনি যাওয়া-মাত্র উমেশ বলে উঠল, 'কি রকম যে আপনার কথাবার্তা মশাই, কে জানে। মাসে মাসে পঞ্চাশটাকা হলে বছরে কত হয় বলুন দেখি? ছ'শ টাকা। সর্বনাশ! তিনশ টাকায় ঠিক করেছিলাম, একেবারে ডবল্ করে দিলেন আপনি!'

জয়নারায়ণবাবু বললেন, 'তা হোক্। আমার আর কে আছে বলতো উমেশ? টাকা নিয়ে আমি করব কি?'

'হাসালেন আপনি! টাকা নিয়ে কি করবেন?'

আরও কি যেন উমেশ বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় বাড়ীর ভেতর থেকে মাসতী কি দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। বললে, 'দিদিমণি খুব কাঁদছে বাবা, কিছুতেই থামাতে পারছি নি, আপনি একবার আসুন ভেতরে।'

'যাচ্ছি।' বলে কিছু বিস্ময় করে জয়নারায়ণবাবু উমেশের মুখের দিকে তাকালেন। বললেন, 'কথাগুলো একটুখানি আস্তে বলতে পারনা উমেশ? ষাঁড়ের মতন এতক্ষণ ধরে' যে-রকম চিৎকার তুমি করলে, এইবার নাও মজা, সরমা সব শুনতে পেয়েছে। শুনে কাঁদতে আরম্ভ করেছে। এইবার আমি ওকে থামাই কেমন করে বল দেখি?'

উমেশ বললে, 'আমি চেঁচাইনি, চেঁচিয়েছেন আপনি।'

সে কথাও সত্যি। জয়নারায়ণবাবু উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'চল—দেখি। তুমিও এসো আমার সঙ্গে।'

দু'জনেই উঠে গেল।

(ক্রমশঃ)

বাংলা রঙ্গালয়ের নব-রূপায়ণ

শ্রীধেরেন্দ্রকুমার রায়
আলমগীর

(৮)

১৯২১ খৃষ্টাব্দের এগারোই ডিসেম্বরে। আমরা দিনের পর দিন গুণতে লাগলুম। পুরানো নাটক যে "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে" বিপুল প্রতিভার প্রথম বিদ্যুৎবিকাশ দেখে সচকিত হয়ে উঠেছিলুম, এখন নূতন নাটকে তার প্রকাশ কতটা বেশী মোহনীয় হয়ে উঠতে পারে, স্বচক্ষে তা দেখবার জন্যে আমাদের আগ্রহের আর সীমা নেই।

"ভারতী" গোষ্ঠীভুক্ত সাহিত্যিকদের অনেকেই বাংলা রঙ্গালয়ের ভালো-মন্দ নিয়ে মতামত ব্যক্ত করতেন না আদৌ। কেউ কেউ কখনো-সখনো বাংলা রঙ্গালয়ের প্রেক্ষাগারে গিয়ে উঁকিঝুঁকি দিতেন বটে, কিন্তু কেউ কেউ ছিলেন অত্যন্ত বিরোধী। রঙ্গালয়ের নটনটীর নাম মুখে আনলেই বিগড়ে যেত তাঁদের মেজাজ।

যেমন "প্রবাসী" পত্রিকার অন্যতম কর্ণধার এবং প্রখ্যাত লেখক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার মুখে অনেক অভিনেত্রীর নাম শুনেই তিনি রীতিমত ক্ষেপে গিয়েছিলেন।

কিন্তু কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, "ভারতী" সম্পাদক কবিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী এবং আমি,—আমরা এই পাঁচজন ছিলুম বাংলা রঙ্গালয়ে অভিনয় অনুরাগী। আমরা প্রায়ই নাট্যকলা নিয়ে নানা আলোচনার ঝোল দিয়ে প্রভূত আনন্দলাভ করতুম এবং সেই কারণেই "ভারতী"র সাহিত্য-আসর শিশিরকুমারের প্রধান বৈঠকে পরিণত হ'তে পেরেছিল। কিন্তু কেবল কাব্য ও নাট্যচর্চার সমান ওস্তাদ শিশিরকুমার নন, নূতন যুগের আরো বহু নাট্যশিল্পী সেখানে গিয়ে তৃপ্তিলাভ করতেন; যেমন নির্মলেন্দু লাহিড়ী, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ও রবি রায় প্রভৃতি এবং সময়ে সময়ে "ভারতী"র বৈঠকে সাহিত্যিকের চেয়ে অভিনেতারাই হলে ভারি হয়ে উঠতেন। এখানে একথাও স্মরণযোগ্য যে, বাংলা রঙ্গালয়ের নব-রূপায়ণে শিশিরকুমারের সঙ্গে "ভারতী" গোষ্ঠীভুক্ত শিল্পী ও সাহিত্যিকদেরও সম্পর্ক ছিল রীতিমত উল্লেখ্য। পরে সেটা আরো বিশদ ক'রে দেখাবার চেষ্টা করব। এখানে আর একটি সত্যকথাও ব'লে রাখি।

বাংলা নাট্যজগতে জনসাধারণের মধ্যে নবযুগধর্ম সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না বললেই চলে। "নাচঘর" পত্রিকাই সর্বপ্রথমে মঞ্চ ও পটের দিকে নিয়মিত ভাবে আবালবৃদ্ধবনিতার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে এবং "ভারতী" গোষ্ঠীভুক্ত সাহিত্যিক ও শিল্পীরাই ছিলেন "নাচঘরে"র কর্ণধার বা পৃষ্ঠপোষক।

অবশেষে যথাসময়ে "আলমগীর" সুরু হ'ল। কিন্তু আমরা দেখতে গেলুম না। স্বয়ং শিশিরকুমারই নিষেধ ক'রে দিয়েছিলেন যে, প্রথম দুইরাত্রি আমরা যেন অভিনয় দেখতে না যাই, কারণ ক্রমাগত ঘষলা দিয়ে ওঁর কণ্ঠস্বরের অবস্থা একেবারেই ভালো থাকবে না।

প্রথম দুইরাত্রি শিশিরকুমারের কণ্ঠস্বর কেমন ছিল জানিনা, কিন্তু যাঁরা অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন তাঁদের প্রত্যেকের মুখেই শুনলুম শিশিরকুমারের অকুণ্ঠ অয়জয়কার—সকলেই একটা অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে ফিরে এসেছেন। তাঁদের প্রত্যেকেই বিস্মিত এবং তাঁদের প্রত্যেকেরই অভিনন্দন মৌখিক নয়, আন্তরিক।

তৃতীয় রাত্রে আমরা "আলমগীরে"র নাট্যাভিনয় দেখতে গমন করলুম। আমরা বলতে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতিলাল গঙ্গোপাধ্যায় এবং আমি। আর কেউ সঙ্গে ছিলেন ব'লে স্মরণ হচ্ছে না।

যবনিকা উঠল। প্রথমেই সুদীর্ঘকাল ধরে দেখলুম সেই গিরিশোত্তর যুগের মার্কা-মারা খাড়া-বড়ি-খোড়, খোড়-বড়ি-খাড়া বা গতানুগতিকা প্রবাহের একঘেয়ে লীলা। মনের উপরে একটুও দাগ পড়ল না। অসন্তুষ্ট চিত্তে এই পুরাতন কাসুন্দীর টিক্ স্বাদ গ্রহণ করতে করতে ভাবতে লাগলুম, কোন্ অসম্ভব যন্ত্রশক্তির গুণে এমন বস্তাপচা নাটকের সেকেলে নিম্নশ্রেণীর অভিনয়ের মধ্যে নূতন প্রাণ ও নূতন রস ফুটে উঠবে!

অবশেষে সত্য সত্যই সেই অসম্ভবই সম্ভবপর হ'ল। আচম্বিতে দ্বিতীয় অঙ্কে শিশিরকুমারের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই অভাবিত পরিবর্তন। প্রথমেই এমন কৌশলে রঙ্গমঞ্চে তিনি প্রবেশ করলেন যে একটিমাত্র বাক্যব্যয় না ক'রে কেবল মৌন ভাবাভিনয়ের দ্বারাই মুহূর্তমধ্যে এই অচল নাট্যাভিনয়কে চলমান ও প্রাণবান ক'রে তুললেন—এ এক আশ্চর্য ব্যাপার এবং সঙ্গে সঙ্গে যেন মায়ামন্ত্রেই জাগ্রত হয়ে উঠল দর্শকদের মুগ্ধ মন।

তারপর সুরু হ'ল সেই অমৃতমায়মান ভাষণ! কে যেন হঠাৎ গুহামুখ থেকে পাথর সরিয়ে বন্দী নির্ঝরকে মুক্ত ক'রে দিলে। তেমন সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর তখনকার সাধারণ রঙ্গালয়ে আর কারুর কর্ণগোচর হয়নি—ধাপে ধাপে তার উত্থান ও পতন, তার সময়োচিত কোমলতা ও কাঠিন্য, তার ভাষার অনুসারী উচ্চারণ-পার্থক্য, এসব বিশেষত্ব গিরিশোত্তর যুগের রঙ্গালয় থেকে নির্বাসিত বা বিতাড়িত হয়েছিল। উপরন্তু স্বয়ং মোগল সম্রাটের পদমর্যাদাসূচক চলন-বলনও সাধারণ থিয়েটারি রাজাদের মত কোথাও কৃত্রিম ও হাস্যকর হয়ে ওঠেনি।

এবং সেই স্মরণীয় ও সুদীর্ঘ স্বপ্ন-দেখার দৃশ্য! কেবল আলমগীরের স্বপ্নদর্শনজনিত আচ্ছন্নতার জন্যে নয়, পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধ'রে প্রায় একাই স্থানপরিবর্তন না ক'রে নাটকীয় আত্মমগ্নে প্রেক্ষকদের ভুলিয়ে রাখা এক অসাধারণ ও অবিশ্বাস্য ঘটনা ব'লে বর্ণনা করা যেতে পারে। শৈশব ও বাল্যকালের কথা না হয় ধরব না, কারণ নাট্য-সম্পর্কীয় জ্ঞান তখন পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় নি, তবে তারপর সচেতন মন নিয়ে প্রায় বাট বৎসর ধ'রে বাংলা রঙ্গালয়ে নাট্যলীলা দর্শন ক'রে আসছি, কিন্তু এমন বিস্ময়কর দৃশ্য ও অনুপম নাট্যনিপুণতার সঙ্গে তুলনা করতে পারি, এ-রকম কোন-কিছুই স্মরণ করতে পারছি না। এই পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধ'রে প্রত্যেক দর্শক মন্ত্রমুগ্ধের মত ব'সে থাকতেন, কেউ একটি টুঁ শব্দ পর্যন্ত করতে পারতেন না। পরের যুগে পুনরভিনয়ের সময়ে এই দৃশ্যটিকে কেটে-ছেঁটে যথেষ্ট ছোট ক'রে ফেলা হয়েছিল, কাজেই নূতন দর্শকরা আমাদের কথা অত্যুক্তি ব'লে মনে করতে পারেন।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ বললেন, "এতদিন লোকের মুখেই সৌখীন শিল্পী শিশিরকুমারের নাম শুনে আসছিলুম, আজ নিজের চোখে দেখে বুঝতে পারছি সত্যই তিনি অতুলনীয়।"

সত্যেন্দ্রনাথ এক অভিনয় দেখেই শিশিরকুমারের ভক্ত হয়ে পড়লেন বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় অকালে ইহলোক ত্যাগ ক'রে তিনি তাঁর পরিপূর্ণ গৌরবে আত্মপ্রকাশ দেখে যেতে পারেন নি।

বিভোর হয়ে অভিনয়ের রস উপভোগ করছিলুম। কিন্তু তারপর আমাদের মনের বাঁধা তার যেন ছিঁড়ে গেল আচম্‌কা।

ব্যাপার কি? নূতন এক কল্পনাতীত দৃশ্য। সাজানো ও জম্‌কালো দৃশ্যপটের সামনে হঠাৎ ঝিনিক্ ঝিনিক্ ক'রে চটুল কুমুর বাজিয়ে নাচতে নাচতে এসে দাঁড়াল জনৈক নর্তক এবং তারপর যে নাচটা নেচে গেল মোগল সম্রাটদের রাজত্বকালে তেমন আজব নাচ কেউ বোধকরি স্বপ্নেও দেখবার সুযোগ পায় নি। তবে বোঝা গেল তবলার বোলের সঙ্গে পদচালনা করতে এই নর্তকটি দস্তরমত ওস্তাদ। কিন্তু এইটুকু কেবল আমাদের বোধগম্য হ'ল না যে, গুরুগম্ভীর "আলমগীর" নাটকের মধ্যে এই প্রহসনসুলভ চটুল দৃশ্যটিকে নিক্ষেপ ক'রে দর্শকদের রসবোধকে এমন চণ্ডালের মত হত্যা করলে কে? কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, কিন্তু এখানে সেই রসিক কর্তাটি কে? নিশ্চয়ই শিশিরকুমার নন—অন্তত এইটুকু আন্দাজ করা কঠিন হ'ল না।

তখন মনে পড়ল আমরা পার্সী প্রভাবগ্রস্ত রঙ্গালয়ের মধ্যে ব'সে আছি। এবং এটা হচ্ছে পার্সী থিয়েটারের চিরাচরিত রীতি—এখানকার কর্তাব্যক্তিরা দারুণ ট্রাজেডির সঙ্গেও উদ্ভট প্রহসনের ঘোড়া না চালিয়ে স্থির থাকতে পারেন না।

প্রায় ষাট কি একষট্টি বৎসর আগে বাংলা রঙ্গালয়ে যখন গিরিশ, অর্ধেন্দু প্রভৃতি সগৌরবে বর্তমান, তখন কি কুক্ষণে একদিন ধর্মতলার পার্সী কোরিন্থিয়ন থিয়েটারে গিয়ে পড়েছিলুম। প্রথমটা আন্দাজ করতেই পারলুম না যে, কোন্ নাটকের অভিনয় হচ্ছে। তারপর আবিষ্কার করলুম এটা হচ্ছে সেক্সপিয়রের "কিং লিয়রে"র অভিনয়। "কিং লিয়রে"র পার্সী নাট্যরূপের সঙ্গে আবার কাউ বয়ের জুড়ে দেওয়া হয়েছে একখানা "আলিবাবা" জাতীয় নৃত্যগীতবহুল চটকদার অপেরা। একবার "কিং লিয়রে"র অভিনয় হয়, তারপর খানিকক্ষণের জন্যে তা থামিয়ে সুরু করা হয় হাসিগাননাচ ভরা অপেরার একএকটি দৃশ্য। পাশাপাশি এগিয়ে চলে একই সঙ্গে কান্না ও হাসি-গানের বৈত লীলা! দেখলুম পার্সী বা হিন্দী দর্শকরাও এর জন্যে একটুও ক্ষুণ্ণ নয়, বরং তাদের মন অধিকতর জাগ্রত ও প্রীত হয়ে ওঠে। চট্‌পট্ চট্‌পট্ শব্দে হাততালি দেয়, হো হো হা হা ক'রে হেসে ওঠে এবং বিপুল পুলকে ঘন ঘন সিটি মেরে কাণে তালা ধরায়।

তখন স্মরণ হ'ল, "কোরিন্থিয়ন থিয়েটারে"র মালিকেরই করতলগত হয়েছে "কর্ণওয়ালিস থিয়েটার", সুতরাং এখানে পার্সী মনোবৃত্তির বিসদৃশ প্রকাশ দেখতে আমরা বাধ্য। তার কাছে একান্ত অসহায় নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ ও প্রধান অভিনেতা (মাষ্টারশিক্ষাদাতা?) শিশিরকুমার!

তারপর রংবার ক্যাঁকেথানো দৃশ্যপটের কথা। মৌন অট্টহাস্য যদি সম্ভবপর হয় তাহলে বলতে হয়, দৃশ্যপটগুলো স্থানকালপাত্র কিছুই আমলে না এনে করছিল যেন বিস্ফোরণপূর্ব মৌন অট্টহাস্য! সে এক বিষম হ-য-ব-র-ল। সাজপোষাকও তেমনি—এ বলে আমায় ছাখ্, ও বলে আমায় ছাখ্! গিরিশ-চন্দ্রের গানের ভাষায়—"কে হারে, কে জিতে, দুজনে সমান!" কেবল ঐশ্বর্যের বড়াই, সৌন্দর্যের ছিটেফোঁটা নেই। উল্লেখযোগ্য ছিল শুধু আলমগীরের পরিচ্ছদ।

শুনেছি নাট্যশিক্ষাদাতা ছিলেন স্বয়ং শিশিরকুমার। কথা সত্য হ'লে বলতে হয়, পুরানো দলের নটনটীদের মধ্যে একমাত্র নীরদাসুন্দরী ছাড়া আর কেহই তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন নি—উদীপুরীর সুবৃহৎ ভূমিকায় কুসুমকুমারীকে প্রায়-অচল বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই ভূমিকায় পরে মালিনী, নীরদাসুন্দরী ও কৃষ্ণভামিনী প্রভৃতি শিশিরকুমারের শিক্ষায় সম্পূর্ণ মর্যাদা রাখতে পেরেছিলেন। তারাসুন্দরীও এই ভূমিকায় কিছুদিন দেখা দিয়েছিলেন, তাঁর অভিনয়ও চমৎকার হয়েছিল।

পুরাতন নাটক "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে"র পুনরভিনয়ে যে অপূর্ব প্রয়োগপটুতা দেখে চমৎকৃত হয়েছিলুম, এই নূতন নাটকে তার যারপরনাই অভাববোধ করেছিলুম।

নাটক হিসাবে "আলমগীর" ক্ষীরোদপ্রসাদের রচনার মধ্যে উচ্চস্থান অধিকার করবে না—এর বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন ত্রুটি দেখানো যেতে পারে, এখানে যা সম্ভবপর নয়। এই সব কারণেই প্রখ্যাত নাট্যকারের লেখনী থেকে জন্মলাভ ক'রেও নাটকখানি অল্প রঙ্গালয়ে গৃহীত হয়নি—সে যেন এতদিন শিশিরকুমারের জন্যেই অপেক্ষা করছিল। এবং শিশিরকুমারের অনন্যসাধারণ প্রতিভার সাহায্য পেয়ে সে এমন জীবনীশক্তি অর্জন করলে যে, খ্যাতির দিক দিয়ে তার স্থাননির্দেশ করা যায় "প্রতাপ-আদিত্যে"র পরেই।

শিশিরকুমার "আলমগীর"-কে গ্রহণ করেছিলেন কেন? তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, এর মধ্যে তাঁর নিজের অভিনয় করবার প্রভূত সুযোগ আছে।

শ্রেষ্ঠ নটের পক্ষে প্রধান দ্রষ্টব্য, নিজের উপযোগী ভূমিকা নির্বাচন করতে পারা। এ শক্তি না থাকলে ব্যর্থ হবে তাঁর অতুলনীয় প্রতিভাও। পরে তিনিও "বলিদানে"র দুলালচাঁদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু দানীবাবুকে অতিক্রম করতে—এমন কি সমান-সমান হ'তেও—পারেন নি। বিলাতের স্যার হেনরি আর্ভিংয়ের নিজের যোগ্য ভূমিকা বেছে নেবার শক্তি ছিল অসাধারণ, তাই অনেক নিম্নশ্রেণীর নাটকও তাঁর হাতে প'ড়ে দীর্ঘজীবন লাভ করত।

এখানে আমরা রবীন্দ্রনাথের কথায় "আলমগীর" সম্বন্ধে অনায়াসেই বলতে পারি: "ওটা নাটকই নয়—এই জন্যই এ নাটক অবলম্বন ক'রে অভিনয়ের উৎকর্ষ দেখানো কঠিন—তৎসত্ত্বেও শিশিরবাবু নিজের ক্ষমতার জোরে এ নাটককেও চালিয়ে দিতে পেরেছেন।"

"আলমগীরে"র নাট্যাভিনয় হচ্ছে শিশিরকুমারের ব্যক্তিগত প্রতিভার অনন্য নিদর্শন। তাঁর পরেও একাধিক খ্যাতিমান অভিনেতা এই ভূমিকার প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু কেউ চলনসইয়ের কোঠার উপরে উঠতে পারেন নি এবং কেউ বা করেছেন কেবল নকলিয়ার কর্তব্যপালন।

ম্যাডান থিয়েটারে শিশিরকুমার বোধ করি পুরো এক বৎসরও অভিনয় করেন নি। কিন্তু তারই মধ্যে দুখানি পুরাতন নাটককে নূতন ভাবে সজীব ক'রে তিনি কেবল আংশিক ভাবে প্রয়োগ-পটুতার নিদর্শন দিলেন না, সেই সঙ্গে দেখালেন তাঁর প্রতিভার বৈচিত্র্য। নাটক দুখানি হচ্ছে "চন্দ্রগুপ্ত" ও "রঘুবীর"।

দানীবাবু "চন্দ্রগুপ্তে"র চাণক্য ভূমিকাটি থিয়েটারী ভাষায় একেবারে 'আলিয়ে' দিয়েছিলেন। তিনি যতদিন বর্তমান ছিলেন ততদিন পুরানো দলের আর কোন অভিনেতাই ঐ ভূমিকাটিকে স্পর্শ করতে সাহসী হন নি। কিন্তু নূতন দলের তরুণ নাট্যশিল্পী শিশিরকুমার নির্ভয়ে সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে প্রকাশ করলেন নব নব সৌন্দর্যের ঐশ্বর্য।

"ক্লাসিক থিয়েটারে'র গতি যখন নিম্নমুখী, সেই সময়ে মিনার্ভা থিয়েটারের ভার নিয়ে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯০৩ সালে "রঘুবীর" খুলেও তাকে বাঁচাতে পারেন নি। শিশিরকুমার সেই অচল পালাটি দুই-এক রাত্রির জন্যে ম্যাডান থিয়েটারে খুলে তার অপরূপ রূপ দেখিয়ে সকলকে অবাক ক'রে দিলেন। প্রেক্ষকরা সেই সঙ্গে আরো বুঝলে, কেবল গল্পে নয়, পল্পেও তাঁর কতখানি অধিকার!

কিন্তু তারপর ম্যাডানরা তাঁকে আর বন্দী ক'রে রাখতে পারলে না। শিশিরকুমার কর্ম ত্যাগ করতে উদ্যত হলেন। স্বর্ণডিম প্রসবকারী হংস উড়ে পালাতে চায় দেখে ম্যাডানরা ব্যস্ত হয়ে তাঁকে হাজার টাকারও বেশী মাহিনা দিতে চাইলেন, কিন্তু তিনি নিজের সংকল্পে অটল। কারণ তিনি জানতেন যে, পরের অধীন হয়ে নাট্যাভিনয়ে উচ্চশ্রেণীর কোন-কিছু সৃষ্টি করা সম্ভবপর নয়,—সেজন্যে চাই নাট্যাচার্যের স্বাধীন মস্তিষ্কচালনা। শিশিরকুমার অর্থলোভে ও ব্যক্তিগত খ্যাতির সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগ দেন নি—তিনি চেয়েছিলেন সাধারণ রঙ্গালয়ে নবযুগ প্রবর্তন করতে। ম্যাডানদের অধীনে চাকরি ক'রে তা হবার নয়, তাই তিনি ম্যাডানদের সম্পর্ক ত্যাগ করলেন। এই স্বল্পকালের মধ্যে তিনি যা অর্জন ক'রে গেলেন, তাহচ্ছে তাঁর ব্যক্তিগত গৌরব, বাংলা রঙ্গালয়ের সর্বাঙ্গসাধক উন্নতির সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ ছিল না।

তবে এই অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সকলকে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন যে, শতাব্দীগতিক পুরাতনের আয়ু ফুরিয়েছে—এখন তাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়ে পরাতে হবে নূতনের কপালে বিজয়তিলক।

গ্রীক দার্শনিক ডায়োজিনিসের মৃত্যুকাল আসন্ন। একটি শয্যায় শুয়ে আছেন তিনি। শিয়রে অপেক্ষমান চিকিৎসক। একটু ঘুমিয়ে পড়েছেন তিনি। একটা যেন গভীর নিদ্রা আসছে।

তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে উৎসুক চিকিৎসক প্রশ্ন করেন, কি কষ্ট হচ্ছে, কি রকম বোধ করছেন?

দার্শনিক ডায়োজিনিস বলেন তাঁর উপলব্ধির কথা, কোন কষ্ট নেই, কেবল দুই সহচরের মধ্যে একজন এগিয়ে আসছে, নিদ্রা আসছে মৃত্যুর পূর্ব লক্ষণ বহন করে।

মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত দার্শনিকের মানসিক শক্তি অটুট থেকে যায়।

ইতিহাস

শক্তিপদ রাজগুরু

—টুকচেন চা খেবা অ ভান মাশায়?

খনখনে গলা লোকটার। একরাশে বেশ ভরাট আর লম্বেজই ছিল বলে মনে হয়। উঁচু বাঁধ ঠেলে উঠে এসে জীর্ণ একটা ছাতিমগাছের নীচে টাটির বেড়া দেওয়া ওই চায়ের দোকানটার সামনে এসে দাঁড়াল। টাটি বেড়া ঘেরা একটু ঠাঁই কোনমতে বাঁধের গায়ে ওই গাছটা হেলান দিয়ে খুপড়িটা তুলছে, বাঁজকাটা একটু চালুর গায়ে হাতকয়েক সমতল জায়গায় সেনমশায়ের চা পান বিড়ি সিগ্রেট জলখাবার দোকান।

অভা সর্দারের মতই ওই দোকানের অস্তিত্বটুকু কোনমতে মাটি কামড়ে তুলছে ব্যারেজের পাশে রাস্তার ধারে। অভা আর সেনমশায় যেন অতীত যুগের মানুষ—এখানের পরিবেশে ওই যেন বলসানো লোহার গার্ডার, দূরে চিমনী আর ধোঁয়াতরা এই বাস্তিকযুগের বাইরে পড়ে রয়েছে ওরা।

খানিকটা উঁচু বাঁধ ঠেলে উপরে উঠে আসতে হাঁপিয়ে উঠেছে অভা। বেঞ্চে বসে যেন ঘম নিচ্ছে। দু'চোখের কোলে পিচুটি; হাতের লাঠিটাই শুধু শক্ত, অতীতের চিহ্ন হিসাবে লাঠিটাই শুধু টিকে আছে অভা সর্দারের হাতে। ইয়া বুকের খাঁচা গুটিয়ে দুমড়ে একটুখানি হয়ে গেছে। হাতের শিরগুলো ঠেলে উঠেছে, জিলজিলে একটু মাংস দিয়ে ঢাকা রয়েছে মাত্র।

অভা ঘোলাটে চোখ মেলে চেয়ে থাকে সামনের দিকে।

ব্যারেজের সামনেই জল আটকানো, জল আর জল। শ্রাবণের চলনামা নদী বাঁধন পড়ে শান্ত স্থির, শুধু ফুলে উঠেছে কানায় কানায়। গেট দিয়ে দুর্বার বেগে জল আছড়ে পড়ছে নদীতে—বাতাসে তারই গর্জনধ্বনি। এদিকে মস্ত খালও বয়ে চলেছে জলস্রোত। যে দৈত্যটা জলে বন্যায় ঘর ভাঙতো, মানুষের ঘরবসত উৎখাত করতো—সোনা ফসলের ক্ষেত চেকে দিত বালির তলে, সেই দৈত্যটাকে কে যেন আষ্টে-পিষ্টে বেঁধে ফেলেছে। পড়ে পড়ে অসহায় যন্ত্রনায় আর গর্জনে ঘামাচ্ছে মাত্র।

আরও ওপরে শালবনের সবুজ হলুদ রং ছুঁয়ে গড়ে উঠেছে মস্ত বাড়ী, বিরাট যন্ত্রপাতি, মাথা তুলেছে ছোট বড় একটার পর একটা চিমনী; নীল আকাশ তাদের ধোঁয়ায় ভরে উঠেছে। বাতাসে জলের উপরকার আকাশ দিয়ে ভাসতে ভাসতে চলেছে তারা ওপারের নীলছায়া মাখা পাহাড়গুলোর দিকে।

কেমন সেই জগৎ—তাদের গ্রাম বসত সেই মানুষগুলো সব হারিয়ে গেছে। নিঃশেষে হারিয়ে গেছে অভা সর্দারের এতদিনের জীবন-যৌবনের যত স্মৃতি।

আচাইদের মস্ত চকমিলান বাড়ী। টিকে আছে শুধু তাদের পদ্মফুল কোটা খিড়কির খানিকটা অংশ। অনেক নীচে যেখা যায় সেই খিড়কীর একটু জলে এখনও ফুটে রয়েছে দু'চারটে পদ্মফুল। ওরা যেন আগেকার সেই গ্রামের শান্ত জীবন—যৌবিদের বেলাশেষের হাসি আর টুকরো কথার শব্দের সন্ধান করে।

ওর ধারে আজ ভিড় জমায় ছুটির দিনে দুর্গাপুর—আসানসোল—বার্নপুর—ওই সব দিককার কত দিশী বিদেশী সাহেব মেমের দল গাড়ী নিয়ে আউটিংএ আসে। পিকনিক করে। একে ওকে দু'চারটে পয়সা দিয়ে মুল ছিঁড়ে নিয়ে যায়—রিয়েল লিলি।

সেনমশাই আর অভা সেই হারানো ভুবনপুরের মানুষ। বাকী অনেকেই কলে কারখানায় কাজ নিয়েছে। উৎখাত হয়ে গিয়ে অন্যত্র বাসা বেঁধেছে। কেউ কেউ কেরাণী হয়ে গেছে।

ওরাই রয়ে গেছে তবু।

—নে।

অভার হাতে একটা কলাই করা গেলাসে খানিকটা চা ঢেলে দেয় সেন মশাই।

অভা কোঁচড় থেকে কতকগুলো মুড়ি বের করে চিবুচ্ছে—বিয়োন চিমসে মুড়ি। বোধ হয় কাল কোথাও যোগাড় করেছিল। তাই চিবুচ্ছে আর চাএ চুমুক দিয়ে চলেছে।

গরম চা-এর গেলাসের কোন উত্তাপই ওর খড়াপড়া শক্ত হাতে লাগে না। লাঠি ধরে কড়া পড়ে গেছে—লাঠি আর সড়কি ধরা হাত।

রাতের অন্ধকারে অভা সর্দারের চর অনুচরদের হুঙ্কারে কেঁপে উঠতো এ অঞ্চলের গৃহস্থ। কত পথচারী লুটিয়ে পড়ত রক্তাক্ত দেহে ওর লাঠির আঘাতে। তারপর ওদের শেষ সমাধি রচিত হত গহন মানাবনের পলির অতলে। আকাশে উঠত শকুনি, শিয়ালের দল রাতের অন্ধকারে ঘুরে বেড়াতো।

বনের মধ্যে রেললাইন—রাতের অন্ধকারে চলন্ত মালগাড়ী থামিয়ে লুঠ করত গাঁট গাঁট কাপড় মালপত্র। কোন রাতে বা দূর দূরান্তরের কোন গৃহস্থের বাড়ীতেও হানা দিত। মশালের লালাভ আলোয় কালো রংমোখা কতকগুলো মুখ, ওদের গর্জন।

বিজয়ীর মত লুঠ করে আনত অভা সোনা টাকাকড়ি। কোনদিন বা হাতে লেগে থাকতো উষ্ণ রক্ত; নদীর জলে এসে ধুতো।

সোনা দানা গহনা সবই দেখেছে মাত্র।

অন্ধকারে গিয়ে ঢুকতো অন্যত্র। দয়া করে যা দিত, তাই নিয়ে অভা বাবুদের ভাবে থাকতো। তবু এ যেন একটা দুর্বার পৈশাচিক উল্লাস।

আর জীবিকার জন্য বছরের চার পাঁচ মাস ধামোদরে ভরা বানে খেয়া নৌকা বাইতো বাবুদের ঘাটে।

সেদিনগুলো আজও ভোলেনি অভা। সে তখন তর যোয়ান।

ভুমনীকে সেবার সঙ্গী করে আনে। কালো ঘাটো গড়ন, ভরা ধামোদরের মতই ওর শরীরে একটা বানমাতা পূর্ণতার বিবশ চল। তবু ভুমনী তাকে বাঁধতে পারেনি, রাতবিরেতে পালাত অভা।

ফিরেতো ভোর রাতেই। গামছা কাপড়ে রক্তের দাগ।

ভুমনী ক্রমশঃ বুঝতে পারে ব্যাপারটা। কাঁদে। একদিন কথাটা না বলে পারে না।

—চল ইখান থেকে চলে যাই।

অভা সর্দার একটু অবাক হয়—কুথাকে যাবি, এঁ্যা?

এ রাজ্যের মুকুটহীন সম্রাট অভা সর্দার। চৌধুরী বাবুদের ডানহাত। সারা চাকলার লোক তাকে জানে, চেনে। ভয়ে হোক, যে কোন কারণেই হোক বাঘা বোয়াল তাকে দেখে।

এ বাড়ির সে পাবে কোথায়। ঝুমনী বলে ওঠে।

—চিনকুটিতে, না হয় বারণপুরের কারখানায় কাজকাম করবি।

—মজুরী? ছ্যাৎ?

অভা দাওয়ায় পাশ ফিরে শোয়। অমন উঞ্ছবৃত্তির থেকে মরা ঢের ভালো।

আজ!

অভার সেই কথাগুলো মনে পড়ে। বাবুদের আমবাগানের চিহ্নও শেষ হয়ে গেল।

সব মুছে গেছে অতীতের দিনগুলো। ঝুমনী নেই।

মরে গেছে সে কয়েক বছর আগে ওলাওঠায়।

অভা সর্দারকে সে হাত বাড়িয়ে ভিক্ষা করতে দেখে যায়নি। দেখে যায়নি তার মেয়ে টগরকে কোন বিদ্যাতের সঙ্গে ঘর ছেড়ে উধাও হয়ে যেতে।

টগরকেও বাধা দিতে পারেনি অভা সর্দার।

রোদ বাড়ছে। সকালের সোনারোদ অল্প রংএ ভরে ওঠে। নদীর ওদিকে ওপারের পরিত্যক্ত মাঠটা আজ নির্জনে পড়ে আছে। দু'একটা চালা ঘরে মুড়ি, সিঙ্গির বাড়ু আর টানা মিঠাইএর দোকান ছিল কদম গাছতলায় নৌকা যাত্রীদের জন্য।

আজ ও পথ পরিত্যক্ত। সোজা ব্যারেজের উপর দিয়ে ছুটে চলে বড় বড় ঝকঝকে বাস ট্যাক্সি সাইকেল রিক্সা—হেঁটে যায় দোকজন। পুরানো সেই দিনের পথটায় ওদের পায়ের দাগ মুছে গেছে আজ।

ব্যারেজের কাজ সবে সুরু হচ্ছে তখন।

নোটিশ হয়ে গেছে গ্রামে। ক্ষতিপূরণ নিয়ে সরে যাও। কলকত্তা ট্রাকটর এসে গেছে। তাদের চাষ সুরু হবে। এসেছে বহু মানুষ, আর কাঁচা পয়সা। কাজ করলেই নগদ দাম।

গ্রামের অনেকেই চলে যাচ্ছে। চাষ আবাদ করতে পারেনা জমিতে। ক্যানেল কাটা হবে। কাজ নেই, সুতরা' ওদের ওখানেই কাজ নিয়েছে অনেক ছেলে-মেয়ে কামিনও ওই ঠিকাদারদের ওখানে।

অভা তখনও নৌকা বয়।

আদিম আরণ্যক পরিবেশ, ওই দুর্বার নদী আর শালবন। সেখানে অভাবেরই রাজত্ব। অনেকেই খেয়াঘাটে এই ছাউনিতলাতে বসেই বলাবলি করে সেদিন পড়ন্ত বেলায় মেঘলয়া নির্জন দামোদরের তীরে বসে।

—বাবা দামোদরকে বাঁধবেক উরো?

কে জবাব দেয়—বাঁধছে সো। দু তিন জায়গায় বেঁধে বেঁধে আনছে। দেখছ না ইবো—খাদান বহর। পাতালসই করে বিলেতি মাটির খাদা পড়বেক।

অভা শোনে আর হাসে।

মুক্ত গৈরিকজলধারা উদ্দাম স্রোতে বয়ে চলেছে। দু'কানা ভর্তি বাঁধ। বাতাসে দামোদরের ক্রুদ্ধ গর্জন জাগি। কলকল শব্দে ঘূর্ণি ওঠে—যন্ত্র দানবের নেচে চলেছে সেকেলে জটাধারী কোন রুদ্র ভৈরব।

বৃষ্টির মেঘনামা আকাশ আর আদিম রহস্যঢাকা শালবনের পাশ দিয়ে নৌকাটাকে উজানে টেনে নিয়ে চলেছে তারা ; তারপর ছাড়বে।

দুর্বার সেই বেগ—স্রোতের টানে নৌকা মাঝ নদীতে ভেসে চলেছে। শক্ত হাতে হাল মারছে অভা। প্রশস্ত বুক কঠিন মাংসপেশীগুলো ফুলে উঠেছে, বৃষ্টিতে ভিজছে। কালো পুঞ্জমেঘ পাংশু ঘন আবরণে ঢেকে ফেলেছে আকাশ, হুহু বাতাস ভরে ওঠে বলগল অট্টহাসি তোলা ঘূর্ণির শব্দে।

—হুঁসিয়ার।

নদীর স্রোতে কোথায় গড়ে উঠছে ভাসা চর। নৌকা বেকায়দায় ওতে ঠোক্কর খেলেই বিপদ। ছিটকে পড়বে যাত্রীরা, নাহয় নৌকার তক্তার জোড় খুলে যেতে পারে। যায় ও।

বাবা দামোদরের বলি চাই কি বছর।

বলি সে নেবেই। সারা নদী যেন বিশাল ক্ষুধিত একটা আকাশজোড়া মুখ মেলে হাঁ করে রয়েছে।

তারই সঙ্গে পাল্লা কষে বেঁচে ছিল অভা সর্দার—চিরন্তন ওই মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়ে। নৌকাটা পাশ কাটিয়ে বের হয়ে গেল ; ওই ওপারের ছায়াঘন কদমগাছটা, মৃত্তিকা যেন এগিয়ে আসছে একটি শান্ত আশ্বাসের মত।

চরা প্রাণ ফিরে পায়। বন্দনা করে—জোহাই বাবা দামোদরচন্দ্র।

সকালে পাড়ি ধরেছিল খেয়া ঘাটে ওপারে দুপুরের পর।

জীবনমরণ খেয়া।

অভা তাই প্রথমে বিশ্বাস করেনি যে কোনকালে বাঁধা পড়বে ওই দামোদরচন্দ্র।

গড়ে উঠছে ব্যারেজ, একটার পর একটা বিরাট পাথরের থাম—তেমনি মজবুত লোহার দরজা বসছে।

এপারে গ্রামের দিকে এগিয়ে আসছে খালটা। দিনরাত যন্ত্রপাতি, লোকজনের চীৎকারে সেই অন্ধকার আদিম গ্রাম বন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বিজলীবাতি জ্বলছে চারিদিকে।

টগর সবে যৌবনে পা দিয়েছে। মানা করেছিল অভা কিন্তু কথা শোনেনি টগর।

কাজ নিয়েছে কোন এক ঠিকাদারের কাছে। অভা সারাদিন পাথরঘাটায় পড়ে থাকে। নাহয় মালপত্র তোলে নৌকায়।

হঠাৎ সেদিন কথাটা ওইখানেই শোনে। টগরকে নিয়ে কারা কিসব কথা বলছে।

একটু দাঁড়াল।

ওরা চেনে না অভা সর্দারকে। নবাগত কোন জীবনেরই কেউ হবে। টাকা ছড়িয়ে ফূর্তি কিনতে এসেছে এ মাটিতে।

অনেক মেয়েকেই দেখেছে অভা নদীর ধারে মানাধনে সেঁয়াকুল ঝোপের এদিক ওদিকে ঘুরতে, সঙ্গে অনেক নোতুন লোক। আজ ব্যাপারটা বুঝতে পারে।

—কি বোল গো! অ খুড়ো! বক্তাগুলোন ফুলো?

অভা আজ ভোমের কথায় যেন এ জগতে ফিরে আসে। আবার কাজে মন দেবার চেষ্টা করে।

কেমন বদলে গেছে দিন।

আজ গ্রাম ছেড়ে অনেকেই চলে গেছে। তার খুঁটি ওই চৌধুরীবাবুরাও কৌত হয়ে যাচ্ছে। জমিদারী চলে গেছে। চলে গেছে তাদের বাগান বিরাট বাড়ী। চোখের সামনে দেখেছে অভা সেই বাড়ীর হারানো দেওয়াল কড়ি-বড়গা কেমন ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়েছে বাদলের আগুনে।

বনস্পতি লুটিয়ে পড়েছে ঝড়ে—উৎখাত হয়েছে যাযাবর পাখীর দল। নইলে অভাসর্দার আজ ওই লোকগুলোকে ঘেন্নিয়ে দিত তার পাতটাদির বার। তবু বাড়ীতে শাসন না করে পারেনা টগরকে।

কেমন সাজগোজ—মোকুন শাড়ী পরেছে টগর। এসব কোথেকে আসে তা এইবার বুঝেছে অভা সর্দার। গর্জন করে ওঠে।

—পাড়ায় ঐ শালোরা কেনে ঘুর ঘুর করে, এ্যাঁ?

—আমি কি জানি? শুধোও গা কেনে উদিকে। ফস্ করে টগর জবাব দেয়।

অভার ম্লান চোখ দুটোও ধপ্ করে জলে ওঠে।

—কি বল্লি?

টগর আজ দুটো পয়সা, নিশ্চিত দুবেলা খাবার সরবার স্বপ্ন দেখেছে। স্বাদ পেয়েছে সাকীদলের। ডোমের রক্ত রক্তে তাই সাড়া জেগেছে।

—কারা উরো?

—জানিনা।

প্রচণ্ড একটা লাথির চোটে ছিটকে পড়ে টগর কাঁকুরে ডাঙায়। থুবড়ে পড়েছে।

উঠে দাঁড়াল। বাবার মুখের উপরই আজ জবাব দেয় সে।

—প্যাটে ভাত, পরনে ত্যানা দিতে পারোনা—আবার মারধা?

লোকের মুখে চুন পড়েছে। কথাটা কঠিন সত্য। অভা থামল। মনের মধ্যে একটা ঝড় ওঠে, কথাটা, ওই নোংরা কথাগুলো তাহলে সবই সত্যি। তবু গর্জায় অভা।

—না জোটে আবগেটা খেয়ে থাকবি। তবু কের যদি কুনদিন উসব নষ্টামির কথা শুনি পাতটাদীর এককোণে ছাপ দু'আধখান করে ফেলাবো।

তবু আটকাতে পারেনি টগরকে।

তার কদিন পরই উধাও হয়ে গেছে টগর। নিষ্ফল গর্জন করে উন্মাদ একটি মানুষ। ঠিকাদারের লোক তার মেয়েকে নিয়ে পালিয়েছে—কিরিয়ে দিক তার মেয়েকে!

উন্মাদ গর্জনে আক্রমণ করতে চেয়েছিল অভা সর্দার। দেখিয়ে দিতে চায় আজও সে বেঁচে আছে। কিন্তু নিষ্ফল সেই প্রচেষ্টা। ফৌজদারীর মামলার আসামী হয়ে জেলহাজতে পচে এল ছয়টি মাস। জামিনদারও মেলেনি। আগে দেখেছে খুনী আসামী হয়েও জামিন পেয়েছে। সেই মামলা তদ্বির করেছে গাঁয়ের বাবুরা, সব ফুসকাস হয়ে গেছে।

আর আজ! বিনাদোষে পড়ে পচছে জেলহাজতে এ এলাকার ত্রাস ওই অভা সর্দার।

বের হয়ে এল ছয়মাস পর অভা ডোম—নিরাশ্রয়, নিবান্ধব একটি ঘাগী আসামী। বন্ধু নেই, আত্মীয়স্বজন নেই, আশ্রয় নেই।

ছয়মাসেই ভুবনপুর আমূল বদলে গেছে। জেগে পড়েছে চৌধুরী প্রাসাদ—বাগান বাড়ী—তাদের পাড়ার বুক চিরে চলে গেছে গভীর খালটা, দুপাশে পাহাড় সমান মাটি স্তূপ করা—তারই অতলে ডুবে গেছে তার ছোট ঘর। সব হারিয়ে গেছে। টগরও আর ফেরেনি।

তখনও টিম টিম করে খেয়াঘাটে নৌকা চলছে।

আর দু একটী বছর চলবে বড় জোর। তারপরই ব্রিজ-এর সব চালু হয়ে যাবে।

আশু বলে ওঠে লগি ঠেলতে ঠেলতে।

তাই হোক খুড়ো। মামোদরের ত্যাজ বরুক। দিদির বরং লোহাকলে কাজই করবো। একায় করলে নগদ হস্তা করকরে টাকা। ই'পারা নৌকার যাত্রীদের কাছে দাওগো দাওগো করে হাত পাতার ঝকমারি থেকে বাঁচা যায়। আর এই নদী পারাপার—দিনরাত যেন বাঁটো বাঁৎ বেরে হাঁ হাঁ করছে, বাগে পেলেই কপাৎ করে গিলে ফেলবেক। ই পারা সাফ হলে বাঁচি।

অভা কথা বলে না। ওদের বয়স আছে—নোতুন দিনের দিকে চেয়ে থাকে তাই।

তার!

তার দিন ফুরিয়ে আসছে। শরীরে সেই তাগদও নেই।

—সেদ দি গো? বৌ পাক দিছে না!

আশু লাফ দিয়ে এগিয়ে আসে হালের দিকে, যাত্রীরাও ঘাবড়ে গেছে।

অভা প্রাণপণ চেষ্টায় হালের মুঠি ধরে টানছে—তবু নড়ে না; নৌকা যেন বাবচাল হয়ে যাবে ঘূর্ণির মধ্যে। আশু এসে লাফ দিয়ে হালটা ধরে টানছে, মোচড় দিতে থাকে; নড়ছে।

ধীরে ধীরে বোকাই নৌকাটা ঘূর্ণি থেকে বের হয়ে এগিয়ে যায় পারমুখো।

অভা সর্দার অপ্রস্তুত হয়ে চেয়ে থাকে। যাত্রীদের কেউ কেউ গর্জন করছে এতক্ষণে।

—ডুবিয়ে মারবি নাকি? এঁ্যা?

অভা কথার জবাব দেয় না। বেশ বুঝতে পারে সে জোর আর নেই।

বুঝবার ক্ষমতাও ফুরিয়ে আসছে।

—সেনমশায় গো এইটু জল দেবা, খাবার জল।

সেনমশায় চা তৈরী করছিল। অভার ডাকে বিরক্ত হয়। মুড়িওলো চিবিয়েছে এতক্ষণ ধরে বসে বসে। সারাদিনের বোঝহয় ওই তার খাবার। কেমন মায়াও হয় লোকটার উপর। একেবারে আড়াতে পারে না।

—নে।

একঘটি জল এগিয়ে দেয়। বলে ওঠে সেনমশায়।

—ইষ্টিশানে যা অভা, তবু দুচার পয়সা ভিক্ষেসিক্ষে মিলবে। নিজের মোটঘাটও বইতে পারবি।

অভা ওর দিকে মুখ তুলে চাইল।

কেমন অসহায় নির্মম সে চাহনি। উদাসীন বিষয়ী পুরুষ ওদের কথা একেবারে ভুলে গেছে।

ইষ্টিশানে যেতে মন চায় না। সেই আগেকার ইষ্টিশানও বদলে গেছে।

বিরাট শেড উঠেছে, কত লোক। কাউকে চেনেনা অভা। বাইরে বাস ষ্টাণ্ড—টাক্সি,

রিক্সার ভিড়। পানের দোকানে রেডিও বাজে। পথের দুধারে বসে থাকে অনকয়েক ভিখেরী, কুষ্ঠরোগী অন্ধ মানুষ। প্রাণপণে ওরা কাঁদে, বাঁধা চীৎকার করে একটা পয়সার জন্যে। ওদের পাশে বসতে পারবে না অভা সর্দার! কক্ষণো না।

কথাটা ভাল লাগে না।

পায়ে পায়ে উঠে এল অভা। এগিয়ে যায় ব্যারেজের ধারে বাগানের দিকে।

ছুটির দিন। রকমারী গাড়ীর ভিড় জমেছে। দর্শকরা এগোচ্ছে। কেউ বালিহাড়িতে ঘুরছে, গান গাইছে। বাতাসে ওঠে গেট-এর ফাঁক দিয়ে আছড়ে পড়া জলরাশির প্রচণ্ড গর্জন। বন্দীজলধারা ওই সামান্য পথ দিয়ে দুর্বার বেগে মুক্তির পথ খুঁজছে। মাঝে মাঝে লাফিয়ে ওঠে মস্ত মাছ গুলো—ঝকমক করে তাদের দেহ আসমানে, আবার জলে ছিটকে পড়ে তারা।

অভা পার্ক করা গাড়ীগুলো ঘোরাঘোরা করে। কেউ চার ছ আনা দেয়। কেউবা ভিখেরীর মত পোষাকপরা লোকটাকে দেখে আগে থেকেই হটিয়ে দেয়।

—এ্যাই!

অভা ধমক খেয়ে গাড়ীর কাছ থেকে সরে যায়। ভদ্রলোক সঙ্গী বান্ধবীকে বলে—কে জানে চোর-ছাঁচড় কিনা।

অভা যেতে যেতে একবার থমকে দাঁড়ায়। কথাটা কানে আসে। ওরা জানেনা, একদিন অভা সর্দারের হাঁকে এখানের মাটি কাঁপতো, ওই মানাবনে এখনও বালিশলির নীচে পোঁতা রয়েছে কত পথচারীর হাড় দেহাবশেষ।

ওই নবাগতের দল সেদিন এ মাটিতে পা দেয়নি।

সেই দুর্দম দামোদরকে দেখেনি। দেখতে এসেছে খাঁচায় বন্দী বনের বাঘের মত বাঁধন পরা দামোদরকে।

অভা সর্দারকে তাই ওরা চেনে না।

হঠাৎ একটা কলরব ওঠে।

বালির ওপর পিকনিকের আসর বসেছে ঠাঁই ঠাঁই। তারা উৎকর্ণ হয়ে ছুটে আসে। ব্যারেজের উপর বাগানে বালিচরে ছুটেছে কৌতূহলী জনতা। ভিড় করেছে সাজগোজ করা মেয়ে পুরুষ। লোহা কারখানা, অন্যান্য কারখানার হাজারী দুহাজারী দেশী বিদেশী মনসবদারের দল।

ওরা দর্শকের মতই দেখছে ওই দৃশ্যটা।

ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসে অভা সর্দারও।

কে একজন দর্শক সাঁতার কাটতে নেমেছিল নিষেধ সত্ত্বেও তারপরই ঘটেছে এই কাণ্ড। বন্দী দামোদর যেন ক্ষেপে উঠেছে। মুক্ত জলধারা ব্যারেজের লোহার কপাটের ফাঁক দিয়ে নীচে নদীতে আছড়ে পড়ছে। সাঁতারু ভদ্রলোক ওই জলধারার একটা ঘূর্ণি স্রোতের বিরাট আবর্তে পড়ে স্রোতের টানে ওই কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে চলেছে। কেরবার পথ জানে না।

চোখের সামনে ফুটে উঠেছে দুস্থার কালো ছায়া, প্রাণভয়ে চীৎকার করে।

—বাঁচাও।

কিন্তু ওই দর্শকদের মধ্যে কেউ নামতে সাহস করে না। কেউ হুকুম করে—গেট বন্ধ করো। নানাজন হুকুম দিয়েই কর্তব্য সারে।

কিন্তু গেট বন্ধ করাও সমূহ বিপদ। শ্রাবণের ভরা নদী। এমনিতেই নদীর জল বিপদ চিহ্ন ছাড়িয়ে রয়েছে। তারপর উপরে মাইথন প্যানচেত ডামের জল বন্ধ না করে এদিকে গেট আটকানো যাবে না। তারাও নির্দেশের জন্য ফোন করছে।

নিস্তব্ধ বাতাসে জাগে নদীর ক্রুদ্ধ জলধারার গর্জন। মেঘজমা আকাশে ওঠে মানুষের হু হু হাওয়ার কলরোল। আকাশ বাতাস ভরে উঠেছে আদিম বিভীষিকায়।

ভীত স্তব্ধ মানুষ। ওরা এই বিশাল ধ্বংস আর নিষ্ঠুর মৃত্যুর মুখোমুখি বিচিত্র পরিবেশে দাঁড়িয়ে গেছে।

শুধু একটা করুণ আর্তনাদ উঠেছে ওই জল কল্লোল ছাপিয়ে।

এই পরিবেশ চেনে একটি মাত্র মানুষ। দামোদরের এই সংহার মূর্তি, প্রকৃতির ভীষণা নিষ্ঠুর রূপ সে প্রত্যক্ষ করেছে। তাকে জয় করে তার মাঝে বাঁচবার চেষ্টা করেছে—বেঁচেছে দীর্ঘদিন! বহুকাল!!

অভা সর্দার সেই মুহূর্তটি ফিরে পেয়েছে। ওর জীর্ণ শিরায় প্রবাহিত হয় আগেকার সেই চঞ্চল রক্তস্রোত, ওই কলকল্লোল আর হু হু বাতাসে ঢেউ ওঠা নদী বহুবার সে পাড়ি দিয়েছে।

একটা শব্দে সকলেই অবাক হয়। কে যেন লাফ দিয়ে পড়লো ওই জলে, মাছের মত সাঁতার দিয়ে এগিয়ে যায়।

দামোদরের স্রোতের স্পর্শ লেগেছে অভার গায়ে। বালিভরা জল চোখে মুখে একটা তৃপ্তির, পরিচিতির আভাস আনে। প্রচণ্ড এক ধাক্কায় ঘূর্ণির বার থেকে ভাসমান লোকটাকে টেনে সরিয়ে দেয়, ছিটকে বের হয়ে পড়ে লোকটা সেই প্রবল স্রোতের সীমার বাইরে থিতোন জলে। একটু সাঁতরে গিয়ে সামনে জলধারা ওয়াটার গেটটা ধরে হাঁপাতে থাকে। বাঁচবার আশ্রয় পেয়েছে সে ওই অতলেও।

অভা বুঝতে পারে কাপড়খানা তাড়াতাড়ি আলগা ছিল, তারই খানিকটা অংশ তার দু'পায়ে জড়িয়ে গেছে। ছাড়াবার সামর্থ নেই। বিরাট স্রোতের ঘূর্ণিটা তাকেই টেনে নিয়ে চলেছে। হাত দুটো ভারি হয়ে আসছে, নিঃশেষিত শক্তির সমস্তটুকু দিয়ে সে ওকে বাঁচিয়েছে সত্যি, কিন্তু নিজেকে বাঁচাবার মত কোন সামর্থই আর তার অবশেষ নেই।

তলিয়ে যাচ্ছে—সরে যাচ্ছে—এগিয়ে যাচ্ছে স্রোতের টানে ওই আছড়ে পড়া জলের দিকে, কেমন প্রচণ্ড একটা কলকল্লোল কানে আসে, বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ। আকাশে আকাশে জমছে কালো মেঘের ছায়া। আদিম বিভীষিকা ভরা দামোদরের মাঝে ভেসে চলেছে একটি অতীতের হারানো মানুষ—অভা সর্দার।

আলো নেই, বুকটা ফেটে যাবে প্রচণ্ড চাপে। জীর্ণ হাত দুটো কি একটা আশ্রয় খোঁজে কেমন নীল আঁধার আর শান্ত স্তব্ধ অন্তহীন কোন রাজ্যে।

ওরা গেট বন্ধ করে ডুবুরি নামিয়ে তুলেছিল একটা প্রাণহীন দেহ।

জীর্ণ দু'হাতে অভা সর্দার দামোদরের অতলে হারানো মাটি দুমুঠো ধরবার চেষ্টা করেছিল শেষবারের মত।

কৌতূহলী হাজারো দর্শকরা বড় একটা কেউ অভা সর্দারকে জানে না—চেনে না।

জানতো না ওরা অতীতের কালীপুর—ভূষনপুরের হারানো ইতিহাস।

পুরাতন পাতা

সেকালের কলিকাতা

"তৎকালীন কলিকাতা সহরের এবং পানীয় জলের দুরবস্থা সম্বন্ধে জ্যোতিবাবুর স্মরণ আছে যে, তখন কলিকাতায় খোলা নর্দ্দমা ছিল। চারিদিকেই দুর্গন্ধ। তখন সহরের যত ময়লা সব গঙ্গায় ফেলা হইত—গঙ্গা জলে সর্ব্বদাই ময়লা ভাসিত, কিন্তু গঙ্গাস্নানের সময় সেই সব ময়লা বা তজ্জনিত দুর্গন্ধসত্ত্বেও আমাদের চিরদিনের সংস্কারবশত মনে কোনই দ্বিধা হইত না। অভ্যাস ও সংস্কারের এমনি মাহাত্ম্য! সন্ধ্যার প্রারম্ভেই মশকমণ্ডলী মাথার উপর বোঁ বোঁ শব্দে মণ্ডলাকারে নৃত্যসহকারে সঙ্গীত জুড়িয়া দিত। সে মধুর সঙ্গীত এখন আর বড় শোনা যায় না। তখন বেচারারা নিশ্চিন্ত ছিল—তাহাদের উপর লক্ষ্য করিয়া তখনও কামান পাতা হয় নাই।

তখন কলের জলও ছিল না। লালদীঘী হইতে পানীয় জল আসিত। মাঘমাসে গঙ্গা হইতে জল আনাইয়া বড় বড় জালা ভরিয়া রাখা হইত। তাহাতেই সম্বৎসর কাজ চলিয়া যাইত। তখন আমাদের বাড়ীর পুকুরের সঙ্গে গঙ্গার যোগ ছিল। আমার দাদা মহাশয় স্বর্গীয় দ্বারিকানাথ ঠাকুর (Prince Dwarikanath) গবর্ণমেণ্ট বা মুনিসিপ্যালিটির হস্তে এক থোকে কিছু টাকা দিয়া গঙ্গা হইতে আমাদের পুকুর পর্য্যন্ত একটি পাকা নহর কাটাইয়া লইয়াছিলেন। পুকুরের জল শুকাইলেই সেই নহর দিয়া গঙ্গার জল আনা হইত। ঝরণার মত ঝরঝর করিয়া সেই শুভ্র ফেনিল জলরাশি আমাদের পুকুরে আসিয়া পড়িত, তখন আমাদের বড়ই আনন্দ হইত। আমরা পাড়ে দাঁড়াইয়া মুগ্ধনেত্রে সেই জলধারা দেখিতাম। এখনকার মুনিসিপ্যালিটি কিছু ক্ষতিপূরণের টাকা ধরিয়া দিয়া আমাদের সে নহরটি এখন উঠাইয়া দিয়াছেন।

এই সময়ে জোড়াসাঁকোর বাটীতে একজন মালিনী ছিল, সে প্রতিদিন ফুল যোগাইত। অন্তঃপুরের জন্য ফুলের মালা এবং বাবুদের গুড়্‌গুড়ির মুখনলের জন্য ফুলের ভূষণ সে নিত্যই প্রস্তুত করিয়া দিয়া যাইত। "হুঁকা-বরদার" বলিয়া তামাক সাজিবার জন্য একজন বিশেষজ্ঞ ভৃত্য নিযুক্ত থাকিত। জ্যোতিবাবু বলেন "বাস্তবিক তাহার সাজা তামাকের ধূমোদ্গিত সুগন্ধে ঘর আমোদিত হইয়া উঠিত। আর এই গভীর বিষয়ে তাহার পারদর্শিতা সারাদিনই পরিলক্ষিত এবং প্রমাণিত হইত। তাহার সাজা তামাকে কখনও কাহাকেও "বসল না, আগুন হলো না, বা সুবিধে হল না" বলিতে শুনি নাই।

একজন "ভবিষ্যদ্বক্তা" তিলক-কাটা বৈষ্ণবী আসিতেন, তিনি অন্দরে মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইতেন। গিব্রেল্ নামে একজন ইহুদি ছিল, সে আতর গোলাপ প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য সরবরাহ করিত। সে এ বাড়ীর বড়ই অনুগত ছিল, সকল ক্রিয়াকর্ম্ম আমোদ উৎসবেই সে বাড়ীর লোকদের সঙ্গে যোগ দিত। তাহাকে দেখিলেই জ্যোতিবাবু আতর চাহিতেন, সে অমনি তুলায় লাগাইয়া একটু আতর ইঁহাকে দিত। "বাচ্চা" বলিয়া একজন কাবুলীওয়ালা জ্যোতিবাবুদের বাড়ীতে মেওয়া পেস্তা প্রভৃতি ফল সরবরাহ করিত; সে ছেলেদিগকে তার ঝুলির ভিতর ভরিয়া লইয়া যাইবে বলিয়া ভয় দেখাইত, এজন্য ছেলেরা তাহাকে খুব ভয় করিত। সদর দেউড়ীতে দারোয়ান ছিল,

এবং প্রত্যেক বাবুর বসিবার ঘরের (Drawing Room) দরজায় এক-একজন করিয়া হুক্কা থাকিত। কোনও অভ্যাগত অথবা অন্য কোনও ব্যক্তি আসিলে, সেই হুক্কা সিয়া বাবুকে আগে সংবাদ দিত। কোনও ভৃত্যকে ডাকিতে হইলেও সেই ডাকিয়া দিত। বাবুদের প্রত্যেক বৈঠকখানাতেই ফরাশ বিছানো। মাঝ-খানে মছলন্দ পাতা, তাকিয়া দেওয়া, গদিওয়ালা একটা উঁচু বসিবার আসন থাকিত তাহাতেই একেলা বাবু বসিতেন। নীচের ফরাশে অভ্যাগত ও মোসাহেবগণ বসিত। এরূপ বিছানা এখন বিবাহ-সভায় বরের জন্যই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাহাই হউক, এসবই ছিল সেকেলে নবাবী আমলের চাল ও কায়দা। উক্তরূপ মুসলমানী সভ্যতা এবং এখনকার ইংরাজী সভ্যতায় তখন যে এক সংঘাত চলিতেছিল, তাহার আলোচনা করিয়া জ্যোতিবাবু বলিলেন যে "তখন মোগলাই সভ্যতার সঙ্গে ইংরাজী সভ্যতার একটা ধুন্ধুমার চলিতেছিল। দেখা যাইতেছে, জয়ী হইয়াছে ইংরাজী সভ্যতা। বৈঠকখানা হইতে সে গদীপাতা বিছানা উঠিয়া গিয়াছে, তাহার স্থানে আসিয়াছে Drawing Room-এ কৌচ, কেদারা। তখনকার aristocracy-র ভাবটা গিয়া এখন (সাম্যের যুগে) democracy-র Spirit-টাই প্রবল হইয়াছে। এরূপ aristocracy যে শুধু আমাদের বাড়ীতেই নিবদ্ধ ছিল তাহা নহে,-তখনকার সমস্ত বড়লোকদের ঘরেই এই একই রকমের প্রথা ছিল। কিন্তু মহর্ষির কক্ষটি ছিল অত্যন্ত সাদাসিদে রকমে সজ্জিত। সেখানে আসনের উচ্চ নীচ কোন পার্থক্যই ছিল না। ব্রাহ্মসমাজ এবং মহর্ষির সদ্দৃষ্টান্তই আমাদের পরিবারের মধ্যে democracy-র ভাবটা আনিয়াছে। পূর্ব্বে এ ভাবটা ছিল না, আর ইহার যে ভবিষ্যৎ পরিণতি ঘটিবে তাহাই বা তখন কে জানিত।

দুইটি বিভিন্ন সভ্যতা বঙ্গদেশকে দুই দিক হইতে যখন এইরূপ সজোরে আঘাত করিতেছিল, আমরা ঠিক সেই সময়ে জন্মিয়া দুইরকমই দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। পূর্ব্বে পোষাক ছিল চোগা, চাপকান, কাবা, পাগড়ী - এখন হ্যাট, কোট, ওয়েষ্টকোট এবং পেণ্টুলন। ভাষায় পূর্ব্বে ফার্সী আরবী শব্দেরই আধিক্য ছিল, এখন হইয়াছে ইংরাজী। বড় মানুষী আহার তখন ছিল কালিয়া, পোলাও, কোর্ম্মা, কোপ্তা, কাবাব প্রভৃতি মোগলাই রকমের, এখন ইংরাজী মতে চপ কাট্‌লেট, পুডিং-রোষ্ট প্রভৃতি হইয়াছে। গৃহসজ্জাও তদ্রূপ, আগেই বলিয়াছি। কিন্তু বেশ দেখা যাইতেছে কোনটিই একাধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই। প্রত্যেক সভ্যতাই আমাদের হিন্দু সভ্যতার উপর এক-একটা পলি বা স্তর রাখিয়া গিয়াছে মাত্র। কাযেই হিন্দু মুসলমানী এবং ইংরাজী এই তিন সভ্যতার উপাদান একত্র হইয়াছে, আঘাত না করিয়া ভাব করিয়াছে, এবং যুদ্ধ না করিয়া সন্ধি করিয়াছে। এ সন্ধির ভাবটা এখন আমাদের সব কাযেই প্রকাশিত হইতেছে। যেমন হিন্দুমতে পূর্ব্বে নামের আগে "শ্রীযুক্ত" লেখা হইত; মুসলমান আমলে আসিলেন 'বাবু'। যখন কোন ব্যক্তিকে যথেষ্টরূপ সম্মান দেখাইতে হইত, তখন তাঁহাকে লেখা হইত "শ্রীযুক্ত বাবু" তারপর ইংরাজী মতে আসিল "Mr" এবং "Esquire"। শেষোক্ত কারণে Mr. বা Esqr-ই প্রযুক্ত হয়। হিন্দু "শ্রীযুক্ত" এবং মুসলমান "বাবু" বেশ একত্র মিলিয়া মিশিয়া ছিল। মিষ্টারও এমনি ভাবে মিশিয়া "শ্রীযুক্ত বাবু মিষ্টার অমুক চন্দ্র অমুক এক্কোয়ার" হইতে পারিত, কিন্তু ইংরাজেরা আসিয়াই "বাবুকে অত্যন্ত অনাদর অবহেলা ও ঘৃণা করিতে লাগিলেন, তাই "বাবু" অভিমানে এখন গা-ঢাকা দিয়াছেন; বাবু অন্তর্হিত হইলেও অন্যান্য বিষয়ে বেশ আদান্ত ঘটিয়াছে। এখন ভাল ভোজ দিতে গেলে

হিন্দুয়ানে শাল্ গুরুতানী, মোগলাই মতে কালিয়া পোলাও, এবং ইংরাজী মতে চপ্, কাট্‌লেট্-এর আয়োজন করিতে হয়। পোষাকেও তাই বুটি, চাদর, চাপকান এবং মোজা ক'লার (Collar)। বর্ত্তমান বাঙ্গলা ভাষারও তাই সংস্কৃত, বাংলা, ফার্সী, আরবী এবং ইংরাজী সকলেই বাঙ্গালীর ভাষায় কিছু না কিছু স্থান অধিকার করিয়া আছেন।

এই সময়ে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় জোতিবাবুদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। জ্যোতিবাবু মাইকেলের কথায় বলিলেন, "মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় তখন আমাদের বাড়ী প্রায়ই আসিতেন। আমার ভগিনীপতি শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ আলাপ পরিচয় ছিল। মধুসূদনকে আমার বেশ স্পষ্টই মনে পড়ে। রঙ ময়লা, চুলগুলি ইংরাজী ফ্যাসানে ছাঁটা বেশ কোঁকড়া কোঁকড়া, মাঝখানে সীঁথি। চোখ দুটী বড় বড় লোচন প্রতিভা দীপ্ত, চেহারা জোরালো, মুখশ্রী অপূর্ব্ব লাবণ্য মণ্ডিত। তাঁহার গলার আওয়াজ ছিল একটু ভাঙা ভাঙা। আমার মনে পড়ে, একদিন তিনি "মেঘনাদবধ" কাব্যের পাণ্ডুলিপি, তাঁহার সেই ভাঙ্গাগলায় পড়িয়া সারদাবাবুকে শুনাইতেছিলেন। তখনও "মেঘনাদবধ" কাব্য প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার কবিতা পাঠের কায়দাই ছিল এক স্বতন্ত্র। প্রত্যেক কথাটি স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া থামিয়া থামিয়া এবং পৃথক পৃথক করিয়া একটানে বলিয়া যাইতেন, যথা— "সমুখ—সমরে—পড়ি—বীর—চূড়া—মণি—বীর—বাহু—চলি—যবে গেলা—যম—পুরে—অকালে—কহ হে —দেবি—" ইত্যাদি। যেমন কবি বা যেমন কাব্য, তাঁহার কবিতার আবৃত্তি তেমন হইত না। সে আবৃত্তিতে কোন প্রকার ভাব প্রকাশের চেষ্টা থাকিত না। তিনি অতিশয় সহৃদয়, আমুদে এবং মজলিসি ব্যক্তি ছিলেন। গল্প করিয়া লোককে মুগ্ধ করিবারও তাঁহার শক্তি অপূর্ব্ব এবং অসাধারণ ছিল।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় কিরূপ সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন তাহার একটা ঘটনা বলিতেছি। বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত নামে আমাদের একজন পরিচিত ও অনুগত লোক ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার টাকে হাত বুলাইতেন এবং ব্যবসা সম্বন্ধীয় মৎলব আঁটিতেন। কিন্তু কোন ব্যবসায়েই তিনি লাভবান্ হইতে পারেন নাই। যে কার্য্যেই তিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহাতেই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। কিন্তু এ দিকে তিনি একজন প্রকৃত কাব্যরসিক এবং রসজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। মাইকেলের নিকট হইতে "ব্রজাঙ্গনা" কাব্যের পাণ্ডুলিপি লইয়া পড়িয়া অবধি, তিনি মাইকেলের অতিশয় অনুরক্ত হইয়া পড়েন; "ব্রজাঙ্গনা" পড়িয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। মাইকেল তাহাই জানিতে পারিয়া "ব্রজাঙ্গনা"-র সমস্ত স্বত্ব (Copy right) সেই পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই বৈকুণ্ঠবাবুকে দান করেন। বৈকুণ্ঠবাবু নিজব্যয়ে কাব্যখানি প্রথম প্রকাশ করেন।"

———

একজন আর কয়েকজন

অমিলকুমার ভট্টাচার্য

সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ আর মানুষ উপেন্দ্রনাথ একজাতের।

উপেন্দ্রনাথের রচনায় মাধুর্যই বেশি। অনুরাগ এবং ভালোবাসার সুরটাই প্রধান। উপন্যাসে তিনি বহু চরিত্র সৃষ্টি করেছেন—বহু ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে তাঁর উপন্যাস-শৈলী বিচিত্র জীবনের আস্বাদ দেয় সন্দেহ নেই। ভালোমানুষের সঙ্গে মন্দ মানুষ আছে। তিলিয়েন চরিত্রে নিষ্ঠুরতাকেও লক্ষ্য করা যায় বটে, কিন্তু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে সেই তিলিয়েন চরিত্রের নিষ্ঠুরতা, জটিলতার মধ্যে এমন আর একটি মানুষের পরিচিতি লাভ করা যায়—যার মধ্যে ভালোবাসার কল্পধারা।

উপেন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে এই যে উদার দৃষ্টিভঙ্গি—তার মূলে তাঁর মানবতাবোধ।

পরিবেশের প্রভাব, স্বার্থের দ্বন্দ্ব, সংস্কারগত মনোভাব—হয় তো সে মনকে মাধুর্যের বিকাশে বাধা দিয়েছে,—কিন্তু সে মন যে শুধু হিংসা, স্বার্থ আর কুশ্রীতাতেই সর্বক্ষণ আত্মমগ্ন হবে, উপেন্দ্রনাথের আদর্শ তার বিরোধী। কেন না, ব্যক্তিগতভাবে তিনি মাধুর্যের উপাসক। সকল মানুষকেই তিনি ভালোবাসা দিয়ে জয় করতে জানেন। তাই উপেন্দ্রনাথের তিলিয়েনও শেষ পর্যন্ত সামাজিক এবং ভালোবাসার পাত্র হয়ে ওঠে।

উপেন্দ্রনাথকে যাঁরা জানেন, তাঁরাই এ কথা স্বীকার করবেন,—তিনি অজাতশত্রু, নিরহঙ্কারী, ভদ্র, এবং সামাজিক।

ঘর এবং পর তাঁর কাছে সর্বত্রই সমান। এই সাম্য ভাবকে প্রতিষ্ঠা করতে কাউকে তিনি নীচের আসনে বসাতেন না। নিজেকেও শ্রেষ্ঠত্বের পর্যায়ে ফেলতেন না।

তাঁর কাছে কেউ 'আপনি' নন—তিনিও কারুর কাছে 'আপনি' হতে চাইতেন না। তুমিত্বের সম্বোধনে তিনি ছিলেন সবার আপনজন। সভা সমিতিতে গিয়ে তিনি ঘরের মতন ব্যবহার করতেন। সভাক্ষেত্র শুধু গুরুগম্ভীর বিষয়-বস্তু আলোচনা চক্র নয়; কিংবা প্রস্তাব গ্রহণের ফিরিস্তি ভরা নয়। সভাপতি উপেন্দ্রনাথের কাছে সভাক্ষেত্র বৈঠকের আসর, গানের মজলিস, আলাপ আলোচনা এবং সাহিত্যের সহিতার্থ বোধের মিলন মন্দির।

বড়দিনের তারিখ বঙ্গসাহিত্যের পত্রিকার একটি বিশেষ শুভক্ষণ। ডিসেম্বরের শেষে প্রতি বছর নিখিল ভারত সাহিত্য সম্মেলন থেকে সুরু করে ভারতবর্ষের নানা স্থানে বাংলা সাহিত্যের নানা সম্মেলন এবং অধিবেশন সুরু হয়। বাংলা দেশে আসানসোলে এই সময় তিন চারদিনের অনুষ্ঠান রবীন্দ্র-শরদীর নামও এদিক থেকে যথেষ্ট। অগ্রজ সাহিত্যিক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এই সাহিত্য অনুষ্ঠানের ব্যাপারী। প্রতি বছরেই তিনি রবীন্দ্র-শরদীর শীতকালীন অধিবেশনে কলিকাতা থেকে অনেক নাম করা সাহিত্যিকদের নিয়ে যান।

রবীন্দ্র-শরদী উপেন্দ্রনাথকে ডাকলেন। আটাত্তর বছরের বর্ষীয়ান যে সাহিত্যিক সারা জীবন উৎসর্গ করেছেন সাহিত্যের সেবায় এবার তাঁকে তাঁদের সম্মেলনের পুরোভাগে রেখে সর্বপ্রথম তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে—তারপর তিনদিন ধরে সাহিত্যের নানা শাখা বিশাখার আলোচনা সমালোচনা এবং সাহিত্য সম্পর্কে নানা প্রস্তাব গ্রহণ কার্যসূচীর অন্তর্গত।

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় যে প্রতিষ্ঠানের মধ্যমণি উপেন্দ্রনাথ সেখানে যাবেন—এতে আর কিন্তু করবার কী আছে!

শিয়ালদহ এক্সপ্রেসে বড় ভীড়—বড়দিনের ছুটি-বিলাসীদের মেলা। রিজার্ভেশন পাওয়া যায়নি। সাহিত্যিকদের একটি দল চলেছেন আসানসোলে রবীন্দ্র-শরদীয় সাহিত্য অধিবেশনে। দলের অধিপতি উপেন্দ্রনাথ সর্বাগ্রে গিয়ে পৌঁছেছেন শিয়ালদহ ষ্টেশনে। ডানহাতে তাঁর ছড়ি এবং বামহাত তাঁর স্নেহভাজন এক অনুজের বাহুবদ্ধ।

প্লাটফরমে একজন রেলওয়ে কর্মচারির কাছে আমি পেশ করলাম—'সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় আসানসোলে সভাপতিত্ব করতে চলেছেন। বয়সে পীড়িত, ভীড়ের মধ্যে যদি একটু বসবার ব্যবস্থা করা যায়।'

রেলওয়ে কর্মচারি খুশিমনে এগিয়ে এলেন উপেন্দ্রনাথের সামনে। একখানি সেকেণ্ড ক্লাস বগি,—সেইখানে কেমন করে না জানি ভিড় করে গেল। উপেন্দ্রনাথ উঠলেন।

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এলেন—সঙ্গে সুসাহিত্যিক, রসিক এবং যুগান্তরের সহযোগী সম্পাদক নন্দগোপাল সেনগুপ্ত। আরো আছেন কবি শুভদত্ত বসু, খ্যাতনামা সাহিত্যিকা বাণী রায় এবং সমালোচকপ্রবর ডক্টর রথীন রায়।

প্রবীনরা এলেন উপেন্দ্রনাথের সাহিত্যে। অপর এক কম্পার্টমেণ্টে গেলেন তরুণের দল—ডক্টর রথীন রায়, বাণী রায় এবং শুভদত্ত বসু।

ট্রেন চলেছে। উপেন্দ্রনাথ বেশ আসর জমিয়ে বসেছেন। মুদগরাম উপেন্দ্রনাথ, আর তাঁর সঙ্গে পূর্বোক্তমে আখর দিয়ে চলেছেন রসিক নন্দগোপাল।

এক্সপ্রেস ট্রেন এক একটা স্টেশন স্টপেজে থামলে এ-ঘর ও-ঘর করে আসছেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। আসানসোলগামী সকল সাহিত্যিকদের তদ্বির ও তত্ত্বাবধান করছেন তিনি। এ ঘরের পাল্লা ক্রমশঃ ভারী হতে লাগলো। প্রথমে এলেন শুভদত্ত বসু, বললেন, 'উপেনদা আর নন্দদা—এমন জুড়ি-গান ছেড়ে কে ও ঘরে থাকবে?'

'কেইবা থাকতে তোমাদের মাথার দিব্যি দিয়েছে?'

উপেন্দ্রনাথের কথায় শুভদত্ত বসু হাসলেন। বললেন, 'দাঁড়ান দাদা, সবাইকেই এ ঘরে টেনে আনছি।'

পরের স্টেশনে এলেন ডক্টর রথীন রায়—'দাঁড়িয়েও যদি যেতে হয় তাও ভালো, ও ঘরে আর যাচ্ছিনে দাদা।'

'কেন, কী হয়েছে?'

'বাণী রায়ের মানিব্যাগ হারিয়েছে। এখন ডিটেক্‌টিভ সেজে চোর ধরি কেমন করে বলুন তো!'

বাণী রায় এসে পৌঁছাতেই সমস্যার সমাধান হয়ে গেলো।

উপেন্দ্রনাথ বললেন, 'মানিব্যাগ হারানোতেই এতো উতলা হলে বাণী, তবু তো ঘর হারায়নি।'

উচ্ছকিত হাসিতে এ ঘর ওরে উঠলো। আর 'যদি হও সুজন এক কথাতে বশজন'—এ নীতি অনুসারে সবাই একটু একটু স্থান বদল করে পরমানন্দে চলা গেলো আসানসোলের পথে।

আসানসোলের প্রসিদ্ধ উকিল পরলোকগত ভবানীদাস মুখোপাধ্যায়ের গৃহে উপেন্দ্রনাথ সবান্ধবে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। ভবানীবাবু তখনও জীবিত; কিন্তু কঠিন অসুখে শয্যাশায়ী।

উপেন্দ্রনাথ কয়েকদিন ছিলেন—তাঁর মধুর ব্যক্তিত্ব এবং সরল ব্যবহার ভবানীবাবুর রোগযন্ত্রণার উপশম ঘটিয়েছিলো। আর ভবানীবাবুর কন্যা শ্রীমতী মায়া দেবী এবং সমগ্র পরিবারই উপেন্দ্রনাথের অতি আপনজন হয়ে উঠলেন।

দিতলে দুখানি ঘর—সামনে খোলা ছাদ। সাহিত্য অধিবেশন স্থানীয় গার্লস স্কুলের প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সাহিত্য অধিবেশনে গুরুগম্ভীর আলোচনা—ঘরের অধিবেশনে সরসতা।

দিতলের দু'খানি ঘরের মধ্যে একটি প্রবীনদের জন্যে নির্দিষ্ট। তাতে আছেন সভাপতি উপেন্দ্রনাথ, পণ্ডিত বক্তা অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেন, নবগোপাল সেনগুপ্ত এবং উপেন্দ্রনাথের সহচর হিসাবে আমি। পাশের ঘরে তরুণদের দলকে সামলাচ্ছিলেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। কিন্তু এখানে শিয়ালদহ এক্সপ্রেসের দুখানি সেকেণ্ডক্লাস কম্পার্টমেণ্টের মতন প্রবীনদের ঘরেই জাঁকজমক বেশি। উপেন্দ্রনাথ একাই একশো—তাঁর সঙ্গে আবার রসিক নবগোপাল সেনগুপ্ত। একে বৃহস্পতি তায় তুঙ্গদশা।

সাহিত্য অধিবেশনে প্রদত্ত একটি সীরিয়স্ বক্তৃতা সম্পর্কে নবগোপাল সেনগুপ্ত উপেন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করলেন, 'দাদা, অমুকের বক্তৃতা কেমন শুনলে বল তো?'

উপেন্দ্রনাথ গাম্ভীর্যের সুরে বললেন, 'বিষয়টির গুরুত্ব আছে; কিন্তু এ সম্পর্কে ক্ষিতিমোহন বাবুর একটি গল্প মনে পড়ছে।'

'কী রকম?'

উপেন্দ্রনাথ বললেন, 'ভাগলপুরে একটি সাহিত্য অধিবেশনে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন একবার সভাপতিত্ব করতে গিয়েছিলেন। একজন বক্তা সুদীর্ঘ বক্তৃতার পর জিগ্যেস করলেন সভাপতিকে, 'কেমন লাগলো আপনার?'

রসিক সভাপতি ক্ষিতিমোহনবাবু বলেছিলেন, 'চমৎকার!' বলে উপমা দিয়েছিলেন, 'একক, দশক, শতক, সহস্র, অযুত, লক্ষ, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, মাঘ, ছেলে-পুলে, নাতি-নাতনি।'

উপেন্দ্রনাথের রস-কাহিনী শুনে আমরা সবাই হেসে উঠলাম। পাশের ঘরে এ-গল্পের প্রতিধ্বনিতে তরুণের দল কলহাস্যে মুখর হয়ে উঠলেন। ক্ষিতিমোহন বাবুর জবানীতে উপেন্দ্রনাথের মন্তব্য হচ্ছে বক্তার বক্তৃতা যুক্তির পথে পরিচালিত হয় নি।

ও-ঘর থেকে এ-ঘরে ছুটে এসে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় বললেন, 'না, বুড়োর দলকেই যখন সামলানো যাচ্ছে না ছেলেদের সামলাই কেমন করে?'

এ-গল্পের পরিপ্রেক্ষিতে আবার নবগোপাল সেনগুপ্তের পালা। তিনি চাপান দেন, উপেন্দ্রনাথ তখন নতুন তরজা সুরু করেন। ত্রিপুরাশঙ্করবাবুও তাঁর গাম্ভীর্যের আস্তরণ খুলে ফেলে রসিকতার মধু বর্ষণ করতে থাকেন।

চারদিনের অধিবেশনের মূল সভাপতি উপেন্দ্রনাথ ঘরে বাইরে সভা করলেন। রবীন্দ্র-শরদীয় সাহিত্য-অধিবেশনে সাহিত্য-সমাজ এবং সমকালীন সমস্যার গুরুতর বিষয়বস্তু আলোচনা এবং ভবানীবাবুর গৃহে গান-বাজনা রস-রসিকতায় মাধুর্য-মণ্ডিত আসর। গভীর রাত্রি পর্যন্ত আড্ডার আসরে আড্ডারাজ উপেন্দ্রনাথ বার্ধক্যের বয়েসকে ছুঁড়ে ফেলেন।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ সংখ্যনপ্রসঙ্গে। সভাপতিরূপে সুষ্ঠুভাবে সভাপরিচালনা, বিষয়-বস্তুর গুরুত্বে তাকে সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান উপেন্দ্রনাথের সমাধিকৃতিত্ব। কিন্তু তারই মধ্যে রসিকতার ফল্গুধারায় নিত্য সভাক্ষেত্রকে অভিসিঞ্চিত করে তোলেন। সভাক্ষেত্রের বহিরঙ্গকে তিনি অন্তরঙ্গতায় মিশিয়ে নেন। তাই সভাপতি, বক্তা এবং শ্রোতা উপেন্দ্রনাথ পরিচালিত সভার একই সত্তা।

সাহিত্যে সহিতার্থ শুধু লেখায় নয় সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত ভাবে সম্প্রসারিত হয় সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ এ-কথা জানতেন। তাঁর চরিত্র মাধুর্যে এটি বরাবরই লক্ষ্য করা যেতো।

আসানসোলের রবীন্দ্র-শরণীর সভাপতি বিরাট সভাক্ষেত্র থেকে আরো এগিয়ে গেলেন। আসানসোল থেকে বার্ণপুর ; বার্ণপুর থেকে ডিসেরগড়।

ডিসেরগড়ের শ্রীযুতী কল্পনা ভট্টাচার্য এবং তাঁর স্বামী শ্রীযুত পাণ্ডু ভট্টাচার্য আহ্বান জানালে, 'দাদা আমাদের ওখানে একবার পায়ের ধুলো দিতে হবে।'

আমরা আপত্তি তুলেছিলাম উপেন্দ্রনাথের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে।

উপেন্দ্রনাথ কিন্তু বললেন, 'আচ্ছা, যাবো।'

গেলেন, কিন্তু সময় না থাকায় জমকালো সভা করতে পারলেন না। আশ্বাস দিলেন, এবার আর তোমাদের এখানকার সকলের সঙ্গে মিশতে পারলাম না ; কিন্তু কথা দিচ্ছি আর একবার আসবো।'

সে-কথা রেখেছিলেন উপেন্দ্রনাথ।

আরো কথা দিয়েছিলেন ভবানী দাস বাবুকে।

ভবানী দাস বাবু ক্ষোভে প্রকাশ করেছিলেন উপেন্দ্রনাথকে বিদায় দেওয়ার সময়, 'দাদা অসুখ হয়ে পড়ে আছি। কিছুই ঘর-আতিথ্য করতে পারলাম না। আর বোধহয় দেখাও পাবোনা আপনার—'

উপেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'আর একবার আমাকে আসতে হবেই এখানে, শুধু আপনার জন্যে নয়। আপনার মেয়ে দাদা এবং নাতনী খুকুর টানে আসানসোলে আসতেই হবে একবার।'

উপেন্দ্রনাথ এ-প্রতিশ্রুতিও পালন করেছিলেন।

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় থেকে গেলেন আসানসোলে। রবীন্দ্র-শরণীর অধিবেশন-অন্তে আমরা কলকাতাভিমুখে ফিরে এলাম।

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের এখনো অনেক কাজ বাকী। চারদিন ব্যাপী সাহিত্য-অনুষ্ঠানের রাজসূয় যজ্ঞের ব্যয়ভার জোটানো বড় সহজ কথা নয়। সাহিত্যের ব্যাপারী পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় আয়-ব্যয় মেটাবেন—চাঁদা তুলবেন। আবার শরণীর প্রসঙ্গটিকে অব্যাহত রাখবেন।

সভাপতি উপেন্দ্রনাথ শুধু সভাপরিচালনা করেই ইতি কর্তব্য শেষ করেন নি। রবীন্দ্র-শরণীর সক্রিয় সমস্তরূপে কিছু চাঁদাও দিলেন। আর বললেন শ্রীযুতী দাদা দেবীকে, 'সভাপতিরূপে যদি না ডাকো তাতে ক্ষতি নেই ; কিন্তু একজন সাহিত্যের শ্রোতার আসন থেকে অন্ততঃ আমাকে বঞ্চিত করো না পরবর্তী বছরের অধিবেশনে।'

খুকুর চোখের জল মুছিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিলেন, 'নাতনীর স্বামী আসন পেলে, তবুও চোখে জল কেন ?

আসানসোলের রবীন্দ্র-শরণীতে গিয়ে উপেন্দ্রনাথ ভবানী দাস বাবুর আশ্রয়ে ক'দিনের জন্যে শুধু ভালো-বাসা পান নি, নিজের স্নেহ-নির্ঝর অন্তরের ভালোবাসা দিয়ে ভালো বাসা জয় করেছিলেন, আর একজনের সাহচর্যে আমরা কয়েকজন তারই অংশীদার হয়ে সাহিত্যের সহিতার্থের বোধের সত্যিকারের পরিচয় পেয়ে লাভবান হয়েছি এ কথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি।

এই প্রথম

অব্যক্ত বেদন

সুচরিতা সেনগুপ্তা

প্রবল প্রগলভতার সঙ্গে টেবিল চাপড়ে সুরজিৎ বলে উঠলো—"বিয়ের পর কিছু-কাল মেয়েদের চাকরী করা কোনমতেই উচিত নয়। তাতে স্বামীর মনের সুখ, সংসারের শান্তি নষ্ট হয়ে যায়।" মূক-বিস্ময়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দেওরের দিকে চেয়ে রইলো সতী। এক মুখে দুই কথা। বিয়ের আগে যে সুরজিৎ চাকুরে মেয়েদের স্বপক্ষে অটিল যুক্তিসহ দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে শুধু স্বয়ংবর্ণা-অভিজ্ঞা যুথ্যু বৌদিকে কতবার নির্বাক করে দিয়েছে, বিয়ের পরেই সে সুরজিৎ কিনা—। সতী দ্বিতীয় বার নির্বাক হয়ে রইলো। শুধু দেওরের বাঙ্ময় মুখের দিকে চেয়ে থাকা হলো। আহা বেচারা। একটু পর সমবেদনার সুরে বলে, "তা অফিস থেকে ফিরতে মাঝে মাঝে একটু আধটু দেরী হয়ে যায় বৈ কি? সকলেরই হয়।

"দেবলা আর অন্য সকলের মধ্যে তফাৎ আছে বৌদি। স্বামী, শ্বশুর বাড়ী ও সংসারের বাগানের মধ্যে কখনোই সে ধরা দেবে না।"

সুরজিৎ-এর মনোবেদনা সতীর কোমল অন্তর গভীর ভাবে স্পর্শ করলো। সন্তর্পণ দীর্ঘশ্বাসও পড়লো একটা। সে বেশী লেখাপড়া শেখেনি, আধুনিক আদবকায়দায়ও অভ্যস্তা ছিলনা বলে এই দেওরই কত উপহাস করতো। নীরবে সতী সে সব সয়ে গেছে।

সুন্দরী শিক্ষিতা চাকুরে তরুণী, সুরজিৎ-এর একমা স্বপন-চারিণী দেবলা কয়েকমাস মাত্র সুরজিৎ-এর সংসারে গৃহলক্ষ্মীপদে অধিষ্ঠিতা হয়েছে। উভয়ের প্রথম দর্শন কোন একটা অফিসে এবং সে দর্শনেই অনুরাগে অনুরঞ্জিত হলো দুটি তরুণ তরুণী হৃদয়। সুরজিৎ-এর মন-ময়ূরপঙ্খীর আরোহিণী তখন একা শুধু দেবলা। দেবলার মত চাকুরে মেয়েরাও যে আদর্শ গৃহিণী ও গৃহলক্ষ্মী হতে পারে এ দৃঢ় বিশ্বাস সুরজিৎ-এর মনে প্রশ্রয় পেলো প্রণয় সুরুতেই। এবং সেকেলে মায়ের মৃদু প্রতিবাদকেও সে অগ্রাহ্য করেছিলো ঐ যুক্তি দিয়ে।

দেবলা শুধু চাকরী করে না। অফিস ইউনিয়নের সুযোগ্যা কর্মীও সে। প্রায়ই তাকে মিটিং এটেণ্ড করতে হয়। কখনো কখনো জনসমাবেশে কিছু বলতেও হয়। কাজেই ঘরে ফিরতে তার দেরী হয়ে যায় প্রায়ই। আর তা নিয়েই যত—।

সন্ধ্যা হয় হয়। শাশুড়ী ঠাকুরঘর থেকে গম্ভীর কণ্ঠে ডাক দিলেন, "শাঁখ বাজিয়ে যাও বৌমা। ঘরের লক্ষ্মীদেরই এটা করতে হয়।"

জলন্ত উনুন থেকে কড়া নামিয়ে রেখে সতী তাড়াতাড়ি এগোলো, নইলে আরও পাঁচকথা শোনাবেন তিনি সে জানে।

শাশুড়ী তখনও বলে চলেছেন, 'ছোটবৌ-এর সঙ্গে তো আর ঘরের কোন সম্পর্ক নেই? বড়বৌ একা আর কদিক সামলাবে। তখনি বারণ করেছিলুম চারুবে বউ, এ সংসারে শান্তি হবেনা। শুনলেনা সে কথা—।" তাঁর ক্ষুব্ধ কুটিল দীর্ঘশ্বাস বক্তব্য আন্দাজ করে নিয়ে মৃদু মন্দ হেসে সতী তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, "তার সন্ধ্যেবেলা ওসব কথা এখন থাক না।"

গুন গুন করে গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে দেবলা ওপরে উঠছে। প্রথমেই এসে রান্নাঘরে ঢুকে সতীর সামনে বসে পড়ে আনন্দে উপচে পড়লো—"আজ ভারী মজা হয়েছিল দিদি। কিরতে তাই দেরী হলো। টিফিনটাইমে আমার কলেজের সহপাঠী বন্ধু অচিন্ত্য এসে হাজির। বল্লে, আজ সন্ধ্যায় সোসপার্কে কবি-বরণ উৎসব আছে, একটা গান গাইতেই হবে। ওদের মনোনীত গায়িকা নাকি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অচিন্ত্যর এই বিপদ। কি আর করি, যেতেই হলো।"

শঙ্কিতা সতী অত্যন্ত কণ্ঠে ফিসফিসিয়ে উঠলো, "এই আস্তে। মা শুনতে পাবেন।" তারপর সহাস্যে বল্লে, "নিজের ঘরে যা একবার। ঠাকুরপো অস্থির হয়ে রয়েছে। এমন সুন্দর মুখখানি কতক্ষণ দেখে নাই।"

সরল রসিকতায় রঞ্জিত হয়ে দেবলা সলজ্জে বল্লে, "আহা।"

"আহা কি? দেবনা গিয়ে বেচারীর দুর্দশা। দেখিগে, মান ভাঙাতে আবার তর্ক করিসনে যেন।"

সতীর কণ্ঠে উৎকণ্ঠা।

চেঁচিয়ে উঠলো সুরজিৎ, "চাকরী ছেড়ে দাও। ঘরের বৌরা চাকরী করলে স্বেচ্ছাচারী স্বাধীন হয়ে ওঠে আর সংসারের শান্তি থাকে না একথা এখন বুঝছি।"

দেবলা জ্বলসে উঠলো। স্বামীর চোখে চোখ রেখে স্পষ্ট করে বল্লে, "বিয়ের আগে সেকথা বিবেচনা করলে হতো না? আমার চাকরীর কথা তুমি জানতে। এখন মিথ্যে চেঁচিয়ে লাভ নেই। তাছাড়া—" শ্লেষ করলো দেবলা—"তোমার পুরোনো ধারণা আজ বদলেছে। আজকের ধারণা কাল বদলাতে কতক্ষণ?"

শাড়ী তোয়ালে নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল দেবলা।

খাবারের ডিস সামনে এগিয়ে দিয়ে সস্নেহে সতী বল্লে, "খেয়ে নে ভাই। ঝগড়া করলি তো? বারণ করেছিলুম না?"

দেবলাকে নিরুত্তর দেখে আবার বল্লে, "হাজার হোক পুরুষমানুষ ঠাকুরপো। নতুন বিয়ে করে তোকে নিয়ে ওর কত স্বপ্ন, কত রঙীন কল্পনা। যাক, নে খা এখন।"

স্বামীর তিরস্কারের উত্তাপ দেবলার মনে প্রচণ্ড দাহ জাগিয়েছিল। সতীর সান্ত্বনায় স্নেহ সিঞ্চনে একটু প্রশমিত হয়ে এলো। পাশে বসা শিশুপুত্র মুখে খাবারের টুকরো গুঁজে দিতে দিতে বিরসস্বরে বল্লে, 'স্ত্রীপুরুষে প্রতি পদে প্রতি ক্ষেত্রে প্রভেদ আর বিভেদ সৃষ্টি বিধাতা করেননি, করেছে মানুষ। তাই যত সুখ শান্তি আনন্দ ও স্বাধীনতার দাবীদার ও অধিকারী শুধু পুরুষেরাই।" ঘুমায়িত চা-এর কাপে এক চুমুক দিয়ে আবার বল্লে, "চাকুরে মেয়েদের জীবনে এমন এক জটিল সমস্যার কথা আমার জানা ছিলনা। স্কুল কলেজে পড়ার সময় বোর্ডিংএ থেকেছি। তারপরই এ চাকরী। ভাল লাগে না এ অশান্তি।"

"এ আবার অশান্তি কিসের রে?" মৃদু তিরস্কার করে উঠলো সতী, "এ তো নিছক স্বামী স্ত্রীর মান অভিমান, সব সংসারেই তা আছে।"

"এ শুধু অভিমান নয় দিদি"—দেবলার কণ্ঠে পুঞ্জিভূত বেদনা—"এ হচ্ছে আমাদের দেশের মেয়েদের জীবনে নানা সমস্যার মধ্যে আর একটি। চা-এর কাপ নিঃশেষ করলো দেবলা। দীর্ঘশ্বাস ফেললো সন্তর্পণে।

স্ত্রীর হাত থেকে পান নিতে নিতে অভিজিৎ শুধালো, "ওদের মিটমাট হয়ে গেছে?"

স্বামীর দিকে কটাক্ষ করে সতী সকৌতুকে উত্তর দিলে, "স্বামীস্ত্রীর ঝগড়া মিটবে না তো কি গো?" হাসলো একটু অভিজিৎও।

"হ্যাঁ গা ছোটবৌমা।" অনুযোগের অভিব্যক্তি শাশুড়ীর কণ্ঠে, "কটা টাকা রোজগার করলেই কি সংসারের একটা কাজেও হাত দিতে নেই মা?"

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই ছুটে এলো সতী। দেবলা শোনেনি তো? সন্তর্ক হয়ে চাইলো ঘরের দিকে। না শুনলেই মঙ্গল।

"কি কাজ মা?" বিনম্র প্রশ্ন করলো সতী।

মাথা নীচু করে বড়ি দিতে দিতেই শাশুড়ী উত্তর দিলেন, "তোমাকে ডাকিনি তো? দেবলা কোথায়?"

প্রচণ্ড কর্তৃত্বাভিমানের স্পর্শে প্রখর হয়েছে শাশুড়ীর কণ্ঠস্বর। প্রমাদ গণলো সতী। অস্পষ্টস্বরে বল্লে, "বোধহয় অফিসের খাতাপত্র দেখছে।"

"ঝাঁটা মারো অমন কাজের মুখে!" শাশুড়ীর মুখের ভাষায় নিঃশব্দ কাঠিন্য—"সংসারের ওপর কোন কর্তব্য নেই, স্বামী শাশুড়ী ভাসুর মানি নেই। কি হবে অমন চাকরীতে?"

দেবলা ধীর পায়ে এগিয়ে এসে তত্তোধিক ধীর কণ্ঠে বল্লে, "যা বলবার ভাল করে বলুন। আমার অফিসের বেলা হয়ে যাবে। দেরী করতে পারবো না।"

উত্তপ্ত বাক্যের স্ফুলিঙ্গ যেন আগুন লাগলো। আহতা ফণিনীর মত শাশুড়ী মাথা তুলে দেবলার দিকে তীব্র দৃষ্টি হেনে অধিকতর উত্তপ্তকণ্ঠে বল্লেন, "ভালভাবে চললেই ভালকথা শুনবে মা। এই যে সংসারের এত ঝামেলা তোমার চোখে কি পড়ে না? দুটো টাকা রোজগার ছাড়া আর কোন দায়িত্ব কি তোমার নেই?"

দেবলার চোখেমুখেও সরোষ স্ফুলিঙ্গ! আশঙ্কিতা সতী তাড়াতাড়ি দেবলাকে নিয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

সুরজিৎ কেমন যেন গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে। দেবলা ও সুরজিৎ-এর প্রণয় শুরু থেকেই উচ্ছল লীলাচঞ্চল। মোহময়ীর চটুলতায় মিষ্ট প্রাণবন্ত সেই আনন্দ-পসরার ভাগীদার ছিল সতীও। ইদানীং ওদের এই নীরব গাম্ভীর্য্য তার ভালো লাগে না। আশঙ্কা জাগে অজানা অমঙ্গলের। তৎক্ষণাৎ দু' কর যুক্ত করে কপালে ঠেকিয়ে সে দেবর জা-এর মঙ্গল মিলন কামনা করে।

সুরজিৎ-এর সামনে বসে সযত্নে খাওয়াচ্ছিল সতী। অস্বস্তিকর নীরবতা ভঙ্গ করে এক সময় বল্লে, "খাও তাড়াতাড়ি, আরও পাঁচটা ভেজে দিচ্ছি।"

কোমল অথচ ক্লান্ত সতীর কণ্ঠস্বরে সুরজিৎ মুখ তুলে চাইলো, ধীরস্বরে বল্লে, "একা তোমার বড্ড কষ্ট হয় বৌদি! ও যদি তোমার একটু সাহায্য করতে পারতো। অফিস তো কখন ছুটি হয়ে গেছে।"

"আমার কোন কষ্ট হয় না ঠাকুরপো।" সতী নয়ন সজল বলে, "তাছাড়া দেবলাও তো মানুষ। ও মেয়ে বলে কি দুঃখ কষ্ট ওর থাকতে নেই? অমিল কেবল তোমরা বাসায় এসে একটু আরাম চাও, শান্তি চাও। আর মেয়েরা সেটুকু চাইলেই কি অপরাধ?" সতী সত্যিই ভারী দুঃখিত হয়েছে। কথায় সে বেদনারই স্পর্শ। মুখে কিছু না বলে সুরজিৎ আধার চাইলো।

সতী বলে চলে, "আর ঘরে বসে থেকে দেবলা করবেই বা কি? সেতো আর আমার মত বুধু নয়? সে লেখাপড়া জানে, সবার সাথে মিশতে জানে। তোমাদের তো গর্ব্ব করাই উচিত।"

সতী থেমে যায়। তার মনে আঁকা অতীত স্মৃতি মুছে যায়নি, যাবে না কখনো। শ্বশুর মরে গেলেন। অভিজিৎ-এর ওপর সংসারের ভার। অসঙ্গলতা ঘটেই। শাশুড়ী উঠতে বসতে খোঁটা দিতেন 'অলক্ষী অপয়া বউ। ঘরে আসতেই অমঙ্গল।' 'রূপই আছে গুণ নেই'—ইত্যাদি।

স্বামী শান্ত প্রকৃতির মানুষ বটে। কিন্তু তিনিও সময়ে সময়ে যে পরিহাস করতেন তা সতীর কোমল অন্তরে তীরের মত বিঁধতো। বলতেন, "শুধু হাঁড়ি ঠেলা ছাড়া আর কিছুই তো শেখনি। একটু ইংরেজী যদি জানতে তবু না হয় শিখিয়ে পড়িয়ে দু'চার টাকা রোজগারের পথ করা যেতো। অন্তত অনটনের সংসারে উপকার হতো।" মৃদু হেসে আবার বলতেন, "বুধু বউ কোন কাজে আসে না।" মলিনমুখী সতীর মুখখানা আরও নীচু হয়ে যেতো।

সুরজিৎ তখন সবে কলেজে ঢুকেছে। বড় বড় কথা বলতে কত তার উৎসাহ। ঘুরে ফিরেই সে তার বন্ধু দিলীপের বৌদির গুণপণা ব্যাখ্যা করতো—"দিলীপের ভাগ্য দেখলে সত্যি হিংসে হয়, যেমনি শিক্ষিতা তেমনি আপ-টু-ডেট।"

ইংরেজী শব্দটার অর্থ সতীর বোধগম্য হয়নি ভেবে মিটিমিটি হেসে বলতো, "মানে, একেবারে আধুনিক, বুঝলে?"

শুনে শুনে সতী একদিন সরল উৎসাহভরে বলে ফেলো, "আমায় একদিন নিয়ে চল না ঠাকুরপো? তোমার নতুন বৌদির সঙ্গে আলাপ করে আসি। ভারী ইচ্ছে করে আমার।"

নিবিড় নির্ভেজাল অনুনয় কণ্ঠে নয়, আয়ত দুটি নয়নেও বুঝি ফুটে উঠেছিলো সতীর। কিন্তু লক্ষিত সুরজিতের নজরে তা পড়লো না। বিদ্রূপের হাসি হেসে উঠলো সে, "তুমি! তবেই হয়েছে! অমন শিক্ষিতা মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারবে তুমি? সে নতুন বৌদি বি-এ পাশ জানো?"

ম্লান এবং মতমুখী হয়ে পড়েছিলো সতী মুহূর্ত্তে। উদ্গত অশ্রুর ফোঁটা গোপন করতে উঠে গিয়েছিলো আড়ালে।

"কি ভাবছো বৌদি?" সতীর অন্যমনস্কতা ভাঙাতে চায় সুরজিৎ।

"এমন আর কি।"—একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সতী বলে, "আমি বুধু গেঁয়ো ছিলুম। আমার সঙ্গে যা করেছো দেবলার সঙ্গে তা করতে যেওনা ঠাকুরপো। ভারী অশান্তি হবে। ও শিক্ষিতা মেয়ে রোজগেরে মনের মত বউ। দেখে শুনে, চিনে জেনে এনেছো। এতেও কেন তোমাদের মন ভরে না বুঝিনে। মেয়েদের যে তোমরা কি ভাবে গেলে আর দেখলে খুশী হও তা আজও কিছুতে বুঝে উঠতে পারলুম না। মেয়েরাও তো মানুষ।"

সুরজিতের খাওয়া হয়ে গিয়েছিলো। দেশলাই জেলে সিগারেট ধরালো একটা। সতীর ব্যথা-নম্র মুখখানির দিকে তাকালো একবার। হঠাৎ আজ নতুনরূপেই চিনলো যেন সতীকে।

কথাগুলো কানে বাজলো যেন নতুন ধ্বনি তুলে। একটু বিস্মিত হলেও মুখে কিছু বললো না। ধীরে ধীরে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে লাগলো। হাতের কাজ সারতে সারতে সতী বলে, "কাল রোববার। দেবলাকে নিয়ে সিনেমা দেখে এসো।"

"দেবলা কি আর বাসায় থাকবে?" সুরজিৎ মৃদু হাসলো, "কোথায় কোন ময়দানে থাকবে, মিটিং নয়তো কোন জলসায় কারও অনুরোধে গান।"

"ছিঃ ঠাকুরপো! আমার সামনে দেবলার সম্বন্ধে এমন করে আর কক্ষণো বলোনা তুমি। মেয়ে হলেও মানুষের অধিকার সে নিতে শিখেছে।" আঁচলে ভিজে হাত মুছতে মুছতে শাশুড়ীর ভাবান্তরকে সতী চলে যায়। তার কেবলি মনে হয় দেবলার কোন দোষ নেই।

রোদলার ছাদে কাপড় মেলে দিয়ে সতী হঠাৎ কৌতূহলী হয়ে দিলেকোঠার দরজায় কান পাতে। শীতের ছুটিছাটার দুপুরে সুরজিৎ এ ঘরেই কাটায়। আজ রোববার। ঢিলেঢালা দুপুরেও সতী দেবলাকে তাড়াতাড়ি খাইয়ে দাইয়ে সুরজিৎ-এর ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছে। মনে মনে হেসে সতী আড়ি পাতলো। কেমন যেন লজ্জাও অনুভব করছিল। তবু একটা অদম্য কৌতূহল। তাছাড়া সুরজিৎ-দেবলার সঙ্গে তার নিবিড় মধুর সম্পর্কে এ অন্যায় নয়। মুখের কৌতুকোজ্জ্বল হাসি তখনি মিলিয়ে গেল সতীর। সুরজিৎ বলছে। নব বিবাহিতের অনুরাগরাঙা কণ্ঠে নয়, কর্তৃত্বের আদেশ, গম্ভীর স্বরে বলছে, "আজ কোন মিটিং জলসা পার্টি নয় আমার সঙ্গে আজ যাবে তুমি সিনেমায়।"

দেবলার কণ্ঠ স্থির—"অসম্ভব। আজ পার্টির অতবড় মিটিং, আমাকে এটেণ্ড করতেই হবে। আর একদিন সিনেমায় যাওয়া যাবে।"

প্রমাদ গণলো সতী। শিক্ষিতের তর্ক। সহজে কেউ হার মানবে না। যদি সাধনা সামনি গিয়ে ওদের তর্ক থামিয়ে সুমীমাংসা করে দিতে পারতো সে।

তীব্রস্বরে সুরজিৎ তখন বলছে, "শিক্ষিতা ঠাকুরে স্ত্রীর ওপর হুকুম করার দুঃসাহস নেই আমার দেবলা। কিন্তু আমার জানতে ভুল আমি বুঝতে পেরেছি। মাঝে মাঝে ভাবি রোজগেরে স্ত্রীর কাছে সব স্বামীই কি আমার মত অধিকারবঞ্চিত, অক্ষম? থাক, যা খুশী তাই করো। আর কিছু বলার নেই আমার।"

দেবলার কণ্ঠস্বর শান্ত—"মনের সঙ্কীর্ণতা যতদিন না সরাতে পারবে নিজের অশান্তিতে নিজেই কষ্ট পাবে। আশ্চর্য! যুগ পালটেছে, হাওয়া পালটেছে, কিন্তু তোমাদের চাওয়ার কি কোন পরিবর্তন নেই? তোমাদের দাবী দাওয়ারও কি শেষ নেই। নারীপুরুষে বিভেদের অবসান তাই কখনোই ঘটতে পারে না।"

সতীর বুক দুরু দুরু করছিল। দ্রুতপায়ে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নেমে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। জানালার ফাঁক দিয়ে আসা মধ্যাহ্নের মধুর রোদে পা টান করে ছড়িয়ে দিয়ে শুয়েছিলো অভিজিৎ। হাতে পত্রিকা। সতীর পদশব্দে তাকালো। বলে, "শোন।"

সতী সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই কাগজটা সতীর সামনে ধরে বলে, "দেবব্রতের বৌ সুপ্রিয়াকে তোমার মনে আছে? সেই যে আমাদের বিয়ের সময় এসে খুব হৈ চৈ আনন্দ করেছিলো? সেই সুপ্রিয়া আমেরিকা থেকে কতবড় ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফিরেছে। এই দেখ তার ছবি।" তারপর একটু জোর দিয়ে স্পষ্ট করে বললো, "সত্যি দেবব্রত কত বড় ভাগ্যবান।"

"মুখ্যু সুখ্যু মেয়ে মানুষ আমি। ওসব বড় বড় কথা বুঝি না"—হঠাৎই যেন সতী খি চিয়ে উঠলো। এক ঝটকায় পত্রিকাটা সরিয়ে দিয়ে দিকলুর পাশে গিয়ে শুয়ে পড়লো।

'হাঁরে, মিটিংএ দাঁড়িয়ে তুই যে অতবড় লেকচার দিলি, বুক কাঁপলো না রে?" চিরুনী চালনা বন্ধ করে সতী দেবলার গলা জড়িয়ে ধরে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো। মাথা নেড়ে একটু হাসলো দেবলা। বড় জাএর সরল স্নেহে মুগ্ধ সে নিজেও। এমন অকপট, উদার মানুষই বুঝি প্রকৃত সুখী। স্থায় অন্যায় দাবী আর অধিকারের চুলচেরা বিচারের আশা রাখে না, মূল্য নির্দ্ধারণের হিসাব নিকাশ রাখে না, জীবনবোধ যার কাছে বেহাৎই অজ্ঞাত বা মূল্যহীন। তবু সত্যি সেকি সুখী? শাশুড়ীর গঞ্জনা, স্বামীর অবহেলা, দেওরের অবজ্ঞা, পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ প্রায়-অশিক্ষিত একটি নারীজীবনে কি প্রকৃত শান্তি তৃপ্তি সুখ ও পূর্ণতা এনে দিতে পেরেছে?

দেবলা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। সতীর অবাধ উচ্ছ্বসিত কথায় হুঁস হলো, "তোর ভাসুরের কি আনন্দ! গর্ব করে বল্লেন, "দেবলার মত মেয়ে আমাদের বাড়ীর বৌ! তাবতেও আমার বুক ফুলে উঠছে গর্বে আর আনন্দে। এমন মেয়ে যদি ঘরে ঘরে জন্মাত। সত্যিরে, অতি আনন্দে তোর ভাসুরের গলা ধরে এসেছিলো। পত্রিকা পড়ে মাকে আমাকে শোনালেন।"

সতী থামলো। আবার চিরুনী দিয়ে দেবলার চুলের গোছা মসৃণতর করতে করতে অতি কোমলকণ্ঠে বল্লে, "আমায় দিয়ে তো তোর ভাসুরের মনের আশা পূর্ণ হতে পারেনি। সেই দুঃখ আমারই কি কম রে। সত্যি তুই আমাদের কত বড় গর্ব। আর ঠাকুরপো ভারী ভাগ্যবান।"

সতীরও গলা যেন ধরে আসে। মাথা নীচু করলো দেবলা। সতীর চেয়ে নিজেকে বড় মনে করতে সে কোনদিন পারেনি, আজও পারছিল না। পরিচয়ক্ষণটি থেকে এই নারীর সরল মধুর স্নেহসিক্ত অন্তরের প্রকাশ অন্তরতম প্রদেশে করে রেখেছে দেবলার মনোমন্দিরে।

দেবলার খোঁপায় সযত্নে কাঁটা গুঁজতে গুঁজতে সতী একমনে বলে চলেছে—"ও বাড়ীর মেসোমশাই এসে কত সুখ্যাত করলেন, বল্লেন, 'ছোট বৌমা সত্যিই রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী।' বলবে না? সবাই বলবে কত গুণ তোর।"

আর একটি মানুষের মতামত জানবার জন্য দেবলার মনটা হঠাৎই আজ যেন কেমন চঞ্চল হয়ে উঠছিল। কিন্তু লজ্জার প্রচণ্ড বাধার মুখে প্রকাশ হতে চায় না। —কই, সতীও তো আজ দেওরের সম্বন্ধে কোন কথা বা পরিহাস করছে না? অন্যদিন যেটা হয় সুরজিৎ-দেবলা মিলনে সতীর অকুণ্ঠ ও ঐকান্তিক প্রয়াস? আজ অনেক প্রশংসা, অসংখ্য হাততালি কুড়িয়ে জয় ও গৌরবের ঘনোমাল্য গলায় নিয়ে ফিরেছে সে। দেবলার জোরালো বক্তৃতা বড় বড় হরফে পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে জনসাধারণের মনে সাড়া জাগিয়েছে। 'দেবলা চৌধুরীকে' আজ সবাই চেনে।

আনমনা দেবলা চমকে উঠলো। সুসজ্জিত সুরজিৎ সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মোহনিবিড় দৃষ্টি মেলে দেবলা চেয়ে রইলো স্বামীর মুখপানে, সত্যিই সুরজিৎ কন্দর্পকান্তি। এমন রূপ বুঝি সচরাচর নজরে পড়ে না। সেই প্রথম দর্শনের মোহাঞ্জন আজ যেন আবার নতুন করে দেবলার আঁখি স্পর্শ করলো। স্ত্রীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সুরজিৎ সতীকে বল্লে, "আমার ফিরতে আজ দেরি হবে বৌদি। বিমানের বোন বিমলা ডক্টরেট পেয়ে লণ্ডন থেকে ফিরেছে তুমি তো জানই। আজ তারই সম্বর্দ্ধনা সম্মিলনী। খাবার রেখো না, সেখানেই আজ বিরাট ভোজ।"

সুরজিৎ চলে গেল। রেখে গেল মনুষ্যত্বের সুস্নিগ্ধ সুবাস আর দেবলার প্রতি প্রগাঢ় উপেক্ষা……। দেবলার অসতর্ক বিমূঢ় দৃষ্টি মুহূর্তের জন্য শূন্য বিবর্ণ হয়ে অনুসরণ করলো দৃপ্ত প্রখর গর্বিত সুরজিৎকে।

সতী নীরবে দেবলার মুখখানা তুলে ধরে তার সীমন্তে দীর্ঘ উজ্জ্বল সিঁদুরের রেখা টেনে দিল। তার প্রদীপ্ত মুখশ্রী কেমন যেন করুণ আর বিষণ্ণ মনে হলো সতীর। অতি সন্তর্পণে একটা নিঃশ্বাস পড়লো তার।…… চঞ্চল পায়ে ঘর ঘরে যেতে যেতে সতীর মনে কতকগুলি অস্পষ্ট প্রশ্নের জট পাকিয়ে যায়। অভিমানক্ষুব্ধ অন্তরে তারই নীরব মীমাংসা করতে চেষ্টা করে সে।…… নারীর কাছে পুরুষের চাওয়ার কি কোন শেষ নেই? স্বাধীন শিক্ষিত একটি নারীর সহজ সাবলীল স্বচ্ছন্দ গতিকে কেন তারা অবাধ সুন্দর সার্থক ও পরিপূর্ণ হতে দেবেনা? এ প্রশ্নের সদুত্তর কে দেবে তাকে। হঠাৎ দু' চোখ জলে ভরে উঠলো সতীর।

মিঃ জন হেণ্ডারসন নামে জনৈক ভদ্রলোক কিছুদিনের জন্য অকস্‌ফোর্ড ভ্রমণের জন্য এসেছেন।

একদিন স্থানীয় কলেজের একটি ছাত্র এল তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে। আমোদপ্রিয় হেণ্ডারসনের খ্যাতি সে শুনেছিল আর তাই তাকে পরাস্ত করার জন্যে নানাযুক্তি ছেলেটির মাথায় ঘুরছিল।

দুপক্ষের বন্ধু বান্ধব উপস্থিত হলেন। একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে বিতর্ক সুরু হোল।

প্রথমে দু পক্ষই সমান তেজে কথাবার্তা চালিয়ে গেলেন, তারপর ছেলেটি বুঝতে পারলে এ তর্ক যুদ্ধে তার পরাজয় আসন্ন।

ক্রমে তার মেজাজ চড়ল, কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে উঠল এবং শেষ পর্যন্ত সে আর নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে মদভর্তি একটা গ্লাস ছুড়ে মারল হেণ্ডারসনের মুখে।

একটুও সরে বসলেন না হেণ্ডারসন, মুখটা মুছতে মুছতে তিনি অত্যন্ত কোমল, ধীর এবং শান্ত কণ্ঠে বললেন, এ সেন অপ্রাসঙ্গিক বিষয়, এখন চলুন আমরা পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে যাই।

একটি অনমনীয় দৃঢ়তার ওপরে আশ্চর্য সংযম, ধৈর্য ও কোমলতার প্রলেপ হেণ্ডারসনকে সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখে অপরাজেয় করে তুলেছিল।

বীরবলের কৌতুক

বরুচি

একবার বীরবলকে এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

দিল্লী থেকে অনেক দূরে মালয়ল নামে একটি ছোট স্বাধীন রাজ্য ছিল। তার রাজা ছিলেন যেমন খেয়ালী তেমনি খেয়ালী আর কাণ্ড-জ্ঞানহীন।

হঠাৎ একদিন সম্রাট আকবর সেই রাজার কাছ থেকে এক চিঠি পেলেন। চিঠিতে লেখা আছে: "এই লিপিতে চারটি জিনিষের এক তালিকা দিলাম। এই চারটি জিনিষ একই সময়ে একই সঙ্গে আমার চাই। তিনমাসের মধ্যে জিনিষগুলি আমায় পৌঁছে দিতে হবে। তা না পারলে, আজ থেকে ঠিক বত্রিশ দিন পরে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হবেন আপনি। আমি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করব। তালিকাটি এই:—(১) উচ্চকুলে জন্ম অথচ নীচমন, এমন একজন মানুষ। (২) হীনবংশে জন্ম অথচ অতি উচ্চমন, এমন একজন মানুষ। (৩) একটি রাস্তার কুকুর। (৪) সিংহাসনারূঢ় গর্দভ। শুধু তাদের আমার সামনে হাজির করলেই হবে না, তাদের পরিচয় প্রমাণিত করে আমায় সন্তুষ্ট করতে হবে। ইতি, বসন্ত ও আপনার একান্ত অনুগত—মালয়ল-রাজ।"

চিঠি পড়ে সম্রাট হাসবেন কি রাগবেন ভেবে পেলেন না। কিন্তু কিছু চিন্তিত হলেন। মালয়ল-রাজ ওঁর বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করবেন, সে জন্যে নয়। মালয়ল অতি নগণ্য রাজ্য। নিতান্তই হীনবল। যুদ্ধ একদিনের বেশী চলবে না। দু'দিনেই সম্রাটের সৈন্য মালয়ল-রাজ্যকে ধরা-পৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারবে।

কিন্তু তাতে তো অনর্থক লোকক্ষয়। চিন্তা সেই কারণেই। মালয়লের রাজা শুধু নির্বোধ নয়, অত্যন্ত খামখেয়ালী স্বভাবসম্পন্ন। তার নানা হঠকারিতার পরিচয় মাঝে মাঝে পাওয়া গেছে। সম্রাট যদি ঠিকমত একটা ব্যবস্থা না করেন, তাহলে হয়ত বোকা-অহঙ্কারী রাজাটা সত্যি সত্যিই সৈন্য সামন্ত নিয়ে হৈ চৈ লাগিয়ে দেবে। তাতে তার রাজ্যের এবং আশেপাশের অনেক লোক দুর্ঘটনাগ্রস্ত হবে। মালয়লের নিরীহ প্রজারা অনর্থক কষ্ট ভোগ করবে। রাজ্যে একটা অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হবে। সম্রাট তো এ সব কোনমতেই চান না। তাই তিনি স্থির করলেন, যা হয় একটা উপায় ঠাওরাতেই হবে—যুদ্ধ নয়। মন্ত্রীকে ডেকে পরামর্শ করলেন। মন্ত্রী বললেন, "রাজাটাকে বাগ মানানো শক্ত। কোন জিনিষ দিয়েই তাকে খুশী করা যাবে না। তার চারটফরমায়েসের কোন মানেই বোঝা যায় না। সুতরাং যুদ্ধ বোধহয় অনিবার্য। সেই আয়োজনই করতে হবে।"

কিন্তু সে আয়োজন সম্রাটের মনঃপূত নয়। ডাকলেন বীরবলকে। মালয়ল-রাজের পত্র শোনালেন। বীরবল কি এর একটা উপায় করতে পারবে না?

হাসলেন বীরবল। এমন কি শক্ত কাজ। নিশ্চয় পারবেন তিনি। বীরবলের অভয় বাক্য শুনে সম্রাটের দুর্ভাবনা দূর হল, মুখ প্রফুল্ল হল। তা হলে কী ভাবে কী করা হবে?

বীরবল বললেন, সম্রাট নিশ্চিন্তমনে নাকে সরিষার তেল দিয়ে ঘুমান। বীরবল সব ব্যবস্থা করবে। আপাতত তাঁকে এ বিষয়ে নানা আয়োজন করতে হবে। সে জন্যে লাখখানেক টাকা

চাই। আর, মাস দুই বীরবল রাজধানী থেকে অনুপস্থিত থাকবেন। সম্রাট যেন বীরবলের খোঁজ না করেন।

আকবর আনন্দিত হলেন। তখনই কোষাধ্যক্ষকে ডেকে বীরবলকে লক্ষ টাকা দিতে হুকুম করলেন। টাকা নিয়ে উধাও হলেন বীরবল।

* * * *

কয়েকদিন পরে মালয়দ-রাজ্যের সীমানায় এক সাহুকরকে দেখা গেল। তিনদেশ থেকে এসেছেন। সঙ্গে হাতী ঘোড়া আরও কত সব জিনিস আর দু'তিনজন ভৃত্য। শোনা গেল, সাহুকর একজন বড়দরের ব্যবসায়ী। খুব কম সুদে টাকা ধার দেন তিনি। তাঁর নাকি অগাধ টাকা। রাজধানীর প্রান্তে যে বড় বাড়িখানা খালি ছিল সেখানা চড়া ভাড়ায় নিলেন তিনি। তারপর লাল নীল দামী দামী পরদা দিয়ে তাকে সাজালেন। রাতের বেলায় বাতির সার জেগে রইল অলিন্দে অলিন্দে। তল্লাটের লোক তাঁর এলাহি কারবারখানা দেখে তাঁর সম্বন্ধে নানারকম গুজোব রটাতে লাগল।

সেই রাস্তায় কিছু দূরেই সহর-কতোয়ালের বাড়ি। তার কানেও সাহুকরের খবর গেল। একদিন সে নিজেই সাহুকরের সঙ্গে আলাপ করতে এল। টাকাওয়ালা বিদেশী। দেখা যাক না, কিছু সুবিধে হয় কি না।

তা সুবিধে হল বৈকি! সাহুকর তাকে এমন ভোজ খাওয়ালেন যে তিনদিন ঢেঁকুর তুললো কতোয়াল। তারপর ভেট। দিনে দু'বেলা ভেট যেতে লাগল কতোয়ালের বাড়ি। কতোয়াল তো আনন্দে আত্মহারা। বন্ধুত্ব পাতালো সাহুকরের সঙ্গে। গভীর আবেগের সঙ্গে জানালো, যতদিন বাঁচবে ততদিন সে সাহুকরকে ভুলবে না; আর, সাহুকরের যদি দৈবাৎ কোন দুঃসময় আসে তা হলে কতোয়াল নিজের জীবন দিয়েও সাহুকরকে সাহায্য করবে।

বলা বাহুল্য, বীরবলই সাহুকর সেজে মালয়দ-রাজ্যে এসেছিলেন।

কতোয়াল একদিন জিজ্ঞাসা করলে—"বন্ধু, গান-বাজনায় আপনার সখ নেই?"

নেই আবার! গানবাজনা পেলেতো সাহুকর আহার নিদ্রা ভুলে যান।

তাই নাকি! বলতে হয় এতদিন! কতোয়াল জলসার আয়োজন করলেন ঘরে। নগরের সেরা বাইজী এসে নাচগানের আসর বসালো।

তারী খুশী চেহারা বাইজীর। নাম রম্ভা। বীরবল বললেন, নামটি তার নাম। তার নাচ দেখে আর গান শুনে বীরবল তাকে সোনার হার বখশিস দিলেন। কিন্তু বখশিস ফিরিয়ে দিলে রম্ভা। বললে, সে যদি সারাজীবন সাহুকরের কাছে থাকবার অনুমতি পায় তাহলে সে আর কিছু চায় না। এই বলে রম্ভা বীরবলের পায়ের ওপর মাথা রেখে প্রণাম করলে। বীরবল বললেন—"সুন্দরী, তুমি আমার সঙ্গে জীবন কাটাতে চাও। আজ আমার সুখের দিন, কিন্তু যখন দুঃখের দিন আসবে তখনো কি থাকবে আমার পাশে। না, পালাবে?"

হাসল রম্ভা। এক লহমায় যে তার বিলাসবৈভব আর হাজার হাজার টাকা রোজগার ছেড়ে আসতে পারে তাকে পরীক্ষা করে দেখুন শেঠজী। বীরবল বললেন—"বেশ তাই হোক। দেশে ফেরবার সময় তোমায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব।"

রম্ভা বাড়ি ফিরে গেল। সেদিন থেকে বীরবল প্রত্যহ রম্ভার বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে লাগলেন।

* * * *

এদিকে সাহুকর অবিবাহিত জেনে তাঁর কতোয়াল বন্ধু তাঁর জন্যে পাত্রী খুঁজতে লাগল এবং সত্যি সত্যিই তাঁর জন্যে এক পাত্রী ঠিক করে ফেলল। কুলেশীলে বংশমর্যাদায় মেয়েটি বিশেষ গ্রহণ-যোগ্যা তাতে সন্দেহ নেই। তার ওপর অশেষ সৌন্দর্যবতী। নাম মনোরমা। বীরবল আপত্তি করলেন না। বিবাহ হয়ে গেল।

বিয়ের পর স্ত্রীকে ঘরে এনে তার স্বামীভক্তি আর মনের গতি পরীক্ষা ক'রে দেখবার জন্যে বীরবল অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করলেন। তার প্রতি অত্যন্ত অবহেলা দেখাতে লাগলেন এবং সময় সময় কঠোর ও নিষ্ঠুর আচরণ করতে লাগলেন।

তারপর একদিন তিনি এক বিষম কাণ্ড করলেন। বাজার থেকে একটা পাকা দুকালা তরমুজ কিনে তাকে একটা বড় রুমালে বেঁধে বাড়ি এসে ঘরের এক কোণে রাখলেন। তরমুজের রক্তের মত লাল রঙ রুমাল ভেদ করে বেরিয়ে পড়ছে। মনোরমাকে ডেকে বীরবল উত্তেজিত ত্রস্তভাবে বললেন—"দেখ, আমি এক ভয়ঙ্কর কাণ্ড করেছি। এখানকার এক রাজপুত্রের মাথা কেটে ফেলেছি। মাথাটা আমি সঙ্গে এনেছি! ঐ যে দেখ! মুণ্ডটাকে আমি বাক্সের মধ্যে বন্ধ করে রেখে যাচ্ছি। খবরদার, একথা কাউকে বলো না, তাহলে তোমার মাথাও কেটে ফেলবো। আমি এখন চললাম। রাত্রে ফিরবো। কালই আমরা এখান থেকে পালাবো।"

এই বলে বীরবল বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে মনোরমা মহা চীৎকার জুড়ে দিলে, পাষণ্ড সয়তান খুনে, সর্বনাশ করেছে। ডাক কতোয়ালকে। তার নির্দেশে একজন ভৃত্য গিয়ে কতোয়ালকে ডেকে নিয়ে এলো। তার কাছে কাঁদতে কাঁদতে মনোরমা জানাল যে কতোয়াল তাকে এক মহা দুর্বৃত্তের হাতে অর্পণ করেছে। মনোরমার প্রতি অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করে সে। শুধু তাই নয়, লোকটা এক সাংঘাতিক খুনে, এক রাজপুত্রের মাথা কেটে এনে বাক্সের মধ্যে রেখে গেছে। ঐ দেখ রক্তের দাগ।

মনোরমার কাহিনী শুনে কতোয়াল তো রেগে আগুন। তাহলে তার মনে মাঝে মাঝে যে-সন্দেহ জাগতো, তা মিথ্যে নয়, সাহুকর লোকটা আসলে একটা পাকা সয়তান! এমন মেয়ের প্রতি এই আচরণ! তার ওপর মানুষ খুন! সুতরাং তার শাস্তি অবধারিত।

ছুটে বেরিয়ে গেল কতোয়াল। তার আদেশে চারজন রক্ষকসাজ ছুটল সাহুকরের খোঁজে। এবং অনতিবিলম্বে তাঁকে ধরে নিয়ে এলো। তারপর সকলের সামনেই তাঁকে বেদম প্রহার করলে।

সকাতরে বীরবল কতোয়ালের উদ্দেশ্যে বললেন—"বন্ধু! শুধু শুধু আমার এমন অপমান আর মারধোর করছ কেন! আমি তো কিছু করিনি।"

কতোয়াল ভেঙিয়ে উঠল—"বন্ধু! সয়তান খুনে কোথাকার! চল, তোমায় মজা দেখাচ্ছি।"

বীরবলকে তারা রাজার কাছে নিয়ে গেল। কতোয়াল বললে—"প্রভু! এই বিদেশী লোকটা এক ভীষণ সয়তান। রাজকুমারকে হত্যা করে তার কাটামুণ্ড নিজের ঘরে লুকিয়ে রেখেছে আর পাছে তার স্ত্রী একথা ফাঁস করে দেয় সেজন্যে তাকে বিষম প্রহার করেছে।"

রাজা তো কতোয়ালের কথা শুনেই এক নিমেষে ক্ষেপে গেলেন। বললেন, "লোকটাকে, এই দণ্ডে শূলে দাও। নিয়ে যাও বধ্যভূমিতে। এখনি।"

একদল প্রহরী অতঃপর বীরবলকে মশানে নিয়ে চলল। কতোয়াল তাদের পুরোভাগে।

বীরবলের ভৃত্য পথে দাঁড়িয়েছিল। তাকে কাছে ডেকে তিনি বললেন—"শিগগির বাড়ি যাও। মনোরমাকে এই দুঃসংবাদের কথা বলো। বলো যে আমি মরতে চলেছি। সে কি উত্তর দেয় দেখে এসো।"

ভৃত্য ঊর্ধ্বশ্বাসে মনোরমার কাছে গিয়ে বীরবলের কথা জানালো। শুনে মনোরমা একটুও দুঃখিত বা বিচলিত হলনা। বললে—"ঠিক হয়েছে। যেমন কুকুর তেমনি মুগুর। মরুক সে।"

ভৃত্য ফিরে এসে মনোরমার জবাব বীরবলকে জানালো। বীরবল তাকে বললেন—"এইবার ছুটে চলে যাও রত্নার বাড়ি। তাকে এই সংবাদ দাও।"

ভৃত্য আদেশ পালন করতে দৌড়ল। বীরবল তখন অনুনয় করে কতোয়ালকে বললেন যে তাঁকে যেন রত্নার বাড়ির সামনে দিয়ে মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। রত্নাকে তিনি একবার শেষ দেখা দেখতে চান।

কতোয়াল বললে—"আচ্ছা, তা হ'তে পারে।"

হাতে হাতকড়া কোমরে দড়ি বাঁধা অবস্থায় বীরবল রত্নার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন। রত্না অলিন্দে দাঁড়িয়ে অধীর উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করছিল। ছুটে নীচে নেমে এল। বীরবলের অবস্থা দেখে কেঁদেকেটে আকুল হল। তারপর কতোয়ালের মুখে ঘটনা শুনে তাকে একান্তে ডেকে নিয়ে রত্না তার কণ্ঠের বহুমূল্য রত্নহার খুলে কতোয়ালের হাতে গুঁজে দিয়ে বললে—"এর দাম পাঁচ হাজার টাকার কম নয়। আপনাকে দিলাম। আপনাকে আরও পাঁচ হাজার দেব। দয়া করে ঘণ্টা-খানেক অপেক্ষা করুন। আমি রাজার কাছে ওঁর প্রাণ ভিক্ষা করতে যাব। যতক্ষণ না ফিরি ওঁকে মশানে নিয়ে যাবেন না।"

মোটা ঘুষ হাতে পেয়ে এবং আরও পাবার আশায় কতোয়ালের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হাত কচলে বললে—"তোমার হুকুম কি ফেলতে পারি রত্না! আমরা এখানেই অপেক্ষা করে রইলাম। তুমি চটপট ফিরে এসো।"

"যাব, আর আসব।" বলে রত্না তার বাড়ির মধ্যে গেল। মহার্ঘ এবং আবেদনময় পরিচ্ছদে নিজের অঙ্গ আচ্ছাদিত করলে। প্রসাধন করলে পরিপাটিরূপে। আয়ত দুই চোখে কাজলের দীর্ঘ রেখা টেনে দিলে। তাম্বূলরাগে রঞ্জিত করলে অধরোষ্ঠ। সর্বাঙ্গে কস্তুরি নির্যাস সিঞ্চিত করলে।

মনোমোহিনী বেশে রত্না পৌঁছলো রাজার কাছে। বাইজী এসেছে শুনে রাজা উচ্চকিত হলেন। রত্নাকে দেখে মুহূর্তে মুগ্ধ বিগলিত হলেন। বিলোল কটাক্ষে রাজার দিকে তাকিয়ে রত্না তার দেহলতা এলিয়ে রাজাকে প্রণাম করলে। বিচিত্র ভঙ্গীতে হাঁটু গেড়ে বসে বললে—"মহারাজ রাজাধিরাজ। দাসীর প্রার্থনা আছে।"

মালয়ল-রাজ তখন প্রায় বেসামাল। বললেন—"কি চাই বল। তোমার প্রার্থনা অপূর্ণ থাকবে না।"

রত্না বললে—"মহারাজ, এদেশে এক সাহুকর এসে বাস করছিল কিছুদিন। কতোয়ালের অভিযোগে আপনি তাকে শূলে চড়াবার হুকুম দিয়েছেন। লোকটা যদিও অপরাধী, তাহলেও সে আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়। তার মৃত্যু ঘটলে দারুণ ব্যথা পাব। তাই প্রার্থনা, এযাত্রা তাকে নিষ্কৃতি দিয়ে রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত করে দিন। আমি আপনার চিরকালের কেনা-বাঁদী হোয়ে থাকবো মহারাজ, যখন যা হুকুম করবেন হাসিমুখে তা পালন করব।"

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন মালয়-রাজ। রত্নার লীলায়িত যৌবনোৎফুল্ল তনুলতা তাঁর পায়ের কাছে। সেদিকে তাকিয়ে বললেন—"তোমার কথা মিথ্যে হবে না তো। যখন যা হুকুম করব…।"

মাথা হেলিয়ে রত্না বললে—"তাই পালন করব! আমার কথা কখনো মিথ্যে হবে না, মহারাজ।"

তখন নির্বোধ রাজা একজন অমাত্যকে যথাযথ আদেশ দিয়ে পাঠালেন। রত্নাও সঙ্গে গেল। অবিলম্বে বীরবল মুক্তি পেলেন। রত্না বীরবলের দু হাত ধরে বললে—"এখন চলুন আমার ঘরে। বিশ্রাম করবেন। অনেক কষ্ট হয়েছে আপনার।"

রত্নার বাড়িতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে, তার সঙ্গে নানা সলাপরামর্শ করে বীরবল সেই দিনই মালয়ল ছেড়ে দিল্লী অভিমুখে রওনা হলেন।

যথাসময়ে রাজধানীতে পৌঁছে সম্রাট সকাশে হাজির হয়ে বীরবল জানালেন, মালয়ল-রাজ যে চারটে জিনিষ চেয়েছেন তা সংগ্রহ করেছেন তিনি।

সংবাদ শুনে সম্রাট আকবর মহাখুসি। বললেন—"কোথায় সেই চার দুর্লভ বস্তু। দেখি।"

বীরবল বললেন—"তারা মালয়ল-রাজের রাজধানীতেই আছে সম্রাট। আপনি আমায় এক পরিচয়পত্র দিয়ে দিন আর তাতে জানিয়ে দিন যে আমি তাঁর প্রার্থিত জিনিষগুলি তাঁকে অর্পণ করবার জন্যে আপনার প্রতিনিধি স্বরূপ তাঁর কাছে যাচ্ছি।"

পত্র লিখে দিলেন আকবর। সেই পত্র এবং সঙ্গে বহু লোকলস্কর নিয়ে মহা আড়ম্বরে বীরবল মালয়ল-রাজ্যে পৌঁছে লোক মারফৎ রাজার কাছে খবর পাঠালেন যে সম্রাট আকবরকে লেখা তাঁর পত্র অনুযায়ী সম্রাটের প্রতিনিধি প্রার্থিত জিনিষ চারটি মহামান্য মালয়ল-অধিপতিকে অর্পণ করতে এসেছেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজসভায় তাঁর ডাক পড়ল। পরিচয়লিপি পড়ে মালয়ল-রাজ বললেন—"আপনারই নাম বীরবল, আমি আপনার নাম শুনেছি। এখন, কই, কোথায় আমার প্রার্থিত জিনিষ?"

সকলে বীরবলের দিকে চেয়ে আছে। অদূরে সহর-কতোয়াল বসে রয়েছে। তাঁর মুখে নিদারুণ বিস্ময়।

রাজার কথার উত্তরে মাথা নুইয়ে বীরবল বললেন—"এখনি হাজির করছি মহারাজ।" এই বলে তিনি তাঁর সেই পুরাতন ভৃত্যটিকে ডেকে তাকে রত্না ও মনোরমার কাছে পাঠালেন, বলে দিলেন, তারা যেন এখনি রাজসভায় হাজির হয়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রত্না আর মনোরমা রাজসভায় উপস্থিত হল। চারিদিকে কৌতূহল ও বিস্ময়। এ তো সেই সাহুকর যে শূলে যেতে যেতে বেঁচে গিয়েছিল।

চারিদিকে বারেক চোখ বুলিয়ে নিয়ে বীরবল বলতে আরম্ভ করলেন—"মহানুভব মালয়ল-রাজ! আমি মাত্র কয়েকদিন আগে এক সাহুকর রূপে আপনার রাজ্যে এসে কিছুদিন ছিলাম। সেই সময় সহর-কতোয়ালের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়। এবং তারই পরামর্শে আমি মনোরমা নামে এই মেয়েটিকে বিবাহ করি। মনোরমা আমার প্রতি কতখানি অনুরাগী, তার স্বামীভক্তি কতখানি গভীর তা যাচাই করে দেখবার জন্যে আমি একদিন একটা পাকা তরমুজ রুমালে বেঁধে বাড়ি এনে মনোরমাকে দেখিয়ে বলি যে আমি রাজার ছেলের মাথা কেটে এনেছি, কাটা মাথাটাকে আমি বাক্সর মধ্যে রাখছি, এবং একথা যেন মনোরমা ঘুণাক্ষরে কারুর কাছে প্রকাশ না করে। এই বলে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাই। সঙ্গে সঙ্গে মনোরমা কতোয়ালকে ডেকে পাঠিয়ে আমায় ধরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে। তারপর আমার শূলের হুকুম হয়েছে শুনে সে আনন্দ প্রকাশ করে বলে যে বেশ হয়েছে, যেমন কুকুর তেমনি

মুক্তর। এই হল মনোরমার চরিত্র। এই তার স্বামীর প্রতি অনুরাগ! সুতরাং উচ্চ কুলে জন্ম হলেও সে নীচমনা। ঠিক নয় মহারাজ?"

মাথা নেড়ে মালয়ল-রাজ বললেন—"বহুৎ বহুৎ ঠিক। আমি সন্তুষ্ট। তারপর, দ্বিতীয় মানুষ কোথায়?"

বীরবল রত্নাকে দেখিয়ে বললেন—"এই যে মহারাজ, আপনার সামনে, এই মেয়েটি। যদিও এ একজন পেশাদার গায়িকা ও নর্তকী, হয়ত হীনবংশে এর জন্ম, তাহলেও এর মন উদার, অন্তঃকরণ মহৎ, ভালোবাসার মর্যাদা রাখতে জানে। রত্না কেমন করে আমার প্রাণ রক্ষা করেছে মহারাজ, তা আপনার অজানা নেই। সুতরাং নীচ কুলে জন্ম হলেও রত্না উচ্চমনা।"

রাজা বললেন—"আমি আপনার সঙ্গে একমত। তৃতীয় জিনিষ?"

বীরবল আঙুল দেখিয়ে বললেন—"ওই যে বসে আছে সহর-কতোয়াল। এই আপনার তৃতীয় প্রার্থিত বস্তু।"

বীরবলের কথা শুনে কতোয়াল লাফ দিয়ে উঠল—"কি! আমি রাস্তার কুকুর! এত বড় আস্পর্ধা।"

রাজা বললেন—"এ আপনি কি বলছেন, বীরবল শেঠ?"

বীরবল বললেন—"আমার কথা শুনুন মহারাজ! রাস্তার কুকুরের স্বভাবটা কিরকম? যখন যার কাছে খেতে পায় তখন তার খুব অনুগত, খেতে না দিলেই অন্যত্র চলে যাবে। তার মধ্যে ভক্তি বিশ্বাস আনুগত্য বা বন্ধুত্ব এসব কিছু নেই। এই কতোয়াল আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিল, বলেছিল, দুঃসময়ে সে আমার প্রাণরিক্ষে সাহায্য করবে। কিন্তু আমি বেকায়দায় পড়তেই সে আমাকে পরিত্যাগ করলে, শুধু তাই নয়, আমার কথা বিশ্বাস করলে না, তদন্ত করে দেখলে না যে সত্যিই আমি কাউকে খুন করেছি কিনা। অপরের কথা শুনেই আমার ওপর অকথ্য অত্যাচার করলে। বন্ধুর কি এই কাজ! তারপর রত্নার কাছে ঘুষ পেয়ে সে তার কর্তব্যে অবহেলা করলে, আমায় মশানে নিয়ে গেল না। এখন মহারাজ, এই লোকটার চরিত্র রাস্তার কুকুরের সামিল কিনা।"

একটু ভেবে মালয়ল-রাজ বললেন—"আপনার যুক্তি অকাট্য; এখন বলুন আমার চতুর্থ বস্তুটি কোথায়?"

বীরবল বললেন—"ভয়ে বলব, না, নির্ভয়ে বলব, নরনাথ?"

"নির্ভয়ে বলুন। এ বুদ্ধির পরীক্ষা! আপনার কোন ভয় নেই।"

হাত জোড় করে বীরবল বললেন—"এই বিশেষণটি আমি আপনার ওপরেই আরোপ করছি মহারাজ! ধৈর্য ধরে আমার বক্তব্য শুনুন। কতোয়ালের কথা শোনা মাত্রই আপনি আমার প্রতি মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিলেন। কতোয়ালের কথা কতখানি সত্যি তা পরীক্ষা করে দেখলেন না। একজন মানুষকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেবার আগে অনেক সাবধানতা অনেক বিচারের প্রয়োজন হয়। রাজা হচ্ছেন লোকপালক, তিনি হবেন সকলের প্রতি সমদর্শী, ন্যায় বিচারক এবং স্থিতবুদ্ধি। কিন্তু পরীক্ষায় তেমনতর সমদর্শিতা বা বুদ্ধি বিবেচনার পরিচয় আপনি দিতে পারেননি! বরং (খুবই দুঃখের সঙ্গে বলছি মহামহিম মহারাজ) নিতান্ত বুদ্ধিহীনের মতোই কাজ করলেন। তাই আমি আপনাকেই আপনার প্রার্থিত চতুর্থ বস্তুরূপে গণ্য করেছি। আমার অপরাধ মার্জনা করবেন।"

সভাস্থলে সূচিভেদ্য স্তব্ধতা। লোকটা বলে কি···

একটু থেমে বীরবল বললেন—"এখন, আমি যখন আপনার প্রাপ্তির চাহিদা জিনিষই আপনার কাছে হাজির করে দিয়েছি এখন দয়া করে তাদের প্রাপ্তি স্বীকার করে একটি লিপি দিন। সেই লিপি আমি সম্রাট আকবরের কাছে পেশ করব।"

সিংহাসন থেকে নেমে এসে মালবল-রাজ বীরবলকে আলিঙ্গন করে বললেন—"বুদ্ধির যুদ্ধে আমার শোচনীয় পরাজয় ঘটলেও আপনার সঙ্গে পরিচয় করে আমি ধন্য হলাম। আপনি আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়েছেন। দয়া করে কয়েকদিনের জন্যে আমার আতিথ্য গ্রহণ করুন।"

কয়েকদিন মালবল-রাজ্যে থেকে বীরবল তাঁর দুই স্ত্রী নিয়ে দিল্লী ফিরলেন। বলা প্রয়োজন ভবিষ্যৎ জীবনে মনোরমা অতি সুগৃহিণীরূপে বিশেষ ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে সপত্নীসহ বীরবলের পরিচালনা করেছিল। আর সম্রাট আকবর বীরবলের এই কৃতিত্বে এক বিরাট ভোজসভার আয়োজন করে তাঁকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেছিলেন। (আগামী সংখ্যায় আরও কাহিনী)

বাঙলায় তখন নবজাগরণের যুগ। বাংলার এক প্রধান কবি গোপনে তার নিজস্ব একটি নাটক অনুবাদের। একজন তাঁর সামনে পড়ে গেল আর তিনি অবিরাম গতিতে তার ইংরেজী অনুবাদ করে চললেন। এক রাত্রির মধ্যে কাজ শেষ হয়ে গেল।

হয়তো এ ইতিহাসের মধ্যে অতিশয়োক্তি আছে; তবু বিনা পারিশ্রমিকে দেশ-প্রেমিক কবির সাধনাই এতে বড় হয়ে উঠেছে।

পুস্তক প্রকাশিত হোল। দেশ ব্যাপী দারুণ উত্তেজনা। প্রকাশক অভিযুক্ত হলেন রাজদ্বারে। তাঁর জরিমানা হোলো এক হাজার টাকা, সেই সঙ্গে এক মাস কারাবাস।

বাঙালীর আর এক বরেণ্য সন্তান আদালতে জরিমানার টাকা গুণলেন।

কালীপ্রসন্ন টাকা দিয়েছিলেন দেশকে ভালবেসে আর যিনি অনুবাদ করেছিলেন সেই কবি শ্রীমধুসূদনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে।

বিশ্বসাহিত্যে এমন গ্রন্থ খুব কম আছে যা নীল দর্পণের মত ইতিহাস রচনা করেছে।

সাহিত্য ও সাহিত্যিক

হেইনরিখ হাইনে

(১৭৯৭—১৮৫৬)

সমীর কুমার গুপ্ত

হেইনরিখ হাইনে য়ুরোপীয় সাহিত্যের একটি অবিস্মরণীয় নাম। সময়ের সিন্ধুতে তাঁর মাত্র ৫৯ বছর জীবন উজ্জ্বল আলোকের একটি অনন্ত বিন্দু। দুর্গমের মধ্যে, গভীরের মধ্যে, মন্দভালোর দ্বন্দ্ববিরোধে, চিন্তায়, সাধনায়, আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত অপরাজেয় এই কবি সারা য়ুরোপীয় সাহিত্যে অবিচ্ছিন্ন সুরের একটি নদীর মতো প্রবাহমান। তার তরঙ্গে তরঙ্গে বিষ আর অমৃতের আমন্ত্রণ, বেদনা ও ব্যর্থতার জ্বালা। গীতিকবিতার অপূর্ব সুরমূর্ছনায় হাইনের কাব্য অনুরণিত এবং তিনি একই সঙ্গে জার্মান কবিতার ইতিহাসে প্রাচীন ঐতিহ্যের অম্লান সাক্ষী এবং নূতনের অগ্রদূত।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং জার্মানী য়ুরোপীয় কাব্যাকাশের তিনটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। কাব্যলক্ষ্মীর স্বর্ণমুকুট এক এক দশকে এই তিন দেশের এক এক জন অসামান্য প্রতিভাধর কবির মাথায় উঠেছে। অথচ লক্ষণীয় যে এই তিন দেশের কবিতার ঐতিহ্য এবং ধারা পৃথকভাবে গড়ে উঠেছে। আবার কবিতার কাল, সন্দ, সুর ও ধর্ম ভাবজগতে পরস্পরকে প্রভাবিত করে বিশেষ মূর্তিতে রোমান্টিসিজমকে প্রকাশ করেছে। জার্মানীতে উচ্চশ্রেণীর গীতিকবিতা অধিকাংশই লেখা হয়েছে গোধূলির মাধুর্য, রাত্রির অন্ধকার, অগাধ মানসিক শান্তি, মৃত্যু ও ভগবানকে কেন্দ্র করে। ফরাসী ও ইংরেজী গীতি কবিতায় প্রেম ও প্রকৃতির প্রভাব বেশী। জার্মান কবিতা য়ুরোপে সর্বপ্রথম ছড়িয়ে পড়ে জার্মান সঙ্গীতের মাধ্যমে। বিটোফেন, সুবার্ট, সুম্যান, ব্রাহমস্, এবং উলফ প্রভৃতি সঙ্গীতজ্ঞরা ক্লপস্টক, গ্যেটে, শিলার, হাইনে, মরিশ্ এবং আইসেনডর্ফের গীতিকবিতাকে সুরের তন্ত্রীতে বেঁধে ফেলেন এবং সারা য়ুরোপে ছড়িয়ে দেন। বৈষ্ণব-কবিতার মতো জার্মাণ গীতিকবিতাও জার্মাণ সঙ্গীতের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত ছিল। ক্রমে ক্রমে কবিতার পালাবদল সুরু হয়। হাইনের জীবন ও কবিতাকে উপলব্ধি করতে গিয়ে জার্মাণ কবিতার এই যুগপরিবর্তনের সঙ্গে কিছুটা পরিচয় থাকা প্রয়োজন। বস্তুত জার্মানীতে ষোড়শ শতাব্দীতে শিভ্যালরির উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম রোমান্টিক কবিতা লেখা সুরু হয়। নেবেলুঙ্গের গাথা এই সময়ে রচিত। দীর্ঘকাল ধরে এই বীরত্বব্যঞ্জক রোমান্টিক কবিতার ধারা প্রবাহিত থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এসে শিভ্যালরির জীবনাগত আদর্শ বাস্তবতার অভাবে শুকিয়ে যায় এবং তা তীব্র ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের আঘাতে ভেঙে পড়ে। এই যুগ জার্মাণ রোমান্টিক কবিতার একটি বিশেষ পরিবর্তনের যুগ। গীতি-কবিতার দিগন্ত বিস্তৃত হয়ে রহস্যবাদকে আশ্রয় করে। ক্রমে ক্রমে ধর্মীয় পবিত্রতা, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক জীবনের তন্ময়তাপূর্ণ সুর জার্মাণ গীতিকবিতার অন্তরে প্রবেশ করে। মার্টিন

লুথারের বাইবেলের অনুবাদ জার্মান কবিতার একটি বিশিষ্ট ঘটনা। একে কেন্দ্র করে যে প্রোটেস্টাণ্ট স্তোত্র রচিত হয় তা ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে য়ুরোপীয় সাহিত্যে একটি বিরাট অবদান স্বরূপ। এরপর জন ক্রিশ্চিয়ান গান্থার কবিতার চিরাচরিত ঘরানাগুলোকে ভেঙে প্রথম আত্মকেন্দ্রিক কবিতা লেখেন। এই আত্মকেন্দ্রিক কবিতার ভেতর দিয়ে "The true voice of feeling", "the unaffected language of the heart" প্রথম প্রকাশ পায় এবং ক্রমশ গভীরতার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ক্লপস্টক এই ঐতিহ্যে বেড়ে ওঠেন এবং তরুণ গোটে, হোলটি, বার্গার, টিল, লেনজ প্রভৃতি কবিরা তাদের কাব্যসম্ভার সাজাতে থাকেন। তারপর সুরু হয় ফরাসীবিপ্লব ও নেপোলিয়নের যুদ্ধ যা সমগ্র য়ুরোপ ও জার্মাণীর সামাজিক ও ভাবজগতে নিয়ে আসে বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এই বিপ্লব হাইনেকে আপ্লাবিত করে তোলে নতুন পৃথিবী সম্পর্কে। তাঁর ধ্যান, ধারণা ও বিশ্বাস নবমূর্তি লাভ করে। মানবতার মুক্তির পূজারী হাইনে হয়ে ওঠেন সর্বজাতির সর্বমানুষের শ্রদ্ধার পুরুষ।

গোটে, শিলার, হোল্ডারলিন, ব্রিনকে, হার্ডার এরা সকলেই জার্মাণীর তথা য়ুরোপের প্রিয় এবং পরিচিত কবি। কিন্তু হাইনে সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যে, যন্ত্রণার অভিব্যক্তিতে এবং সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়বিলাস ও সূক্ষ্ম ভাবময়তার সংমিশ্রণে গোটের পর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কবি। হাইনে মূলত প্রেমের কবি এবং জার্মাণ গীতিকবিতা তাঁর হাতে সম্ভবত চরম উৎকর্ষে উপনীত হয়। তাঁর জীবনদর্শন এই প্রেমকে তিক্ততা ও বঞ্চনার কষ্টপাথরে যাচাই করে এক নূতন উপলব্ধিতে উন্নীত করেছে। বিদ্রূপ এবং ব্যঙ্গও হাইনের কবিতার আর একটি মূল সুর। জীবনের বিষ এবং অমৃতকে সমানভাবে আহরণ করে তিনি সম্পূর্ণ এবং তাঁর স্বচ্ছ ভাবসত্তার দৃষ্টিতে জগত এবং জীবন নতুন মহিমায় প্রতিফলিত। প্রসিদ্ধ কবি ও সমালোচক ম্যাথুআর্নল্ড মন্তব্য করেছেন, মানুষের নির্বুদ্ধিতা, দম্ভ, মিথ্যাচার প্রভৃতি দেখে বিধাতার মুখে যে বিদ্রূপ-তিক্ত হাসি ফুটে উঠল তার নাম হাইনরিখ হাইনে। জার্মাণ কবিতা তার দ্বাদশ শতাব্দীর গীতিময়তা থেকে আরম্ভ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত তার সমস্ত আত্মকেন্দ্রিকতা, ভাবৈশ্বর্য, সূক্ষ্ম বিচারবোধ, বিশ্লেষণ এবং বিশ্বাস নিয়ে হাইনের কবিতায় পরিণতি লাভ করে। তাঁর কোথায়? (Wo?) কবিতা একটি অমর সৃষ্টি। বিশ্বসাহিত্যে খুব অল্প কবিতাই এমন যন্ত্রণা ও জীবনবোধের আলোয় উজ্জ্বল। দি লোরেলি (Die Lorelei), নির্বাসনে (In der Ememde), মরফিনি (Morphine), বিদায়বেলায় (Der Scheidende) প্রভৃতি এক একটি অপূর্ব কবিতা। 'য়ুথডার সিডার' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি জার্মাণীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে স্বীকৃতি পান। য়ুরিসিক ইন্টার, মেংসো, রাইজেবিল্ডার, ডের রাব্বিনার, আটাট্রল, রোমানজারো প্রভৃতি তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ। গদ্য রচনাতেও হাইনে ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

জার্মাণীর অন্তর্গত ডুসেলডর্ফে ইংরেজী ১৩ই ডিসেম্বর ১৭৯৭ সালে হাইনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা স্যামসন হাইনে ছিলেন একজন ব্যবসায়ী এবং তাঁর জননীর নাম বেটী হাইনে। ছেলেবেলায় নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্যে একবার স্বেচ্ছাসৈনিক হিসেবে নাম লেখান। কিন্তু তিনি যুদ্ধে যাননি। হামবুর্গে ধনী খুড়ো সলোমানের কাছে ছিলেন ব্যবসা শিখতে। সেখানে তিনি খুড়তুতো বোন আমেলিয়াকে দেখে মুগ্ধ হন। এরপর হাইনে বন বিশ্ববিদ্যালয়

থেকে আইনের উপাধি লাভ করেন। তিনি পূর্বে ধর্মে ছিলেন ইহুদী এবং এখানে তিনি খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। ব্যবসা, প্রেম, ওকালতি কোনটাতেই হাইনে জীবনে সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। তিনি বারে বারে পরাজিত হয়েছেন। কিন্তু এই পরাজয় এবং ব্যর্থতা কবির মহাজীবন এবং মহাপৃথিবীর দরজা খুলে দিয়েছে। যে অতুলনীয় কাব্যের স্রোত তিনি বইতে দিয়েছেন তার উৎসমুখে ছিল এই ব্যর্থতার জ্বালা ও পরাজয়ের লজ্জা। ১৮৩৪ সালে ফ্রান্সে ম্যাথিল্ডা নামে এক সুন্দরী ফরাসিনীকে তিনি বিবাহ করেন। এই ভদ্রমহিলা কবির প্রতিভা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। ১৮৪৮ সাল থেকে তিনি মেরুদণ্ডের পীড়ায় রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায় দিন কাটান। ১৮৫৬ সালে হাইনে মারা যান প্যারিসে। রোগ তাঁর উদ্যমকে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি এবং জীবনের শেষ পাঁচ বছরে তিনি তাঁর গভীরতম সৃষ্টির ফসল ফলিয়ে যান।

জার্মাণ কবিদের মধ্যে হাইনে বাঙালী পাঠকের কাছে সর্বাপেক্ষা পরিচিত ও অনূদিত কবি। রবীন্দ্রনাথই প্রথম হাইনেকে আমাদের দেশে পরিচয় করিয়ে দেন। সাধনা পত্রিকায় তিনি কবির ন'টি গীতিকবিতার অনুবাদ প্রকাশ করেন। তারপর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচি, মোহিতলাল মজুমদার প্রভৃতিরা এগিয়ে আসেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রিয় কবি ছিলেন হাইনে। সাম্প্রতিক কালের কবিদের মধ্যে তিনি ও বিষ্ণু দে হাইনের গীতি কবিতার অনুবাদে অগ্রণী। শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় সম্প্রতি হাইনের একটি অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সৌমেন্দ্রনাথ নিজেও কয়েকটি কবিতা অনুবাদ করেছেন। বাংলাদেশ আজও কবিতায় দেশ এবং শিল্পে ও বিজ্ঞানে যথেষ্ট উন্নতি করা সত্ত্বেও জার্মাণীর প্রধান পরিচয় তার কাব্যে। জার্মাণদের সঙ্গে ভারতীয়দের ভাবগত মিল খুব বেশী। জার্মাণ দার্শনিকেরা ভারতীয় দর্শনে গভীর বিশ্বাসী। বেদ, উপনিষদ তাদের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছে। ফরাসী কবি বোদলেয়রের মত হাইনে আধুনিক চিন্তাধারা ও একশ্রেণীর বাংলা কবিতাকে প্রভাবিত করতে পারেন নি বা ইংরাজ কবিদের মত বাঙালী কবিদের উপর সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হননি সত্য কিন্তু তাঁর কাব্যের গীতিময়তা, সৌন্দর্য ও সত্যের উজ্জ্বল স্পর্শ সকলকে মুগ্ধ করেছে। হাইনে গভীরভাবে ভালবেসেছিলেন আমাদের সনাতন ভারতবর্ষকে। হাইনের রোমান্টিক মন, ভারতের দর্শন ও কাব্যে গভীর জ্ঞান এবং কবিতায় ভারতীয় প্রতীক ও চিত্রকল্পের ব্যবহার, পৌরাণিক কাহিনী ও বীরচরিত্রের ঘন ঘন উচ্চারণ আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। অধ্যাপক লেসেনের সংস্পর্শেই ভারতবর্ষ সম্পর্কে তিনি অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠেন। ভারতের অরণ্য, প্রান্তর, তরঙ্গশোভিতা দিগন্তপ্রবাহিনী গঙ্গা, তুষাররাজ দেবতাত্মা হিমালয়ের ডাক তিনি বহুদূর থেকে কান পেতে শুনেছিলেন এবং তিনি তাঁর কাব্যে এদের অমর করে রেখে গেছেন। অমরায় এই কবি আমাদের অন্তরের গভীর স্নেহ, ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা নিয়ে একান্ত আপনজনের মত ঘুরঘুরান্ত ধরে বেঁচে থাকবেন। এইসব কবি এবং দার্শনিকের ভেতর দিয়ে আমরা জার্মাণ জাতি ও দেশকে চিনেছি, ভালবেসেছি।

নির্বাসনে

হেইনরিখ হাইনে

একদা আমার নিজেরি একটি ছিল মনোরম দেশ,
সেখানে আরামে কাটত আমার দিন ;
সেখানে দীর্ঘ ওক, মৃদু ডাক দিত ভায়োলেট।
এ ছিল স্বপ্নে লীন।

খেয়েছিল চুমা আমাকে আর বলেছিল আমাকে,
(বিশ্বাস করা কঠিন তা ভালো করে
শুনিয়েছে কানে) 'ভালোবাসি আমি তোমাকেই' কথা কটি।
এ ছিল স্বপ্নসত।

অনুবাদক—সুশীল কুমার গুপ্ত

যে সুন্দর, তাকেই ডাকি ; যে ভালো, তাকেই ডাকি। যে আমার ডাক শুনে, তাকেই ডাকি! এই যে আশ্চর্য ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, বিস্মিত হইয়া আছি, ইহাকেই ডাকি। এই অনন্ত সুন্দর জগৎ শরীরে যিনি আত্মা, তাঁহাকে ডাকি ; আমিও ডাকি, তুইও ডাকিস। জানিয়া ডাকি, না জানিয়া ডাকি, সমান কথা। তুইও কিছু জানিস না, আমিও জানি না ; তোরও ডাক পৌঁছিলে আমারও ডাক পৌঁছিবে। যদি সর্বশব্দগ্রাহী কোন কর্ণ থাকে, তবে তোর ডাক পৌঁছিবে না কেন? আয় ভাই, একবার মিলে মিশে দুইজনে পঞ্চম স্বরে ডাকি।

—বঙ্কিমচন্দ্র

কালব্যতিক্রম

পবিত্র পাল

বুদ্ধি, চিন্তা যখন পণ্যে পরিণত হয়, তখন আমাদের সমগ্র অস্তিত্ব জুড়ে মূলতঃ ভয় করে। তখন 'মূল্যবোধ' বলে কোন শব্দের জন্ম ঘটে, 'নৈতিক অধঃপতন' সেখানে স্থান গ্রহণ করে। যখন বুদ্ধি এবং চিন্তা মননশীলতার সঙ্গে কোন সংযোগ রক্ষা করে চলতে পারে না, তখনই নৈতিক অধঃপতন অনিবার্য। প্রতিরোধ-ক্ষমতার মধ্যে যারা শুধু সংখ্যাতত্ত্বের সন্ধান করেন এবং যারা মনে করতে অভ্যস্ত যে কোন ধরণের কৌশল অবলম্বনে প্রতিরোধ-ক্ষমতা বাড়ে, বিংশ শতাব্দীতে তাদের মানায় না। মধ্যযুগের কোন এক বিস্মৃত দুর্গের দেয়ালের গায়ে তাদের লেপ্টে রাখলে যথোচিত কাজ হয়।

এ কথাটাই বার বার মনে হয়েছে, বঙ্গসন্তান তথাকথিত একশ্রেণীর ঝাঁকিবাজ সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের কার্যাবলী দেখে। আমার পাড়ার যে রকবাজ ছেলেটি সম্প্রতি সচেতন হয়ে উঠেছে এবং বুঝতে পেরেছে মাংসপেশীর আস্ফোলনে এবং মুখচোখের অভিব্যক্তিতে জানোয়ারসুলভ আকৃতি ফুটাতে পারলে চীনকে হটান সম্ভব, বিভিন্ন সভাসমিতি এবং পথপরিক্রমাতে তাদের দেখে সে-ছেলেটির সঙ্গে আমি এক করে ফেলি। অথচ এঁরা জানেন না, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বঙ্গদেশ এমন ছিল না এবং এঁরা জানেন না, বিশ শতকে তাঁরা বাস করছেন।

বিশ শতকে রবীন্দ্রনাথের সত্যসাধনা, গান্ধীজীর অহিংসা আন্দোলন এবং শ্রীনেহরুর জোটনিরপেক্ষ নীতি প্রভৃতির পরীক্ষানিরীক্ষায় মানবেতিহাসে এক বিশেষ মূল্যবোধের জন্ম নিয়েছে। প্রতিরোধ করবার শক্তি আমরা এ তিনটির মধ্যেই পাই। এ বিশেষ মূল্যবোধ নৈতিক স্বাস্থ্যটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। এ স্বাস্থ্যটি সমগ্র মানব সমাজের ঘাড়ে বর্তিয়েছে, কেননা সুস্থ এবং সুখী মানবসমাজের ভিত্তিই হ'ল এই।

যারা মনে করেন, নৈতিক স্বাস্থ্য প্রভৃতি সব ভুয়া কথা, 'নৈতিক স্বাস্থ্য' শব্দটি জিরো মার্ক পেয়েছে বলে ইদানীং গগণ ফাটাচ্ছেন, তারা অন্ত কতগুলো বুধ যারা নির্বোধ, যারা ইতিহাস-জ্ঞানশূন্য এবং যারা রাষ্ট্রনীতি থেকে মানবনীতিকে অপসৃত করে সেখানে যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে বিরস্ত্র করতে চান, তারা জানেন না, নৈতিক শক্তি শ্রীনেহরুর জোটনিরপেক্ষ নীতির বড় শক্তি বলেই চীনকে পিছিয়ে যেতে হয়েছে। মার্কিন-বৃটিশ অস্ত্রশস্ত্র এসেছে বলে চীন সরেনি। কেন না, অধীচীন এটাকে মোটেই ভয় পায় না।

সম্প্রতি 'ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস' পত্রিকায় জ্যাক বোরেস লিখেছেন,—'But, it is of our younger generations we must think to-day. To imbibe in them the same namby-pamby nonsense of non-violence, of peaceful co-existence and of the virtue of refusing to enter into defence arrangements and instead hug the illusion of non-alignment is to condemn the India of to-morrow to the costly follies of today. এ ভদ্রলোকটির সাংবাদিক খ্যাতি বিস্তর। তিনি স্বভাবতই সে-শ্রেণীর প্রতিনিধি, যে-শ্রেণী বসি-কৌশিকের অভিধানে জনসাধারণের

নেতৃত্ব দাবী করেন। তাঁরই ছেলে জনেছিলাম, বয়ঃসন্ধির ক্ষণে কিছু ইংরেজি কবিতা লিখে বৃটিশ উঠতি মোহেমিয়ানদের অন্তঃপুরে প্রবেশে সমর্থ হয়েছিল। কবি ডন মোরেস গোয়া-অভিযানে 'ভীষণ ক্রুদ্ধ' হয়ে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব গ্রহণে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

ক্র্যাক মোরেস-জাতীয় সাংবাদিক ও সাহিত্যিক বাংলাদেশেও সংখ্যায় কম নেই। এদের আমরা দেখেছি, কী পরিমাণ হীন এঁরা—কি বুদ্ধির ব্যাপারে, কি দূরদর্শিতার ব্যাপারে। আমি প্রাক-ভিক্টিম যুগের সেই শ্রেণীর একজন, ক্র্যাক মোরেস যাকে ইয়ংগার জেনারেশন বলেছেন। এই ইয়ংগার জেনারেশন তাঁর হীরের টুকরো ছেলে ডন মোরেসের জেনারেশন হতে নারাজ। এই জেনারেশনের ভবিষ্যত ক্র্যাক মোরেসরা যদি রচনা করতে চান, তবে এ স্বপ্নে বিভোর হতে তারা বিন্দুমাত্র রাজী নন। তিনি অহিংসা এবং ক্ষেটিনিরপেক্ষতাকে যে বঙ্কিম কটাক্ষে হীন করতে চেয়েছেন, সে দুটো নীতিতেই আমাদের ভবিষ্যত নিহিত। এই ভারতীয় সাংবাদিকরা আমাদের অত্যন্ত বেশি লজ্জিত করে তুলেন, যখন বিদেশের বিখ্যাত সাপ্তাহিক "দি নিউ স্টেইসম্যানের" প্রাধ্যমান সম্পাদক এবং বাংলাদেশের শতজনের কমিটির অন্যতম সভ্য কিংসলি মার্টিন দিল্লীর ইনটারন্যাশানাল সেন্টারে। সে সমস্ত নির্বোধ সাংবাদিকদের তিরস্কার করেন যারা চীনা-আক্রমণ প্রতিরোধ করতে গিয়ে উত্তেজনায় পিকিং এবং লাসা পর্যন্ত নজর ফেলতে চান।

বিশ শতকের শিক্ষা : জীবনের কাছে হত্যাকারীর বিরুদ্ধে, মানবমঙ্গলকারীর বিরুদ্ধে আবেদন জানাও। জীবন হল সত্য। সত্য হ'ল সৎ অসৎ মিলিয়ে তৈরী। অসৎকে ঠিক মত চিনে সৎকে তার বিরুদ্ধে জিতিয়ে দাও। অসতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ভুলপথে যেন চালিত না হয়। তাকে রুখতে গিয়ে সৎকে অসতের পথে নামিয়ে না আনি। অসৎ রাষ্ট্রকর্তার বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে দেশের জনসাধারণকে, তার সভ্যতা, সংস্কৃতিকে হেয় করে না তুলি। জ্ঞানের ভাণ্ডারে সত্যের আসন আধারে। অতএব সভ্যতা, সংস্কৃতি হতে পারে তা শত্রুর দেশের জনগণের জ্ঞানরূপে গ্রহণ করতে ভুলো না। শান্তির জন্যে শান্তির শত্রুর বিরুদ্ধে লড়। এমন ভাবে লড়বে শান্তির শত্রুকে বেশিদিন শত্রু থাকতে দেবে না। নিজের বলিষ্ঠ প্রেমের দ্বারা শান্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এটাই সে-জীবনের প্রতিষ্ঠা বহন করে, যে জীবন মানবতার দীপ্তিতে মনুষ্যত্বের অন্তর্লীন মাহাত্ম্যে উজ্জ্বল।

বিশ শতকের এই শিক্ষা যার মধ্যে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, মানবতন্ত্র প্রভৃতি শব্দের সমাবেশ ঘটেছে, আমাদের সামনে রাখতে পারলেই তবেই সময়োচিত কাজ বলে গণ্য হবে। অহিংসা কোনদিন দুর্বলের নীতি নয়। এই অহিংসার আলোতেই শান্তির কবুতর পৃথিবীর অগণিত সাধারণ নরনারীর জীবনে উড়ছে। সেজন্যেই নিউক্লিয়ার ওয়রের সূচনাযন্ত্রটি হাত থেকে ফসকাবার উপক্রম হওয়া সত্ত্বেও কেউ ছাড়ছেন না। কি কেনেডি, কি ক্রুশ্চেভ। কিউবাতে ক্রুশ্চেভ যা করলেন, বিশ শতকের শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞ বুদ্ধির পরিমণ্ডল তাঁর মাথায় ভর করেছিল। আর মাও সে তুং প্রমুখরা যা করলেন, তা বিশ শতকের মানুষের বুদ্ধির পরিচয় নয়ই, বরং বলা চলে, মধ্যযুগের এক উদ্ধত ব্যারণ যেন মত্ততায় উদ্‌ভ্রান্ত।

ক্র্যাক মোরেসরা যারা বন্-ভায়োলেন্স, নন-এলাইনমেন্টকে নন-সেন্সের অন্ধকূপে পুঁতে ফেলে ভবিষ্যত জেনারেশনের জন্য ক্রন্দন উপহার দেন, তাঁদেরকে আমরাই প্রাকভিক্টিমের যুবকেরা সতর্ক করে দিচ্ছি। তাঁদের সাথে সাথে যেন আমাদের তাঁরা ছ'শতক পিছনে না নিয়ে যান।

নাগাসাকি হিরোসিমার গহ্বরে যাঁদের জ্বালে হয়েছে তাঁদের অত সহজে আমরা মন থেকে মুছি নি। সাম্প্রদায়িকতার বলি হয়েছেন যাঁরা তাঁদের চোখের সামে নিশ্চিহ্ন হতে দেখেছি এবং সে-স্মৃতিও উজ্জ্বল। ধনিকতন্ত্রের শিকার হয়েছেন যে-সমস্ত সাধারণ নরনারী, তাঁদের ক্ষুধার্ত মুখ দেখেছি গতযুদ্ধে। আমরা হিংসা চাই না, মোরেস সাহেব।

চীনকে হটাব। তার শাস্তি আমাদের হাতেই হবে। সে-শাস্তি দু'রকম। এক, ৮ সেপ্টেম্বর থেকে পিছিয়ে যেতে হবে। আমাদের হিংসা সে সমস্ত সীমানালঙ্ঘনকারীদের তাড়াবার জন্য চালিত হবে। আমাদের হিংসা কমুনিস্টদের দেশের জনগণের বিরুদ্ধে নয়। শ্রীনেহরু এবং দার্শনিক রাষ্ট্রপতি বার বার একথা বলেছেন। দুই, নীতির লড়াইয়ে আমাদের জিততে হবে। ভারতবর্ষের মাটিতে পা রেখে ভারতবর্ষের আত্মিক শক্তিকে ভুলতে পারি না। এ শক্তির জোরে বিশ শতকেই রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী এবং বিনোবাজী তাঁদের মহান্ জীবনের ভিত্তি তৈরী করেছেন। রাষ্ট্রনীতিতে সুভাষচন্দ্র এ আত্মিক শক্তির সাধক হতে পেরেছিলেন বলেই সেদিন রাধাকৃষ্ণণ তাঁকে সন্ন্যাসী বলেছিলেন। বিরাট অনাসক্তির জন্য এক সময় রঁলাকে ভুল বুঝেছিলেন বারবুস, রলাঁবাদে কটাক্ষ করেছিলেন। রাষ্ট্রনীতিতে অনাসক্তির মূল্যবোধ প্রয়োগ করার মধ্যে ভারতের নীতি আছে। বিশ শতকে যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-দেশবিভাগ দারিদ্র্যে পর্যুদস্ত ভারতভূমি অনাসক্তির সাধনায় বলিষ্ঠতা আনতে পারছে না, কিন্তু জোটনিরপেক্ষ নীতি বেলগ্রেড নেতৃত্বে অনেকটা সে-সার্থকতা অর্জনে সমর্থ হয়েছে। এ অনাসক্তির অভাবেই রাষ্ট্রনীতিতে মাও সে তুংরা বা ম্যাকার্থীরা অ্যামিতিক নিয়মে মানুষের ভবিষ্যত চিত্র আঁকেন। নৈতিক শক্তি কোন অ্যামিতিক নিয়মের দাস ক্রীতদাস নয়। ভারতীয় বুদ্ধিজীবীগণ এক ফ্যাসিবাদী মাও-এর বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে আরেক ফ্যাসীবাদকে নিজেদের চরিত্রে প্রোথিত করছেন। এটা বিশ শতকের শিক্ষার বিরুদ্ধে। বিশ শতকের শিক্ষা, ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে কোন-ও পদ্ধতিতে তাকে ডেকে আনব না, তাকে ভিতরে বাইরে নিশ্চিহ্ন করব। সামরিক বেশে, স্বৈরাজকের বেশে, ধনতন্ত্রের বেশে, গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে, সমাজতন্ত্রের ছদ্মবেশে এ ফ্যাসীবাদ এসে আমাদের মাথা মুড়তে পারে।

বিশ শতক শিখিয়েছে, স্বদেশকে ভালবাসা, নিজেকে ভালবাসা সমস্ত মানব জাতির প্রতি ভালবাসায় রূপান্তরিত করতে হবে। সে হিসেবে সংগ্রামের পরিধি বিস্ময়কর বিস্তৃত। এ পরিপ্রেক্ষিতে চীনের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম চালাতে হবে।

আমরা প্রাক্তনিরিশের যুবকরা মোরেস সাহেবদের সাংবাদিকতায় বিশ্বাস করিনা, করতে চাই না। বিশ শতকে যেখানে এগিয়েছি, সেখান থেকে পিছিয়ে যেতে চাই না, বরঞ্চ এগিয়ে যেতে চাই। কালব্যতিক্রম আমাদের চিন্তার ভিতকে দুর্বল করে, এবিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকা দরকার হয়ে পড়েছে। আমাদের কম্যুনিষ্ট-সমর্থন, কম্যুনিষ্ট-বিরোধিতা, গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র প্রভৃতি সমস্ত মতামত সাম্যের দিকে লক্ষ্য স্থির করে চালাতে হবে। কালব্যতিক্রমের অন্ধ সরণি বেয়ে চিন্তাচর্চা পরিচালিত করলে সমূহ বিপদ। আমি সমস্ত মোরেস সাহেবদের উদ্দেশ্যে বাঙালী অবাঙালী, সাহিত্যিক সাংবাদিক সবার উদ্দেশ্যে এ বিষয় সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বনে অনুরোধ জানাচ্ছি। আর সে সঙ্গে প্রাক্তনিরিশ যুবক-বন্ধুদের কাছে নিবেদন করছি, বহু অভিজ্ঞতায়, বহু যন্ত্রণায় লব্ধ বিশ শতকের মূল্যবান শিক্ষাগুলোকে যেন আমরা কোন অবস্থাতেই লাঞ্ছিত হতে না দিই।

যুগ যুগ ধরে নেফা ভারতের অঙ্গ

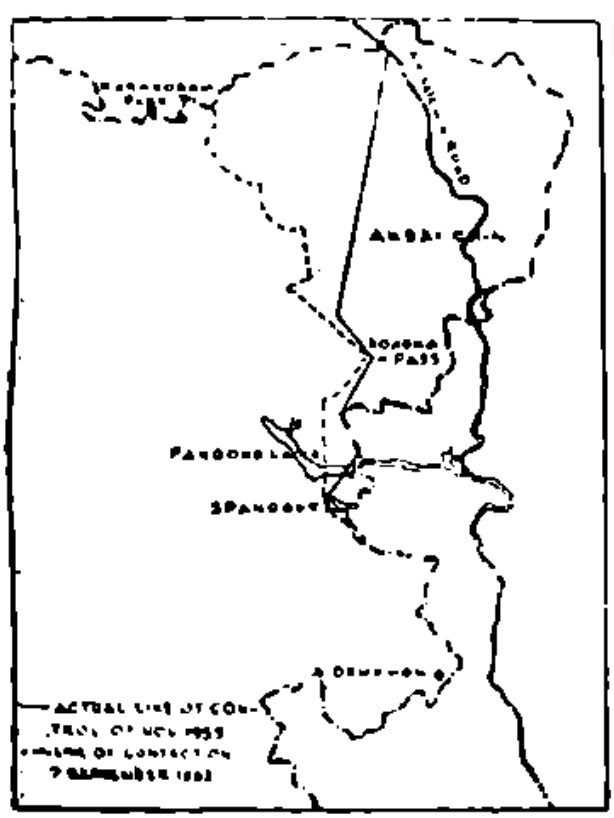

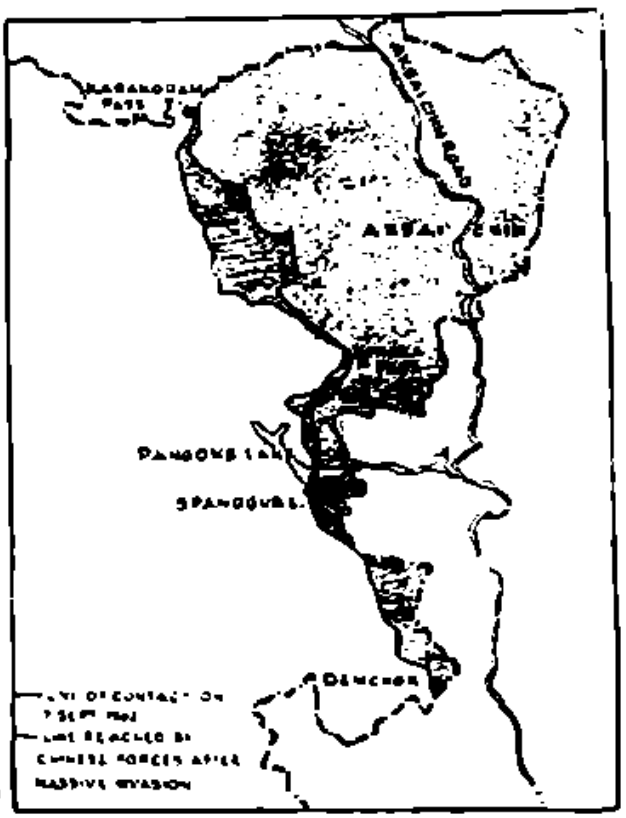

১৯৫৯এর নভেম্বর মাসে চীনের প্রকৃত সীমারেখা কেবল কতকগুলি চেকপোষ্ট। তারপর থেকে ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৬২ তারিখ পর্যন্ত চীনা সৈন্যবাহিনী বলপূর্বক এগিয়ে এসেছে, যে কোন প্রকারেই হোক তাদের ১৯৬০ সালে প্রকাশিত মানচিত্রের অংশ সমূহের দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করতে।

অন্যায়ভাবে লাডাকের এই অংশ ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৬২ তারিখের আগে পর্যন্ত চীন অধিকার করে। মোট আয়তন ১২,০০০ স্কোয়ার মাইল। তারপর সাম্প্রতিক আক্রমণে আরও কিছু অংশ অধিকার করে। চীনারা কিছু ভারতীয় আত্মরক্ষী ঘাঁটি সমূহও সাম্প্রতিক আক্রমণে বিধ্বস্ত করে।

চীন-ভারত পূর্ব সীমান্তে লাল চীন ৩০,০০০ বর্গ মাইলের উপর কর্তৃত্ব দাবি করছে। চীনের যুক্তি হল,—"বহুবার আমরা অকাট্য যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছি যে-আইনী ম্যাকমোহন লাইনের উত্তরে এই এলাকা অবস্থিত"। অথচ যুক্তিটা কি তা জানা যায় নি। শুধু বলা হয়েছে, "এই জায়গা আমাদের বলে জানি। এটাই যথেষ্ট প্রমাণ।"

কিন্তু অপরদিকে যুগ যুগ ধরে প্রশাসনিক কর্তৃত্ব, চুক্তি, চিরাচরিত সীমারেখা এবং সর্বোপরি স্থানীয় জনসাধারণের স্বীকৃতি হল ভারতের প্রমাণ, হাজার হাজার বছর ধরে নেফা ভারতের অংশ হয়ে আছে।

শাস্ত্র ও পুরাণ সাক্ষী : কবি পুরাণ, মহাভারত এবং বিষ্ণু পুরাণে উল্লেখ দেখা যায় বর্তমানে নেফা বলে যে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল আছে সেটা সেকালে হিন্দু রাজাদের শাসনাধীন ছিল। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর যোগিনী পুরাণ এবং হুয়েন সাঙের বিবরণে দেখা যায়, কামরূপের হিন্দু রাজ্য বর্তমান ভারত ও তিব্বতের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাছাড়া সপ্তদশ শতাব্দীতে লেখা—"আসাম উপত্যকার রাজনৈতিক ভূগোল বিবৃতি"তে বলা হয়েছে যে, নেফার আদিবাসীগণ আসামের অহোম রাজাদের খাজনা ও নজরানা দিত। ১৮২৬ সালে ব্রিটিশরা অহোম রাজাদের পরাজিত করে আসাম দখল করে। তারপর অহোম রাজাদের পরাক্রম নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ক্রমান্বয়ে সমগ্র নেফাকে তাদের শাসনাধীনে আনতে সক্ষম হয়।

হিমালয় পর্বতমালা যে বহু যুগ ধরে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল এবং তিব্বতের সীমারেখা সেটা ১৮৭৩ সালে মিঃ টি. টি. কুপার এবং ১৮৮৩ সালে মিঃ মিচেলের বিবরণ পড়লে জানা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর বহু চীনা মানচিত্র এবং পুস্তকেও এর উল্লেখ রয়েছে। যেমন ১৮৬৩ সালের তাসিং মানচিত্র এবং ১৯১০ সালের ক্যানটনে চিয়াও চাং আকাদমীর প্রকাশিত মানচিত্র এর সাক্ষ্য দেবে।

কর্তৃত্বের চুক্তি :—এ পর্যন্ত ইতিহাস থেকে প্রমাণ দেওয়া হলো। এবার ১৯১৪ সালে সিমলায় ভারত, তিব্বত এবং চীনের সীমান্ত চুক্তির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই তিন দেশের প্রতিনিধি বিস্তৃত আলোচনার পর মানচিত্রে একটা সীমারেখা নির্দিষ্ট করেন এবং চুক্তিপত্রে তাঁরা সকলেই স্বাক্ষর দেন। ভারতের পক্ষে মিঃ ম্যাকমেহন এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন এবং তাঁর নাম অনুসারে এই সীমারেখার নাম হয়েছে ম্যাকমেহন লাইন। এই হলো ভারত ও চীনের মধ্যে সর্বজনস্বীকৃত সীমানা।

সাম্প্রতিককালে চীন দাবি করছে সিমলা সম্মেলনে তিব্বতের স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে যোগদানের কোন অধিকার নেই এবং চীন এই সীমানাকে অনুমোদন করবে না। ১৯৬০ সালে উভয় দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে সীমানা সম্পর্কে আলোচনায় ভারত সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়ে চীনকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তাদের এই যুক্তি ভিত্তিহীন। তখন বলা হয়েছিল তিব্বত চীনাদের কবলে যাবার আগে পর্যন্ত স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিবেশি বহু রাষ্ট্রের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে চুক্তি করেছে এবং চীন তখন একবারের জন্যও আপত্তি জানায় নি। তিব্বতের স্বাধিকার তখন স্বীকৃত ছিল।

১৯৫৯ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু মিঃ চৌ-এন-লাইয়ের কাছে এক পত্রে ম্যাকমেহন লাইন সম্পর্কে ভারতের যুক্তি উপস্থাপিত করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন চীন সরকারের মত নিয়েই সিমলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আলোচনার বিবরণে দেখা যায় চীন এবং তিব্বতের প্রতিনিধি ভারতীয় প্রতিনিধির সমপর্যায় থেকে আলোচনায় পূর্ণভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এই কারণে ম্যাকমেহন লাইনকে চীন, তিব্বত এবং ভারতের সীমানা বলে মেনে নেওয়া সঙ্গত। আন্তর্জাতিক আচরণ বিধি অনুযায়ীও এটা সিদ্ধ।

প্রশাসনিক কর্তৃত্ব : নেফা ও তিব্বতের চিরাচরিত সীমারেখা অবধি সমগ্র অঞ্চলে ভারতের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব সম্পর্কে বহু প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা থেকে বহু বিষয়েই ভারত সরকার এই অঞ্চলে সকল ব্যবস্থা করেছেন। ১৮১০ সাল থেকে ভারত সরকার বহু বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেছেন এবং কোন্ এলাকায় এগুলি কার্যকরী হবে সেটাও তাতে নির্দিষ্ট করে বলা আছে। ভারত সরকারের পলিটিক্যাল অফিসারের শাসনাধীন এলাকা সম্পর্কে নির্দিষ্ট ভাবে বলা হয়েছে। তাছাড়া

পুরানো আদমসুমারীর রিপোর্টেও দেখা যায় মেকা ভারতের কর্তৃত্বাধীন ছিল। ১৮৮১ সালে আসামের আদমসুমারীর রিপোর্টে নির্দিষ্ট ভাবে বলা হয়েছে হিমালয় পর্যন্ত সকল আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল আসামের অন্তর্ভুক্ত।

অবশ্য একথা সত্য যে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সীর ব্রিটিশ অফিসারদের শাসন-ব্যবস্থা ঢিলেঢালা ছিল। তবে তারা ব্রিটিশ পতাকার সঙ্গে আদিবাসীদের পরিচিত করবার জন্য, দোষীকে শাস্তি দেবার জন্য, অস্ত্রশস্ত্র বেটাবার জন্য এবং ব্যাপকভাবে শান্তি রক্ষার জন্য প্রায় সময়ই সমগ্র অঞ্চল সফর করতো।

১৮৮৩ সালের ভারতের মানচিত্র, সার্ভে অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত ১৮৮৪ সালের মানচিত্র এবং ১৯০৩ সাল পর্যন্ত সংশোধিত মানচিত্র এর অন্যতম সাক্ষ্য। ১৯০৯ সালে তদানীন্তন ভারত সরকার কর্তৃক মেমোরেণ্ডাম অন্ নেটিভ স্টেটস্-এর সঙ্গে প্রকাশিত মানচিত্রে সমগ্র আদিবাসী এলাকাকে অন্তর্ভুক্ত করে দেখানো হয়েছে।

ভারত এত প্রমাণ উপস্থাপিত করবার পরে চীনের আর কি বলবার আছে! আছে শুধু গায়ের জোরে দাবি খাটাবার হুমকি। "আমি জানি মেকার একটা বিরাট অংশ আমার। কাজেই সেটা আমি নেবো। এর চেয়ে বড় যুক্তি কি চাই"। সত্যিই পশুশক্তির কাছে সাক্ষ্য প্রমাণ অচল।

ভগবান তথাগত অরণ্যে শিষ্যদের নিয়ে বসে আছেন।

চারদিক থেকে গাছ হতে শুকপত্র ঝরে পড়ছে।

দুই অঞ্জলি ভরে শুকপত্র নিয়ে তথাগত জিজ্ঞাসা করেন, এই কি শেষ শুকপত্র।

শিষ্য বলেন, না, অরণ্য জুড়ে রয়েছে শুকপত্র।

তথাগত বলেন, তেমনি জগৎ জুড়ে আছে সত্য। যতটুকু তোমার করায়ত্ত তার বাহিরেও আছে সত্য, সর্বদা স্মরণ রাখবে একথা।

অমৃত কথা ও কাহিনী

শ্রীশঙ্করাচার্যের কথা—

একদিন প্রাতঃকালে শঙ্করাচার্য শিষ্যগণকে ভাষ্য পড়াচ্ছেন। এমন সময় এক অতি বৃদ্ধ পণ্ডিতবেশ ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। 'বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ' দেখে পাঠ বন্ধ করে সকলে সসম্মানে তাঁকে আসন দিলেন। ব্রাহ্মণ আসন গ্রহণ না করে গম্ভীর স্বরে বললেন, এখানে কে একজন ব্রহ্মসূত্র অধ্যাপনা করছেন শুনছি ; তিনি কোথায় ?

বৃদ্ধের ভাবভঙ্গি ও কথা শুনে সকলেই স্তম্ভিত। শঙ্করাচার্য আসন ত্যাগ করে বৃদ্ধকে আসন দিলেন। তেজস্বীগণের তেজ এইরূপেই সকলের নিকট সম্মান আকর্ষণ করে। ব্রাহ্মণ আসন গ্রহণ করে শঙ্করাচার্যকে বসতে বললেন। উভয়ে উপবিষ্ট হলেন। ক্রমে শিষ্যগণও উভয়কে বেষ্টন করে উপবেশন করলেন। সকলেই উদগ্রীব ; বৃদ্ধ কি বলেন শুনবেন।

অন্য কথা না বলে বৃদ্ধ একেবারেই বললেন, আপনাকে তো এঁরা সকলে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকার বলছেন ; আচ্ছা, বলুন দেখি—তৃতীয় অধ্যায় প্রথম সূত্রের অর্থ কি ?

শঙ্করাচার্য স্বভাব সুলভ প্রসন্ন গম্ভীর ভাবে বললেন, জীব যখন এই দেহত্যাগ করে দেহান্তর গ্রহণের জন্য যায়, তখন সে দেহবীজ যে সূক্ষ্মভূত, সেই সূক্ষ্মভূতের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে যায়। শ্রুতিতে এই বিষয়ে প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তর আছে। তার দ্বারা এই সিদ্ধান্ত লাভ হতে পারে। অতএব পূর্বপক্ষে পাওয়া যায় যে, ভূত সূক্ষ্মের দ্বারা পরিবেষ্টিত না হয়ে নিরাকার ভাবে প্রাণাদির গমন সম্ভবপর হয় বলে মুক্তি সাধন কালে বৈরাগ্যের আবশ্যকতা নাই ; কিন্তু সিদ্ধান্ত পক্ষে-পাওয়া যায় যে, ভূত সূক্ষ্মের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে যায় বলে মুক্তির সাধনে বৈরাগ্যের আবশ্যকতা আছে।

* * *

শ্রীচৈতন্যদেবের কথা—

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীসনাতন গোস্বামীকে শিক্ষা দান কালে বললেন, মায়াবদ্ধ জীবের কৃষ্ণস্মৃতি জ্ঞান নাই, সেই কারণে জীবের প্রতি কৃপা পরবশ হয়ে কৃষ্ণ বেদ পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র রচনা করিয়ে শাস্ত্র-গুরু এবং অন্তর্যামী আত্মারূপে আপনাকে জানেন। এতে কৃষ্ণ আমার প্রভু, আমার ত্রাণকর্তা—জীবের এই জ্ঞান হয়। বেদশাস্ত্রে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন, এই তিনটি বিষয় অভিব্যক্ত। কৃষ্ণপ্রাপ্তি সম্বন্ধ, ভক্তি—প্রাপ্তির সাধন তার নাম অভিধেয় এবং প্রেমই ভক্তি প্রয়োজন। প্রেম পুরুষার্থ শিরোমণি মহাধন, এর দ্বারা কৃষ্ণ মাধুর্য সেবা প্রাপ্তি কৃষ্ণরস আস্বাদন হয়। এতে দৃষ্টান্ত এই যে—এক দরিদ্রের ঘরে একজন সর্বজ্ঞ এসে দরিদ্রের দুঃখ দেখে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি, এত দুঃখী কেন ? তোমার পিতৃধন আছে, তোমাকে না বলে তোমার পিতা অন্যত্র দেশ ত্যাগ করেছেন। এই সর্বজ্ঞের বাক্যে দরিদ্র যেমন পিতৃধনের সন্ধান জানলো, ঐরূপ বেদ পুরাণ বাক্যে জীবের প্রতি কৃষ্ণ উপদেশ প্রদত্ত হয়েছে। সর্বজ্ঞের বাক্যে যেমন ধনলাভ অনুবন্ধ, সর্বশাস্ত্রে তেমনি শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ উপদেশ। পিতার ধন আছে এই মাত্র জেনে কেউ সেই ধন পায় না, সর্বজ্ঞ ধন প্রাপ্তির উপায় বলেছেন-এই স্থানে ধন আছে, মাটি খুঁড়লেই পাবে কিন্তু সাবধান, দক্ষিণে খুঁড়লেই ভীমরুল বুকুনী উঠবে ধন পাবে না, পশ্চিমে খুঁড়লে সেখানে এক যক্ষ আছে সে বিঘ্ন করবে ধন হাতে পাবে না ; উত্তরে খুঁড়লে সেখানে এক কৃষ্ণ অজগর সর্প আছে সে গিলে ফেলবে ধন পাবে না, পূর্ব দিকের মাটি অল্প খুঁড়লেই তুমি ধনের ভাণ্ড পাবে।

দেশ-বিদেশ

হামবুর্গে যাদুকরদের অধিবেশন ঃ

কিছুদিন আগে যদি হামবুর্গের পথেঘাটে ঘুরে বেড়াতেন, একটা মজার জিনিস লক্ষ্য করতেন। দেখতেন পথের দুপাশে একদল দোকানদার দেখতে দেখতে চলেছে, হঠাৎ কোন লোক এসে তাদের পাকড়াও করে বলছে, দয়া করে আমাকে আপনাদের কিছু কিছু ম্যাজিক দেখান না। আর অমনি সেই ভদ্রলোকদের মধ্যে কেউ তার ফাঁকা পকেট দেখিয়ে চক্ষের নিমেষে শাদা ইঁদুর বার করছে, কেউ বা ছোট একটুকরো দড়ি বার কোরে ভারতীয় দড়ির খেলা দেখিয়ে আশপাশের জনতাকে অবাক করে দিচ্ছে, আবার কেউ বা সবুজ রুমালের ওপর হাত বুলিয়ে সেটিকে মুহূর্তে টকটকে লালে পরিবর্তিত করছে।

এরা সবাই পৃথিবীর আঠাশটি দেশ থেকে হাজার খানেক যাদুকর জার্মান যাদুকর সমিতি প্রতিষ্ঠার পঞ্চাশ বার্ষিকী অধিবেশনে যোগদান করতে হামবুর্গে এসেছিলেন। য়ুরোপের বিভিন্ন দেশ ছাড়াও ইজিপ্ট, ভারত ও তুর্কী থেকেও বহু যাদুকর এই অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে নাম করা ছিলেন ওলন্দাজ যাদুসম্রাট হেন্ড ক্যান্স ও বিখ্যাত জার্মান যাদুকর কালানাগ। একটা কথা জানবেন যাদুবিদ্যা যারা শেখে, তাদের প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে একজন ম্যাজিককে পেশা হিসাবে গ্রহণ করে, আর বাদবাকি শখের যাদুকর, নিজেদের আনন্দের জন্যে তারা এই বিদ্যা আয়ত্ত করে বা অনুরোধ করলে উপস্থিত সকলকে খেলা দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দেয়।

এইসব যাদুকরদের মাঝে মাঝে কংগ্রেস হয়; তবে সেখানে তারা বাৎসরিক রিপোর্ট, পরিসংখ্যান, লাভ-লোকসান নিয়ে মাথা ঘামায় না। সেখানে তারা নতুন নতুন খেলা সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে। যাদুকর ছাড়া কোন সাধারণ লোক কিছুতেই সেইসব অধিবেশনে প্রবেশ করতে পারে না। এই সতর্কতার কারণ যাতে তাদের কোন কৌশল ফাঁস না হয়ে যায়। ব্যাঙ্কের ধনের মত তারা তাদের বিদ্যাকে আগলে রাখে।

একটু আগেই বলেছি যে বহুলোক শখ হিসেবে যাদুবিদ্যা শেখে। য়ুরোপে মাছধরা, খেলাধুলো ও ডাকটিকিট সংগ্রহের শখের পরেই যাদুবিদ্যার স্থান। লক্ষ লক্ষ লোক অবসর বিনোদনের জন্যে যাদুবিদ্যা শেখে এবং দেখিয়ে লোককে আনন্দ দেয়। এদের মধ্যে অবশ্য দু'চারজনই নাম করে। এরা সহজে কাউকে তাদের সমিতির সভ্য করে না। যদি কেউ সভ্য হতে চায় বহুদিন তাকে হবু সভ্য হয়ে থাকতে হয়। তারপর তাকে শপথ নিতে হয় যে সে ম্যাজিকের গোপন কথা জীবনে কারুর কাছে ফাঁস করবে না। শপথ গ্রহণ করা অবশ্য নিতান্ত দরকার কারণ কৌশল ফাঁস হয়ে গেলে যাদুকররা খাবে কি করে। আজকাল অবশ্য দোকানে যাদুবিদ্যার নানারকম বই,

আমেরিকা

সচিত্র সংযোজন

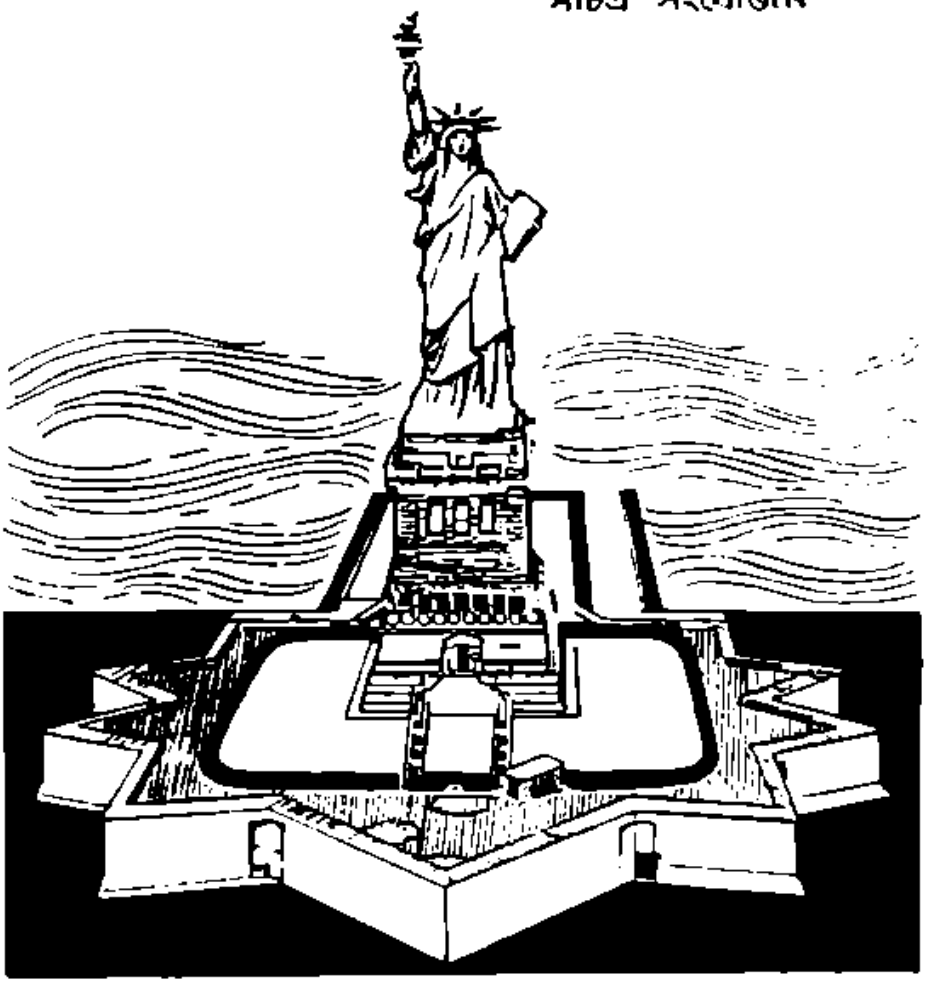

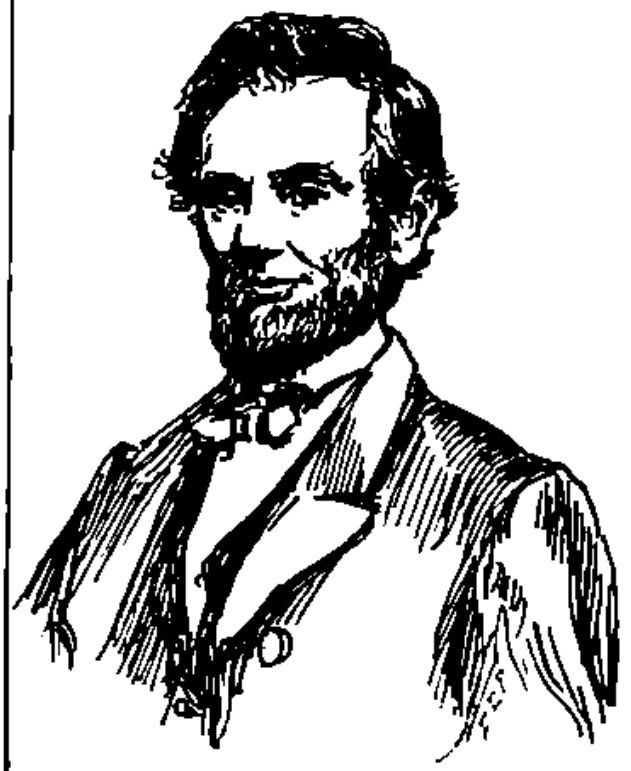

With malice toward none, with Charity for all, with Firmness in the right as god gives us to see the right, let us strive on to finish the work we are in, to bind up the nation's wounds, to care for him who shall have borne the battle and his widow and his orphan, to do all which may achieve and cherish a just and lasting peace among ourselves and with all nations

ABRAHAM LINCOLN

Second Inaugural Address, MARCH 4, 1865

মার্কিন ভাস্কর্য্য ও চারুশিল্প পরিক্রমা

পি. আর. পি.

জীবন সংগ্রাম মানুষকে চিরদিন অস্থির করে তুলেছে। কখনও বা প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্য তাকে সৃষ্টি-মূলক কাজের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। তা' থেকে জন্ম নিয়েছে কারুশিল্প, চারুশিল্প, ভাস্কর্য্য—সভ্যতা।

বহুকাল পূর্ব্বে ইয়োরোপের বিভিন্ন স্থান থেকে অনেকে আমেরিকায় এসে উপনিবেশ গড়ে তোলে। উপনিবেশিক জীবনের সমৃদ্ধির সাথে তাদের মনে জেগে ওঠে রসতৃষ্ণা। শিল্পচর্চ্চা আরম্ভ হল মার্কিনী মহলে। মার্কিনী শিল্পীরা তাকালেন ছেড়ে আসা পিতৃভূমির দিকে শিল্প প্রেরণা লাভের জন্যে। কিছু সংখ্যক শিল্পী তখন ইয়োরোপে গেলেন, বিশেষ করে ইংল্যাণ্ডে, শিল্পকলা আয়ত্ত করতে।

অষ্টাদশ শতকের প্রায় মধ্য পর্য্যায়ের কথা। সে সময়কার একজন চিত্রশিল্পীর নাম প্রথমেই উল্লেখ করা চলে, যার চিত্রশিল্পে তখনও ইয়োরোপীয় শিল্পরীতি সংক্রমিত হয়নি। তাঁর নাম হল জন সিংগলটন কোপলে (১৭৩৭-১৮১৫ খৃঃ)। প্রতিকৃতি চিত্রণে তাঁর বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এই সময়ে যে ভাস্কর-শিল্পীর দেখা মেলে তাঁর নাম উইলিয়াম রাশ। কাঠখোদাই মূর্ত্তি নির্ম্মাণে তাঁর দক্ষতা প্রসিদ্ধি লাভ করে। সমসাময়িক কলাকার বেঞ্জামিন ওয়েষ্টের নাম এখানে উল্লেখযোগ্য একটি শিল্পী-গোষ্ঠীর নায়ক হিসাবে। তাঁর অনুবর্ত্তী ছিলেন জন্‌ওয়েল এফ. বি. মোর্স। এই সময়কার শিল্পী গ্যাড্‌স্বলিনের 'এরিয়াড্‌নি' চিত্রখানির কথা উল্লেখ করা চলে, চিত্রটি তৎকালীন আবহমিক চিত্রের একটি নিখুঁত নিদর্শন বলে।

গিলবার্ট ষ্টুয়ার্টকে (১৭৫৫-১৮২৮) ব্রিটিশ চিত্রশিল্পী গেইনস্‌বারোর চিত্র অনুপ্রাণিত করে। আমেরিকাতে ফিরে আসার পর তাঁর অঙ্কনরীতিতে এক অদ্ভুত স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়। অনাড়ম্বর প্রয়োগ নৈপুণ্যে, নিখুঁত বর্ণবিন্যাসে তাঁর অঙ্কিত প্রতিকৃতি এক রূপালি স্নিগ্ধতার স্তরে উন্নীত দেখা যায়। প্রতিকৃতি শিল্পীদের মধ্যে টমাস সালী (১৭৮৩-১৮৭২) ও হেন্‌রি ইনম্যান (১৮০১-১৮৪৬)-এর নামও উল্লেখযোগ্য। সালীর চিত্রে বর্ণপ্রতিফলন ছিল ছন্দময়—যেন মুক্ত-ফোয়ারা। ভাস্কর্য্যে এই সময় এক বীর্য্যবান রচনা-শৈলীর পরিচয় নিয়ে এলেন—হার্কে গ্রাউন (১৮১৫-১৮৮৬)।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দের অন্তর্বর্ত্তীকালে প্রাকৃতিক দৃশ্য-শিল্পের প্রথম অঙ্কুর উদ্গম হয়, হাড্‌সনরীতির মাধ্যমে। কবিত্বময় পরিবেশে মার্কিন মনের রূপ এবং চিত্রে চমৎকার প্রতিফলিত হয়। এই শিল্প পরচারণার পথে এগিয়ে এলেন জর্জ্জ ইম্‌নেস (১৮২৫-১৮৯৪)। তাঁর দৃশ্য চিত্রণ এক মহাকাব্যিক ব্যাপ্তিতে প্রসারিত। কিন্তু তাঁর রচনা-শৈলী ক্রমে কল্পনাশ্রয়ী বস্তুনিরপেক্ষ রূপ গ্রহণ করে হয়ে ওঠে সঙ্গীতময়। দৃশ্য-শিল্পী জর্জ্জ ইনেসের চিত্র আত্মসংবেদনশীল ও ভাবনিষ্ঠার প্রোজ্জ্বল, কিন্তু জেমস্ এ. মেক্‌নীল হুইসলারের চিত্রে রয়েছে করবেট ও কন্‌ষ্টিন লাটুরের সূক্ষ্ম বর্ণাঢ্যতা।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, প্রথম থেকেই যে দুটি জিনিষ মার্কিন শিল্পকলাকে চিহ্নিত করেছে তার প্রথমটি হল বাস্তবানুগ সরলতা যা বাস্তবিকতায় সুস্পষ্ট। উইলিয়াম হোমার, টমাস্ এ্যাকিন্স্ (১৮৪৪-

১১১৩ খৃঃ) এই শিল্পরীতির অনুচর। এই গোষ্ঠীভুক্ত হলেন এডওয়ার্ড হোপার, চার্লস-শীলার প্রভৃতি। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল—মার্কিনী শিল্পে, তার জীবনধারার সুর—যা রূপে, রসে, অনুভূতির গভীরতায় ভরপুর। জীবন-প্রবাহের এই সুর বর্ণালী রঙের তুলেছে রাইডার থোমাস-গ্রেভস্, এবং মার্ক টোবির চিত্র-কলায়।

চাইল্ড হাসামের চিত্রে ছায়া পড়েছিল ইয়োরোপের প্রতিচ্ছায়াধর্মক (Impressionism) শিল্পরীতির। এবং আথার বি, ডেভিডের চিত্রে পাওয়া স্বপ্নের ঘোর—পলাতকার হাতছানি। জন সিংগার সার্জেন্ট (১৮৫৬-১৯২৫) আমেরিকার শিল্প-সাধিয়ানার চেতস একজন কীর্তিমান শিল্পী। এই সময়কার (১৮৩০-১৯১০) ভাস্কর শিল্পী কুইন্সী এ্যাডামস্ এবং অগাস্টাস সেন্ট-গডেন্সের প্রগতিপন্থী ভাস্কর্য্য রচনা আমেরিকার শিল্প ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা। ভাস্কর জর্জ গ্রে বার্নার্ড, (১৮৬৬-১৯৩৮) ফরাসী শিল্পী রঁদ্যার রোমান্টিক-ইম্প্রেশনিষ্টিক্ শিল্প ব্যঞ্জনার মাধ্যমে যে শিল্প আন্দোলন সৃষ্টি করেন তার ফল আধুনিক ভাস্কর্য্য-শিল্পে সুদূর-প্রসারী। এই সময় একদল শিল্পী উত্তর প্রান্তীয়ের শিল্পের বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করে বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, ফ্রেডারিক রেমিংটনের নাম এই হিসাবে উল্লেখযোগ্য। আধুনিক কালে আমেরিকার পরিশীলিত শিল্পী মানসে প্রাচীন শিল্পকলা যে রেখাপাত করেছে তার পরিচয় পাওয়া যায় পলিনেশীয় কাঠখোদাই, মিশরীয় প্রস্তর চিত্রের অনুকৃতিতে ও মর্য্যাদাবোধে।

আধুনিক চিত্রের প্রগতিধারা অনুসরণ করতে গিয়ে আমেরিকাতে অনুষ্ঠিত একটি প্রদর্শনীর কথা এসে পড়ে। এই চিত্র প্রদর্শনী সম্ভবতঃ আধুনিকতাবাদী চিত্রশিল্পের গোড়ার কথা। এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে। এই প্রদর্শনী দেখে মার্কিন জনসাধারণ যতটা না বিস্মিত হয়েছিল তার চেয়ে হয়ত বেশী আঘাত পেয়েছিল। তাই বিদ্রূপ করে এই নব্য-শিল্পী-গোষ্ঠীর নাম দিয়েছিল তারা "ছাঁই বাটি পন্থি" (Ash Can School)। তাদের শিল্প-শৈলীর উপাদান ছিল—দিন-মজুর ও তাদের ঘরবাড়ীর নোংরা পরিবেশ ইত্যাদি। তারপর ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকাতে, ইয়োরোপীয় চিত্র-শিল্পীদের একটি চিত্র প্রদর্শনী হয়। সেই প্রদর্শনীতে সীজান্ ও পিকাসোর চিত্র প্রদর্শিত হয়েছিল। সেটাও মার্কিনবাসীরা খুসী মনে গ্রহণ করতে পারেনি। ওরা বলেছিল পাগলের দল। কিন্তু তাহলে কি হবে? এই প্রদর্শনীই আমেরিকার শিল্পী-মানসে নব প্রেরণা জাগিয়েছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর আমেরিকার শিল্পীরা ইয়োরোপীয় শিল্পাঙ্গনে অধিকতর আনাগোনা শুরু করেন। তা থেকেই মার্কিন শিল্প-কর্মে নবতর উন্মেষ দেখা যায়। কিন্তু শিল্পরাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করল ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের অর্থনৈতিক সঙ্কট। এই দুর্যোগে আমেরিকার শিল্প দুটি ধারায় বিভক্ত হল। প্রথম ধারার অনুবর্তীদের শিল্পকলার নাম হল—জাতীয় এবং দ্বিতীয়টির নাম সোস্যাল প্রোটেস্ট।

এই 'জাতীয়'রীতির অনুগামীদের মধ্যে টমাস বেন্টন, থো জোন্স, জন্ কারীর নাম করা যেতে পারে। তাঁদের চিত্রে বিস্তীর্ণ উর্বর ভূমি ও যান্ত্রিক শক্তির সম্ভাবনাময়-রূপ দৃশ্য নাটকীয় উচ্ছ্বাসে রূপায়িত হল। কখনও বা তাঁদের চিত্রে স্থান পেল অর্থাভাবের নিষ্ফল নির্মমতা বা নগর প্রান্তের বস্তীর নগ্ন কদর্য্যতা, তার ভেতরও প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পাওয়া যেত শিল্পীমনের দৃঢ়-মর্ম ও আত্ম-প্রত্যয়।

অন্যদিকে সোস্যাল প্রোটেস্টদের রচনা-শৈলী প্রকাশ করত প্রাচুর্যের মধ্যে অভাব, অন্যায়, অসোপাত্তা ইত্যাদি অর্থাৎ মার্কিনীদের জীবনযাত্রার নিষ্ফল দিকটা। শিল্পীরা কিন্তু অর্থনৈতিক অব্যবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারলেন না। এবার গভর্ণমেণ্ট কর্তব্য কর্মে এগিয়ে এলেন। প্রায় ৫০০ হাজার শিল্পীর ভরণপোষণের ব্যবস্থা হল। এই বিনিময়ে শিল্পীরা জাতিকে যা উপহার দিল তার মধ্যে ১৫০০টি মুরাল চিত্র, ২৫৬২ ভাস্কর কর্ম ও বহু সংখ্যক বিভিন্ন জাতীয় চিত্র। অথচ এই সাহায্যপ্রাপ্ত-শিল্পীদের মধ্যেই অনেকে শিল্প মাধ্যমে সরকারের বিরূপ সমালোচনা করতেও ছাড়েন নি। জর্জ বিজ্‌লের একখানি 'মুরাল' চিত্রের কথা বলছি। ওয়াশিংটনে গভর্ণমেণ্টের জাস্টিস্ ভবনে এখনও ঝুলান রয়েছে সেই চিত্র। চিত্রটি জনাকীর্ণ কুঁড়ে ঘরে দুঃখ দারিদ্রের অন্তরাল একটি আলেখ্য—সরকার বাহাদুরের অযোগ্যতার প্রতি একটি তীক্ষ্ণ কটাক্ষ। এমন একটি কটূক্তি ভরা চিত্র কি কোনও সর্বাত্মক টোটেলিটারিয়ান গভর্ণমেণ্ট তাদের ঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে রাখতে সাহস পেত?

যাক্ এসব কথা, এখন আসা যাক মূল বক্তব্যে। ১৯৪০ অব্দের কাছাকাছি এসে দেখা গেল মার্কিনী শিল্প অনেকখানি পূর্ণতা লাভ করেছে। স্থাপনাপন্থীদের উদ্ধত গর্ব অনেকটা শমিত হয়ে প্রশান্তিতে ভরে উঠেছে। সোস্যাল প্রটেস্ট গ্রুপও স্থায়ী অবোধ্য শব্দ ছেড়ে, মানব সৃষ্ট দুঃখ, শাশ্বত বিশ্ব সমস্যার বিস্তীর্ণ বক্তব্যভূমি নেবে দাঁড়িয়েছে।

এখানে একটা কথা বলে রাখি। ইয়োরোপীয় চিত্ররীতি নিয়ে আমেরিকাতে যদিও অনেক পরীক্ষা হয়েছে, একমাত্র অতিপ্রাকৃত চিত্ররীতি (Surrealism) ছাড়া অন্য কোনও আধুনিকরীতি মার্কিনশিল্পে তেমনভাবে শেকড় বসাতে পারেনি। একথার সমর্থন পাওয়া যাবে ১৯৪৩ অব্দের হুইট্‌নি মিউজিয়ামের বার্ষিক চিত্রপঞ্জী আলোচনা করলে। দেখা যাবে ওখানকার চিত্রের শতকরা ১৫টি প্রাকৃতরীতির চিত্র, ১০টি অবয়ব নিরপেক্ষ (abstract) আর বাকীগুলি মানসধর্মী (Sublective)। এই শ্রেণীর সাবজেক্টিভ্ চিত্র অবশ্য কোনও বিশেষ রীতির গণ্ডীর মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেনি—এরা বিভিন্নরীতির গা ঘেঁসে চলেছে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রেখে। চলার পথে হয়ত তারা কখনও প্রাকৃতরীতির কাছে এসে গেছে অথবা অতিপ্রাকৃতের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে। কিন্তু কোনও রীতিকেই পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করেনি।

সর্বশেষে একথাই বলা যায় যে আমেরিকার নব-কলারীতি তার অটুট জীবনীশক্তি নিয়ে, স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বিশ্বসংস্কৃতির অগ্রযাত্রার পথে এগিয়ে চলেছে।

অনেকে প্রশ্ন করেন আধুনিক শিল্প কি বলতে চায়—তা মোটেই পরিষ্কার নয়। তার উত্তরে হয়ত বলা চলে শিল্পের মর্মবাণী উদ্‌ঘাটন করা শিল্পীর কাজ নয়, দর্শক আবিষ্কার করুক তার অন্তর্নিহিত বাণী—শিল্পী ভাস্কর নয়। এ যুগের অনেক কিছুর মর্মই ত উদ্‌ঘাটন করা যায় না। মানসিক চাঞ্চল্য, ভয় ভাবনা, নিরাপত্তা এসবের উৎপত্তি বা নিরসনের ইঙ্গিত এখনও ত কেউ দিতে পারে নি। তবুই শিল্পীর কাছ থেকে তবে করুণাময়ী চাওয়া কেন?

মার্কিন দেশের যৎকিঞ্চিৎ

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

যাবার বেলায় পিছু ডাকে—কবির সত্যদৃষ্টিতে যে কথা ফুটে উঠেছিল তা যে কতো বড় সত্যি তা বুঝতে পারি যখন বিদায়ের বেলা ঘনিয়ে আসে—

আনি হলো যাবার আয়োজন
তবু পথিক থামো কিছুক্ষণ

মন সালতামামী করতে বসে—কী পেলাম, কী দিলাম, শুধু ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়া নয়, দেশের সমষ্টিগত আত্মার সন্ধান কতটুকু পেলাম, যে ঐতিহ্যের, যে মিশ্র চৈতন্যের ধারাবাহিকতা সবার পরশে পূত হয়ে আমাতে এসে থেমেছে, তার কতটুকু ক্ষীণ ভগ্নাংশের স্পর্শ রেখে গেলাম এখানে—মাটির ধুলোয়, মানুষের হৃদয়ে, আমার ভোগে-ত্যাগে, আসক্তি-অনাসক্তিতে।

কতো অজানারে জানাইলে তুমি, কতো ঘরে দিলে ঠাঁই
দূরকে করিলে নিকটবন্ধু, পরকে করিলে ভাই

ওয়াশিংটনের শেরাটন্ পার্ক হোটেলের বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ঘিরে সেকালের স্মৃতি হিসাবে এখনও একটি ছোট্ট রেললাইন পাতা আছে—তার ছোট ছোট কামরায় চড়ে বিরাট হোটেলের এপাড়া থেকে ওপাড়া যাওয়া যায়, এ ব্লক থেকে ও ব্লক। বুড়োদের কাছে সেটা অতীতের ঐতিহ্য, কিন্তু ছোট ছোট ছেলেমেয়ের কাছে সেটা শুধু বিস্ময়ের বস্তু নয়, অপার আনন্দেরও জিনিষ—রেল চলছে, ইঞ্জিন বাঁশী দিচ্ছে, ছেলেরা উঠছে নামছে, সারাদিন ধরে রেল-রেল খেলা। ভোরের অরুণ-আবীরের ছটায় উদ্ভাসিত শিশুদল চঞ্চল হয়ে ছুটেছে এ খেলায় যোগ দিতে—এই দৃশ্য প্রায়ই চোখে পড়তো আমার ঘরের জানালা থেকে—আমিও মাঝে মাঝে পার্কে নেমে বনস্পতিদের দিকে চেয়ে তাদের খেলা দেখতাম। একটি ছোট্ট ছেলে আমাকে দেখলেই বলতো morning, uncle; দেশ থেকে দশ হাজার মাইল দূরে শিশুকণ্ঠের এই স্বাগত সমস্ত দিনটাকে ভরিয়ে রাখতো এই অপূর্ব আস্বাদে।

বিবেকানন্দ তুষারশীর্ষ হিমালয়ের আলমোড়া থেকে ১৮৯৭ সালের জুলাই মাসে তার এক আমেরিকান বন্ধুকে চিঠি লেখেন, সঙ্গে একটি কবিতা, নাম "The Living God"—

ওরে মূর্খদল!
জীবন্ত দেবতা ঠেলি
অবহেলা করি
অনন্ত প্রকাশ তাঁর, এ ভুবনময়

চলেছিস ছুটে মিথ্যা মায়ার পিছনে
বৃথা স্বপ্ন-কলহের পানে
কর তাঁর উপাসনা, একমাত্র প্রত্যক্ষ দেবতা।

মানুষে মানুষে মিলিয়েই যে মহাদেবতা, এইতো তাঁর চিদানন্দ রূপ, চিন্ময় প্রকাশ। ভাবি এই সহজ সত্য-বোধটা যদি জীবনে ফুটতো, শুধু আমারে নয়, সকলের—হিউম্যানিজম, র‍্যাশানালিজম্, স্যাশানালিজম্, কত ইজমের বুকনিই ত ঝাড়ি—সবার উপরে মানুষ সত্য বলে প্রেমাশ্রু বিগলিত হয়ে খোলে চাটিও দিই, কিন্তু ততঃ কিম্। কিন্তু বিদ্ধিও নেই, বুদ্ধিও নেই, শুধু প্রশ্ন—যা পরিপ্রশ্ন নয়—অন্ত উপসর্গে কণ্টকিত, প্রণিপাত দূরের কথা, শুধু নিপাত, বড়জোর নিপাতনে সিদ্ধি। কে বললে আজ কবির কণ্ঠে

অয় হোক্ মানুষের, ঐ নব জাতকের ঐ চিরজীবিতের

এই পরিচয়ই যে সবচেয়ে বড়ো পরিচয়, জাতির জীবন যজ্ঞে জ্বালিয়ে তোলা অগ্নিশিখা।

আজ আশ্চর্য লাগে ভাবতে তখনকার দিনের রূপকথার মত সোনার দেশ ভারতবর্ষের খোঁজে, ইউরোপের বাপে খেদানো মায়ে তাড়ানো দামাল ছেলের দল তাদের দুর্ধর্ষ চেতনা নিয়ে, দুর্দম উৎসাহ নিয়ে, অতলান্তিকের দুস্তর পারাবারে পাড়ি দিয়েছিল। তাদের কণ্ঠে মন্ত্র ছিল বটে

O Crux, ave unica spera
ক্রুশ, তুমিই জীবনের একমাত্র ভরসা

কিন্তু তবু তারা নিজেদের উপরও বিশ্বাস হারায়নি। "Geography of hunger" বুভুক্ষার ভূগোল হয়তো তাদের ঘরছাড়া করেছিল, তারা পল পঁপার মত হয়তো noble savage বা অভিজাত বন্য মানুষ হয়েছিল তবু আজকের কবির ভাষায়

মানুষের ইতিহাস কত আত্মঘাতী মূঢ়তায়
পথ হারাবে
তবু হে কালের অধীশ্বর
হতাশ আমরা হবোনা।

হতাশ তারা হয়েছিল কি না জানিনা তবে হাল ছাড়েনি। আমেরিকার তারই পরিচয় পেলুম। ঊর্মিচঞ্চল রত্নাকর সমুদ্রের বুক চিরে কঠোর কশাঘাতে দুলতে দুলতে ডুবতে ডুবতে, মেফ্লাওয়ার চলেছে—আশা আকাঙ্ক্ষা, প্রেম ভালবাসা, ভগবানের প্রতি বিশ্বাস, লোভ মোহ, অত্যাচার অবিচার অনাচার অপচয়ের স্বপ্ন দেখতে দেখতে। কেউ যাচ্ছে পেটের জ্বালায়, কেউ যাচ্ছে পালিয়ে, কেউ যাচ্ছে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করতে। কিন্তু আমাদের নিক্তিতে যে যাই হোক, সবাই নূতনের উন্মাদনায় প্রাণচঞ্চল। কলম্বাসের আবিষ্কার ভারত-আবিষ্কারের বেশ। আজও তার স্মৃতি জেগে রয়েছে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নামকরণের মধ্যে, ওদেশের প্রাচীন মানুষদের রেড ইণ্ডিয়ান্ সংজ্ঞায়। কে জানে এই ক্ষীণ সূত্রটি কি শুধু আকস্মিকের মালায় গাঁথা। দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে ভারতবর্ষের কবির এই কল্পনা শুধু কি উচ্ছ্বাস না ইতিহাসের একটি অমোঘ সূত্র। মুনি অতীত ভারতবর্ষকে নিয়ে অনেকদিন থেকেই অনেক কথা শুনিয়েছেন। 'ইতিহাসের হিসাব নিকাশে শতমুগান্ত

আগে যে মানুষ এসেছিল, আমাদের অতি অতি অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ যাঁরা, ওঁদের পদযাত্রা শুরু হলো কবে, কতো হাজার বছর পূর্বে, কোন প্রস্তর যুগে, কিন্তু যেদিন আমরা ভারতলতিকার প্রথম উন্মোচন করলাম সেদিন ও তিনি পরিপূর্ণ যৌবনা যেন আলোক মাতাল স্বর্গলতার বহু আবরণভূষিতা দেবী মিনার্ভা (Minerva born in a panoply)। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর নানা ব্যাপ্তি, নানা প্রসার, নানা বিচিত্র অভিব্যক্তি, রূপ ও রস শুধু সীমায় নয়, অসীমেও, অলক্ষ্যেও। দ্রাবিড় পুলিন, আর অনার্য শক হূণ পাঠান মুঘল ব্রিটিশ যুগ পেরিয়ে আজ আমরা স্বাধিকার মন্ত্র এক নূতন তীর্থে। আমাদের রাষ্ট্র, আমাদের ধর্ম, আমাদের নীতি, আমাদের সাহিত্য, আমাদের চিন্তানায়করা সকলেই সেই ভাবচেতনার কথা বলে গেছেন, যা আমাদের অবের করবে আত্মদ্রোহী করবে না, যা আমাদের সুখ-সমৃদ্ধি জ্ঞান-বিজ্ঞান, জীবনযাপনের উন্নত মান ও মূল্যবত্ত সমাধান করে দেবে, শুধু পারলৌকিক চেতনায় নয়—ইহৈব, এইখানকারও।

আজকের পৃথিবীতে চোখ চেয়ে দেখলে মনে আপনিই আসবে যা দেখেছি যা শুনেছি তুলনা তার নেই। আজ সমস্ত পৃথিবী যেন একটা ছোট্ট সভা, সকালে কলকাতায় চা খেয়ে রাত্রে নিউইয়র্কে ডিনারে বসি। শুধু তাই কেন, সমুদ্রবেষ্টিত পৃথ্বী ছাড়িয়ে উধাও হয়ে যাই সুদূর নীলিমে, নীহারিকার রাজ্যে, চন্দ্র মঙ্গল বৃহস্পতিকে পেরিয়ে, অন্ত করতে বসি কবে যাব শুধু গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে নয়, অন্ত সৌরমণ্ডলে, অন্ত আলোর রাজ্যে—আর এক মহাশূন্যে। পিছনে পড়ে থাক্ আলো-বাতাসের এই পৃথিবী—বাস্তিক মানুষ আজ চলেছে ঊর্ধে আরো ঊর্ধে স্টাটোস্ফিয়ার, আয়নোস্ফিয়ের পার হয়ে, নভোতলে পাখা মেলে, তরঙ্গায়িত অসীমের আলিঙ্গনে। তাই আজ আমি যে দেশেরই মানুষ হই না কেন, সব দেশেই আমার ঘর আছে। অবশ্য আমার নাড়ীর টান আমার মাটির সঙ্গে আমার সভ্যতা, সংস্কৃতি, তার বিকাশ তার প্রকাশের সঙ্গে, আমার বিবর্ধমানতার ইতিহাস তার রস পাবে সেই চেতনার উন্মেষনায়। সেই আসল জিনিষটির উপর যখন আঘাত পড়ে—যে দিক দিয়েই পড়ুক—যে মূল সূত্রের অবলেপেই আসুক-মস্কোতেই হোক, হিমগিরিতেই হোক্ বহিরঙ্গেই হোক্ বা অন্তরাত্মারই হোক্ সেই আদর্শের জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ হতেই হয়। আজকের যুগে প্রত্যেক চিন্তাশীল দেশ ও মানুষের দুটো সীমা—একদিকে সে বিশ্বনাগরিক, একদিকে সে মুক্ত বিহঙ্গম, আর একদিকে সে নিজের গণ্ডীতে আবদ্ধ—কিন্তু সে গণ্ডী, সীমায় বটে কিন্তু আনন্দের, সেবার, প্রেমের, আদর্শের, অকুণ্ঠ নিষ্ঠার। আত্মকেন্দ্রিক জীবনেও যেমন দুটো খোলা আর লাটাই গুটিয়ে কেলা তেমনি সমষ্টিকেন্দ্রিক জীবনেও আমরা কঠোর স্বদেশভক্ত, সীমিত অথচ বিশ্ব হৃদয়ের সঙ্গে স্পন্দিত। এই চেতনাই রামমোহনের, বিবেকানন্দের, রবীন্দ্রনাথের, অগুহারলালের। এরই পরিপ্রেক্ষিতে, আমেরিকাকে যদি দেখা যায় তাহলেই বোঝা যাবে কোথায় আমাদের সেই সেতুগুলি Bridge of Understanding।

আমেরিকা তখন কয়েক বছরের শিশুরাষ্ট্র—তোখা আমেরিকা নব অভ্যুদয়। কিন্তু তখনি তার অর্ণবপোত দূরসমুদ্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দেই দেখি কলকাতার বন্দরে জাহাজ এসে লেগেছে। শোনা যায় বাইশবছরে আমেরিকার স্যালেম বন্দর থেকে একখানি জাহাজ এসেছিল, তার নাম ছিল "অর্ড"। কলকাতা তার নামকরণ করেছিল—"দি স্যালেম্ ক্রাইসেট্"। ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেনের ইতিহাসে ইংরেজ-অধ্যুষিত কলিকাতায় দুজন আমেরিকানকেও সেই যুগে কলিকাতার স্থায়ী বাসিন্দারূপে পাওয়া যায়। ওঁদের নাম স্যামুয়েল 'ম' আর বেঞ্জামিন 'অর'। ধর্মপ্রাণ ব্যবসায়ী রামদুলাল দের কারবারের প্রধান অংশই

ছিল আমেরিকার পক্ষে, তাঁর নামে একটি আমেরিকান জাহাজের নামকরণও হয়। শুধু তাই নয় তাঁর আমেরিকান বন্ধুরা স্টুয়ার্ট দ্বারা অঙ্কিত জর্জ ওয়াশিংটনের একটি ছবি রামমোহনকে ১৮০১ সালে উপহারও দেন।

রালফ্ ওয়াল্ডো এমার্সন্ উনবিংশ শতাব্দীর পৃথিবীর ইতিহাসে একজন সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ও চিন্তানায়ক বলে খ্যাত। কোথায় রামমোহন, কোথায় এমার্সন, হাজার হাজার মাইলের ব্যবধান দুজনের শিক্ষা-দীক্ষা আলাদা সংস্কৃতি সভ্যতার প্রভাব বিভিন্ন, তবু শত বিভেদ সত্ত্বেও মিল হয় সেই শাশ্বত পটভূমিতে। দেখি এমার্সন পড়ছেন রামমোহনের লেখা, তার "Precepts of Jesus" প্রভৃতি বই। ঐ বইটি বোস্টনেই প্রকাশিত হয়েছিল। বিখ্যাত মনীষী রোঁলা আমেরিকায় বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেন যে, ঐ সময় অর্থাৎ ১৮৩০ থেকে ২৪।৩০ বছর "New England was going through a crisis of Spiritual renaissance and Intoxicating idealism" ১৮৩৮ সালে হারভার্ডে বক্তৃতা দিলেন "থুরো" আত্মা সম্বন্ধে। বৈদেহী পড়ে গেল সুধীজন সমাজে—একী এসব 'আত্মনস্রষ্টনে'র কথা থুরো পেলেন কোথায়, 'Joint Bible' যার করবার প্রস্তাব পর্যন্ত করেছিলেন তাতে থাকবে "Ex Oriente Lux" অর্থাৎ প্রতীচীর আলো। এমার্সন 'ব্রহ্ম' নামে কবিতাই লিখলেন

If the red slayer think he slays.
Or if the slain think he is slain,
They know not well the subtle ways
I keep, and pass, and turn again.

কে কাকে মারছে, কে মরছে, কেউই জানেনা কি হচ্ছে, মহাকালের সীমাতীত যে আমি, সে আমি আছি (অহমহং ভোঃ). চলেছি, আবার ফিরেছি। গান্ধীজী, এমার্সনের ও থুরোর একজন মস্ত ভক্ত ছিলেন। "থুরোর" ওয়ালডেন (Walden) নামক পুস্তকেও গীতা, শকুন্তলা ও বহু ভারতীয় তথ্যও তত্ত্বের সমাবেশ পাই। ভারতীয় দর্শন ও চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত "থুরো" গান্ধীজীকে সিভিল ডিস্‌অবিডিয়েন্স (Civil disobedience) সম্বন্ধে শিক্ষা দেন বা প্রভাবান্বিত করেন—এও এক আশ্চর্য দেওয়া নেওয়ার কথা। এই প্রসঙ্গে মহাত্মাজীর আমেরিকান শিষ্য জন্ হেনস্ হোমস্ (John Haynes Holmes) ও লুই ফিশার (Louis Fischer) বা ভিনসেন্ট শিয়ার (Vincent Sheear) বা সরোকিন (Sorokin)-এর উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক নয়। পূর্বেই আমি গল্প করেছি যে এই সেদিনেও দেখে এলাম ওয়াশিংটনের এটমিক্ এনার্জী কমিশন্ (Atomic Energy Commission)-এর সামনে মূক-মানুষের মিছিল চলেছে "Stop Atomic tests" বলে—তাদের হাতের পতাকাতে যে নাম অঙ্কিত সে নামটি ভারতবাসীর পক্ষে পুণ্যনাম—জাতির জনকের নাম—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

গান্ধী মহারাজের শিষ্য কেউ বা ধনী কেউ বা নিঃস্ব
এক জায়গাতে আছে মোদের মিল..... .....

হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর প্রণাম আর প্রণাম পৌঁছয় সেই একই জায়গায়—তবু চিরকালের মানুষের আশা যেমন ধ্বনিত হয়েছে গান্ধী রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের কণ্ঠে তেমনি রোঁলা, থোরো, এমার্সন্, সিনক্লেয়ারের বাণীতে আজও যেন কম্‌কণ্ঠে থোরোর বাণী শুনছি—

"I have sworn upon the alter of God eternal hostility against every form of tyranny over the mind of man."

শুনছি রোঁলা বলছেন আমেরিকাকে—

"Heir of George Washington and Abraham Lincoln, take up the causes not of a party, not of a single people but of all, Summon the representatives of the peoples to Congress of Mankind. Speak, speak to all. The world hungers for a voice which will overleap the frontiers of nations and classes."

বিবেকানন্দের আমেরিকা প্রবাসের উল্লেখ করে রোঁলা ওয়াল্ট হুইটম্যানকে মৃত অতিকায় (dead giant) বলে অভিহিত করেছিলেন। কবির Leaves of Grass-এ বা Song of Myself-এ কিন্তু অদ্ভুতভাবে ভারতীয় ভাব বা বৈদান্তিক চিন্তা প্রকাশিত হয়েছে। কেউ কেউ তার মধ্যে বুদ্ধী প্রভাবও লক্ষ্য করেছেন। একজন সমালোচক বললেন—ভগবদ্গীতা আর নিউইয়র্ক হেরাল্ডের 'পাক' জুটেছে ওয়াল্ট হুইটম্যানে। নির্বাণ তাঁর কাছে mist, repose আবার forgetfulness। ভারতীয় চিন্তার ব্রহ্মকে কিন্তু "old occult Brahma" বা "the tender junior Buddha" বলা হয় না। তবু ওয়াল্টহুইটম্যান্ স্বাধীন চিন্তার কবি, রবীন্দ্রনাথকে তিনি স্পর্শ করেছেন অন্তশ্চেতনায়। তাঁরই শিষ্য ও সাথী রবার্ট ইনগারসল্ (Robert Ingersoll) স্বামীজির সংস্পর্শে আসেন। এড্গার এলান্ পোর ইউরেকা (Eureka) নামক কবিতাতেও উপনিষদের প্রভাব দেখি। রোঁলার শেষ মন্তব্য যে হুইটম্যান ঘুমন্ত আমেরিকার অন্তর্গত সত্তার প্রতীক (the genius of Whitman was the index of the hidden soul sleeping)।

ভারতবর্ষের সঙ্গে আমেরিকার হৃদয়ের সম্পর্ক অন্য অনেক দিক দিয়েও গড়ে উঠেছে দেখা যায়। অধ্যাপক হুইটনী সংস্কৃত পড়তে শুরু করলেন—ইয়েল্ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি হয় একশো বছরেরও আগে সিপাহী বিদ্রোহেরও পূর্বে (১৮৫৪ খৃঃ অব্দে)। হুইটনী ছিলেন পাণিনির শিষ্য, চলে গেলেন জার্মানীতে, রথ্, ওয়েবার, কার্লসেপলিনস্ প্রভৃতি ভারত-তত্ত্ববিদ্দের কাছে শিখলেন সংস্কৃতের জাদু, তাঁর ভাষার, তাঁর ভাবের তাঁর সাহিত্যের অপরূপ আস্বাদ নিয়ে ফিরলেন। আর অথর্ববেদ তাঁকে প্রাচ্যবিদ্যার মায়াবী করে তুললে।

এছাড়া আরো কতো আদান প্রদান চলেছিল তার হয়ত ইতিহাস ছেঁড়া পাতাতেই লেখা রইলো। আমিয়ারে এলেন থিয়সফিষ্ট কর্ণেল অলকট্, বরোদায় গেলেন পাঠাগার বিশেষজ্ঞ বর্ডেন। এসব টুকরো টুকরো কথা ও কাহিনী মানুষের মনে মহীরুহের বীজই বপন করে যায়।

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের কথা বলেই আমার এবারকার দিনপঞ্জী শেষ করি। মেরী লুই বার্কের নিউ ডিস্কভারিস্ (New Discoveries) পুস্তকে পড়ি যে ১৮৯৩ সালে বিবেকানন্দ যখন আমেরিকায় যান তখন তিনি সম্পূর্ণভাবে অপরিচিত, তাঁর জিনিষপত্র নেই, টাকা নেই, কোন পরিচয় পত্র নেই, (Totally unknown, unequipped, without funds, with no credentials); তিনি শিকাগো থেকে বোষ্টনে এলেন। ট্রেনে দেখা হলো এক বৃদ্ধা মহিলার সঙ্গে তিনিই তাকে আশ্রয় দিলেন এবং হারভার্ডের বিখ্যাত অধ্যাপক রাইটের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিলেন। প্রফেসর রাইটকে তিনি ডাকতেন "মহাত্মা" বলে। মিসেস্ রাইটের একটি চিঠিতে পড়ি

"He came friday—in a long Saffron robe that caused Universal amazement. He was a most gorgeous irsion. He had a superb carriage of the head, was very handsome in an oriental way, about thirty years old in times and ages in civlization....."

বহুবার স্বামীজী মাতৃসমা আমেরিকান মহিলাদের কাছে তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন। শিকাগোর ধর্মমহাসম্মেলনে তাঁর ভাষণ, তার প্রতিক্রিয়া, এসব ভারতের সব লোকেরই জানা। আমেরিকায় বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রচার, তাঁর শিষ্য ও শিষ্যাদের বেদান্ত প্রচারে উৎসাহে এ সব ত ঐতিহাসিক ব্যাপার।

রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল নানাপথ জুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।

রবীন্দ্রনাথকেও আমেরিকায় দেখা গেছে একবার নয় বার বার, পাঁচবার। মানুষে মানুষে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করতে হবে, তাদের ঐক্যের সূত্রে জ্ঞানের সূত্রে বাঁধতে হবে, মানবতার মন্ত্র দিতে হবে এইতো ছিল কবির বাণী। মৃত্যুর কয়েকদিন আগেও এই মহাকবি যিনি মানুষের উপর বিশ্বাস হারাতে পারেন নি, যাঁর আশা ছিল যে কুৎসিত তাণ্ডব যেদিন শেষ হবে সেদিন—

মানব তপস্বীবেশে চিরাভগ্ন শয্যাতলে এসে
স্নান হবে নিরাসক্ত মনে ধ্যানের আসনে

তিনি যৌবনের রূপের প্রতীক আমেরিকার কাছেই জানালেন তাঁর আবেদন, যেন আধ্যাত্মিকতাবাদী মানুষের শেষ আশ্রয় সেখানে থাকে (প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে প্রেরিত তারবার্তা ১৯৪০ জুন) যেটা হবে আত্মপ্রকাশের নতুন পথ, মানব কল্যাণ সাধনার নতুন দৃষ্টিভঙ্গী। উইল ডুরাণ্ট রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন যে, আপনি এসেছেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যেকার প্রতিবন্ধকগুলিকে ভেঙে দেবার কাজে সহায়তা করবার জন্য। মনে পড়লো মহিয়সী মহিলা হেলেন কেলারের কথা—ছোট ছোট শিশুদের আপনি যে হাত ধরে নিয়ে গেছেন, সেই হাতের অনুভূতির কিছুটা প্রীতিপূর্ণ স্মৃতি রইলো আমার হাতে।

বাইরের আকাশে আলো নিভে আসছে—দিনান্তের ছায়ার স্পর্শ থাকুক আমার দিনপঞ্জীতে। মার্কিন কবি লুই আণ্টার মেয়ারের কবিতাতে পড়েছি, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিনি লিখছেন—(দি ডিভাইডেড্ ক্রে)

কে তুমি এখন্, হে মরকায়া
যে চিন্তার মিনার, আকাশ লুণ্ঠন করা স্বপ্ন
আর আদর্শ প্রেমের সাম্রাজ্য করো দাবী?
যে বাসায় তুমি বাঁধা
পাঁচটি মাত্র তা থেকে পালাবার দ্বার
আনন্দের পাঁচটি পথ, আর পাঁচটিই যথেষ্ট

তাইতো মার্কিনী ঔপন্যাসিক ভিডোডোর ড্রাইজার লিখলেন

যা ছিল বাঁকা-চোরা তা সোজা হলো
... ...
যা ছিল সুন্দর তা মিলল অবিনশ্বরের সঙ্গে

যখন রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি নন্, যখন তাঁর নাম আমেরিকায় কেন ইংলণ্ডেও বেশী লোক জানেনা তখন হ্যারিয়েট মনরো, এজরা পাউণ্ড প্রভৃতি মার্কিনী কবিরাই তাঁকে আবিষ্কার করলেন মহিলা কবি ও শিল্পী শ্রীযুতা মূডীর বৈঠকখানায়। কায়ারস্লেসে আগুন পোহাতে পোহাতে গীতাঞ্জলি পড়ছেন কবি বাংলায় ইংরাজীতে আর মুগ্ধ হয়ে আছেন তাঁর শ্রোতা ও শ্রোত্রীর দল—আমেরিকায় বসে কল্পনা করতে পারি সেই পরিবেশ সৌন্দর্যের পর সৌন্দর্য উদ্ঘাটিত হচ্ছে।

কবি শিকাগোতে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, "আমি ভালবাসি, আমার আশেপাশের মানুষদের। আর মর্যাদাও দিই তাদের ভালবাসার" এই ভালবাসাই দূরকে করে নিকট, পরকে করে আপন। এই মন্ত্রই ব্যষ্টির সাধনার মন্ত্র, সমষ্টির চেতনার সূত্র—

যে তোরে পাগল বলে তারে তুই বলিস নে কিছু
আজকে তোরে কেমন তেবে গায়ে ছুঁড়ে ধুলো দেবে
কাল সে প্রাতে মালা হাতে ছুটবে যে তোর পিছু পিছু।

"জীবনের আধ্যাত্মিক আদর্শের দিকটা আমেরিকায় অনুসরণ করা হয় বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে; আধুনিক পৃথিবীর আর কোথাও এরূপ দেখা যায় না। ধনোৎপাদন তার অন্তর্দৃষ্টিকে বাধা না দিয়ে একটি সৃজনমুখী গণতন্ত্র সম্বন্ধে তার কল্পনাকে করেছে বন্ধনমুক্ত, যে গণতন্ত্রের মধ্যে দেখতে পাওয়া যাবে মানবাত্মার প্রকৃত স্বাধীনতা। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে মার্কিণ সভ্যতার এই অভিযান খুঁজে বের করবে তার আত্মপ্রকাশের চির নতুন পথগুলোকে, মানবজাতির কল্যাণসাধনের জন্যে আমেরিকা নিয়োগ করবে তার বাস্তব সম্পদকে; রোগমারীকে জয় করে এবং বৈজ্ঞানিক জীবনযাত্রা প্রণালীকে চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়ে যার সুফল পরিব্যাপ্ত হবে তার ভৌগোলিক সীমানার বাইরে ও বহুদূর পর্যন্ত।"

—রবীন্দ্রনাথ

এই সংখ্যায়

উদাত্ত আহ্বান—	৫৪৩
যে কথা আপনিও ভাবছেন—	৫৪৯
অমৃত কথা ও কাহিনী—	৫৫০
অন্তরীক্ষে—(ব্যঙ্গচিত্র)	৫৫৩
প্রতিযোগিতা—আশাপূর্ণা দেবী	৫৫৯
লেখিকার কথা—শ্রীশান্তাদেবী	৫৬৮
জীবনের যজ্ঞশালায় (উপন্যাস)—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	৫৭০
বীরবলের কৌতুক—বরুচি	৫৭৪
জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৫৭৭
একটি কলমের জন্য—জগদীশ মোদক	৫৮৪
পাহাড়ী গাঁয়ের কথা—নীলিমা দাশগুপ্ত	৫৮৯

বেঙ্গল
কেমিক্যালের
সুনির্বাচিত
সৌন্দর্য-উপচার

উষসী ফেস পাউডার

মুখে মাখবার
অপূর্ব প্রসাধনবেদু—সুন্দর
মুখশ্রীকে আরো উজ্জ্বল ও
আকর্ষণীয় ক'রে তোলে।

আপনার রূপ আরো রমণীয় ক'রে তুলবার চাবিকাঠি তো আপনারই হাতে। বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রসাধন সামগ্রী আপনার ঘুমন্ত রূপের গায়ে সোনার কাঠি বুলিয়ে দেবে।

প্রিয়া স্নো

পাউডার মাখবার আগে
এই স্নো মেখে নিতে
হয়। মুখের ছোটখাট
দাগ এতে ঢেকে যায়,
পাউডার বহুক্ষণ নিখুঁত-
ভাবে লেগে থাকে।

ক্যাম্ফারাইডিন হেয়ার অয়েল

কেশগুচ্ছকে বেশ
কোমল, ঘন ও
নিবিড় করে।

গ্লিসারিন সাবান

উচ্চাঙ্গের
গায়ে মাখা
সাবান—যে কোন ঋতুতে
ব্যবহার করা চলে।

প্রিয়া

এই মনমাতানো
সুগন্ধি সব সময়
মনকে প্রফুল্ল ও
সজীব রাখে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

এই সংখ্যায়

বিশ্ব-সাহিত্য—
সাহিত্য ও সাহিত্যিক—রবার্ট ফ্রস্ট ৫৯৮
সাহিত্য সংবাদ—কাল অতিক্রম—পবিত্র পাল ৬০১
চিঠি শুধু চিঠি নয়— ৬০৩
এই প্রথম—নমিতা বসু ৬০৪
একজন আর কয়েকজন—অনিলকুমার ভট্টাচার্য ৬০৭
দেশ-বিদেশ— ৬১২
খেলাধূলা— ৬২৬
ভারত ভ্রমণে— ৬২৭
উপেন্দ্রনাথ— ৬২৯
বিনা শ্রমসে—উপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় (অপ্রকাশিত রচনা) ৬৩০
আমেরিকা—সচিত্র সংযোজন ৬৩১

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে

মুক্তহস্তে দান করুন

ভীমচন্দ্র নাগ

গ্রামের দোকানদার বলেন ঃ

"ব্যবসায়ী হিসাবে যে টাকা আমি খরচ করি তার যতটা পারি উসুল করে নেবারই চেষ্টা করি। তাই, সাইকেল কেনার যখন প্রয়োজন হ'ল তখন র‍্যালেই কিনলাম, কারণ র‍্যালে অত্যন্ত মজবুত, যথেষ্ট মাল বইতে সক্ষম, আর স্বচ্ছন্দ ও ক্ষিপ্রগতি।"

র‍্যালে

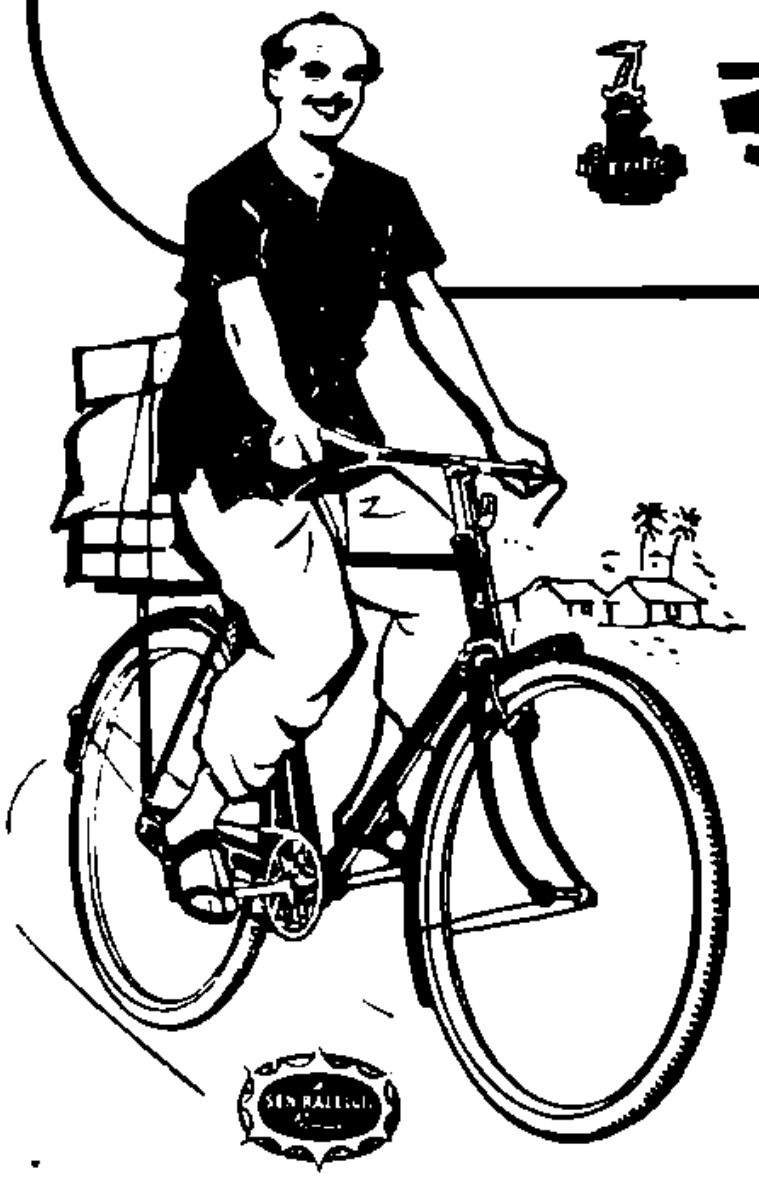

সাইকেলের তালিকায় শীর্ষতম নাম

অধিকতর আরামের জন্য
উইট্‌কপ
সীট লাগান

সেন-র‍্যালে

গল্প-ভারতী

গ্রাহক সংখ্যা—১০৬৯

সম্পাদক :

সহঃ সম্পাদক : শ্রীকল্যাণ রায়

মূল্য এক টাকা

শ্রীসুধাংশু কুমার রায় চৌধুরী কর্তৃক ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেড ২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত এবং কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

নতুন **নির্মল** হাফ-বার সাবানে
কাচলে আপনার কাপড়চোপড় হবে

ধবধবে ফরসা

ঝলকা সুগন্ধে ভরপুর

গল্প-ভারতী

অষ্টাদশ বর্ষ,

মাঘ ১৩৬৯

উদাত্ত আহ্বান

ভারত-আত্মার বাণীমূর্ত্তি, ব্রহ্মতেজ ও ক্ষাত্রবীর্য্যের সমন্বয়-মূর্ত্তি, চির-তারুণ্যের প্রতীক, সর্ব্বত্যাগী অথচ অনলস কর্ম্মযোগী, সঙ্কল্পে কঠোর, জ্ঞানে ভাস্বর, প্রেমে অপরাজেয়, বৈদান্তিক সন্ন্যাসী হইয়াও আর্ত্ত, দুর্গত, দুঃখীর প্রতি করুণায় বিগলিত-হৃদয়, স্বদেশপ্রেমিক ও স্বজাতি-বৎসল হইয়াও সর্ব্ব মানবে প্রীতিমান আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের শতবর্ষ-পূর্ত্তি উপলক্ষ্যে তাঁহাকে অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই। তাঁহার উদাত্ত আহ্বান আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়া আবার আমাদিগকে মোহ-প্রবুদ্ধ করুক। সেই সঙ্গে আমরা প্রণাম জানাই ভারতের ক্ষাত্রশক্তির প্রতীক সর্ব্বজন-বরেণ্য নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে, যিনি অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারার উত্তরাধিকারী। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার অনুসরণে আমরা বলি—'আবার আসিবে কি না! স্বামিজী ও নেতাজীর ন্যায় বীর সন্ন্যাসী 'আবার আসিবে কি না'। নেতাজী যে বীর সন্ন্যাসী, এ কথা কে অস্বীকার করিতে পারেন?

ধর্ম্মরাজ যম শ্রদ্ধাবান নচিকেতাকে বলিয়াছিলেন—

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।'

'ওঠ, জাগো, শ্রেষ্ঠ আচার্য্যগণের নিকট গিয়া আত্মার স্বরূপ অবগত হও।'

স্বামীজি একটু পরিবর্ত্তিত আকারে এই কথাই বলিয়াছেন—

'ওঠ, জাগো, যে পর্য্যন্ত লক্ষ্যে না পৌঁছিবে, সে পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হইও না।'

স্বামিজীর কণ্ঠে যুগবাণীই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। তাঁহার উদাত্ত আহ্বান একদিন পরানুচিকীর্ষু ভারতবাসী তথা বাঙালীকে আত্মসচেতন করিয়াছে, তাহাদের প্রাণে জাগাইয়াছে বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়।

টেনিসনের ইউলিসিসের মত স্বামিজীও যেন ঘড়, নিশ্চেষ্ট, তামসিকতায় আচ্ছন্ন স্বদেশবাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

'How dull it is to pause, to make an end,
To rust unburnished, not to shine in use,
As though to breathe were life'.

আজ যদি আমরা মানুষের মত বাঁচিতে চাই, যদি জীবনে পরম শ্রেয় লাভ করিতে চাই, তবে স্বামিজীর উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিতে হইবে, যে আহ্বান আজও ভারতের আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হইতেছে। 'যদি জগতে কিছু পাপ থাকে, দুর্বলতাই সেই পাপ', 'চালাকি দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য হয় না', 'মানুষ হয়ে যখন এসেছিস, একটা দাগ রেখে যা', 'টাকায় কিছু হয় না, নাম যশেও কিছু হয় না, একমাত্র চরিত্রই বাধাবিঘ্নরূপ বজ্রদৃঢ় প্রাচীরকে বিদীর্ণ করিতে পারে।'

আরও শুনিতে হইবে সেই ভীমকর্ম্মা, অমেয়াত্মা, দেশমাতৃকার দেবীতে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ নেতাজীর রুদ্র কণ্ঠের আহ্বান। 'সংগ্রামের প্রয়োজন যে এখনও থামে নাই, বোধহয় কোন দিন থামিবে না। অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, ব্যভিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, দেশের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আততায়ীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম।' স্বামিজী ও নেতাজীর কণ্ঠে আমরা শুনিতে পাইব শাশ্বত ভারতাত্মারই বাণী। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত।' 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ'। 'নান্যোনমবসাদয়েৎ'।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে স্বামিজীর প্রিয় বন্ধু ও বাংলার বরেণ্য নেতা শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়কে কথাপ্রসঙ্গে একদিন তিনি বলিয়াছিলেন: "বাঙলার যুবকদের অস্থি দিয়ে যে বজ্র নির্মাণ হবে তাই থেকে ভারতের অধীনতা ঘুচে যাবে। আপনি আমায় কতকগুলি বাছাই করা উপযুক্ত ছেলে দিতে পারেন? তাহলে আমি সারা দুনিয়াকে একটা নাড়া দিয়ে দিই।"

* * * * *

"আধুনিক কালে ভারতবর্ষে বিবেকানন্দই একটি মহাবাণী প্রচার করেছিলেন—সেটি কোন আচারগত নয়। তিনি দেশের লোককে ডেকে বলেছিলেন, তোমাদের সকলের মধ্যে ব্রহ্মশক্তি, দরিদ্রের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চান। এই কথাটি যুবকদের চিত্তকে সমগ্রভাবে জাগিয়েছে। তাই এই বাণীর ফল দেশের সেবায় আজ বিচিত্রভাবে বিচিত্র ত্যাগে ফলেছে। তাঁর বাণী মানুষকে যখনই সম্মান দিয়েছে তখনই শক্তি দিয়েছে। সেই শক্তির পথ কেবল এক খোঁকা নয়। তা কোন দৈহিক প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির মধ্যে পর্য্যবসিত নয়, তা মানুষের প্রাণ-মনকে প্রাণবান করেছে। বাঙলাদেশের যুবকদের মধ্যে যে সব দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই, তার মূলে আছে বিবেকানন্দের সেই বাণী, যা মানুষের আত্মাকে ডেকেছে, আত্মুলকে নয়। ভয় হয় পাছে আচারের সংকীর্ণ অনুশাসনে সে নবোদ্বোধিত তেজকে চাপা দিয়ে ম্লান করে দেয়, কঠিন তপস্যার পথ থেকে বাহ্যিক আচারের পথে দেশের মনকে ভ্রষ্ট করে"।

—রবীন্দ্রনাথ

Before flooding India with Socialistic and political ideas, first deluge the land with spiritual ideas. The first work that demands our attention is, that the most wonderful truths confined in our Upanishads, in our scriptures, in our Puranas, must be brought out from the books, brought out from the monasteries, brought out from the forests, brought out from the possession of selected bodies of people, and scattered broadcast all over the land, so that these truths may run like fire all over the country, from North to South and East to West, from the Himalayas to Cape Comorin, from Sindhu to the Brahmaputra.

• • •

We have wept long enough; no more weeping, but stand on your feet and be men. It is a man-making religion that we want. It is man-making theories that we want. It is man-making education all round that we want. And here is the test of truth—anything that makes you weak physically, intellectually and spiritually, reject as poison, there is no life in it, it cannot be true. Truth is strengthening. Truth is purity. Truth is all knowledge. Truth must be strengthening, must be enlightening, must be invigorating.

• • • • •

Get up, and set your shoulder to the wheel—how long is this life for? As you have come into this world, leave some mark behind. Otherwise where is the difference between you and the trees and stones?—They too come into existence, decay and die.

• • • • •

It is the heart that conquers, not the brain. Books and learning, Yoga and meditation and illumination—all are but dust compared to love.

Lay down your comforts, your pleasures, your names, fame or position, nay, even your lives, and make a bridge of human chains over which millions will cross this ocean of life. Bring all forces of good together. Do not care under what banner you march. Do not care what be your colour, green, blue or red, but mix all the colours up, and produce that intense glow of white, the colour of love. Ours is to work. The results will take care of themselves.

• • • •

Let us all work hard, my brethren, this is no time for sleep. On our work depends the coming of the India of the future. She is there ready waiting. She is only sleeping. Arise and awake, and see her seated here, on her eternal throne, rejuvenated, more glorious than she ever was—this motherland of ours.

• • • •

First bread and then religion. We stuff them too much with religion, when the poor fellows have been starving. No Dogmas will satisfy the cravings of hunger···

• • • •

Feel for the miserable and look up for help—it shall come. I have travelled twelve years with this load in my heart and this idea in my brain. I have gone from door to door of the so-called rich and great. With a bleeding heart I have crossed half the world to this strange land, seeking for help. The lord is great. I know He will help me. I may perish of cold or hunger in this land, but I bequeath to you, young men, this sympathy, this struggle for the poor, the ignorant, the oppressed.

Swami Vivekananda

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের একটি ঘটনা

তখন নরেন্দ্রের বয়স বছর দশেক, ছাতুবাবুর বাজারে চড়কের মেলা দেখতে নরেন্দ্র গিছলেন। ফেরবার সময়ে মাটির তৈরী মহাদেবের একটা সুন্দর পুতুল নরেন্দ্র কিনে বিভন স্ট্রীট দিয়ে বাড়ী ফিরছেন। তখন সূর্যের আলো ম্লান হয়ে আসছে। দিনের শেষে দেখা দিচ্ছে সন্ধ্যাবেলা। রাস্তার আশেপাশে মাঝখানে কলের জলের মত লোকের ভীড়। এমন সময় সবাই চমকে উঠে রাস্তার মাঝখান থেকে দুপাশের ফুটপাথে আশ্রয় নিলে। রাস্তার মাঝখানটা প্রায় খালি। কী ব্যাপার! একটা গাড়ীগাড়ীর ঘোড়া ফেপে গিয়ে রাশ-লাগাম ছিঁড়ে ফেলে তীরের মতন বেগে ছুটে আসছে। খুব গরীব সামান্য ঘরের একটি মেয়ে—বয়স হয়তো পঁচিশ-ছাব্বিশ, তার কোলে একটি দু'বছরের ছেলে। মেয়েটি রাস্তা পার হতে যাচ্ছে—এমন সময় পাগলা ঘোড়াটাকে দেখে ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়লো। কোল থেকে তার ছেলেটা ছিটকে পড়লো রাস্তায়। ঘোড়াটা এসে পড়েছে একেবারে কাছে কাছে। রাস্তার দু'পাশের লোক ছেলেটির অবস্থার কথা ভেবে ভয়ে অস্থির। চারদিকে গোল বাড়িওলা পুরো বরসী সব মানুষ। কিন্তু কী কোরে ঐ ছেলেটাকে বাঁচানো যায়—সে বুদ্ধি ও সাহস তখন কারোই আসলো না। এমন সময় দেখা গেলো দশ বছরের খুব তেজীয়ান একটা ছেলে এসে তাড়াতাড়ি ঐ শিশুটাকে তুলে নিয়ে ফুটপাতে চলে এলো। একটু হলেই শিশুটি ঘোড়ার পায়ের তলায় চুরমার হয়ে যেতো। অবাক হয়ে সবাই তাকিয়ে দেখতে লাগলো—এই অদ্ভুত বালকটিকে। কেউ করলে তার সাহস ও বুদ্ধির সুখ্যাতি, কেউ আবার 'গোরার ডানপিটে' বলে ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করতে লাগলো। পাড়ার ভদ্রলোকেরা মাতঙ্গিনী কোরে অনেকে বলাবলি কোরতে লাগলেন—কোথাকার একটা নীচু জাতের ছেলের জন্যে একজন নামজাদা ও সম্ভ্রান্ত এটর্নির ছেলের নিজের বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ার কি দরকার ছিল? কিন্তু স্বামিজীর মহীয়সী জননী ভুবনেশ্বরী এই কথা শুনে তাঁর আদরের ছেলেকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, "বাবা! এই তো চাই, নিজের প্রাণ দিয়েও মানুষকে বিপদ থেকে বাঁচাবে।"

"আমাদের আছে সবই, নাই শুধু এক বস্তু—নিঃশেষে আত্মবলিদান—সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে ধ্রুবতারার দিকে লক্ষ্য স্থির করে একটি আদর্শের পশ্চাতে সারাটি জীবন অনুধাবনের ক্ষমতা। এই ক্ষমতা, এই tenacity of purpose আমাদের নেই, আমরা অন্তরের সঙ্গে দেশকে ভালবাসিনা, স্বজাতিকে ভালবাসিনা। আমরা যদি দেশকে ভালবাসতে শিখি তাহলে আত্ম-বলিদানের ক্ষমতা লাভ করব, আমাদের চরিত্রে অবিরাম ও অশ্রান্ত পরিশ্রমের ক্ষমতা (tenacity of purpose) ফিরে আসবে। এই দুইটি বল—tenacity of purpose বা moral stamina কোথায় পাব? বনে-জঙ্গলে যুগ-যুগান্তর ধরে তপস্যা করলেও পাব না। পাব নিষ্কাম কর্মের মধ্যে জীবন ঢেলে দিলে—অবিরাম সংগ্রামে লিপ্ত হলে। ঘরের কোণে বসে উপাসনা করলে বা সংসার ত্যাগ করলে—সাধনা বা শক্তি সঞ্চয় হয় না।

শত শত মহাপুরুষ এই দেশে আবির্ভূত হয়েছেন। অথচ তাঁদের আবির্ভাব সত্ত্বেও জাতি আজ কিরূপ শোচনীয় অবস্থায় পড়ে রয়েছে! জাতিকে বাঁচাতে হলে সাধনার দ্বারা আবার অন্তদিকে পরিচালিত করতে হবে। জাতিকে বাদ দিয়ে ব্যক্তিত্বের সার্থকতা নেই—একথা আজ সকলকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।..... যে যুগে আমাদের বাস, সে যুগের পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধনা করা আমাদের কর্তব্য। ভারতবর্ষকে কল্যাণে, মুক্তিতে, মহিমায় গরীয়সী করে তুলতে হলে এ যুগের প্রয়োজন—একটি কর্মবাদের দর্শন।"

• • •

"আমি জানি, এই পৃথিবীতে যা কিছুই সত্য, তা সবারই আছে মৃত্যু। জানি, মৃত্যু নেই স্বপ্নের, মৃত্যু নেই আদর্শের, মৃত্যু নেই মানুষের মনের। আমি হয়ত আমার স্বপ্নের জন্যে মরে যেতে পারি কিন্তু জানি আমার মৃত্যুর পরেও আমার সেই স্বপ্ন বেঁচে থাকবে, একদিন না একদিন তা সত্য হয়ে উঠবে শত সহস্র মানুষের জীবনে। এই বিশ্বাসের চেয়ে বড় আনন্দ আর কি আছে? এই আনন্দের চেয়ে মানুষের কাম্য আর কি আছে? আমার আত্মা একদিন অনুরূপ শত শত আত্মায় জীবন্ত হয়ে উঠবে, আমার অসমাপ্ত কর্মকে সার্থক সম্পূর্ণ করে তুলবে, এর চেয়ে বড় অভিজ্ঞান আর কি নিয়ে যেতে পারি?

.....ঠিক এই জন্যেই বিশ্ব-বিধাতা এই নশ্বর মানবদেহে আত্মার সংস্থান করেছেন..... আমার মৃত্যু দিয়ে আমার জাতি বেঁচে উঠবে, সেই জীবন্ত জাতির মধ্যে আমিই বেঁচে থাকবো....."

• • • •

Suffering-এর মধ্যে বুঝি কষ্টই আছে কিন্তু একথা সত্য নয়। Suffering-এর মধ্যে কষ্ট যেমন আছে তেমন আবার আনন্দও আছে। এই আনন্দবোধ যার হয়নি তার কাছে কষ্ট শুধু কষ্টই। সে ব্যক্তি দুঃখ-কষ্টের নিষ্পেষণে অভিভূত হয়ে পড়েও কিন্তু যে ব্যক্তি দুঃখ-কষ্টের ভিতর একটা অনির্বচনীয় আনন্দের আস্বাদ পেয়েছে তার কাছে Suffering একটা গৌরবের জিনিস। সে দুঃখ-কষ্টের চাপে মূর্ছা না হয়ে আরও শক্তিমান ও মহীয়ান হয়ে উঠে।..... যে ব্যক্তি কোনও মহান আদর্শকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসার দরুন দুঃখ যন্ত্রণা পায় তার কাছে দুঃখ-ক্লেশ অর্থহীন নয়। দুঃখ তার কাছে রূপান্তরিত হয়ে আনন্দ বলে প্রতীয়মান হয় এবং সেই আনন্দ অমৃতের শিরায় শিরায় শক্তিসঞ্চার করে। আদর্শের চরণে যে আত্মসমর্পণ করতে পারে সেই কেবল জীবনের অর্থ বুঝতে পারে এবং জীবনের অন্তর্নিহিত রসের সন্ধান পায়।

• • •

.....নীলকণ্ঠকে আদর্শ করে যে ব্যক্তি বলতে পারে আমার মধ্যে আনন্দের উৎস খুলে গেছে তাই আমি সংসারের সকল দুঃখ-কষ্ট নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিতে পারি, যে ব্যক্তি বলতে পারে আমি সব যন্ত্রণা-ক্লেশ মাথায় তুলে নিচ্ছি, কারণ এর ভিতর দিয়ে আমি সত্যের সন্ধান পেয়েছি, সে ব্যক্তিই সাধনায় সিদ্ধ হয়েছে।

—নেতাজী

যে কথা আপনিও ভাবছেন

বঙ্কিম-যুগের একজন মনস্বী লেখক বলিয়াছেন—'আমরা যে শুধু মানুষ নহি, তাহা নহে; আমরা একেবারেই অমানুষ।' লেখকের উক্তির পর অর্ধ শতাব্দীরও অধিককাল অতীত হইয়াছে, ইতিমধ্যে বিজ্ঞানের অভাবনীয় অগ্রগতি ঘটিয়াছে, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিরও অনেক পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু মনস্বী লেখকের উক্তিটি কি আজ মিথ্যা হইয়াছে? আপনি কি বলিবেন না, লেখকের মন্তব্যটি একালে যতটা সত্য, সেকালে তেমন ছিল না?

কেন এমন হইল? আমরা দীর্ঘকাল পরাধীন ছিলাম কিন্তু আমাদের গৃহে স্বরাজ ছিল। সেখানে পরস্পরের মধ্যে ছিল ভক্তি-প্রীতি, স্নেহ-মমতা, আত্মীয়তা-কুটুম্বিতার সম্পর্ক। আর আজ? ঐ যে আপনার প্রতিবেশী ন-বাবু, প্রকাণ্ড ধনী, সমাজে পদমর্যাদারও কম নয়, তাঁহার অন্তরের মধ্যে একবার দৃষ্টিপাত করুন তো? সেখানে বিরাজ করে সীমাহীন রিক্ততা। গৃহের মধ্যে সবাই স্ব-স্ব প্রধান। গৃহ-কর্তার সাধ্য নাই যে কাহারও বিরুদ্ধে দুর্বল দুটি কথা বলেন। শুধু ধন থাকিলেই কি মানুষ সুখী হয়? ঋষি বলিয়াছেন, তাহা হয় না। 'ন বিত্তেন তর্পনীয়ো মনুষ্যঃ।' আর আপনিও একবার নিজের অন্তরে দৃষ্টিপাত করিয়া বলুন তো, আপনার গৃহে কি মনাকি না এ্যানাকি, সোসিয়ালিজম্ না নিহিলিজম্?

ভাবিতেছিলাম, কেন এমন হয়। হঠাৎ মনে পড়িল, দাশরথি রায়ের সেই প্রসিদ্ধ গানের দুইটি পংক্তি—

'দোষ কারো নয়গো মা,
আমি স্বখাত-সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।'

মনে হইল, আমাদের গৃহে যদি সত্যই এ্যানাকি (অরাজকতা) বিরাজ করে, তবে সে দোষ কি অনেকটা আমাদের নয়? আমরা কি মানুষ হইয়াছি? আমরা কি সংযমী, মিতাহারী, মিতাচারী? Plain living ও high thinking কি আমাদের জীবনের আদর্শ? আমরা কি ঈশ্বরে ভক্তিমান্, ভারতের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান্? গৃহের মধ্যে কি আমরা ধর্ম ও নীতির একটা পরিমণ্ডল রচনা করিতে পারিয়াছি?

তাই মনে হইল, আজ আমাদের নিজেদেরও আত্ম-বিশ্লেষণ ও আত্ম-সমীক্ষার একান্ত প্রয়োজন। একবার বাহিরের জগৎ হইতে দৃষ্টিকে ফিরাইয়া অন্তরের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। নতুবা নিষ্ফল ক্রন্দনেই জীবনটা কাটাইতে হইবে।

ভারতের ঋষিও বলিয়াছেন—'আত্মানং বিদ্ধি', নিজেকে জান। গ্রীক দার্শনিকের কণ্ঠে ইহারই প্রতিধ্বনি—Know thyself.

———

অমৃত কথা ও কাহিনী

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা—

সকলকে ভালবাসতে হয়। কেউ পর নয়। সর্বভূতেই সেই হরিই আছেন। তিনি ছাড়া কিছুই নাই। প্রহ্লাদকে ঠাকুর বললেন, তুমি বর নাও। প্রহ্লাদ বললেন, আপনার দর্শন পেয়েছি, আমার আর কিছু দরকার নাই। ঠাকুর ছাড়লেন না। তখন প্রহ্লাদ বললেন, যদি বর দেবেন, তবে এই বর দিন, আমার যারা কষ্ট দিয়েছে, তাদের অপরাধ না হয়। এর মানে এই যে, হরি একরূপে কষ্ট দিলেন। সেই লোকদের কষ্ট দিলে হরির কষ্ট হয়। সাধুর রাগ দ্বেষ থাকবে না, সব সহ্য করা সাধুর দরকার। তাই ছেলেকে বলতাম, তুই আমার কথা সহ্য করবি, আমি তোর কথা সহ্য করব, তবে হবে, তা না হলে খাজাঞ্চিকে ডাকতে হবে।

ভক্তি গেলে মানুষ কি নিয়ে থাকে? তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য, তবু তিনি ভক্তাধীন। বড় মানুষের দারবান এসে বাবুর সভার একধারে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে কি একটা জিনিস আছে, কাপড়ে ঢাকা। অতি সঙ্কোচভাবে বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কি দারবান, হাতে কি আছে? দারবান সঙ্কোচভাবে একটি আতা বার করে বাবুর সম্মুখে রাখলে—ইচ্ছা, বাবু ওটি খাবেন। বাবু দারবানের ভক্তিভাব দেখে আতাটি খুব আদর করে নিলেন, আর বললেন, আহা বেশ আতা। তুমি এটি কোথা থেকে কষ্ট করে আনলে? তিনি ভক্তাধীন। দুর্যোধন অত ঘর দেখালে, আর বললে, এখানে খাওয়া দাওয়া করুন, ঠাকুর (শ্রীকৃষ্ণ) কিন্তু বিদুরের শাকান্ন সুধার ন্যায় খেলেন।

• • • •

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের কথা—

বহির্মতাবলম্বী কতকগুলি লোক আচার্য্যের নিকট এসে উপস্থিত হলেন। তাঁরা আচার্য্যকে প্রণাম করে বললেন, স্বামিন্, আমরা বহির্মতানুবর্ত্তী। বেদমধ্যে অগ্নিকে দেবগণের মধ্যে প্রথম বলা হয়েছে। অগ্নিই দ্বিজগণের দেবতা। ব্রাহ্মণগণ এঁর উপাসনা করে মুক্ত হন, ইনি পাপাহারী, এবং অলক্ষ্মীনাশক। বেদ মধ্যে অগ্নিদেবতার শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে এরূপ বিস্তর প্রমাণ আছে। আপনারাও এঁর উপাসনা করে কৃতার্থ হ'ন। এঁদের কথা শুনে আচার্য্য বললেন, দেখুন, বহ্নি দেবতাদিগের মধ্যে অধম, বিষ্ণুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং দেবতাগণ তন্মধ্যবর্ত্তী বলে শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে। অতএব বহিসাধ্য যে সমস্ত কর্ম্ম আছে, আপনারা তাদের অনুষ্ঠান এবং বিষ্ণুর আরাধনা করে শুদ্ধি অদ্বৈত ব্রহ্মপরায়ণ হ'ন, তাহলেই মুক্তিলাভ করতে পারেন।

আচার্য্যের এই বাক্যে তাঁদের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হ'ল।

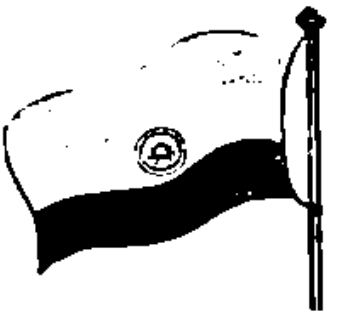

আমাদের সঙ্কল্প

"সংগ্রাম যত কঠোর ও দীর্ঘস্থায়ী হোক না কেন আক্রমণকারীদের ভারতের পবিত্র ভূমি থেকে বিতাড়িত করা সম্পর্কে ভারতীয় জণগণের দৃঢ় সংকল্প, এই সংসদ বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পূর্ণ সমর্থন করছে।"

১৯৬২ সালের নভেম্বর মাসে
সংসদ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব থেকে

জয় হিন্দ

আমাদের সঙ্কল্প
পুনরায় দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করার
এখনই সময়

আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করার সঙ্কল্প পুনরায় দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করার সময় এসেছে। সদা সতর্ক থাকুন, প্রতিজ্ঞায় অটল থাকুন– কারণ এটা আপনাদেরই যুদ্ধ। যা করার এখনই করুন। জাতীয় সেবা প্রতিষ্ঠানগুলিতে কাজ করার জন্য স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসুন ● সমস্ত রকম অপচয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করুন এবং সব রকম অপ্রয়োজনীয় ব্যয় পরিহার করুন ● খাদ্য ও বস্ত্র মূল্যবান জিনিষ। এগুলির অপচয় করবেন না ● সময়ও অত্যন্ত মূল্যবান। ঘণ্টা বা দিন হিসেবে সময়ের পরিমাপ করবেন না, আপনি কতটুকু কাজ করেছেন সেই অনুযায়ী সময়ের পরিমাপ করুন ● আপনার দায়িত্বগুলি পালন করুন। সব সময়ে সব জিনিষ শৃঙ্খলার সঙ্গে করুন।

সদা সতর্ক থাকুন

জাতীয় প্রস্তুতিতে

অংশ গ্রহণ করুন।

অন্তরীক্ষে

আমার ?

আমার ??

এখন
কথা নয়
কাজ

আমি যা বলি তাই করুন
আমি যা বলি তাই করুন
আমি যা বলি তাই করুন
কিন্তু আপনি যা করেন---?

অশ্লীল সাহিত্য ঃ

তুমি এ বই কোত্থেকে পেলে ?

তুমি যেখানে লুকিয়ে রেখেছিলে আমি ঠিক সেইখান থেকে পেয়েছি।

ভেজাল ঃ

স্যার, শতকরা তো ১০০ ভাগই ভেজাল মিশিয়েছি
এখন বলুন আর কত পার্সেন্ট মিশাব.....?

বড় সাধের হাঁস আমার — কত সোনার ডিমই না তুমি পেড়েছ—
আর আজ তোমায় বিদায় দিতে হচ্ছে—
শুধু ১৪ ক্যারেট পাড়ছ বলে ?

প্রতিযোগিতা

আশাপূর্ণা দেবী

খাতাখানা যদি এমনি টেবিলে পড়ে থাকতো আরও পাঁচটা বই কাগজের সঙ্গে, নিশ্চয়ই শুভময়ের চোখেও পড়ত না। অন্ততঃ খাতার মধ্যেকার বিষয়বস্তু তো নয়ই। কারণ খাতার মলাটই পরিচয় দিচ্ছিল এটি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র তিলকের অঙ্কের খাতা।

কিন্তু শুভময় তার ভিতরের তথ্যের সঙ্গেও পরিচিত হতে বাধ্য হলেন। কারণ টেবিলে ঠিক তাঁর লেখার জায়গাটিতেই খাতাখানা প্রজাপতির মত দু'দিকে দু'টি পক্ষ বিস্তার করে উপুড় হয়ে পড়ে ছিল।

অতএব শুভময় তুললেন তাকে। হয়তো বা মুড়ে সোজা করে রেখে, নিজের জন্যে জায়গা পরে করে নিতে। কিন্তু মুড়ে রাখা হ'ল না, উল্টেই চমৎকৃত হলেন শুভময়। অঙ্কের খাতায় লিখা একটি পূর্ণা কবিতা।

আয়ে! কী এ?

শুভঙ্করীর আধুনিক ছড়া না কি?

না কি তিলকবাবু কবিতা লিখতে সুরু করেছেন? বালক পুত্রের এই উন্নতিতে কৌতুক অনুভব করলেন শুভময়, এবং তিলকের বয়স হিসেব করে ভাবলেন অবশ্যই নিষিদ্ধ বস্তু কিছু নেই। চোখের সামনে তুলে ধরা চলে।

তুলে ধরলেন।

আর সঙ্গে সঙ্গে অমল কৌতুকের সেই শিথিল দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল তাঁর। বার দুই পড়লেন কবিতাটা, মানে—যদি তা'কে কবিতাই বলা হয়, তারপর আস্তে খাতাটা মুড়ে রাখলেন।

অনেকক্ষণ পরে মুখে একটু ক্ষীণহাসি ফুটে উঠল। হয়তো বিরক্তির আর ব্যঙ্গের নয়, কৌতুকেরই।

বুঝলেন খাতাটা তিলক অসতর্কে লিখতে লিখতে ফেলে রেখে যায়নি। কারণ দেখা যাচ্ছে তলায় নাম সই থেকে তারিখ বসানো পর্যন্ত সব কমপ্লীট্। বাবাকে তার অমূল্য অবদানটি দেখাবার উদ্দেশ্যেই তিলকের এই অসতর্কতার ভাণ।

দশ বছরের ছেলের পক্ষে এটাই তাদা স্বাভাবিক বাবা তার ভাণ ধরতে পারবেন না, অসতর্কতা বলেই মেনে নিয়ে ডেকে পিঠ চাপড়াবেন।

পিঠ চাপড়াবেন।

মুখের সেই ক্ষীণ হাসিটুকু মিলিয়ে গেল শুভময়ের।

কিন্তু তিলক কই?

মনে হচ্ছে বাড়ীতে নেই।

তা' বাড়ীতে কি কেউই আছে!

সারা বাড়ীটা নিঃসাড়।

শুধু নীচের তলার রান্নাঘর থেকে চাকর নফরের কর্মতৎপরতার কিঞ্চিৎ নমুনা আসছে বাসন পত্র হাতা খুন্তির মাধ্যমে।

আজকাল সন্ধ্যাটা প্রায় রোজই এই ভাবে কাটছে: নিঃসাড় বাড়ীতে একাই ঘোরা-ফেরা করেন শুভময়। স্ত্রী কন্যা বড় ছেলে একে একে কেটে, রাত করে। তিলক থাকতো, তার মাষ্টার আসতো, সেও আজকাল প্রায়ই থাকছে না, মাষ্টার ফিরে যাচ্ছে।

এসব অনিয়ম মেনে নেওয়া ভিন্ন উপায় নেই। ওরা নাকি প্রতিযোগিতার কাজ করছে। কী সেই কাজ ঠিক অনুধাবন করতে পারেন না শুভময়। কারণ স্বভাবতঃই তিনি 'ধরণুনো।' অন্যচিন্তার কর্মজগৎ থেকে উদ্বৃত্ত যে সময়টুকু, তিনি সেটুকু কাজে লাগান লেখাপড়ায়। পড়েন প্রচুর, লেখেনও কিছু কিছু।

অবশ্য ওঁর সেই লেখাকে ওঁর স্ত্রী পুত্র কন্যা কোনদিনই মূল্য দেয় না। শেফালী তো জোর গলাতেই বলে, 'সময় হলো তো ষাড়গুঁজে লেখা। সমাজ সংসার বলে যে কিছু আছে, তা' আর জানলে না। তা' আবার কী লেখা! মা রামায়ণের অনুবাদ! কে ছাপবে ও বই? কিনবেই বা কে? রামায়ণ মহাভারত আজকাল আবার কেউ পড়ে না কি? এ সময়টা যদি গল্প উপন্যাস লিখতে, ঘরে চারটি পয়সা আসতো! দেখিতো বন্ধায়! পাবলিশাররা বাড়ীর হাটি নেয়, সম্পাদকরা দু'বেলা হাঁটাহাঁটি করে।'

শুভময় হাসেন।

বলেন, 'তোমার বন্ধার মত শক্তিশালী কলম আমার হাতে থাকলে কি আর তোমার এই অবস্থা হতো?'

শেফালী অবশ্য ঘোরে এটা বাদ। রেগে বলে, 'আমরা সাধারণ মানুষ, ওই সাধারণটাই বুঝি: হ'তে পারে বন্ধা খুব রাশিশ লেখে, কিন্তু নামডাকটা কিছু কম?

তা' এসব আগের কথা।

সম্প্রতি শুভময়ের স্ত্রী কন্যা পুত্র সবাই রাগ ত্যাগ করে শুভময়কে করুণার চোখে দেখতে সুরু করেছে।

লোকটার দ্বারা যে কিছু হবে না, সেটা নিশ্চিত বুঝে ফেলেছে ওরা।

হয়তো ওদের কথাই ঠিক। নইলে শুভময় দেশের এই সংকট সংকুলের সময়েও ওঁর সেই 'রামায়ণের সরল গদ্যানুবাদ' নিয়ে পড়ে আছেন? বাড়তি কোনও কর্মক্ষমতার পরিচয় দিতে পারছেন না! অথচ শেফালী? মেয়ে হয়েও কত কীই করছে।

আজকাল তো ওর নাগাল পাওয়াই দায়। মেয়েটাকে সুদ্ধু নিয়ে বেড়ায়, সামনেই যে তার ফাইন্যাল পরীক্ষা তা' ভাবে না।

নিজের খাতাপত্র খুলে শুভময় একবার ভাবলেন, পরীক্ষাকে কি আরও একবার সাবধান করে দেওয়া উচিত নয় ওঁর? পরীক্ষার মুখে এমন করে ঘুরে বেড়ানো—। মনে পড়ল সেদিন সাবধান করতে গিয়ে শেফালীর গঞ্জনা খেয়েছিলেন। শেফালী বলেছিল, 'কী চাও তুমি? দেশের এই

যুদ্ধে তোমার গায়ে আঁচড়টি লাগবে না? অনেক দিতে হবে আমাদের যুগলে? অর্থ সামর্থ্য, আয়ার আয়েস, বর্তমানের শৃঙ্খলা, ভবিষ্যতের স্বপ্ন। শুধু যদি দেশের কাজ করতে বলে পরীক্ষায় ফেল্ করে, কোনও দুঃখ নেই আমার।'

কিন্তু শুভময় দুঃখ অনুভব করছেন।

ভাবছেন, একদিকে ফেল্ করে অন্য দিকে পাস করার মূল্য কি?

চিন্তায় বাধা পড়ল।

নীচের তলায় শেফালীর সাড়া পাওয়া গেল। ঘুটে কি রিকসাওলা কারু সঙ্গে যেন ঝগড়া করছে। অনেক শব্দ - অনেক কথা। এত কি সওদা করে আনলো শেফালী?

অসন্তুষ্ট ঘুটেওয়ার বকবকানি থামছে না।

উঠতে হল শুভময়কে।

নীচে নেমে গিয়ে বিনা বাক্যে লোকটার হাতে একটা আধুলি দিলেন। লোকটা সেটা একবার উল্টে পাল্টে দেখে নিয়ে নমস্কার করে চলে গেল।

শেফালী ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে, 'এটা কী হল?'

'বলছি'—শুভময় বলেন, 'কিন্তু তোমার এটা কি? চার ক্যানেস্তা কেরোসিন কী হবে?'

'কী হবে, সে আর তোমার জেনে কী হবে? শেফালী তীব্র ভাবে বলে, 'সংসারের দরকারের কথা কোনদিন ভাবো তুমি? সমিতির মিসেস ঘোষ বললেন, শীগগিরই এমন একটা সময় আসবে, যখন কেরোসিন একেবারেই পাওয়া যাবে না। তার মানে 'অনতা' অচল। তার মানে আবার সেই ঘুটে কয়লা কাঠ! বাড়ীতে ধোঁয়া আগুনতাত মাথাধরা।

'কতদিন পাওয়া যাবে না কেরোসিন?' শুভময় নিরিহ প্রশ্ন করেন।

'তা' কে হাত গুনেছে?' শেফালী বলে, 'বছরের পর বছরও হতে পারে।'

শুভময় মৃদু হেসে বলেন, 'বছরের পর বছর! সেই অগাধ দরদভূমি তোমার এই চারটিন তেলে ভিজবে?'

'এই চারটিনেই থেমে থাকবো ভেবেছ? যতদিন পাওয়া যাবে সুবিধে হলেই কিনে নেব দু'চার টিন করে। তোমার মতন নিশ্চিন্ত চিত্ত হলে আর সংসার করতে হ'ত না। এখন থেকেই তো ভেবে মরছি আমি কি পাওয়া যাবে, আর কি যাবে না। কোনটার জন্যে বেশী অসুবিধেয় পড়বো। এইতো—আরও একটা কথা বলছিলেন আমাদের 'কার্ড এন্ড' ক্লাবের তনিমাদি। 'ডেটল' ও নাকি পাওয়া যাবে না আর। না পাওয়াই স্বাভাবিক! সেও যোতল কতক কিনে রাখতে পারলে—সে যাক, কিন্তু তুমি হঠাৎ নেমে এসে কিছু না শুনে-টুনে খামোকা রিকসা-ওলাকে পয়সা দিলে যে?'

'দিলাম। বকাবকি খারাপ লাগছিল। শব্দ কোথা?'

'এসময় যেখানে থাকে রোজ। ওদের নাটকের রিহার্শালে—'

'ও! তিলকও বুঝি যোগ দিয়েছে তা'তে?'

'চমৎকার। তিলু ওদের নাটকে যোগ দিতে যাবে কেন? ওদের স্কুলের মাষ্টার মশাইরা ওদের

নিয়ে একটা কাণ্ড করছেন বলছ না সে দিন ? স্বরচিত কবিতার একটা কম্পিটিশান আছে। তাছাড়া – '

শেফালীর কথার মাঝখানেই তিলক এলো।

শুভময় একটু গম্ভীর হলেন।

বললেন, 'তোমার মাষ্টার মশাই বোধহয় এসে ফিরে গেছেন ?'

তিলক সভয়ে বলে ওঠে, 'বাঃ আমিতো বারণ করে দিয়েছিলাম। শনিবারে আর বুধবারে আমার সময় হবে না বলেছিলাম।'

'ওঃ তাই বুঝি। তা'হলে হয়তো আসেননি। আমি শুধু অনুমান করছিলাম। আচ্ছা সময় হলে আমার ঘরে একবার এসো।'

তিলক বাবার মুখের দিকে একবার তাকাল। ঠিক বুঝতে পারল না। ভাবছিল কবিতার জন্যে বেশ একখানা তারিফ পাবে। কিন্তু বাবার গলার সুরটা কেমন বেসুরো মনে হচ্ছে যেন।

'এটাই বোধকরি তোমার জীবনের প্রথম কবিতা ?'

'হ্যাঁ' স্বরটা মৃদু হলেও তীক্ষ্ণ। ধারে তীক্ষ্ণ।

তিলক নিতান্ত বালক হলেও সেটা ধরতে পারে। তাই চুপ করে থাকে।

'কি ? তাই না ?'

'হ্যাঁ।'

'তা' বেশ। সাবজেক্টটা ভালই বেছে নিয়েছ। কিন্তু হঠাৎ এটা লিখতে গেলে কেন ?'

তিলক আজকেই যা একটু খতমত খাচ্ছে, নচেৎ মুখচোরা সে মোটেই নয়। শুভময় বরাবরই ছেলে-মেয়েদের শিখিয়ে এসেছেন, 'যা বলবে স্পষ্ট গলায় বলবে।'

তা' এবার তিলক স্পষ্ট গলাতেই বলে। বলে, 'দেশাত্মবোধক কবিতার প্রতিযোগিতার জন্যে হেড, 'স্বর' লিখতে বলেছিলেন।'

'দেশাত্মবোধক কবিতার জন্যে –' আস্তে আস্তে থেমে থেমে বলেন শুভময়, 'কী আশ্চর্য্য ! তার জায়গায় এটা কি হয়েছে ? এর মধ্যে তোমার দেশাত্মবোধ কোথায় ?'

তিলক অবাক হয়ে বলে, 'বাঃ সবটাইতো দেশাত্মবোধ। দাদা মা দিদি সবাইতো খুব প্রশংসা—'

'সবাই খুব প্রশংসা করেছেন ? বল কি ? কিন্তু আমি তো আদৌ বুঝতে পারছি না এর মধ্যে দেশাত্মবোধ কোন খানে ফুটে উঠেছে। আচ্ছা—নিজেই তুমি পড়তো একবার।'

তিলকের এবার ভরসা ফিরে আসে।

কেন না স্কুলে রেসিটেশানে তা'র বিলক্ষণ নাম আছে। বোকে পড়ার দোষেই তার কবিতার মূল রস বাবার হৃদয়ঙ্গম হয়নি। কবিতা কি মনে মনে পড়বার জিনিস ?

বাবার হাত থেকে খাতাটা টেনে নেয় সে। যদিও নেবার দরকার ছিল না। আগাগোড়াই মুখস্থ তার। তবু বাবার সামনে বলেই। যদি নার্ভাস হয়ে হঠাৎ ভুলে যায় এক আধ লাইন।

খাতাটা হাতে নিয়ে বেশ কায়দা করে ঘাড় বাঁকিয়ে আবৃত্তি সুরু করে দেয় সে।

'ওরে চীন! পাজী চীন!
বাঘ আরশোলা টিকটিকি খেগো
তাবলে না দিন দিন।
নাক খ্যাঁদা আর হলদে মুখওলা বুনো বর্বর চীন।
হতভাগা মাথা নোয়ো ইঁদুর চুঁচো –
আর দেখি, তোরে, কেটে করি কুচো কুচো।
সেই রক্তের সমুদ্রে ধোয়া—
নাচবো তা' দিন দিন।
ওরে মনসেল উল্লুক পা—'

'থামো থামো!'

শুভময় প্রায় আর্তস্বরে বাধা দিয়ে ওঠেন। 'যথেষ্ট হয়েছে। তোমার ওই ছোট্ট মুখটা থেকে এই সব কথা বার হচ্ছে কি করে, তাই ভেবে, পাচ্ছি না। বল এর মধ্যে দেশাত্মবোধ কোথায়?'

'কোথায়? বাঃ।'

তিলক বোধকরি 'কোথায়' এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর খুঁজে না পেয়েই এদিক ওদিক তাকায়।

শুভময় ওর বিমূঢ় ভাব দেখে একটু হাসেন। বলেন, 'না নেই। এদিকে ওদিকে পিছনে আসলে কোথাও নেই। তুমি ছেলেমানুষ তাই বুঝতে পারছ না এটা কিছু হয়নি। হয়েছে স্রেফ একটা নোংরা গালাগালের ছড়া। এ লেখা শুধু তোমার মনের নীচতাকেই প্রকাশ করেছে, দেশাত্মবোধের মত মহৎ বস্তুকে নয়।'

তিলক বিড় বিড় করে বলে, 'ক্লাসের ছেলেরা বলল—'

'কী বলল?'

'বলল ভাল হয়েছে।'

'তা' বলতে পারে। তারাও ভয়ঙ্কর একটা ভুল পথের মধ্যে ঢুকে পড়ে ভাবছে এটাই ঠিক। আমি বলছি, এ ঠিক নয়। না না, এই যুদ্ধতে আমাদের আর যত ক্ষতি হোক, আমাদের সত্যতাটুকু যেন হিতে না হয়। তিলক, আমি চাইনা যে এই নীচ জিনিসটা তোমার হাতকে আর মনকে কলঙ্কিত করুক। তাই এটা ছিঁড়ে ফেলছি। বুঝলে? একটু ভাল করে ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে কেন ছিঁড়লাম।' খাতা থেকে পাতাটা ছিঁড়ে কুচিকুচি করে ফেলে দিয়ে শুভময় বললেন, 'যুদ্ধে আবার নতুন করে লিখতে বোসো। ভাল জিনিস নিয়ে, সৎ জিনিস নিয়ে, দেশমাতাকে রক্ষা করবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে! অবাক হয়ে গেছি আমি তিনু, অদ্ভুত ভাবে অবাক হয়ে গেছি। ভেবে পাচ্ছি না এত খারাপ খারাপ কথা তুমি শিখলে কোথা থেকে? এ রকম শিক্ষা তো তোমাদের ছিল না!'

কিন্তু কে শুনছে শুভময়ের আক্ষেপ?

বেচারা তিলকের তো তখন হরবিগলিত অবস্থা। প্রকাণ্ড আশার গেয় প্রচণ্ড কোপটা বড্ডই লেগেছে। শুভময় দুঃখিত হলেন। তবু ময়তাকে প্রশ্রয় দিলেন না। শুধু একটা নিশ্বাস পড়ল।

তাঁর জীবনের শিক্ষা কি তাঁর সন্তানের মধ্যে অনুসরিত হবে না? জয়ী হবে শেফালী? জয়ী হবে পারিপার্শ্বিকতা? শুভময় পরাজিত হবেন?

বড় ছেলে দীপক।

সে তো বড় হয়ে ওঠা ইস্তক চলে গেল নাগালের বাইরে, ধরে বসল ভিন্ন পথ ভিন্ন মত। তবু—ছেলের সেই পথকে সমর্থন না করলেও ছেলেকে শ্রদ্ধা করতেন শুভময়। ছেলে তাঁকে অবজ্ঞা করলেও করতেন। হাঁ, অবজ্ঞাই করতো দীপক বাপকে।

শুভময় যে একটা প্রগতিহীন নীতি আঁকড়ে বসে থেকে তাঁদের বাড়তে দিচ্ছেন না, সভেজ হতে দিচ্ছেন না, একথা স্পষ্ট বলতেও ছাড়ত না।

কিন্তু দীপক সহসা তার মত ও পথ বদলেছে। সেই বদলের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছেন শুভময়। তাকে অশ্রদ্ধা করতে সুরু করেছেন। ছেলের যে দৃঢ়তাটুকু অন্ততঃ তাঁর কাছে শ্রদ্ধার বস্তু ছিল, সেটা যে একটা দাঁপা স্যাস বেলুন মাত্র, এ অনুধাবন করে ধিক্কার আসছে তাঁর। সেই চুপসে যাওয়া কাটা বেলুনের অবশেষটুকুর দিকে তাকিয়ে দেখতেও অপ্রবৃত্তি আসছে।

শেফালী অবশ্য শুভময়ের এই মনোভাবের কিছু কিঞ্চিৎ টের পেয়ে হৈ হৈ করে উঠেছিল। গালে হাত দিয়ে বলেছিল, 'বলি বটে। তোমার—অত পাওয়া ভার। ছেলে যখন কম্যুনিষ্টের খাতায় নাম লিখেছিল তখন তো তোমার উপদেশামৃতের জ্বালায় বাড়ীতে টেঁকা ভার ছিল যাহার। এখন সে নাক কান মলে ভুল বুঝে ঠিক পথে এসেছে, এখন আবার তোমার তাকে উল্টো ঘেন্না! তোমার মতন লোকের যে কেন সংসার করার সাধ হয়েছিল তাই ভাবি। উচিত হয়নি, উচিত হয়নি।'

সত্যিই হয়তো উচিত হয়নি। শুভময় ভাবেন, নইলে কিছুতেই কেন কারো মনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেন না মনকে বুঝিয়ে! কেন মনে হয় তিনি যেন এদের থেকে অনেক দূরের মানুষ। দূরের মানুষ বলেই তো সহজ করে বোঝাতে পারেন না, কেন তিনি দীপককে তখনও সমর্থন করতে পারেননি, এখনো সমর্থন করতে পারছেন না। কেন খুঁজতে বসছেন, এদের জীবনের সত্য ভবে কোথায়?

খেতে বসে তিলককে দেখতে পেলেন না। শেফালী ননীকে দিয়ে কেরোসিনের টিনগুলো শোবার ঘরে শ্বশুরের আমলের উঁচু পালঙ্কের তলায় রাখাতে রাখাতে ভারী মুখে বলে, 'সে খাবে না, খিদে নেই।'

শর্বরী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে, 'কেঁদে কেটে ঘুমিয়ে পড়ল, শরীরটা না খারাপ হয়। দু'দিন বাদে স্কুলের ফাংশন।' শর্বরীর কণ্ঠের এই তীক্ষ্ণতার মধ্যে কোথায় যেন অভিযোগের সুর।

শুভময় ভাবলেন পরদিন ছেলেটাকে কাছে ডেকে আর একটু ভাল করে বোঝাবেন। বোঝাবেন তার ভ্রান্তি কোথায়। বোঝাবেন শুভময়ের আপত্তি কোথায়।

কিন্তু কোথায় তিলক?

পরদিন সকালে না, বিকেলে না, রাত্রে না, তারপরদিনও না। তুমুলের ঘুম হয়ে উঠল তিলক।

কখন নায়, কখন খায়, কখন শোয় পাত্তা পাওয়া ভার। শেফালী বলে, 'কি জানি কোথায় যেন গেছে।' সর্বরী বলে, 'তাকে নিয়েই তো মাষ্টারমশাইর কাড়াকাড়ি। ক্লাশের মধ্যে ওই তো পাতা!'

শুভময়ের ছেলেকে নিয়ে মাষ্টারমশাইর কাড়াকাড়ি, শুভময়ের ছেলে ক্লাশের পাতা, এর চাইতে সুখের ব্যাপার আর কি আছে? তবু কেন শুভময়ের কোথায় যেন খচ্ খচ্ করে। শুভময় স্থিতধী-ছাড়া এতে কি আর সন্দেহ আছে?

শনিবারের পড়ন্ত বেলা।

শেফালী এসে কার্ডটা সামনে রাখল।

'দেখ, আমি ভেবেছিলাম যাব, কিন্তু হল না। তনিমাদি খবর পাঠিয়েছেন আজ সন্ধ্যায় একটা জরুরী মীটিং। বসুদেরও তো আজ প্লেস রিহার্শাল, বাড়ী থেকে কেউ না গেলে তিলুর মনটা খারাপ হবে।'

'কী। আজই ওদের সেই ফাংশান নাকি? কিন্তু আমাকে কেন, মানে আমি কেন?'

'তুমি কেন! আশ্চর্য! কী আর বলব! তুমি ওর বাবা এটাই একটা কারণ। আমি তো আমার কর্তব্যের ষোল আনা করছি, তুমি না হয় এক নয়া পয়সা পিতৃকর্তব্য পালন করলে?'

'আহা তা' নয়। মানে, আমি বলছিলাম কি—'

'তুমি কি বলছিলে, তুমি কি বলবে, তুমি কি কি বলতে পার, সবই আমার মুখস্থ হয়ে গেছে, কষ্ট করে আর বলার দরকার নেই। আমি এই কার্ড রেখে চললাম, ইচ্ছে হয় যেও, না ইচ্ছে হয় যেও না।'

শেফালী দ্রুতবেগে নেমে যায়।

অগত্যাই উঠতে হয় শুভময়কে।

একেই তো ছেলেটা আজ দু'দিন ধরে অভিমানে মুখ লুকিয়ে বেড়াচ্ছে, আবার যদি আজ কেউ ওর স্কুলে না যায়—

শুভময় যখন পৌঁছলেন তখন ওদের উদ্বোধন সঙ্গীত হয়ে গেছে, ঘোষকরি আরও কিছু হয়ে গেছে, মাইকে কতকগুলো নাম বলা হচ্ছে। সেশান্সঘোষক কবিতার প্রতিযোগিদের নাম।

'...অরুণ সেন, বাবলু রায়, পিকলু শাহ', অরুণ চ্যাটার্জি'...আরও কি সব যেন।

কই তিলক গঙ্গোপাধ্যায় বলল কি?

আহা নাতো। দু'দিনের মধ্যে নতুন কিছু রচনা করা বোধহয় সম্ভব হয়নি বেচারার। শুভময় ভাবলেন, আর দু'একদিন আগে যদি—

কিন্তু না তো! মাইকের সামনে প্রথম এসে দাঁড়াল তো তিলকই। তা'হলে প্রথমেই বোধহয়—

'হ্যাঁ প্রথমেই ওর নাম ছিল। তিলক গঙ্গোপাধ্যায়। ক্লাশ ফাইভ। সেকশন এ। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে ইনি একটি রৌপ্যপদক লাভ করেছেন। কবিতাটি তিনি এখন আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছেন।'

শুভময় আশ্বস্ত হ'লেন।

তা'হলে তিলক একটা কিছু বানিয়ে তুলেছে।

শুভময় অবাক হলেন, এত ছেলেদের মধ্যে কবিতায় তিলকই প্রথম হয়েছে

শুভময় কৌতুক অনুভব করলেন।

ক্লাশ ফাইভের ছেলেদের সম্পর্কে 'ওনি' 'তিনি'র প্রয়োগ শুনে।

তাদের শুভময় অবহিত হলেন। হাসলেন মনে মনে।

ওঃ দাঁড়ানোর কী কায়দা বাবুর। যেন ভারী একটা মাতব্বর। ফুলের মত রুচি মুখটি নিয়ে—

সহসা চিন্তার গতি স্তব্ধ হয়ে গেল শুভময়ের।

এতগুলো লোকজন আর আলো আলপনা সমেত সমস্ত প্যাণ্ডেলটা বাসন্তী হয়ে গেল যেন। মনে হ'ল যা শুনছেন, তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে না। অনুভূতির স্তরের বাইরে কে যেন কী বলে চলেছে।

এসব কথা শুভময় টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে রাস্তায় ফেলে দিয়েছিলেন না? মরা সাপ ফণা তুলে উঠে ছোবল মারে?

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন।

অনেকগুলো হাঁটুকে ঠেলতে ঠেলতে বেরিয়ে এলেন খোলা জায়গায়।...কিন্তু কথাগুলো যে পিছন থেকে তাড়া করছে।

'...ওরে চীন তোর মুখে দিই থুতু,
বুকে মারি কসে লাথি।
ডেকে আন তোর আছে যত ছেলে নাতি...'

দ্রুত পায়ে এগোতে লাগলেন শুভময়। খোলা হাওয়ায় নিশ্বাস নিতে চেষ্টা করলেন। হ'ল না। আরও কথা,...নোংরা নীচ কথা - শুভময়ের বালক পুত্রের রূপ ধরে তাড়া দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাঁকে।... 'পাজী রাস্কেল চীন...বেটে বাঙ্কল চীন, এতদিনে তোরে চিনেছি যে মোরা চীন...'

ভয়ঙ্কর একটা হাততালির শব্দ উঠেছে। মনে হচ্ছে অনেকগুলো কাঠে কাঠে ঠোকাঠুকি হচ্ছে।

শুভময় বেরিয়ে এসেছেন, চলে যাচ্ছেন, তবু যেন ওই হাততালির শব্দ তাঁকে তাড়া করছে। আশেপাশে শুনতে পাচ্ছেন টুকরো টুকরো কথা।... 'ওয়াণ্ডার ফুল'...'আশ্চর্য!'...'অতটুকু ছেলে'... 'বলছিলাম না এই যুদ্ধে মায়ের কোলের শিশুটিও জেগে উঠেছে!'...

শুভময় চলতে চলতে একবার আকাশের দিকে তাকালেন।

বোধহয় কৃষ্ণপক্ষের রাত। চাঁদ দেখতে পেলেন না, শুধু নক্ষত্ররা ঝিক্‌ঝিক্ করছে।...নক্ষত্র যে কী জিনিস না' শুভময়ের জানা নেই এমন নয়। তবু সেই ছেলেবেলার বিশ্বাসের সংস্কারে ওরা যেন হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া মৃত প্রিয়জনের আত্মার মত মৌন করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখল, শুভময়ের মুখের দিকে।

আর চলতে চলতে সম্পূর্ণ অবান্তর একটা দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠল তাঁর। পালঙ্কের নীচে সাজিয়ে রাখা শেফালীর সঞ্চিত সেই কেরোসিনের টিনগুলো। আরও নাকি কিনবে শেফালী। স্টক্ বাড়িয়ে চলবে।

কিন্তু হঠাৎ যদি ওগুলোয় কোন রকমে আগুন ধরে যায়। কিছু কি আর বাকী থাকবে তা'হলে?

শুভময়ের মনে পড়ল ওই উঁচু পালঙ্কটা তাঁর পিতামহর আমলের।

———

লেখিকার কথা

শ্রীশান্তা দেবী

যাঁরা কথাসাহিত্য বা কবিতা রচনা করে থাকেন আমাদের দেশে লোকে তাঁদেরই সাহিত্যিক বলে থাকে। কিন্তু এই সংজ্ঞাটা আমার মতে ভুল। ভাষায় ভাবে ও চিন্তায় যে সকল প্রবন্ধ স্থায়ী যশ অর্জন করার মত, যার যুক্তি, প্রকাশ ভঙ্গিমা, উদ্দীপনীশক্তি অতুলন তা চিরদিনই সৎসাহিত্য। শিল্পীদের যে P. E. N. আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করেছে তাতে কবি, সম্পাদক, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার সকলেই সাহিত্যিক বলে স্বীকৃত হয়েছেন। সেই হিসাবে লেখিকা বলতেও আমরা আরো অনেকের কথা বলতে পারি যাঁরা হয়ত গল্প লিখে যশ পাননি।

এমনি একজন ছিলেন সরলাদেবী চৌধুরাণী। ইনি দীর্ঘদিন 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন, স্বদেশীযুগে গান ও প্রবন্ধ লিখে এবং 'বীরাষ্টমী' ব্রত স্থাপন করে রাজনীতি ক্ষেত্রেও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সরলাদেবী ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবীর কনিষ্ঠা কন্যা। আমরা শৈশবকালেই সরলাদেবীর নাম শুনেছি। আমার মা সুগায়িকা ছিলেন, গান ভালবাসতেন বলে স্বরলিপি দেখে গান শেখবার তাঁর ইচ্ছা ছিল। এই জন্য বাবা মাকে একটি স্বরলিপির বই কিনে দিয়েছিলেন। বইটির নাম ছিল 'শতগান'। শতগানের স্বরলিপি করে সেটি প্রকাশ করেন সরলাদেবী। একশত গানের সব কটিই আজ আর মনে নেই। সে প্রায় ষাট বৎসর আগের কথা। কিন্তু শৈশবে মার মুখে 'বন্দেমাতরম্' গান শুনেছিলাম এই শত গানেরই কল্যাণে। এবং সুরটা শিশুদের পক্ষে সোজা ছিল বলে মা আমাদের স্বদেশী গান "উঠগো, ভারতলক্ষ্মী, উঠ আদি জগৎজনপূজ্যা" শিখিয়েছিলেন। "চিনি গো চিনি ওগো বিদেশিনী" এবং ভানুসিংহের "সুন্দরী রাধে আওরে ধনি" প্রভৃতি গানও মা শতগান থেকে শিখে আমাদের শিশুকালে শোনাতেন। এই 'শতগান' ছাড়া সরলাদেবীর নাম আর এক জায়গায় দেখতাম সেটা সেকালের 'ভারতী'। ছোট ছোট সাইজের মোটা মোটা পত্রিকা তার উপর সরলাদেবীর নাম লেখা থাকত ১৩০৮ কি ১৩০৯ সালে। পত্রিকা পড়বার বয়স হয়নি, কিন্তু কাগজগুলি প্রতিমাসেই মার হাতে দেখতাম।

এই সরলাদেবী এবং তাঁর দিদি হিরণ্ময়ী দেবীকে প্রথম দেখলাম কাশী কংগ্রেসে। আমার বাবা কংগ্রেসে এলাহাবাদ থেকে ডেলিগেট হয়ে গিয়েছিলেন শিক্ষা বিষয়ে একটা বড় প্রস্তাব সম্পর্কে বলতে। এতই ছেলেমানুষ আমি যে সে বিষয়ে আমার কিছুই মনে নেই। আমি অনেক বৎসর পরে অপরের মুখে শুনেছিলাম যে বাবা কংগ্রেসে ওই বিষয়ে বলেছিলেন। কিন্তু এটা খুব ভাল করেই মনে আছে যে আমাদের সকলকে বাবা কাশীতে নিয়ে গিয়েছিলেন সেই সময়ই একেশ্বর-বাদীদের সম্মিলন হওয়াতে। কাজেই রোজই কংগ্রেস মণ্ডপে যাবার সৌভাগ্য হত। মহিলাদের দুটো বসবার জায়গা ছিল। একটা পরদার মধ্যে, আর একটা পরদার বাইরে। পরদার বাইরে অন্যান্য মহিলাদের মধ্যে একজন সুসজ্জিতা মহিলাকে দেখলাম তাঁর মাথায় বেনারসী ওড়না। ওড়না ছাড়া বাকি সাজটা খুব জমকালো নয়। শুনলাম তাঁর নাম হিরণ্ময়ী দেবী। শান্ত স্নিগ্ধ একটু বিষণ্ণ চেহারা। পরে শুনেছিলাম ইনিও কিছুকাল সরলাদেবীর সঙ্গে 'ভারতী'র সম্পাদনা করেছেন। আমরা এলাহাবাদে খুবই লাদাসিধা ভাবে মানুষ হয়েছিলাম। কাজেই কংগ্রেস মণ্ডপে মহিলা এবং কোনো

কোনো পুরুষের সাজসজ্জা আমাদের খুব চমৎকার লাগিয়ে দিয়েছিল। বক্তৃতা বোঝবার ক্ষমতা ছিল না, কাজেই সাজপোষাক আর ভীড় দেখতাম।

একদিন দেখলাম মঞ্চে ঢুকলেন দুজন ব্যক্তি—একজন মহিলা ও একজন পুরুষ। কি চমৎকার জমকালো সাজ, আর কিরকম উজ্জ্বল গৌরবর্ণ যেন ফেটে পড়েছে। দুজনেই লম্বা চওড়া, আভিজাত্য-ব্যঞ্জক চেহারা। একজন কে বলেছিলেন, এঁরা হলেন সরলাদেবী ও রামভুজ দত্তচৌধুরী, সদ্য বিবাহের পরে এসেছেন। সরলাদেবী অল্প বয়সে বিবাহ করেননি। রাজনীতি ও সাহিত্য সঙ্গীত প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করার পর তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের পর সরলা দেবী বাংলাদেশ ছেড়ে পাঞ্জাবে চলে যান। সেখান থেকেই বোধহয় ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে এলাহাবাদ কংগ্রেসে আসেন। এবারেও আমরা কংগ্রেসে কলকাতা থেকে এলাহাবাদে গিয়েছিলাম। বিরাট শিল্প-প্রদর্শনী ও নানা অনুষ্ঠান হয়েছিল। তারই মধ্যে কোন্ একটা জায়গায় সরলাদেবীকে দেখলাম বাজনা বাজিয়ে একলা "বন্দেমাতরম্" গাইছেন। কি জোরালো গলা! তখনকার দিনে ত মাইক ছিল না, শুধু গলাতেই সরলাদেবী সভা মাতিয়ে তুললেন। শুনেছি বাল্যে তিনি গানের জন্য মাতামহ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে পুরস্কার পেয়েছিলেন। এইখানেই নিখিল ভারত মহিলা কনফারেন্সে সরলাদেবী তাঁর সুবিখ্যাত ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল প্রথম স্থাপন করেন। তিনি এই বিষয়ে উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা করেছিলেন। গানটি সেই সভাতে হয়েছিল কিনা আমার ঠিক মনে নেই। পঞ্চাশ বৎসর পার হয়ে গিয়েছে, তখন আমি স্কুলের পড়া সবে শেষ করেছি। বাংলাদেশে 'ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলে'র নাম শ্রীযুক্তা কৃষ্ণভাবিনী দাসের নামের সঙ্গেই বেশী জড়িত। কৃষ্ণভাবিনীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগ স্মরণীয় করেছিল তাঁকে। প্রতিষ্ঠানটি যে সরলাদেবীর কল্পনা থেকেই উদ্ভূত তা অনেকেই জানত না। আমরাও ছেলেবেলায় যখন বাড়ীতে বাড়ীতে কৃষ্ণভাবিনীকে দেখতাম অন্তঃপুর শিক্ষার জন্য অর্থ, শিক্ষয়িত্রী, ছাত্রী প্রভৃতি জোগাড় করতে তখন মনে করতাম ওই কর্মপ্রাণা শুভ্রবেশিনী সুগৌরী মহিলাই ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের সর্বস্ব।

সরলাদেবীকে পরে নানা জায়গায় দেখেছি। তিনিই জালিয়ানওয়ালাবাগের বিষয় রবীন্দ্রনাথকে জানান শোনার পর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাও বেড়ে যায়। শেষ বয়সে তিনি আমাদের বাড়ীতে মাঝে মাঝে আসতেন, ঘরোয়া গল্পও করতেন। তাঁর ছেলে দীপক চৌধুরী আমার ছোটভাই মনুর বন্ধু ছিল শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে। সরলাদেবীর হোটখাট অনেক লেখা বেশ সরস ছিল। ছেলেবেলায় তাঁর একটা লেখা পড়ি, তাতে আছে সরলাদেবীর শৈশবে তাঁর কোন এক সখী তাঁকে শাস্তির ভয় দেখিয়েছিল যে পৃথিবীতে সরলাদেবীকে একলা ফেলে রেখে সখীরা সকলে যাবতীয় অসৎ লোকদের সঙ্গে কাজেকর্মের বিচি পেয়ে মরে যাবে। সরলা পৃথিবীতে এই রকম নির্জন কারাবাস কল্পনা করে ভীষণ ভয় পেয়েছিলেন। ছেলে দীপকের বিষয়েও তাঁর একটি লেখা আমাদের খুব ভাল লাগত।

অনেক বয়সে সরলাদেবীর সুদীর্ঘ শুভ্র ঘন চুল ছিল দেখেছি। যতদিন সধবা ছিলেন পোষাক পরিচ্ছদ খুব ভাল করতেন। সরলাদেবী ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে খুব অল্প বয়সেই বি-এ, পাশ করেন এবং রাসবিহারী ঘোষ প্রদত্ত "পদ্মাবতী মেডেল" বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পান। মহিলাদের মধ্যে ইনিই প্রথম মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী ছিলেন সরলাদেবীর প্রায় সমবয়স্কা। ইন্দিরাদেবী সাহিত্য ক্ষেত্রে বেশীকিছু রেখে যাননি যদিও, শুধু তাঁর লেখা ছিল ভারি সোজা আর ঝরঝরে। তাঁর 'নারীর উক্তি'

একসঙ্গে অনেকে বোধহয় পড়েছেন। ইন্দিরাদেবী সঙ্গীতের ক্ষেত্রেই বেশী খ্যাতি পেয়েছেন, গান-বাজনায় তাঁর মত পাকা লোক পুরুষদের মধ্যেও কম আছে। ইন্দিরাদেবী শেষ বয়সে শান্তিনিকেতনে তাঁর প্রতিভার ও ক্ষমতার ফল মানুষকে দিতে বেশী সুযোগ পেয়েছিলেন। পূর্ণ জীবনে কলকাতায় তাঁর এতটা সুযোগ হয়নি। তখন তিনি সংসারেই অনেকটা তলিয়ে গিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনে আসার পর রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ে তাঁর বইও প্রকাশিত হয়েছিল।

আমি যখন সবে কলেজে ঢুকেছি সে সময় স্বর্গীয় ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের এক কন্যা আমার সঙ্গে পড়তেন। আমরা অনেক সময় ডাঃ মজুমদারের বাড়ীতে একত্রে বসে অঙ্কশাস্ত্রের পাঠ নিয়েছি আমাদের অধ্যাপকের কাছে। এই সূত্রে ঐ পরিবারের সঙ্গে আমাদের খুব যোগ হয়। প্রতাপবাবুর এক কন্যা ছিলেন ইন্দিরাদেবীর শ্বশুরবাড়ীর বৌ। প্রতাপবাবুর বাড়ীতে বিবাহাদিতে আমাদের নিমন্ত্রণ হত। একবার এক বিবাহের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম। সেখানে অনেকের ভীর অবশ্য অনেক সুন্দরী মহিলা এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে হঠাৎ চোখে পড়ল অত্যুজ্জ্বল একটি স্ত্রীমূর্তি। শুধু উজ্জ্বল গৌরবর্ণ বলেই বলছি না, তাঁর চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল, মুখের ও দেহের ভঙ্গী সতেজ, বেশভূষা অতি সুরুচি-সম্মত, এমন চেহারা সচরাচর চোখে পড়ে না। কথাবার্তাও সহজ সপ্রতিভ এবং ঘরোয়া ধরণের। আমি কাউকে জিজ্ঞাসা করিনি, কিন্তু মনে মনে অনুভব করলাম ইনি ইন্দিরাদেবী। ইন্দিরা-দেবীর এই রকমই একটা ছবি বোধহয় আমার মনে ছিল। আমি আগে কখনও তাঁকে দেখিনি। পরে শুনলাম আমার অনুমান ভুল নয়। এর পর ইন্দিরাদেবীকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে "ঘরোয়া খেলা"র গান শেখাতে মাঝে মাঝে দেখি। আমি সর্বদা যেতে পারতাম না। নাহলে হয়ত আরও বহুবার দেখতাম। কলেজ থেকে সবে বি. এ পাশ করে কিছুদিন সঙ্গীত সঙ্ঘে এসরাজ শিখতে যেতাম। সে সময় প্রতিভাদেবীর সহকর্মী রূপেও ইন্দিরাদেবীকে প্রায় দেখতাম। ১৩২০ সালের শ্রাবণ মাসে প্রতিভাদেবী ও ইন্দিরাদেবীর যুগ্ম সম্পাদনায় "আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা" নামে সঙ্গীত বিষয়িনী একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইঁহারা কৃতিত্বের সহিত আষাঢ় ১৩২৮ পর্যন্ত এই পত্রিকা সম্পাদনা করিয়াছিলেন।

সবচেয়ে কাছে তাঁকে দেখেছি শান্তিনিকেতনে। সেখানে তিনি ছোট বড় সকলের আপনার হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি যে বিদ্যায় বুদ্ধিতে বংশ-গৌরবে সাধারণ আর পাঁচটা মানুষের চেয়ে অনেকটাই উঁচুতে এ তাঁর কাছে গেলে মানুষের মনে হত না। বাহিরের চেহারায় তাঁর আভিজাত্য দেখবামাত্র চোখে পড়ত। কিন্তু কথা বলতে সুরু করলে মনে হত প্রত্যেকেরই ঘরের মানুষ তিনি। তিনি ছোট ছেলে-মেয়েদের নামও ভুলতেন না। দুদিনের পরিচয়ও মনে রাখতেন, অকস্মাৎ আশ্রমকে সাদরে অভ্যর্থনা করতেন। রমণীর শ্রী, ধী ও হ্রী যেন তাঁর মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। মনে হত ধন্য সেই পিতামাতা যাঁরা এমন মেয়েকে গড়ে তুলেছিলেন।

ইন্দিরাদেবী শৈশবে ইংরাজী শিক্ষার মধ্যেই মানুষ হয়েছিলেন, কারণ তাঁর বাবা ছিলেন প্রথম আই, সি, এস। কিন্তু বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ী গিয়ে তিনি তাঁর বাংলাভাষা ও বাংলা রীতিনীতিকে নিজের চেষ্টায় এমন নিখুঁৎ করে তুলেছিলেন যে কেউ সহজে ধরতে পারত না যে তিনি শৈশবে বাংলা শিক্ষার মধ্যে মানুষ হননি। ইন্দিরাদেবী ইংরাজীও যেমন সুন্দর বলতেন, বাংলাও ঠিক সেই রকমই সুন্দর বলতেন। পিয়ানোও যেমন বাজিয়ে মানুষকে মুগ্ধ করতে পারতেন, রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়েও তেমনি মুগ্ধ করতেন।

ইনি সরলাদেবীরই সমবয়স্কা ছিলেন, এবং বোধহয় তাঁরই কাছাকাছি সময়ে বি. এ পাশ করেন।

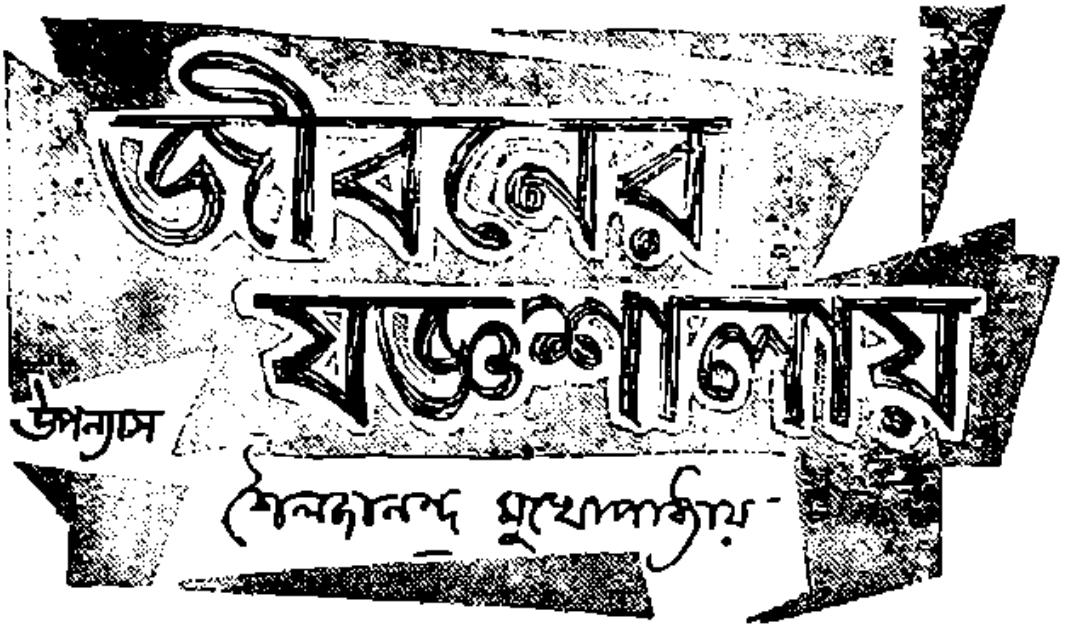

॥ আট ॥

কান্না কি আর থামে সহজে ?

তবু সে কান্না সরমাকে থামাতে হলো।

বাবাকে সে ভয় করে চিরকাল। বাপের মুখের ওপর একটি কথাও সে বলতে পারে না কোনদিন। সেদিনও কিছু বলতে পারলে না।

বুক তার ভেঙে গেল তবু সে মুখ বুজে অজয়কে পাঠিয়ে দিলে অনাথ-আশ্রমে। পাঠিয়ে দিয়ে অবধি সেই এক কথাই তার মনে হতে লাগলো—কেন এই মিথ্যাচার ? বাবা যখন জোর করে বলেছেন, বিয়ে তাকে আবার করতেই হবে। কিন্তু এমন একটি মানুষও কি পাওয়া গেল না কোথাও—সব-কিছু জেনেশুনেও যে তাকে প্রসন্নমনে গ্রহণ করতে পারে ?

সেদিন একটা বইএ সে পড়ছিল—বিধবা বিবাহের কথা। পল্লীগ্রামে সে মানুষ হয়েছে। ইস্কুল-কলেজে পড়ার সুযোগ তার হয়নি। শহরের লেখাপড়া জানা কম-বয়েসী মেয়েরা বিধবা হলে কি করে তা সে জানে না। সে শুধু জানে তাদের গ্রামের সুরবালার কথা। বিশু মজুমদারের মেয়ে সুরবালা। তারই মত খুব কম বয়সে মেয়েটা বিধবা হলো। ছেলে অবশ্য তার ছিল না। কিন্তু সুরবালার মত অমন মায়া, অমন নিটোল সুন্দর শরীরের গড়ন, অমন যৌবন—সচরাচর দেখা যায় না। বাড়ীতে মা বাবা ভাই বোন—দুই বিধবা পিসি, আর এক মাখাতো ভাই। বাপের অবস্থা খুব ভাল। ঠাকুরবাড়ীতে শ্যামসুন্দরের বিগ্রহমূর্তি। নিত্য পূজোর ব্যবস্থা। দেখতে দেখতে মেয়েটা যেন সন্ন্যাসিনী হয়ে গেল। দিনরাত ঠাকুরবাড়ীতে পড়ে থাকে। শুচাচারিণী পূজারিণীর মত সুরবালা নিজের হাতে ঠাকুরের ভোগ রান্না করে দেয়। পূজোর সময় হাত জোড় করে ঠাকুরের সুমুখে চোখ বুঁজে বসে থাকে। পিঠে একপিঠ কালো চুল এলিয়ে দিয়ে, শাড়ীর আঁচলটা তার ওপর একফেরতা জড়িয়ে, নিরাভরণ নিটোল হাত দুটি বাড়িয়ে সে যখন প্রণাম করে তখন সত্যি সত্যিই মনে হয় বুঝি তার যেমন সমর্পণ করবার মত একটা অবলম্বন সে পেয়েছে।

সুরবালার নাম হলো খুব। সবাই তার সুনাম করতে লাগলো। বলতে লাগলো—'এমনিই হতে হয় বিষ্ণুর বিষয়াকে।' সবাই যেন সমীহ সম্মান করে কথা বলতে লাগলো সুরবালার সঙ্গে।

ঠাকুরবাড়ী সরমাদেরও ছিল। জয়নারায়ণবাবুর বাবার প্রতিষ্ঠিত সে মন্দিরে ছিল গোপালের বিগ্রহ। কিন্তু বিশেষ কোনও কাজ না পড়লে সরমা কোনোদিনই সেখানে যেতো না। পাড়ার একটা মেয়ে একদিন বলেছিল সরমাকে, 'গোপালের মন্দিরে দু'একদিন যাস্ না। ভক্তি যদি না আসে তো সুরবালাকে একদিন দেখে আসিস্।'

কিন্তু সুরবালাকে আর-একবার ভাল করে দেখবার সুযোগ সরমার হলো না।

সরমা যাব যাব করছে, এমনদিনে শুনলে সুরবালা বৃন্দাবন চলে গেছে। তার সেই মামাতো ভাই বীরেন চাকরি করতো রেল-কোম্পানীতে। সে নাকি রেলের পাশ নিয়ে তাকে নিয়ে গেছে তীর্থভ্রমণে।

কিন্তু সেই যে সে তীর্থভ্রমণে গেল, সে আর গ্রামে ফিরে এলো না।

কথাটা প্রথমে চাপা ছিল অনেকদিন, কিন্তু তার সেই মামাতো ভাইটিও যখন ফিরলো না—সবাই তখন নানান রকম কানাঘুষা করতে লাগলো।

শেষ পর্যন্ত সবাই জানলো যে সুরবালা তার সেই মামাতো ভাইটির সঙ্গে কুলত্যাগ করেছে।

কথাটা সরমা জানতো। এক একসময় মনে মনে ভগবানকে ডাকতো আর বলতো,—সুরবালার মত অবস্থা তার যেন না হয় ঠাকুর।

তার চেয়ে বিয়ে করাই ভাল।

বিয়ের জন্য সরমা যেন মনে মনে প্রস্তুত হয়েই ছিল।

তাই জয়নারায়ণবাবু এসে যখন তাকে বিয়ের কথা বললেন তখন সে মুখ বুজে চুপ করেই রইলো।

সরমার আপত্তি ছিল শুধু একটা জায়গায়। যাকে সে বিয়ে করবে, ভালবেসে যার সঙ্গে আবার তাকে নতুন করে সংসার পাততে হবে, অজয়ের কথাটা তার কাছে গোপন করে রাখবে কেমন করে? ভেবেছিল তাদের পরিচয় যখন খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠবে, তখন একদিন তার স্বামীকে সব কথা সে বলে দেবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয়নারায়ণবাবু সে-পথেও কাঁটা দিয়ে দিলেন।

বিয়ের আগে প্রকাশ একদিন নিজে এলো সরমাকে দেখতে।

দু'জন দু'জনকেই দেখলে।

না, খারাপ নয়। দেখতে চমৎকার। একে বোধহয় ভালবেসে এর সঙ্গে ঘর করা চলে। প্রকাশ তো সরমার মুখের দিকে তাকিয়েই বলে উঠলো, 'ব্যস্, আমার আর কিছু বলবার নেই।'

বলেই সে উঠে দাঁড়ালো।

উমেশ বললে, 'উঠলে যে যাবা? কিছু যদি জিজ্ঞাসা করবার থাকে তো কর।'

'না। আমার আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার নেই। একবার শুধু আমি দেখতে চেয়েছিলাম। দেখে গেলাম।'

উমেশ জেদ ধরে বললো, খেয়ে যেতে হবে।

প্রকাশ বললে, 'না, আমি যাব না।'

এই বলে সে চলে যাচ্ছিল সত্যিই, কিন্তু উমেশ তখন বললে, 'সরযূকে বিয়ে করা তুমি করেছি। না খেলে মেয়েটা দুঃখু পাবে।'

প্রকাশ থমকে দাঁড়ালো। বললে, 'তুমি তাহ'লে তাড়াতাড়ি যা জোগাড় দিয়ে দিও, খেয়েই আমি চলে যাব। আমার কাজ আছে।'

খুব ভাল করেই খেলে প্রকাশ।

কিন্তু রাত্রিতে ঘরে ঢুকলো সরযূর মন। রাগ তখন দূরে গেছে, রাগাঘরের দিকে একবার ফিরেও তাকায়নি সরযূ। কি রান্না হয়েছে তা সে জানতেও না। অথচ অবলীলাক্রমে মিথ্যা কথাটা বলে বসলো উমেশ। বললে, সরযূ রান্না করেছে।

শেষ পর্যন্ত প্রকাশের মতেই সরযূর বিয়েটা চুকে গেল। বিয়েতে আড়ম্বর বিশেষ কিছুই হলো না। আড়ম্বর করতে প্রকাশও চায়নি, অন্নদাবাবুও চাইলেন না।

বিয়ের পর অন্নদাবাবু সরযূকে কাছে ডেকে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'বোস!'

সরযূ কিন্তু বসলো না। লজ্জায় কেমন যেন জড়োসড়ো হয়ে মেঝেতেই দাঁড়িয়ে রইল।

তার সে অবস্থাটা অন্নদাবাবু বোধহয় বুঝতে পারলেন। হাত বাড়িয়ে সস্নেহে তাকে কাছে টেনে এনে তার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'লজ্জা করিসনে। লজ্জা কিসের? আমি বিয়ে দিলাম মা, আমি তোর বাবা—'

কথাটা উচ্চারণ করতে গিয়ে অন্নদাবাবুর গলার আওয়াজটা কেমন যেন ধরে এলো, চোখ দুটো ছলছল করতে লাগল। আজ বহু বিগতের স্মৃতিও এমন অবশ করে তোলেনি তাঁকে কখনো। মনে পড়ল, তাঁর এই একমাত্র মেয়ে সরযূ যেদিন বিধবা হয়েছিল সেদিন তিনি একবার কেঁদেছিলেন, আর আজ একবার কাঁদলেন।

সরযূ মুখ তুলে তাকাতে পারলো না, কিন্তু বুঝতে পারলো বাবা তার কাঁদছেন। সরযূর চোখ দু'টোও জলে ভরে এল।

অনেক নীরবে কিছুক্ষণ কাটবার পর অন্নদাবাবু চোখ তুলে বললেন, 'অন্যায় কিছু করিনি মা, ভালোই করেছি। আজ না বুঝিস, পরে বুঝতে পারবি। কিন্তু হাঁ, একটা কথা বলি মা, যেজাজ ছোকে তাকলাম। প্রকাশ যেন অন্যায়ের কথাটা কোনদিন না জানতে পারে। জানলে আমি বড় লজ্জায় পড়ব।'

মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে ছিল সরযূ, কিন্তু অন্নদাবাবু তাকেও নিশ্চিন্ত করতে পারলেন না। বললেন, 'তুই আমার পায়ে হাত দিয়ে দিব্যি কর্। বল্ কোনোদিন একথা প্রকাশকে বলবি না।'

সরযূকে বলতে হলো। বলেই মনে হলো সরযূর মাথাটা যেন ঘুরছে। সে আর উঠে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারলে না। যেমন বসে ছিল তেমনি বসেই রইলো।

কথা ছিল, বিয়ের পর সরযূকে অন্নদাবাবু প্রকাশের বাড়ীতে পাঠাবেন না, প্রকাশই এসে তাকে নিয়ে যাবে তার নিজের বাড়ীটা ভাড়া দিয়ে এখানে এসে বাস করবে। কিন্তু প্রকাশ কি যে ভাবলো

কে আনে, বলেন, 'এখন কিছুদিনের জন্যে সরমাকে নিয়ে যাই, তারপর দু'জনে এইখানে থাকবার ব্যবস্থাই করব।'

অরুণাচরণবাবু এ প্রস্তাবে রাজী হবেন কি না সন্দেহ, কিন্তু সরমা নিজেই ব্যাপারটা যায় সেরে বসলে। মালতী কি এসে খবর দিলে, 'ডিসপেন্সারি বসছে—সে যাবে জামাইবাবুর সঙ্গে।'

কিন্তু তখন অরুণাচরণবাবু প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেননি। অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন বলতে গিয়েও বলেননি না, তাড়াতাড়ি সেখান থেকে উঠে তিনি বাড়ীর ভেতর চলে গেলেন।

সরমা চুপ করে একটি থালা জামাদার কাছে পেছন দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। অরুণাচরণবাবু যে এদিকের বারান্দার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন তা সে টের পায়নি।

তাঁকে দেখেই মুখ ফেরালে।

অরুণাচরণবাবু বললেন, 'ঠাকরে কিছে কি বলে গাড়িয়েছিস? যাবি কথাকে?'

লজ্জায় মাথা নেয়ে সরমা চোখ মুছে ফেলল।

অরুণাচরণবাবু বললেন, 'আমার ওপর রাগ করে যেতে চাচ্ছিস না ত?'

ঘাড় নেড়ে সরমা বলল, 'না বাবা।'

অরুণাচরণবাবু সরমার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। দেখলেন সরমার সে বিষণ্ণতা আর নেই, আবার আগে ঠিক সেই আগের মতই চঞ্চলতা ফিরে এসেছে। এইটিই তিনি চেয়েছিলেন। কিন্তু আজ যদি সে তার স্বামীর ঘর করতে চলে যায় তাহলে একা ঘরে তিনি থাকবেন কেমন করে?

সরমা নিজেই যখন যেতে চাইছে তখন আর তাকে ধরে রাখা উচিত নয়। তাঁর একা থাকবার দুঃখের কথা তাকে জানালে হয় ত' সে যেতে চাইবে না। তাই অরুণাচরণবাবু মুখ ফুটে আর কোনও কথাই বললেন না। 'তাই যা ভ', তোর সুখের আড়েই আমার যা কিছু সব। তুই সুখী হয়েছিস জানলেই আমি সুখী হবো।'

অরুণাচরণবাবু ভেবেছিলেন তাঁর মেয়ে-জামাই তাঁর কাছেই থাকবে। সরমা তা জানে: তবু সে যে কেন এখান থেকে চলে যেতে চাচ্ছে, সেকথা বাপের কাছে মুখ ফুটে বলাও যায় না হাই! এখানকার এই ঘরের যেখানে-সেখানে ছেলেটার স্মৃতিচিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে। এখানে যদি সে তার স্বামীকে নিয়ে বাস করে তাহলে ছেলের কথা তার কাছে গোপন রাখতে সে পারবে না।

এইটেই তার জীবনের সবচেয়ে বড় বিড়ম্বনা বলে মনে হচ্ছে।

জীবনের রঙ্গালয় যখন বদলেই গেল, তখন সেই নতুন জায়গায় গিয়ে পুরণো স্মৃতিচিহ্ন সব মুছে ফেলে দিয়ে আবার নতুন করে জীবনটাকে আরম্ভ করাই ভাল।

[ক্রমশঃ]

বীরবলের কৌতুক

বররুচি

সম্রাট আকবরের সভায় দু'জন গাইয়ে বাজিয়ে কুতিবাজ সভাসদ ছিল। একজনের নাম নদ। অপরজনের নাম কাপুর। বাদশা তাদের খুবই পছন্দ করতেন আর প্রশ্রয় দিতেন। সেই জন্যে কাউকে কেয়ার করত না তারা, কোন নিয়ম শৃঙ্খলা মানতো না, যা তা কাণ্ড করে বেড়াতো।

একদিন তারা নেশার ঝোঁকে স্বয়ং সম্রাটের সামনেই ঝেয়াঝেয়ি করে বসল।

আকবর ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রতি দণ্ডাদেশ দিলেন। নির্বাসন দণ্ড। আকবরের রাজ্যের ত্রিসীমানায় তাদের জায়গা নেই। তারা দূর হোক। কাল সূর্য ওঠার আগেই তারা যেন চলে যায়।

হুকুম জারি করলে জাঁদরেল।

• • • •

উপায় নেই। কাঁধে ঝোঁচকা-বুঁচকি বেঁধে দু'জনে পথে বেরুলো। একজন বরকন্দাজ তাদের শহরের সীমানা পর্যন্ত খেদিয়ে দিয়ে এলো।

কিন্তু দিল্লী ছেড়ে তারা যাবে কোথায়? এই শহরেই তাদের পাঁচ পুরুষের বাস। এখানেই তাদের যা-কিছু হাঁকডাক। বিদেশে কে তাদের জায়গা দেবে? জীবনে তারা কখনো দিল্লী ছেড়ে যায় নি। দিল্লীই তাদের পৃথিবী।

শহরের প্রান্তে কিছুক্ষণ এধার ওধার ঘোরাঘুরি করে তারা একটা বনের মধ্যে আস্তানা গাড়লে।

এদিকে শহরের চারদিকে চ্যাঁটরা পড়ে গেছে। কেউ যদি তাদের দেখে তাহলে যেন সঙ্গে সঙ্গে কতোয়ালকে খবর দেয়। খবর না দিলে শাস্তি। আর খবর পেয়ে যদি কতোয়াল তাদের ধরতে পারে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে শূলে চড়ে বা গলায় ফাঁস পরে তাদের বেহেস্তে গমন।

সুতরাং খুব লুকিয়ে চুরিয়ে তারা দিন কাটাতে লাগল।

দিনের বেলা বনের মধ্যে আপটি মেরে থাকে। রাত গভীর হলে শহরে গিয়ে খাবার দাবার কিনে আনে।

দু'চারজন দোকানদার দয়া-পরবশ হয়ে তাদের জিনিষপত্র দেয়। অনেকের মতো ঐ দোকানদারগুলিও এদের দু'জন ওস্তাদ আর দিলদার মানুষের এহেন দণ্ড ভোগে দুঃখিত হয়েছে এবং তাদের সমবেদনা জানিয়েছে।

কিন্তু এ-ভাবে কতদিন চলতে পারে?

বনের মধ্যে কি জীবন কাটানো যায়? চিরদিন ফরাস-তাকিয়া নিয়ে যারা ঘুমিয়েছে তারা বনের মধ্যে গাছের তলায় ঘুমুবে কেমন করে?

তাছাড়া পয়সা ফুরিয়ে গেল। এদিকে রোজগারপাতি বন্ধ। দোকানদারেরা আর কতই বা ধারে জিনিষ দেবে।

অসহ্য বোধ করতে লাগল তারা। তারপর অনেক ভেবে চিন্তে শেষ পর্যন্ত মরীয়া হয়ে তারা এক কাজ করল। একদিন গভীর রাত্রে দু'জনে বীরবলের বাড়ী গিয়ে হাজির হল।

বীরবল ছোকরা দুজনকে ভালবাসতেন। তাদের নির্বাসনে দুঃখিত হয়েছিলেন। হঠাৎ তাদের দেখে খুশী হলেন আবার শঙ্কিতও হলেন। এ তারা করেছে কি? শহরের মধ্যে একেবারে বাদশার প্রাসাদপুরীর কাছে চলে এসেছে? যদি কেউ দেখে ফেলে তাহলে তো তাদের রক্ষা থাকবে না?

তারা কাঁদো কাঁদো হয়ে জানাল যে এরকম ভাবে বনের মধ্যে থাকার চেয়ে জীবন বিসর্জন দেওয়াও শ্রেয় তাদের কাছে। তারা দিল্লী ছেড়ে কোথায় যাবে? দিল্লী ছাড়া অন্য কোন জায়গা তারা চেনে না। আর কোথাও তাদের স্থান নেই।

তারা বললে—"হুজুর! আপনি এখন আমাদের জান—প্রাণের মালেক। আপনার বুদ্ধির অন্ত নেই। আপনি বুদ্ধিসাগর। অসীম আপনার করুণা! আমাদের বাঁচার একটা উপায় বাৎলে দিন—যাতে আমরা বাঁচতে পারি। তা যদি না দেন কাল সকালে আমরা ধরা দেব। বনের মধ্যে মশা আর পোকা-মাকড়ের কামড়ের চেয়ে শূলই আমরা মেনে নেব। আর পারছি না আমরা। সোপাঁই আপনার।"

তাদের করুণ কাকুতিতে বীরবলের চিত্ত আর্দ্র হল।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন—"একটা মতলব মাথায় এসেছে। জানি না, তাতে কাজ হবে কি না।"

—"আপনার মতলবে কাজ হবে না! বলেন কি মালেক। নিশ্চয় হবে। বলুন, যা বলবেন তাই করব। তার পর আমাদের নসিব।"

বীরবল তখন তাদের একটা উপায় বলে দিলেন।

সে-রাত্রে তারা বীরবলের বাড়িতেই রইল।

• • • •

পরদিন সাহানশা আকবর যথারীতি প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছেন।

সেদিন বাদশার মেজাজ বেশ সরিফ ছিল। গতরাত্রে প্রধানা বেগমের সঙ্গে মিটমাট হয়ে গেছে—অনেকদিনের মান-অভিমানের পালা চুকে গেছে। তাছাড়া গতরাত্রের আহারটিও যেমন পরিপাটি হয়েছিল, ঘুমও তেমনি হয়েছিল তোফা। তাই বেশ ঝরঝরে শরীর আর ফুরফুরে মন নিয়ে তিনি বেড়াতে বেরিয়েছেন।

দু'ধারে গাছ-লাগানো ছায়াঘন যে-পথের উপর দিয়ে রোজ তিনি কিছু দূর পর্যন্ত ঘুরে আসেন, সেই পথ ধরেই চলতে লাগলেন।

হঠাৎ অদূরে একটা বড় গাছের ডালপালার ভিতরে ধড়ফড় শব্দ শুনে থমকে দাঁড়ালেন।

একটু এগিয়ে গিয়ে লক্ষ্য করে দেখলেন, গাছটার নীচু ডালে বসে দু'জন লোক! ডালপালার ফাঁক দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে।

কাছে গিয়ে ভাল করে দেখে বাদশা তাদের চিনতে পারলেন—নন্দ আর কাপুর। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে পড়ল, এদের তো তিনি রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, রীতিমতো হুকুম জারী হয়ে গিয়েছিল, তবে কোন্ সাহসে তারা সেই হুকুম অমান্য করে এখানে রয়েছে?

হাতের মণিমুক্তাখচিত মোটা কাশ্মীরি লাঠি উঁচিয়ে বাদশা তাদের তাড়া করলেন। তারা অমনি সড় সড় করে গাছের মগডালে উঠে গেল।

সম্রাট গাছের নীচে দিয়ে চীৎকার করে বললেন, "বদমায়েস ব্যাটারা! তোদের না রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। আমার হুকুম তোরা অমান্য করেছিস! তোদের প্রাণে কি ভয়ডর নেই?"

উপর থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। সম্রাট আবার হেঁকে উঠলেন—"তোরা গাছের ওপর উঠে বসে আছিস কেন?"

এইবার তাদের একজন হাতজোড় করে বললে, "খোদাবন্দ! আপনি আমাদের বাবা! আর্জি আছে প্রভু।"

"কি তোদের আর্জি?" আকবর কৌতূহলী হলেন।

তখন দু'জনে নীচের ডালে নেমে এলো। দু'জনের মধ্যে কাপুর ছিল কথাবার্তার দড়। সে বলতে লাগল, "ধর্মাবতার! আপনার হুকুম পেয়ে আমরা অনাথার মত নানা জায়গায় ঘুরতে লাগলাম। কিন্তু যেখানেই যাই, দেখি, সে জায়গা আপনার রাজ্যের মধ্যে। দিল্লী ছেড়ে অনেক দূরে চলে যাই। কিন্তু সেসব জায়গাই আপনার এলাকার মধ্যে। পৃথিবী জোড়া সাম্রাজ্য আপনার। যতদূরেই যাই তার সীমানা ছাড়াতে পারি না।"

এই বলে কাপুর থামল। সম্রাট বললেন, "তারপর কি হল?"

কাপুর বলতে লাগল, "শেষ কালে ঘুরে ঘুরে আমরা দেখলাম যে আবার দিল্লীর কাছেই আমরা এসে পড়েছি। তখন স্থির করলাম যে সমস্ত দুনিয়াতল যখন আপনার রাজ্য তখন ওপর দিকে আকাশে উঠতে হবে। তাই আমরা এই গাছে চড়ে আকাশের দিকে যাবার চেষ্টা করছি। পৃথিবীর মাটিতে আমাদের ঠাঁই নেই—সে সমস্তই যে আপনার রাজ্যের মধ্যে।"

কাপুরের কথা শুনে বাদশা হাসতে লাগলেন। বেশ মজার কথা বলেছে তো কাপুর। ছোকরা ছুটো চালাক বটে। বললেন, "নেমে আয় তোরা। আমি হুকুম করছি।"

তারা নেমে এলো এবং সম্রাটের পদপ্রান্তে পড়ে নাকে খৎ দিয়ে তাঁর মার্জনা চাইল।

সম্রাট খুশী হয়ে তাদের মাপ করলেন এবং পুনরায় তাদের কাজে বহাল করে মালোদারা তবল করে দিলেন।

বলা বাহুল্য, বীরবলের কাছেই তারা এই বুদ্ধি পেয়েছিল।

———

জগদ্গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ

জীবন কাহিনী ॥

শ্রীচিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত

৮

প্রচারের কাজে ময়মনসিং সেরপুরে যাচ্ছে বিজয়, এক বুনো মোষ তাকে তাড়া করল। কী খাড়া শিঙ, লক্ষ্যে তীক্ষ্ণ হয়ে ছুটে আসছে। বিজয় চোখ বুজে বসে পড়ল পথের উপর। একমনে ডাকতে লাগল ভগবানকে।

সরু গ্রাম্য পথ, দু পাশে কাশ বন। হঠাৎ ঝড় উঠল। আন্দোলিত কাশে ঢাকা পড়ল বিজয়। সহসা মোষ পথ খুঁজে পেল না। বিজয় দেখল অদূরে একটা বুনজকারের গর্ত। সেখানে গিয়ে গা ঢাকা দিল। ঝড় থামতেই মোষ আগের জায়গায় পৌঁছে খুঁজতে লাগল শিকার। শিকারের নাম-গন্ধও নেই। দারুণ রোষে মস্ত মোষের শিঙ দিয়ে মাটি খোঁড়াই সার হল।

মোষ গেল তো কোত্থেকে দুটো হরিণ এসে জুটল। আর ছুটন্ত হরিণের পিছে ক্ষুধিত বাঘ। ভগবান বলে চোখ বুজল বিজয়। হরিণে মনোযোগী বাঘ বিজয়ে আকৃষ্ট হবার সময় পেলনা। হরিণের সন্ধানেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

সেবার রংপুরে এক গ্রামে যাচ্ছে। মাঠে এসে পড়েছে অমনি মুষলবর্ষণ শুরু হল। জলের সঙ্গী ঝড়ও এসেছে ঘনঘটায়। এখন কী করি, কোথায় আশ্রয় নিই! ভিজতে ভিজতে রাস্তায় উঠে দেখল এক সার দোকান। বেটা সামনে গেল, জিজ্ঞেস করল, 'একটু ঠাঁই দেবে?'

এখানে জায়গা কোথায়! কে না কে এক আগন্তুক, আশ্রয় দিয়ে শেষে বিপদে পড়ি। একে একে সবগুলি দোকানই প্রত্যাখ্যান করল।

কিন্তু আমার বৃক্ষতল কে কাড়ে! বিজয় এক গাছতলায় এসে আশ্রয় নিল। দেখল কে

এক পাগলী বসে আছে। শীর্ণকায়, গায়ের রঙ কালো, পিঠে দীর্ঘ কেশভার। দু চোখ জ্বলছে অন্ধকারে।

'মা', তুমি কে?' মধুস্বরে জিগগেস করল বিজয়।

'মা! তুই আমাকে মা বলে ডাকলি? তাতে প্রাণ জুড়িয়ে গেল।' বললে পাগলী, 'আমার রামপ্রসাদ বলে এক ছেলে ছিল সেও অমনি ডাকত মিষ্টি করে। জানিস তেল না মেখে মাথাটা জ্বলে যাচ্ছে। আগে আগে কত মাখিয়ে দিত রামপ্রসাদ। তুই দিবি?'

বিজয় এক ছুটে দোকান থেকে তেল কিনে আনল।

বিজয়ের হাতের নিচে মাথা পেতে দিল পাগলি। বললে, 'রাত্রে থাকবি কোথায়?'

পাগলির মাথায় তেল ঢেলে দিল বিজয়। বললে, 'আর কোথায়! এই গাছের নিচে।'

'সে কি? একটা দোকানে গিয়ে থাকলেই তো হয়।'

'ওরা দিলনা থাকতে।'

'দিলনা?' পাগলির চোখ থেকে আগুন বেরুল। 'কেন, দিল না কেন?'

'বিদেশী লোক, তাই বিশ্বাস হলনা।'

'বটে? তোকে ওদের বিশ্বাস নেই?' কোত্থেকে একটা লাঠি কুড়িয়ে নিল পাগলি। তেড়ে গেল দোকানের দিকে। একটার পর একটা দোকানের বন্ধ দরজায় লাঠি মারতে লাগল। কি, আশ্রয় দিবিনে? দেখি তোরা নিরাশ্রয়ের হোস কিনা। দেখি কে তোদের রক্ষা করে।

পর পর দরজা খুলে গেল দোকানের। একটাতে আশ্রয় নিল বিজয়।

কিন্তু পাগলি কোথায় গেল?

কেউ তার খোঁজ পেলনা। যাকে দেখে ভয়, তাকে এখন না দেখে অনুতাপ!

গোসাই-গতপ্রাণ কুঞ্জ ঘোষের বাড়িতে রক্তবৃষ্টি হয়ে গেছে। কুঞ্জবাবুর স্ত্রী ও ছেলে প্রবল জ্বরে শয্যাশায়ী। ব্যাপার কী?

'সমস্ত তোমার শাশুড়ির অপরাধ। তাকে ডাকাও।' আদেশ করলেন গোসাইজি।

বৃদ্ধা শাশুড়ি দাঁড়াল হেঁট মুখে।

'কী করেছ?'

'কালীকে কাঁটা ছুঁড়ে মেরেছি।'

'সে কী? কালীকে পেলে কোথায়?'

'প্রায়ই আজকাল নাম করবার সময় কালীমূর্তি দেখা দেয়।' বলতে লাগল বৃদ্ধা, নাম যতই গাঢ় হয় কালীও ততই কাছে আসে। আমি বলি, তুমি আমার ইষ্ট নও, তুমি সরে যাও, কিন্তু কালী সরে না, দাঁড়িয়ে থাকে। আমার কথা গ্রাহ্যও করে না। সেদিন ঘর ঝাঁট দিয়ে দরজার কাছে বসে নাম করছি, দেখি কালী আবার ঠিক তেমনি এসে দাঁড়িয়েছে। বারে-বারে বললাম চলে যেতে, কথাটা কানেই তুললনা। তখন নিদারুণ রাগ হল। হাতের কাছে ঝাঁটাগাছটা ছিল, ছুঁড়ে মারলাম। বেটি তখন ভাগল। তারপর আর আসেনি কোনদিন।'

'আসেনি? এই উৎপাতটা তা হলে কী! কিন্তু আমি ভেবে স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি, তুমি তাকে ঝাঁটা মারলে কী বলে?' গোস্বামী প্রভু অবাক মানলেন।

'আমি ওকে চাই না, তবু ও আমার কাছে আসে কেন?' বৃদ্ধা ভড়পে উঠল।

'লোকে সাধ্যসাধনা করে একবার দর্শন পায় না, আর তিনি তোমাকে নিজের থেকে কৃপা করলেন, আর তুমি কিনা তাঁকে ঝাঁটা ছুড়লে!'

'আমার ঘরে চড়িল,' বৃদ্ধা বললে, 'কালী আমার সাধনপথের প্রলোভন।

'সে কী? কালী কি ভগবান নন?'

'শ্রীকৃষ্ণই তো ভগবান। আমি তো সেই ভাবেই দেখি, সেই ভাবেই নাম করি।'

'ধীক্ষাকালে ভগবানের নির্দিষ্ট কোনো রূপের কথা তো বলা হয়নি।' বললেন গোসাইজি: 'তিনি দ্বিভুজ না চতুর্ভুজ কে বলবে। কোন রূপে তিনি তোমার কাছে প্রকাশ পাবেন তা তিনি জানেন। যে মূর্তিতে আসেন সেই মূর্তিটি মেনে নেবে।

বৃদ্ধা হাঁপাতে লাগল: 'আমি এখন তবে কী করব?'

'যাও, মানসিক করে কালীপুজো করোগে।'

বুড়ি চলে গেলে কৃষ্ণ ঘোষকে ডাকালেন গোসাইজি। বললেন, 'তোমার শাশুড়ি শুনবেনা। যাও তুমি নিজে গিয়ে গিগগির কালীপুজোর ব্যবস্থা করো। নচেৎ ঘোর অকল্যাণ। শোনো। নাম করতে-করতে যা কিছু প্রকাশ পাবে তাকেই প্রণাম করে মেনে নেবে, তারই কাছ থেকে চেয়ে নেবে আশীর্বাদ।'

'কী আশীর্বাদ চাইব?'

'ভগবানের চরণে মতি-গতি হোক, ভক্তি হোক এর চেয়ে আর বড় প্রার্থনা নেই।'

এলাহাবাদে এসেছে বিজয়। সঙ্গে কেশব সেন আর প্রতাপ মজুমদার।

একদিন ভক্তদের নিয়ে উপাসনা করছে বিজয়, এক মিশনারি সাহেব ঘরে ঢুকল। উপাসনা শেষ হয়ে গেছে তবু বিজয় উঠছেনা। কেউ খবরের কাগজ পড়ছে, কেউ বা গল্প করছে, কিন্তু বিজয় বসে আছে ধ্যানস্থ হয়ে। কিছুতেই ভাঙছে না তার তন্ময়তা।

মিশনারি কেশবকে জিগগেস করলে, 'ঐ লোকটি কে?'

'কোন লোকটি?'

'যিনি সভা ভেঙে গেলেও স্থিরভাবে বসে আছেন—ঐ যে—'পাদ্রী বিজয়কে নির্দিষ্ট করে দিল। 'তাঁর সঙ্গে আমি কিছু কথা বলতে চাই।'

'তাঁকে ডাকব?'

'না। তিনি নীরবে উপাসনা করছেন, তাঁর উপাসনা ভাঙতে আমার ইচ্ছে নেই। আমি বেরোবে বসি।'

ধ্যানভঙ্গের পর বিজয় এল সাহেবের কাছে।

'শোনো যীশুখৃষ্ট ছাড়া জগতে আর কোনো উপায় নেই।' বললে পাদ্রী, 'আর তিনি ছাড়া কার সাধ্য জগতের পাপভার মোচন করে?'

ইংরেজ হলে কী হয়, পাদ্রী বেশ বাঙলা শিখেছে।

বিজয় বললে, 'তুমি তো অনেক দিন ধরে খৃষ্টধর্ম প্রচার করছ, বইও পড়েছ বিস্তর। আমার দোটা কতক প্রশ্নের উত্তর দেবে?'

'বেশ তো। বলো না তোমার কী প্রশ্ন?'

'ধর্ম কাকে বলে? আত্মা কাকে বলে? সত্য কী, পাপ কী, মায়া কী?'

প্রশ্ন শুনে সাহেব স্তম্ভিত। শুধু মুখে বললে, 'এসব প্রশ্ন কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করে'নি, নিজের মনেও ওঠেনি কোনোদিন। ধর্ম বলতে শুধু যীশুখৃষ্ট আর বাইবেলই বুঝি। এর বাইরে আর কিছু জানিনা।'

'কিন্তু তোমার যীশু যে এশিয়ার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে এক গ্রামে জন্মেছিলেন তা জানো?' কেশব এগিয়ে এল 'জানো আমাদের ভারতবর্ষ সেই এশিয়ারই অন্তর্গত?'

'না, না, অত শত জানবার আমার কী দরকার!'

'তোমার যীশুকে আমরা তোমার চেয়েও বেশি জানি, বেশি ভালোবাসি।'

'তবে তাকে তোমরা ভজনা করনা কেন?'

'তাকে আমরা' মহাপুরুষ জ্ঞানে ভক্তি করে থাকি কিন্তু আমাদের উপাস্য তাঁর পিতা সেই পরমেশ্বর। শোনো, যদি এদেশে খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে চাও, তা হলে দেশে ফিরে যাও, সেখানে সবার সঙ্গে চর্চা করে আমাদের প্রশ্নগুলির উত্তর নিয়ে এস। উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত এ দেশের লোক আকৃষ্ট হবেনা। স্বধর্ম কেন ছাড়বে, কার হাতে সবস্ব তুলে দেবে, একটু যাচাই করে দেখবেনা? সুতরাং—'

আর বাকস্ফূর্তি করলনা সাহেব, দেশে ফিটটান দিল।

লাহোরে এসেছে বিজয়। একদিন তার চিত্তবিকার উপস্থিত হল। সঙ্গে সঙ্গেই মনে জাগল অনুতাপ। আমি প্রচারক, ধর্মোপদেষ্টা আর আমারই মনের এ বিভ্রম! কাঁদতে লাগল বিজয়। নিজেই একটি গান তৈরি করে গাইতে লাগল।

যদিন পড়িল মনে কেমনে নাথ ডাকিব তোমায়
পারে কি তৃণ পশিতে অনন্ত অনল মেঝায়।
তুমি পুণ্যের আধার, অনন্ত অনল সম
আমি পাপী তৃণসম, কেমনে পূজিব তোমায়॥

গান করেও প্রাণে শান্তি এল না। স্থির করল আত্মহত্যা করবে। সেই সঙ্কল্পে নির্জন মধ্যরাত্রে রাভি নদীর পারে এসে দাঁড়াল। মন স্থৈর্যের একটা প্রস্তর খণ্ড বাঁধল কোমরে। ঝাঁপ দিতে যাবে হঠাৎ কোত্থেকে এক ফকির এসে আপটে ধরল। বললে, 'শরীর ছাড়লেই শোক প্রবৃত্তি নষ্ট হবেনা।'

বিজয় থমকে তাকাল ফকিরের মুখের দিকে।

'ধৈর্য ধর। ধৈর্য ধরলেই মঙ্গল হবে।' বললে ফকির, 'তখন পাপ বস্তু হয়ে যাবে টেরও পাবে না। তার এখনো অনেক দেরি আছে। কিন্তু যাবে সে একদিন, নিশ্চয় যাবে। সব কাজেরই সময় ভগবান নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কিছু হবার নেই। বাতাসে যে ধুলো ওড়ে তাও তাঁর ইচ্ছেতে। তাই ভাবনা কোরোনা। সংসারে ভগবানের লীলা দেখ।'

'কিন্তু আপনি—আপনি কী করে জানলেন আমার মনের কথা?'

'আমি নদীতীরে বসে ভজন করছিলাম,' বললে ফকির, 'হঠাৎ দৈববাণী হল, এক মহাত্মা আত্মহত্যা করছে, তাকে বাঁচাও।'

'কিন্তু আমাকে বাঁচিয়ে লাভ কী হল? আমার মন অশুচি।'

ফকির হাসল। বললে, 'তাই তো বলছি অশুচি মন নিয়ে পরকালে গিয়েই বা লাভ কী? ভগবানের নাম করো তিনিই তোমাকে পবিত্র করবেন। যখন পরলোকে যাবে পবিত্র জীবন নিয়ে যাবে—অমনি-অমনি গিয়ে লাভ কী।'

আশ্বাসের মত তাকাল বিজয়।

'তুমি নিজেকে এখন অপবিত্র মনে করছ কিন্তু তুমি আসলে কত সুন্দর একদিন জানতে পারবে।'

'কবে?' বিজয়ের কণ্ঠে আকুলতা ঝরে পড়ল।

'সাধন পথে অগ্রসর হলেই দেখতে পাবে চোখের সামনে একখানা আয়না ফুটে উঠেছে। সেই আয়নায় দেখবে তোমার স্বরূপ। বুঝবে তুমি কত সুন্দর।' ফকির সাধন পথের ইঙ্গিত দিতে চাইল। বললে, 'প্রত্যহ রাত্রে শোবার সময় ভগবানের মাতৃবাচক নাম জপ করবে।'

'ভগবানকে মা বলে ডাকব?'

'হ্যাঁ। মা বলে ডাকবে। জপ করতে-করতে মন যখন তন্ময় হবে দেখবে নিদ্রা এসে গেছে। আর কোনো মলিন চিন্তা তোমাকে চঞ্চল করতে পারবে না।'

মনে অপরিমেয় বল পেল বিজয়। বাড়ি ফিরে শান্তিতে ঘুমুতে গেল।

দুর্দান্ত কামকে বশীভূত করা দূরের কথা, মন্দীভূত করা যাচ্ছে না। যন্ত্রণায় ধড়ফড় করছে পূর্ণানন্দ। এসেছে গোঁসাইজির কাছে। বলছে স্বপ্নবৃত্তান্ত। স্বপ্ন দেখেছে এক তরুণী আত্মীয়ার সঙ্গে প্রণয় নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে। এত নিয়মনিষ্ঠার পরেও এরকম স্বপ্ন কেন?

'স্বভাবদোষ খণ্ডন হয়নি এখনো।' বললেন গোঁসাইজি, 'মেয়েটির উপর যে তোমার বহুকালের আসক্তি।'

'এ আসক্তি কী করে যাবে?'

'শুধু শ্বাসেপ্রশ্বাসে নাম জপো। কোনো অসৎ কল্পনা মনে এলেই চেঁচিয়ে পাঠ কোরো কিংবা গান গোয়ো। কল্পনাতেও কামভাব না জাগলে বুঝবে শত্রু পরাভূত হয়েছে। বীর্যরক্ষার জন্যে চাই ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। সামান্য একটু অসতর্ক ফাঁক রাখলেই ঢুকে পড়বে কালসাপ।'

শ্বাসেপ্রশ্বাসে নামজপের কথা সাধারণ লোকের মুখেও শোনা যাচ্ছে। মাঝিরা গান গাইছে:

'মন পাগলা রে, হরদমে গুরুজীর নাম লইও।
দমে দমে লইও রে নাম কামাই বাহি দিও।'

আর যজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যেমন জপযজ্ঞ, তেমনি নামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মাতৃনাম। 'মা, আমি তোমার গোষা পাখী।' মাঘোৎসবে উপাসনা করছেন গোস্বামী প্রভু: 'মা, অন্নপূর্ণা, আজ ছোট-বড় কাঙাল-ফকির সবাইকে তুমি পেটভরা অন্ন বিতরণ করছো। দেশে-বিদেশে আজ কত লোক তোমার প্রসাদ পেয়ে পরিতৃপ্ত হচ্ছে। আমাকেও অভুক্ত রাখনি, দিয়েছ অঢেল করে। আর না, মা, আর না—একটা কাণাকড়ি হলেই আমার যথেষ্ট। একটা কাঙাল ছেলের এর বেশি আর কী চাই? বেশি হজম করি এমন সাধ্য কই? ষোল-ষোল দিও মা, একটি করে কাণাকড়ি দিও। তার বেশি নয়, কখনো নয়।'

মথুরা হয়ে বৃন্দাবনে এসেছে বিজয়। ব্রাহ্মসভায় বক্তৃতা দিচ্ছে, হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা

এসে গেল। সেকী মশাই?' ব্রাহ্মেম প্রচার করতে বসে শেষ পর্যন্ত সোহলীলা! লোকে বলবে কী!'

'লোকে বুঝবেই বা কতটুকু স্থান মাহাত্ম্য যে আছে তা কে অস্বীকার করবে।'

'স্থান মাহাত্ম্য?'

'হাঁ, বক্তৃতার সময় চোখের সামনে যা দেখলাম তাই বললাম। এ যে বৃন্দাবন। এ যে বহু লোকের গোচারণের স্থান।'

একদিন তো উপাসনায় জগজ্জননীর আবির্ভাব হল। বিজয় ডাকতে লাগল 'মা' 'মা' বলে। গোড়া ভক্তেরা আপত্তি জানাল—আমরা কি ভগবতী, মা, জগদ্ধাত্রীর আরাধনা করছি?

জানিনা। মাকে দেখলুম। ডাকলুম। প্রাণ মন ভরে গেল।

বৃন্দাবন থেকে মথুরা হয়ে আগ্রায় এল বিজয়। তাজমহল দেখল। রাত্রে দেখল এক অনির্বচনীয় স্বপ্ন।

দেখল, যেন তাজের প্রাঙ্গণে ঘুরছে। চার পাশে ফুলন্ত গাছ, জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে দিক-দেশ। শাদা আর সবুজ একসঙ্গে হাসছে। মনে হল, গাছ নেই, সুন্দরী তরুণী হয়ে গিয়েছে। বিহ্বল হয়ে তাকাল বিজয়। এরা কারা? দেবকন্যা? না কি অপ্সরী?

'তুমি কেন এ পবিত্র জায়গায় এসেছ?' কলকণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল মেয়েরা।

মুহূর্তকাল স্তব্ধ থাকল বিজয়। বললে, 'তোমাদের কাছ থেকে একটি বিষয় জানতে এসেছি।'

'আমাদের কাছ থেকে?' সুরাঙ্গনারা আবার হেসে উঠল। 'বলো শুনি কী তোমার জিজ্ঞাসা।'

'ঈশ্বর যে সর্বব্যাপী তা কী করে বুঝি?'

'আশ্চর্য, আজও তুমি বোঝনি? যাঁর রাজ্যে বাস করছ, যাঁর দয়া ছাড়া এক পল বাঁচবার অবকাশ নেই তাঁর সর্বব্যাপিত্বে তুমি আজও সন্দিহান?'

'আমি ঘোর মূর্খ, কিছুই জানিনা।'

'আচ্ছা, আমাদের মত সুন্দরী কোথাও দেখেছ?'

'না, স্বপ্নেও দেখিনি।'

'আমাদের কে এত সুন্দর করেছে? আমাদের এ রূপ-লাবণ্য কার সৃষ্টি, কার শিল্প-কর্মে? কার করুণা?'

'ঈশ্বরের।'

'হাঁ, ঈশ্বরের। ঈশ্বর এ দেহে বর্তমান বলেই এ দেহ এত সুন্দর। তাঁর অধিষ্ঠান ছাড়া কিছুই সুন্দর হতে পারেনা। সমস্ত সুন্দরে ঈশ্বরকে দেখ।' রূপসীরা কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে করল: 'তার চেয়েও বেশি করে দেখ। সমস্ত কিছুতেই ঈশ্বর আছেন বলে সমস্ত কিছুকেই সুন্দর বলে দেখ সর্ববিধে ঈশ্বরকেই পরমসুন্দর বলে জানে।'

রূপসীরা আবার বৃক্ষরূপ ধারণ করল।

চমকে উঠল বিজয়। তাকিয়ে দেখল কতগুলি প্রাচীন বৃক্ষ বসে আছে। তারা বলে উঠল, 'যে ঈশ্বরকে সুন্দর বলে জানলে সেই ঈশ্বরকেই প্রাণ বলে জানো। তিনি প্রাণরূপে আছেন বলেই আমরা এতদূর সাধবান হতে পেরেছি।'

বৃক্ষেরা বৃহদাকার বৃক্ষে রূপান্তরিত হল।

ঘুম ভেঙে গেল বিজয়ের। আশ্চর্য, আগে যা মাত্র খুন বলে বোধ হত এখন তা পরিপূর্ণ বলে বোধ হল। সর্বত্রই ঈশ্বর। সর্বত্র তাঁর দয়া, সর্বত্র তাঁর পবিত্রতা। সমস্ত বিশ্ব তাঁরই আবির্ভাবে নীরন্ধ্র।

প্রথমা কন্যা এল সংসারে। বিজয় তার নাম রাখল সন্তোষিণী।

পরিবার বড় হচ্ছে। প্রতিপালনের ব্যবস্থা কী? চিকিৎসাবৃত্তি তাই ছাড়তে পারলনা বিজয়। কিন্তু বৃত্তিতে উন্নতি করতে হলে যে অখণ্ড মনোযোগ দরকার তার অবকাশ কোথায়?

দুর্গাচরণ বাঁড়ুয্যে স্বপ্নযোগে দেখা দিয়ে ওষুধ বলে দেয় আর সেই ওষুধে সুনিশ্চিত আরোগ্য।

দুর্গাচরণ বিরাট ডাক্তার, দেশনেতা সুরেন বাঁড়ুয্যের বাবা। পরলোকে গিয়েও চিকিৎসা করছে। লাঘব করছে যন্ত্রণা।

একদিন স্বপ্নে বিজয়কে বললে, 'তোমার কেবল দেহরোগেরই চিকিৎসা নয়। তোমাকে ভবরোগেরও চিকিৎসা করতে হবে। শুধু দেহমন্দিরের আরাম নয়, ভবাধিদাহের আরাম।'

তবে এই তুচ্ছ চিকিৎসা ছেড়ে দিই। কিন্তু সংসার চলবে কী করে? যাঁর সংসার তিনি চালাবেন।

তার আগে একবার গুপ্তিপাড়ায় যেতে হয়। রুগী মুমূর্ষু, চলে এসেছিলেন, আরেকবার যাবেন দেখতে, নতুন ওষুধ দিয়ে সেই কথাটা রাখতে হয়। রুগীর আত্মীয়েরা তার জন্যে বসে আছে আকুল হয়ে।

কিন্তু যাবে কী করে? তুমুল ঝড়জল সুরু হয়ে গিয়েছে।

শান্তিপুরের ওপারে গুপ্তিপাড়া। খেয়ানৌকোর জন্যে বিজয় ঘাটে এসে দাঁড়াল।

কিন্তু পাটনী নৌকো ছাড়তে রাজি নয়। এই দুর্যোগে পারাপার অসম্ভব।

'বা, তাই বলে রুগী মারা যাবে?'

'তা জানিনা। কিন্তু আমি মারা পড়তে রাজী নই।'

খেয়ার মাঝি প্রত্যাখ্যান করল।

কিন্তু নিবৃত্ত হবার লোক নয় বিজয়।

ওষুধের শিশি মাথায় বেঁধে নদীতে ঝাঁপ দিল। ভাদ্র মাসের ভরা নদী ঝড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে, তারই মধ্য দিয়ে পথ করে এগুতে লাগল। নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে পরের প্রাণ, রুগের প্রাণকে, আর্তের প্রাণকে বেশি গৌরব দিল। পরসেবাই পরম সেবা।

এ কী! এ দুঃসময়ে আপনি! রুগীর আত্মীয়েরা বরাভয়প্রদ ধন্বন্তরিকে দেখলে।

'হ্যাঁ, সাঁতরে পার হয়ে এসেছি, ওষুধ এনেছি মাথায় বেঁধে।'

ঈশ্বরই মহৌষধি। ঈশ্বরই শিরোধার্য।

চিকিৎসা ব্যবসা ছেড়ে দিল বিজয়। বন্ধু ব্রজসুন্দরকে লিখলে:

'আমি ভিষারির ঘরে জন্ম গ্রহণ করেছি। ব্যবসা করা আমার কাজ নয়। আমি আমার ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিলাম। ব্রাহ্মভাইয়েরা আমাকে সাহায্য করেন, ভালোই, না করেন, তাও ভালো। ঈশ্বরের চরণে শরীর মন বহুদিন হল বিক্রয় করেছি। তিনি আমাকে পরিত্যাগ করবেন না। তিনি অন্তর্যামী, তিনিই আমাকে সংসারে সাহায্য করবেন। ব্রাহ্মধর্মের জয় হোক। আমার শোণিত ব্রাহ্মধর্মকে পোষণ করুক।'　　(ক্রমশ)

একটি কলমের জন্য

জগদীশ ভৌমিক

উনোনে ভাত চাপিয়ে ছোট একটা লাঠির মাথায় ঝাড়ন বেঁধে মণিমালা ঘরের ঝুল ঝাড়তে সুরু করে।

ভাতটা ফুটতে যা সময় নেবে তার ভেতর একটা ঘর অন্তত সে ঝাড়ামোছা করতে পারবে। এছাড়া তার আর সময় নেই।

কিন্তু ছোটকা কনকলতা তা বোঝে না। সময় অভাবে করতে পারেনি বলে আজ সকালে সে মণিমালাকে বেশ দু'চার কথা শুনিয়েছে।

কনকের সেই কটুভাষণে মণিমালা বড়ো আঘাত পেয়েছে। জবাবে কনককে কয়েকটা কড়া কড়া কথা শোনানোর ইচ্ছে হয়েছিল। বলতে চেয়েছিল, সংসারে একটা মানুষ সারাদিন খেটে প্রাণপাত করে, আর তুমি পানদোক্তার কৌটো নিয়ে সারাদিন পা ছড়িয়ে আলিস্যি ভাঙো, এই সামান্য কাজটা তুমিও তো সারতে পারো।

কিন্তু এতো কথা বলার সাহস হয়নি মণিমালার। হয় না। বয়সে এবং বয়েসে সে বড়ো, তবু এ সংসারে কনকের দাপটে তাকে সবসময় তটস্থ থাকতে হয়।

শুধু কনক কেন, বাড়ির কর্তা থেকে পাঁচবছরের মেয়েটি পর্যন্ত কারুর পান থেকে চুণটি খসার উপায় নেই। তাহলেই তুমুল কাণ্ড বেধে যায়। পাঁচ বছরের মেয়েটি পর্যন্ত জেঠিমাকে মুখনাড়া দিয়ে কথা শোনাতে ছাড়ে না। এবাড়ীর অদ্ভুত আবহাওয়ায় সেও বুঝতে শিখেছে- জেঠিমা তাদের সংসারে করুণাপ্রার্থী ছাড়া আর কিছু নয়।

বাড়ির ছেলেমেয়েদের ব্যবহারে কষ্ট হলেও মণিমালা কোনোদিন তাদের কিছু বলতে পারে না। বলার উপায় নেই। তাতে বাচ্চারা তো দশকথা শোনাবেই, কনকও তাদের পক্ষ নিয়ে বকতে সুরু করবে। এরকম ব্যাপার বহুবার ঘটেছে। তাই মণিমালা এবাড়ীর সকলের গঞ্জনা মুখ বুজে সয়ে যায়। কারুর কথায় কোনোদিন কোনো প্রতিবাদ করে না।

এমনিতে মণিমালা বড়ো কম কথা বলে। জীবনে অনেক দুঃখ বেদনার অভিজ্ঞতা তাকে কেমন যেন বোবা করে দিয়েছে। তার জীবনের ওপর দিয়ে তো কম ঝড়ঝাপ্টা যায়নি।

আঠাশ বছর বয়েসে মণিমালা বিধবা হয়েছে। সুশান্তর বয়েস তখন দশ। বিধবা হয়ে প্রথমে উঠেছিল ভাইয়ের সংসারে। সেখানে দারিদ্র্য সহ্য করা যদি বা সম্ভব ছিল, কিন্তু দুমুঠো ভাতের জন্যে নিত্যদিন ভাজের খোঁটা দেওয়া তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এখানে এসে বুঝলো, এ জগতে তার জন্যে কোথাও সহানুভূতির ছিটেফোঁটা নেই।

যাই হোক্, তবু এই দুঃখকষ্টের ভেতরও মণিমালা স্বপ্ন দেখতো; সুশান্ত বড় হলে তার এই দুঃখের নিশ্চয় অবসান ঘটবে।

আশাটা নেহাৎ অমূলক ছিল না। লেখাপড়ায় সুশান্তর ছিল যেমন মেধা তেমনি মনোযোগ। ক্লাসে ফার্স্ট হয়ে উঠতো। স্কুলের মাস্টার মশায়রাও তেমনি স্নেহের চোখে দেখতেন। বরাবরের জন্য 'ফ্রী'-র ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

আবার ঠিক এই সময় করেকেই কনক এবং কনকের ছেলেরা তাকে সহ্য করতে পারতো না। কারণ সুশান্তর ভেতর যে গুণগুলি ছিল—কনকের ছেলেদের ভেতর ছিল তার একান্ত অভাব।

এই অক্ষমতার রোষে ছেলেগুলো সুশান্তর পেছনে লেগে থাকতো। বাড়িতে তাকে কোণঠাসা করে রেখেছিল। মারা ছলচুতোয় তাকে গালাগালি দিতো। মাঝে মাঝে গায়ে হাত তুলতেও কসুর করতো না। ওদের সংগে পেরে উঠতো না সুশান্ত।

এমনিতে ও বড়ো দুর্বল ছিল। তাছাড়া স্বভাবটাও ছিল বড়ো শান্ত, কোমল। তাই পড়ে পড়ে ওদের হাতে মারই খেত। মণিমালার এ ব্যাপারে কিছু বলার উপায় ছিল না। বললে ছেলেরা লঘুগুরু জ্ঞান হারিয়ে যা বলার নয়—তা তো দেখেছেই, পরন্তু কনক মনে করতো, মণিমালা বুঝি তার অধিকারের সীমা ছাড়াচ্ছে। সুতরাং মুখ বুজে সমস্ত অন্যায় অপমান সহ্য করা ছাড়া উপায় ছিল না।

এমনি লাঞ্ছনা অপমান প্রতি পদে পদে মণিমালাকে সইতে হয়। আজ সকালেই ঘরের ঝুল ঝাড়া নিয়ে কি গণ্ডগোলটাই না দিয়েছে। তাই আজ রান্না করতে করতেই সময় করে নিতে হয়েছে মণিমালাকে। উনোনে ভাত চাপিয়ে ঘরের ঝুল ঝাড়তে সুরু করেছে। কনকের ছেলেরা যে ঘরটায় শোয় প্রথমে সে ঘরটায় ঝুল ঝাড়তে লাগলো।

বড়ো দ্রুত হাতে কাজ করছিল মণিমালা।

দেওয়ালে যে বড়ো ছবিটা টাঙানো আছে, তার পেছনে একরাশ ঝুল জমে ছিল। লাঠির মাথায় বাঁধা ঝাড়ন দিয়ে সেই ঝুলগুলো ঝাড়তে গিয়ে ছবিটা একটু নড়ে উঠলো, আর তাইতে ছবিটার পেছন থেকে যে জিনিসটা সশব্দে মাটির ওপর আছড়ে পড়লো, তা দেখে সে বড়ো অবাক হ'য়ে গেল।

কলমটা মেঝে থেকে তুলে নিল সে। গায়ে একরাশ ধুলো আর ঝুল লেগে রয়েছে। জিনিসটা যে অনেকদিন থেকেই ছবিটার পেছনে লুকোনো অবস্থায় পড়ে আছে তা চেহারা দেখে বেশ বোঝা যায়।

আঁচল দিয়ে ধুলো ঝেড়ে মণিমালা কলমটার দিকে তাকিয়ে থাকে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার দুচোখ জলে ভরে ওঠে।

কলমটা আজ এতোদিন পরে পাওয়া গেল। অথচ এটা হারিয়ে যাওয়ায় একদিন এবাড়ীতে কী হুলুস্থুল ব্যাপারই না হয়েছিল।

মণিমালার দেওর অবনীমোহনের বড়ো শখের কলম ছিল এটা। একবার দোকানের জন্যে কোলকাতায় মাল ক্রয় করতে গিয়ে ভালো দাম দিয়ে জিনিসটা কিনেছিল। জিনিসটা সব সময় তার পকেটেই থাকতো।

একদিন কলমটা যখন তার পকেটে পাওয়া গেল না তখন বাড়ির সকলকে একে একে ডেকে জেরা করতে লাগলো অবনীমোহন। প্রথমে নিজের ছেলেদের জেরা সুরু করেছিল। তাইতে কনকলতা ব'লে উঠেছিল—ওরা তোমার কলম নিতে যাবে কেন। ওদের কি কলম নেই। তোমার ওপরের ভাইপোটিকে বরঞ্চ জিজ্ঞেস করে ছাখো। সে তো কলমের জন্যে কিছুদিন থেকে তার মায়ের কাছে বায়না ধরেছে। নিলে সে-ই নিয়েছে।

কনকের বড় ছেলে অমিলও ফট্ ক'রে ব'লে বসলো—হ্যাঁ বাবা, ও-ই নিয়েছে। ওর পকেটে ওইরকম একটা পেন দেখেছি।

সুশান্তকে ডেকে জেরা করা হলো। সে বললো—পেনের কথা আমি কিছু জানি না।

অনিল বললো—তোর পকেটে কাল ওইরকম যে একটা পেন দেখলুম।

সুশান্ত অবাক হয়ে ওর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো।

কনক অবনীমোহনকে বললো—ও-ই নিয়েছে, ওর মুখ চোখ দেখে বুঝছো না।

সুশান্ত ওদের কথাবার্তায় এতো অবাক হয়ে গিয়েছিল যে তার মুখ দিয়ে কোনো কথা সরছিল না। ওকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে অবনীমোহনের মনে বুঝি সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল। হঠাৎ অতিমূর্তিতে এগিয়ে এসে সুশান্তর গালে একটা চড় মেরে বলেছিল—বল্ হারামজাদা, আমার কলম কোথায় রেখেছিস?

সুশান্তর সেদিন যেন কী হয়েছিল। কাকার হাতে চড় খেয়ে চিরকালের শান্ত ছেলেটা সেদিন কেমন যেন বড়ো উদ্ধত হ'য়ে উঠেছিল। উদ্ধতগলায় বলে উঠেছিল—আপনি আমায় অন্যায়ভাবে মারবেন না কাকাবাবু।

কী বললি হারামজাদা! আমার কাছের জন্য অন্যায় তোর কাছে জানতে হবে—তুই আমায় জানাবি!—ব'লে অবনীমোহন ক্ষেপে গিয়ে আরও কয়েক ঘা কিল চড় ঘুষি বসিয়ে দিলো।

সুশান্ত তবু চুপ ক'রে রইলো না। দুহাত দিয়ে কাকার নির্দয় আক্রমণগুলোকে ঠেকা করতে করতে বলে উঠেছিল—জানাবো বইকি, আপনার যদি সেটুকু বোঝবার শক্তি না থাকে তবে জানানোই উচিত।

কনকলতা গালে হাত দিয়ে অবাক হওয়ার ভঙ্গীতে বলেছিল—ও মা গো—ছেলের কি মুখ ভাখো। কেমন ক্যাট্ ক্যাট্ করে ছোটমুখে বড়ো কথা বলছে। দাও না গো দেখিয়ে ওর মুখটা থেঁতো ক'রে।

অবনীমোহন কনকের বলার অপেক্ষায় ছিল না। তার আগেই সে চুলের মুঠি ধরে সুশান্তকে ধরাশায়ী ক'রে বেদম মার দিতে সুরু করেছে।

ছেলেটার সেদিন যে কী হয়েছিল। কাঁদছিল, তবু উদ্ধত গলায় অবনীমোহনকে ভর্ৎসনা করে চলেছিল।

মধিমালার মনে হয়, শুধু সেদিনের ব্যাপারটার জন্যেই ও অমন উদ্ধত হ'য়ে ওঠেনি। আসলে এবাড়ীর লাঞ্ছনা গঞ্জনা পেয়ে দীর্ঘদিন ধরে তার মনে যে ক্ষোভের বারুদ জমা হ'য়েছিল—সেটাই সেদিন ফেটে পড়েছিল। অবনীমোহনের মুখের ওপর সেদিন তার অমানুষিকতা—তার স্বার্থান্ধতার সমুচিত জবাব দিয়েছিল।

অবনীমোহনও রাগ সামলাতে পারেনি। তার ক্রোধ আর অমানুষিকতা চরমে উঠেছিল সেদিন। এলোপাথারি কিল চড় ঘুষি আর লাথিতে সুশান্ত জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল।

সেদিন প্রায় দু'ঘণ্টা পরে তার জ্ঞান ফিরেছিল। তখন তার সমস্ত শরীরে অসহ্য ব্যথা। ব্যথায় উঠে বসতে পারছিল না। কঁকিয়ে কঁকিয়ে কোনোরকমে কথা বলছিল।

সব থেকে বুকেই বেশী চোট লেগেছিল। অবনীমোহন জুতোপায়ে তার বুকে কয়েকটা

দাগি মেরেছিল। তাইতেই বুঝি অমন হয়েছিল। সে-ঘটনার পর সুশান্ত প্রায় তার বুকের যন্ত্রণাটার কথা মাকে বলতো।

ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝলেও মণিমালার তেমন কিছু করার উপায় ছিল না। শুধু মাঝে মাঝে রাত্তিরে সুশান্তর বুকে গরম তেল মালিশ ক'রে দিতো। কিন্তু তাতে কিছুই হলো না।

…এরপর সুশান্ত দিন দিন বড়ো কাহিল হ'য়ে পড়ছিল। মণিমালা উদ্বিগ্ন হ'য়ে প্রায় জিগ্যেস করতো—হ্যা রে, তোর কী হয়েছে? দিন দিন অমন শুকিয়ে যাচ্ছিস কেন?

সুশান্ত কোনো জবাব দিতে পারতো না। মায়ের মনের উদ্বেগ দূর করার জন্যে শুধু মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলতো। কিন্তু সে হাসি বড়ো ম্লান। বড়ো চেষ্টাকৃত। মণিমালার উদ্বেগ তাতে বাড়তো বৈ কমতো না।

…তারপর দিনে দিনে আরও নানা উপসর্গ দেখা দিল। রোজ বিকেলের দিকে ঘুসঘুসে জ্বর আসতো। খুকখুক ক'রে কাশতো। রাত্রে বিছানায় শুয়ে ঘেমে নেয়ে উঠতো।

ছেলের রোগের কথা এতো দিন অবনীমোহনকে বলেনি মণিমালা। কোনো প্রতিকার হবে না জেনেই বলেনি। কিন্তু পরে বাড়াবাড়ি দেখে আর চেপে রাখতে পারেনি। শুনে অবনীমোহনের মুখে বিরক্তির রেখা ফুটে উঠেছিল।

আরও দু'তিন দিন বলার পর সে একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তারকে ডেকে এনেছিল। সেই ডাক্তারই সুশান্তকে ওষুধ দিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তাতে কোনো ফল হচ্ছিল না। দিনে দিনে ও যেন আরও নির্জীব হয়ে পড়ছিল। বেশী নড়তে চড়তে পারতো না। রাত্রের দিকে ঘামটা আরও বেশী দেখা দিয়েছিল। রাত্রে বিছানায় শুয়ে কষ্টে ছট্‌ফট্‌ করতো।

মণিমালা সারারাত শিয়রে জেগে থেকে বাতাস করতো। গায়ে হাত বুলিয়ে দিতো। আর মাঝে মাঝে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতো,—হে ঈশ্বর, ওর দেহের সমস্ত রোগ যন্ত্রণা আমার দেহে দিয়ে ওকে সম্পূর্ণ আরোগ্য ক'রে দাও।

কিন্তু কিছুই হলো না। আরো অবনতিই দেখা দিল।

শেষের দিকে মণিমালা অবনীমোহনের হাতে পায়ে ধ'রে এক এ্যালোপ্যাথ ডাক্তারকে আনিয়ে সুশান্তকে দেখিয়েছিল।

রুগী দেখে এবং রোগের বিবরণ শুনে ডাক্তারের মুখ কুঁচকে উঠেছিল। তারপর অবনীমোহনকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে খানিকক্ষণ ধরে কী সব যেন বলেছিল, যা অবনীমোহন মণিমালাকে বলতে চায়নি।

তবে মণিমালার জানতে কিছু বাকী থাকেনি। সেদিন রাত্তিরে খেতে বসে অবনীমোহন কনকের সঙ্গে চাপাগলায় যখন কথা বলছিল তখন আড়াল থেকে মণিমালা তার দু'একটা কথা শুনেছিল।

অবনীমোহন বলছিল—খুব সাবধান, ছেলেমেয়েরা যেন ওদিকে না ঘেঁষে, ব্যাপার বড়ো ছোঁয়াচে ব্যারাম।

কনক বলছিল—না তা আমি যেতে দিচ্ছিনে। তবে বাপু তুমি যতো তাড়াতাড়ি পারো ওদের এবাড়ী থেকে বিদেয় করার ব্যবস্থা করো। ছেলেপিলেদের এমনি করে কদ্দিন আর সামলে রাখা যায়।

অমলীবোধন চাপাগলায় বলেছিল—না, যেরকম অবস্থা তাতে খুব বেশীদিন লাগলাতে হবে বলে তো মনে হয় না। ডাক্তার তো তাই ব'লে গেল।

—তাই নাকি!

—চুপ, আস্তে বলো, শুনতে পাবে হয়তো।

মণিমালা আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি। তার মাথা ঘুরছিল। পা দুটো যেন অবশ হ'য়ে গিয়েছিল। টলতে টলতে কোনো রকমে নিজের ঘরে এসে বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়েছিল।

দুচ্ছা যে আসন্ন সুশান্ত নিজেও বুঝি তা টের পেয়েছিল। শেষের দিকে ক'টা দিন সে মাকে কাছ-ছাড়া করতো না। সব সময় আঁকড়ে ধরে রাখতো। মায়ের মুখের দিকে স্থির চোখদুটি মেলে অপলকে তাকিয়ে থাকতো। তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার চোখদুটি জলে ভ'রে উঠতো। গভীর রাত্তিরে মা ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবে মায়ের চোখে মুখে গায়ে কী এক গভীর মমতায় হাত বুলিয়ে দিতো।

যেদিন ও মারা গেল সেদিনটির কথা মণিমালা কিছুতেই ভুলতে পারে না।

বিকেল থেকে কথা বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। শুধু ঘোলা চোখে মায়ের দিকে অপলকে তাকিয়েছিল। স্থির চোখদুটি থেকে কেবলই জল গড়িয়ে পড়ছিল। মণিমালা বুঝেছিল, সে জল শুধু রোগের যন্ত্রণার জন্যেই নয়, নিষ্ঠুর পৃথিবীতে মাকে সম্পূর্ণ নিঃসহায় অবস্থায় ফেলে যেতে হচ্ছে বলেই সে কাঁদছিল। মায়ের চোখের জলেই সে যেন ওকে বেশী বিচলিত হ'য়ে পড়েছিল।

* * * * *

আজ তিন বছর পরে কলমটা পেয়ে সুশান্তর জন্যে মণিমালার বুকে নতুন ক'রে শোক উথলে উঠলো। সে কাঁদছিল আর মাঝে মাঝে কলমটার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল। যেন এই কলমটাই তার জীবনের পরম শত্রু।

সুশান্তর শোকে মণিমালা এতো অভিভূত হ'য়ে পড়েছিল যে উনোনে ভাত চাপিয়ে এসেছিল সে খেয়াল তার ছিল না। ভাত বোধহয় অনেকক্ষণ থেকেই পুড়ছে। পোড়া গন্ধটা যখন খুব তীব্র হয়ে নাকে এসে লাগলো তখন সে চমকে উঠলো।

ভয়ে তার সমস্ত মনটা মুহূর্তে সিটিয়ে গেল। ভাত পুড়ে যাওয়ার জন্যে যে দুঃসহ লাঞ্ছনা আজ তাকে ভোগ করতে হবে তার জন্যে সে আবার কাঁদতে লাগলো।

———

[কাহিনীর কাল উনিশশো একুশ। স্থান হিমাচলের চাষা। পাত্র চাষার সর্দার পরমরাজ ওরফে পর্মা এবং পাত্রী চাষার সেরা সুন্দরী কিশোরী ফুলমু।

শৌর্যে, বীর্যে, শক্তিতে, বুদ্ধিমত্তায়, হিমাচলে পর্মার দ্বিতীয় নেই। একডাকে সকলে তাকে চেনে। ভারতবর্ষকে বৃটিশমুক্ত করাই পর্মার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। বৃটিশের সঙ্গে লড়বার জন্য গোপনে প্রস্তুত হচ্ছে পর্মা। কঠিন তার প্রতিজ্ঞা, মত্ত তার বল। চাষার দ্বিতীয় পরবের দিন পর্মা আর ফুলমুর অদ্ভুত ভাবে পরিচয় হয়। তারপরই ওদের জীবনে নতুন পরিচ্ছেদের শুরু। কিশোরী ফুলমু রাতারাতি অনুভব করে যে সে বড় হয়েছে আর পর্মা আরো অনেক বেশী কাজের মধ্যে ডুবিয়ে দেয় নিজেকে। সেই দ্বিতীয়-পরবের দিন আরো একটি ঘটনা ঘটে। বাঙ্গলা চা-বাগানের ম্যানেজার লালসাহেব ফুলমুকে নির্জনে টেনে নিয়ে ওর ওপর পশু-শক্তি প্রয়োগের চেষ্টা করে। পাহাড়ী কন্যে ফুলমুর দাঁতের কামড় পুরস্কার পেয়ে তারপর সরে পড়ে তাড়াতাড়ি।

এদিকে পর্মা নিজের দৃঢ় সংকল্প ও মনের দৃঢ়তা থেকে ভীত হতে থাকে ক্রমশঃ। শেষপর্যন্ত ফুলমুর চোখের আড়ালে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়। মনকে বুঝ দেয় সে, কাঙড়ার অজেয় দুর্গের নক্সাটা দেখে আসা তার একান্ত প্রয়োজন। রওনা হওয়ার আগের রাতে, ফুলমু বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ওর গোপন আস্তানায় এসে হাজির। - কী? না - একরাত্রির মতো আশ্রয় দাও। কেন?---না বলে, মত্ত জোতদার ঘুমুলো নাহুর কামনার বহ্নি থেকে ও মুক্তি পাবে না। ওর গরীব বাবা এবং নাবী নাহুর কাছ থেকে অনেক টাকা পেয়ে আহ্লাদে একেবারে আটখানা হয়ে রয়েছে। ফুলমু কোনোমতে ওদের সজাগ চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এসেছে। পর্মা অসুস্থতাকে লেশমাত্র প্রশ্রয় দেবেনা, কিন্তু আশ্রিতাকে আশ্রয় দেয়া যে তার ধর্ম। অগত্যা, ফুলমুকে দিয়ে প্রায় প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়ে ওর সেবা করে নিলো। ফুলমুকে পুরুষের ছদ্মবেশে দিলরাজ নাম দিয়ে কাঙড়ায় এসে ওঠে ওর বাবার দোস্ত্ কর্মকর বাড়িতে। কর্মকর কাঙড়া দুর্গের গাইড, সংসারে তার কেউ নেই।---তিনজন দুর্গ দেখতে গেছে, অষ্টমীর মেলে, সেইদিন সেখানে হটো ফুলতে আসে বদমাস্ লালসাহেব তার এক বন্ধু ডিককে নিয়ে। সাহেব ফুলমুকে দূর থেকে দেখেই চিনতে পারে। আড়ালে সরে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। দুর্গ দেখে ফেরার সময় নির্জন উৎরাই পথে যখন নামতে থাকে ফুলমুরা, তখন মত্ত পাথরের চাঙড়া পর্মার দিকে গড়িয়ে দিয়ে তাকে শেষ করবার চেষ্টা করে সাহেবরা। গুরুতর আহত হয়ে বাড়িতে ফেরে পর্মা। ফুলমু পাতার রস দিয়ে পর্মার ব্যথা ভাল করে এবং মাংস খেলে পর্মা তাড়াতাড়ি শক্তি লাভ করবে, এই ভেবে, ফুলমু নিজের কাঙড়ুকোড়া গোপনে বিক্রী করে মাংস নিয়ে আসে।]

পরমরাজ বললো, "আর আমার বিশ্রামের দরকার নেই, আমি ঠিক আছি। কিন্তু, তুমি মাংস পেলে কোথায়?"

ফুলমু বললো, "কিনে আনলাম।"

"পয়সা কে দিলো?"

"কে আবার দেবে, আমার কাছে ছিলো, মাংস কিনলাম, আলু কিনলাম, আদাপেঁয়াজ কিনলাম, গরম মশলা কিনলাম—" কথা শেষ ক'রে ফুলমু নিজের তরিতে ঘরের মধ্যে একটা পাক খেয়ে নিলো।

পর্ণা হেসে ফেললো, "তুমি সত্যিকথা বলছোনা দিলরাজ, আমি জানি তোমার কাছে পয়সা ছিলো না—"

ফুলমু নিচু হ'য়ে নিজের চায়ের বাটি, পর্ণার থালাবাটি গুছিয়ে নিতে নিতে ফিসফিসিয়ে বললো, "তুমি ঠিক বলেছো পর্ণার, আমার কাছে পয়সা ছিলো না। আমি তোমার কোর্তার জেব থেকে পয়সা চুরি করেছি।"

পর্ণা বুঝলো, এবারও ফুলমু লুকোলো, সত্যি কথা বললো না। ওর কোর্তার পকেটে মাত্র কয়েকটা পয়সা ছিলো, তা দিয়ে মাংস তো দূরের কথা তার আনুসঙ্গিক উপকরণও কেনা যায় না। কিন্তু, কিছুতেই বলবেনা যখন, তখন ও নিয়ে পীড়াপীড়ি ক'রে লাভ নেই। বললো, "আচ্ছা, মাংসের কথা থাক্, তোমার ওষুধটা কি বলো, জেনে রাখি।"

ফুলমু হাসিমুখে বললো, "ভোমপাতা আর ঘৃতকুমোপাতা, এই দুটো পাতার রস আর একটু চুণ, ব্যস্ আর কিছু না। চুণ দিয়ে ঘষে, ঐ দুটো পাতা থেকে রস বার ক'রে ঘায়ের লাগিয়ে দিতে হয়।'

আমার বাপু একবার পাহাড় থেকে প'ড়ে হাঁটু জখম করেছিলো, বিছানায় পড়েছিলো পনেরো দিন। পা নাড়তেই পারে না তো কেতির কাজ করবে কী করে? আমার নানী দেখতে এসেছিলো বাপুকে। নানী যখন বাপুর পায়ে এই ওষুধ লাগাচ্ছিলো, তখন আমি সামনে ছিলাম। তাছাড়া, ও দুটোপাতা নানীকে আমিই তুলে এনে দিয়েছিলাম, সেজন্য আরো আমার মনে আছে। নানী চুণ দিয়ে ঘষে ঘষে পাতার রস বাপুর পায়ে লাগালো, একবার দুপুরে, একবার বিকেলে। রাতের বেলা দেখি, বাপু দিব্যি উঠে এসে আমাদের সাথে ব'সে খানা খেলো।...তা, সেই ওষুধটা বাবা কৈলজ্-বজীরের দয়ায় আমার মনে প'ড়ে গেলো ভাগ্যিস।

—"ওরে বাবা, আমাকে মাংস পাকাতে হবে—" ফুলমু থালাবাটি হাতে নিয়ে ছুট্ লাগালো।

কর্ণাক্ষ চিল্‌মে ফুঁ দিতে দিতে মাথা কাঁকিয়ে বললো, "বড় আচ্ছা লেড়্কা দিলরাজ, বড় সাচ্চা লেড়্কা—"

পর্ণা কর্ণাক্ষর খুশিভরা মুখের দিকে তাকিয়ে মুখটিপে হাসলো একটু।

তিনজন গোল হ'য়ে খেতে বসেছে। ঘাড়ে ঘাড়ে মাথা নেড়ে মাংস রান্নার তারিফ করছে কর্ণাক্ষ। যে ক'টা দাঁত আছে, সে ক'টা বা'র ক'রে মাঝে মাঝে অনর্গল হাসছে। পর্ণা যেন হঠাৎ আবার গার্হস্থ্যের মুখোশ এঁটে নিয়েছে। ওর মুখ দেখে খুশি-অখুশি কিছু বোঝবার যো নেই। ফুলমু একটু বেশীরকম উচ্ছ্বসিত। খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে কথা বলে যাচ্ছে অজস্র, আর পর্ণার পাতে বড় বড় মাংসের টুকরো তুলে দিচ্ছে। বলছে, "খাও পর্ণার, বেশী ক'রে মাংস খাও। বাপুর কাছে শুনেছি—চোট্ খেলেই শরীর মজবুত হয়। না, সত্যি কিনা কর্ণাক্ষচাচা তুমিই বলো?"

কর্ণাক্ষ তার মস্ত কয়েকটা দাঁতের মাঝখানে মাংসের টুকরোটা কায়দা করতে করতে বললো, "নিশ্চই, ঠিক কথা বলেছিস দিলরাজ—"

ফুলমুর খেমে ওঠা নরম মুখের দিকে পর্দা তাকালো একটু, এতক্ষণে, ফুলমুর হড়োহুড়ি ক'রে মাংস আনার কারণটা বুঝলো। কিন্তু, ও চুপ করেই রইলো।

কর্ণাক্ষ মাংসটা গিলে ফেলে বললো, "মাংস বসিয়ে তুই কোথায় আবার ছুট দিয়েছিলিয়ে দিলরাজ ?"

"শুকনো লাকড়ি আনতে মান্‌তিয়ার কাছে গিয়েছিলাম, না হ'লে মাংস হ'তে আরো অনেক দেরী হতো।"

"মান্‌তিয়ার সঙ্গে তোর আলাপ হয়েছে বুঝি ?"

ফুলমু হাসলো, "আলাপ কী বলছো চাচাজী, খুব ভাব হ'য়ে গেছে মান্‌তিয়ার সঙ্গে। ওকে সঙ্গে ক'রেই তো বাজার ক'রে আনলাম, পাতা আনলাম,—ও সঙ্গে না থাকলে ভোমপাতা ধুতুরোপাতা আনতেই পারতাম না এত সহজে, সারা জঙ্গল ঢুঁড়তে হতো। বড় ভাল মেয়ে এই মান্‌তিয়া।"

কর্ণাক্ষ তার স্তিমিত ঘোলাটে চোখদুটো টান ক'রে, ফুলমুর মুখের দিকে তাকিয়ে কৌতুক-গলায় শব্দ করলো, "হুঁ !.....হুঁ.....।" তারপর হেসে ফেলে বললো, "সত্যি, মান্‌তিয়া খুব ভাল মেয়ে, কতদিন আমার তামাকু সেজে দিয়েছে—চা বানিয়ে খাইয়েছে—"

পর্দা এতক্ষণ পরে ঠোঁট ফাঁক করলো, "মান্‌তিয়া কে ?"

"আমার ডানপাশে যে পীলায়ংএর বাড়িটা, সেখানে মান্‌তিয়ারা থাকে।" জবাব দিলো কর্ণাক্ষ।

সকলের খাওয়া হ'য়ে গিয়েছিলো। ফুলমু সব বাসনগুলো গুছিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো, বললো, "ঐ মান্‌তিয়াকেই তো তখন হটিয়ে দিলাম, আমার পেছু পেছু আসছিলো, বেটি এমন মজাদার গল্প ক'রে—গল্প শুনতে বসলে কী আর রান্না তাড়াতাড়ি হতো—"

কর্ণাক্ষ একটা লম্বা কাঠি নিয়ে উবু হ'য়ে দাঁত খোঁচাতে বসলো।

আগে একটা আস্ত বকরী অনায়াসে খেয়ে ফেলতো, আর এখন কিনা এক ছটাক মাংস খেলেই ঝুলুনি শুরু হয় দাঁতের। অস্ফুটে খানিকক্ষণ গজর গজর ক'রে কাঠি রেখে কলিজা নিয়ে বসলো কর্ণাক্ষ।

পর্দার বিছানা বিছানোই ছিলো, ও মুখধুয়ে এসেই শুয়ে পড়লো। মুখধোবার সময় ফুলমু বলে দিয়েছে,—সর্দার, ঘুমিয়ে পড়োনা যেন, আমি বাসন কখানা ধুয়ে এসে তোমার কাঁধে ওষুধ লাগিয়ে দেব। চোখবুজে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়বার চেষ্টা করছে পর্দা। আর ওষুধে দরকার নেই, ব্যথা ভাল হয়ে গেছে। কিন্তু ঘুম তাড়াতাড়ি আসবে ব'লে ভরসা হচ্ছে না। দুপুরে যা একখানা লম্বা ঘুম দিয়েছে, সহজে কী আর ঘুম আসবে ?

ফুলমুর পাতিলা (ডেকচি), কাড়ছি (হাতা) মাজার টুং টাং শব্দ শোনা যাচ্ছে। পর্দা প্রাণপণে চোখ বুজে আছে, কিন্তু কানের কাজ বেড়ে গেছে। ফুলমুর বাসন মাজার শব্দ, জল ঢালার

শব্দ, সব কিছু খুঁটিনাটি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু তাড়াতাড়ি ঘুমোতে পারলে বড় ভাল হতো পর্ণার। ঘুম আজ আর আসবে না নাকি!

কর্ণাক্ষ চোখবুজে কিছুক্ষণ ধোঁয়া টানার পর বললো, "বেটা, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি?"

"না, কেন?" চোখ বুজেই জবাব দিলো পর্ণা।

"তোর ভাইয়া দিলরাজের কে কে আছে সংসারে?"

পর্ণা একমুহূর্ত ভেবে নিয়ে বললো, "এখন ওর কেউ নেই। ও আমার কাছেই থাকে—"

"তবে তো বেশ ভালই হয়েছে। শোন, বেটা, দিলরাজকে তাহলে আমার কাছেই রেখে যা—"

পর্ণা মনে মনে ভাবলো: কেন, তোমাকে রেঁধে খাওয়ানোর জন্য আর বাসন মাজার জন্য।

"আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে—" কর্ণাক্ষ বলতে লাগলো, "মানুতিয়া মেয়েটা খুব ভাল, খুব ভাল জোড়ী বনবে দিলরাজের সঙ্গে। আমি ওদের সাদীর বন্দোবস্ত ক'রে দেব। মানুতিয়ার বাবা ভেজরামের টাকাকড়ি বেশ আছে। ঐ একটা মাত্র মা-মরা মেয়ে। বুড়ো ভেজরাম এমনি বারা একটি ছেলে খুঁজছে জামাইএর জন্য। বুড়োর বাড়ি, জায়গাজমি সবই তো এরপর দিলরাজই পাবে- "

পর্ণা হাসি চাপতে গিয়েও একটু হেসে ফেললো, বললো, "তা, বেশতো—"

"তাহলে তুই ব'লে দিস দিলরাজকে, ও তো দেখলাম তোকে যেমন খাতির ক'রে, তেমনি ভালবাসে, তারও ক'রে খুব।"

পর্ণা হাসিমুখে বললো' "তা ক'রে।"

কর্ণাক্ষ শুয়ে প'ড়ে বললো, "তাহলে এই কথাই ঠিক রইলো, দিলরাজ এখন আমার কাছেই থাকবে। বিয়ের পর দিলরাজ আর মানুতিয়া দুই বুড়োকে ভাগাভাগি করে দেখবে। বলা যায় না, আমার এ বাড়িটাও দিয়ে যেতে পারি। এ সংসারে আমার আর আছে কে?—" বুড়োর দীর্ঘশ্বাস ফেলবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নাক ডাকা শুরু হলো।

: আসলে, ফুলমুর সুন্দর মুখের ওপর দিয়া পড়ে গেছে কর্ণাক্ষ চাচার—পর্ণা নিজের মনে খুব খানিকটা হেসে নিলো।

তার মিনিট দুই পরে, হাতে পাতা ঙলতে ঙলতে ঘরে ঢুকলো ফুলমু। পর্ণা তখন কপট গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। ফুলমু পাশে এসে দাঁড়ালো। এমন নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে সর্দার, ওকে জাগানো তো ঠিক হবে না, ফুলমু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো। প্রায় বিশমিনিট দাঁড়িয়ে রইলো ফুলমু। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নির্নিমেষ দেখতে লাগলো পর্ণাকে। সর্দার পরমরাজের বলিষ্ঠ সুন্দর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, সুগঠিত বুকের পেশী, আকর্ণ বিস্তৃত চোখ আর ব্রহ্মরন্ধ্র জোড়াভুরু,—এমনভাবে দেখার সুযোগ ফুলমুর এর আগে আর কখনো হয়নি। একটু পরে কোলাটার দিকে নজর গেলো। কোলাটার দিকে তাকিয়ে উদ্বেল হয়ে উঠলো ফুলমু। ভাবলো, সর্দারের ঘুমটা একটু তরল হ'লে, বা পাশ ফিরলে ও তখন ডাক দিয়ে ওষুধটা লাগিয়ে দেবে। কিন্তু, কপট নিদ্রা তো ফিকে হয়না কখনো।

এদিকে, পর্ণাও ভেতরে ভেতরে অস্থির হ'য়ে পড়লো।

ফুলমু ওর পাশ থেকে সরবে কতক্ষণে? আর কতক্ষণ ও নিঃশ্বাসের তালে তালে বুক ওঠাবে নামাবে ঘুমন্ত মানুষের মত।

ফুলমু পলকহীন চোখে সর্দারের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

—সর্দারের মনে সুখ নেই—আত্মগতভাবে বললো ফুলমু.

—অমন সুন্দর মুখের চেহারা ঘুমের মধ্যেও কিরকম গম্ভীর হ'য়ে আছে, কেমন রুক্ষ-কঠিন দেখাচ্ছে সর্দার মুখ। ভুরু দুটোও এত কোঁচকানো, কপালে পর পর রেখা পড়েছে কয়েকটা।

—এর কারণ তো ও-ই, ও ছাড়া আর কে?

সর্দার নিষ্ঠুর নয়, সর্দারের মায়া দয়া আছে। সেই ভালমানুষির সুযোগ ও আপাগোড়া নিচ্ছে। না। আর নয়। অনেক ভুগলো সর্দার ওর জন্য। কালকেই ও চাষায় ফিরে যাবে। একাই যাবে। কারুর সঙ্গ-টঙ্গ ওর লাগবে না। না, কাল আর যাওয়া হচ্ছে কী করে? পরশু যাবে।

কর্দারুচাচা বেশ স্বার্থপর। হয়তো, সর্দারকে দিয়েই রান্না করাবে। কোমরটা না কমা দেখে ও যায় কী ক'রে! তবে, পরশু ও ঠিকই যাবে। তাছাড়া, আর একটা গোলমাল পাকাতে পারে। মানতিয়ার ওকে নাকি ভয়ানক ভাল লেগে গেছে। দুপুরবেলা, ও যখন ঘর ছেড়ে নিঃশব্দে বা'র হলো, তখন মানতিয়া ওপরপড়া হ'য়ে এসে আলাপ করলো, পরিচয় দিলো,—

এই পাশের কুঠিতেই আমরা থাকি, তোমরা তো এখানে নতুন এসেছো,—কোনো কিছুর দরকার হ'লেই আমার কাছে চেয়ে নিও, এবং ও বাজারে যাচ্ছে শুনে, আর ঘুত্‌রো পাতা আর দ্রোনপাতার ওর বিশেষ প্রয়োজন শুনে, এগিয়ে এসে ও যখন ফুলমুর সঙ্গে সঙ্গে চললো, তখন কী আন্দাজ খুশি হয়েছিলো ফুলমু। আর সত্যি বলতে কী, মানতিয়া সঙ্গে না থাকলে, ও অত সহজে পাতাগুলিও পেতোনা, আর কাঙহু (বালা) জোড়াও অত চট ক'রে বিক্রী ক'রে বাজার করতে পারতো না।

ফুলমু অবশ্য সেজন্য খুব কৃতজ্ঞ মানতিয়ার ওপর। কিন্তু, ও-ই জট পাকাবে। ঐ সামান্য ক'ঘণ্টার ভেতর, বোধহয় হাজারবার বলে ফেললে', দিলরাজ, তুমি বড় ভাল, তোমায় আমার বড় মনে ধরেছে।

এর মানে বোঝা বেশী কষ্ট নয়।

ও পরশুই চলে যাবে। আরো দু চারটে দিন হয়তো থাকতে পারতো, কিন্তু, মানতিয়ার চোখে ধরা পড়ে যাবে। মেয়েদের চোখকে ফাঁকি দেয়া অত সহজ নয়।

আজই তো, কাঙহুজোড়া পকেট থেকে বার ক'রে যখন জিগ্যেস করলো,—এসব কোথায় বিক্রী হয় জানো?

মানতিয়া,—কাঙহু কোথায় পেলে?—বলে চোখ বড় ক'রে ওর আপাদমস্তক কিভাবে দেখে নিলো। ওর শরীরটা তখন কিরকম শিরশিরিয়ে উঠেছিলো। তাসিস্ ব'লে ফেলিনি,—এ দুটো আমার। ওর আশ্চার—শোনার পর ওর মুখের থেকে মানতিয়া চোখ সরিয়ে নিয়েছিলো বটে, কিন্তু, তবু একটু খুঁত্ খুঁত্ না ক'রে ছাড়েনি।

—তোমার আশ্চার কাঙহু কেন বেচে দেবে দিলরাজ, আমাকে আগে বললে না কেন? আমি ওটা রেখে বাপুর কাছ থেকে চেয়ে তোমাকে টাকা দিতাম··।

পর্দা আর পারলো না। ফুলমু যে দিকে দাঁড়িয়েছিলো, তার বিপরীত দিকে পাশ ফিরলো।

"সর্দা—র···!" ফুলমু হাঁটু মেড়ে ব'সে অস্ফুটে ডাক দিলো।

পর্দা কয়েকদিন ধরে, হৃদয়ের মধ্যে একটা ছোট্ট চোরকুঠুরি আবিষ্কার করেছে। যার

অস্তিত্ব ও একেবারেই জানাতোনা। ওর মন আনাগোনা শুরু ক'রেছিলো সেখানে। সেই আনাগোনা ও জোর ক'রে বন্ধ ক'রে দেবে। ওর ধারণা, আজ বিকেল থেকেই ও তা পেরেছে।—এই নিরালা রাতে, এই ছায়া ছায়া অন্ধকার, ফুল্লুকে ওর পা বেঁসে বসে, ওষুধ ও লাগাতে কিছুতেই দেবে না। সবে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে মনটাকে, কি জানি, আবার যদি মনের ওপর দখল হারিয়ে ফেলে! কিন্তু, বৃথাই মানুষের বড়াই!

ফুল্লুর ডাকের সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুলে গেলো পর্ণার। আবার সোজা হ'য়ে শুয়ে কড়া গলায় বললো, "বললাম না, ওষুধের আর আমার দরকার নেই, ব্যথা সেরে গেছে। যাও, শুয়ে পড়োগে যাও—" কিন্তু, পর্ণা নিজেই আশ্চর্য হলো, যতখানি কড়া আওয়াজ ও বা'র করতে চেয়েছিলো, গলা দিয়ে তার কিছুই বার হলো না।

ফুল্লু নিষেধ মানলো না। হাত বাড়িয়ে কোলার ওপর পাতার রস লাগাতে লাগাতে বললো, "সর্দার, তুমি না বললে হবে কী, এখনো কোলা রয়েছে খুব, যেন একটা পাকা আমরুল। কোলা না কমিয়ে ফেললে আবার যদি ব্যথা হয়।"

পর্ণা কিছু না ব'লে, শরীরটা কেমন একরকম আড়ষ্ট ক'রে চোখ বুজে রইলো।

ফুল্লু ধীরে ধীরে অনেকক্ষণ ধরে ওষুধটা লাগালো, আর বারে বারে চাইলো পর্ণার দিকে। ওর মনে হলো, ও যেন কোনো জড়ো পদার্থের ওপর ওষুধ লাগাচ্ছে, কোনো মানুষের শরীরে নয়। মানুষের শরীর এমন কাঠ হ'য়ে যায় কী ক'রে! নড়া না, চড়া না, এক টুকরো কথা না, এমনকি নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের কাজ পর্যন্ত এমনভাবে চলছে—প্রায় না বোঝার মত।

সর্দার ওর সান্নিধ্য একেবারে পছন্দ করছে না, সেটা ফুল্লু এতক্ষণ পরে স্পষ্ট বুঝতে পারলো। আর, বোঝার সঙ্গে সঙ্গেই ওর ভয়ানক কান্না পেয়ে গেলো। একটার পর একটা কান্নার ঢেউ যেন ওর গলা পর্যন্ত ফেনিয়ে উঠ্‌তে লাগলো। প্রাণপণে ঠোঁট চেপে রইলো। তবু, যেন এক টুকরো কান্না ঠোকর খেয়ে বেরিয়ে এলো, ওর চাপা দুটো ঠোঁটের ভেতর দিয়ে। ফুল্লু ভয় পেয়ে, তাড়াতাড়ি দু'হাত তুলে নিজের মুখ চেপে ধরতে চেয়েছিলো, কিন্তু, দুটো হাতই নোংরা। ওদিকে, কান্নারা যেন বল বেঁধে ঠোঁটের একেবারে সামনে এসে গেছে। বিচলিত ফুল্লু দিশা হারিয়ে পর্ণার শুধু প্রশস্ত বুকের ওপর মাথা গুঁজে হু-হু ক'রে কেঁদে উঠলো।

চোরকুঠুরির দরজা খুলে গেছে। কিছুক্ষণের জন্য পর্ণা সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হলো। ওর হাত দুখানি প্রসারিত হ'য়ে নিমেষের মধ্যে ফুল্লুকে জড়িয়ে ধরলো।

সমস্ত ঘর চুপ। অসহ্য আনন্দে ফুল্লু অবশ-আচ্ছন্ন। কান্না থেমে গেছে অনেকক্ষণ। কতক্ষণ যে পর্ণা এমনভাবে আত্মবিস্মৃত হ'য়ে রইলো তা ও নিজেও টের পেলো না। অনেকক্ষণ পর, ওর সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠতেই, হঠাৎ সমস্ত নেশার ঘোর কেটে গেলো পর্ণার। এক ধাক্কায় ফুল্লুর শরীরটাকে সরিয়ে দিয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো বিছানার ওপর। ধাক্কার বেগটা প্রচণ্ড ছিলো, ফুল্লু একেবারে ছিটকে ওপাশের দেয়ালে গিয়ে পড়লো। পাথরে-দেয়ালে কপাল ঠুক সঙ্গে সঙ্গে দরদরিয়ে রক্ত ঝরতে শুরু হলো।

পর্ণার উত্তেজনা তখনো কমেনি। ফুল্লুর রক্তপাতের দিকে তাকিয়েও একেবারে স্তব্ধ হতবুদ্ধি

হয়ে গেলো। ও তো ফুলমুকে আঘাত দেবে ব'লে ধাক্কা দেয়নি। ও তো রক্ষে করতে চেয়েছে ফুলমুকে। সেই সঙ্গে নিজেকেও। কিন্তু, কোথা দিয়ে কী যেন ঘটে গেলো!

ওর মনটা তখুনি ছুটে গেছে ফুলমুর কাছে। —ফুলমু, এ কী হলো! আমি তো তোমাকে ব্যথা দিতে চাইনি। শিগ্‌গির ওঠো, চলো, রক্ত ধুয়ে ফেলে তোমার কপালে জলপটি লাগিয়ে দি। ওঠো—, দেরী করোনা। কিন্তু, পর্দার মনটা যত ছুটোছুটি করলো, লাফালাফি করলো, ও তত শক্ত পাথর হ'য়ে ঘরে রাখলো নিজেকে।

ফুলমু কপাল টিপে উঠে দাঁড়ালো।

একটু ভয়ে ভয়ে ঘাড় ফিরিয়ে সতর্ক চোখে ঘুরন্ত কড়াইর দিকে চেয়ে নিয়ে, ভেতরে চাকা-বারান্দায় চলে গেলো। কপালের রক্ত বন্ধ হচ্ছিলোনা ব'লে একটু মুষড়িয়ে পড়লো ফুলমু। এতরাত্রে গাঁধাপাতা সংগ্রহ করবে কী করে।

অনেকখানি রক্ত বার হয়ে যাওয়ার পর মনে পড়লো চুণ আর চিনির কথা। চুণ-চিনি মিলিয়ে পুরু ক'রে কপালে লাগিয়ে, হাত ধুয়ে ঘরে ফিরে এলো। ঘরে ঢুকে, লণ্ঠনটা পর্দার কাছ থেকে সরাতে এসেই, ও যেন মস্ত হোঁচট্ খেলো একটা।

মাথাটা দেয়ালে হেলিয়ে খুব ক্লান্ত ভঙ্গিতে ব'সে আছে পর্দা। মুখে যেন একফোঁটা রক্ত নেই, ঠোঁট শুকনো।

: এমন ভাবে ব'সে আছে কেন পর্দা? এমন মুখ শুকনো, ঠোঁট শুকনো? এর কী মানে? কেন?

—কেন আবার? সব অনর্থের কারণই তো তুই মুখপুড়ি!

পরণের জন্ত অপেক্ষা ক'রে আর কাজ নাই, কালই চাম্বায় ফিরে যা।

তাই যাবে ফুলমু। তাই যাবে। আর দেরী করবে না একদিনও। ·· সেই প্রথম দিনের দেখা পর্দা,—যে দু গাড্ডা ঠাস্-বোঝাই মাল অনায়াসে হড়হড়িয়ে চড়াইয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো, সেই দ্বিতীয় দিনের দেখা পর্দা,—যে মোষের লড়াইয়ের দিন ঘুমুলো নাহুর সামনে, চোখে মুখে আলো নিয়ে টান্ টান্ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো,—আর এই যে, দেয়ালে ঠেস্ দিয়ে, ঘামে ভেজা শরীর নিয়ে, শুকনো মুখে হতাশ ভঙ্গিতে ব'সে আছে, সে কী এক? কোথায় আমি নামিয়ে এনেছি চাম্বা শহরের সর্দার পরমরাজকে!

ফুলমুর চোখের পাতা ভিজে আবার ভারি হ'য়ে উঠ্‌লো, "সর্দার—!"

ফুলমুর আহ্বানে পর্দা চোখ তুলে তাকালো ওর দিকে, কিন্তু দৃষ্টি ওর দিকে নয়।

"আমার কোনো ব্যথা লাগেনি সর্দার, এক ফোঁটা ব্যথা নেই—"

এবার পর্দার ফাঁকা চোখে দৃষ্টি এসেছে। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো ফুলমুর মুখের দিকে। তারপর চোখাচোখি হলো।

অকুণ্ঠ-সরল সে দৃষ্টি। এতটুকু জটিলতার ছায়া নেই ফুলমুর কালো টানা টানা চোখদুটিতে। এমন সারল্যের দিকে চেয়ে থাকলে মনটা যেন না মোচড় দিয়ে পারে না। পর্দার চোখ তাড়াতাড়ি সরে গেলো। ফুলমুর কোলা কপালটার দিকে চেয়ে রইলো। ফুলমু বলছে, ব্যথা নেই। কিন্তু, এখনো তো রক্ত পুরো বন্ধ হয়নি। চুণ-চিনির পুরু প্রলেপ ভেদ ক'রে এপাশে ওপাশে চুইয়ে রক্ত পড়ছে। আর ব্যথা কী আর এখুনি হবে, কাল সকালে টের পাবে।

"সর্দার, আমার কোনো ব্যথা নেই—" হেসে হেসে আবার বললো ফুলমু।

পর্দা খুব শান্ত গলায় বললো, "ভাল। যাও তুমি এবার শুয়ে পড়োগে—"

—কিন্তু, সর্দার কেন সহজ হচ্ছে না? এখনো অমন ক'রে ব'সে থাকবে কেন? অনেক মাথা খাটিয়ে ফুলমু বললো, "সর্দার, আমি কালকেই চাষায় ফিরে যাবো। আমার সঙ্গে কোনো লোকজন লাগবে না—"

পর্দা দেয়াল থেকে পিঠটা আলগা ক'রে নিয়ে ফুলমুর মুখের দিকে তাকালো, "সেই ভাল। কালকেই তুমি চলে যেও। আমি টিকিট কেটে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসবো তোমাকে।"

কপাল কাটলো, রক্তারক্তি রক্ত পড়লো, এক ফোঁটা চোখ দিয়ে জল পড়েনি ফুলমুর। পর্দার কথা শেষ হওয়ার আগেই ফুলমুর দু'চোখ ছাপিয়ে টুপ্‌টাপ্‌ ক'রে বড় বড় ফোঁটায় জল পড়লো। সর্দারের চোখে সেটা যেন ধরা না প'ড়ে—খুব তৎপরতার সঙ্গে লণ্ঠনটাকে ঘরের একপাশে নামিয়ে রেখে ফুলমু ক্ষিপ্রপায়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

বুড়ো কর্দার টেরও পেলোনা, তার চার হাত দূরে এত কিছু ঘটনা ঘটে গেলো। ও তখন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে, দিলরাজ আর মানতিয়ার সাদীর স্বপ্ন দেখ্‌ছে। —ও বিয়ের ভোজ খাচ্ছে, আর ওর পাশে দাঁড়িয়ে মানতিয়ার বাবা তেজরাম খুব বেশী রকম খাতির ক'রে খাওয়াচ্ছে ওকে।—এমন রাজপুত্রের মত জামাই ক'রে দিলাম, খাতির করবে না?—হেঁ-হেঁ-হেঁ—ঘুমের মধ্যেই হাসছে কর্দার।

[ক্রমশঃ]

ঈশ্বরের কার্য্য কি বুঝা যায়, তিনি কি উদ্দেশ্যে কি করেন? তিনি সৃষ্টি, পালন, সংহার সবই করেছেন। তিনি কেন সংহার করেছেন আমরা কি বুঝতে পারি? আমি বলি, মা আমার বোঝাবার দরকার নাই, তোমার পাদপদ্মে ভক্তি দিও। মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য এই ভক্তিলাভ। আর সব মা জানেন। বাগানে আম খেতে এসেছি, কত গাছ, কত ডাল, কত কোটীপাতা, এসব বসে বসে হিসাব করার আমার কি দরকার? আমি আম খাই, গাছ পাতার হিসাবে আমার দরকার নাই।

—শ্রীরামকৃষ্ণ

The beaten paths of literature lead safeliest to the goal, and the talent pleases us most which submits to shine with new gracefulness through old forms. —*Carlyle.*

সাহিত্য ও সাহিত্যিক

কবি রবার্ট লী ফ্রস্ট

বর্তমান আমেরিকার শ্রেষ্ঠ কবি আটাশী বছর বয়স রবার্ট ফ্রস্ট গত ২৯শে জানুয়ারী বষ্টনে মারা যান।

কবি ফ্রস্ট ১৮৭৪ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন সাংবাদিক। এগারো বছর বয়সে রবার্ট পিতাকে হারান। সানফ্রান্সিসকোর ছেলে তিনি নিউ ইংল্যাণ্ডে পিতামহের কাছে বাস করতে চলে যান। বাল্যকাল থেকেই তাঁকে সংগ্রামময় জীবনে নামতে হয়। কখনো বা চাষাবাদের কাজে, কখনো শ্রমিকের কাজে, কখনো স্কুল শিক্ষক এবং আঞ্চলিক সংবাদপত্রের সম্পাদকের কাজে তিনি ছিলেন। কঠোর বাস্তবের সংগে কবিকে জীবিকার জন্যে লড়তে হয়েছিল।

উনচল্লিশ বছর বয়সে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'এ বয়েজ উইল' প্রকাশিত হয়। কাব্যচর্চা তিনি বিদ্যালয়ে থাকতেই শুরু করেছিলেন। এবং পরবর্তী জীবনে ডারমুথ কলেজে আরো বেশি সুনাম কেনেন কবিতার ক্ষেত্রে। প্রথম জীবনে তাঁর প্রেরিত কবিতাসমূহ প্রকাশকরা একবাক্যে বাতিল করে দিয়েছেন। তিনি যাঁকে বিয়ে করেন সেই এলিনর হোয়াইট তাঁর প্রেরণার উৎসস্বরূপ ছিলেন বলা যায়। কেননা, এ ভদ্রমহিলার কবিতা সম্পর্কে বিস্তর জ্ঞান ছিল। তিনি তাঁর স্বামীর কবিতার ভালমন্দ বিচার করে পরম উৎসাহিত করতেন কবিকে। ভদ্রমহিলা মারা যান ১৯৩৮ সালে।

বিয়ের এক বছর পরে কবি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যান ক্লাসী সাহিত্য-পাঠের জন্য। সেখানে দু'বছর পড়েন, কিন্তু কোন ডিগ্রী পাবার আগেই চলে আসেন। পরে ডারমুথ ও হার্ভার্ড দু' বিশ্ববিদ্যালয়ই তাঁকে অনারারি ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করেন। তারপর অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ এবং আরো কিছু বিশ্ববিদ্যালয় অনুরূপ সম্মান দেখান।

তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ লণ্ডনে প্রকাশিত হয় ১৯১৩ সালে। তাঁর আগের বছর তিনি ইংল্যাণ্ড যান। বইটি ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে। ১৯১৪ সালে কাব্যগ্রন্থ 'নর্থ অব্ বষ্টন' প্রকাশিত হওয়ামাত্র চতুর্দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৯১৫ সালে যখন দেশে ফিরেন, আমেরিকার নতুন দিগন্তের কবি বলে সমগ্র দেশবাসী অভ্যর্থনা জানান।

১৯২৩ সালে ফ্রস্ট ইংল্যাণ্ডে ও আমেরিকায় একযোগে 'দি নিউ হাম্পসায়ার' প্রকাশ করেন। এ বইটি আমেরিকার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সম্মান 'পুলিটজার' পুরস্কার লাভ করে। এ একই পুরস্কার তিনি আরো তিনবার লাভ করেন যথাক্রমে ১৯৩১ সালে কবিতা সংকলন, ১৯৩৭ সালে 'এ ফারদার রেঞ্জ'' ১৯৪৩ সালে 'এ উইটনেস ট্রি' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ দ্বারা। তিনিই একমাত্র কবি, যিনি চারবার এ পুরস্কারটি লাভ করার বিরল সৌভাগ্য অর্জন করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি আমেরিকার পোয়েট্রি সোসাইটির কাছ থেকে স্বর্ণ পদক লাভ করেন। ১৯৬২ সালে জানুয়ারীতে

তিনি যখন অসুস্থ হন, তখন ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে বোলিনগেন পুরস্কার দান করেন। ১৯৫৮ সাল থেকে তিনি লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের কবিতা-সংক্রান্ত উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছিলেন।

তারপর তাঁর আটাশী জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত হল 'ইন দি ক্লিয়ারিং' এতে 'দি গিফট আউট রাইট' শীর্ষক বিখ্যাত কবিতাটি রয়েছে।

রবার্ট ছিলেন আমেরিকার একজন জনপ্রিয় কবি। তিনি তাঁর কবিতার দ্বারা যেমন জনমনকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন, তেমনি তরুণ ও প্রবীণ সাহিত্যসেবকদের তাঁর অনুপম স্বভাব-মাধুর্য দ্বারা অন্তরঙ্গ করতে পেরেছিলেন। তিনি কবিতা খুব ভাল আবৃত্তি করতে পারতেন। যখন কবিতা পাঠ করতেন ফ্রস্ট, তখন শ্রোতারা চুম্বকবৎ শ্রবণ করতেন। আবার তিনি ছিলেন একজন রসিক ব্যক্তি। তিনি একবার বলেছিলেন, "A diplomat is a man who always remembers a woman's birthday but never remembers her age." বৃদ্ধ বয়সে যাঁরাই তাঁর সংস্পর্শে যেতে পেরেছেন, তারাই লক্ষ্য করেছেন, কবি যখন কথা বলতে আরম্ভ করতেন, তখন মুখের ওপর স্পষ্ট শত সহস্র বার্ধক্যের ভাঁজ যেন তারুণ্যের আবেগে ও দীপ্তিতে মুছে যেত।

ফ্রস্টের কাব্যে আমেরিকা তার মানস ছবির একটি পরিচ্ছন্ন রূপ খুঁজে পেয়েছে। তার স্বীকৃতি স্বরূপ মার্কিন কংগ্রেস তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট কেনেডি কংগ্রেসের তরফ থেকে একটি পদক উপহার দিয়েছিলেন। কেনেডি যখন প্রেসিডেন্ট পদে বসেন, তখন ফ্রস্ট 'দি গিফট আউট রাইট' কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনান। আমেরিকার ইতিহাসে এর আগে আর কোন কবিই এ ধরণের অনুষ্ঠানে যোগদানের সম্মান পাননি। ফ্রস্ট মারা গেছেন খবর পেয়ে কেনেডি বলেন, তাঁর মৃত্যু "Leaves the vacancy in the American spirit." তিনি আরো বলেন, "His death impoverishes us all, but he has bequeathed his nation a body of imperishable verse from which Americans will for ever gain joy and understanding. He had promises to keep. and miles to go and now he sleeps."

কেনেডির শেষের বাক্যটি রবার্ট ফ্রস্টের একটি কাব্যগ্রন্থের পাদটীকা মাত্র। অর্থাৎ কবি বলছেন,

The words are lovely, dark and deep,
But I have promises to keep
And miles to go before I sleep.
And miles to go before I sleep....

জন্ম-মৃত্যুর সীমানার বেরা জীবনে আমার অনেক কিছু করবার আছে এবং আমাকে করতে হবে, অনেক কথা রাখতে হবে। সেই চিরনিদ্রার দেশে যাবার আগে আমাকে বহুদূর পথ পাড়ি দিতে হবে।

বহু বাধাবিপত্তির কাঁটার দুর্গম পথের ভয়কে কাটিয়ে আমাদের সাধের গানে যেতে হবে, কর্তব্য সম্পন্ন করে মনুষ্যত্বের মহিমায় বড় করতে হবে জীবনকে।

The ground work of all faith is human woe
There's nothing but injustice to be had.

No choice is left a poet, you might add,
But how to take the curse, tragic or comic…'

আমরা ফ্রস্টের কাব্যে অনেক অমূল্য পংক্তির সন্ধান পাই, যা এক পলকে জীবনের গভীরে টেনে নিয়ে চলে, আমাদের বিস্ময় জাগায়, এক অনুপম অনুভূতির সাগরে ডুব দিতে সাহায্য করে। তেমি কবিতার অংশ :

"Before the leaves can mount again.
To fill the trees with another shade.
They must go down past things coming up.
They must go down into the dark decayed"…

এবং আরো একটি,

"The same leaves over and over again.
They fall from giving shade above."…

এই হলেন কবি ফ্রস্ট।

তাঁর মৃত্যুতে আমেরিকান সাহিত্য এবং বিশ্বসাহিত্য-ও এক কৃতী সেবককে হারিয়ে নিঃসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্ত হল।

তথাকথিত খ্যাতির মোহ থেকে রবীন্দ্রনাথের মন চিরকাল মুক্ত ছিল। আবরণ-হীন ঘরে সহস্র লোকের চক্ষু তারকার নীচে বাস করতে তাঁর খুবই আপত্তি। তিনি জানতেন অধিকাংশ মানুষ মানুষের অবস্থাকে পূজা করে, আসল মানুষকে নয়।

নোবেল পুরস্কারের খবর পেয়ে রবীন্দ্রনাথের যা মনে হয়েছে তা আজকের প্রচারের যুগে একেবারে বিস্ময়কর কথা : একটি কুকুরের লেজে টিন বাঁধিয়া দিলে, বেচারা নড়িলেই যেমন শব্দ হয় এবং চারিদিকে লোকের ভিড় জমে আমার দশা তদ্রূপ। • • যে সব লোকের আমার প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নাই, বা যাহারা আমার রচনার একটি ছত্রও পড়ে নাই, তাহারাই তাহাদের আনন্দজ্ঞাপনে সর্বাপেক্ষা অধিক মুখর। • • • এই অবাস্তবতার আধিক্য ভয়াবহ। সত্য কথা কি, ইহারা আমি যে সম্মান দাবি করিয়াছি, সেই সম্মানকে সম্মান দেখাইতেছে। আমাকে নহে।

কবি আজ জীবিত থাকলে কী বলতেন!

সাহিত্য-সংবাদ

শিল্পে নীতির বেসাতি

পবিত্র পাল

ডিকেন্স নাকি কথাসাহিত্যিক হিসেবে তত্টা স্মরণীয় বা বরণীয় নন। আসলে তাঁকে স্মরণ করি এজন্যে যে, তিনি পুঁজিবাদের সমালোচক ছিলেন এবং সেজন্যেই যেহেতু তিনি শোষিত সমাজের সঙ্গে একাত্ম হয়েছিলেন। কথাটা বলেছেন, চীনের লেখক কাউন্সিলের সদস্য। ডিকেন্সের ১৪০তম এবং ও' হেনরীর শততম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ কথা বলেছেন।

এরেনবুর্গ সোভিয়েট লেখক সঙ্ঘের মাতব্বরদের দ্বারা বহুবার নিন্দিত এবং তাঁর পেছনে সে-মাতব্বররা আঠার মত লেগে আছেন। পারলেই তাঁকে একঘরে তাঁরা ঠুকে নেন। আবার কিছু দিন হল, বিখ্যাত রাশিয়ান শিল্পী আন্দ্রেকজাণ্ডার সাকসিওনিভ প্রাভদায় এরেনবুর্গকে এক চোট নিয়ে নিলেন। ব্যাপারটা নাকি এই যে, এরেনবুর্গ পশ্চিমী শিল্পরীতির রাশিয়ার শিল্পক্ষেত্রে প্রবর্তন করতে সাহায্য করছেন। এভাবে বুর্জোয়া-ভাবাদর্শের সাহায্যে অন্তর্ঘাতীমূলক কাজ করে যাচ্ছেন।

এদিকে আবার বিজ্ঞতম ব্যক্তি বলে যাঁকে আমরা জানি কিউবার পর থেকে, সেই ক্রুশ্চেভ রেগে গেছেন অ্যাবষ্ট্রাক্ট আর্টের ওপর। ক্রুশ্চেভের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে হাঙ্গেরীর মিঃ কাদার বলছেন,

"Artists should know that socialism is the ideology of the masses and he who appeals to the masses must find the way to the thoughts and feelings of the labouring millions ··Works of art must live up to their noble mission : to help the education of the Socialist man." অ্যাবষ্ট্রাক্ট আর্ট সে কারণেই নাকি পরিত্যাজ্য। সেকারণেই নাকি সে-তরুণ রাশিয়ান শিল্পীদের মস্কোর ইউথ হোস্টেলে অ্যাবষ্ট্রাক্ট আর্টের প্রদর্শনীর আয়োজন করতে দেওয়া হয়নি নভেম্বর মাসে। ক্রুশ্চেভ অ্যাবষ্ট্রাক্ট আর্টকে প্যাথলজিক্যাল বলেছেন এবং টাস বলেছেন, এগুলো আর কিছু নয় শুধু "imperishable babbling demonstrating the spiritual poverty of the authors of the works."

এদিকে আমাদের দেশে একদল বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী, যাদের কারো কারো অকালপক্কতার ফসল কিছু বক্তৃতা কোন কোন পত্রে অনুলিখিত হওয়ার ছুতো খুঁজে যায়, স্বাধীন সাহিত্য সমাজের সেবায় ব্রতী হয়েছেন। স্বাধীন সাহিত্য সমাজ বলতে তাঁরা কী বুঝেন বা এদ্দিন ধরে কী বুঝে এসেছেন, বাংলা দেশের লোক তা ভালই জানেন। জনসাধারণের স্বার্থের সংগে তাদের সংযোগ কোন কালেই ছিলনা বা নেই এবং তাদের স্বাধীন সাহিত্যের সংজ্ঞাটি অনুরূপ। এদের মাথায় রাজনীতির মতলব বহুল পরিমাণে কিলবিল করছে সন্দেহ নেই।

পরপর কতগুলো দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করা হল। এতেই স্পষ্ট হয়, দেশে বিদেশে শিল্প-চর্চার ক্ষেত্রে 'নীতি' এসে কোমর শক্ত করে দিয়েছে। এ নীতির সঙ্গে সুস্থ ব্যক্তিত্বের সম্পর্ক কতখানি এবং জনসাধারণের স্বার্থের সঙ্গেই বা কতখানি, এ প্রশ্ন তলিয়ে দেখার অবকাশ নিতান্তই কম। এলিয়ট ইউরোপার সন্ধানে ইদানীং ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন বলেই, য়ুটেনের কমন মার্কেটে যোগদান চান। য়ুটেনের আর্থিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তা বিচার করছেন না। এলিয়টের দৃষ্টান্তটি এ-প্রসঙ্গে এখানে তুলনায় একারণে, ইদানীং আমাদের দৃষ্টি খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়েছে বলেই যখন যে সত্যের মুখোমুখী বসা উচিত, সে সত্যকে ধরে রাখতে বা চিনতে পারি না। আধুনিক জীবনের উত্তেজনাপূর্ণ রাজনীতির মন্থনান করতে গিয়ে দেখতে পাই, মূল লক্ষ্যাভিমুখী হওয়া কী সাংঘাতিক কঠিন কাজ। তাতে মস্তিষ্কে বেদনা উপস্থিত হয়, চিত্তে ভীতির সঞ্চার হয়, নিরাপত্তা হ্রাসের আশঙ্কা দেখা দেয়।

আরো মজা, শিল্পের ক্ষেত্রে নীতির লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরাই যাঁরা প্রথম মহাযুদ্ধের শুরুতে বাল্যকাল কাটিয়েছেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্রৌঢ়ত্বের ক্লান্তিতে ঝুঁকেছেন এবং পরবর্তীকালে বিবিধ সুবিধে-বাণিজ্যের তরী বেয়ে পরমকৃতজ্ঞতায় সুখী হয়ে দিন অতিবাহিত করছেন। এঁদের কাছ থেকে অনেক কিছু পাবার আশা ছিল। কেননা বহু তিক্ত অভিজ্ঞতার স্মৃতি বহন করে এঁরা ভেবেছিলাম সার সত্যের লক্ষ্যে পৌঁছুবার সাধনায় ব্রতী হবেন। এঁদের বিবেকে বাধেনা ইতিহাসকে মিথ্যে প্রমাণ করে জনসাধারণকে ধোঁকা দিতে। সুখের বিষয়, জনসাধারণের মধ্যে শুভবুদ্ধির সাহায্যে প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বেড়েছে। তাঁরা দুটো যুদ্ধ এবং যুদ্ধাতঙ্কের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিত। এবং দুটোর কোনোরকম ছদ্মবেশে প্রকাশকে বাধা দিতে সমর্থ।

নীতি নিশ্চয়ই থাকবে শিল্পের চর্চায়। কিন্তু নীতির গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেয়া চলবে না। কেননা, মনে করি, এতে সত্যদৃষ্টি ব্যাহত হয় এবং লাঞ্ছিত। এক নীতির জয়ঘোষণায় আরেক নীতির অনুশীলনকারীদের যেন শ্রদ্ধা জানাই। তাকে অযৌক্তিক প্রতিপন্ন করব কাজে, বুদ্ধিতে, সভা চিন্তায়, কিন্তু তাকে লাঞ্ছনা নয়, নয় তাকে ধিক্কার-অপমান, যা দিয়ে নিজেদের নীতিকে কখনো জেতানো যায় না। বরঞ্চ সমূহ ভয় থাকে, নিজেদের নীতিটি বুঝি শুষ্ক কলসীর মত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সমস্ত ধরণের শিল্পসাহিত্যের প্রশ্নে যেন আলোচনা প্রবলভাবে আমরা প্রবর্তন করতে পারি। সমস্ত আলোচনা যেন উত্তেজনা বর্জিত হয়, প্রীতির উত্তাপ ও শুভচেতনার উদ্দীপনা চিন্তাচর্চাকে জোরদার করে।

বিভিন্ন নীতির বেসাতি যেন শিল্পের ক্ষেত্রে কোন প্রত্যুৎ আচরণের প্রবর্তন না করে, বিভিন্ন নীতির পরীক্ষা নিরীক্ষা জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-সহযোগে পরিচালিত হয়। আমি বিশ্বাস করি, তখন শিল্পী ও সাহিত্যিক সমাজ ভবিষ্যতকে অনেকখানি নেতৃত্ব দিতে পারেন।

চিঠি শুধু চিঠি নয়!

(স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত)

আমেরিকা।

২০শে নভেম্বর ১৮৯৯

অভিন্নহৃদয়েষু,

শরতের পত্রে খবর পেলুম। হারকিন্সের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই, তোমরা এইবেলা experience (অভিজ্ঞতা) করে নাও। আমার আর কোন রোগ নেই। আমি আবার ঘুরতে চললুম জায়গায় জায়গায়। কুছ পরোয়া নেই, মাভৈঃ। সব উড়ে যাবে তোমাদের সামনে, খালি disobedient (অবাধ্য) হয়োনা, সব সিদ্ধি হবে।...জয় মা রণরঙ্গিনী! জয় মা, জয় মা রণরঙ্গিনী! ওরু, ওরা শুরুকী ফতে!

...আসল কথা, ঐ কাপুরুষত্বের চেয়ে পাপ নেই; কাপুরুষের উদ্ধার হয় না—এ নিশ্চিত। আর সব সয়, ঐটি সয় না। ওটি যে ছাড়বে না তার সঙ্গে আমার আর সম্পর্ক চলে কি? এক ঘা খেয়ে দশ ঘা তেড়ে মারতে হবে - তবে মানুষ।...কাপুরুষ দয়ার আধার!!

আমি আশীর্বাদ করছি, আজ এই মহামায়ীর দিনে, এই রাত্রে মা তোমাদের হৃদয়ে নাবুন, অনন্তশক্তি তোমাদের বাহুতে আসুন। জয় কালী, জয় কালী, জয় কালী। মা নাববেনই নাববেন —মহাবেগে সর্বজয়—বিশ্ববিজয়; মা নাবছেন, ভয় কি? কারুর ভয়? জয় কালী, জয় কালী। তোমাদের এক একজনের ঘাপটে ধরা কাঁপবে। জয় কালী, জয় কালী! আবার onward, forward (এগিয়ে চল, এগিয়ে যাও)! ওরু শুরু, জয় মা, জয় মা, কালী, কালী, কালী। রোগ, শোক, আপদ, দুর্বলতা সবগেছে তোমাদের! মহাবিজয়, মহালক্ষ্মী, মহাশ্রী তোমাদের! মাভৈঃ মাভৈঃ। কাঁড়া উত্তরে গেছে, মাভৈঃ। জয় কালী, জয় কালী!

বিবেকানন্দ

পুঃ—আমি মায়ের দাস, তোমরা মায়ের দাস—আমাদের কি নাশ আছে, ভয় আছে? অহঙ্কার মনে যেন না আসে, ভালবাসা যেন না যায় মন থেকে। তোমাদের কি নাশ আছে?—মাভৈঃ। জয় কালী, জয় কালী!

এই প্রথম

কমলা

নমিতা বসু

"সোমেশ তোমার স্ত্রী নাকি ধর্ম করছে? ব্যাপার কি হে!" কেউ বলে, "দেখো হে সোমেশ, অমন সুন্দরী স্ত্রী হাতছাড়া না হয়ে যায়।" কেউ বলে, "সোমেশটার মেরুদণ্ডও নেই, যুবতী স্ত্রী ধর্ম করছে, সে নির্বিবাদে তা সমর্থন করছে।" সোমেশ বন্ধুদের নানান্ মতামত শুনে স্মিত হাসে। কখনও বা রসিকতার সঙ্গে জবাব দেয়, "আমায় ছাড়া তো ওসব হয়না, সতীর পুণ্যে পতির পুণ্য হবে।" একবার অন্তরঙ্গ কোনও বন্ধুকে বলে ফেলেছিল, 'ভালোই তো', ওই সব নিয়ে থাকলে সংসারে না পাওয়ার বোধ কম বোধ হবে। জান তো ভাই, একান্নবর্তী পরিবার, কমলার মনটি বড়ো নরম। সারাদিন সংসারের নানা ঝামেলা তার ওপর দিয়ে যায়—কী আর দিতে পারি তার পরিবর্তে।" সহানুভূতিতে ভরে ওঠে তার মুখ, চোখে মুখে ফুটে ওঠে বাথা। হয়তো ভাবে পদোন্নতির আশায় কলকাতায় ছেড় অফিসে না এসে জামালপুরেই ছিল ভালো। কিন্তু শুধু নিজের উন্নতি ভেবে তো সে আসেনি। ভাইরা বাকী সবাই কলকাতায়। বিধবা ভাইবউ, বৃদ্ধা জেঠি, ভাগে ভাগ্নী দু'টি, বিদেশ থেকে টাকা পাঠাবার চেয়ে এক জায়গায় থাকা হ'লে আখিক সুবিধা বেশী।

কিন্তু যতটুকু না হ'লে নয় রেখে আয়ের বাকী অংশটা সবই কলকাতায় সংসার খরচের জন্যে পাঠাতে কমলা তো কখনও আপত্তি করেনি। এক এক সময় যদিও বড় চিন্তিত হয়ে পড়তো কমলা। ভাবতো, পুরুষমানুষ বোঝেনা তো, মেয়ের বিয়ের ব্যাপার। খুকীর জন্যে কী উপায়ে টাকা রাখা যায়। যদি কখনও বলেছে সোমেশকে, সোমেশ তার শান্ত স্থির বুদ্ধি দিয়ে উত্তর দিয়েছে—"ভাবো কেন, দাদা আছেন, জ্যাঠাইমা আছেন, আমার অন্য ভাইদেরও তো মেয়ে আছে। দাদা সব ঠিক করে দেবেন।" কিছু বলতে গিয়েও কমলা থেমে গিয়েছে। সোমেশ নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ।

খুকী হবার পর তারা জামালপুরে এসেছিল। আজ সাত বছর হল। এখন কমলার বয়স তিরিশ। সোমেশ সাঁইত্রিশ। এই বয়সে স্ত্রীর ভগবৎ-পথে স্বামীর সহায়তা এ যে ঈশ্বরের কতবড়ো আশীর্বাদ সেই কথা কমলার গুরুদেব ও অন্যান্য ভক্তা মহিলারা যখনই বলতেন কমলা কৃতার্থ হয়ে যেত। সত্যি বড়ো ভাগ্যে এমন স্বামী মেলে। এতটুকু স্বার্থ নিজের জন্যে মানুষটাকে কেউ করতে দেখেনি।

কমলার এই পরিবর্তনে তার একটি বিশেষ বন্ধু সঠিক খবর জানবার জন্যে সোজা কমলাকে এক চিঠি লিখেছিল। অবশ্য ছেলেমানুষীতে কমলা খুব হেসেছিল। উত্তরে লিখে ছিল—সখ, সুখ, এসব ক্ষণস্থায়ী, পারিপার্শ্বিকের ওপর শান্তির আশা করার মতো বোকামী আর নেই। সংসারে কেউ কাউকে বোঝেনা। তাই যে জীবনে বিষাদ নেই সে পথেই সে পা বাড়িয়েছে। বান্ধবী এর কিছুদিন চিঠিতে লিখেছিল "কোনও অভিমান তোকে এই পথে চালিত করেনি তো? তোর ওপর তোর স্বামী ও খুকীর জীবন নির্ভর করছে। ঈশ্বরের পথ সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু তোকে

জানি বলেই বলছি। একবার ভেবে দেখেছিলি? সোমেশবাবু বড় সৎ লোক। সংসারের পক্ষে খুব ভালো।" এ চিঠির জবাব দেয়নি কমলা।

ভাইদের মধ্যে সোমেশের কাজ সবচেয়ে ভালো এবং আমলপুরে ছবির মতো সুমুখল সুখে-ভরা তাদের জীবনযাত্রা দেখবার পর থেকেই বাড়ীতে কমলার ত্রুটি বেড়ে গিয়েছিল। সে সংকুচিত হত। ওঁদের মন রাখবার অসাধ্য সাধনা করতো।

আজকাল সন্ধ্যায় কমলা গুরুর ভরসায় সকলের উপেক্ষা বেড়ে ফেলে পুজোয় বসে। সোমেশ আপিস থেকে ফিরে কখনও কাচের পার্টিশান একটু ঘুরে আসে খুকী ও ভাইপো ভাইঝিদের নিয়ে। কিন্তু ক্রমেই সেটা কমে আসছে। ক্লান্ত হয়ে ফিরে খবরের কাগজটি বিস্তারিত পড়বার জন্যে নিয়ে—তারপর আলোটি নিভিয়ে বিশ্রাম করে।

খুকী বাবার কাছে আবদার করে—"কেন মা আমার জন্মদিনে আমোদ করতে নিরুৎসাহ করে? সকলের মা কতো উৎসাহ করে, আমার মা খালি বলে যে 'ওসবের মধ্যে কিছু নেই।' সোমেশ বলে, "কে বলে নেই, ওর মধ্যে যা থাকবার তা নিশ্চয় আছে। তোমার জন্মদিনে কি করতে চাও বলো মা।" খুকী বলে, "কিচ্ছু করতে চাইনা, কিচ্ছু দরকার নেই আমার।"

এই ভাবে দিন কেটে যাচ্ছে।

কলকাতায় আসবার দু'বছরের মধ্যে কমলা দীক্ষা নিয়েছে—সে আজ বছর কয় হল।

মেয়ে বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠেছে। কমলা মধ্য বয়সে পদার্পণ করলেও তার চেহারা দেখে মনে হয় যে চল্লিশের কোঠা অনেক দিন আগেই পেরিয়ে গেছে। সোমেশের মাথার পাকা চুলের অংশই বেশী। ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায় ভুগে দেহ ক্ষীণ হয়েছে। মেয়ের দিকে চেয়ে চেয়ে কত কথাই মনে পড়ে সোমেশের। সে যখন পাঁচ বছরের মেয়ে বাগানে খেলে বেড়াতো—কতোই না সুখালোচনা হত তাদের মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে। খুকী তার মায়ের মতো দেখতে। সে যেমন ছিল খুকীও তেমন। চাপা, নরম কিন্তু জেদী।

সোমেশের শরীর ইদানীং বড় একটা ভালো থাকে না। কিছু না কিছু চলেই। ডাক্তারেরা দিন কতক কলকাতার বাইরে ঘুরে আসবার পরামর্শ দিলেন। কথা উঠেছিল সোমেশের অশীতিতমা জেঠি, তার, ভাগ্নি ও ছোট ভাই সস্ত্রীক যাবে সোমেশদের সঙ্গে। কিন্তু কয়েকটি কারণে এবার তা হ'ল না।

পুরীর চক্রতীর্থে সোমেশের বন্ধুর খালি বাড়ীতে কমলা ও খুকীকে নিয়ে সে উঠলো। তীর্থস্থানে গিয়ে কমলা বড় প্রসন্ন। পুরীতে জগন্নাথের মন্দির ছাড়াও একাধিক মঠ মন্দির আছে।

কর্তব্যপরায়ণা ও কাজের কমলা চিরকাল। স্বামীর পথ্য ইত্যাদি নিখুঁত ভাবে সে নিজে হাতে করে দিত। সন্ধ্যার দিকে প্রায় রোজই সে কাছের মন্দিরটিতে যেত। সোমেশের বেড়ানোর সঙ্গী খুকী। কমলার কথা কেউই তোলে না।

সোমেশের শরীরের হয়তো বা কিছু উপকার হয়ে থাকবে—কিন্তু অমন মানুষ যে খিট্‌খিটে হ'তে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। কমলা বলতো—"তোমার কাজ না করে তো মন্দিরে যাই না। তোমার যখন যা দরকার সব রেখে তবেই তো ঠাকুরের আজ্ঞা

পালন করি। তিনি ঠিকই বলেন—"সংসারটা এই রকমই। শুধু নিজের কথা ভাবে মানুষ।" সোমেশ লজ্জিত হয়। ব্যথিত স্বরে বলে, "দুঃখিত হয়োনা কমলা। শরীরটা বড় খারাপ হয়েছে, মনটাও বড়ো দুর্বল হয়ে পড়েছে বোধহয়। না, যত্নের ত্রুটি তো তোমার নেই।"

সেদিন ছিল পূর্ণিমা। চাঁদের সম্মোহন হাসিতে অতল জলরাশি যেন তার স্পর্শ বাসনায় ব্যাকুল হয়ে পরমুহূর্তেই অক্ষমতায় বিপুল আক্ষেপে সমুদ্রের বুকে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ভেঙে পড়ছে—আবার উঠ্‌ছে—পড়ছে। এ আক্ষেপে ক্ষোভ নেই। চাঁদনীর এই জলকেলি চিরন্তনী। বড় অপূর্ব এই দৃশ্য।

চাঁদ ও ঢেউয়ের এই রঙ ঘুমোতে দিল না সোমেশকে। গভীর রাতে বারান্দায় বসতে গিয়ে দেখে কমলা রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে। সোমেশ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হয়তো দুর্বল শরীরে মাথা ঘুরে গেল। কাছেই চেয়ারটির ওপর বসে পড়ল। কমলা নিশ্চল নিথর দাঁড়িয়ে। রেলিংএ ঠেস দিয়ে হাতটি ভর দিয়ে এক ভাবে দাঁড়িয়ে। সে কি ঢেউয়ের ওঠা-পড়ার সঙ্গে তার মনের তরঙ্গের হিসাব মেলাচ্ছে?

আস্তে আস্তে উঠে এল সোমেশ। বড় সংকুচিত ভাবে কমলার পেছনে এসে দাঁড়ালো। কমলা মগ্ন। নিজের ওপর শাসন হারিয়ে কমলার বাঁ হাতখানি ধরতেই সে চমকে উঠল। চকিতে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে দুই হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল সোমেশ। বাঁধ-ভাঙা কান্নার মাঝে বলে উঠ্‌ল কমলা, "উঃ বড় কঠিন। বড় কষ্ট। আমি ক্লান্ত।" এবার ভরসা পেয়ে সোমেশ সস্নেহে কমলার মাথায় হাত দিয়ে তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করতেই কমলা ছিটকে সরে গেল। চাপা গলায় বলে, "কে এই পথে যেতে আমায় এগিয়ে দিয়েছিল? কে নিজের স্ত্রী-কন্যার ওপর কর্তব্যকে বড় করে আমায় সৎশিক্ষা দিয়েছিল?" ফিস্ ফিস্ করে ধরা গলায় বেরিয়ে গেল—"ভেতরটা আমার ঘাতে সংঘাতে জীর্ণ। ভগবান আমাকে ক্ষমা করো।" হতবাক্ হয়ে রইল সোমেশ। কত দিনের কতো পুঞ্জীভূত জিজ্ঞাসা আবেদন সব ভীড় করে এসে তার স্বর রোধ করে দাঁড়ালো। স্থির স্বরে কমলা বলে, "অসুস্থ শরীর তোমার, শোওগে।"

যন্ত্রচালিতের মতো ফিরে গেল সোমেশ তার ঘরে। জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে তার বিছানায়। ঢেউগুলির মূর্ছনা কানে আসছে। বড় বিষাদ তার সুরে। সমুদ্রে আর উত্তেজনা নেই। রাত্রি শেষে জলরাশি ম্লান চাঁদকে কল কল শব্দে সে রাত্রির শেষ কথার রেশ টেনে যাচ্ছিল মাত্র। ক্রমে ভোর হয়ে এলো। চাঁদের শেষ হাসিটি মিলিয়ে গেল।

———

একজন আর কয়েকজন

অমিলকুমার ভট্টাচার্য

ব্রহ্মজ্ঞান হচ্ছে পরমব্রহ্মকে জানা। নিজের আত্মোপলব্ধির চেতনা দিয়ে সোহং—আমিই সেই ব্রহ্মের স্বরূপ, এই পরম চেতনা লাভ করা। জীবনবোধের এই পরমমূল্যকে পেতে হলে সাধনার প্রয়োজন। সে-সাধনায় যাঁরা সিদ্ধিলাভ করেন—তাঁরা ঋষি। তাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন।

দেহ থেকে মন এবং মন থেকে আত্মার প্রসারই হচ্ছে জীবন-বেদ। দেহগত জীবন থেকে আত্মিক জীবন যাপনই ঋষিকর্ম।

ঋষিকর্মে সংসারের গণ্ডিকে অতিক্রম করা চাই। সংসারের গণ্ডি—বন্ধন। দেহের সীমা মৃত্যু। এই গণ্ডি এবং সীমার পথে যদি আবদ্ধ হয়ে থাকো, তবে কেমন করে তুমি পরমব্রহ্মকে লাভ করবে? কেমন করে তোমার আত্মোপলব্ধির চেতনাকে খুঁজে পাবে? কেমন করে তুমি মৃত্যুত্তীর্ণ হবে?

প্রাচীনকালের ঋষিরা সংসারের বন্ধন ত্যাগ করে বনে যেতেন—আত্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মস্বরূপকে জানতে। গৃহীকেও তাঁরা উপদেশ দিয়ে গেছেন সংসার-কর্তব্যপালন করে প্রৌঢ়ত্বে বনং ব্রজেৎ।

প্রাচীনকালের ঋষিদের যুগ অপসৃয়মান। এখন আর গৃহীর পক্ষে বনবাস সম্ভবপর নয়। কিন্তু তবুও যাঁরা শুধুই সংসারের জীব নন—তাঁরা তো বৈদান্তিক জীবন-ধর্মের কিছু নির্দেশ অন্ততঃ পালন করবেন।

শুধু প্রাণধারণ আর জীবন-যাপনের সাধারণ নিয়মতন্ত্রে তাঁরা যদি আবদ্ধ থাকেন—তাহলে সংসারের ক্ষুদ্র গণ্ডিই তো তাঁদের বেঁধে রাখবে।

খাওয়া-পরা, সুখ-ঐশ্বর্য, দুঃখ-বেদনা, আশা-বঞ্চনা—নরনারীর দৈনন্দিন জীবনের কথা। প্রেম-বিরহ, সুখ-দুঃখ এতে আর মহত্তর জীবন-বোধের চেতনা কই? মৃত্যুত্তীর্ণ মানবের জীবনের বৈদান্তিক জীবন-দর্শনের কতোটুকু আভাস এ থেকে পাওয়া যেতে পারে?

আমাদের কবিরাজমশাই এই প্রশ্নই একদিন করে বসলেন। প্রশ্নটি ছিলো তাঁর একটি জিজ্ঞাসা।

কবিরাজমশাই কয়েকজনের মতনই একজন উপেন্দ্র-অনুরাগী পাঠক। সাহিত্যের পাঠক হিসাবে উপেন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাসের তিনিও একজন ভক্ত। কিন্তু উপেন্দ্র-সান্নিধ্যলাভে তিনি তাঁর কাছ থেকে আরো কিছু পেয়েছিলেন যার জন্যে তিনি তাঁকে ঋষি-আখ্যা দিতে কুণ্ঠিত হননি।

কবিরাজমশাই উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি; শাস্ত্রজ্ঞ। পাশ্চাত্য শিক্ষাতেও তিনি উচ্চ ডিগ্রীধারী।

গয়া-ভারতীর সম্পাদকীয় আড্ডায় কবিরাজমশাই একজন নিয়মিত মজলিসী ব্যক্তি।

উপেন্দ্রনাথের তদানীন্তন উপন্যাস রচনায় শুধু শিল্পকর্মে হয়তো বা তাঁর তাত্ত্বিক মন পরিপূর্ণতা লাভ করছিলোনা। তাঁর কাছ থেকে তিনি হয়তো কিছু আত্মবাক্যের সন্ধানে উৎসুক হয়েছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে কবিরাজমশাই উপেন্দ্রনাথকে একদিন বললেন, 'দাদা, বয়েস তো হলো, এইবার উপন্যাস লেখা ছেড়ে আরো বড়ো বিষয়-বস্তুতে হাত দিন।'

উপেন্দ্রনাথ প্রশ্ন করলেন, 'কেন ?'

কবিরাজমশাই বললেন, 'আপনি জ্ঞানী। এখনো যদি সংসারের কাহিনী নিয়ে জীবন কাটান, তবে ব্রহ্মজ্ঞানের নির্দেশ দেবেন কবে ?'

কবিরাজমশাই-এর কথায় উপেন্দ্রনাথ হাসলেন। বললেন, 'সংসারের অলীকত্ব বুঝতে হলে সংসারকে তো সার্থক ভাবে উপলব্ধি করতে হবে। এই উপলব্ধি-বোধ না এলে বিশ্লেষণ-শক্তিই বা আসবে কেমন করে ? সংসারকে বিশ্লেষণ করার জন্যেই তো গল্প-উপন্যাসের কাহিনী গাথা।'

কবিরাজমশাই বিস্ময় বিমুগ্ধ চোখে উপেন্দ্রনাথের দিকে তাকালেন। বললেন, 'এই বোধ নিয়েই কী আপনি কাহিনী রচনা করেন ?"

উপেন্দ্রনাথ বললেন, 'ঠিক তাই। গল্প-উপন্যাস তো শুধু নিছক কাহিনী নয়। গল্প-উপন্যাস জীবনতত্ত্ব—জীবন-বেদ। সংসারের কতো বিচিত্র মানুষ—তার কতো বৈচিত্র্যময় জীবনধারা আর মননশীলতা। তাই নিয়েই তো কাহিনী। সে-কাহিনীর মধ্যে স্থূল থেকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার শক্তি গড়ে ওঠে। সংসারকে সার্থকভাবে বিশ্লেষণ করতে না পারলে তার অসারত্বকে জানা যাবে কেমন করে ? বেদান্তের উপদেশ, 'নেতি নেতি বিচারেণ ব্রহ্মজ্ঞানং ভবিষ্যতি।' নচিকেতা যমের সঙ্গে সংসারের সমস্ত উপচারকেই অলীক বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সংসারকে না জেনে কী তিনি প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন ? আমার গল্প-উপন্যাস লেখার সাধনাও ঠিক তাই।'

কথাটি শুধু নিছক তত্ত্বকথা নয়। উপেন্দ্রনাথের জীবন-কর্মে এর প্রমাণ নিতাই পাওয়া যেতো।

ছেলেরা বড় হয়েছে। তারা সক্ষম—সুবিবেচক। জ্যেষ্ঠপুত্র অমলপ্রসাদ সংসারের কর্তৃত্ব গ্রহণে রাজী। বিশেষ করে আরও এইজন্যে যে উপেন্দ্র-রচনার প্রতি ওঁর ঐকান্তিক অনুরাগ। স্বীয় পিতৃদেব বলে নয়, সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ সংসারের দায় এবং ভাবনামুক্ত হয়ে বাংলা সাহিত্যকে আরো পরিপুষ্ট করে তুলুন—অমলপ্রসাদ কায়মনোবাক্যে সেই আকাঙ্ক্ষাই করে থাকেন। একমাত্র পুত্রবধূ শ্রীমতী গোপাও শ্বশুরমশাইকে বলেন, 'খোপার খাতা, মুদির হিসেব আর বাজার-খরচ নিয়ে এখন আর আপনি ব্যস্ত হবেন কেন ? ও কাজ তো আমাদের !'

উপেন্দ্রনাথ হাসেন। বলেন, 'বৌমা, এর রস ফুড়ানোতেও কী কম আনন্দ !'

'কিন্তু লোকে কী বলবে বলুন তো ?' বলবে, এত বড়ো মানুষটিকে অকৃতজ্ঞ সংসার খোপার-হিসেবে বেঁধে রাখতে চায় !'

'বেঁধে রাখতে চাইলেই কী বেঁধে রাখা যায় বৌমা ?'

'তাহলে সংসারের এই খুঁটিনাটি ব্যাপারে কী স্বাদ পান ?' শ্রীমতী গোপার কথায় উপেন্দ্রনাথ বিপরীত প্রশ্ন করেন, 'আচ্ছা বৌমা, তুমি তো কতো রকমের রান্নাই রাঁধো। সব খাবারগুলোই কী তোমার প্রিয় ?'

আরো কথা বলতে যাচ্ছিলেন উপেন্দ্রনাথ। শ্রীমতী গোপা বুদ্ধিমতী। বললেন, 'থাক্ বাবা। এইবারে বুঝেছি।'

যাক্ বাচ্ছ। উপেন্দ্রনাথের এই বৈদান্তিক সত্তাও আসল উপেন্দ্রনাথ নয়। কথার যাদুকর উপেন্দ্রনাথ কথা দিয়ে নিজের আত্মোপলব্ধিকে যে সব সময় সঠিকভাবে ব্যক্ত করেন তা নয়। যে-কথায় অপরের আনন্দ—সে-কথাই কি নিজের কথা ? যে-কথায় অপরের অপ্রসন্নতা সে-কথা হয়তো নিজের

কথা হলেও হতে পারে! বিষ্টু নাগকে যে-কথা তিনি বলেন, আমাদের সে-কথা বলেন না। কেননা, সে-কথায় আমাদের কারুর সায় সব সময় যে থাকবে এমন কোনো মানে নেই। আবার আমাদের যে কথা বলেন—সে কথা বিষ্টু নাগকে বলতে চান না। কেন না, বিষ্টু নাগ আমাদের কয়েকজনের মতন পাঁচজন সাধারণ স্তরের মানুষ নয়। অথচ বিষ্টু নাগ এবং আমরা সবাই উপেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গজন।

বাড়ির বুড়ি ঝি বয়সেজাতী। কিন্তু সরল, সৎ এবং নির্লোভী। বাড়ির বড় ছেলে অমল-প্রসাদ নিয়মতান্ত্রিক। নিয়মতন্ত্র রক্ষায় অমলপ্রসাদের মধ্যে কিছু কঠোরতা আছে। শৃঙ্খলতাবোধ সংসারে নিতান্তই প্রয়োজন। বাড়ির বুড়ি ঝি সে-প্রয়োজনকে মেনে নিতে পারে না। তার কাছে আবার তদারকি কেন?

বুড়ি ঝি এসে বলে, 'না বাবা, তোমার মুখে আমি থাকতে লারলাম।'

উপেন্দ্রনাথ কী যেন লিখছিলেন। লেখা থামালেন। বললেন, 'কেন, কী হলো আবার?'

'তোমার বেটার মুখের বা শুনতে লারবো।'

উপেন্দ্রনাথ হৃদয়ঙ্গম করলেন। বললেন, 'সে তখন বলবে যখন তুমি শুনবে। আর তুমি যখন বলবে, তখন সে শুনবে। তাছাড়া কী সংসার চলে? যাও, কাজ করোগে যাও।'

বুড়ি ঝি তবুও নড়ে না।

উপেন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলেন,—'কী হলো আবার?'

'উনি যে তেড়িয়ে দিয়েছেন। দাও, আমার মাইনে পত্তর সব চুকিয়ে দাও।'

'কেন, এ সংসার কী তোমার নিজের নয়? তোমারো তো রাগ হয়। মুখে বলেছে বলে কি মনেও সে সেই কথাই বলেছে? যাও বৌদিদিমণির কাছে যাও।'

জলন্ত আগুনে জল পড়লো। আগুন নিভে গেলো।

বিষ্টুনাগ এরই মধ্যে কখন এসে বসেছিলেন। সমস্ত ঘটনাটাই তাঁর প্রত্যক্ষগোচর।

উপেন্দ্রনাথকে সম্বোধন করে তিনি বললেন, 'এ তোমার আর এক কৌশল।'

'কী রকম?'

'সাপও মরলো লাঠিও ভাঙলো না।'

'এই নীতিই তো যথার্থ নীতি।'

'যথার্থ নীতি কিনা জানি নে। তবে ভণ্ডনীতি।'

'ভণ্ডনীতি?'

'ভণ্ডনীতি নয়? তোমার অহং ভাবকে কেমন প্রচ্ছন্ন ভাবে প্রকাশ করলে!'

'কী রকম?'

'এ সংসারটা যে তোমারই কর্তৃত্বাধীন তাই বজায় রইলো। অমলপ্রসাদ গৌণ, বুড়ি ঝি নগণ্য।'

উপেন্দ্রনাথ হাসলেন।

বিষ্টুনাগ টিপ্পনি কাটলেন, 'কাঃ তব কান্তা, কস্তে পুত্রঃ—কী বলো ভায়া!'

উপেন্দ্রনাথ অসমাপ্ত রচনায় পুনরায় মনোনিবেশ করলেন।

লেখার জন্যে লেখা। তার মধ্যে আনন্দ পাওয়া আর আনন্দ দেওয়া এই দুইটি হচ্ছে মুখ্য আর তার বাইরে আরো যদি কিছু পাওয়া গেলো—তাহলে সেটা হচ্ছে গৌণ।

নিজেকে প্রকাশ করে আমি আনন্দিত। আমাকে পেয়ে তুমি আনন্দিত—আমি ধন্য। আমার পাওনা মিটে গেলো। কিন্তু লেখার জন্যে যে-লেখা—সেখানে ভাবগত পাওয়া মুখ্য নয়, বস্তুমূল্যের পাওনাই মুখ্য। বস্তুমূল্যের পাওনার সঙ্গে আরো যদি কিছু পাওয়া যায়—তাহলে তাহচ্ছে বোনাসের ওপর শাকের আঁটি।

শাকের আঁটির পাওনাটা যে পেশাগত পাওনার চেয়েও বড়ো হয়ে ওঠে—পেশাদার লেখক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে তা প্রত্যক্ষভাবে দেখার সুযোগ আমার অনেকবার হয়েছে।

সাহিত্য-তীর্থের সম্পাদক কবি রমেন মল্লিক এসে আর্জি পেশ করলেন, 'দাদা, পূজো সংখ্যার জন্যে গল্প চাই।'

উপেন্দ্রনাথ তখন গল্প-উপন্যাস লেখা নিয়ে বিব্রত। পূজোর মরশুম। বড়ো নামজাদা লেখকদের কাটলার বাজার। সৎসংসারের খোরাক কুড়িয়ে নেওয়ার সময়।

আমি কিন্তু কিন্তু করতে লাগলাম—'রমেনবাবু, অন্য চুটকি লেখার কথা বলুন! এ-সময় গল্প লিখবেন কী করে উপেনদা—যে কটির বায়না নিয়েছেন, তাই শেষ করা দায়।'

উপেন্দ্রনাথ বললেন, 'রমেনকে বঞ্চনা করা যাবে না অনিল—ওর কথা নোটবুকে টুকে রাখো।'

রাজার হুকুম—মন্ত্রীকে তা পালন করতেই হলো।

রমেন মল্লিক উৎফুল্ল। তিনি প্রতিশ্রুতি আদায় করে চলে গেলেন।

আস্ত গল্প লিখিয়ে হলেও উপেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি কিছু লিখতে পারতেন না। লেখার পরও অনেক কাটাকুটি করতেন। আর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণতার জন্যে লেখার স্পীডও ছিলো না।

যাইহোক কয়েকটি গল্প লিখলেন উপেন্দ্রনাথ এবং রমেন মল্লিকের 'সাহিত্য-তীর্থের' খোরাক মেটাতে একজন সম্পাদককে তিনি নিরাশ করলেন। এর জন্যে যে আর্থিক ক্ষতি হয়েছিলো তাঁর সে-কথা জানতে পেরে রমেন মল্লিক কিছু পারিশ্রমিকের কথা প্রস্তাব করতেই উপেন্দ্রনাথ প্রবলভাবে বাধা দিলেন, 'লেখার জন্যে তো লিখতেই হয় যে, লেখার জন্যে কিছু অন্তত: লিখতে দাও!' আরো সত্যির কথা—যেকটি গল্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলে যে গল্পটি আমার বিবেচনায় বোধ হয়েছিলো, উপেন্দ্রনাথ সেই গল্পটিই লেখার আনন্দে রমেন মল্লিককে উপহার দিয়েছিলেন।

পূজো সংখ্যায় আর কোনো লেখা দেওয়া তাঁর সাধ্যাতীত। কেন না, গল্প-ভারতীর পূজো সংখ্যায় তিনি আত্ম-নিয়ন্ত্র।

অথচ অধ্যাপক ডক্টর অরুণ মুখোপাধ্যায় এসেছেন, যাহোক একটু কিছু লেখা দিতেই হবে সাহিত্যিক মনোজ বসুর কাগজে।

উপেন্দ্রনাথ বিপন্ন বোধ করলেন। সমস্যার সমাধানে আমি উপায় বাতলালাম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রতিক প্রদত্ত দীর্ঘ বক্তৃতার কিছু অংশ স্বতন্ত্রভাবে দেওয়া যেতে পারে। ডক্টর অরুণ মুখোপাধ্যায় খুশি হলেন। তিনি সর্টহ্যাণ্ডে নোট নিতে প্রস্তুত।

খাতা খুলে আমি বলতে যাচ্ছিলাম উপেন্দ্রনাথ বাধা দিলেন। তিনি স্বয়ং বলতে

লাগলেন এবং ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে যে রচনাটি দাঁড়ালো—তা সম্পূর্ণ পৃথক আর একটি মৌলিক লেখা।

ডক্টর মুখোপাধ্যায় উৎফুল্ল। গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি লেখা নিয়ে চলে গেলেন।

আমি বললাম, 'দাদা, অনেক কাজ কিন্তু পিছিয়ে গেলো। প্রেস রাগারাগি করবে।'

উপেন্দ্রনাথ হেসে বললেন, 'কিন্তু অঙ্কণের আনন্দ তুমি স্বচক্ষে দেখলে তো! আর আমারো আর একটি লেখা হলো।'

আমি বললাম, 'কিন্তু পারিশ্রমিক?'

উপেন্দ্রনাথ জবাব দিলেন, 'আগে লেখা। তারপর লেখা।' একটু এদিক ওদিক তাকালেন উপেন্দ্রনাথ।

বললাম, 'কী দেখছেন দাদা?'

'না, নেই। দরজার কাছে কী যেন একটা ছায়া দেখলাম।'

'কার ছায়া!'

'ভেবেছিলাম বুঝিবা বিষ্ণু নাগের।'

'বিষ্ণু নাগ?'

আমার কথার উত্তরে সহাস্যে উপেন্দ্রনাথ বললেন, 'হ্যাঁ, বিষ্ণু নাগ। তোমাকে দেখেই বোধ হয় আর এলেন না। নিঃশব্দে ফিরে গেলেন।'

'আজ কী তাঁর আসার কথা ছিলো?'

'তাঁর কী আসার সময়-অসময় আছে নাকি?'

'তা এসে আবার ফিরে গেলেন কেন?'

'তুমি তাঁকে প্রকাশ করে দেবে তাই। আজকাল তিনি তোমাকে একটু ভয় পাচ্ছেন।'

উপেন্দ্রনাথের রহস্য সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম না। তবে এইটুকু বুঝলাম উপেন্দ্রনাথের সঙ্গে ইদানিং তাঁর একটা গভীর রহস্য-লোকের সংযোগ ঘটেছে।

ফল ত্যাগ করিয়া কর্মকে ভালবাসা, নিষ্কাম কর্মসাধনে কর্মবন্ধ ছিন্ন করাই হিন্দুর হিন্দুত্ব। যাঁহারা নিজের পূর্ণ অদ্বৈতানন্দে ডুবিতে চান, তাঁহারাই এই উচ্চ আদর্শের মর্ম বুঝিতে পারিবেন।

—উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব

রাজধানী থাস লণ্ডনের বাইরেও ইংলণ্ডের বিভিন্ন শহরে অনেক স্থায়ী থিয়েটার আছে। এগুলির মধ্যে প্রাচীনতম হলো ব্রিস্টলের থিয়েটার রয়্যাল। ১৭৬৬ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ প্রায় দু'শ বছর আগে এই থিয়েটার তৈরী হয়েছিল। সেই থেকে অদ্যাবধি এই থিয়েটারের জনপ্রিয়তা অব্যাহত আছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নাট্য-সম্প্রদায় এই থিয়েটারের মঞ্চে তাঁদের নাট্য-শৈলী প্রদর্শন করে গেছেন। আজ ঠিক সে'শো বছর হ'লো ব্রিস্টলের ওল্ড ভিক নাট্য সম্প্রদায় এখানে নিয়মিত বিভিন্ন নাটকের অভিনয় প্রদর্শন করে চলেছেন।

ওল্ড ভিক সম্প্রদায় স্বদেশের বিভিন্ন শহরে ঘুরে ঘুরেও তাঁদের বিভিন্ন নাটকের অভিনয় করে থাকেন। ১৯৫৩ সালে লণ্ডনের ওয়েষ্ট এণ্ড থিয়েটারে এঁরা একদিন একটি কমেডির অভিনয় করেছিলেন। নাটকটির নাম 'স্যালাড ডেজ।' প্রথম দিনের দু'টি অভিনয়ের পরেই জনসাধারণের তরফ থেকে ক্রমাগত আরো অভিনয়ের অনুরোধ আসতে লাগলো। এই ভাবে দেখতে দেখতে পাঁচটা বছর কেটে গেলো। বলাই বাহুল্য, একটি বিশিষ্ট নাট্য-সম্প্রদায় হিসেবে এর পরে ওল্ড ভিক নাট্যামোদিদের কাছে উচ্চ মর্যাদার আসন লাভ করলেন।

কোনো নাট্য-সম্প্রদায়ের পক্ষে ষোলটা বছর হয়তো কিছুই নয়। কিন্তু ওল্ড ভিক মাত্র ষোলো বছরের মধ্যেই নানা কারণে রীতিমতো একটা ঐতিহ্যের সৃষ্টি করে ফেলেছে বলতে হয়। এটা হয়েছে দুটো কারণে। প্রথমত পুরনো প্রচলিত নাটকের শক্তিশালী নতুন ধরণের অভিনয় দক্ষতার জন্যে, আর, দ্বিতীয়ত নতুন নতুন নাটক সৃষ্টি করে। সদ্যোক্ত কমেডি 'স্যালাড ডেজ'-এর উল্লেখ আগেই করেছি। ওল্ড ভিক দ্বিতীয় বিরাট সাফল্য অর্জন করেন টলষ্টয়ের অবিনশ্বর সাহিত্য 'ওয়র এণ্ড পীস' এর নাট্যরূপ দিয়ে। এই বিরাট উপন্যাসখানার অংশ বিশেষ নিয়ে নাটক রচনা করে তার অভিনয় এর আগেও বৃটেন, জার্মানি, ফ্রান্স, রাশিয়া, পোল্যাণ্ড বা আমেরিকায় হয়েছে। কিন্তু গোটা উপন্যাসখানার ভেতর থেকে কোনো প্রধান চরিত্র বাদ না দিয়ে কাহিনীর পূর্ণাঙ্গ রূপটি বজায় রেখে নাটক করবার চেষ্টা ওল্ড ভিক সম্প্রদায়ই প্রথম করেছিলেন এবং এ নাটকেরও সাফল্য রীতিমতো ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

একেবারে হালফিলের, অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর থেকে ইংলণ্ডে যে নবনাট্য আন্দোলন চলছে তারই মধ্যে একখানা হলো রবার্ট বল্ট-এর "এ ম্যান ফর অল সিজনস।" ওল্ড ভিক কর্তৃক এ নাটকের অভিনয়ও বিশেষ সমাদর লাভ করেছে।

পিটার উষ্টিনভের "রোমানফে এণ্ড জুলিয়েট" কমেডিখানিও ওল্ড ভিক সম্প্রদায় বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে মঞ্চস্থ করেছেন।

পুরণো নাটকের মধ্যে ওল্ড ভিক কর্তৃক শেক্সপীয়ারের হ্যামলেট, দি টেমপেষ্ট, জুলিয়াস সীজার এবং বার্ণার্ড শ'র আর্মস এণ্ড দি ম্যান এর অভিনয় সব চাইতে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

———

॥ উপেন্দ্রনাথ ॥

উপেন্দ্রনাথ আজ আর আমাদের মধ্যে নাই। তাঁহার সাহিত্য এবং সাহিত্যাদর্শ বাঁচিয়া আছে এবং চিরদিন থাকিবে।

উপেন্দ্র-অনুরাগী বাংলা-সাহিত্যের অগণন পাঠক-পাঠিকা উপেন্দ্র-সাহিত্যের রস আস্বাদনে আজিও পরিতৃপ্ত।

তাঁহার লেখনীতে যে সত্যের আদর্শ, সৃষ্টির যে অননুকরণীয় প্রতিভা, সৌন্দর্যলোকের যে ধ্যানমগ্নতা, চরিত্র-সৃষ্টির যে জাগ্রত প্রভাব প্রতিভাত, তাহা শুধু সাহিত্য-রস-পিপাসুদের আনন্দ দানই করে না তাহা সাহিত্যের এবং জাতির মহা-কল্যাণ সাধনও করে।

গল্প-ভারতীর সঙ্গে তাঁহার অবিচ্ছেদ্য বন্ধন। তাঁহার স্নেহস্পর্শকে সযত্নে বক্ষে ধরিয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা নিবেদন করিয়া আমরা বলি,—'জয়তু উপেন্দ্রনাথ!'

বিনা শ্রমসে

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(অপ্রকাশিত রচনা)

'বিনা প্রেমসে নাহি মিলে নন্দলালা'—এ কথার সত্যতা মেনে নেবার জন্যে যেমন প্রমাণপঞ্জীর প্রয়োজন হয় না, বিনা শ্রমসে উৎকৃষ্ট বস্তু সৃষ্টি করা যায় না, সে কথার সত্যতা সম্পর্কেও সেই একই কথা।

'কষ্ট না করলে কেষ্ট পাওয়া যায় না' ব'লে একটা যে বাঙলা প্রবচন প্রচলিত আছে, তার যথার্থ পাঠ হওয়া উচিত ছিল, 'কষ্ট না করলে ইষ্ট পাওয়া যায় না'। 'কেষ্ট' চালু হয়েছে 'কষ্ট'র সঙ্গে অন্ত্যপ্রাসের জোরে। আসলে 'কেষ্ট' মানে উৎকৃষ্ট অর্থাৎ কষ্ট না করলে উৎকৃষ্ট বস্তু উৎপন্ন হয় না। জগতের সকল উৎকৃষ্ট বস্তুই পরিশ্রমের ফল।

এখানে প্রতিভার কথা ওঠে। অনেকের ধারণা, প্রতিভাবান ব্যক্তির পক্ষে পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না, অবহেলা অনাদরে হেলাফেলাভাবে তিনি যা করেন তাই উৎকৃষ্ট বস্তু হয়।

এ বিষয়ে কিন্তু জগতের প্রতিভাবান ব্যক্তিদেরই বিরুদ্ধ সাক্ষ্য আছে। ঠিক মনে পড়ছে না, খুব সম্ভবত আমেরিকার প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক টমাস আল্‌ভা এডিসন প্রতিভার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন: Genius is the capacity for taking infinite pain. অর্থাৎ প্রতিভা হচ্ছে পরিশ্রম নেবার শক্তি।

আর একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি এডিসনের মতো প্রতিভাকে ষোল আনা পরিশ্রমের মধ্যে নিবদ্ধ না ক'রে জন্মদত্ত দৈবশক্তিকেও খানিকটা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন: Genius consists of one-fourth of inspiration and three-fourths of perspiration. অর্থাৎ প্রতিভা হচ্ছে এক-চতুর্থাংশ অনুপ্রেরণা আর তিন-চতুর্থাংশ ঘাম, অর্থাৎ পরিশ্রম।

সুতরাং, পরিশ্রম যে প্রতিভার একটা বৃহৎ অংশ, একথা প্রতিভাবান ব্যক্তিগণেরও অভিমত। শিল্পাচার্য নন্দলাল তুলি আর কয়েকটা রঙ নিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে একখণ্ড কাগজের উপর এমন কিছু ক'রে দিতে পারেন যার মধ্যেও শক্তির পরিচয় পাওয়া যাবে, কিন্তু সেই জিনিসটাকে নন্দলালের হিসাবের উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠায় নিয়ে যেতে হ'লে নন্দলালকেও যা করতে হবে তার নাম পরিশ্রম। অবশ্য অভ্যস্ত অভিজ্ঞ শিল্পীর নিকট পরিশ্রম ক্রমশঃ সহজসাধ্য হয়ে আসে, কিন্তু অনিবার্য থাকে চিরকাল।

একখণ্ড মর্মর প্রস্তরের মধ্য হ'তে শক্তিশালী ভাস্কর সৌন্দর্যময়ী নারীমূর্তি নির্মাণিত করেন। ছেনি-বাটালির প্রাথমিক আঘাতে যে কঠোর রুক্ষ বাহু নির্গত হয় তাকেও বাহু ব'লে বোঝা যায়। কিন্তু সেই বাহুতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শিরা তুলে যদি এমন স্তরে যেতে হয় যেখানে মনে হবে বাহুতে হাত বুলোলে শিথিল পেলব ত্বকের স্পর্শ পাওয়া যাবে, তা হ'লে পরিশ্রমের অনেক কাঠ-খড় পোড়াবার প্রয়োজন হয়।

অন্যান্য শিল্পের ন্যায়, সাহিত্য-শিল্পের বিষয়েও সেই একই কথা। সেখানেও inspiration এক-চতুর্থাংশ। রবীন্দ্রনাথ অবহেলা অনাদরে যে বস্তু রচিত করতেন, তার মধ্যেও তাঁর সাহিত্য-শক্তির পরিচয় থাকত। কিন্তু 'ঘরে-বাইরে' অথবা 'শেষের কবিতা' রচনা করতে বসতে হ'লে তখন আর অবহেলা-অনাদর চলত না; তখন প্রগাঢ় নিদিধ্যাসনের সংযমের আসনে ব'সে লেখনী চালাতে হ'ত। রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপির সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা জানেন, কত কাটাকুটি, কত বদ-বদল, কত সংযোগ-বিয়োগের পর তাঁর রচনা অভিপ্রেত মূর্তি গ্রহণ করত।

সুতরাং, সর্বভূমির সকল শিল্পীরই এই সদুপদেশ মনে রাখা উচিত যে, বিনা শ্রমসে না মিলে পরাকাষ্ঠা।

আমেরিকা

সচিত্র সংযোজনে

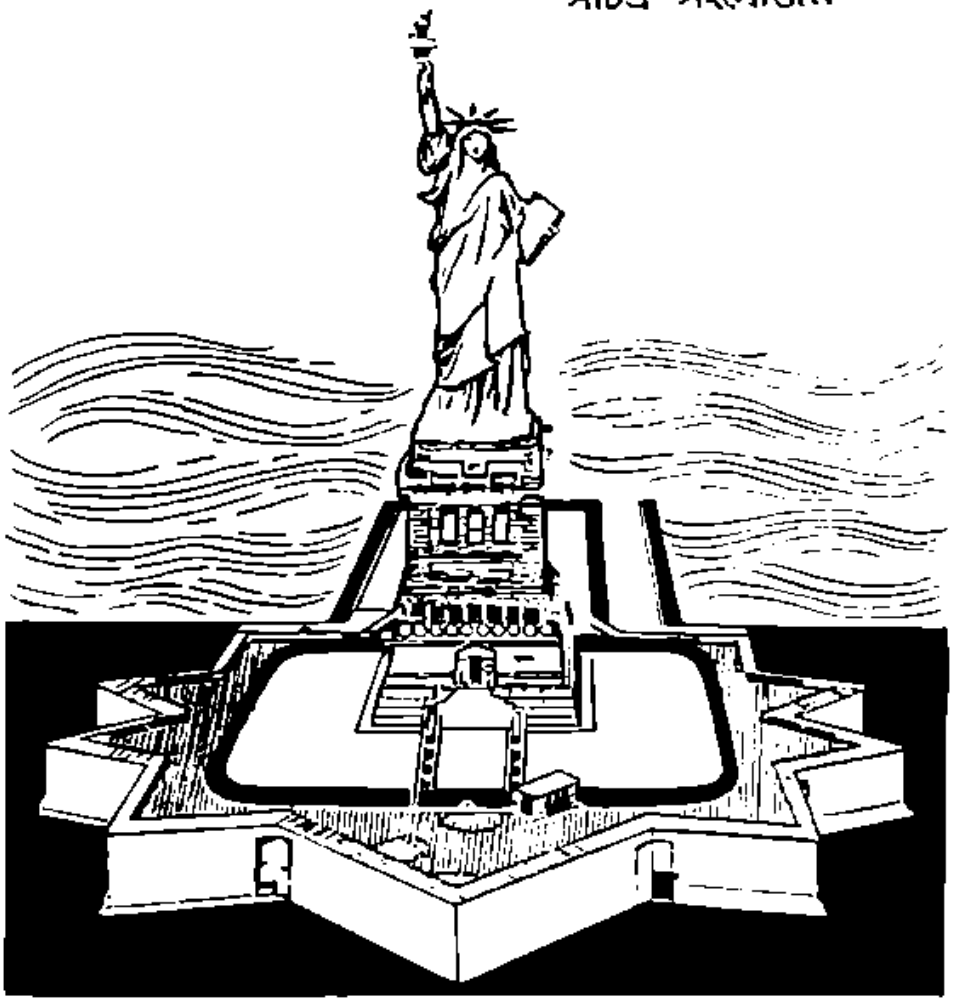

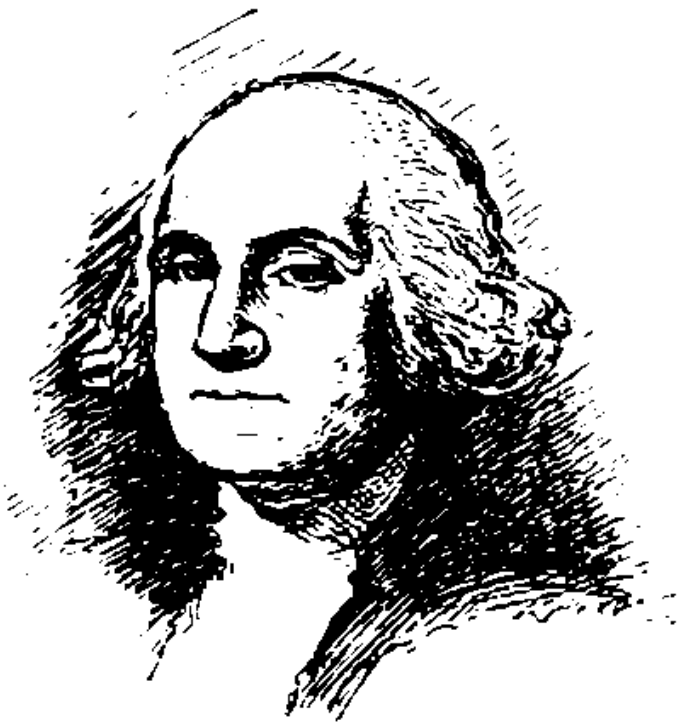

GEORGE WASHINGTON (1732-1799)

First President of the United States.

"Observe good faith and justice towards all nations. Cultivate peace and harmony with all. Religion and morality enjoin this conduct; and can it be that good policy does not equally enjoin it? It will be worthy of a free, enlightened, and, at no distant period, a great Nation to give to mankind the.... example of a people always guided by an exalted justice and benevolence."

FAREWELL ADDRESS, 1796

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ইতিহাসের মূলসূত্র

আজ থেকে বহু বছর আগে হেগেল তাঁর The Philosophy of History রচনা করেছিলেন। এই বইয়ের এক জায়গায় হেগেল ভবিষ্যৎ-বাণী করেছিলেন যে, ভবিষ্যতে পৃথিবীর আদর্শ-স্থানীয় দেশ হবে আমেরিকা। যে Absolute ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করে আসছে সভ্যতার সুরু থেকে—ভবিষ্যতে তাই আত্মপ্রকাশ করবে আমেরিকার রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে।

আজকের পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা সম্বন্ধে যাদের মোটামুটি কিছুটা ধারণা আছে তাঁরা সবিস্ময়ে তাকান আমেরিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-ব্যবস্থার দিকে। বর্তমান পৃথিবীতে দেশ এবং রাষ্ট্র হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করে আছে সে কিসের জোরে? অ্যাটম বোমা বা অন্য কোনো প্রকার মারণাস্ত্রের সংখ্যাধিক্যের জন্যে? আমাদের মনে হয় তা ঠিক নয়। এ্যাটম বোমা যখন তাদের ছিল না তখনো তারাই শ্রেষ্ঠ ছিলো। এবং এ্যাটম বোমা তো দূরের কথা, অন্য কোনো প্রকার মারণাস্ত্রের আবিষ্কার করে বা তার প্রয়োগ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কখনো সভ্য পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্বের প্রয়াসী হয়নি—যদিও ঐতিহাসিক প্রয়োজনে গত ৪০ বছর ধরে একাধিকবার কয়েক সপ্তাহের নোটিশে মোটা মার্কিন জাতি যুদ্ধের সাজ পরে যে কোনো অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে।

এই যে আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলা, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এবং জাতীয় চরিত্র কতখানি শক্তিশালী এবং প্রাণময় হলে যে এটা কার্যত ঘটানো যায় তা একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে।

আমাদের মনে হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃত শক্তি তার রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এবং সংবিধানের মধ্যেই নিহিত রয়েছে—অ্যাটম বোমার মধ্যে নয়। যে ক্ষণজন্মা মহাপুরুষগণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান রচনা করে গেছেন—রাষ্ট্রনায়ক এবং সৎ মানুষ হিসেবে তাঁরা শুধু আমেরিকাবাসীদেরই নমস্য নন, গোটা মানবজাতিরই শ্রদ্ধার পাত্র। তার কারণ, সংবিধানে সত্যসত্যই জনসাধারণের হাতে তাঁরা দেশের প্রকৃত এবং সমস্ত কার্যকরী ক্ষমতা তুলে দিয়েছেন। তুলে দিয়েছেন দ্বিধাহীন চিত্তে এবং নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়ে যে দেশের জনসাধারণের হাতেই প্রকৃত ক্ষমতা থাকা উচিত। তাঁরা বিশ্বাস করেছেন যে জনসাধারণ ক্রমশঃ প্রদত্ত ক্ষমতার যথাযোগ্য ব্যবহার করতে পারবে। ভুল চুক যদি কখনো কিছু ঘটেই যায় তো ঘটবে—অবশ্য এবং পারিপার্শ্বিকের তাগিদে তারা ক্ষমতার ন্যায্য ব্যবহার করতে শিখবে। এই রকম দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো বলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম যুগের রাষ্ট্রনায়কেরা কেউ কখনো ব্যক্তিবিশেষ বা গোষ্ঠি বিশেষের হাতে প্রকৃত ক্ষমতাটুকু করায়ত্ত করবার ফিকির খোঁজেন নি।

জনসাধারণের যোগ্যতার ওপর এতখানি আস্থা আজকের দিনেও খুব কম দেশের রাজনীতি-বিদরাই দেখাতে পারেন।

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের রাজনীতিবিদদের দেখা যায় যে, যে জনসাধারণের ভোটে তাঁরা প্রতিনিধি সভায় নির্বাচিত হন, একবার সেখানে পৌঁছে এমন সমস্ত কথাবার্তা বলতে থাকেন যেন জনসাধারণ কিছুই বোঝে না, তিনি তাদের একজন অভিভাবক স্বনীয় ইত্যাদি। এঁরা একটা সরল কথা ভুলে যান যে, কিছু না বুঝলেও যে জনগণের শক্তিতে তাঁরা শক্তিমান হয়ে উঠেছেন তাদের প্রতি তাঁদের কর্তব্য বা মমতাবোধের প্রকাশ একটু ভিন্নভাবেই হওয়া উচিত। তারা যদি প্রকৃতই ভালো মন্দ কিছু না বোঝে এমন হয়, তো বুঝতে পারবার মতো যোগ্যতা তারা যতো শীঘ্র লাভ করতে পারবে তার ব্যবস্থা করা তাঁদেরই কর্তব্য—রাজনৈতিক এবং নৈতিক দু'দিক দিয়েই।

১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই উত্তর আমেরিকার কয়েকটি কলোনী একযোগে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। স্বাধীনতার এই ঘোষণাটি রচনা করেছিলেন টমাস জেফারসন। এই ঘোষণার একটি বাক্যাংশ হলো নিম্নরূপ: ...When a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably a design to reduce them under absolute Despotism, it is their right, it is their duty, to throw off such Government, and to provide new guards for their future security.

আমেরিকার বিপ্লবী বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জর্জ ওয়াশিংটন ১৭৮৭ খৃঃ অব্দে সর্বসম্মতিক্রমে নবপ্রতিষ্ঠিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৭৯১ খৃঃ অব্দে দ্বিতীয় বারের জন্যেও জনগণের পীড়াপীড়িতে উনি রাষ্ট্রপ্রধানের গুরুদায়িত্ব বহন করেছিলেন। কিন্তু তারপরে আর কোনো মতেই ওঁকে সরকারী কোনো পদে রাখা যায়নি। উনি বলেছিলেন: কারো পক্ষেই দুবারের বেশি রাষ্ট্রপতি হওয়া উচিত নয়। জাতির পক্ষে একান্ত জরুরী অবস্থার সময় ভিন্ন পরবর্তীকালেও প্রত্যেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের আদর্শ মেনে চলেছেন। জর্জ ওয়াশিংটনের বিদায়-বাণীর মধ্যেই মার্কিন রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল জিনিষটি পাওয়া যায়।...The basis of our political systems is the right of the people to make and to alter their constitutions of Government. But the constitution which at any time exists till changed by an explicit and authentic act of the whole people is sacredly obligatory upon all.....

চঞ্চলা পাঠক

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি

এখন থেকে ঠিক চার শ' উনসত্তর বছর আগে কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন। এশিয়া ইয়োরোপের অনেক দেশের দু' হাজার এমন-কি তিন হাজার বছরের প্রাচীন ইতিহাস, ধর্ম-দর্শন বা সাধারণভাবে সাংস্কৃতিক ধারা সম্বন্ধে যেখানে অসংখ্য বই লেখা হয়েছে এবং বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, সেখানে পাঁচশ বছর আগে একটা দেশের অস্তিত্বই ছিলোনা কথাটা মনে রেখে যদি তার সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করবার কথা ওঠে তা'হলে প্রথমটা ব্যাপারটাকে একটা হালকা জিনিষ বলে মনে হতে পারে। মনে হতে পারে যে এরকম নবীন একটা সাহিত্য বা সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনার আবার কি থাকতে পারে। আমেরিকার অনেক দেশের পক্ষে কথাটা সত্যি হলেও পশ্চিম গোলার্ধের মধ্যমণি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে কথাটা সত্যি নয়।

অস্তিত্বের যে নবীনতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহিত্য-স্রষ্টারা তার অস্থিরতা বা অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও বিগত এক শ' কি দেড় শ' বছরের মধ্যে যা সৃষ্টি করেছেন আজকের পৃথিবীর সাহিত্যের আসরে এক বিস্ময়ের বস্তু। কারণ এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই মার্কিন দেশের সাহিত্যে এরকম অন্ততঃ বিশজন স্রষ্টার আবির্ভাব আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যাঁদের প্রত্যেকের সৃষ্টিই বিশ্বসাহিত্যের উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছে এবং মানুষের সাহিত্যের ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করেছে।

এখানে অবশ্য একটা কথা বলা দরকার। আমেরিকার ভূখণ্ড যদিও চার শ' বছর আবিষ্কৃত হয়েছে, এবং সেখানে সাহিত্যচর্চা হচ্ছে আড়াই শ' কি দু'শো বছরেরও কম সময় যাবৎ, কিন্তু অন্য যেকোনো অনুন্নত দেশের সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াসের চাইতে আমেরিকার বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহিত্যের ক্রমবিকাশ প্রকৃতিগতভাবেই কিছুটা ভিন্ন। কারণ যে জনসমষ্টি নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তাঁরা সংখ্যায় বেশির ভাগই ছিলেন ইংরেজ। সংখ্যার দিক থেকে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন ফরাসীরা। খাস ইয়োরোপের রাজনীতি তথা শিল্পসাহিত্যে যে সময়ে ইংরেজ এবং ফরাসীরা শ্রেষ্ঠত্ব লাভের আশায় প্রতিযোগিতায় ব্যাপৃত সেই সময় তাদেরই কিছু লোক আটলান্টিকের অপরপারে একটা নতুন দেশ, নতুন রাষ্ট্র এবং নতুন কৃষ্টি ও সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছিলেন। সংখ্যার জোর এবং অন্যান্য কারণবশতঃ আমেরিকায় নবগঠিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের প্রাধান্যই স্বীকৃত হয়েছিলো। এবং সেইজন্যেই ইংরেজী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী ভাষা। ফরাসী, জর্মন, পোলিশ, স্কান্ডিনেভিয়ান, স্লাভ বা ইতালীয় কিম্বা অন্য যে কোনো ভাষাভাষী মানুষই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাঁদের স্থায়ী বসবাসের বন্দোবস্ত করেছিলেন তাঁদের সকলকেই ইংরেজী ভাষাকেই আপনার বলে গ্রহণ করতে হয়েছিল এবং সেখানকার স্থায়ী অধিবাসীরা ক্রমশ যখন সাহিত্যসাধনা সুরু করলেন তাঁরাও বাহন হলো ইংরেজী ভাষা।

আলোচনার সুবিধের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহিত্যকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করে নিতে পারি। প্রথমত বিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত আর দ্বিতীয়ত বিংশ শতাব্দী সুরু হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত। প্রথম যুগের স্রষ্টা বলে আমরা যাঁদের কথা এখানে উল্লেখ করব তাঁদের সাহিত্য আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাসিকের পর্যায়ে পড়ে। মার্ক টোয়েন, হোমস, থোরো, হথর্ণ, হুইটম্যান, এমার্সন, এডগার এ্যালান পো, ও হেনরী প্রভৃতি এদিকে অগ্রগণ্য।

মার্ক টোয়েনের "দি ইনোসেন্টস এ্যাব্রড," "হাক্‌লবেরী ফিন," হোমসের তিনখানা ব্রেকফাস্ট টেবল, থোরোর ওয়ালডেন, হথর্ণের স্কারলেট লেটার, হুইটম্যানের লীভস অব গ্রাস এবং অন্যান্য কবিতা, এমার্সনের প্রবন্ধাবলী, এডগার এ্যালান পো এবং ও হেনরীর ছোটো গল্প—সংক্ষেপে বলতে

সেদে এই রচনাগুলিকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহিত্যের নিজস্বতা সৃষ্টিতে প্রধান সহায়ক হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। এবং এই রচনাগুলি যে বিশ্বসাহিত্যের স্বীকৃতিলাভ করেছে তা বলাই বাহুল্য। এই রচনাগুলি যে বাস্তবিক পক্ষে কতটা বিশিষ্টতা সম্পন্ন তা একটা কথা ভেবে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে। এই রচনাগুলির মাধ্যম ইংরেজী ভাষা, রচয়িতাদের অনেকেরই পূর্বপুরুষ খাঁটি ইংরেজ ছিলেন, অর্থাৎ খাস ইংলণ্ডের নাগরিক ছিলেন। কিন্তু দেখা গেলো আটলান্টিকের এপারে এসে ওঁদের এবং বংশধরদের ভাব ধারণা এবং বিশ্বাস একটা নতুন সংস্কৃতির সৃষ্টি করলো। পরবর্তীকালে, এমনকি আজ পর্যন্ত মার্কিন সাহিত্যের যে বিশিষ্টতা, কি গল্প বা উপন্যাসে, কি কাব্য, প্রবন্ধ বা রম্যরচনার মধ্যে, তার প্রকৃতির নিজস্বতা আমরা পূর্বোক্ত পূর্বসূরীদের রচনার মধ্যে দেখতে পাই।

মার্ক টোয়েনের সমকক্ষ রসজ্ঞানসম্পন্ন সাহিত্যিকার কি আটলান্টিকের ওপারে কি এপারে কখনোই খুব বেশি দেখা যায়নি। যে কারণের জন্য হিউ্লেকের ইয়োরোপেন ইংরেজী ভ্রমণসাহিত্যে অমরত্বলাভ করেছে, ঠিক সেই কারণবশতঃই মার্ক টোয়েনের "দি ইনোসেন্টস এ্যাব্রড" একখানা অনবদ্য গ্রন্থ।

হোমসের ব্রেকফাস্ট টেবল সিরিজের ৩ খানার যে কোনো মনোযোগী পাঠকই স্বীকার করবেন যে ডলতেয়ারের সঙ্গে ওঁর তুলনা করা হ'লে ডলতেয়ারকে কোনোভাবে ছোটো না ভেবেই আমার হোমসকে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিতে পারি।

হথর্ণের 'স্কারলেট লেটার' নিঃসঙ্গতাপ্রিয় মনোভাবসম্পন্ন চরিত্রের মনোবিশ্লেষণের উদাহরণ স্বরূপ হয়ে রয়েছে উপন্যাস সাহিত্যে। এদিক দিয়ে হথর্ণের সমকক্ষ বা তাঁর চাইতে অধিকতর দক্ষতা-সম্পন্ন লেখকের আবির্ভাব হয়েছে পৃথিবীতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তবু তার ফলে হথর্ণের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য কিছুমাত্র কমেনি। আজকের দিনেও হথর্ণের উপন্যাসখানি নানাদেশে সাগ্রহে পঠিত হয়।

গোড়ার দিকের মার্কিন সাহিত্যের কাব্য এবং প্রবন্ধের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় হুইটম্যান এবং এমার্সনের কথা। কবি হিসেবে হুইটম্যান প্রকৃতই একজন বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন। বেশ কিছুটা রবীন্দ্রনাথের মতো হুইটম্যান যা কিছু লিখতেন তাই কবিতা হয়ে যেতো—অর্থাৎ কবিতার আকার না হ'লেও প্রকৃতিতে প্রতিটি রচনার কাব্যধর্মীতা একবাক্যে স্বীকৃতিলাভ করেছে। জন স্টুয়ার্ট মিল এক জায়গায় লিখে গেছেন যে প্রকৃত কাব্য রচনার স্ট্রাকচারের ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে রচনাটির অন্তর্নিহিত আবেগধর্মীতার ওপর। হুইটম্যান এ কথার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। হুইটম্যান আজ পর্যন্ত বোধহয় আমেরিকার শ্রেষ্ঠ কবি। ওঁর কাব্যের সব চাইতে লক্ষণীয় দিক হলো জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে কি করে বিশ্বমানবের গ্রহণের এবং অনুধাবনের উপযোগী কাব্যরচনা করতে হয় সেই অতি-দুরূহ এবং অনেক প্রথম শ্রেণীর কবির পক্ষে দুঃসাধ্য শক্তি ও বোধটিকে উনি অতি স্বাভাবিকভাবেই আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অনেকে যে হুইটম্যানের হামেশাই তুলনা করে থাকেন তার একটা কারণ হলো রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত রচনার ভেতরেই যেমন সাহিত্যিক বক্তব্য ছাড়াও একটা দার্শনিক বক্তব্য প্রচ্ছন্নভাবে ওতপ্রোত হয়ে থাকে—হুইটম্যানের রচনাতেও ঠিক সেই জিনিসটির পরিচয় পাওয়া যায়।

আজকের পাঠক সমাজের বেশির ভাগই মনে করেন, এমার্সন দার্শনিক ছিলেন, সাহিত্যিক ছিলেন না। এর প্রধান কারণ ওঁর প্রবন্ধাবলীর ভাবগাম্ভীর্য। এমার্সনের "ইংলিশ ট্রেইটস এণ্ড রিপ্রেজেন্টেটিভ মেন"এর প্রবন্ধগুলি বা 'নেচার', সার্কেল বা এই রকম আরো একাধিক প্রবন্ধ আজে যার সমতুল্য রচনা আজ পর্যন্ত কদাচিৎ দেখা যায়। এমার্সন কবিতাও লিখতেন। ওঁর 'Brahma' কবিতাটিতে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন চিন্তার ছাপ স্পষ্ট দেখা যায়।

ছোট গল্পের ক্ষেত্রে পো এবং ও হেনরী পৃথিবীর সর্বত্রই পাঠক সমাজের কাছে যথাযোগ্য সমাদর লাভ করেছেন। এ ক্ষেত্রে পো'র বিশিষ্টতা সম্বন্ধে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে বর্তমান বিশ্ব-সাহিত্যে ছোট গল্পের যে ধারা চলেছে পো-কে তার শুধু অন্যতম প্রবর্তক বলেই গণ্য করা হয় না, ছোট গল্পকার হিসেবে আজ পর্যন্ত ওঁর সমকক্ষতার স্বীকৃতিলাভের আশা পৃথিবীর যে কোনো দেশের তরুণ সাহিত্যিকেরা করে থাকেন।

সংক্ষেপে বলা চলে যে এতোগুলি স্তম্ভের ওপর আজকের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহিত্যকর্মীরা তাঁদের সাহিত্য-সৌধ নির্মাণ করেছেন। নির্মাণ করেছেন তো বটেই, করে চলেছেনও বলতে হয়, তার কারণ স্টাইনবেকের নোবেল প্রাইজ লাভ কিংবা কবি রবার্ট ফ্রস্টের মৃত্যু পর্যন্ত আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহিত্যের যে অবস্থা দেখতে পাচ্ছি, ওর বিন্যাসে সামগ্রিকভাবে বিচার করে দেখলে তা নিশ্চয়ই বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে প্রথম শ্রেণীর বলেই স্বীকৃতি লাভ করবে।

প্রথমে আমরা যাঁদের সম্বন্ধে বলেছি তাঁদের পর থেকে আজপর্যন্ত আমরা দেখতে পাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁদের সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব এবং নূতনত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। এবং একটা দেশ যে এই তিরিশ কি পঁয়ত্রিশ বছরের ভেতর শুধুমাত্র সাহিত্যক্ষেত্রেই এতোগুলি নোবেল প্রাইজ পেলো এইটেই বোধহয় তাঁদের কর্মোদ্যম এবং ঐকান্তিকতার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। ধরে নেওয়া গেলো নোবেল প্রাইজ দেওয়া বা পাওয়ার পেছনে রাজনীতির কলকাঠি নাড়াচাড়া করা হয়। কিন্তু তবু, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যাঁরা নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন সাহিত্য সাধনার জন্য তাঁদের মধ্যে দু'একজন, যেমন রবীন্দ্রনাথ ইয়েটস বা বার্নার্ড শ'কে বাদ দিলে আর যাঁরা নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন তাঁদের কারো সৃষ্টির চাইতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাহিত্যিক হিসেবে যাঁরা নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন তাঁদের সৃষ্টি মূল্য নিকৃষ্ট শ্রেণীর নয়। ইউজেন ও নীল, সিনক্লেয়ার লুই, পার্ল বাক, উইলিয়ম ফকনার, আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে, জন স্টাইনবেক এঁদের সৃষ্ট সাহিত্যের উচ্চমান সম্বন্ধে আজকের দিনে কি আর সন্দেহের অবকাশ আছে? টি. এস. এলিয়টও নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন এবং আজকের দিনে উনি বৃটিশ কবি এবং বৃটিশ নাগরিক বলেই পরিচিত কিন্তু উনিও মূলতঃ মার্কিন।

হেনরী জেমস, কবি কার্ল স্যাণ্ডবার্গ, আপটন সিঙ্কেয়ার ফিটজেরাল্ড, কবি রবার্ট ফ্রস্ট, আর্নল্ড বেনেট প্রভৃতির রচনাও বিশ্বসাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। কবি কার্ল স্যাণ্ডবার্গের আব্রাহাম লিঙ্কনের বিরাট জীবনীগ্রন্থখানি জীবনীসাহিত্যের ক্ষেত্রে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। ও নীল মার্কিন সাহিত্যে নাটকের যে বিশিষ্ট ধারার প্রবর্তন করেছিলেন আজকের দিনে টেনেসি উইলিয়াম পর্যন্ত তার মান অক্ষুণ্ণ রয়েছে বলা চলে। হুইটম্যানের কাব্য ক্লাসিকের পর্যায়ে পড়ে এ কথা আগেই বলেছি। কবি হিসেবে তারপর থেকে কার্ল স্যাণ্ডবার্গ, ভিনসেণ্ট মিলে, এবং রবার্ট ফ্রস্টের কাব্যও সর্বত্র সমাদৃত। এডিথ হোয়ারটন, উইল। ক্যাথার, জন ডস প্যাসস এবং হাওয়ার্ড ফাস্টের রচনাবলীও দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করছে। এবং এই সমস্ত মিলিয়ে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে শিল্প এবং সাধারণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মার্কিনীদের যে কর্মোদ্যম সাহিত্যক্ষেত্রেও ঠিক সেইরূপ প্রচেষ্টাই অব্যাহতগতিতে তরুণ সাহিত্য-কর্মীদের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে। তাই বলছিলাম, মার্কিন সাহিত্যের সৌধ একদিক থেকে যেমন বড়া হয়ে গিয়েছে এ কথা সত্য, আর একদিক থেকে ঠিক তেমনি এখনো তার নির্মাণ কার্য চলেছে, একথাও সত্য।

সুনীল নাগ

শ্রীআয়ুর্ব্বেদমের—

মহাভৃঙ্গরাজ তৈল

●

কেশ ও মস্তিষ্কের
পক্ষে অতুলনীয়

●

বহু পরীক্ষিত ও
দেশবরেণ্যগণ কর্তৃক
উচ্চ প্রশংসিত

●

শ্রীআয়ুর্ব্বেদম.

২৭৯এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬

ফোন : ৫৫-৩২৯৪

বড় বড় ষ্টেশনারী দোকানে পাওয়া যায়।

গল্প-ভারতী

ফাল্গুন সংখ্যা—১৩৬৯

সম্পাদক :

সহ: সম্পাদক : শ্রীকল্যাণ রায়

মূল্য এক টাকা

শ্রীসুধাংশু কুমার রায় চৌধুরী কর্তৃক ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেড ২১৯বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত এবং কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

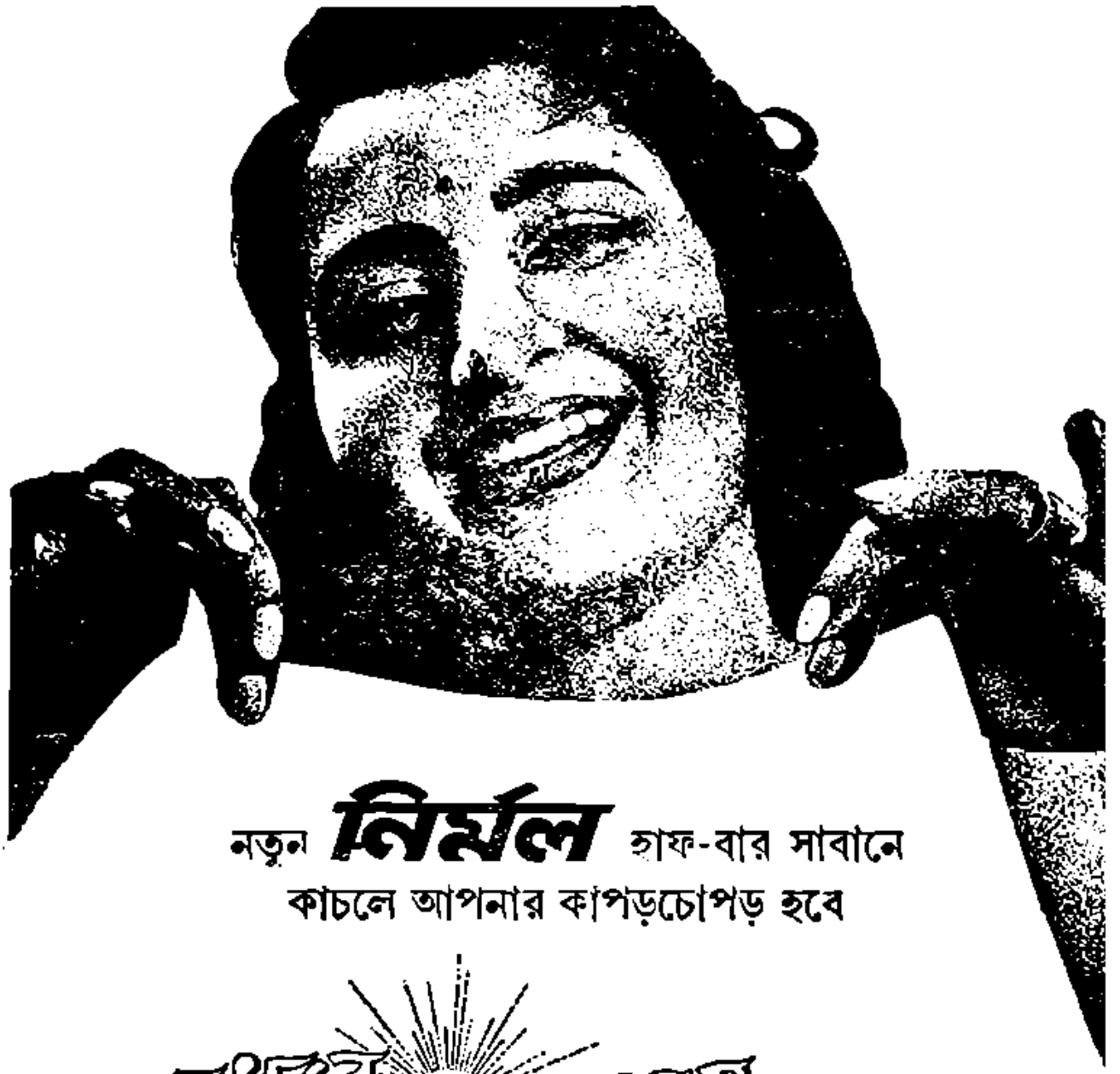

নতুন **নির্মল** হাফ-বার সাবানে
কাচলে আপনার কাপড়চোপড় হবে

ধবধবে ফরসা

ঝলকা সুগন্ধে ভরপুর

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়—	৭৩৯
উদাত্ত আহ্বান—	৭৪৩
ইটালীর স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রদূত স্বদেশপ্রেমিক জোসেফ ম্যাটসিনি—	৭৪৫
ম্যাটসিনির বাণী—	৭৪৭
সঙ্গীত আসর—বিদ্রোহী মুকুন্দদাস—রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৪৮
অন্তরীক্ষে—(ব্যঙ্গচিত্র)	৭৫০
জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৭৫৫
জীবনের যজ্ঞশালায় (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	৭৬৩
আর্ত আওয়াজ বহমান পদধ্বনি—নির্মলেন্দু মাল্লা	৭৬৭
পাহাড়ী গাঁয়ের কথা—নীলিমা দাশগুপ্ত	৭৭২
গীতার সেই শ্লোকটি—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়	৭৭৯
বীরবলের কৌতুক—বররুচি	৭৮৪
জেলেপাড়ার সংঘের ছড়া নিয়ে মামলা—বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৮৬

এলাচের বাস ওদেরই ছোটদের আহ্লাদে আটখানা,—কে. সি. দাসের রসগোল্লা হলে তো কথাই নেই! কে. সি. দাসের টিনের রস-গোল্লা যেমনি সুস্বাদু তেমনি বিশুদ্ধ, পুষ্টিও ঘোল আনা। একটা টিন আনাই বিধুর—নিজেরাও খান ছেলেমেয়েদেরও খাওয়ান।

দাম :

ছোট টিন টাকা ১.২৫
মাঝারি টিন টাকা ২.৫০
বড় টিন টাকা ৫৲

কে. সি. দাস প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা • ছেলেবী

এই সংখ্যায়

শার্দূল পর্ব—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৬৯৪
ইতিহাসের পাতা থেকে—বাংলার লুপ্ত গৌরব তাম্রলিপ্তী—অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৭০২
জীবনের যজ্ঞশালায় (উপন্যাস)—শ্রীশৈলানন্দ মুখোপাধ্যায়	৭০৬
এই প্রথম-বিলাস—কাননী মিত্র	৭১০
একজন আর কয়েকজন—অনিলকুমার ভট্টাচার্য	৭১২
আড়ষ্ট কাঠ—বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়	৭১৭
বিশ্ব-সাহিত্য—	৭২১
সাহিত্য ও সাহিত্যিক—বানিয়ান—সুধীন্দ্র সিংহ	৭২২
সাহিত্য সংবাদ—মননশীলতার কদর—পবিত্র পাল	৭২৫
দেশ-বিদেশ—	৭২৮
খেলাধূলা—	৭৩১
বিশ্বের লোকনৃত্য—সচিত্র সংযোজন	৭৩৫
উত্তর ইয়োরোপের লোকনৃত্য—অমলকুমার নাগ	৭৩৭

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে

মুক্তহস্তে দান করুন

ভীমচন্দ্র নাগ

কলিকাতা

— সগৌরবে চলিতেছে —

ওরিয়েন্ট · বসুশ্রী · বীনা

(শীত-তাপ নিয়ন্ত্রিত চিত্রগৃহ)

প্রত্যহ : ২-৩০, ৫-৪৫ ও ৯টায়

গৃহস্থী

অভূতপূর্ব্ব - অতুলনীয়

অনবদ্য

জেমিনী চিত্র

সঙ্গীত
রবি · শাকিল

গীত
শাকিল

সংলাপ
পং মুখরাম শর্ম্মা

পরিচালক
কিশোর সাহু

নিম্নলিখিত চিত্রগৃহগুলিতে চলিতেছে :—জয়শ্রী—বরানগর ; চন্দা—ব্যারাকপুর ; চিত্রপুরী—খিদিরপুর ; পি-সম—মেটিয়াবুরুজ ; অশোক—সালকিয়া ; জয়ন্তী—বিষড়া ; রজনী—জগদ্দল ; শ্রীলক্ষ্মী—কাঁচরাপাড়া ; অন্না—চন্দননগর ; বঙ্গবাসী— হাওড়া ; সন্তোষ—বেলিয়াঘাটা ; গোধূলি—আসানসোল ; বম্বে সিনেমা

আনন্দে উৎসবে...

প্রাত্যহিক প্রয়োজনে..

সবার মনোরঞ্জনে...

পরিণামরমনীয়

কেশতৈল

কেশরঞ্জন

কবিরাজ এস্‌ এল, সেন এণ্ড ব্রাদার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-৬

স্বামীজীর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে

শ্রদ্ধার্ঘ্য

॥ ছেলেবেলার বিবেকানন্দ ॥

ড: শশিভূষণ দাশগুপ্ত রচিত স্বামীজীর ছেলেবেলার বৈচিত্র্যময় উর্মিমালার একটি মনোরম দৃষ্টিভঙ্গীতে অভিনব রূপায়ণ। [২৲]

রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার কথা

॥ নবীন রবির আলো ॥

ড: বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য কবির ছেলেবেলাকার পরিবেশটি ও তাঁর কবি-পরিণতির ইতিবৃত্তটি অত্যন্ত সুচারুরূপে পরিস্ফুট করেছেন এই বইটিতে। [১·৭৫]

দুটি বইই দু-রঙা ছবিতে ভরা, শোভন সংস্করণ

॥ ছোটদের বৌদ্ধগল্প ॥

শ্রীসুলতা কর কর্তৃক বৌদ্ধ বাণী ও জাতক সম্পর্কিত শ্রেষ্ঠ গল্পের সুষ্ঠু সঙ্কলন। [১·৫০]

বহু ছবি শোভন সংস্করণ।

॥ আমরা ফসল ফলাই ॥

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত চাষের পদ্ধতির সরল ব্যাখ্যা। ছোটদেরও উপযুক্ত বই। [১·২৫]

॥ জলের রূপকথা ॥

ড: বীরেন গুহ কর্তৃক জল সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক কথাগুলি রূপকথার মতই সরল করে বলা। [১৲]

॥ যুব কল্যাণ ॥

চিত্রশিল্প লেখক শ্রীবিনয় ঘোষ কর্তৃক আমাদের দেশের যুব সমস্যার আলোচনা ও তাঁদের কল্যাণের ইঙ্গিত। [১৲]

আরও অনেক বই আছে। তালিকার জন্য লিখুন।

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ

৩২এ, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

॥ আমাদের বই সর্ব্বত্র পাওয়া যায় ॥

মডার্ণ ডেকরেটরস

৬৫ এ, ডব্লু, সি, ব্যানার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬ ফোন ৫৫-২০৪৮

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

গল্প-ভারতী

অষ্টাদশ বর্ষ,

ফাল্গুন ১৩৬৯

সম্পাদকীয়

স্বামী বিবেকানন্দ—বৈরাগী না বিপ্লবী ?

জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বিবেকানন্দ জীবনী ও বাণী নিয়ে অনেক কিছু ছাপা হয়েছে ও হবে—গল্প-ভারতীও তাঁকে অর্ঘ্য নিবেদন করেছে, তাই একটি প্রশ্ন তুলছি : একদিক থেকে দেখি তিনি খাঁটি বৈরাগী, গুরু রামকৃষ্ণ তাঁকে বৈরাগ্যে দীক্ষা দিয়ে গেছেন, পিতা বিশ্বনাথ দত্তের আকস্মিক মৃত্যু (১৮৮৪) তে পারিবারিক অর্থসংকট যখন চরমে উঠেছে জননী ভুবনেশ্বরী দেবী আশা করছেন বড় ছেলে নরেন B. A. পাশ করে B. L. পরীক্ষা দেবেন—নরেন পরীক্ষাও দিলেন না ও মিমাই বসুর মত বিখ্যাত অ্যাটর্নী অফিসে কাজ শিখেও আইন ব্যবসায়ে নামলেন না। দুটি বালক ভাই মহেন্দ্র ও ভূপেন্দ্রর শিক্ষা বাকী তবু শ্রীরামকৃষ্ণ দেখেন বিবেকানন্দ মাতৃসদনে কোন আর্থিক নিবেদন না করে খালি হাতে পূজার মন্দির থেকে ফিরে এলেন। জগৎদুর্লভ গুরু শ্রীরামকৃষ্ণও নরজগত থেকে চলে গেলেন ১৮৮৬ সালে। রেখে গেলেন কপর্দকহীন নরেনের ঘাড়ে সংঘ গঠন ও শিষ্য পালনের গুরুভার। বরানগরে ছোট্ট মঠ থেকে শুরু করে ১৮৮৬—১৯০২ পর্য্যন্ত চলল বিশ্বে বেদান্ত প্রচার ও মহাধর্মসম্মেলন (১৮৯৩) ও ভারতে ফিরেই বেলুড়ে রামকৃষ্ণ সংঘ প্রতিষ্ঠা (১৮৯৭)। ৩০ বছরের যুবকের পক্ষে সে কম গৌরবের কথা নয় অথচ সেই বেলুড়ের তিনি যেন কেউ নন্। গুরুভাই ব্রহ্মানন্দকে অধ্যক্ষ পদে বসিয়ে নিজে সরে গেলেন, কাগজ-পত্রে কোথাও তাঁর নাম নেই! বৈরাগী বিবেকানন্দকে দেখি পথিকৃৎ বিপ্লবী রূপে। তাঁর আদর্শে তাই বিশ্বব্যাপী বেদান্ত আন্দোলন সার্থক হয়েছে ১৯ শতকের শেষ পাদে আর প্রথম পাদে দেখি বিবেকানন্দের আদর্শ পুরুষ (নিবেদিতা গ্রন্থ

দ্রষ্টব্য) মহাত্মা রামমোহন রায়কে (১৭৭২—১৮১৩)। রামমোহন তাঁর মাতৃভাষা বাংলায় প্রথম বই লেখেন বেদান্তসূত্র ও বেদান্ত সার (১৮১৪) যার ইংরাজী অনুবাদ আমেরিকা প্রভৃতি পশ্চিম দেশে পৌঁছে জার্মানীর Max muller Paul Deussen ও মার্কিন চিন্তানায়ক Emerson ও Thoeran প্রভৃতির রচনায়। বিবেকানন্দ তাঁর সংক্ষিপ্ত ৩৯ বছরের জীবনে দুইবার (১৮৯৩, ১৮৯৯) বিশ্ব ভ্রমণ করে বেদান্তকেই ভারতের চরম বাণীরূপে প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন—এখানেও তিনি বৈরাগী বলেই বিপ্লবীর কাজ করে গেছেন পরাধীন ভারতও যে আধ্যাত্মিক সাধনার বাণী শোনাতে পারে তা বিবেকানন্দ প্রমাণ করে গেলেন। দ্বিতীয় বিশ্বভ্রমণের পর মাত্র বছর কয়েক বিবেকানন্দই মরজগতে ছিলেন। ১৯০২ সালের গোড়ায় তাঁর শিষ্যা ভগ্নী নিবেদিতা শেষবার ভারতে এলেন ও ১৯১১ সালে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ নারী শিক্ষার বৈপ্লবিক প্রেরণা জাগিয়ে নিবেদিতাও চলে গেলেন—নিবেদিতার দেহান্তরও এক অপূরণীয় ক্ষতি একথা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও প্রবাসীতে প্রবন্ধে লিখে গেছেন যেমন তিনিই বিবেকানন্দের অকালমৃত্যুর খবর পেয়ে প্রথম স্মারক সভায় (Excelsior Club ভবানীপুর) সভাপতিত্ব করেন। (?, July 1902) স্বামিজীর দেহান্তের পর Bengalee 20. July দ্রষ্টব্য) National Library থেকে উদ্ধার করে দেখিয়েছি। সেখানে নিবেদিতা ইংরেজীতে কিছু বলেন কিন্তু বাংলায় প্রাণস্পর্শী ভাষণ দেন রবীন্দ্রনাথ।

১৯৬৮ সালে Chicago সহরে যেখানে স্বামীজী Parliament of Religion-এর ভাষণে ভারতের নাম জগদ্বিখ্যাত করেন সেই Chicago humanityর ধর্ম সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে আমি গিয়ে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছি। স্বামীজি Atlantic পেরিয়ে মার্কিন দেশে যাননি Pacific পেরিয়ে গিয়েছিলেন প্রথমে দক্ষিণ ভারতে অর্থসংগ্রহ করে বোম্বাই থেকে Colombo ও লঙ্কার দেশে বৌদ্ধধর্ম (হীন যান) দেখে চীন পেরিয়ে জাপানের মহাযান বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দু সভ্যতার খোঁজ আমাদের দিয়ে বিবেকানন্দ সিংহলী অনাগরিক ধর্মপালের সঙ্গে Chicagoর ধর্মসভায় যোগদান করেন। সেই ধর্মপালের শতবার্ষিকী উৎসবও (Sept. 1964) আগত প্রায়।

এ সব কথার উল্লেখ আমি করেছি অনেক লেখায় বিশেষভাবে Prabuddha Bharat পত্রিকার Pacific Ocean survey প্রবন্ধে। জাপানে এসেই স্বামীজি বুঝেছিলেন জাপান চীনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রথম যুদ্ধ শুরু করেছে 18934-94। তার জের চলবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ও জাপানের পতন এই সব বৈপ্লবিক অবস্থার সমাবেশ হয় পরিব্রাজক বিবেকানন্দের জীবনেই কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত তিনি পরিভ্রমণ করেছেন শুধু মন্দিরে ও রাজপ্রাসাদে নয় গরীবের কুটিরে চণ্ডাল মেথরও তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তার সাক্ষ্য পাই তাঁর রচনার মধ্যেই। তাই বিপ্লবী না বৈরাগী এ প্রশ্ন তুলেছি। নূতন ভারত তিনি গড়ে গেছেন নূতন বাণী তিনি ভারত তথা বিশ্বে দিয়ে গেছেন।

যে শূদ্রকে অবনত করে ভারত অবনতির চরমে নেমেছে সেকথা যেমন রবীন্দ্রনাথ তেমনি তাঁর ছোট ভাই বিবেকানন্দও বলে গেছেন। ১৯০২-১৯০৪ সালে রুশ জার এর সিংহাসন কেঁপে উঠছে—জাপানের হাতে বিরাট রুশ পরাজিত—বিশ্বের আরও ঘটনা আমরা দেখেছি! তার ১০ বছরের মধ্যেই দেখেছি চীনে Manchu সম্রাট (১৯১১)ও রুশ বিপ্লবের (১৯১৭) জগতে এক নূতন শূদ্র-রাষ্ট্র U S S R জন্মগ্রহণ করল যার ফলে U S A বৈশ্যরাষ্ট্রও যেন নিস্তব্ধ। এই সব বিপ্লবের সূচনা বিবেকানন্দ দেখে ও অনুভব করেই যেন বলে গিয়েছিলেন ভারত চোখ রেখো বিশাল চীন ও বিরাট রাশিয়ার দিকে—সেকথা ভেবে আজ বিস্ময় জাগে! চীনের ভারত আক্রমণ হয়ত এক নূতন অধ্যায়েরই সূচনা করেছে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭৫ সালে) ব্রহ্মদেশ হয়ে জলপথে চীন ভ্রমণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চীন ভ্রমণের সময় (১৯২৪) সে কথা জেনেছি ও "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়" পড়েছি। সে কথা আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ্যা মহাসম্মিলন (Orientalists Congress 1960) বিভাগে Moscow বিশ্ববিদ্যালয়ে বলে এসেছি। স্বামী বিবেকানন্দের যুগে শ্রেষ্ঠ রুশ লেখক Leo Tolstoy। স্বামিজী তাঁর Raja Yogh গ্রন্থ প্রকাশ মাত্র Tolstoyকে পাঠান ও Tolstoy পড়েন। তাঁর diary মধ্যে পেয়েছি। রুশ ভারতের সম্বন্ধ ১৯১৭ সালের বিপ্লবের বহু পূর্বে তা মনে রাখতে হবে। কারণ রুশ ভাষায় পরমহংসদেবের কথামৃত ও বিবেকানন্দ গ্রন্থাবলীও অনূদিত হয়েছে। মিশনের সাধুরাও এ কথা হয়ত সবাই জানেন না। রুশরা খৃষ্টান ধর্ম মানে না কিন্তু বৌদ্ধধর্মে গভীর আগ্রহবান ও ভারতীয়দের মহাকাব্য রামায়ণ মহাভারতাদি মূল সংস্কৃত থেকে রুশ ভাষায় অনুবাদ করেছে ১৯৬০ সালে দেখে এসেছি—তারও বিরাট ভবিষ্যৎ আছে! গ্লাভ সাহিত্যে ভারতের মহাকাব্য স্থায়ী আসন পেয়েছে। শুধু ফরাসী জার্মান ইংরেজ নয় রুশরাও আমাদের সঙ্গে এক্ষেত্রে আত্মীয়তা করেছেন।

জাপানী শিল্পী মনীষী T. Okakura 1901 সালে কলিকাতায় এসে ঠাকুর বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেন তাঁর কথা স্বরেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখে গেছেন ও ওকাকুরা বিবেকানন্দকে জাপানের এক ধর্মসম্মেলন উদ্বোধন করতে এসেছিলেন কিন্তু শরীর খারাপ বলে তিনি যাননি। তাঁর শিষ্যা ভগ্নী নিবেদিতা কলকাতায় বসে Okakuraর Ideals of the East গ্রন্থের ভূমিকাদি লেখেন। নিবেদিতার লেখায় অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। কত নূতন তথ্য চীন-জাপানের বিরাট শিল্পের ইতিহাসের প্রথম পরিচয় আমাদের যেন Okakura। তিনি Boston Museum-এ কিছুকাল কাজ করে মারা যান। তাঁর ভ্রাতা আমার সঙ্গে জাপানে দেখা করেন যখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমি Peking থেকে Shanghai হয়ে Tokyo যাই (১৯২৪)।

প্রবোধচন্দ্র বাগচী

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী বোম্বে ন্যাশন্যাল ইউনিয়নের উদ্যোগে আয়োজিত বিরাট জনসমাবেশে দেশনায়ক 'শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষ' (তখন শ্রীঅরবিন্দ বলিয়া অভিহিত হইতেন না) 'বর্তমান পরিস্থিতি' ('The present Situation') সম্বন্ধে ইংরেজীতে ভাষণ দিয়াছিলেন। তাহাতে দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করা হইল। তাঁহার সেই ভাষণে তিনি বাংলার তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়াছেন। তখন ছিল স্বদেশী আন্দোলন যুগের মধ্যপর্ব; এবং বাংলা ও বাঙালীর উপর দিয়া বিদেশী সরকারের নির্যাতন-নীতির প্রয়োগ চলিয়াছিল নির্মমভাবে। জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক 'যুগান্তর' পত্রিকার যুগ্মাকর রাজদ্রোহের অভিযোগে দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন; জাতীয়তাবাদী বাংলা দৈনিক 'নবশক্তি' পত্রিকার বিরুদ্ধেও অভিযোগ আনীত হইয়াছে; এই সমুদয় সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে কলিকাতার ইংরেজী দৈনিক 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায়। সেই পত্রিকাখানি দেখাইয়া দেশনায়ক শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষ বলেন:

..."This is the situation of the country today. Do you realise what I mean? There is a creed in India today which calls itself Nationalism, a creed which has come to you from Bengal. This is a creed which many of you have accepted when you called yourselves Nationalists...

What is Nationalism? Nationalism is not a mere political programme; Nationalism is a religion that has come from God. Nationalism is a creed which you shall have to live. Let no man dare to call himself a Nationalist if he does so merely with a sort of intellectual pride, thinking that he is more patriotic, thinking that he is something higher than those who do not call themselves by that name. If you are going to be a Nationalist, if you are going to assent to the religion of Nationalism, you must do it in the religious spirit. You must remember that you are the instruments of God. What is this that has happened in Bengal? You call yourselves Nationalists, but when this happens to you, what will you do?

This thing is happening daily in Bengal, because, in Bengal, Nationalism has come to the people as a religion, and it has been accepted as a religion. But certain forces which are against the religion are trying to crush its rising strength. It always happens when a new religion is going to be preached, when God is going to be born in the people, that such forces rise with all their weapons in their hands to crush

the religion. In Bengal too a new religion, a religion divine and sattwic has been preached, and this religion they are trying with all the weapons at their command to crush. By what strength are we in Bengal able to survive? Nationalism has not been crushed. Nationalism is not going to be crushed. Nationalism survives in the strength of God and it is not possible to crush it, whatever weapons are brought against it. Nationalism is immortal Nationalism cannot die; because it is no human thing, it is God who is working in Bengal. God cannot be killed, God cannot be sent to jail.···

Whatever the Bengali believed, if he believed at all—many do not believe—but if he believed at all, there was one thing about the Bengali, that he lived what he believed.··· If he believed that one thing was necessary for the salvation of the country, if he believed that a thing was true and that it should be done, he did not stop to think about it. He would not stop to consider from all intellectual standpoints whether the truth in it was merely an ideal and to balance whether he would do honestly what he believed or whether he could hold that belief intellectually without living it but without regard to consequences to himself, he went and did what he believed.···

The Bengali has the faculty of belief. Belief is not a merely intellectual process, belief is not a mere persuasion of the mind, belief is something that is in our heart, and what you believe, you must do, because belief is from God. It is to the heart that God speaks, it is in the heart that God resides. This saved the Bengali. Because of this capacity of belief, we were chosen as the people who were to save India, the people who were to stand foremost, the people who must suffer for their belief, the people who must meet everything in the faith that God was with them and that God is in them. Such a people need not be politically strong, it need not be a people sound in physique, it need not be a people of the highest intellectual standing. It must be a people who can believe.

In Bengal there came a flood of religious truth. Certain men were born, men whom the educated world would not have recognised if that belief, if that God within them had not been there to open their eyes, men whose lives were different from what our education, our western education taught us to admire. One of them, the man who had the greatest influence and has done the most to regenerate Bengal, could not read and write a single word. But he had this one divine faculty in him, that he had more than faith and had realised God. God knew what he was doing. He

sent that man to Bengal and set him in the temple of Dakshineshwar in Calcutta, and from North to South and East and West the Educated men, men who were the pride of the University, who had studied all that Europe can teach, came to fall at the feet of this ascetic. The work of salvation, the work of raising India was begun. Consider the men who are really leading the present movement. One thing I will ask you to observe and that is that there are very few who have not been influenced by the touch of a Sadhu."...

মানিকতলা বোমার মামলার বিচারকালে দেশনায়ক অরবিন্দ ঘোষের জীবনে কতকগুলি অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল। তন্মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন লাভ ও তাঁহার সহিত কথোপকথন অন্যতম। তিনি যখন কারাবাসকালে নির্জ্জনে ধ্যানস্থ থাকিতেন, তখন স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সর্ব্বদাই তাঁহার কথোপকথন হইত এবং এক পক্ষকাল ওইরূপ ঘটিয়াছিল। তৎকালে স্বামী বিবেকানন্দের উপস্থিতি তিনি অনুভব করিয়াছিলেন। অরবিন্দ ঘোষ এই বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, উহার প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

....."It is a fact that I was hearing constantly the voice of Vivekananda speaking to me for a fortnight in the jail in my solitary meditation and felt his presence,.....The voice spoke only on a special and limited but very important field of spiritual experience and finished saying all that it had to say on that subject."

বিখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বোমার মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তিনিও কারাবাসকালে অরবিন্দ ঘোষের কতকগুলি অলৌকিক ব্যাপার লক্ষ্য করেন। তাঁহার বর্ণনা হইতেও উদ্ধৃতি দিতেছি :—

..... "এই হট্টগোল ও দলাদলির মধ্যে একেবারে নিশ্চল স্থাণুর মত বসিয়া থাকিতেন—অরবিন্দবাবু। কোন কথাতেই হাঁ, না, কিছুই বলিতেন না। জেলের প্রহরীদের নিকট হইতে তাঁহার আচরণ সম্বন্ধে অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনিতে পাইতাম। কেহ বলিত—তিনি রাত্রে নিদ্রা যান না, কেহ বলিত—তিনি পাগল হইয়া গিয়াছেন। ভাত খাইবার সময় আলুসুদ্ধ, টিকটিকি ও পিঁপড়াসুদ্ধ ভাত খাওয়াইয়া দেন; স্নান করেন না, মুখ ধোন না, কাপড় ছাড়েন না—ইত্যাদি। ব্যাপারটা জানিবার জন্য বড় কৌতূহল হইত; কিন্তু তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহসে কুলাইত না। মাখায় মাখিবার জন্য আমরা কেহই তেল পাইতাম না; কিন্তু দেখিতাম যে, অরবিন্দবাবুর চুল যেন তেলে চকচক করিতেছে। একদিন সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—'আপনি কি স্নান করিবার সময় মাথায় তেল দেন?' অরবিন্দবাবুর উত্তর শুনিয়া চমকিয়া গেলাম। তিনি বলিলেন—'আমি তো স্নান করি না।' জিজ্ঞাসা করিলাম—'আপনার চুল এত চকচক করে কি করিয়া?'

অরবিন্দবাবু বলিলেন—'সাধনের সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরের কতকগুলি পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে। আমার শরীর হইতে চুল বসা (fat) টানিয়া লয়।'

দুই একজন সন্ন্যাসীকে ওরূপ করিতে দেখিয়াছি; কিন্তু ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝি নাই।

তাহার পর ডকের মধ্যে একদিন বসিয়া থাকিতে আমি লক্ষ্য করিলাম যে, অরবিন্দবাবুর চক্ষু যেন কাঁচের চক্ষুর মত স্থির হইয়া আছে; তাহাতে পলক বা চাঞ্চল্যের লেশ মাত্র নাই। কোথায় পড়িয়াছিলাম যে চিত্তের বৃত্তি একেবারে নিরুদ্ধ হইয়া গেলে চক্ষে ওই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। দুই একজনকে তাহা দেখাইলাম; কিন্তু কেহই অরবিন্দকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। শেষে শচীন আস্তে আস্তে তাঁহার কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—'আপনি সাধন করে কি পেলেন?' অরবিন্দ সেই ছোট ছেলেটির কাঁধের উপর হাত রাখিয়া হাসিয়া বলিলেন—'যা খুঁজেছিলাম, তা পেয়েছি।' তখন আমাদের সাহস হইল, আমরা তাঁহার চারিদিক ঘিরিয়া বসিলাম। অন্তর্জগতের কি অপূর্ব কাহিনী শুনিলাম, তাহা যে বড় বেশী বুঝিলাম তাহা নহে; তবে এই ধারণাটি হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গেল যে, এই অদ্ভুত মানুষটির জীবনে সম্পূর্ণ একটা নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। জেলের মধ্যে বৈদান্তিক সাধনা শেষ করিয়া যে সব তান্ত্রিক সাধনা শেষ করিয়াছিলেন, তাহারও কতক কতক বিবরণ শুনিলাম। জেলের বাহিরে বা ভিতরে তাঁহাকে তন্ত্রশাস্ত্র লইয়া কখনও আলোচনা করিতে দেখি নাই। এ সমস্ত গুহ্য সাধনের কথা তিনি কোথায় পাইলেন জিজ্ঞাসা করায় অরবিন্দ বাবু বলিলেন যে, একজন মহাপুরুষ সূক্ষ্ম শরীরে আসিয়া তাঁহাকে এই সমস্ত বিষয় শিক্ষা দিয়া যান। মোকদ্দমার ফলাফলের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—'আমি ছাড়া পাব।'

শ্রীঅরবিন্দ

"ফলে তাহাই হইল। মোকদ্দমা আরম্ভ হইবার এক বৎসর পরে যখন রায় বাহির হইল, তখন দেখা গেল সত্য সত্যই অরবিন্দ বাবু মুক্তি পাইয়াছেন।"

সংকলক শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহ রায়

সঙ্গীত-আসর

স্বাদেশিকতা ও সঙ্গীত

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতীয় সঙ্গীত সংস্কৃতি এক মহান্ আদর্শে গঠিত। সকল সভ্য দেশেরই শিল্পকলার রূপ ভিন্ন হলেও তার লক্ষ্য এক। শিল্পকলা দেশের শ্রেষ্ঠ পরিচিতি। সাহিত্যে, কাব্যে, ভাস্কর্যে, চিত্রে, একটি দেশের ভাবধারা, তার অন্তরাত্মার পরিচয় পাওয়া যায়। সঙ্গীতাদি চারু কলা এবং সাহিত্য, কাব্যের প্রধান ধর্ম মানুষের অন্তর্নিহিত চিত্তবৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করা এবং সেই চিত্তবৃত্তি যাতে দেশের কল্যাণ সাধনে এবং মানব সমাজের উন্নতি কল্পে নিয়োজিত হয় তার প্রচেষ্টা। দেশের ও সমাজের দায়িত্ব অনেকখানি কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীর উপর ন্যস্ত। ভাল কি মন্দ মানুষের জন্মগত নয়। পরিবেশ ও সমাজ তার জন্য দায়ী। তাই সাহিত্য, কাব্য এবং সঙ্গীত যদি সমাজকে আদর্শ পথে চালিত করে, তবে প্রকৃত মানুষ গড়ে তোলার কাজে বিশেষ সহায়তা হয়।

সঙ্গীত জাতীয় জীবনে অপরিহার্য্য। মানুষের মধ্যে মৈত্রী বন্ধন স্থাপনে, মার্জ্জিত রুচি অর্জ্জনে, সামাজিকতা বোধ জাগিয়ে তুলতে এবং দেশ বিদেশের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানে সঙ্গীতের শক্তি অপরিসীম। সঙ্গীত কেবলমাত্র ভোগ বিলাসের উপাদান নয় এবং নানাবিধ উপায়ে সঙ্গীতকে ব্যবসার বস্তু হিসাবে ব্যবহার করাও রীতি ও নীতি বিরুদ্ধ। বিদ্যা দানে অর্থোপার্জ্জন বৈধ কিন্তু সঙ্গীতের ন্যায় শ্রেষ্ঠ শিল্প ব্যবসার সামগ্রী রূপে ব্যবহার সম্পূর্ণ অবৈধ। আমাদের দেশে সঙ্গীত রক্ষিত হয়েছে বিধিবিহিত প্রথায় অর্থাৎ শিষ্য পরম্পরায় সাধনালব্ধ জ্ঞান সংরক্ষিত ও প্রচারিত হয়েছে।

জাতির সুদিনে শিল্পকলার উন্নতি, অনুশীলন যেমন সকল দেশের কাম্য তেমনি দুর্দিনেও জাতিকে অনুপ্রাণিত করতে, তাকে দেশের গৌরব রক্ষায় সংকল্প গ্রহণ করতে সাহিত্য, কাব্য এবং সঙ্গীতের দান চিরাকাঙ্খিত। জাতীয় সঙ্গীত সকল সভ্য দেশেই আছে। সেই গানে জাতির শৌর্য্য, বীর্য্যের কীর্ত্তি ঘোষণা করে। স্বদেশী গানগুলি দেশপ্রেমের অনন্ত দৃষ্টান্ত। চারণগণের গান এক সময়ে রাজপুত বীরগণকে, দেশের অতীত কীর্ত্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিত এবং দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে তারা মন প্রাণ নিয়োজিত করত।

এই সব গান, কবিতা বা সাহিত্য made to order নয় বা কাহারও তুষ্টি সাধনের জন্য নয়। এ কাব্য, সাহিত্য এবং গান স্বতস্ফূর্ত। তাই সে গানে মানুষের মনে অদম্য প্রেরণা জাগিয়ে তোলে এবং মানুষকে এগিয়ে দেয় কর্ত্তব্যের পথে। অনভিজ্ঞ ও নীরস শ্রোতার প্রশংসা অর্জ্জনের জন্য সে সকল সাহিত্য কাব্য বা সঙ্গীতের সৃষ্টি হয় নি। বাঙ্গলার স্বদেশী যুগের গান, সাহিত্য ও কাব্য যে ভাবে দেশবাসীর প্রাণে সাড়া দিয়েছিল এবং দেশবাসীকে আত্মত্যাগে এবং দেশের মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল তা যে-কোন দেশের ইতিহাসে বিরল। ১৯০৫এর বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলন এবং ১৯১১ পর্য্যন্ত স্বদেশীযুগ এবং তৎ পূর্ব্বে হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠা। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমে, বাঙ্গলায় অবির্ভাব হয়েছিল মনীষিগণের যাঁরা জগত পূজ্য। তখন সাহিত্যিক, কবি-সঙ্গীতশিল্পী সকলেই এক মহান আদর্শের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। ঋষি বঙ্কিম প্রচার করলেন মহামন্ত্র "বন্দে মাতরম্"। তাঁর এই মন্ত্র জাতিকে আত্মবিস্মৃতি

থেকে আত্মচেতনায় প্রতিষ্ঠিত হতে রতী করে তুলল। রঙ্গলালের "স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে", সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "গাও ভারতের জয়", জ্যোতিরিন্দ্রের "বাজরে শিঙা বাজ", রজনীকান্তের "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়", দ্বিজেন্দ্রলালের "ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা", "যেদিন সুনীল জলধি হইতে", অতুলপ্রসাদের "বল বল বল সবে", "উঠ গো ভারত লক্ষ্মী", কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের "জন গণ মন", "দেশ দেশ নন্দিত করি", "সার্থক জনম আমার", "ও আমার দেশের মাটি", "আমার সোনার বাংলা", "ওরে তোর ব্যথা যাতে" এক সময়ে সারা দেশকে মাতিয়ে তুলেছিল। ঐ গানগুলি সে যুগের শ্রেষ্ঠ স্মারক। মানুষের স্বীকৃতি, তার প্রতিষ্ঠা, এবং জ্ঞানজ্ঞান রহিত মানব সমাজ, দেশের মুক্তিই ছিল ঐ সকল গানের মর্মবাণী।

নবগোপাল মিত্র প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মেলা বা জাতীয় মেলার (১৮৬৬) সহিত ঠাকুর পরিবারের বিশেষ যোগ ছিল। রবীন্দ্রনাথ অল্প বয়সে হিন্দুমেলার অধিবেশনে স্বরচিত দেশাত্মবোধক গান গেয়ে ও কবিতা আবৃত্তি করে সকলকে মুগ্ধ করেন। জাতীয় ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গান অবিস্মরণীয়।

দ্বারিকানাথ গাঙ্গুলীর কতকগুলি স্বদেশী গান বিখ্যাত। অবলাবান্ধব পত্রিকা প্রচার করিয়া ইনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে নারীর জাগরণ যে বিশেষ আবশ্যক তা তিনি উপলব্ধি করেন এবং তাঁর রচিত গান—

"না জাগিলে সব ভারত ললনা
এ ভারত আর জাগে না জাগে না"
স্মরিলে পূর্ব্বের কথা অশ্রুজলে আঁখি ভাসে
পূরব সৌভাগ্য রবি হায় পশ্চিম আকাশে।"

উল্লেখযোগ্য। এই সংখ্যায় সরলা দেবী রচিত "অতীত গৌরব বাহিনী" বিখ্যাত স্বদেশী গানের স্বরলিপি ১৩১৪ সালের "সঙ্গীত প্রকাশিকা" ষষ্ঠ ভাগ থেকে উদ্ধৃত হল।

মিশ্র খাম্বাজ—তাল ফেরতা

অতীত গৌরব বাহিনী মম বাণী গাও আজি হিন্দুস্থান্,
মহা সভা উন্মাদিনি মম বাণী গাও আজি হিন্দুস্থান্
কর বিক্রম বিভব যশ সৌরভ পূরিত সেই নাম গান॥
বঙ্গ বিহার উৎকল মাদ্রাজ মারাঠগুর্জ্জর পাঞ্জাব রাজপুতান্।
হিন্দু পার্সি জৈন ইসাই শিখ্, মুসলমান।
গাও সকল কণ্ঠে সকল ভাষে নমো হিন্দুস্থান।
ভেদ রিপু নাশিনি মম বাণী গাও আজি ঐক্য গান
মহাবল বিধায়িনি মম বাণী গাও আজি ঐক্য গান।
মিলাও দুঃখে সৌখ্যে সখ্যে লক্ষ্যে কায়মন প্রাণ।
সকল জন উৎসাহিনি মম বাণী গাও আজি নূতন তান্
মহাজাতি সংগঠনি মম বাণী গাও আজি নূতন তান্।
উঠাও কর্ম্ম নিশান্ ধর্ম্ম বিষাণ বাজাও চেতায়ে প্রাণ॥

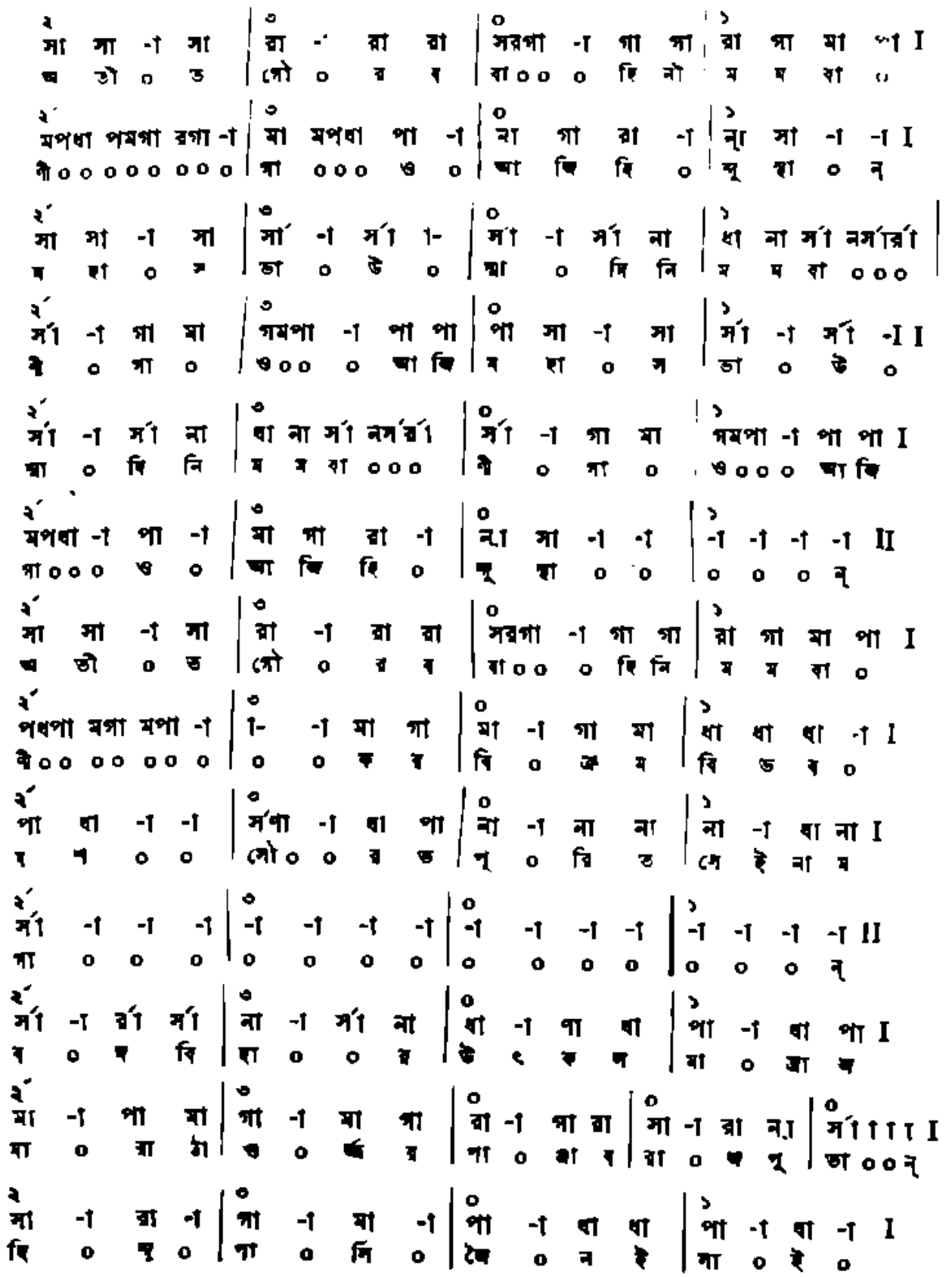
২ ০ ০ ১
সা সা -া সা | রা -' রা রা | সরগা -া গা গা | রা গা মা পা I
অ ভী ০ ভ | গৌ ০ র ব | বা০০ ০ হি নী | ম ম বা ০
২´ ০ ০ ১
মপধা পমগা রগা -া | মা মপধা পা -া | মা গা রা -া | ন্া সা -া -া I
শী০০০০০ ০০০ | গা ০০০ ও ০ | আ হি হি ০ | মু ন্া ০ ন্
২´ ০ ০ ১
সা সা -া সা | র্সা -া র্সা ।- | র্সা -া র্সা না | ধা না র্সা নর্সার্রা
ম হা ০ স | ভা ০ উ ০ | ম্মা ০ দি নি | ম ম বা ০০০
২´ ০ ০ ১
র্সা -া গা মা | গমপা -া পা পা | পা সা -া সা | র্সা -া র্সা -I I
শী ০ গা ০ | ও০০ ০ আ হি | ম হা ০ স | ভা ০ উ ০
২´ ০ ০ ১
র্সা -া র্সা না | ধা না র্সা নর্সার্রা | র্সা -া গা মা | গমপা -া পা পা I
ম্মা ০ দি নি | ম ম বা ০০০ | শী ০ গা ০ | ও০০০ আ হি
২´ ০ ০ ১
মপধা -া পা -া | মা গা রা -া | ন্া সা -া -া | -া -া -া -া II
গা০০০ ও ০ | আ হি হি ০ | মু ন্া ০ ০ | ০ ০ ০ ন্
২´ ০ ০ ১
সা সা -া সা | রা -া রা রা | সরগা -া গা গা | রা গা মা পা I
অ ভী ০ ভ | গৌ ০ র ব | বা০০ ০ হি নি | ম ম বা ০
২´ ০ ০ ১
পধপা মগা মপা -া | ।- -া মা গা | মা -া গা মা | ধা ধা ধা -া I
শী০০ ০০ ০০ ০ | ০ ০ ক র | বি ০ ক্র ম | বি ভ ব ০
২´ ০ ০ ১
পা ধা -া -া | র্সণা -া ধা পা | না -া না না | না -া ধা না I
ব শ ০ ০ | গৌ০ ০ র ভ | পূ ০ বি ত | গে ই না ম
২´ ০ ০ ১
র্সা -া -া -া | -া -া -া -া | -া -া -া -া | -া -া -া -া II
গা ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ন্
২´ ০ ০ ১
র্সা -া র্রা র্সা | না -া র্সা না | ধা -া পা ধা | পা -া ধা পা I
ব ০ ষ বি | হা ০ ০ র | উ ৎ ক ল | মা ০ ত্রা জ
২´ ০ ০ ০ ০
মা -া পা মা | গা -া মা গা | রা -া গা রা | সা -া রা ন্া | র্সা I I I I I
মা ০ রা ত্মা | ও ০ র্জ্ঞ য | পা ০ ত্রা ব | রা ০ ত্ম পূ | তা ০০ন্
২ ০ ০
সা -া রা -া | গা -া মা -া | পা -া ধা ধা | পা -া ধা -া I
হি ০ মু ০ | গা ০ দি ০ | ত্মৈ ০ ন ই | গা ০ ই ০

২´ ৩ ০ ১
না -া -া পা | পা -া র্সা -া | -া -া -া -া | -া -া ধপা -া I
শি ০ খ্ মু | স ল্ মা ০ | ০ ০ ০ ন্ | ০ ০ গা০ ও
২´ ৩ ০ ১
পা ধা পা | র্সা পা ধা | পা ধা পা | র্সা পা ধা I
স ক ল | ক ০ ঠে | স ক ল | ভা ০ বে
২´ ৩ ০ ১
ম পা -া | মগা রা গা | মা -া -া | -া -া -া II
ন ঘো ০ | ছি০ ০ ন্ | ছা ০ ০ | ০ ০ ন্
২´ ৩ ০ ১
-া -া -া সা | -া সা রা রা | সরগা -া গা গা | রা গা মা পা I
০ ০ ০ হে | ০ ম রি পু | নাও০ ০ শি নি | ম ম বা ০
২´ ৩ ০ ১
মপধা পমগা রগা-া | মা মপধা পা -া | মা গা রা -া | ন্া সা -া -া I
শী০০ ০০০০০ | সা ০০০ ও ০ | আ জি ঐ ০ | কা গা ০ ন্
২´ ৩ ০ ১
সা সা -া -া | -া র্সা র্সা র্সা | র্সা -া র্সা না | না র্সা নর্সর্রা I
ম হা ০ ০ | ০ ব ল বি | ধা ০ রি নি | ম ম বা ০০০
২´ ৩ ০ ১
র্সা -া গা মা | গমপা -া পা পা | পা সা -া -া | -া র্সা র্সা র্সা I
শী ০ সা ও | ও০০ ০ আ জি | ম হা ০ ০ | ০ ব ল বি
২´ ৩ ০ ১
র্সা -া র্সা না | ধা না র্সা নর্সর্রা | র্সা -া গা মা | গমপা -া পা পা I
ধা ০ রি নি | ম ম বা ০০ | শী ০ সা ও | ও০০ ০ আ জি
২´ ৩ ০ ১
মপধা -া পা -া | মা গা রা -া | ন্া সা -া -া | -া -া -া -া I
গা০০ ০ ও ০ | আ জি ঐ ০ | কা সা ০ ০ | ০ ০ ০ ন্
২´ ৩ ০ ১
-া -া -া সা | -া সা রা রা | সরগা -া গা গা | রা গা মা পা I
০ ০ ০ হে | ০ ম রি পু | নাও০ ০ শি নি | ম ম বা ০
২´ ৩ ০ ১
পধপা মপমা পা -া | -া মা পা -া | মা -া -া ধা | ধা -া ধা -া I
শী০০ ০০০ ০ ০ | ০ নি লা ও | দুঃ ০ ০ খে | লো ০ ঘো ০
২´ ৩ ০ ১
পা ধা -া র্সা | পা ধা পা -া | না -া -া না | না -া ধা না I
ন ০ ০ ঘো | ন ০ ক্ষে ০ | কা ০ ম ম | ন ০ প্রা ০

২´	৩
র্সা -া -া -া	-া -া -া -া II
০ ০ ০ ০	০ ০ ০ ৭

"বঙ্গ বিহার" থেকে "নমো হিন্দুস্থান্" পর্য্যন্ত গাইতে হবে।

২´	৩	০	১
-া সা সা সা	রা রা রা -া	সরগা -া গা গা	রা গা মা পা I
০ স ক ল	জ ন ঊ ৎ	সা০০ ০ হি নি	ম ম ষা ০
২´	৩	০	১
মপধা পমগা রগা -া	মা মপধা পা -া	মা গা রা গা	ন্া সা -া -া I
ধী০০ ০০০০০ ০	গা ০০০ ও ০	আ জি নূ ত	ন ভা ০০ ন্
২´	৩	০	১
সা সা -া -া	র্সা -া র্সা র্সা	-া র্সা র্সা না	ধা না র্স নর্সর্রা I
ম হা ০ ০	আ ০ ভি সং	০ গ ঠ নি	ম ষ ষা ০০০
২´	৩	০	১
র্সা -া গা মা	গমপা -া পা পা	পা সা -া -া	র্সা -া র্সা র্সা I
ধী ০ গা ০	ও০০ ০ আ জি	ম হা ০ ০	আ ০ ভি সং
২	৩	০	১
-া র্সা র্সা না	ধা না র্সা নর্সর্রা	র্সা -া গা মা	গমপা -া পা পা I
০ গ ঠ নি	ম ষ ষা ০০০	ধী ০ গা ০	ও০০ ০ আ জি
২´	৩	০	১
মপধা -া পা -া	মা গা রা গা	ন্া সা -া -া	-া -া -া -া I
গা০০ ০ ও ০	আ জি নূ ত	ন ভা ০ ০	০ ০ ০ ন্
২´	৩	০	১
-া সা সা সা	রা রা রা -া	সরগা -া গা গা	রা গা মা পা I
০ স ক ল	জ ন ঊ ৎ	সা০০ ০ হি নি	ম ম ষা ০
১´	৩	০	১
পধ মা মপা -া	-া মা মা গা	মা -া ধা ধা	ধা -া -া -া I
ধী ০ ০০ ০০০	০ ঊ ষ্ঠা ও	ক ০ র্ষ নি	ষা ০ ০ ন্
২´	৩	০	১
পা ধা র্সা পধা	পা -া -া -া	-া না না -া	-া না ধা না I
ষ ০ র্ষ বি০	ষা- ০ ০ ন্	০ ষা ভা ও	০ চে ভা রে
২´	৩	০	১
র্সা -া -া -া	-া -া -া -া	-া -া -া -া	-া -া -া -া II II
প্রা ০ ০ ০	০ ০ ০ ০	০ ০ ০ ০	০ ০ ০ ৭

"বঙ্গ বিহার" থেকে "নমো হিন্দুস্থান" পর্য্যন্ত গাইতে হবে।

উদাত্ত আহ্বান

একটি কবিতার বিখ্যাত পংক্তি মনে পড়িতেছে—'নিদ্রিতে নিদ্রিতে নারে জাগাতে কখন।' ঘুমন্ত ব্যক্তি কখন ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগাইতে পারে না, এ কথার তাৎপর্য্য অতি গভীর। মনে পড়ে, জনৈক পণ্ডিত মহাশয় স্কুলে, ব্যাকরণ পড়াইতেছিলেন। ছাত্রেরা 'বিভক্তি ও কারক' কতটা আয়ত্ত করিয়াছে, তিনি তাহাই পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিলেন। পংক্তিটিতে দুইবার 'নিদ্রিতে' পদটির প্রয়োগ আছে। এই পদ দুইটিতে কোন্ কারকে কোন্ বিভক্তির ব্যবহার হইয়াছে, উহাই ছিল পণ্ডিত মহাশয়ের প্রশ্ন। ইতিমধ্যে একটি ছেলে হঠাৎ এক অদ্ভুত কথা বলিল। সে বলিল, 'পণ্ডিত মহাশয়, কথাটা বোধ হয় সকল সময়ে সত্য নয়।' পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, 'কেন?' ছাত্রটি বলিল, 'ঘুমন্ত মানুষও ঘুমন্ত মানুষকে জাগাইতে পারে।' যেমন ধরুন, একজন ঘুমন্ত মানুষ যদি স্বপ্ন দেখিয়া চীৎকার দেয়, তাহা হইলে আর একজন ঘুমন্ত মানুষ জাগিয়া উঠিতে পারে।' অপর ছাত্রেরা এই কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিল। ছাত্রটি বুদ্ধিমান্ তাহাতে সন্দেহ নাই। পণ্ডিত মহাশয়ও ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তিনি বলিলেন,—'আচম্কা কারো ঘুম ভেঙে যাওয়া এক কথা, আর অপরকে জাগিয়ে তোলা আর এক কথা।'

শ্রুতিতে বলা হইয়াছে আমরা যখন ঘুমাইয়া পড়ি, তখনই তো কলিযুগ, যখন উঠিয়া দাঁড়াই, তখনই তো ত্রেতাযুগ, আর যখন চলিতে থাকি, তখনই তো সত্যযুগ। অতএব চলিতে থাক, চলিতে থাক। (চরৈবেতি চরৈবেতি)। আমাদের শাস্ত্রে এ কথাও বলে, নিদ্রার উৎপত্তি তমোগুণ হইতে। জীবনে তমোগুণের প্রয়োজন নাই, একথা বলিনা, কিন্তু মাত্রা লঙ্ঘন করিলেই বিপদ। কোন জাতি যখন তমোগুণে আচ্ছন্ন হয়, তাহার জীবনে যখন অবসাদ ও নৈরাশ্য পুঞ্জীভূত হয়, তখনই তাহার মস্তকে নামিয়া আসে বিধাতার রুদ্ররোষ। তাহার চৈতন্য সম্পাদনের জন্যই বিধাতা তাহার উপর আঘাত হানেন, কিন্তু সে আঘাত অভিশাপ নয়,—আশীর্ব্বাদ।

যুগে যুগে মহাপুরুষেরাই তন্দ্রাচ্ছন্ন বা মোহাভিভূত জাতিকে মোহপ্রবুদ্ধ করিবার ভার গ্রহণ করেন। আমাদের জীবনের অতি সঙ্কটময় মুহূর্ত্তেও কি আমরা তাঁহাদের আহ্বানে সাড়া দিব না? আমাদের গৃহ যখন অগ্নিবেষ্টিত, তখনও কি আমরা তরল আমোদ প্রমোদেই মা ভাসাইয়া দিব? রায়রণের কবিতার কথা কি আমাদের মনে নাই। সন্ধ্যায় তাহারা ছিল সুন্দরীগণে পরিবৃত হইয়া প্রমোদ-উৎসবে রত তারপর সহসা কামানের গর্জ্জন শোনা গেল। আর কোন দিকে দৃকপাত না

করিয়াই সৈন্যরা ছুটিল যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে। কারণ, এ আহ্বান কর্ত্তব্যেরই আহ্বান, দেশের স্বাধীনতা রক্ষার আহ্বান। কর্ত্তব্যের আহ্বানেও যদি আমাদের সুখ-স্বপ্ন টুটিয়া না যায়, তবে যে আমাদের দুর্গতির অন্ত থাকিবে না।

যে মানুষ অম্লান বদনে অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করে, গুণীকৃত অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদমাত্র করে না, সে প্রবীণ পাকা লোক হইতে পারে কিন্তু তাহাকে আত্মমর্য্যাদা-সম্পন্ন মানুষ বলা যায় না। আমাদের আজ নবত্বের দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে, তবে আমরা সকল ভয় ও ভাবনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিব। মহামানবদের সঞ্জীবনী বাণীর অনুধ্যান করিয়াই আমরা নবজন্ম লাভ করিব। তাঁহাদের উদাত্ত আহ্বান যদি আমাদের কানের ভিতর দিয়া মর্ম্ম স্পর্শ করে, তবেই আমরা বাঁচার মত বাঁচিব, 'নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়।' যদি বাঁচিতে হয়, বাঁচার মত বাঁচিব, আর যদি মারতে হয়, বীরের মত মরিব,—ইহাই তো পুরুষের কথা।

ম্যাটসিনি প্রতিষ্ঠিত নব্য ইতালী সমাজের শপথপত্র

যাহার বিশ্বাস যে, আত্মত্যাগেও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রকৃত ধর্ম্ম এবং একতা ও লক্ষ্যের অবিচলিততাই প্রকৃত বল সেই আমি, "নব্য ইতালী সমাজের—যে নব্য ইতালী সমাজের সভ্যেরা আমার সহিত একমতে, এক বিশ্বাসে ও এক ধর্ম্মে—দীক্ষিত ও সংবদ্ধ সত্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত—হইয়া শপথ করিতেছি যে ইতালীকে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত করিতে ইতালীকে একটি সাধারণতান্ত্রিক জাতিতে পরিণত করিতে জন্মের মত এ প্রাণ উৎসর্গ করিলাম—সেই আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি বেষাক্ত, রচনাও কার্য্যদ্বারা যতদূর সাধ্য, আমার ইতালীয় ভ্রাতৃগণকে "নব্য ইতালীর" লক্ষ্যপোষোগী শিক্ষা প্রদান করিব; যে সমাজ বন্ধন নব্য ইতালীর "অভীষ্ট সিদ্ধির" প্রধান উপায়, তাহার অনুষ্ঠানে রত থাকিব এবং যে রাজনৈতিক উৎকর্ষ অন্য চিরস্থায়ী করিবার একমাত্র নিদান, তাহার অনুসরণে কখনই বিরত হইব না কখনই অন্য কোন সমাজের সভ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইব না—যাঁহারা নব্য ইতালী সমাজের সভ্যদিগের প্রতিভূ—তাঁহারা যখন যাহা আদেশ করিবেন—সমাজের লক্ষ্যের সহিত বিসংবাদী না হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রতিপালন করিব এবং প্রাণ দিয়াও সেই সকল আদেশের গুপ্ততা রক্ষা করিব।

এই সকল প্রতিজ্ঞা পালনে একণে ও অনন্ত কালের জন্য আমার এই জীবন উৎসর্গীকৃত করিলাম—যদি কখনও আমি এই প্রতিজ্ঞাসকলের সমস্ত বা অংশমাত্র ভঙ্গ করি—তাহা হইলে ইন্দ্রের বজ্র যেন আমার মস্তককে চূর্ণীকৃত করে—মানবিক ঘৃণা যেন আমাকে পদদলিত করে এবং মিথ্যা শপথকারী অকালনীয় কলঙ্ক যেন আমার স্মৃতিকে অনন্তকালের জন্য কলুষিত করে।

ম্যাটসিনিই সর্ব্বপ্রথমে এই শপথ গ্রহণ করিলেন—ক্রমে অসংখ্য লোক ম্যাটসিনির দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। নব্য ইতালী-সমাজ ক্রমেই পুষ্টাবয়ব হইতে লাগিল। নব্য ইতালী সমাজ—ম্যাটসিনির মস্তিষ্কের উদ্ভাবন।

ইতালীর স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রদূত স্বদেশ প্রেমিক জোসেফ ম্যাটসিনির বাণী ঃ—

[ম্যাটসিনির গৌরবময় জীবনাদর্শ সমগ্র পৃথিবীর স্বাধীনতাকামী মানুষ মাত্রকেই উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করিয়াছে। এই মহান নায়ক ও অমর লেখককে নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও রাজনৈতিক গুরুর মর্য্যাদা দান করিয়াছিলেন। জাতীয় জীবনের এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে তাঁহার অমর বাণী উদ্ধৃত করা হইল। পরবর্ত্তী সংখ্যায় ম্যাটসিনির সংক্ষিপ্ত পরিচয় বাণী প্রকাশ করা হইবে।]

বাহ্য-বিপ্লব অন্তর্বিপ্লবের প্রতিফলন মাত্র। কি নৈতিক, কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক যেকোন বিপ্লব-সাধন করিতে যাওনা কেন, অগ্রে তোমাকে অন্ত-বিপ্লব-সাধন করিতে হইবে ; অগ্রে তোমাকে লোকের মনের ভাবস্রোত তদনুকূল দিকে প্রধাবিত করিতে হইবে। অভীপ্সিত-কার্য্যারম্ভ হওয়ার অগ্রে লোকের মনকে অনুকূলভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে। লোকের মন অনুকূল ভাবে প্রস্তুত হইলে তাহা কার্য্যের দিকে অপ্রতিহত বেগে আপনিই প্রধাবিত হইবে! সে বেগ নিবারণ করে, কাহার সাধ্য ? অভিলষিত বিষয়ে দৃঢ়সংকল্প-মন ও নিম্নাভিমুখিনী স্রোতস্বিনীর গতিকে রোধ করে ? এ স্রোতের বেগে পাহাড়-পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া যায়, দুর্লঙ্ঘ্য বাধা-বিপত্তি সকল অন্তর্হিত হয়। এই অন্তর্বিপ্লব-সাধন করাই —জনসাধারণের মানসিক ভাবস্রোতের গতি পরিবর্ত্তন করাই—সংস্কারকদিগের সর্ব্বপ্রথম সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। এই গভীর বিপ্লব-সাধনের দুইমাত্র অস্ত্র লেখনী ও জিহ্বা। বাগ্মী হৃদয়ালোড়নকারিণী বক্তৃতা দ্বারা সমাগত শ্রোতৃবর্গের চিত্ত উদ্ভাবিত করিয়া দেন, লেখক হৃদয়-প্রজ্জ্বালনকারিণী রচনা দ্বারা অনাগত পাঠকবৃন্দের হৃদয়কে অগ্নিময় করিয়া তুলেন। অন্তর্বিপ্লব সাধন করিতে হইলে এই দুইশ্রেণীর সংস্কারকেরই একান্ত প্রয়োজন।

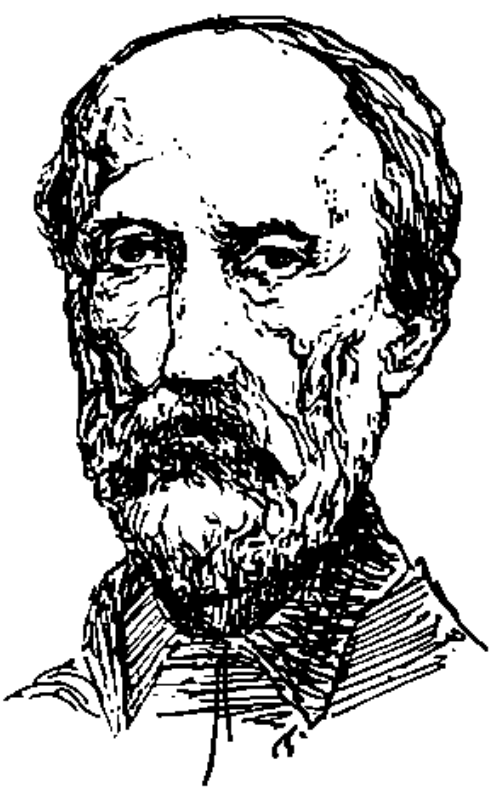

জোসেফ ম্যাটসিনি

হৃদয়-ভাবের উদ্বেলতা হইতেই মহতী বিপ্লব-পরম্পরা সংসাধিত হইয়া থাকে। যাঁহারা মনে করেন যে, শুদ্ধ শাণিত বেয়নেটেই বিপ্লব সংসাধিত হইতে পারে, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। নৈতিক উৎকর্ষ অন্তর্বিপ্লব সংসাধিত করিলে, বেয়নেট বা শারীরিক বল বাহ্য বিপ্লবমাত্র সম্পাদিত করে। ভাবোদ্বোধিত স্বল্প

বিশেষের সমর্থন কালেই বেয়নেট প্রকৃত শক্তিশালী। জনসাধারণের মনে নৈতিক জ্ঞান বদ্ধমূল হইলেই, তাহা হইতে সামাজিক স্বত্ব ও কর্ত্তব্যজ্ঞান সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। অন্ধ পাশব বলে কখন কখন দুই একটি জেরুপুরুষ সমুদ্ভূত হইতে পারে বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের জয় প্রায়ই জনসাধারণের ইচ্ছার প্রতিকূলে, এইজন্য তাহার পরিণাম প্রায়ই যথেচ্ছাচার—সাধারণ হিতের সমূলোৎপাটন।

যখন লেখকের তেজস্বিনী রচনা স্বাধীনতার ভাবে জনসাধারণের মনকে উচ্ছ্বসিত করিয়া দেয়, তখনই লোকের স্বাধীনতা লাভে প্রকৃত অধিকার জন্মে। যখনই লোকে স্বাধীনতার অভাব অনুভব করিতে শিখে, তখনই তাহাদিগের স্বাধীনতালাভের ইচ্ছা বলবতী হয়। তখন বিপ্লব আপন হইতে আবির্ভূত হয়। তখনই বিপ্লববিধিও ন্যায়ের অনুমোদন প্রাপ্ত হয়। সুতরাং তখন বিপ্লবের সাধন-সামগ্রীও ন্যায় ও বিধির অনুমোদনে অনিবার্য্য বলপ্রাপ্ত হয়।

অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী প্রশস্ত হৃদয় মনীষিগণ জগতে যে নূতন উন্নতির বীজ রোপন করেন, অসংখ্য লোকের জলসেচনে সেই বীজ হইতে প্রথমে অঙ্কুর ও পরে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। সেই বৃক্ষ আবার বহুকাল জলসেচনের পরে ফল ধারণ করিয়া থাকে।

মানব সমাজের শিক্ষা একদিনে সম্পন্ন হইতে পারে না। কার্য্য-কারণ সম্বন্ধের বহুকাল-ব্যাপিনী পর্য্যালোচনায়, ঘটনা নিচয়ের অক্লান্ত অধ্যয়নে এবং অবিসম্বত সত্যসমূহের ধীর ও বহুকাল ব্যাপী প্রয়োগেই মানব মনে নূতন সংস্কার—নূতন বিশ্বাস প্রতিষ্ঠাপিত হইতে পারে।

• • • •

এই ক্রমিক উন্নতি ও ক্রমিক শিক্ষার প্রধান সাধন সাময়িক পত্র। যাঁহাদিগের জীবনের এক লক্ষ্য, তাহাদিগের সমবেত শ্রমে ও সমবেত যত্নেই এরূপ গুরুতর ব্যাপার সংসাধিত হইতে পারে। এই সাময়িক পত্র সমস্ত ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিবে। কোন ঘটনাকেই তুচ্ছজ্ঞানে পরিত্যাগ করিবে না। ইহা প্রত্যেক ঘটনার অভ্যন্তরে যে গভীর ও অপরিবর্ত্তনীয় সত্য নিহিত আছে, তাহার অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করিবে। এরূপ শিক্ষাপ্রণালীই একণকার ঘটনাস্রোতের গতি প্রাবল্যের সম্পূর্ণ উপযোগিণী।

—জোসেফ ম্যাটসিনি।

———

যে কথা আপনিও ভাবছেন

যাহারা কখনও অপরের কথা ভাবে না, দেশ ও জাতির কল্যাণের কথা যাহারা চিন্তা করে না, তাহাদিগকে আমাদের কিছু বলিবার নাই। আপনারা যাঁহারা দেশ বা জাতির সমস্যা লইয়া মাথা ঘামান, তরুণ-সম্প্রদায়ের অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খলতায় এবং তথাকথিত প্রবীণ বা উচ্চপদস্থ লোকদের অলস নিশ্চিন্ততা ও দায়িত্বজ্ঞান হীনতায় যাঁহারা অন্তরে বেদনা অনুভব করেন, তাঁহাদের সঙ্গেই আমরা আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। আপনারা অনেকে হয়তো বলিবেন—সমস্যা তো গুরুতর কিন্তু সমাধানের পথ কই? আবার কেহ বা বলিবেন, সমাধানেরও পথ আছে কিন্তু ঘণ্টা বাঁধিবে কে?

'সাবা' নামক পুস্তকে বঙ্কিমচন্দ্র একদিন গভীর দুঃখে লিখিয়াছিলেন—

'এই বঙ্গসংসাররূপ পশুশালায় জন্য কিছু করা যায় না কি? যায় না,……কেননা, তাহাতে রায় বাহাদুরি, রাজ বাহাদুরি, টাইটল অব ইণ্ডিয়া কিছুই নাই। আছে কেবল মূর্খের করতালি। কে অগ্রসর হইবে?'

আমরাও জিজ্ঞাসা করি—আমাদের দেশে যে অনাচার ও দুর্নীতির প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, উহাকে রুদ্ধ করিবার জন্য কিছু করা যায় না কি? আমরা বলি—নিশ্চয়ই যায়, কিন্তু যে এই কার্যে অগ্রসর হইবে, তাহাকে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইতে হইবে, কেননা, এ কাজে কোন-পুরস্কার নাই, কোন খেতাবের আশাও নাই। তবে এ ব্যাপারে অগ্রসর হইবেন কে? যিনি দেশ ও জাতিকে ভালবাসেন, তিনিই অগ্রসর হইবেন। যদি শক্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি কর্তব্যে উদাসীন থাকেন, তবে তিনি পাপভাগী হইবেন।

আমাদের বক্তব্য আমরা ধীরে ধীরে নিবেদন করিব। আজ বাংলার ইতিহাসের একটি বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায়ের কথা স্মরণ করিব। আমরা জিজ্ঞাসা করিব—অতীতে যাহা ঘটিয়াছে, বর্তমানে তাহা ঘটিতে পারিবে না কেন?

একদিন অবিভক্ত বাংলার কোন এক মফঃস্বল শহরে একদল ত্যাগী ও আদর্শবাদী শিক্ষক মানুষ গড়ার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আহ্বানে সাড়া দিয়াছিল যে তরুণের দল, তাঁহাদের ছিল 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন।' এই তরুণদের ব্রত ছিল সর্বপ্রকার দুর্নীতি, অনাচার, অত্যাচার, ব্যভিচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়ান। তাঁহাদের পতাকায় লেখা ছিল 'প্রেম, সত্য, পবিত্রতা।' জোসেফ ম্যাটসিনির একটি উক্তি তাঁহাদের অন্তরে প্রেরণা জাগাইয়াছে—

'Whenever you see corruption by your side and do not strive against it, you thereby betray your duty.'

আমরা সেকালের পূর্ব্ববঙ্গের বরিশাল শহরের কথা বলিতেছি। যাঁহারা মানুষ-গড়ার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অশ্বিনীকুমার দত্ত, জগদীশ মুখোপাধ্যায়, কালীশ পণ্ডিত প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। সেকালে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে এমন একটি আত্মমর্য্যাদাবোধ জাগ্রত হইয়াছিল যে, পরীক্ষাগৃহে শিক্ষকদের উপস্থিতির প্রয়োজন হইত না, কারণ, কোন ছাত্রই অসাধু উপায় অবলম্বন করিত না।

আজ আবার দেশের মধ্যে একদল বিপ্লবী তরুণের প্রয়োজন, যাহারা সর্ব্বপ্রকার ভয়কে উপেক্ষা করিয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে। আর তাহাদিগকে সুপথে পরিচালিত করিবার জন্য চাই একদল ত্যাগব্রতী শিক্ষক। যতদিন দেশে আদর্শ শিক্ষকের অভাব ঘটিতেছে, ততদিন কোন বর্ণীয় প্রতিষ্ঠান কি এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন না?

হয়ত প্রত্যক্ষ করার মত কোন আশু লাভ না হতে পারে কিন্তু কোন আত্মত্যাগই বৃথা যায় না। একমাত্র ত্যাগ ও সাধনা বরণের পথেই কোন আদর্শ পূর্ণ প্রকাশের পথে এগিয়ে যেতে পারে এবং প্রতি দেশে জাতির জীবনে এই চিরন্তন নিয়মই প্রবহমান যে একমাত্র শহীদের শোণিতেই আদর্শের বীজ বোনা সম্ভব।

এই মরজগতে সব নষ্ট হয়ে যায়—নষ্ট হয়ে যাবেও—কিন্তু আদর্শ, মনীষা ও স্বপ্নের মৃত্যু নেই। কোন আদর্শের জন্য কেউ হয়ত প্রাণ দিতে পারে—কিন্তু সেই আদর্শ তার জীবনাহুতির পরে সহস্র আত্মায় পুনর্জন্ম লাভ করে। এই রূপ রীতি যাতে করে বিবর্তনের চাকা এগিয়ে চলে—এই যুগের স্বপ্ন ও আদর্শ পরের যুগে পূর্ণ মূর্ত্ত হয়ে ওঠে। ত্যাগ, সাধনাবরণ ও দুঃখব্রত ছাড়া এ পৃথিবীতে কোনদিন কোন উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়নি।

আদর্শের জন্যই জীবনধারণ এবং মৃত্যুবরণ—এই কল্পনা অপেক্ষা আর পরম তৃপ্তির কি হতে পারে? নিজের করণীয়কে অসম্পূর্ণ রাখেনি এমনি অনুভূতির চেয়ে একজনের কাছে মহত্তর আনন্দের আর কি হতে পারে? পর্বতে, গিরিপথে, স্বদেশের বিস্তীর্ণ সমতলের কোণে কোণে, সমুদ্রোত্তীর্ণ দূরদূরান্তে তার বাণী ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হবে—একজনের আত্মার কাছে এর চেয়ে পরম পুরস্কার আর কি হতে পারে? নিজের আদর্শের বেদীমূলে শান্তিতে আত্ম-বিসর্জন দেওয়া অপেক্ষা জীবনের মহত্তম সার্থকতা আর কি থাকতে পারে?

প্রকৃতপক্ষে স্বতঃসিদ্ধ যে ত্যাগ ও সাধনাবরণের পথে কেউ কিছু হারায় না। যদি জগতের কিছুও সে হারায়ও বা তবুও সে অনেক কিছু লাভ করে—লাভ করে এক অমর জীবনের উত্তরাধিকার।

এই আত্মার ধর্ম। জাতিকে বাঁচাবার জন্য ব্যক্তিকে মরতেই হবে। আজ আমি মৃত্যুবরণ করব যেন ভারত বাঁচতে পারে,—অর্জন করতে পারে স্বাধীনতা ও গৌরব।

—নেতাজী

অমৃত কথা ও কাহিনী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা :

কোন গ্রামে এক ধার্মিক তাঁতী বাস করত। তাকে সকলেই খুব ভালবাসত। তাঁতী হাটে কাপড় বিক্রী করতে গেলে, খরিদ্দার দাম জিজ্ঞাসা করলে বলত, "রামের ইচ্ছা সুতার দাম ১৲ টাকা, আর মেহনতের দাম ।৹ আনা, রামের ইচ্ছা মুনাফা ৵৹ আনা। কাপড়ের দাম রামের ইচ্ছা ১৷৵৹। লোকে তাকে এত বিশ্বাস করত যে তৎক্ষণাৎ দাম ফেলে দিয়ে কাপড় নিত। তাঁতী রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর অনেকক্ষণ বাহিরের চালায় বসে ঈশ্বরের গুণকীর্তন করত। একদিন অনেক রাত্র পর্যন্ত ঈশ্বরের নাম করছে আর মধ্যে মধ্যে তামাক খাচ্ছে। এমন সময় সেই পথ দিয়ে কতকগুলো ডাকাত ডাকাতি করতে যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে মুটে না থাকাতে তাঁতীকে ডেকে নিলে। তারপর একজন বাড়ীতে ডাকাতি করে তার মাথায় কতকগুলো জিনিষপত্র চাপিয়ে দিল। এমন সময় পুলিশ এসে তাঁতীকে মোট মাথায় ধরে ফেল্লে, আর অন্য সব লোক পালাল। পরদিন হাকিমের কাছে বিচারের সময় গ্রামের লোক জানতে পেরে উপস্থিত হয়ে বল্লে, "হুজুর ও বড় ধার্মিকও কখনও ডাকাতি করতে পারে না।" তাঁতীকে সাহেব তখন কি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করলে। সে বল্লে, "হুজুর, আমি রাত্রে ভাত খেয়ে চণ্ডীমণ্ডপে বসে ভগবানের নাম করছি। এমন সময় রামের ইচ্ছা একদল ডাকাত আমায় ধরে নিয়ে গেল। রামের ইচ্ছা তারা এক বাড়ীতে ডাকাতি করে কতকগুলি মোট আমার মাথায় চাপিয়ে দিলে। এমন সময় রামের ইচ্ছা পুলিশ এসে আমায় ধরে ফেল্লে। তখন রামের ইচ্ছা তারা আমায় ছাড়তে দিলে। আজ সকালে রামের ইচ্ছা হুজুরের কাছে এনেছে। সাহেব ধার্মিক লোক দেখে তাঁতীকে ছেড়ে দিলে। তাঁতী রাস্তায় বন্ধুদের বল্লে, "রামের ইচ্ছা আমাকে ছেড়ে দিয়েছে।"

• • • •

তমোগুণের স্বভাব অহঙ্কার। তমোগুণের আর একটি লক্ষণ ক্রোধ। ক্রোধে বিবেচনা জ্ঞান থাকে না। হনুমান লঙ্কা পুড়ালেন, এ জ্ঞান নাই যে সীতার কুটীর পুড়বে। তমোগুণের আর একটি লক্ষণ কাম। কাম ক্রোধাদি ছয় রিপু এরা ত সহজে যাবে না; এদের ঈশ্বরের দিকে মোড় ফিরিয়ে দাও। ঈশ্বরের কামনা কর। সচ্চিদানন্দের সহিত রমণ কর। যারা ঈশ্বরের পথে বাধা দেয়, তাদের উপর ক্রোধ। আবার ভক্তির তম আনলে ক্রোধ যাবে। আমি দুর্গানাম করেছি আমার আবার বন্ধন কি? পাপ কি? তারপর ভগবানকে পাবার জন্য লোভ কর। আমার আমার যদি করতে হয় তবে তাঁকে লয়ে, যেমন 'আমার কৃষ্ণ', 'আমার রাম'। তাঁর রূপে মুগ্ধ হও। যদি অহঙ্কার করতে হয় তবে বিভীষণের মত!—"আমি রামকে প্রণাম করেছি—এ মাথা আর কারো কাছে নোয়াবো না। যদি মদ অর্থাৎ মত্ততা করতে হয়, তাহলে আমি তাঁর দাস। আমি তাঁর ছেলে এই অহঙ্কার করতে পার। এই রকম ছয় রিপুর মোড় ফিরিয়ে দাও। কাম যেন গাছের মূল। কামনা যেন ডালপালা। সব মন তাঁকে দিলে তাঁর দর্শন হয় না। পুরাণে আছে, রাবণের রজো গুণ, কুম্ভকর্ণের তমোগুণ, বিভীষণের সত্ত্বগুণ। তাই বিভীষণ রামচন্দ্রকে লাভ করেছিলেন।

অন্তরীক্ষে

দেশের কথা বলব না — দেশের দুর্দশা দেখব না।
দেশের কথা শুনব না — দেশের কথা ভাবব না।

আমরা বেশ আছি !।

অশ্লীল সাহিত্য যারা লেখে

তারা শুধু সমাজদ্রোহী নয়, দেশদ্রোহী—

অশ্লীল সাহিত্যের বীজ এমনি করেই ছড়ায়

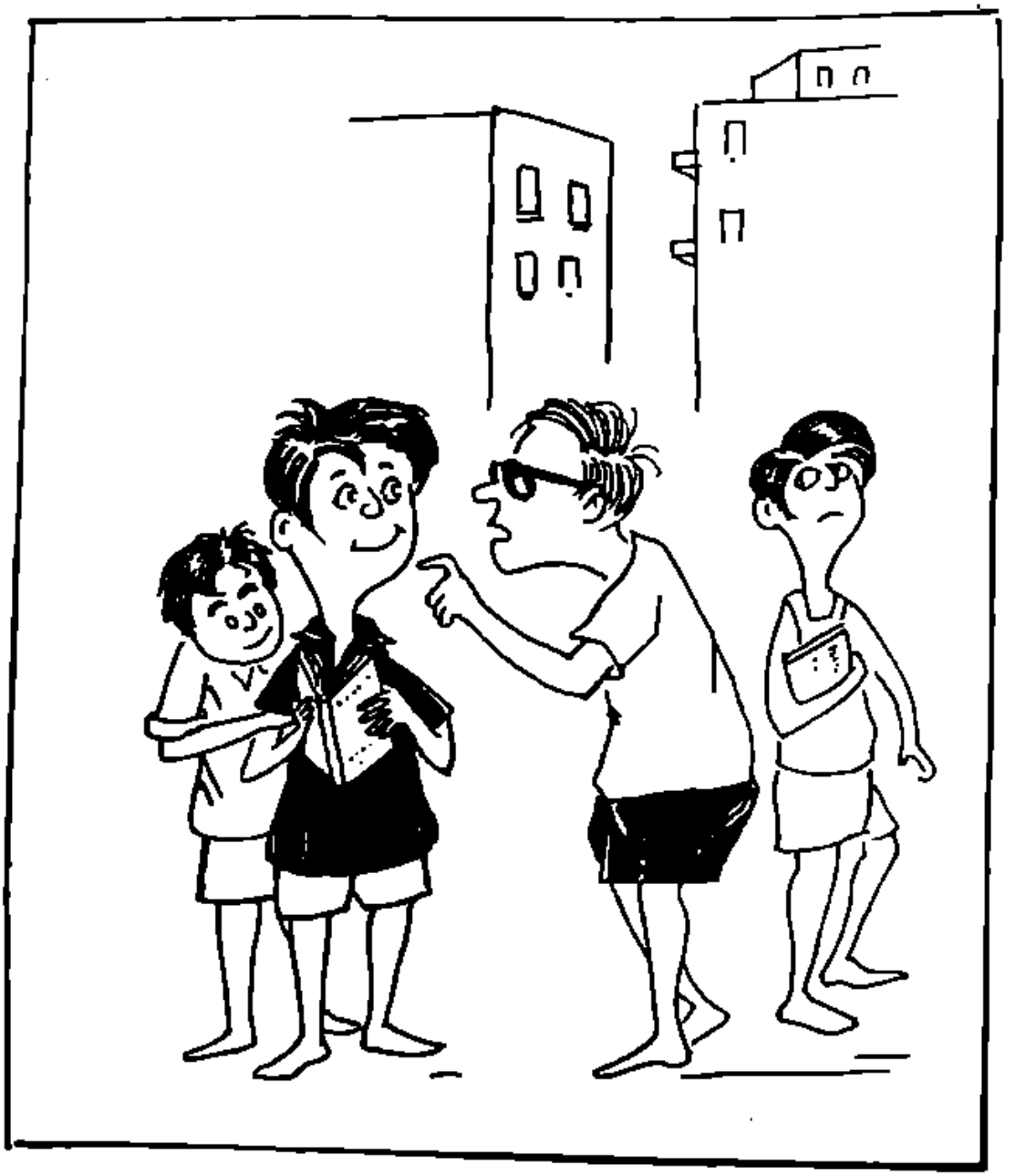

ক্যাবলার মত হাসছিস্ কেন? শোন,—
শুধু মলাট মিলেই হবে না—বইটা লুকিয়েও পড়তে হবে।

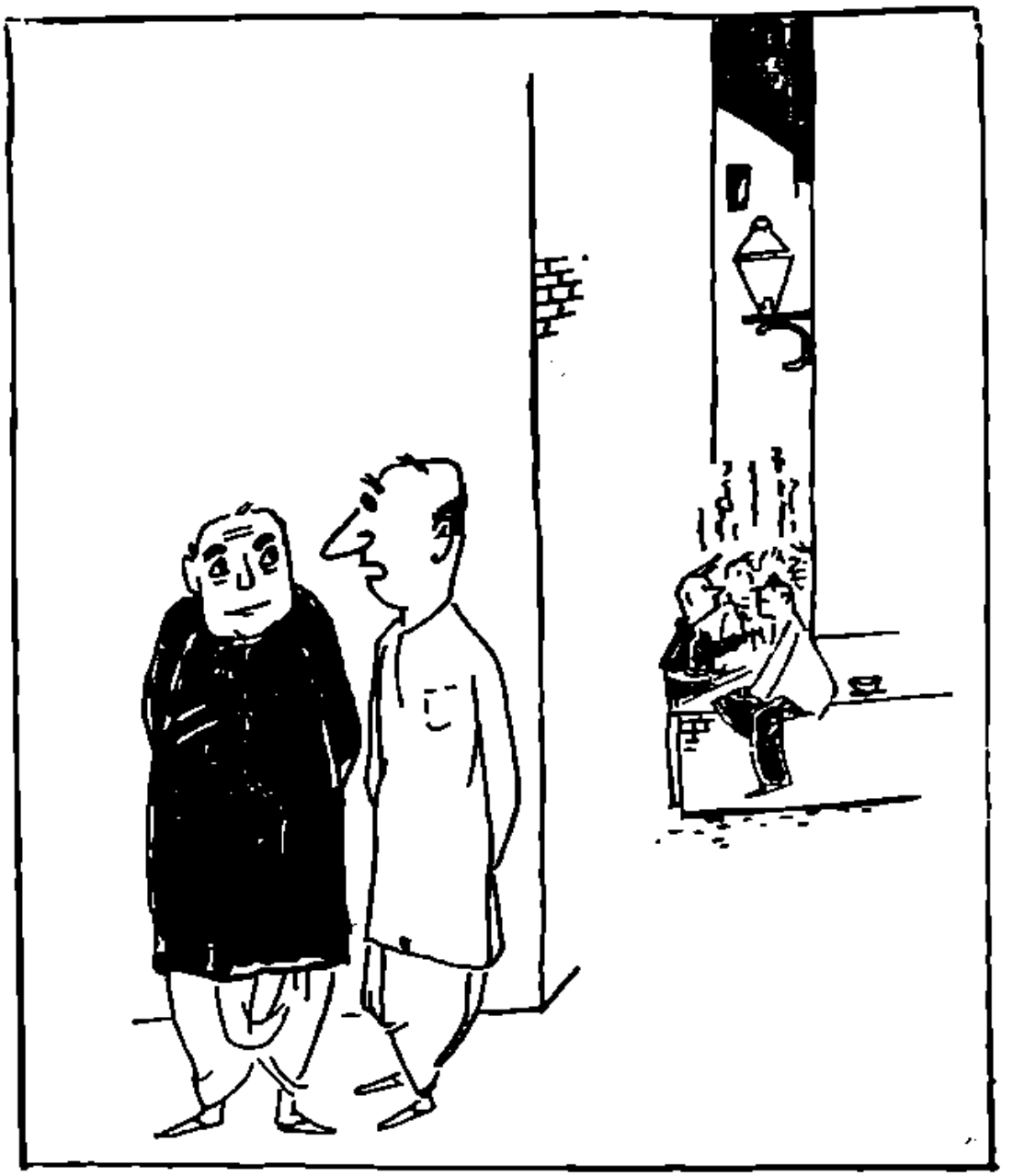

সিগারেটের ধোঁয়ায় গলি দিয়ে হাঁটা যেত না,
এবার ট্যাক্সের শুঁড়োয় যদি কমে—কি বলেন ?
হুঁ !

তোমারি তরে
কত যতন করে
গেঁথেছি সোনার হার।

বাংলা রঙ্গালয়ের নব-রূপায়ণ

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার রায়

(৯)

বসন্ত সমাগমে বহু কোকিল

শিশিরকুমার সকলকে মোহিত ক'রে বিদায় নিয়েছেন। তাঁর কণ্ঠস্বরমাধুর্য আর শ্রুতিগোচর হয় না, বা তাঁর অনুপম প্রতিভা। মুক্তভায় পটভূমিকায় ভঙ্গিবৈচিত্র্যের বিদ্যুৎচিত্রমালা আর সৃষ্টি করে না।

বাংলা নাট্যনভে একবার একটা বড় ঢেউ দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল। তারপর আবার আর কোন স্রোত, আর কোন ঢেউ নেই। সে আবার হয়ে পড়ল যেন বদ্ধ জলাশয়।

"আলমগীরে" শিশিরকুমার কেবল নিজের ব্যক্তিগত প্রতিভার প্রোজ্জ্বল পরিচয় দিয়ে গেলেন। কিন্তু নাট্যকলা তো শুধু অভিনয়-নিরপেক্ষ নয়। তার ক্ষেত্র বহুধা বিস্তৃত।

কথায় বলে, এক কোকিলের ডাকে বসন্ত আসে না। তখনই বুঝি বসন্ত এসেছে যখন কান্তার ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে বহু বসন্তসখার সম্মিলিত কণ্ঠসঙ্গীতে।

আমাদের নাট্যজগতেও দেখা গেল সেইরকম ব্যাপার। এতদিন নব্যশিক্ষিতের সমাজে সে ছিল অনাদৃত, উপেক্ষিত, অবহেলিত। শিশিরকুমার তাকে টেনে আলো ফুলে দিয়ে গেলেন। তিনি পথিকৃৎ। এখন তাঁর দেখানো পথে একে একে আসতে লাগলেন নূতন নূতন পথিক।

শিশিরকুমার নাট্যজগৎ থেকে বিদায় নেওয়ার আগেই দেখা গেল, তাঁর ব্যবসায়ে ব্রতী হয়েছেন একাধিক ব্যক্তি। কেউ সহকর্মী, কেউ বন্ধু।

এক প্রভাতে "ভারতী" পত্রিকার জন্যে গল্পরচনায় নিযুক্ত আছি, এমন সময়ে খবর পেলুম দুইজন ভদ্রলোক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন। মিনার্ভা থিয়েটারের মালিক উপেন্দ্রনাথ মিত্র ও অধ্যক্ষ সতীশচন্দ্র রায়। দুইজনই আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু আমি তো জানতুম, নিজের ডেরা ছেড়ে উপেনবাবু সহজে কোথাও নড়েন না, এত সকালে তিনি কেন আমার বাড়ীতে?—মনের মধ্যে এই প্রশ্ন নিয়ে কলম ছেড়ে নীচে নেমে গেলুম এবং তাঁদের জন্যে আমার পাঠগৃহের দরজা খুলে দিলুম।

উপেনবাবু ছিলেন রীতিমত কর্মিষ্ঠকর্মী ব্যক্তি। জনসাধারণের মনোরঞ্জনে বুঝে তাদের জন্য নব নব বৈচিত্র্যের ব্যবস্থা ক'রে ১৯১৫ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত বিশেষ সুখ্যাতির সঙ্গে রঙ্গালয় চালিয়ে গিয়েছেন—এ দৃষ্টান্ত বাংলা নাট্যজগতে দুর্লভ। তাঁর সুযোগ্য পুত্র এখন তাঁরই নীতি অনুসরণ ক'রে এই প্রতিযোগিতার বাজারেও নিজের আসন অটল রেখেছেন। সতীশচন্দ্র রায় ছিলেন উপেনবাবুর সুযোগ্য সহকারী।

আসন গ্রহণ ক'রেই সতীশবাবু আসল কথা পাড়লেন। বললেন, "হেমেন্দ্রবাবু, আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছি। শিশিরবাবু আমাদের থিয়েটারের বাজার মাটি ক'রে দিয়েছেন।"

—"কেন?"

—"শিক্ষিত নূতন অভিনেতা ছাড়া থিয়েটার আর চলবে না। দর্শকরা ভালো শিক্ষিত অভিনেতা দেখতে চায়। এ বিষয়ে আপনি আমাদের সাহায্য করতে পারেন?"

—"কি রকম সাহায্য?"

উপেনবাবু বললেন, "শুনেছি য়ুনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের নরেশচন্দ্র মিত্রের খুব নাম। কেউ কেউ বলেন, তিনি শিশিরবাবুরও চেয়ে উঁচুদরের অভিনেতা। আপনি তাঁকে মিনার্ভায় আনতে পারেন?"

আমি তখন পর্যন্ত নরেশচন্দ্র মিত্রের অভিনয় দেখিনি—এমন কি তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়ই হয় নি। তবে একটা কথা মনে পড়ল। তারই উপরে নির্ভর করে বললুম, "আমি চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি।"

সেদিন এই পর্যন্ত।

আগেই বোধ হয় বলেছি, তখন আমি প্রায়ই তাঁর থিয়েটারে যাতায়াত করতুম। অভিনয় দেখা উদ্দেশ্য ছিল না, অপরেশচন্দ্র প্রভৃতির সঙ্গে গল্প করতে ভালো লাগত।

একদিন বাইরে অভিনয় চলছে এবং ভিতরে আরামআসনে অর্ধশায়ী অপরেশচন্দ্রের সঙ্গে আমি কথাবার্তা কইছি।

হঠাৎ নজরে পড়ল, একটি অচেনা যুবক 'উইংসে'র পাশে দাঁড়িয়ে একমনে অভিনয় দেখছেন। তাঁর ছিমছাম পোষাক, মার্জিত চেহারা ও বুদ্ধিদীপ্ত মুখ সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

জিজ্ঞাসা করলুম, "ও ভদ্রলোক কে?"

অপরেশচন্দ্র বললেন, "শুনেছি উনি একজন শিক্ষিত ও উঁচুদরের সৌখীন অভিনেতা। সিমলার সরকারি অফিসের পদস্থ অফিসার। ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছেন। সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম। নাম রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়।"

সেইদিনই অপরেশচন্দ্র তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন।

তারপর যেদিনই যাই, রাধিকানন্দের সঙ্গে দেখা হয়। এক একজন লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ববন্ধন পাকা হয়ে উঠতে দেরি লাগে না—রাধিকানন্দ সেই শ্রেণীরই লোক। কথাপ্রসঙ্গে তাঁরই মুখে জানা গেল, এখন তিনি বহুদিনের জন্যে প্রবাসী বটে, তবে একসময়ে কলকাতার বিখ্যাত সখীত সমাজে অভিনয় করতেন। এখনো সিমলায় বাংলা অভিনয়ে যোগ দেন। হাউইট কিলিপ্‌সের সম্প্রদায়ে যোগ দিয়ে ইংরেজী অভিনয়ও করেছেন। শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও নরেশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব।

বৈকালে তাঁর থিয়েটারে গিয়ে রাধিকানন্দকে ধরলুম। একেবারেই কাজের কথা পেড়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "আপনি নরেশচন্দ্র মিত্রকে মিনার্ভা থিয়েটারে নিয়ে আসতে পারবেন?"

—"হয়তো পারব।"

—"বেশ, সেই চেষ্টা করুন।"

—"কিন্তু আমার একটি সর্ত আছে।"

—"কি সর্ত?"

—"নরেশচন্দ্রের সঙ্গে মিনার্ভায় আমাকেও গ্রহণ করতে হবে।"

—"কিন্তু আপনি তো সিমলায় সরকারি অফিসের কর্মচারী, এখানে স্থায়ী ভাবে অভিনয় করবেন কেমন ক'রে ?"

—"তিনমাসের ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছি। দরকার হ'লে আরো তিনমাসের ছুটি নিতে পারি। যদি সুবিধা দেখি, চাকরি ছেড়ে এখানেই থেকে যাব।"

সেইদিনই রাত্রিকালে আমাদের বৈঠকে শিশিরকুমারের সঙ্গে দেখা হ'ল।

জিজ্ঞাসা করলুম, "শিশির, নরেশ মিত্র কোন্ শ্রেণীর অভিনেতা ?"

—"নরেশ ? A great artist."

—"রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় ?"

—"A good second class."

রাধিকানন্দ সম্বন্ধে আমার মনে যেটুকু দ্বিধা ছিল, শিশিরকুমারের মত শুনে তা দূর হ'ল—কারণ বাংলাদেশে যাঁরা শ্রেষ্ঠ নটের আসন অধিকার ক'রে আছেন তাঁদের অধিকাংশই ঐ "good second class"-এর উপরে উঠতে পারেন না।

কিন্তু পরে রাধিকানন্দের অভিনয় দেখে বোঝা গেল, শিশিরকুমার রাধিকানন্দের আধুনিক অভিনয় দেখেন নি ব'লে তাঁর সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করতে পারেন নি। ইতিমধ্যে সাধনার ফলে রাধিকানন্দের অভিনয় যে অধিকতর উন্নত হয়ে উঠেছিল তাঁর প্রথম আবির্ভাবেই তার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল।

নরেশচন্দ্র ও রাধিকানন্দ মিনার্ভা থিয়েটারে প্রধান দুই অভিনেতা রূপে গৃহীত হ'লেন। কিন্তু তার আগে আমাকে অনেক বাধা এড়াতে ও প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল, চিত্তাকর্ষক হ'লেও সে সব কথা এখানে তুলে আর পুঁথি বাড়াতে ইচ্ছা করি না।

শিশিরকুমারের আত্মপ্রকাশের তিন-চার মাস পরেই নরেশচন্দ্র ও রাধিকানন্দ সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগ দেন।

দর্শক আকর্ষণের লোভে তাড়াতাড়ি তাঁদের পার্শ্বপ্রতীপের আলোকে দেখাবার জন্যে মিনার্ভার কর্তৃপক্ষ এতটা উৎসুক হয়ে উঠলেন যে নূতন কোন নাটকের অপেক্ষায় থাকতে পারলেন না। মিনার্ভার ভাণ্ডারে পুরাতন কাসুন্দীর মত তুলে রাখা হয়েছিল ১৯১১ খৃষ্টাব্দে প্রথম অভিনীত যে "চন্দ্রগুপ্ত" পালা—দানীবাবুর অভাবে যার আর পুনরভিনয় সম্ভবপর হয় নি, সেই পালাটিকেই তাঁরা আবার সরগরম করতে বাধ্য হ'লেন। চাণক্যের ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় ক'রে প্রথমে দানীবাবু (মিনার্ভায়) ও পরে শিশিরকুমার (ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে) প্রেক্ষকদের কাছ থেকে প্রভূত অভিনন্দন লাভ করেছিলেন। এখন সেই ভূমিকায় নরেশচন্দ্রের নাম বিজ্ঞাপিত হ'ল—ধরতে গেলে তাঁর পক্ষে এটা হয়ে দাঁড়াল রীতিমত অগ্নিপরীক্ষার মত।

কিন্তু দানীবাবু ও শিশিরকুমারের সঙ্গে তুলনা না ক'রেই বলা যায়, এ পরীক্ষায় নরেশচন্দ্রও বিফল হন নি। তিনিও করেছিলেন উচ্চশ্রেণীর অভিনয়।

রাধিকানন্দকে দেওয়া হয়েছিল অপেক্ষাকৃত অপ্রধান (এবং নাটকের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়ও বটে) আন্টিগোনাসের ভূমিকা। শ্রেষ্ঠ নটের দ্বারা অভিনীত হয়েও ঐ ভূমিকাটি আগে কোনদিন দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নি। ওটি ছিল প্রায় উপেক্ষিত ভূমিকা। কিন্তু রাধিকানন্দের

অপূর্ব নাট্য-নিপুণতা তার মধ্যে এমন আশ্চর্য প্রাণসঞ্চার করলে যে সেই ভূমিকাটিই সমগ্র পালার মধ্যে প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয় হয়ে উঠল।

"ভারতী" সম্পাদক ও প্রসিদ্ধ লেখক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় রাধিকানন্দের অভিনয় দেখে বলেছিলেন, "আমি এই প্রথম বাংলা রঙ্গালয়ের মঞ্চ-অভিনেতার মুখে স্বাভাবিক স্বরে মাতৃ-সম্বোধন শ্রবণ করলুম।" তা ছাড়া প্রত্যেক দৃশ্যে তাঁর প্রবেশ ও প্রস্থানের ভঙ্গি হয়েছিল রীতিমত অভিনব ও চমকপ্রদ। মেলো-ড্রামাটিক ভূমিকায় মেলো-ড্রামাটিক অভিনয়ের প্রায় চরমোৎকর্ষ। অনেকের ভ্রান্ত ধারণা আছে মেলো-ড্রামাটিক অভিনয় ব্যাপারটাই হচ্ছে নিম্নশ্রেণীর। কিন্তু ইতালীর নট প্রাসো মেলো-ড্রামাটিক অভিনয়ের জন্যে য়ুরোপে অমর যশ অর্জন ক'রে গেছেন। গর্ডন ক্রেগ পর্যন্ত তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। পৃথিবী-প্রসিদ্ধ ইংরেজ অভিনেতা স্যর হেনরি আর্ভিংও ছিলেন প্রধানত মেলো-ড্রামাটিক অভিনেতা। রাধিকানন্দ যে যথার্থ স্বাভাবিক অভিনয়েও উচ্চশ্রেণীর কৃতিত্ব প্রকাশ করতে পারতেন পরে সে প্রমাণও দিয়ে গেছেন।

আর একটা ব্যাপারও স্পষ্ট বোঝা গেল। নূতন অভিনেতারা লাভ করলেন ঘন ঘন অভিনন্দন এবং পুরাতন দলের লোকদের ভাগ্যে লভ্য হ'ল কেবল বিদ্রূপধ্বনি ও টিটকারি। দর্শকরা আর পুরাতনকে সহ্য করতে নারাজ।

তারপর 'মিনার্ভা' নরেশচন্দ্র ও রাধিকানন্দকে নিয়ে খুলেছিল একাধিক পালা কিন্তু তাঁরাও কেবল শ্রেষ্ঠ শিল্পী রূপে আসর জমালেন, অন্য কোনদিকে কোনরকম প্রযোজনৈপুণ্য প্রকাশ করতে পারলেন না।

ওদিকে কয়েক মাস পরে শিশিরকুমারকে হারিয়ে ম্যাডানরাও এমন আর একজন নূতন দলের অভিনেতাকে হস্তগত করলেন, যাঁকে আমরা সৌখীন সম্প্রদায়ের শিশিরকুমারের দ্বারা প্রযোজিত "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস" পালায় বৃহন্নলার ভূমিকায় দর্শন করেছি। তাঁর জন্যে প্রস্তুত হ'ল নাট্যকারের দ্বারা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত "প্রতাপাদিত্য" নাটক। তিনি হচ্ছেন কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ভাগিনেয় নির্মলেন্দু লাহিড়ী। তিনি পরে আমার কাছে স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেছিলেন: "শিশিরবাবু পথ না দেখালে সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগ দেবার সাহস আমার হ'ত না।"

আর একজন নূতন শিল্পীর নামও এই নাট্যাভিনয়ে উল্লেখযোগ্য। তিনি হচ্ছেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (হাস্যাবতার 'ফানিম্যান' নামে তখনকার সাহেব-মহলে অতিশয় পরিচিত)। তিনি নিয়েছিলেন রডার ভূমিকা। যদিও তাঁর অভিনয় হয়েছিল অতি চমৎকার তবু দুর্ভাগ্যের বিষয় বাংলা রঙ্গালয়ে সেই তাঁর প্রথম ও শেষ আত্মপ্রকাশ।

"প্রতাপাদিত্যে"র নামভূমিকায় নির্মলেন্দু অভিনয় করলেন যে উচ্চশ্রেণীর সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু তিনিও নাট্য-পরিচালনায় প্রয়োজনৈপুণ্য জাহির করতে সক্ষম হ'লেন না।

সর্বাগ্রে শিশিরকুমার, তারপর নরেশচন্দ্র ও রাধিকানন্দ এবং তারপর নির্মলেন্দু।

তারপরেই একেবারে ভেঙে গেল বাঁধ—নূতন দলের শিল্পীদের সামনে আর কোন প্রতিবন্ধক রইল না—১৯২৩ খৃষ্টাব্দে "কর্ণার্জুন" পালায় অভিনয়ে একসঙ্গে রঙ্গাবতরণ করলেন তিনকড়ি চক্রবর্তী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র ও শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি।

তাঁরাও প্রকৃত অভিনয়চাতুর্যের প্রমাণ দিলেন বটে—কিন্তু ঐ পর্যন্ত। সে নাট্যাভিনয়েরও মধ্যে পরিচালকের কোনরকম প্রয়োগপটুতার চিহ্নই ছিল না—পুরাতন ঢঙের লোকেরা পালা জমাবার পোষাকী যাত্রার পালাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়—এমন কি এর মধ্যে নাটকীয়

ক্রিয়ার সঙ্গে কোনরকম সম্পর্ক না থাকলেও শুধু গান শোনাবার জন্যেই "আলিবাবা"র মত নিষ্প্রভিত পুনরাবির্ভাবও হয়েছে। এতগুলি নূতন শিল্পীর দলে একজন মাত্র যোগ্য পরিচালক থাকলে এমন সব বিসদৃশিকর ব্যাপার সম্ভবপর হ'ত না। তবে অভিনয় মন্দরমত উৎরে গিয়েছিল এবং আর সকলের উপরে টেক্কা মেরেছিলেন শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র "শকুনি"র ভূমিকায়।

"কর্ণার্জুনে"র সঙ্গে আর একটি দাস্তকর ব্যাপারের সম্পর্ক আছে অনেকেরই যা জানবার কথা নয়। "চন্দ্রগুপ্তে"র পুনরভিনয়ে নরেশচন্দ্র ও রাধিকানন্দের আধুনিক অভিনয়ের সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে নাটকের নামভূমিকায় সেকালের প্রখ্যাত নট হাঁদুবাবু (বা মন্মথনাথ পাল) দর্শকদের দ্বারা বারংবার বিদ্রূপ হয়ে প্রতিজ্ঞা করেন যে, নূতন দলের শিল্পীদের সঙ্গে তিনি আর কোন সম্পর্ক রাখবেন না। তিনি "মিনার্ভা" থেকে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়ে পুরাতন দলের দ্বারা পরিচালিত "ষ্টারে"র আসরে গিয়ে দেখা দেন। কিন্তু সেখানেও দুদিন যেতে না যেতেই তাঁর দুর্ভাগ্যক্রমে "কর্ণার্জুন" নাট্যাভিনয়ে আর একজন নূতন শিল্পীর আবির্ভাব হ'ল। হাঁদুবাবু নূতনদের এতখানি লম্ফঝম্প আর বরদাস্ত করতে না পেরে থিয়েটারের পাট একেবারেই তুলে দিলেন, তারপর আবার অল্পদিনের জন্যে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন বটে, কিন্তু জীবনে আর কোনদিন নূতন দলের সঙ্গে পাদপ্রদীপের আলোয় দেখা দেন নি।

অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তোফীর অন্যতম প্রধান শিষ্য হয়েও হাঁদুবাবু গুরুর নামরক্ষা করতে পারেন নি মাত্র একটি কারণে। তাঁর গুরু সুরবর্জিত অভিনয়ের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু তিনি করতেন অর্থহীন সুরেলা অভিনয়। অথচ হাস্যরসের ও সিরিয়স-কমিক ভূমিকায় তাঁর অভিনয় হ'ত মন্দরমত উচ্চ শ্রেণীর। "বরুণা", "বাসন্তী সেনা", "চাঁদবিবি", "দাদা ও দিদি", "আবুহোসেন" ও "কেদার কীর্ত্তি" প্রভৃতি বহু নাটকেই তিনি অবিস্মরণীয় অভিনয় ক'রে গিয়েছেন। "সিরি-ফরহাদে"ও তাঁর ভূমিকার তুলনা এ-পর্যন্ত পাওয়া গেল না, যদিও শেষের দিকে তা করুণ রস বিতরণ করত। অহীন্দ্র চৌধুরীও এই ভূমিকায় তাঁর উপরে উঠতে পারেন নি।

মুস্তোফীর প্রধান শিষ্য তারক পালিত গুরু নির্দ্দেশিত পথ পরিত্যাগ করেন নি বলে নূতন দলের আবির্ভাবের পরেও প্রথম শ্রেণীর অভিনয়-শক্তির পরিচয় দিয়ে গিয়েছিলেন।

নূতন দল এলেন নূতন ভঙ্গির অভিনয়-চাতুর্য নিয়ে—কিন্তু প্রথম শ্রেণীর প্রযোজকর্তার সাড়া তখনও পাওয়া গেল না। যথার্থ প্রথম শ্রেণীর প্রযোজকর্তার অভাবেই বাংলা রঙ্গালয়ে তখনও পর্যন্ত নব-রূপায়ণ সম্ভবপর হ'ল না। যিনি তা পারতেন তিনি থিয়েটারি কর্ত্তাদের মুরুব্বিআনা ও অন্যায় আবদার সইতে না পেরে সাধারণ রঙ্গালয়ের মায়াশৃঙ্খল ছিঁড়ে পলায়ন করেছেন। প্রযোজকর্ত্তাকে হ'তে হবে একসঙ্গে সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পরসিক, তাঁকে দিতে হবে নূতন নাটকে একটি মূল সুর বেঁধে এবং সেইদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখে তিনি করবেন নাট্যশিক্ষাদান। বাংলা রঙ্গালয় পেলে বটে নূতন যুগের শিল্পীগণকে, কিন্তু তাঁদের কারুর মধ্যে পাওয়া গেলনা উচ্চশ্রেণীর প্রযোজকর্ত্তার প্রতিভা।

ভিন্ন ভিন্ন পাকা গাইয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন রাগিণীর এক একটি পদ গেয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কোন ওস্তাদ-গায়ক এসে একটি গোটা রাগিণীর পরিপূর্ণ রূপ এবং মর্মবাণী ফুটিয়ে তুলতে পারছে না —গায়েন-সমাজে এসব গাইয়ের স্থায়ী আসন নেই। বাংলা রঙ্গালয়ের মধ্যে এই শ্রেণীর শিল্পীদেরই কলরব শোনা যেতে লাগল। গানের অংশগুলি শুনতে মিষ্ট লাগে। কিন্তু মস্তিষ্কের খোরাক বা প্রকৃত উপভোগের আস্বাদ দিতে পারে না।

তাই তখনও পুরাতন দলের দাকর্ষণ ও গলাবাজী বন্ধ হ'ল না এবং সেইজন্যেই দেখি, নবযুগের অভিনেতাদের নূতন পদ্ধতি দেখে "কর্ণার্জুন" নাট্যাভিনয়ে নূতন দলের ভক্তরা যখন প্রশস্তিপূর্ণ প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে, ঠিক সেই সময়েই ভূবিখ্যাত মনোমোহন থিয়েটারের প্রেক্ষাগারে কাতারে কাতারে দর্শক ভেঙে পড়ছে এবং বৃদ্ধ, রুগ্ন, অথর্ব ও প্রায়-দৃষ্টিহীন দানীবাবুর তরুণ যুবক ও দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের ভূমিকায় অদ্ভুত ও বিসদৃশ অভিনয়ও তারা পরম সন্তুষ্ট মনে সহ্য করে যাচ্ছে এবং বিনার্তা আবার পুরাতনের বহু কূপে ঝাঁপ দিয়েছে, উপরন্তু নির্মলেন্দুকে পেয়ে ম্যাডানরা নব-রূপায়ণের ছিটেফোঁটাও দান করতে পারছে না।

শিশিরকুমার পারসী থিয়েটারের আদর্শে গড়া ম্যাডানদের থিয়েটারের সংস্পর্শ থেকে মুক্ত হ'লেন বটে, কিন্তু নাট্যজগৎ থেকে একেবারে দূরে থাকতে পারলেন না। ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্ম কোম্পানি তখন বাংলার প্রথম পূর্ণাঙ্গ হাসির ছবি "ইংলণ্ড রিটার্ণড" তোলবার পর আরো দুই কি একখানি ছবি দেখিয়ে চিত্র ব্যবসায় ছেড়ে দিলেন। তাঁদের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি কিনে নিয়ে আর এক ভদ্রলোক গড়লেন "তাজমহল ফিল্ম কোম্পানি" এবং শিশিরকুমার হলেন এই নূতন সম্প্রদায়ের কর্ণধার। যদিও ছবি ছিল তাঁর কাছে অনেকটা দুরোরাশীর মত, তবু চিত্ররাজ্যেও তাঁর অবদান আছে। যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম ভাঙিয়ে আজকের চিত্রকাররাও যন্ত্রমত অর্থলুণ্ঠন করছেন, সেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে চলচ্চিত্র ভক্তদের প্রথম পরিচয়সাধন করেন সাহিত্যরসিক শিশিরকুমারই। সেই প্রথম ছবির নাম "আঁধারে আলো"। আমি মাঝে মাঝে তাঁদের ষ্টুডিয়োয় গিয়ে ছবি তোলার কাজ দেখতুম এবং যেদিন "আঁধারে আলো" প্রথম বাজারে খোলা হয়, শিশিরকুমার, শরৎচন্দ্র ও আমি একসঙ্গে ব'সে সেই চিত্রাভিনয় দর্শন করেছিলুম। বলা বাহুল্য, চিত্র তখনও নির্বাক এবং কেবল পরিচালকের নয়, নায়কেরও কর্তব্য পালন করেছিলেন স্বয়ং শিশিরকুমারই।

একহিসাবে "আঁধারে আলো" প্রদর্শন হচ্ছে বাংলা চিত্রজগতের একটি স্মর্তব্য ঘটনা। এ খালি শরৎচন্দ্রের প্রথম ছবি নয়। উপরন্তু এ হচ্ছে বাংলা চিত্রজগতে প্রথম উচ্চশ্রেণীর নাটকীয় ছবি—হ্যাবলাদিকে আশ্রয় ক'রে যা বাজীমাৎ করতে চায় নি, একসঙ্গে করতে চেয়েছে বহু বিচিত্র রসনিবেদন।

এর আগে এবং পরেও শিশিরকুমার বারংবার যোগ দিতে বাধ্য হয়েছেন চিত্রাভিনয়ে, কিন্তু ছবির মধ্যে ছিল না তাঁর যথার্থ প্রাণপদার্থ। তাঁর মতানুসারে চিত্রাভিনয়ের চেয়ে মঞ্চাভিনয় হচ্ছে উচ্চতর শ্রেণীর আর্ট। মঞ্চমায়ার প্রেম থেকে বঞ্চিত হয়ে তখন কেমন কেমন করছিল তাঁর মন। কিন্তু এ বিরহের দুঃখ তাঁকে বেশীদিন সহ্য করতে হয় নি।

তখন ক্রমশঃ ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে ষ্টারের তারকা। কর্ণওয়ালিস থিয়েটার 'আলফ্রেডে' স্থানান্তরিত হয়ে আত্মহত্যা করলে। শিশিরকুমার অন্তরালে। 'কর্ণার্জুন' লাভ করলে লোকসাধারণের আদর। তার উপরে 'বিনার্তা' আগুনে পুড়ে ছাইগাদায় পরিণত। প্রেক্ষকরা আর অক্ষম ও বৃদ্ধ দানীবাবুকে দেখে উৎসাহ পাচ্ছে না। সহরে ধরতে গেলে একটিমাত্র চলমান রঙ্গালয়। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাজারে 'ষ্টারে'র মঞ্চে আর্টের আসর জমাটায় পক্ষীর কলসঙ্গীতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

এল এক অভাবিত আমন্ত্রণ। ইডেন গার্ডেনে মত এক সরকারী একজিবিসন হবে—নানা বিভাগে তার বেজায় জাঁকজমক। যতদূর স্মরণ হয়, শিশিরকুমারের কাছে প্রস্তাব এল ওখানে তিনি পক্ষকালব্যাপী নাটা-মৈঠকের আয়োজন করতে পারবেন কিনা?

এ যেন পেটুককে জিজ্ঞাসা করা—ক্যাংলা দুই ভাত খাবি?

শিশিরকুমারের মনের ভাবটা তখন—এই যে আমি তো হাত ধুয়েই বসে আছি।

নমোনমো চিত্রসুন্দরী, আপাতত বিদায়। [ক্রমশঃ]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কাঙড়ার চোখে তখনো ঘুমের ঘোর।

শর্মা উঠে গায়ে একটা কোর্তা চড়িয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। বেরিয়ে যাওয়ার সময়, বাইরে থেকে টেনে ভাল ক'রে বন্ধ ক'রে দিলো দরজাটা। কাল সারা রাত জেগে কাটিয়েছে ও, কিছুতেই দুচোখ জুড়লো না। মাথা দিয়ে আগুন ছুটছে এমনি গরম। বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস না লাগালেই নয়, আর মনটাও বিশ্রীরকম তেতে আছে। কোনো দিক্-টিক্ নয়, যে দিকে ওর পা ওকে নিয়ে চললো, সেই দিকেই চললো। ওর ভেতরের একটা দুর্নিবার তৃষ্ণা ওকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ালো এপথে ওপথে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে, আকাশের গায়ে বুজে এলো তারাদের মিটমিটে চোখ। বাতাসে ভোরের গন্ধ। পথে একটা দুটো লোক চলাচল শুরু হলো। সদ্যজাগা ভিতর, মনালের মৃদু কূজন শোনা গেলো। পূবদিকের আকাশ লাল হলো। শুরু হলো পথে পথে প্রাণবন্তার চঞ্চলতা। পাথরে-পথ একটু একটু ক'রে গরম হ'তে লাগলো। আর সর্মার শর্মাও যেন নিজেকে ফিরে পেলো নিজের মধ্যে।

লোকদের ডেকে ডেকে, প্রশ্ন ক'রে পরিচিত হ'তে লাগলো কাঙড়া শহরের সঙ্গে। ঘুরে ঘুরে শর্মা দেখলো অনেক। থানা, ডাকঘর, তারঘর, হাসপাতাল, ছেলেদের স্কুল, মেয়েদের স্কুল—সব দেখলো। ছেলেদের স্কুলটি আর্যসমাজ পরিচালিত, মেয়েদের স্কুল ক্যানাডিয়ন মিশন পরিচালিত।

ছেলেমেয়েদের স্কুল দেখে শর্মার ভাল লাগলো। আর ভাল লাগলো পাশ্চাত্য মিশনারী থেকে নিজেদেরকে দূরে রেখে, কাঙড়াবাসীরা আজও তাদের নিজস্ব কৃষ্টিকে সুন্দর বাঁচিয়ে রেখেছে ব'লে।

তারপর কাঙড়া দুর্গের নক্‌শাটা ভাবতে ভাবতে বাড়ির পথ ধরলো।...ইতিহাস বিখ্যাত কাঙড়ার দুর্গ যে অজেয় দুর্গ ছিলো—যার দেখবার চোখ আছে, সে তা এখনো দেখতে পাবে। দুর্গ পাদমূলে পরিখাটার কথা মনে হলো শর্মার। একটু নজর করলেই বোঝা যায়, কী গভীর ছিলো এই পরিখা। এই পরিখা পারাপারের কাষ্ঠসেতুটা কেমন ছিলো কে জানে। সেতুর এতটুকু চিহ্নও নেই এখন। আর একটা কথা মনে হলো শর্মার, কাল দুর্গের ভেতর একটা মসজিদ দেখেছিলো—ভাঙা মসজিদ, সেটা কে তৈরী করেছিলো জেনে নেয়া হয়নি।

বাড়ির দরজার কাছে যখন পৌঁছোলো শর্মা, তখুনি মনে পড়ে গেলো ফুল্লুকে, তার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ফুল্লুর কথা একবারও মনে পড়েনি ওর।

এদিকে ফুলমুও অনেক রাত্রি পর্যন্ত জেগেছে। কিন্তু কষ্টে নয়—আনন্দে। ইচ্ছে করেই সারা-রাত্রি পর্যন্ত ঘুমোয়নি ফুলমু। যে অনাস্বাদিত সুখ পর্দার কাছে ও পেয়েছে, তারই আনন্দে ওর মনটা বেসামাল। তার কাছে কপালের ওটুকু আঘাত তো কিছুই নয়। সেই অনির্বচনীয় পুলকের কথা ভেবে ভেবে, ও বারে বারে রোমাঞ্চিত হয়েছে,—ওর ঘুম আসেনি। কিন্তু আশ্চর্য এই—না ঘুমোনো পর্যন্ত ও অনবরত কেঁদেছে। তারপর আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়েছে কখন।

ভোরের দিকে একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখে লাফিয়ে উঠে বসেছে। তারপর আর ঘুম হয়নি। সে স্বপ্নের ছবিটা বারে বারে মনে পড়ছে ওর।

…গভীর রাত্রি। আকাশে মেঘের ঘনঘটা। পর্দাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে ফুলমু। হাঁটতে হাঁটতে কতদূরে চলে গেলো ও। পা ভারি, নিশ্বাস ভারি,—তবু পর্দার দেখা নেই। মেঘের চাদর সরিয়ে একাদশীর একফালি চাঁদের মত শীর্ণমুখ দেখা দেলো চাঁদের। সেই ক্ষীণ আলোয় ও আবিষ্কার করলো সর্দারকে।

ফুলমুর পেছনে নদী, সামনে জঙ্গল। আর সেই জঙ্গলের শেষে একটার পর একটা পাহাড় উঠে গেছে। সেই পাহাড়ে উঠছে সর্দার। ছোটো মাঝারি সব পাহাড় ছাড়িয়ে এবার বৃহৎএর দিকে এগোচ্ছে। হঠাৎ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলো একটা মস্ত সাদা ভিহু, (ভালুক)। নিঃশব্দে এগোতে লাগলো সর্দারের দিকে। পর্দা যেন একটা অদ্ভুত আত্মমগ্নতায় আচ্ছন্ন হ'য়ে চলেছে। কোনোদিকে নজর নেই, শুধু বৃহৎ পর্বতের উঁচু চূড়োটাই ওর লক্ষ্য।

ফুলমু প্রাণপণে চীৎকার ক'রে উঠলো। কিন্তু গলা দিয়ে একফোঁটা স্বর বার হলো না। ছুটে যেতে চাইলো, পা নড়লো না। হাত দুখানা পর্যন্ত নাড়াতে পারছে না। সমস্ত শরীর কাঠ। কী নিদারুণ নিঃসহায় অবস্থা তখন ফুলমুর। তীব্র আতঙ্কে বিহ্বল হ'য়ে তীরপাখির মত স্তব্ধ হ'য়ে তাকিয়ে আছে। ভালুক আর সর্দারের ব্যবধান অল্প হ'তে হ'তে অল্পতর হ'য়ে উঠলো। আর দেরী নেই। আর বোধহয় মুহূর্ত দুই তিন পরেই ভয়াল ভালুক তার নখর থাবা নিয়ে লাফিয়ে পড়বে সর্দারের ঘাড়ের ওপর। ঠিক সেই মুহূর্তে ফুলমুর কণ্ঠ দিয়ে বেরিয়ে এলো একটা অবরুদ্ধ আর্ত চীৎকার। সেই তীক্ষ্ণস্বর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হ'য়ে ওপর দিকে উঠে গেলো।

পর্দা আচমকা ঘাড় ফেরানোর সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়ে পড়লো পাহাড়ের শীর্ষদেশ থেকে,—তারপর চোখের নিমেষে, পাহাড়ের সীমাহীন অতল গহ্বরে মিলিয়ে গেলো পর্দার বিশাল শরীরটা। ভালুক এবার তীরবেগে ছুটে আসছে ফুলমুর দিকে। ফুলমু নড়লো না, চড়লো না, পাথরের মত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। ভালুকের ঘুরন্ত কমতে কমতে একেবারে কমে এলো। তারপর ভালুক তার বিরাট শরীর নিয়ে লাফিয়ে পড়লো ফুলমুর ওপর।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে ঘুম ভেঙে গেলো ফুলমুর।

কী ভয়ংকর স্বপ্ন! ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে ফুলমুর। নিশ্বাস-প্রশ্বাসগুলি যেন গিট পাকিয়ে গেছে; মন্ কেলতে পারছে না ও।

তার একটু পরেই ফুলমু এ ঘরে এসে দেখে, পর্দার বিছানা গোটানো, আর পর্দা ঘরে

নেই। ওর বুকের টিপ্‌টিপানি তখনো কমেনি। দু'হাত দিয়ে বুক চেপে ধরে, জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ও চুপমুখে সর্দারের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো।

সকাল হলো। বেলা বাড়তে লাগলো। বাইরে একেবারে চুপ হ'য়ে, ভেতরে ভেতরে ছট্‌ফটাতে লাগলো ফুলমু। অবশেষে কর্দারুচাচার হাঁকডাকে নিজেকে খানিকটা ধাতস্থ করলো।

যন্ত্রচালিতের মত চুলো ধরালো, জল বসালো, চা বানালো, কিন্তু সবই ঢিমে তেতালায়। তারপর চা খেতে গিয়ে দেখলো, গিলতে পারছে না। কেমন যেন একটা অস্বস্তি ঘম্ আটকানো ভাব হয়েছে ওর।

তবু ও নিজের মনে বারে বারে উচ্চারণ করলো, আর জোর ক'রে জিইয়ে রাখলো সে ইচ্ছেটা,—আজ ও চাষায় যাওনা হবে নিশ্চয়ই।

পর্দা যখন ঘরে ঢুকলো, বোদ কড়কড়ে হয়ে গেছে। ফুলমু এতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে, ওখানে দাঁড়িয়ে, কর্দারুচাচার বারচারেক চিলম ধরিয়ে, লাকড়ি কেড়ে, চুলোয় ডাল বসিয়ে—নিজের পোঁটলাটা বেঁধে ফেলেছে।

পর্দা ঘরে ঢুকতেই ফুলমুর সঙ্গে চোখাচোখি হ'য়ে গেলো। ফুলমু অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলো, ঠিক সেই প্রথমদিনের দেখা পর্দা, যেন ওর চোখের সামনে দাঁড়ালো। সূর্যের তেজী রোদ সারা অঙ্গে মেখে নিয়ে যেন ঘরে এলো সর্দার। চোখ-মুখ সমস্ত শরীর যেন ঝকমকে উজ্জ্বল। ফুলমুর চোখমুখও আনন্দে ঝিকিয়ে উঠলো। বললো, "সর্দার! আমার টিকিট কেটে এনেছো?"

পর্দা জবাব না দিয়ে ফুলমুর কপালের কাটা দাগের দিকে তাকালো। এখনো ফোলা আছে যথেষ্ট। গতরাত্রের সমস্ত কথা মনে প'ড়ে গেলো। সমস্ত মনটা একটা বোবা ধিক্কারে ভারি হ'য়ে উঠলো।

"সর্দার, চাষায় গাড়ি ক'টায়? দেরী হ'য়ে গেলো না তো?"

পর্দা ফুলমুর চোখের ভেতর চাইলো।

চাষায় যাওয়ার কথা বলাতে, এই মেয়েই না কাল রাত্রে কেঁদে আকুল হয়ে উঠেছিলো। মুখ আড়াল ক'রে চোখের জল লুকিয়ে চলে গেলে কী হবে, পর্দা বাঁধভাঙা অশ্রুর বন্যা দেখে ফেলেছিলো, তারপর শুনেছিলো মধ্যরাত্রি পর্যন্ত ফুলমুর কোঁপানী।

চোখের ভেতর দিয়ে ফুলমুর মনটা যেন পড়তে চেষ্টা করলো পরমরাজ। খুশি হলো ফুলমুর সহজ-সুন্দর মুখের চেহারা দেখে। মন হাতড়ে দরকার নেই আর। হাসিমুখে বললো, "আজ তো গাড়ির আর সময় নেই দিলরাজ, কাল নিশ্চয়ই টিকিট কেটে আনবো।"

"ঠিক আছে—" ফুলমু লাফিয়ে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিলো, কর্দারু কাশতে কাশতে হাত নেড়ে বাধা দিলো ওকে।

"দিলরাজ, শোন বেটা—।" প্রাণপণে কাশিটাকে থামিয়ে কর্দারু জড়ানো গলায় বললো, "চাষায় টিকিট দিয়ে তোর হবে কী?"

"গাঁয়ে ফিরে যাবো—" ফুলমু বললো।

"সে কী! তোকে পর্দা বুঝি এখনো কিছু বলেনি? তুই তো বরাবরের মত কাওড়ায় থেকে যাবি—"

"কেন ?"

"এই সামনের মাসেই মান্‌তিয়ার সঙ্গে সাদী দিয়ে দেব তোর। মানতিয়ার বাবা খুব টাকা পয়সাআলা লোক। আর ঐ তো একটা সেড্ কি, আখেরে তোরই হ'য়ে যাবে সব। তেজরামকে বলেছি সকালে, সে খুব রাজি; আর মান্‌তিয়াও হেসে হেসে বুঝিয়ে দিয়েছে—ও-ও খুব রাজি।"

এতবড় একটা আনন্দ সংবাদে ফুল্‌মুর চোখমুখ একফোঁটা উজ্জ্বল হলো না দেখে, বুড়ো যেন বেশ একটু অবাকই হলো। বললো, "তোর ভাইয়া পর্মাও এ বিয়েতে খুব খুশি হ'য়ে মত দিয়েছে—"

"কে? পর্মার মত দিয়েছে!" ফুল্‌মু চোখ তুলে পর্মার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলো।

পর্মা হেসে কেলেই সামলে নিয়েছে। চোখ দিয়ে কি যেন বোঝাতে চাইলো ফুল্‌মুকে। এবং ফুল্‌মু যে ঠিক বুঝে নিয়েছে, তা তার পরের কথাতেই বোঝা গেলো।

কর্মাকর দিকে চেয়ে একেবারে নিরীহ মুখ ক'রে বললো, "চাচাজী, তুমি আমাকে খুব একটা খোশখবর দিলে। তোমাকে আজ রাত্রেই আমার মাংস রান্না ক'রে খাওয়াবো। কিন্তু গাঁয়ে আমাকে একবার যেতেই হবে। যেটুকু জমি-জিরেত আছে, ওখানে ফেলে রেখে আর কী লাভ হবে? সব বেচে দিয়ে, কাওড়ায় এসে একেবারে পাকা ভাবে বাস করবো।"

খুব খুশি হয়েই ফুল্‌মুর প্রস্তাবে সায় দিলো কর্মাকর। আর রাতের মাংসটা যাতে ফসকে না যায়, সেজন্য আবার তার উল্লেখ করলো, "কাল কাঙ্‌গুজোড়া ক'টাকায় বেচেছিলিরে দিলরাজ? তা দিয়ে আজও কী মাংস কেনা যাবে?"

ফুল্‌মু জবাব দেবে কী, ওর মুখ শুকিয়ে ক্যাকাসে হ'য়ে গেলো।

পর্মা এগিয়ে এসে একেবারে ফুল্‌মুর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালো. "কা'র কাঙ্‌গু দিলরাজ?" পর্মার গলা গম্ভীর।

"ওটা আমার ছিলো। একদম পুরোনো হ'য়ে যাচ্ছে হ'য়ে গেছলো কিনা, তাই বেচে দিলাম। মান্‌তিয়াটা তো ভারি ইয়ে—এ কথাটা আবার চাচাজীর কাছে বলার কী ছিলো?" খুব উদাসীন গলায় ফুল্‌মু কাঙ্‌গু-বিক্রীর প্রসঙ্গ শেষ করলো বটে, কিন্তু শেষের দিকে ওর গলা একটু কেঁপে গেলো।

পর্মা কিছু বললো না। শুধু ফুল্‌মুর চোখের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে, সরে গিয়ে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

ফুল্‌মু চলে গেলো সেখান থেকে। একটু পরে ধূমায়িত চায়ের বাটি হাতে নিয়ে পর্মার পেছনে এসে দাঁড়ালো, "চা আমার লাগবে না—" জানলা দিয়ে পথের দিকে চোখ মেলে জবাব দিলো পর্মা।

চায়ের বাটি হাতে নিয়ে ফুল্‌মু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো।

পর্মা টের পেলো ফুল্‌মু চলে যায় নি। গরম চা হাতে নিয়ে তেম্‌নি দাঁড়িয়ে আছে ওর পেছনে। কিন্তু এখন ওর কোনোদিকে নজর দেবার সময় নেই। পথের কোণাকুণি বাঁকা বাড়িটাকে নিরীক্ষণ করছে।

—সত্যিই তো ভাববার মত, কেন অমন মজবুত বাড়িটা হাঁটু ভেঙে পড়েছে। বাড়িটার দিকে চেয়ে চেয়ে কারণ বার করবার চেষ্টায় আছে পর্মা।

সামনের রাস্তাটা ঐ বাঁকাবাড়ির গা ঘেঁসে ঘুরে গিয়ে পেছনের রাস্তায় গিয়ে মিশেছে। পর্ণা নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে বাড়িটার দিকে। বাড়িটার ট্যারা হ'য়ে যাওয়া রহস্য কিছুতেই ও বা'র করতে পারছে না। বাড়িটার পাশে কালোপাহাড়ের মত একটা ভাঁসা (মহিষ) দাঁড়ানো। সামনের আবর্জনার স্তূপ থেকে বাসিন্দেরা তরকারীর খোসা বার ক'রে খাচ্ছে। আশ্চর্য! সেই ভাঁসাটাকেও মনে হচ্ছে বেঁকা। তারপরই বাড়িটার বাঁকাত্বটুকু বার ক'রে ফেললো পর্ণা।

—ও দিকের জমিটারই এক দিক ধসে নেমে গেছে। তবু···, তবু এখনো ঘুলমু দাঁড়িয়ে আছে! আর কিসে এখন মন দিতে পারে পর্ণা?

কেন? দূরে আকাশটাকে ফুঁড়ে ঐ যে মাথা তুলে আছে চোঙাটা! গাঢ় কালো ধোঁয়া বার ক'রে আকাশের নীল চেহারাটাকে বদলে দিচ্ছে, বিষিয়ে দিচ্ছে,—ওটা তো বেশ দেখার মত জিনিষ।—কী কলের চোঙা ওটা?

কর্ণাক তার কলিজা (হুঁকো) নিয়ে ব্যস্ত ছিলো কতক্ষণ, এখন নজরে প'ড়ে গেছে, "আরে পর্ণা, দেখছিস কি,—আগে চা তো খেয়ে নে, জুড়িয়ে গেলো যে—" পর্ণা ঘুরে দাঁড়ালো। চোখে মুখে রাশি রাশি বিস্ময় এনে বললো, "সেকী! দিলরাজ! তুমি এখনো দাঁড়িয়ে কেন? আমি তো ব'লে দিয়েছি, চা আমি খাবো না—" কর্ণাকর দিকে তাকালো পর্ণা।

"চাচা! কাল দুর্গের ভেতর একটা ভাঙা মসজিদ দেখলাম, সেটার কোনো নাম আছে নাকি? কে বানিয়েছে এই মসজিদ?" কর্ণাক হুলমুর চা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ভুলে গেলো, বললো, "ওর বোধহয় কোনো নাম ছিলো না, শুনিনি তো কারো কাছে। মসজিদটা তৈরী হয়েছিলো সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশে। কাল কড়ারোদে কাঙড়া দুর্গ ভাল ক'রে দেখা হয়নি। একদিন বিকেলের দিকে যাই চল্। সব অন্ধি সন্ধি দেখিয়ে দেব। তুই গাইড হবি বলছিলি, তার বন্দোবস্তো করবো নাকি?"

"দেখি এখনো মন স্থির করিনি। আর কয়েকদিন প'রে বলবো।"

"সর্দার···!" দুবার চোঁক গিলে আস্তে আস্তে ডাক দিলো হুলমু। পর্ণা ভুরু কুঁচকে বড় একটা ধমক দিতে যাচ্ছিলো, কিন্তু হুলমুর দিকে তাকিয়ে সমস্ত উষ্মা মিলিয়ে গেলো। নিষ্পাপ, পবিত্র, অনাঘ্রাত সুন্দর একটি যৌবন ওর সামনে দাঁড়ানো, আর তার কোলা কোলা দীঘল চোখ দুখানিতে অনেক ভাষা-ভরা করুণ মিষ্ট হাসি।

—রাগ করোনা, আমার ওপর তুমি আর রাগ করোনা-, হুলমুর চোখদুটি অনুনয় করছে।

পর্ণা হাত বাড়ালো চা নেবার জন্য। চায়ের বাটি পর্ণার হাতে দিতেই, এক ঝলক হাসি হুলমুর সারা চোখেমুখে ছড়িয়ে পড়লো, চমক্ লাগালো। এ হাসির চেহারা আলাদা, অনেক ঐশ্বর্য এ হাসিতে।

পর্ণা অবাক হ'য়ে চায়ে দীর্ঘ একটি চুমুক দিলো।

: এমন হিম-শীতল উপেক্ষার ভাব দেখেও কেউ এমন ক'রে হাসতে পারে!

হুলমু রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলো। আর কর্ণাক কাঙড়া দুর্গের খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করতে লাগলো মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে।

রোদের তেজ একেবারে নেই। অথচ নরম আলো আলো ভাব। আকাশে নানা রঙের ঘটা—লাল, হলুদ, বাদামী, পাটকিলে। যত রং, তত বাহার, দিনান্ত আকাশটাকে একটার পর একটা, কত রঙে যে রঙিয়ে যাচ্ছে। একটা রঙের শেষ হওয়ার আগেই, আর একটা রঙের শুরু, তার শেষ মেলাবার আগেই আবার আর একটা।

এমনি সময় পর্ণা স্রুতপায়ে চড়াই ভাঙছিলো। দুপুর শেষ হবার আগেই বাড়ি থেকে বার হ'তে চেয়েছিলো, কিন্তু এখন বিকেল শেষ হ'তে চললো।

খাওয়া দাওয়ার পর এমন গল্প জেঁকেছিলো কর্ণারু, সমস্ত হিমাচলী অঞ্চলটাই ওর যেন নখ-দর্পণে,—পর্ণা আগ্রহী মন নিয়ে সে সব শুনছিলো। গল্পে গল্পে কখন যে বেলা কাবার হ'য়ে গেছে টেরই পায়নি।

কাল কর্ণারুচাচার চোখ দিয়ে কাঙড়া দুর্গ দেখেছিলো, সে দেখা ওর দেখা হয়নি। আজ নিজের চোখ দিয়ে, নিজের মন ক'রে দেখবে। কাঙড়া দুর্গের ভেতরে ঢুকে মনটার লাগাম ছেড়ে দেবে। যেখানে যেতে চাইবে মন, তার পিছু পিছু যাবে ও।

প্রায় সিকিপথ চলে এসেছে, এমন সময় পেছন থেকে ডাক শুনলো, "সর্দার! একটু আস্তে হাঁটো—"

মুখ ফিরিয়েই পর্ণা হতবুদ্ধি হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেলো।

ফুল্লু প্রাণপণে ছুটে ছুটে ওপরে উঠে আসছে। আর ওর আহ্বানের মধ্যে একটা অদ্ভুত ব্যাকুলতা।

ফুল্লু প্রায় রুদ্ধশ্বাসে উঠে এলো পর্ণার কাছে। তারপর বুক চেপে ধ'রে জোরে হাপরের মত শ্বাস টানতে লাগলো।

"কী হলো? কর্ণারুচাচার কিছু হয়েছে নিশ্চয়ই। দুপুরে যখন অতগুলো রুটি খেলো, তখনই জানি—" পর্ণার গলায় উদ্বেগ।

নিঃশ্বাস প্রশ্বাস তখনো সহজ হয়নি ফুল্লুর। মাথা নেড়ে জানালো,—কর্ণারুচাচার কিছু হয়নি।

"তবে?" পর্ণা অবাক হ'য়ে ফুল্লুর টুকটুকে লাল হ'য়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। এমন অধীর উন্মত্তের মত ছুটে আসার কারণ কী তাহলে! বেশবাস পর্যন্ত এলোমেলো—বিস্রস্ত।

ফুল্লু ভাবতে লাগলো, সর্দারকে কী বলি! ঐ বিশ্রী দুঃস্বপ্নের কথাটা কী আর মুখ দিয়ে উচ্চারণ করা যায়। তাছাড়া, আরো আছে, সর্দার যার হবার সময় উঠোনের বুড়ো খেড়াকগাছ থেকে তিনবার ডাক দিয়ে উঠলো উল্লু (পেঁচা), আর কালো একটা ধুম্রলোচনা বেড়াল বাইরের দরজার পাশে বসে কাঁদতেই থাকলো। এত সব যেখে শুনে, কেমন ক'রে আমি আর ঘরে থাকতে পারি! ফুল্লুকে চুপ যেখে পর্ণা আবার জিজ্ঞেস করলো, "ফিলরাজ, কী ব্যাপার?"

ফুল্লু ভাবলো, সর্দার কী ভুলেও কোনো এক মুহূর্তে ওকে ফুল্লু ব'লে ডাকতে পারে না! থাকলে, ও নিয়ে মন খারাপ ক'রে লাভ নেই কোনো, এখন সর্দারকে উত্তর কী দেয়া যায়। ফুল্লু একটু ভেবে নিয়ে, হেসে হেসে পর্ণার মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো।

"সর্দার, কালই তো আমি চলে যাচ্ছি, তাই ভাবলাম, যাওয়ার আগে দুর্গটা আর একবার ভাল ক'রে যেখে যাই। হয়তো কাঙড়ায় আর কোনোদিনও আসা হবেনা—"

পর্মা বুঝলো, ফুলমু কি যেন একটা লুকোচ্ছে। ওর মেজাজটা চিড় খেলো একটু, কিন্তু সেটাকে প্রকাশ হতে দিলোনা। বললো, "আচ্ছা এসো—"

পর্মাকে অগত্যা গায়ের গতি কিছুটা কমাতেই হলো। পাশাপাশি উঠতে লাগলো ওরা। ওরা টেরও পেলোনা, দুটি শ্বেতাঙ্গ মূর্তি অনেকখানি দূরে দূরে থেকে ওদের অনুসরণ ক'রে চলেছে। কোনো কথা নেই। দু'জনে চুপচাপ চড়াই ভাঙছে। দুর্গের প্রথম তোরণে পৌঁছোতে যখন অল্প কিছু বাকী, তখন ফুলমু ঠোঁট খুললো, "সর্দার, কাল তো আমি চলে যাচ্ছি- "

পর্মা অন্যমনস্ক হ'য়ে কী যেন ভাব'ছিলো, ভাবতে ভাবতেই বললো, "হ্যাঁ। কালই চলে যাও। আর দেরী করা ঠিক হবেনা—" ফুলমুর গলাটা ধরে এলো, "আমি চলে যাব, তোমার একটুও কষ্ট হবে না সর্দার?"

"না। কষ্ট হবে কেন?" একটু বেশীরকম আশ্চর্য হবার ভান করলো পর্মা।

ফুলমু খতমতো খেয়ে চুপ ক'রে গেলো। গলাটা সহজ হ'তে সময় লাগলো একটু, তারপর বললো, "কর্দারচাচার বাড়িতে তো আর কোনো লোক নেই, হয়তো তোমাকে দিয়েই রান্না করাবে—তোমার কষ্ট হবে খুব—"

"না, সেজন্য ভেবোনা। বাজার থেকে কিনে-কেটে একটা ব্যবস্থা আমি করে নেব—" খুব হাল্কা বিষয় নিয়ে মানুষ যে সুরে কথা বলে, সেইভাবে এ প্রসঙ্গ শেষ করলো পর্মা।

ফুলমু একটা নিঃশ্বাস ফেললো। সেই নিঃশ্বাসের শব্দ কানে যেতেই, এতক্ষণ পর পর্মা যেন সজাগ হলো নিজেকে।

"তারপর দিলরাজ! গাঁয়ে ফিরে তুমি এখন কী করবে?"

ফুলমু ভাবলো, বলে, তা শুনে তোমার আর কী লাভ হবে? যা আমার মন চাইবে, তাই করবো। কিন্তু বললো, "সর্দার, তুমিই ব'লে দাও, কী করা আমার দরকার।" কয়েক মুহূর্ত বিরতি, তারপর পর্মা বললো, "তুমি যদি নাসুকে বিয়ে কর, সবচেয়ে তোমার পক্ষে সেটাই ভাল হবে, নাসুকে কোনোমতেই যখন ঠেকাতে তুমি পারবেনা, তখন তো ওর বউ হওয়াই ভাল। নয়নরাজ খুব নামকরা জোতদার, তোমার কোনো অভাব থাকবেনা, তোমার আত্মা-নাবীরও কষ্টের আসান হবে। সব দিক দিয়ে এর চেয়ে ভাল আর কিছু হবে না—"

ফুলমু মাটির দিকে চোখ রেখে বললো, "তাই হবে সর্দার, আমি নয়নরাজকেই বিয়ে করবো—"

পর্মার গলায় একটু উত্তেজনা এলো, "তুমি সাধুবাবার নাম নিয়ে ঘোঁটপাকিয়ে রেখেছো বটে, কিন্তু ওতে কিছু এসে যাবেনা। নাসুকে ডেকে খুলে বলে দিও,—তোমার তখন সাধীর ইচ্ছে ছিলো না, তাই ও কথা বানিয়ে বলেছো, তাহলেই সব গোলমাল মিটিয়ে দেবে নাসু।"

ফুলমু একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বললো, "তাই বলবো।"

(ক্রমশঃ)

বীরবলের কৌতুক

বররুচি

বীরবলের সঙ্গে সম্রাট আকবরের প্রথম সাক্ষাতেই বীরবল একটি কৌতুকপ্রদ এবং সেই সঙ্গে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার সৃষ্টি করেছিলেন।

আকবরের সভায় যোগ দেবার আগে বীরবল ভিনগাঁয়ের এক জায়গীরদারের প্রধান পার্শ্বচর ছিলেন। জায়গীরদারের নানা কাজে তিনি এমন অসামান্য বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন যার জন্যে তাঁর খ্যাতি সম্রাটের কানেও পৌঁছেছিল।

সম্রাট শুনলেন, বীরবল শুধু যে একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাই নয়, তাঁর পাণ্ডিত্যও অগাধ এবং রসরসিকতায় তাঁর জুড়ি নেই।

সম্রাট ভাবলেন, এ হেন ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর তো পরিচয় করা দরকার। এবং যদি দেখেন যে তিনি সত্যিই এমন সব দুর্লভ গুণের অধিকারী তাহলে তো তাঁর দরবারেই তাঁর স্থান, জায়গীরদারের খোঁয়াড়ে নয়।

আকবর আদেশনামা পাঠালেন বীরবলের কাছে। সম্রাট আকবর তাঁর দর্শন ইচ্ছা করেন।

চিঠি পেয়ে বীরবল তো প্রথমটায় ঘাবড়ে গেলেন। পত্রবাহককে জানালেন, শীঘ্রই তিনি সময়মত সম্রাটের কাছে হাজির হবেন।

• • • •

সম্রাট আজ দরবারে বসেছেন। দরবার সেদিন অবারিতদ্বার।

বহু দর্শনার্থীর আনাগোনা। বহু প্রার্থী।

সম্রাট সেদিন কল্পতরু।

রাজপ্রাসাদের সামনে এসে বীরবল দাঁড়ালেন। লোকজন ভিতরে যাচ্ছে আসছে। সেই পথ দিয়ে সিংহদ্বার পেরিয়ে ভিতরে ঢুকলেন।

দরবার-মহলের বড় দরজায় সশস্ত্র রক্ষী দাঁড়িয়ে আছে। বীরবল সেখানে পৌঁছাতেই রক্ষী তাঁর পথরোধ করলে।

তাঁর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে দরবাররক্ষী বুঝে নিলে আগন্তুক ভিনদেশী। তাছাড়া পোষাক পরিচ্ছদের যা বাহার তাতে তেমন কোন পদস্থ লোকও নয়। বললে—কি চাও?

বীরবল জানালেন—তিনি সম্রাটের দর্শনপ্রার্থী।

মাথা নেড়ে রক্ষী বললে—আজ আর হবে না। দেরী করে এসেছো। অন্য দিন এসো।

বীরবল বললেন—কিন্তু আজই যে আমার দেখা করবার কথা। পথ ছাড়ো ভাই। আমি ভিতরে যাই।

মৃদু হেসে রক্ষী বললে—শুধু মুখের কথায় হয় না। কিন্তু ছাড়ো তো পথ ছেড়ে দিই। না হয় তো পথ রোধো।

খুব চাষ। কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে বীরবল বললেন—বুঝেছি। পাওনাদের খুশী করে তবে দেবদর্শন পাওয়া যায়। তুমি কিছু অন্যায় বল নি। কিন্তু ভাই আমার কাছে তো কিছু নেই আজ।

—তাহলে কাল এসো।

—আজ হয় না?

—না। যারা ভিতরে যাচ্ছে সবাই কিছু কিছু দিয়ে যাচ্ছে। আর তুমি একেবারে মুক্তং···

বীরবল বললেন—না না মুক্তং কেন। শোন ভাই। তোমার সঙ্গে একটা রফা করি।

কৌতূহলী হয়ে রক্ষী বললে—রফা। কি রকম শুনি।

বীরবল আবার কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলেন। তারপর বললেন—সম্রাটের কাছে আমার কিছু প্রার্থনা আছে। আমার বড় অর্থাভাব। তাই আমি তাঁর কাছে কিছু অর্থ প্রার্থনা করব। নিশ্চয় আমার প্রার্থনা অপূর্ণ থাকবে না।

মাথা নেড়ে রক্ষী বললে—না, তা থাকবে না। বিশেষ করে বিদেশী দুঃস্থ মানুষের আর্জি সম্রাট কখনো নামঞ্জুর করেন না।

বীরবল বললেন—বেশ, তাহলে আমি তোমায় কথা দিচ্ছি, সম্রাটের কাছে আমি যা পাবো তার অর্ধেক তোমায় দেব।

—কিন্তু···

বীরবল তাড়াতাড়ি বললেন—না, না, এর মধ্যে আর 'কিন্তু'র কাঁটা তুলো না। দেখ, আমায় ফিরিয়ে দিয়ে তো তোমার কোন লাভ হবে না। তার চেয়ে আধা-আধি বখরা কি ভাল নয়?

কি ভেবে রক্ষী বললে—আচ্ছা, যাও। খবরদার যেন বেইমানি করো না।

—পাগল, তোমার সঙ্গে কখনো বেইমানি করতে পারি। বলে বীরবল দরজা পার হয়ে, প্রকাণ্ড চত্বর অতিক্রম ক'রে সভা প্রকোষ্ঠে ঢুকলেন।

তাকিয়ে দেখলেন সামনে। মহার্ঘ আসনে প্রশান্তকান্তি ব্যক্তিত্বদীপ্ত সম্রাট আকবর বিরাজ করছেন। সুসজ্জিতা সুন্দরীরা দুপাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে ব্যজন করছে। তাঁর রত্নখচিত আলবোলার স্বর্ণাভ নল দিয়ে বাদশাহী তাম্রকূটের যে ধোঁয়া নির্গত হচ্ছে তার মধুর গন্ধে সভাস্থল আমোদিত হয়ে উঠেছে।

দর্শনার্থীর ভীড় কমে গেছে। দু'একজন যারা ছিল তারাও চলে গেল।

বীরবল ধীরে ধীরে সম্রাটের কাছে গিয়ে নতজানু হয়ে অভিবাদন জানালেন।

সম্রাট মুখ তুলে তাকালেন। উভয়ের দৃষ্টি সম্মিলিত হল। সেই দৃষ্টির মধ্যে দিয়েই যেন পরস্পরের পরিচয় হয়ে গেল।

—ভিনদেশী বলে মনে হচ্ছে? সম্রাট শুধালেন।

—মহানুভব সম্রাট! আমি মথুরার গ্রামের বীরবল শেঠ। আপনার হুকুম পেয়ে হাজির হয়েছি।

বীরবল শেঠ! সম্রাট উচ্চকিত হলেন।

—আসুন। আরও কাছে আসুন। আমি তো এই ক'দিন ধরেই আপনাকে প্রত্যাশা করেছিলাম।

কাছে এসে বসলেন বীরবল। আলাপচারী সুরু হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সম্রাট বুঝলেন, একটি আসল রত্নের সন্ধান তিনি এতদিনে পেয়েছেন।

বীরবল বুঝলেন, লোকে যে সম্রাট আকবরকে দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা বলে, তা মিথ্যা নয়।

কথায় কথায় আকবর বললেন—আজ আপনি একটি বিশেষ দিনে আমার কাছে এলেন। তাই আজ আমার আনন্দ আরো বেশি বোধ হচ্ছে।

বীরবল বললেন—আজ আপনার কাছে বহু দর্শনার্থী এসেছিল…

—সেজন্যে নয়। আকবর বললেন—আজ আমার জন্মদিন। সকাল থেকে মনে মনে ভাবছিলাম, আজকের এই দিনটি কোন শুভসার্থকতায় পরিণতি লাভ করবে।

মুগ্ধ হলেন বীরবল। বিহ্বল বোধ করলেন। মাথা নুইয়ে বললেন—খোদাবন্দ! আপনি নিজের দেবদুর্লভ মহিমায় অহরহ সার্থক। শ্রীরামচন্দ্রের সাগর সঙ্গমে কাঠবিড়ালীর যে সার্থকতা আমাদেরও তাই। আজ আমিই চরিতার্থ হলাম। আমার জন্ম সার্থক হল।

আকবর বললেন—আপনাদের শ্রীরামচন্দ্র সকল মানুষের নমস্য! প্রজাপুঞ্জকে তাঁর অদেয় কিছু না। অতবড় আদর্শ আমরা পালন করতে পারি না। তাহলেও আজ আপনি প্রথম আমার কাছে এলেন। আমার রীতি আছে, প্রথম যিনি আসেন, তাঁর প্রথম প্রার্থনা আমি সাধ্যমত পূরণ করি। বলুন পেঠজি! আপনার কি প্রার্থনা?

বীরবল উত্তর দিলেন—দেবদর্শনের অক্ষয় পুণ্য অর্জন করলাম খোদাবন্দ্! সেই সঙ্গেই আমার সমস্ত প্রার্থনা পূর্ণতা লাভ করল। আর কোন প্রার্থনা নেই, সম্রাট, তবে……

থামলেন বীরবল। উৎসুক কণ্ঠে সম্রাট বললেন—বলুন। কোন কিছু যদি চাইবার থাকে, আপনি বিনা দ্বিধায় বলুন।

ক্ষণেক চিন্তা করে বীরবল বললেন—একান্তই যদি প্রার্থনা করতে হয় সম্রাট, তবে একটি প্রার্থনা জানাবো।

—কি সে প্রার্থনা?

বীরবল বললেন—আপনার পাশে যে প্রতিহারি দাঁড়িয়ে আছে তাকে হুকুম করুন, সে আমার পিঠে বিশ ঘা বেত মারুন। এই আমার প্রার্থনা।

একি আজব আর্জি। সম্রাট বিস্ময়ে বিমূঢ় বোধ করলেন। বীরবল বেতের প্রহার চান।

—এ কি বলছেন পেঠজি। আপনাকে বেত মারবো!

—হ্যাঁ সম্রাট। এই আমার প্রার্থনা। প্রার্থনা যখন জানিয়েছি তখন তা পূর্ণ করুন সম্রাট।

—একি আপনার স্থির সিদ্ধান্তের প্রার্থনা?

মাথা নেড়ে বীরবল বললেন—হাঁ খোদাবন্দ্।

উপায়ান্তর না দেখে সম্রাট প্রতিহারিকে বেত আনতে বললেন।

বেত হাতে প্রতিহারি এসে দাঁড়াল। সম্রাট তাকে কাছে ডেকে বললেন—হুঁসিয়ার। খুব আস্তে আস্তে মারবে!

প্রতিহারি ঘাড় নাড়লো।

বিস্মিত স্তব্ধ সভাস্থলে সে এক অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা ছিল।

বীরবল পিঠ পেতে দাঁড়ালেন। আর প্রতিহারি তাঁকে গুণে গুণে বেত মারতে লাগল।

এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ……

—বাস। থামো। বীরবল বললেন—ক্ষণেক অপেক্ষা কর প্রতিহারি।

বেত থামল। বীরবল সম্রাটের দিকে ফিরলেন।

—বলুন শেঠজি। আর বাকি, কি বলেন।

মাথা নেড়ে বীরবল বললেন—তা নয় সম্রাট। অন্য কথা বলবার আছে।

বলুন বলুন।

বীরবল বলতে লাগলেন—আজ আমার এই যে প্রার্থনা আর এই যে পুরস্কার, এর একজন ভাগিদার আছে সম্রাট।

—সে আবার কি?

বীরবল বললেন—সত্য কথাই বলছি সম্রাট। এখানে প্রবেশ করবার আগে একজনের সঙ্গে আমার সর্ত হয়েছে যে আজ আমি আপনার কাছে যা পাবো তার অর্ধেক তাকে দিতে হবে। অতএব কুড়ি ঘা বেতের বদলে যা তার প্রাপ্য।

এই বলে তিনি দরবারের রক্ষীর সঙ্গে যে কথাবার্তা হয়েছিল আদ্যপূর্বক তা বিবৃত করলেন।

তাঁর সেই বিবৃতি শুনে সভাস্থলে বিস্ময় আর লজ্জার ঢেউ বয়ে গেল, আকবর এক মুহূর্তে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন।

—বটে, তাহলে অনেক দিন ধরেই এই কুকর্ম চলছে। অনেকেই তাহলে এই রকম শোষণের কবলে পড়েছে। হ্যাঁ। তাও সে পাবে বৈকি! তালমতই পাবে। প্রতিহারি, ধরে নিয়ে এসো বেত মিঞাকে।

দরবার রক্ষী তখন বোধ হয় দিবাস্বপ্নে বিভোর ছিল। আজ পাওনা ভালই হয়েছে, আর একটা মোটা পাওনা বাকি। হিন্দু শেঠ কখন্ ফিরবে? ভিতরে গেছে তো অনেকক্ষণ।

হঠাৎ দু'জন প্রতিহারিকে একেবারে তার সামনে এসে তার গায়ে হস্তক্ষেপ করতে দেখে সে বিমূঢ় বোধ করল, তারপর যখন ধাক্কা খেতে খেতে একেবারে খোদ্ সম্রাটের কাছে হাজির হল তখন সে প্রায় বেসামাল।

সম্রাটের আদেশে একজন অমাত্য তাকে তার অপরাধের কথা বিশদভাবে জানিয়ে দিলে।

রোষদীপ্ত নয়নে সম্রাট বললেন—ওকে ওর যথরা তালমত বুঝিয়ে দাও। লাগাও দশ বেত। কুর্তা খুলে নাও ওর।

সম্রাটের অমোঘ আদেশে সেদিন যে শুধু একজন উৎকোচলোভী রাজভৃত্য শাস্তি পেল তাই নয়। বীরবলের সুকৌশল ঘটনা-স্থাপনের কৃতিত্বে রাজদরবারের একটি গুপ্ত কুপ্রথার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়ে চিরতরে তা অবলুপ্ত হল।

এবং সেইদিনই সম্রাট আকবর বীরবলকে তাঁর অন্যতম অন্তরঙ্গ সভাসদ রূপে মনোনীত করলেন।

———

রজত চৌধুরী

চিত্রিতা দেবী

"আমি লোকটা অন্তরে নেহাৎ মন্দ নই। অন্তত আমার তো তাই ধারণা। কিন্তু আমার ব্যবহারে নাকি সেকথার কোন প্রমাণ নেই। আমার নামে এইরকম গুজব সবাই রটায়। এমনকি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুরাও বলে যে, তারা নাকি আজো আমার অন্তরের পরিচয় পায় নি। এই নিয়ে তাদের আড্ডায় যখন তখন অনেক কথারই আলোচনা চলে। আর আমাকে সেখানে হঠাৎ উপস্থিত হতে দেখলেই তারা পরস্পরে চোখ টিপে বলে, কি হে রজত। এবারের নতুন খবর কী বল?

গল্প বানাতে আমার দেরী হয় না। গল্পের জগৎ আমার মধ্যে তৈরী হয়েই থাকে। সত্যে মিথ্যায় মিশে মিশে তারা নানা রঙে বেরিয়ে আসে। ওরা যখন 'ব্রেক গুল, ব্রেক গুল.' বলে হাসির হুল্লোড় বাধিয়ে দেয়, সেই সুযোগে আমি হয়ত পাশের বন্ধুটিকে ডেকে বলি,—"এই হীরেন, শোন দরকারী কথা আছে। দশটা টাকা দিতে পারিস? আমি তোকে কাল. নিদেন পরশু তো ফেরৎ দিতে পারবই।" বন্ধু হয়ত তখনি লাফিয়ে উঠে বলবে, "এইজন্যেই তখন থেকে ভাবছি। সরে বসি কি উঠে পালাই। তোর পাশে বসায় বিপদ অনেক।" আমাকে তখন হাসতেই হয়, হ্যা হ্যা করে,—বলতেই হয়,— "আচ্ছা যা, আজ তোকে না হয় ছেড়েই দিচ্ছি।" কিন্তু ততক্ষণে দেখি ওরা হাসি বন্ধ করে গম্ভীর হবার ভান করতে করতে, যে যার হাতের পাতা পরীক্ষা করতে সুরু করেছে। আমাকে তখন ফিরে আসতেই হয়। সবাই আজকাল আমাকে এড়িয়ে চলতে চায়। আমার ঘনিষ্ঠতাকে ভয় করে ওরা। অবশ্য ওদেরো দোষ দেওয়া যায় না। একটু অন্তরঙ্গতা করেছ কি মরেছ। অমনি হয়ত আমি কিছু একটা চেয়ে বসব। কিম্বা বলব, অমুক বড়লোক তো তোর হাতে ধরা, আমাকে একবার তার কাছে নিয়ে চল না। দেখি যদি একটা হিল্লে করে নিতে পারি।

যদিও হাতের কাজ আমার ভালো। যে একবার দেখেছে সেই উচ্ছ্বসিত হয়েছে। তাই মাঝে মাঝে আমার অমন এক আধটা হিল্লে যে লেগে যায় না, তা নয়। কিন্তু তারপর আবার যে কে সেই। কখন কেমন করে যে ছিটকে চলে আসি। সেই যাকে বলে পুনর্মূষিকো ভব। একেবারে সেই আগের ইঁদুর। যা কিছু ছিল,—টাকা পয়সা, সুখ সৌভাগ্য, সব ইঁদুরের মত কুট্ কুট্ করে কেটে কেটে সারা করেছি।

জন্মেছি তারী এক নামজাদা বংশে। গুণ, যৌবন, মান সম্ভ্রমই নয়, দয়া দাক্ষিণ্য, সাধুতা ও সত্যবাদিতার জন্যেও এবংশের খ্যাতি ছিল। আমার মধ্যেও আমার প্রায়ই মনে হয়, ঐ সব সদ্-গুণগুলো এখনো বেঁচে আছে। কিন্তু যেন নেশা করে পড়ে আছে, মাথা তুলতে পারছে না। পূর্ব পুরুষ কেউ একজন 'রাজা' উপাধি পেয়েছিলেন,—আমার জ্যাঠতুতো দাদা, আজো সেই উপাধি দিব্যি বয়ে বেড়াচ্ছে, অথচ আমার দশা তাখ। ছোটবেলায় কিন্তু পয়সা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছি। বাবা ছিলেন যেমনি দিলদরিয়া, তেমনি বেহিসেবী। তাঁর দামী ক্যামেরা নিয়ে ছোটবেলায় খেলাচ্ছলে ফোটোগ্রাফী শিখেছিলাম। একটু বড় হতেই জার্মানী থেকে খুব নামকরা মেশিন আনিয়ে নিজে

ডেভেলপ করতে শিখেছি। সেই মেশিন আজো চলছে। ছবিতোলার হাত আমার খুব পরিষ্কার, আর তেমনি তীক্ষ্ণ ছবিতোলার চোখ। ভিতরের আত্মশিল্পী মনের মধ্যে দিয়েও ফুটে বেরোয়, একথা সকলেই স্বীকার করে! কিন্তু আমার চোখকে কেউ বিশ্বাস করে না। সবাই মনে করে আমার চোখ রাতদিনই সুযোগের সন্ধানে ঘুরঘুর ঘুরঘুর করে ঘুরছে। এচোখে শিল্পসৃষ্টির আন্তরিকতা ফুটতেই পারে না। অন্তত তাই তো সবাই বলে। শুধু বাইরের সকলেই নয় আমার স্ত্রী পর্যন্ত ঐ কথাই বলে। শুধু আন্তরিকতা নয়, আমার নাকি ভালোবাসাও নেই।

অথচ আমার মনে হয়, ভালোবাসাও আমার মধ্যে যথেষ্টই আছে। কিন্তু শুধু ভালোবাসাতে তো আর পয়সা জোটে না; আরে বাঁচতে হবে তো! সত্যিকথা বললে, জোটে কয়েকটা ফাঁকা উপদেশ, আর মিথ্যে প্রতিজ্ঞা। অথচ মিথ্যের ব্যবসায়ে মন্দা আর হয় না।

কথার দাম আমি অনেক কাল হোল চুকিয়ে দিয়েছি। বেশ জানি যে, সত্যি কথাকে একটু খানি বাঁকিয়ে চুরিয়ে দিলে, অনেক সময়ে বেশ লাভ হয়। রত্নাবলী যাই বলুক, তেমনি করেই ওকেও তো পেয়েছিলুম। সোজা সত্যি কথা বললে, সেকি আর ভাগ্যে ঘটত? তমোনাশবাবু মেয়ের হাত না দিয়ে, সোজা পথ দেখিয়ে দিতেন।

কিন্তু মুস্কিল এই যে, মিথ্যে কথার ফাঁকে মাঝে দুএকটা সত্যি কথা আমিও যে বলে থাকি, একথা কেউ বিশ্বাস করতে পারছে না। সত্যি সেইজন্যেই রত্নাবলী বিশ্বাস করতে পারছে না যে, আমি সত্যিই কাল ক্যাম্পে চলে যাব। ও এখনো বুঝতেই চাইছে না যে আমি সত্যি এয়ার্মেন্টি কমিশনে যোগ দিয়েছি। অবশ্য না দিয়ে আমার কোন উপায়ও ছিল না। যে বিবেকটাকে আমি ছোট বেলা থেকে বেশ পোষ মানিয়ে রেখেছিলাম, হঠাৎ সেটা বেশ যে এমন অবাধ্য অশান্ত হয়ে আমাকে কামড়াতে লাগবে কে জানে। তাই বুঝতে পারছি। যুদ্ধে আমাকে যেতেই হবে, তাছাড়া আর উপায় নেই! যে অন্যায় না জেনে আমাকে করতে হয়েছে, তার প্রায়শ্চিত্ত হিসেবেও অন্তত এটুকু আমাকে করতে হবে। আরে আমার মধ্যে বিবেক যে একেবারেই ছিল না তা তো আর নয়, তবে বড় নিরীহ ভাবে পড়ে পড়ে ঝিমোচ্ছিল এতদিন।"

রজত চৌধুরী নিজেই নাকি এসব কথা হরিশ ভট্টাচার্য্যকে বলে গেছে। হরিশবাবু তাদের পরিবারের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাই শত দোষ সত্ত্বেও রজতের উপরে তাঁর একটা স্বাভাবিক মমতা ছিল। হরিশবাবু সেদিন আমাদের আড্ডায় রজতের গল্প বলতে বলতে, তার নিজের মুখের এই কথাগুলি বলছিলেন।

রজত নাকি সেবারে কি একটা কোম্পানীতে বেশ একটা লাগসই কাজ বাগিয়েছিল। কোম্পানীর প্রচার বিভাগের ফোটোগ্রাফারের কাজ! দার্জিলিংএ যেতে হয়েছিল, চা বাগানের ফোটো তুলতে। ফোটো তোলার কাজ শেষ হয়ে গেল, তবু কিন্তু দার্জিলিং ছাড়তে ইচ্ছে হোল না রজত চৌধুরীর। কোম্পানীর পয়সায় এসেছে! উঠেছে ভালো আস্তানায়। হোটেলটি মনোরম, ব্যবস্থা ভালো, না আছে কাজের চাপ, না আছে ওপর-ওলার হুমকী। সকালে যতক্ষণ ইচ্ছে ঘুমোও! ঘরে ব্রেকফাস্ট আনিয়ে খাও খেয়ে খেয়ে। আবার ঘুমোও। যখন ইচ্ছে বেড়াতে যাও। যা খুসী কর! রজত চৌধুরীর দিন বেশ আনন্দে কাটতে লাগল। আপিস থেকে চিঠি আসে, খুলেও দেখে না! পরপর তিন খানা চিঠি এসে জড়ো হবার পরে চতুর্থ চিঠিটা যখন এল তখন খুলে দেখে, ডিস্‌মিস্‌এর চিঠি।

যাক্ চাকরীটা গেল তাহলে ; ভালোই হোল। কি একঘেয়ে চাকরী, পোষায় না রজতের। যাকগে, আর একটা যোগাড় করে নিলেই হবে। এইবারে রজত চৌধুরীকে একটু চেনা গেল তো? চাকরী চাকরী করে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াবে, বন্ধুদের ব্যতিব্যস্ত করে মারবে, আর চাকরী পেলে দুদিনেই খেয়ে মেখে সবরকমে ফাঁকি দিয়ে চাকরীটি খোয়াবে।

যাইহোক বরখাস্তের চিঠি পেয়ে রজৎ চৌধুরী তার ছোট সুটকেসটা ব্রাউন কাগজ দিয়ে বেশ করে মুড়ে বেঁধে নিল। মনে হোল মস্ত একটা কিসের প্যাকেট যেন। সুটের উপরে ওভার-কোট চড়িয়ে, একহাতে ক্যাম্বেরার কেস, অন্য হাতে কাগজের প্যাকেটটি নিয়ে রোজকার মত বেরিয়ে এল। সুবিধে এই যে হোটেলটা থেকে কয়েক পা নীচে নামলেই রিক্সা পাওয়া যায়। পয়সার পরোয়া না করে রজৎ চৌধুরী সোজাসুজি একটা রিক্সা-ভাড়া করে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড পর্যন্ত নেমে এল। দশদিনের হোটেল বিল বাকী রেখে পালিয়ে গেল, বিবেকের বকুনি না খেয়েই। কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই কোম্পানীকে লিখে তাদের বিল আদায় করে নেবে। কাজেই ওদিক থেকে বিবেকের কামড়া কামড়ি করার কোন মানে হয় না! এবং রজতের বাধ্য বিবেক তা করেও নি।

তবু রজতের মনটা কেমন যেন চুপসে যাচ্ছিল। কিছুতেই তাকে আর টেনে তুলতে পারছিল না রজত চৌধুরী। ট্যাক্সিতে বসে বসে সেই কথাই ভাবছিল। হঠাৎ খেয়াল হোল রত্নাবলীর আর একটি গয়নাও অবশিষ্ট নেই। বড়লোকের মেয়ে দেখেই অনেক ভেবেচিন্তে অনেক কথার প্যাঁচ খেলিয়ে বিয়েটা ঘটিয়ে তুলেছিল রজত। বউয়ের সঙ্গে সঙ্গে সোনাও ঘরে এসেছিল যথেষ্ট। কিন্তু আজ বেচারী রত্নাবলীকে রোজ সোজের ছুগাছি বালা হাতে দিয়ে ঠাট্ বজায় রাখতে হচ্ছে। এখন বউছেলে নিয়ে আবার একবার ভারী বেকায়দায় পড়তে হবে রজতকে। শ্বশুরবাড়ীতেও মুখ দেখাবার যো রাখেনি। সেখানেও শালা শ্বশুর দুজনেই তার সম্বন্ধে ভয় করে। রত্নাবলী বলেছে, যতদিন না রজত সত্যি সত্যি রোজগার করে পুরোপুরি খিতু হয়ে বসতে পারছে, ততদিন আর বাপের বাড়ীতে মুখ দেখাবে না। রজত চৌধুরীর হঠাৎ নিজের ওপরে কেমন যেন রাগ হতে লাগল। চাকরী অবশ্য আগেও রজত চৌধুরী দুচার বার পেয়েছে আর ছেড়েছে। কিন্তু, তখনো তো রত্নাবলীর হাতে কিছু না কিছু মজুৎ ছিল। একবার এক হঠাৎ-সায়েব হওয়া জাত-বনীকে তোষা দিয়ে বেশ কয়েক হাজার মারতে পেরে ছিলো। কিন্তু সে কৌশল আর চলবে না। এখন সবাই ওকে চিনে নিয়েছে। সত্যি নিজের উপরে রাগ হোল রজতের।

আঁকাবাঁকা ঘোরানো রাস্তা ছেড়ে ট্যাক্সি এসে কার্ট রোড ধরল। রজত চৌধুরী ভাবছিলো এ চাকরীটা পাবার আগে কী উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হোত রত্নাবলীকে। একটা মহিলা সমিতির ক্যান্টিনে সারাদিন ধরে খাবার তৈরী করত রত্নাবলী। মাইনে যেটুকু পেত তাতে তিনজনের কত-টুকু সুরাহা হতে পারে। দিনরাত রত্নাবলী জপ করেছে আর প্রার্থনা করেছে, জ্ঞান, ভক্তি ইত্যাদি সব বড় বড় জিনিষের জন্যে নয়, কেবল রজতের একটা চাকরীর জন্যে। তাই একাজটা পেয়ে রত্নার পা ছুঁয়ে শপথ করেছিল রজত চৌধুরী। এবারে সে খিতু হয়ে বসবেই। আহা! বড় ভুল হয়ে গেছে। আপিসের চিঠিগুলি খুলে দেখা উচিত ছিল। ফস্‌কে যাওয়া চাকরীটা রজতকে বারবার হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগল। রজত চৌধুরীর মনের মধ্যে রত্নাবলীর প্রার্থনারা মাথা ঠুকতে লাগল—আর কিছু না, শুধু মাত্র একটা লাগসই চাকরী! আর একবার সুযোগ পেলেই রজত চৌধুরী দেখিয়ে দেবে। জীবনটাকে আগাগোড়া বদলে ফেলে নতুন ভাবে গড়ে নেওয়া যায় কিনা।

আশ্চর্য এই যে রজত চৌধুরীর প্রার্থনা কখনো বিফল হয় না। সেই গল্পই করেছিল রজত হরিশ ভট্টাচার্যের কাছে, বলেছিল, কেউ যদি বিশ্বাস না করে তো সে নাচার।

ট্যাক্সি থেকে নেমে, ভাড়া চুকিয়ে হেঁশেলে ঢুকতে যাবে। হঠাৎ কাঁধের উপরে মৃদু টোকা অনুভব করে চমকে ফিরে তাকাল রজত চৌধুরী! একজন তিব্বতী, কিম্বা ভুটিয়াও হতে পারে, মাথায় উল্টানো 'ফারে'র টুপী, মুখে বড় বড় লাল দাঁতের হাসি। রজত চৌধুরী অবাক হোল, ব্যাপার কী? পাহাড়ের মানুষ বেশী কথার লোক নয়। তার বক্তব্য খুব সহজ, ছোট্ট এবং স্পষ্ট। সে রজত চৌধুরীকে একটা চাকরী দিতে চায়। অবশ্য হঠাৎ চাকরী পাওয়া রজত চৌধুরীর ভাগ্যে আগেও ঘটে গেছে। তাই সত্যিই এবারেও যেন রজত চৌধুরী পুরোপুরি হতাশ হতে পারেনি, পারেনি ভাগ্যের উপরে বিশ্বাস হারাতে। কিন্তু তাই বলে এত শীঘ্র? গাড়ী থেকে নামতে না নামতে? একটা চাকরী যেতে না যেতেই? রজত চৌধুরীও অবাক না হয়ে পারল না। এ লোকটা কে? এবং রজতকেই বা এ কি কাজ দেবে? ছবি তোলার কাজ। এ কি করে জানল যে রজত ছবি তুলতে জানে?

—"বাঃ," লংচু তোয়াং হেসে বলে, বাংলা জানে না বটে তবু তার বুদ্ধি কিছু কম নেই! রজতের কাঁধের ক্যামেরাই তো বহন করছে তার পরিচয়।

লংচু তোয়াং রজতকে কথা বলার অবসর দিল না; বলে, তার মনিব রজতকে হাজার টাকা পর্যন্ত মাইনে দিতে রাজী আছে। উপরন্তু হোটেলের সব খরচ, যদি অবশ্য সে রীতিমত কাজ দেখাতে পারে। রজত চৌধুরী অবশ্য জানত যে তার উপরে ভাগ্যের করুণা আছে! কিন্তু সে যে পতিব্রতা স্ত্রীর মত সব সময়ে তার সঙ্গে সঙ্গে লেগে থাকবে কিছুতেই তাকে ছেড়ে যাবে না, একথা জানত না।

এক কথায় রাজী হয়ে গেল রজত চৌধুরী। লংচু তোয়াং বললে, যে হোটেলে সে উঠেছিল, সেই হোটেলেই সে ফিরে যেতে পারে, যদি চায়। আর তাঃ বাকী বিল? সব লংচু তোয়াংএর কর্তারা মিটিয়ে দেবেন। সত্যি? এরা তাহলে এতদিন ওর উপরে নজর রেখেছিলো? তা ভালো লোকের খোঁজ করতে গেলে, চারিদিকে একটু সুলুক সন্ধান রাখতে হয় বই কি।

এত শীঘ্রির সমস্যার সমাধান হবে তা কে ভেবেছিলো। তবু কেন যেন রজত চৌধুরী পুরোপুরি খুশী হতে পারল না। হরিশবাবু বলেন, রজত বলেছিল, হঠাৎ ওর মনটা কেমন যেন দমে গিয়েছিল। অবশ্য ভয় পাবার ছেলে রজত চৌধুরী নয়! দেখাই যাক্ না ব্যাপারটা কী?

ব্যাপার বুঝতে কিন্তু বেশী সময় লাগলনা; দুদিনেই রজত চৌধুরী টের পেল যে সে নিজের অজ্ঞাতে, ভারতের পূর্ব সীমান্তের পথ ঘাটের ছবি তুলে চীনের কাছে বিক্রী করছে। সেদিন গ্যাংটক্ থেকে দুদিনের টুর সেরে ফিরে এসে স্থির নিশ্চয় হোল রজত চৌধুরী। রজত অবাক হয়ে ভাবল, এ আবার কী কাণ্ড, চীনের সঙ্গে যে ভারতের 'ভাই ভাই' ভাব। অবশ্য একথা সকলেই জানে যে, রাজনীতিতে বিশ্বাস ও সততার স্থান নেই। সুযোগ পেলে সবাই সকলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে অথবা মিথ্যা বলতে পারে, শুধু অবশ্য সত্যবাদী ভারত ছাড়া।

কিন্তু, বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতায় কি পাপ হবে? হোলেও সে পাপকে কেয়ার করবে না রজত চৌধুরী। ওর মানি ব্যাগে, লংচু তোয়াং এর মাধ্যমে পাওয়া আসায় হাজার টাকা, দশটা একশ টাকার নোটে মাত্র হয়ে চুপ করে ঢোকে রইল। রজতের প্রবল ইচ্ছে হোল ব্যাগসুদ্ধ সেই

টাকাটা লংচু তোয়াংএর মুখের উপরে ছুড়ে মারে। কিন্তু ওর বিবেচনা ওর বিবেককে ঠাণ্ডা করল। অন্যায় যা হবার সে তো হয়েই গেছে। মাঝে থেকে টাকাটা কেন খোয়া যায়। রজত চৌধুরী এতদিন পরে নিজেকে একটা রোমাঞ্চকর নাটকের নায়ক রূপে দেখতে পেয়ে বেশ খুসী হয়ে উঠল। রজত লংচুকে বললো, পরদিন ঘোড়দৌড়ে যাবে, লংচু যেন টিকিট কিনে রাখে। লংচুর ছোট ছোট ধূর্ত চোখ দুটো আগেই বুঝেছিল যে রজত বুঝেছে, এখন বুঝল যে রজত জেনেশুনে দেশকে বিক্রী করতে রাজী হয়েছে।

কিন্তু সেইখানেই লংচুর ভুল হয়েছিল, রজতকে আর যাই বলুক কিন্তু তাকে বিশ্বাসঘাতক কেউ কখনো বলতে পারবে না। 'ম্যাপে'র উপরে একটা ছোট কাকে খানার বসে বসে, দুটি দীর্ঘ চিঠি লিখলে রজত চৌধুরী, একটা লংচু তোয়াংএর মাধ্যমে তার মনিবকে। অন্যটা একটি বিখ্যাত সংবাদ পত্রে।

—"তাই নাকি? কাগজে বেরিয়েছিল বুঝি এসব খবর?" বন্ধুরা হরিশকে জিজ্ঞেস করে।

—"পাগল হয়েছো? কাগজ কখনো এসব ছাপায়? কাগজওয়ালারা রজতকে যথেষ্ট চিনত। তবু ছাপতে রাজী হোল না; বল্লে, এ চিঠি ছাপালে মিথ্যে গুজব রটানো হবে। রজতের জীবনের একটা প্রচণ্ড সত্যকে ওরা তার একটা বানানো গল্প মনে করল নাকি? এই প্রশ্ন নাকি রজতকে কিছুতে স্থির থাকতে দিল না। হরিশবাবু বলছিলেন, রজত নাকি তাঁকে বলেছে, যে ভাগ্যে কর্তৃপক্ষ "এমার্জেন্সি কমিশনের ব্যবস্থা করেছেন, নইলে, রজতের ঘুমন্ত বিবেকটা এতদিন পরে জেগে উঠে, 'খাস চাই, খাস চাই' বলে ভারী জ্বালাতন সুরু করত। কিন্তু রজত চৌধুরীর সবচেয়ে দুঃখু কি জানেন? হরিশবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্লেন,

—ওর দুঃখটা এই যে লোকে যদি আজ ওকে ইউনিফর্ম পরে সশরীরে কুচ্‌কাওয়াজ করতে দেখে, তাহলেও বোধহয় বিশ্বাস করবে না যে রজত সত্যিই যুদ্ধে যাচ্ছে। হয়ত ভাববে, এর মধ্যেও রজতের একটা কোন মতলব আছে। হরিশবাবু দুঃখু করে বললেন, যে ছেলেটা যাবার সময়ে বলে গেল, "কাকাবাবু লোকে যে আমাকে মতলববাজ বলে, সেকথা অবশ্য মিথ্যে নয়, তবে এইটে আশ্চর্য, ওরা কেন ভাবতে পারে না যে, আমার মাথায় ভালো মতলবও দুএকটা আসতে পারে।"

———

লেখিকাদের কথা

গত একশত বৎসরের মধ্যে বাংলা দেশে আমাদের জন্মের পূর্বে কয়েকজন সুলেখিকা ছিলেন যাঁদের কথা আজ লোকে ভুলে গিয়েছে। একজন ছিলেন শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা বসু। লাবণ্যপ্রভা আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর সহোদরা। বাংলা ভাষার উপর তাঁর আশ্চর্য্য দখল ছিল। তিনি শিক্ষক কার্য্যে নিজের জীবনের অনেক সময় দান করেছিলেন, সেই জন্য তাঁর লেখার মধ্যে উপদেশাত্মক লেখা প্রচুর ছিল। আমরা শিশুকালে আমার মায়ের কাছে দুটি বই দেখতাম তার নাম ছিল "দৈনিক।" দুখণ্ডে লেখা বইটি ডায়েরীর মত করে প্রতিদিনের তারিখ ধরে লেখা। ১৮৯৯ ও ১৯০১ খৃষ্টাব্দে বই দুটি প্রকাশিত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "ইহা বহু ক্ষুধিত আত্মার তৃপ্তি সাধন করিয়াছে।"

লাবণ্যপ্রভা এক সময় ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। তিনি রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয়ও পরিচালনা করতেন। সম্ভবত 'নীতি কথা' নামে তাঁর একটি বই ছিল। কিছুদিন তিনি বালক বালিকাদের "মুকুল" পত্রিকা পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর রচনাভঙ্গী এমন সুন্দর ছিল যে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র যখন বাংলা প্রবন্ধ প্রকাশ করতেন তখন লোকে বলত নিশ্চয় উনি লাবণ্যপ্রভাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছেন।'

লাবণ্যপ্রভাকে আমি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে দেখেছি। হয়ত তার ২।১ বৎসর আগেও দেখে থাকব। তখন তিনি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকারের পত্নী।

এঁদের সন্তান-সন্ততি ছিল না। শকুন্তলা নাম্নী একটি অন্ধ দেশীয় বালিকাকে তাঁরা কন্যা রেখে পালন করেছিলেন। শকুন্তলা বেশে এম্ এ পাশ করার পর অক্সফোর্ড থেকে ডিগ্রী নিয়ে আসেন। কিছুদিন পূর্ব্বে আমেরিকায় এই শকুন্তলা শাস্ত্রীর মৃত্যু হয়। অন্নপূর্ণা নামে আর একটি কন্যাকেও লাবণ্যপ্রভা পালন করেন। লাবণ্যপ্রভা বিদুষী ও কর্ত্তব্য পরায়ণা ছিলেন। তিনি ছাত্র ছাত্রীদের বিশৃঙ্খল ব্যবহার বা কর্ত্তব্যে অবহেলা সহ্য করতে পারতেন না। ছাত্রীরাও তাঁর গুরুগম্ভীর ভাবিকী চেহারার জন্য তাঁকে খুব ভয় করে চলত। ১৮৮২ কিম্বা ৮৩ খৃষ্টাব্দে ইনি বেথুন কলেজে পড়তেন। ইঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী হেমপ্রভা বসু যখন বেথুন কলেজে ১৯১১।১২ খৃষ্টাব্দে উচ্চ বিদ্যা পড়াতেন তখন আমি সেই কলেজে পড়ি। এঁরা দুইবোন সে সময় একত্রে অনেক দেশ বিদেশে বেড়াতেন।

কার্সিয়াং লাবণ্যপ্রভার অতি প্রিয় স্থান ছিল। এখানে তিনি সুন্দর একটি ছোট বাড়ী করেন। বাড়ীর নীচের হলে ব্রাহ্ম সমাজের সাপ্তাহিক উপাসনা হত এবং উপরতলায় শয়নকক্ষাদি ছিল। পরে এর বাড়ী বোধহয় ব্রাহ্ম সমাজকেই দান করেন।

আমরা যখন বাল্যকালে প্রথম কলকাতায় আসি তখন লাবণ্যপ্রভার ছাত্রীদের কাছে তাঁর ছাত্রীশাসন বিষয়ে অনেক গল্প শুনতাম। সে সব গল্পে অনেক অতিরঞ্জিত কথা থাকত তবে বোঝা যেত যে অন্যায় করলে তাঁর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সহজ ছিল না।

এই সময়েই আর একজন লেখিকা ছিলেন লজ্জাবতী বসু। ইনি রাজনারায়ণ বসুর কন্যা। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়।

"সাহিত্য" "প্রদীপ" "প্রবাসী" প্রভৃতি অনেক মাসিক পত্রিকায় লজ্জাবতীর কবিতা প্রকাশিত

হত। লজ্জাবতী বোষের শান্ত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাঁকে নানা জায়গায় বিশেষ দেখা যেত না। আমি তাঁকে তাঁর ভগ্নীপতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের বাড়ীতে দেখেছি। তিনি চিরকুমারী ছিলেন।

ছেলেবেলা কৃষ্ণকুমার বাবুর বাড়ীতে আমাদের খুব যাওয়া আসা ছিল। সেখানে রাজনারায়ণ বসুর কন্যাদের ছাড়া আর একজনকে মাঝে মাঝে দেখতাম। ইনি শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। তখন তাঁর নামে বিরাট মোকদ্দমাটি হয় নি। তখন অরবিন্দ আমার বাবার Modern Review পত্রের একজন লেখক ছিলেন। তাঁর Hero and the Nymph প্রভৃতি ইংরাজী বইয়ের প্রকাশক ছিলেন আমার বাবা। অরবিন্দ টুইল শার্ট গায়ে দিয়ে কৃষ্ণকুমার বাবুর ঘরে বসে বসে বই পড়তেন দেখতাম। তার পর যখন ঘোষার মোকদ্দমা হয় তখন বাবা Modern Review এ লিখে মোকদ্দমার জন্য টাকা সংগ্রহের চেষ্টা করতেন।

কৃষ্ণকুমার বাবুর জ্যেষ্ঠাকন্যা কুমুদিনী মিত্রও একজন লেখিকা ছিলেন। তাঁর "শিখের বলিদান" বইটি বেশ আদৃত হয়েছিল। এছাড়া তিনি একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতেন। তার নাম ছিল 'সুপ্রভাত।' কুমুদিনীর জন্ম ১৮৮২ র কাছা কাছি কোন সময়। এঁর "সুপ্রভাত" বাংলা ১৩১৪ সালে প্রকাশিত হয়। নয় দশ বৎসর চলেছিল। কুমুদিনী সুশিক্ষিতা মহিলা ছিলেন। ১৯০২ কিম্বা ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি বেথুন কলেজ থেকে B. A পাশ করেন। বোধহয় লজ্জাবতী মেডেল পান। তাঁর পিতার বাড়ীতে ইউনিভার্সিটি গাউন ও মেডেল পরা তাঁর মস্ত বড় ছবি টাঙানো থাকত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে তিনি প্রায়ই তাঁর ভগ্নীর সঙ্গে ব্রহ্মসঙ্গীত গাইতে আসতেন। আমরা তখন সেই পাড়াতেই থাকতাম।

তারও কিছুদিন আগে প্রথম স্বদেশী আন্দোলনের সময় কুমুদিনী মিত্র স্বদেশী গান গেয়ে অনেক জায়গায় স্বদেশ প্রেমের প্রেরণা দিতেন শুনেছি। তিনি তাঁর 'সুপ্রভাতে' স্বদেশী আন্দোলন বিষয়ে লিখতেন। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র প্রসাদ বসু ছিলেন অ্যাটর্নিসার্কুলার সোসাইটির বড় কর্মী, বোধহয় সম্পাদক। ইঁহারই সঙ্গে কুমুদিনীর বিবাহ হয়। কুমুদিনী খুব শান্ত ও গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। কিন্তু খুব তেজস্বিনী ও ছিলেন। বরাবরই দেশহিতকর নানা কাজের সঙ্গে তিনি জড়িত থাকতেন। তাঁর সুশ্রী চেহারায় শান্ত ও তেজস্বী নারীর শ্রী স্পষ্ট ফুটে উঠত। "সরোজ নলিনী দলিটির পত্রিকা 'বঙ্গলক্ষ্মী' ও কুমুদিনী কিছুদিন সম্পাদনা করেছিলেন। তারপর কাগজটি নানা হাতে ঘুরেছে। এক সময় আমিও 'বঙ্গলক্ষ্মীর' ভার নিয়েছিলাম বছর দুই।

আমরা ছেলেবেলা একবার কৃষ্ণবাবুর স্ত্রীকন্যাদের সঙ্গে আগ্রা বেড়াতে গিয়েছিলাম। সে সময় অধ্যাপক নগেন্দ্রনাথ নাগের বাড়ীতে আমরা ছিলাম। রোজ সকালে ঘোড়ার গাড়ী চড়ে তাজমহল ইতমদ্দৌলা সিকান্দ্রা দেখে বেড়াতাম। ট্রেনের থার্ডক্লাশে চড়ে মথুরা বৃন্দাবন দেখতেও গিয়েছিলাম। বৃন্দাবনে তীর্থবাসিনী বিধবা মহিলাদের এবং নানারকম পাণ্ডাদের উৎপাতে কৃষ্ণবাবুর পত্নী এতই বিরক্ত হয়েছিলেন যে রেগে বলেছিলেন "আমি কলকাতায় গিয়েই সুপ্রভাত কাগজে সব লিখে দেব।" অবশ্য তার স্বামীর বিখ্যাত "সঞ্জীবনী" সাপ্তাহিকের নাম করলেও পাণ্ডারা কিছু বুঝত না, সুপ্রভাত তারা কখনও শোনেই নি।

শ্রীশান্তাদেবী

জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ

জীবন কাহিনী ॥

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

৯

কন্যা পৃষ্ঠে প্রথম পুত্র হল বিজয়ের। নাম রাখল যোগজীবন।

ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্যে বিজয় এসেছে মুঙ্গেরে। প্রাচীনকালে এখানে মঙ্কু ঋষির আশ্রম ছিল বলে সহরের নাম মুঙ্গের। আর মুঙ্গেরের সব চেয়ে বড় আকর্ষণ কষ্টহারিণী।

গঙ্গার উপরেই কষ্টহারিণী প্রতিষ্ঠিতা। আর তারই নামে ঘাট কষ্টহারিণীর ঘাট। মনোরম ভজনের জায়গা। কত সাধুসন্ত নিবিষ্ট রয়েছে ধ্যানে। সমস্ত স্থান জুড়ে ভগবৎ স্পর্শ যেন প্রোজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। শুদ্ধ হয়ে একটু বসলেই আপনা-আপনি ধ্যান জমে যায়। আলাযন্ত্রণার লেশমাত্র থাকেনা।

এই ঘাটেই এক যোগীর দেখা পায় বিজয়।

কিন্তু মুঙ্গেরে সন্তোষিণী মারা গেল। শোকের শেল হৃদয় ছিন্ন করে দিল বিজয়ের।

যিনি হরণ করেন তিনিই আবার পূরণ করেন। যাঁর দেওয়া শোক তাঁরই দেওয়া সান্ত্বনা।

কেশবও চলে এসেছে মুঙ্গেরে।

কিন্তু একী অকরণ। কয়েকজন ব্রাহ্ম ভক্ত অবতারজ্ঞানে কেশবকে পূজা করতে লাগল। বিচলিত হল প্রণামে। খেয়ে নিল পাদোদক।

বিজয় চটে গেল। বললে, 'এ সব কী হচ্ছে।'

'কী সব?'

'এই সব ব্রাহ্ম বিগর্হিত কর্ম। পায়ের ধুলো নেওয়া পা ধুইয়ে দেওয়া—

'তা আমি কী করব?'

'তুমি এর প্রতিকার করো।'

'আমি কারো স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারিনা।'

বিজয় চলে এল কলকাতায়। যদুনাথ চক্রবর্তীকে দলে নিল। সংবাদ পত্রে সুরু করল আন্দোলন। এ সব নয় পূজার প্রশ্রয় নেই ব্রাহ্মধর্মে।

কলহের মূত্রজাল ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। বিজয়ের সমর্থকেরা কেশবকে বলতে লাগল ভণ্ড, কেশবের সমর্থকেরা বিজয়কে বলতে লাগল নাস্তিক।

পরস্পরে সুরু হল কাদাছোঁড়াছুঁড়ি।

এ গ্লানির শেষ হবে কিসে? তিক্ত-বিরক্ত হয়ে বিজয় ফের ফিরে এল শান্তিপুর। হঠাৎ, নির্জনে কুলদেবতা শ্যাম সুন্দর দেখা দিল বিজয়কে। বললে, 'তোকে ঘর থেকে বের করলাম, আবার তুই সেই ঘরেই প্রবেশ করলি?'

চমকে উঠল বিজয়। কিন্তু অলৌকিককে বেশি আমোল দিলনা। ভাবল অলীক কল্পনা, হয়তো বা মস্তিষ্কের বিকার।

কিন্তু এ যা ঘটল এও ভাবনাতীত। কেশব চিঠি লিখল বিজয়কে। বললে, আমার দিকের কথাটা একবার বোঝো।, তারপর এস, ঝগড়া মিটিয়ে ফেলি।

প্রীতিসুন্দর চোখে সমস্ত পরিচ্ছন্ন করে দেখতে পেল বিজয়। দেখতে পেল ওটা আসলে নরপূজা নয়, ভক্তি প্রকাশের আতিশয্য মাত্র। কেশবের নিজের মনে কোনো অভিমান নেই, সে সম্মানের প্রত্যাশী নয়। সুতরাং এ আন্দোলন বন্ধ হোক।

'আমি অনুসন্ধান করে দেখে স্থির করেছি,' ধর্মতত্ত্ব পত্রিকায় ঘোষণা করল বিজয়, 'কেবল বাহ্যিক কার্যে ও শব্দে আতিশয্য দোষ আছে, মতে কোনো দোষ নেই। যাঁরা এরূপ ব্যবহার করেন তাঁদের মধ্যে কেউই মানুষকে উপাসনা করেন না বা ঈশ্বর বা ঈশ্বরের মধ্যবর্তী জ্ঞানে কোনো মানুষের কাছে প্রার্থনাও করেন না। কেশববাবুর প্রতি তাঁরা যেরূপ ব্যবহার করেন, তা যতই অলৌকিক হোক না কেন, আমি কখনোই মনে করতে পারিনা যে তাঁরা কেশববাবুকে ভক্ত পরিবারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও পরম উপকারী বন্ধু ছাড়া অন্য কোনো ভাবে দেখেন। এরূপ বাহ্যিক ব্যবহার মানুষের প্রতি যত অল্প হয় ততই ভালো, কেননা তা দিয়ে অন্যের অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা।

ভক্তি ভাজন কেশববাবুর প্রতি আমি কখনো দোষারোপ করিনি। অপর ভ্রাতারা তাঁকে সম্মান দিতে যেরূপ ব্যবহার করুন না কেন তিনি তার জন্যে দায়ী নন। তিনি সেরূপ সম্মানের অভিলাষী নন। তার জন্যে কাউকে তিনি অনুরোধ করেননি, বরং এ যে তাঁর অভিপ্রেত নয় তা অনেকবার বলেছেন। তিনি স্পষ্টরূপে তৎকালে ঐরূপ সম্মান প্রকাশে নিষেধ করেননি তাঁর কেবল এইটুকু ত্রুটি আমি দেখেছিলাম। এছাড়া বর্তমান আন্দোলনে তাঁর অণুমাত্র অপরাধ নেই। এ আমি নিশ্চয় রূপে বলতে পারি।'

বিজয়ে কেশবে পুনর্মিলন হল। শুষ্কতার মহামারী ঘুচে গিয়ে দেখা দিল আরোগ্যের সুপ্রভাত।

ব্রাহ্মসমাজের অনেকেই তখন পৌসাইজীর শিষ্যত্বে। লিখছেন শিবনাথ শাস্ত্রী: তিনি মনে করলে নিজের একটা দল বাঁধতে পারতেন, কিন্তু সেদিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল না। তিনি নিজের জয় চাইলেন না, ব্রাহ্মধর্মেরই জয় চাইলেন। এতে তিনি আমার হৃদয়ের নিকট সহস্রগুণ প্রিয় হলেন।'

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরদ্বার উদ্‌ঘাটিত হল। দূর হয়ে গেল মনোমালিন্য। জেগে উঠল প্রীতি-মৈত্রীর নির্মল আনন্দস্রোত।

ঘানাঘাটের কাছে কলাইঘাটায় তখন আছে বিজয়, পুনর্মিলন উপলক্ষে সেখানেও ব্রহ্ম মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হল। কেশব স্বয়ং উপস্থিত হল সে উৎসবে। সরল, উদার, সুপ্রসন্ন। লিখছেন শিবনাথ:

'একদিন সন্ধের পর কেশববাবু সদলে কীর্তন করতে-করতে নৌকায় করে চূর্ণী নদীতে বেড়াতে গেলেন। প্রাতে উঠে দেখি কেশববাবু ব্রাহ্মদের পায়ের তলায় একপাশে পড়ে ঘুমুচ্ছেন। আহার করতে বলে দেখলাম, তাঁর বড়মানুষী কিছুই নেই, সামান্য ডালভাত মনের আনন্দে আহার করছেন।'

আর বিজয়? বিজয় সত্যসন্ধ। সত্যব্রতধারী। সত্যের অনুরোধে রুদ্ধ করতে পারে নিজের বাক্‌যন্ত্রণা। সর্বাঙ্গে নিতে পারে মৌনের আবরণ।

ব্রাহ্মদের হিতের জন্যে কতগুলি নিয়ম প্রবর্তন করল বিজয়।

প্রত্যহ অন্যূন তিনবার পরব্রহ্মের উপাসনা করবে। অভ্যস্ত কতগুলি বাক্য উচ্চারণ না করে জীবন্ত ভাবে উপাসনা করবে। দয়াময় নামের মধ্যে সাধন করতে হবে। নামসাধন হলে অন্তরে পিতার সঙ্গে যোগসাধন করতে বিশেষ ব্যাকুলতা হবে। অন্তরে দয়াময় পিতা প্রকাশিত হবেন। নিন্দাস্তুতিতে সাধকের মন বিচলিত হয় না, সুতরাং তার সঙ্গে বিবাদবিসংবাদ অসম্ভব। প্রত্যেক ব্রাহ্মকে এরূপ সাধন করতে হবে—সাধন না করলে মঙ্গল কোথায়? সাধন না করলে ব্রাহ্ম হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

কেউ বিশ্বাসবিরুদ্ধ কাজ করবেনা। মনে যা সত্য বলে জানবে কাজে তা পরিণত করবে। সহস্র ক্ষতি হলেও কপট আচরণ করতে পারবেনা। ব্রাহ্মকে ব্রাহ্ম অবিশ্বাস করতে পারবেনা। সুরাশক্তি, মাদক সেবন, মিথ্যাকথা, মিথ্যা ব্যবহার প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, কৃতঘ্নতা, ব্যভিচার, পরনিন্দা, উৎকোচ গ্রহণ ইত্যাদি পাপাচরণ করলে তাকে ব্রাহ্ম বলে গ্রহণ করা উচিত নয়। ব্রাহ্ম শুধু ঘৃণা করে কাজ শুধু পরিহারই করবেনা, শ্রদ্ধার সঙ্গে সৎকর্মের অনুষ্ঠান করবে। পাপ করা যেমন অধর্ম কর্তব্য পালন না করাও তেমনি অধর্ম।

কারো দোষ দেখলে তার দুর্বলতা দূর করবার জন্যে পিতার কাছে প্রার্থনা করতে হবে এবং গোপনে তাকে সংশোধন করতে হবে। ভাইয়ের দোষ নিয়ে উপহাস করা চলবে না। যেমন একাকী উপাসনা করবে তেমনি আবার নিয়মিত সামাজিক উপাসনা করবে। নিজের দুর্বলতাকে সমর্থন না করে বিনীতভাবে স্বীকার করবে দুর্বলতা। কেউ ঈশ্বরের নাম নিয়ে উপহাস করলে কানে হাত দিয়ে তার কথাকে অগ্রাহ্য করবে। ঈশ্বর, পরলোক, প্রার্থনা, পাপপুণ্য, প্রায়শ্চিত্ত, মুক্তি, অনন্ত উন্নতি ইত্যাদি ব্রাহ্মধর্মের মূল সত্যে যার বিশ্বাস নেই তাকে ব্রাহ্ম বলে গণ্য করা হবে না।

ব্রাহ্মধর্ম শুধু ধর্ম নয়, ভক্তিই ব্রাহ্মধর্মের প্রাণ। ব্রহ্মানুরাগ থেকেই ভক্তির উৎপত্তি। 'কর সাধন ব্রহ্মের চরণ, যাতে পাবে নিত্য শান্তি নিত্য ধন।'

কেশব বিলেত চলে গেল। কমাস পর ফিরে এসে 'ভারত সংস্কার সভা স্থাপন করল। পাঁচটা বিভাগ হল—সুলভ সাহিত্য প্রচার, স্ত্রীশিক্ষাবিস্তার, দাতব্য ঔষধালয়, সুরাপান নিবারণ, শ্রমজীবীদের শিক্ষাদান আর এক পয়সা দামের সাপ্তাহিক পত্রিকা সুলভ-সমাচার প্রকাশ।

কাজ নিয়ে বিজয় মেতে উঠল। ঢেলে দিল মন-প্রাণ।

কলকাতায় যেবারায় মহামারীরূপে দেখা দিল ম্যালেরিয়া। সংস্কার সভা সেখানে এক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করল। পরিচালনার ভার নিল বিজয়।

ভোরে উঠে সোজা চলে যায় গাঁয়ে হেঁটে। ঘরে ঘরে ওষুধ দেয়, রুগীর শুশ্রূষা করে। কলকাতায় ফিরে আসতে আসতে দুপুর গড়িয়ে যায়। স্নানাহার সেরে স্ত্রী-বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করে। রাত জেগে সংবাদপত্রের জন্যে লেখে প্রবন্ধ। ক্রমাগত পরিশ্রমের ফলে হৃদরোগ দেখা দিল। একদিন হঠাৎ পড়ল অজ্ঞান হয়ে।

প্রায়ই অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তবু কাজের থেকে সেবার থেকে নিবৃত্ত হয় না। কেশব একজন দেহরক্ষী রেখে দিল। কখন কোথায় বিপন্ন হয়ে পড়ে তার ঠিক কী।

হঠাৎ একদিন এক স্বপ্ন দেখল বিজয়।

'এই, জগন্নাথ ঘাটে যা না।' কে যেন বলছে: 'সেখানে এক সাধু আছেন। তাঁর কাছে ওষুধ পাবি। যা, দেরি করিস নে।'

বিজয় গেল না। স্বপ্ন আবার কখনো সত্য হয় নাকি? মাথার গরমে এই স্বপ্ন দেখা। অস্বাস্থ্যের নিদর্শন।

কয়েকদিন পরে আবার সেই স্বপ্ন। 'কী, গেলি না? যা না, একবার গিয়ে না পরীক্ষা করে। ব্যাধিটা যদি সারে, একবার দেখতে দোষ কী।'

এবার কেন যেন প্রত্যাখ্যান করতে জোর পেল না। মন্দ কী, অসুখের যদি কিছু সুরাহা হয়।

গেল জগন্নাথ ঘাটে। হ্যাঁ, ঐ তো একজন সাধু দেখা যাচ্ছে।

বিজয় তার কাছে স্বপ্নবৃত্তান্ত বলল। 'আপনার কাছে ওষুধ আছে?'

'হ্যাঁ, আছে। কিন্তু আসতে এত দেরি করলে কেন!' সাধু তাকাল বিজয়ের দিকে: 'ওষুধ যে এরই মধ্যে অনেক খরচ হয়ে গিয়েছে।'

'যা আছে তাই দিন।'

'তাই দিচ্ছি। কিন্তু এতে তোমার ব্যাধির সম্পূর্ণ আরোগ্য হবে না, তবে মূর্ছাটা বন্ধ হবে।' সাধু তার ঝুলিতে হাত ঢোকাল। 'আরো কদিন আগে এলে পুরো ওষুধ দিতে পারতাম। ব্যাধিরও অবসান হত।"

'মূর্ছা যদি বন্ধ হয় তাও তো অনেক।'

ওষুধ অসঙ্কোচে খেয়ে নিল বিজয়। কী আশ্চর্য, তার পর থেকে আর মূর্ছা নেই।

মূর্ছা বন্ধ হলেও ব্যাধির মূল গেল না। হৃৎপিণ্ডে ব্যথাটা ঠিক তেমনিই আছে। মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ চিবার্সকে দেখাল। চিবার্স বললে যন্ত্রণা অসহ্য হলে মরফিয়া নিতে হবে। এই একমাত্র উপশমের উপায়।

'ব্যারাম নির্মূল হবে না?'

'না। বরং এই ব্যারামেই তুমি মারা যাবে।'

নিশ্চিন্ত হল বিজয়। মূর্ছা মূর্ছীভূত হয়েছে, ব্যাপ্তাও প্রশমিত হবে। আপাততঃ তা হলেই হল। মৃত্যুর কথা কে ভাবে! তার জন্যে কে বসে থাকে! যতদিন নিশ্বাস আছে খাওয়া যাবে না হয় মরকিয়া। আগে জীবনের কাজ তো সমাধা করি।

বিজয় বেরিয়ে পড়ল প্রচারের কাজে, উদ্যম বেগে। হোক অনাহার, হোক অনিদ্রা, অবিচ্ছিন্ন পথক্লেশ। সমস্ত দুঃখকষ্ট, রৌদ্রবর্ষা উপেক্ষা করে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করে বেড়াতে লাগল। রংপুর, কাকিনিয়া, দিনাজপুর, কুচবিহার। কুচবিহারে সুরু হল সেই হৃৎপিণ্ডের যন্ত্রণা। ঈশ্বরের বিধানে যেহই যদি অক্ষম হয়, মানুষের আর কী স্পর্ধা!

কলকাতায় ফিরে এল বিজয়। কেশবের সঙ্গে দেখা করতে গেল। দেখল কেশব নিজের হাতে রান্না করছে।

হাসে কেশব চায় ব্রাহ্মদের মধ্যে বৈরাগ্য জাগুক। জাগুক মানশূন্যতা।

এবার এস আমরা 'ভারত-আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করি।

'ভারত-আশ্রমের' উদ্দেশ্য হচ্ছে ভক্ত পরিবারদের একসঙ্গে একত্র বসবাস করে নিষ্ঠায় ধর্মাচরণ করা।

'একাকী ধর্মসাধন করলে মুক্তি হয় না। একাকী ধর্মপথে বিচরণ করা স্বার্থপরতা। সকলে এক পরিবারবদ্ধ হয়ে পরিত্রাণের আশায় স্বর্গরাজ্যে যেতে হবে। আশ্রমের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করছে বিজয়, 'নরনারী একসঙ্গে ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও উপাসনা করবে। তাদের স্নানাহার পৃথক পৃথক হলেও সকলেই এক আচ্ছাদনের আশ্রয়ে আছে এই মৈত্রীর বন্ধন মানতে হবে। সর্বসময়েই সৎপ্রসঙ্গ উৎসাহে সকলে উদ্দীপ্ত হয়ে থাকবে। স্বর্গের মহাসত্যও মানুষের হাতে পড়ে বিকৃত হয়ে যায়। ভারত-আশ্রমের উদ্দেশ্য না বিকৃত হয়।'

প্রচণ্ড নিন্দাবাদ সুরু হল। প্রচারকেরা মূর্খ, অশিক্ষিত এমন কথা বলতেও ছাড়ল না।

প্রচারকেরাও কেউ কেউ প্রতিবাদপত্র ছাপল।

বিরক্ত হল বিজয়। প্রচারকেরা কেন তাদের ব্রতভঙ্গ করবে? গালাগাল দিক, প্রহার করুক, অম্লান মুখে সহ্য করতে হবে। প্রার্থনা করতে হবে নির্মুকদের জন্যে। ঈশ্বরে নির্ভর করে সমস্ত রোষকে শান্ত করতে হবে। যারা ব্যাকুল হৃদয়ে হরিনামের নাম ঘোষণা করে তাদের বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন কী। প্রচারকরা যদি অভিমানী হয়, নিন্দায় মুখ বিমর্ষ করে তাহলে তারা ধর্মরাজ্যে ঢুকবে কী করে।'

কজন ব্রাহ্ম বকাবকি করে একটা গাড়োয়ানকে মারলে। তাই দেখে বিজয় নির্জনে কাঁদতে বসল। আরেকদিন উপাসনার শেষে খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি করল ভক্তেরা—কে বেশি খাবে তার লালসায়। সেদিন বিজয় উপবাস করে রইল। ব্রাহ্ম শুধু শুধু উপাসনায় নয় জীবনের ছোটখাট ব্যবহারে। শুধু মুখে ব্রহ্ম নয়, চিন্তায় ব্রহ্ম আচরণে ব্রহ্ম। ব্রহ্মেই নিয়তস্থিতি।

কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ আর ভক্তিযোগ—সাধনের শ্রেণী বিভাগ করে দিল কেশব যার মনের গতি যেদিকে সে সেই দিকে ব্রতী হোক।

অঘোর গুপ্ত নিল জ্ঞানযোগের সাধন। আর বিজয়ের জন্যে ভক্তিযোগ।

ব্রতের সপ্তদশ সংযম বিধি অনুধাবন করো।

প্রাতঃস্মরণ, প্রাতঃস্নান, নাম গান, নামশ্রবণ, ভক্তিগ্রন্থপাঠ, রন্ধন, দরিদ্রকে অন্নদান, সেবা, পশুপক্ষীসেবা, বৃক্ষলতাদি সেবা, বিশুদ্ধ আহার, পঠিত শ্লোকের পুনরাবৃত্তি, সংপ্রসঙ্গ-নির্জনে ভগবৎকীর্তন ও ভক্তদের নিকট আশীর্বাদ প্রার্থনা।

ভক্তিব্রত গ্রহণ করল বিজয়।

নামে ভক্তি প্রেমে ভক্তি ভক্তি সাধুসঙ্গে। ভক্তিতেই আহ্লাদ। চিরপ্রসন্নতাই ভক্তির লক্ষণ। জীবনে প্রসন্নতাই একমাত্র জীবিকা।

কায়মনোবাক্যে ব্রত পালন করতে লাগল বিজয়।

এক বছর পরে কেশব বললে, 'তুমি ভক্তিযোগে সিদ্ধ হয়েছ।'

বিজয়ের মন মানলনা। বললে, 'ভক্তির অঙ্কুর মাত্র যদি হয় তাহলে সময়ের চিহ্নিকা জাগবে। জাগবে অব্যর্থকালত্ব। জাগবে বৈরাগ্য, দীনভূতত্ব। আমার মধ্যে সেসব লক্ষণ কোথায়? কোথায় আমার ভগবানকে পাবার জন্যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা, না পাবার জন্যে উদ্বেগ, কোথায় তাঁর নামগানে আনন্দ, তাঁর গুণবর্ণনে অনুরাগ? কোথায় তাঁর বিশ্বরূপতিতে বিশ্বাস? ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে ভক্তের যে লক্ষণ বলা হয়েছে আমার মধ্যে তার স্ফুট প্রকাশ কোথায়?'

কী বলেছে সেই গ্রন্থে? বলেছে—

শান্তির ব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধ সমুৎকণ্ঠা নাম গানে সদারুচিঃ॥
আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্ বসতি স্থলে।
ইত্যাদয়ো ভূতাবাস্যুর্জাত ভাবাঙ্কুরে জনে॥

কেশব অভিভূত হয়ে গেল।

ভক্তি গোপনীয়া। গোস্বামী প্রভু বলছেন ভক্তদের,—'ভক্তি জ্ঞান বৈরাগ্য তিনজন বৃদ্ধি ছিলেন। ভক্তিদেবী বৃন্দাবনে গিয়ে যুবতী হলেন। জ্ঞান বৈরাগ্য বৃদ্ধিই থেকে গেল। ভক্তিকে কৃপণের ধনের মত গোপন রাখতে হবে। শাস্ত্রকারেরা যুবতীর স্তনের সঙ্গে তার তুলনা করেছেন। বালিকা বুকদেহে ঘুরে বেড়ায়, যুবতী হলে বস্ত্রদ্বারা স্তন আচ্ছাদন করে। স্বামী ছাড়া পিতামাতা গুরুজনও তা দেখতে পায়না। ভক্তিও সেই রকম। ভগবান ছাড়া সকলের থেকেই সন্তর্পণে গোপনে রক্ষণীয়া। প্রথম প্রথম যখন ভাবের উল্লাস আরম্ভ হল, চোখ দিয়ে একটু জল পড়তে লাগল, ভাবলাম লোকে দেখুক। পরে মনে হত, একী করে গোপন করব? হৃদয়ের কোন আড়ালে রাখব তা গোপন করে? ভক্তি গোপনীয়া।'

নির্জনে সাধন করবার জন্যে কোন্নগরের কাছে মোড়পুকুর গ্রামে একটি উদ্যান কিনল কেশব। কিন্তু কোথায় নির্জনতা? সেইখানে দিনে-দিনে ভিড় বাড়তে লাগল ব্রাহ্মদের। সাধ্য কী থাকে কেউ অজ্ঞাতবাসে?

নির্জন সাধনের ইচ্ছায় বিজয় মাঝে মাঝে যায় উদ্যানে। সেখে পথের ধারে বসে একটা লোক ঘুতো সেলাই করে, কিন্তু কী আশ্চর্য, মজুরির দর করেনা, দাবি করেনা, যে যা দেয়

তাই নৈয় মাথা পেতে, কথাটি না বলে। বিজয় একদিন তাকে অনুসরণ করে তার বাড়ি গেল, কী ধরনের লোক দেখি গে।

খিদিরপুর অঞ্চলে লোকটার বাড়ি, থাকে সামান্য বস্তিতে। সন্ধের বাড়ি ফিরে মরশাতি রেখে গঙ্গাতীরে চলে এল লোকটা। স্নান করল, আহ্নিক করল, বাড়ি গিয়ে বিগ্রহ ও তুলসী বৃক্ষের অর্চনা করল। অজিত পয়সা দিয়ে ঘি-আটা কিনল, রুটি তরকারি তৈরি করে ভোগ দিল ঠাকুরকে। পরে আর সকলকে প্রসাদ ভাগ করে দিয়ে নিজে খেতে বসল। যদৃচ্ছা লাভ—ভবিষ্যতের জন্যে সঞ্চয় নেই। ভগবান যেমন রাখেন্ তেমনিই থাকব।

আলাপ করল বিজয়। বুঝল এ একজন উচ্চস্তরের সাধক। কর্মফলের জন্যে ঈশ্বর আদেশে শুচির কাজ করছে। ঈশ্বর নিবেধ কার কাছে পয়সা চাইতে পারবেনা। যে যা দেবে তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে।

ভারত আশ্রমে দোতলায় গভীর রাত্রে একাকী বসে তন্ময় হয়ে ব্রহ্মনাম করছে বিজয়, হঠাৎ মনে হল কে যেন বন্ধ দরজায় করাঘাত করছে। অভিভূতের মত বিজয় দরজা খুলে দিল।

একদল জ্যোতির্ময় পুরুষ ঘরে ঢুকল সহসা। 'চিনতে পাচ্ছ? আমি অদ্বৈত আচার্য।' বললে একজন।

'আর এঁরা।'

'ইনিই মহাপ্রভু। ইনি প্রভু নিত্যানন্দ। আর ইনি শ্রীবাস। শোনো।' বললে অদ্বৈত, 'তোমার ব্রাহ্ম সমাজের কাজ শেষ হয়েছে। এখন মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হও। যাও স্নান করে এসো মহাপ্রভু এখনি তোমাকে দীক্ষা দেবেন।'

বিহ্বলের মত বিজয় নিচে নেমে গেল। পাতকুয়োয় স্নান করে দ্রুত পায়ে চলে এল উপরে। মহাপ্রভু তাকে দীক্ষা দিলেন। অদ্বৈত বললে, 'যথাকালে এই দীক্ষা পূর্ণ হবে তোমার মধ্যে। তখন তুমি বুঝবে এর সার্থকতা।'

সকলে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

পরদিন প্রাতে অসময়ে পাতকুয়োর কাছে স্বামীর সিক্ত বস্ত্র দেখে যোগমায়া অবাক হয়ে গেলেন। রাত্রে হঠাৎ স্নান করলেন, কেন, কী ব্যাপার?

স্ত্রীকে স্বপ্নবৃত্তান্ত বললে বিজয়।

নির্জনে নিয়ে গিয়ে বললে কেশবকে। কেশব বললে, 'একথা কাউকে বোলো না। কেউ বিশ্বাস করতে পারবেনা, তোমাকে পাগল বলে উপহাস করবে।'

পুরোপুরি বিজয়ই কি পারছে বিশ্বাস করতে? মনে হচ্ছে পরলোকগত কতগুলি আত্মা এসেছিল পরীক্ষা করে দেখতে। দীক্ষার নামে সে বিচলিত হয় কিনা। ব্রাহ্মধর্মে থেকে হয় কিনা বিশ্রান্ত বিচ্যুত। না কি পরব্রহ্মের ধ্যানেই সে আরূঢ় থাকে?

[ক্রমশঃ

শার্দূল পর্ব

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

দীনবন্ধু দাদামশাই পত্রিকা খুলে কী যেন দেখছিলেন, আমি ঘরে পা দিতেই চোখ তুলে তাকালেন।

কম্বলের ওপর বসতে বসতে জিজ্ঞেস করলুম, কী খুঁজছেন দাদু পত্রিকায়? বার্তাকু তরুণ নিবেদ?

—উঁহু, বিয়ের তারিখ।

—কার?

—কার আবার? নিজের জন্যেই।

—বটে-বটে!—আমি খুশি হয়ে বললুম, পাত্রী কোথায়?

—এখনো তার জন্ম হয়নি। ভেবেছি তোমার একটি মেয়ে হলে তাকেই তোমার দিদিমা করে ঘরে আনব। কী বলো, বন্ধিকে মেয়ে দিতে আপত্তি আছে নাকি?

—কিছু মাত্র না। বিশেষ করে আপনার মতো সুপাত্র যখন।

—যা বলেছ!—দীনবন্ধু দাদামশাই খড়মড়ায় বলটা মুখে তুলে নিলেন: সুপাত্র নিশ্চয়। বয়েসও বেশী নয়—মোটে সত্তরের কাছাকাছি। যাক—ও ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এখন তোমার খবর কী? এই সাত সকালেই কোথায় গিয়েছিলে?

—রমেশ সরকারের ওখানে। ভদ্রলোকের একজোড়া ভালো বিলিতী কুকুর আছে—জানেন তো? তাদের বাচ্চা হয়েছে। একটা বাচ্চা কলকাতায় নিয়ে যাব ভেবেছি।

—কেন, কলকাতায় কুকুর পাওয়া যায় না?

—যায়—তবে বিস্তর দাম। তাও সব সময়ে বিশ্বাস করা যায় না। ঠকিয়ে দিতে পারে। আর এ হল খাঁটি-কুকুর। ভদ্রলোক বলতে গেলে বেচেই দিতে চেয়েছেন। কলকাতায় নিয়ে যেতে যা সামান্য ট্রেন-খরচা।

—হুঁ। দাদামশাই কিছুক্ষণ চুপ চাপ তামাক টানতে লাগলেন। বাগের ওপার থেকে ভিজে বাতাস এসে বাইরে সুপুরির বনে সাড়া তুলল, ঘোয়েদের শিস্ শোনা যেতে লাগল। একটা হলুদ রঙের প্রজাপতি এসে দাদামশাইয়ের মাথার কাছে জানলাটার ওপর উড়ে বসল।

আমি বললুম, দাদু, বিয়ে এবার সত্যিই হবে আপনার। প্রজাপতি এসে পৌঁছেছে।

দাদু যেন একটুখানি অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন, রসিকতাটায় সাড়া দিলেন না। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, কুকুর পুষে কী হবে হে? বরং বাঘ পোষো।

—বাঘ! বলেন কি!

—তাই তো বলছি। তা হলে দিদিমণির কাছে কোনোদিন প্রেস্টিজ নষ্ট হবার ভয় থাকবে না।

—আপনি পুষেছিলেন নাকি?

—নির্ঘাৎ।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, কই, কখনো শুনিনি তো?

—তুমি সেদিনের ছোকরা—আমার জীবনের তুমি কী জানো হে?—দাদামশাই ভ্রুকুটি করলেন: রবি ঠাকুরের ওপর দয়া করে জীবনস্মৃতি লিখলুম না—নইলে তোমাদের বাংলা সাহিত্যে একটা সেন্‌সেশন পড়ে যেত।

—তাতে আমার সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনার বাঘ পোষার পেছনে একটা গল্পের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে দাদু।

—গল্প আমি বলিনা—তোমার মতো বানিয়ে বানিয়ে বই লেখার অভ্যেস আমার নেই। আমি সর্বদা সত্যি ঘটনাই বলি।

আমি আর একটু ঘনিয়ে বললুম: তা হলে সত্যি ঘটনাটাই বলুন। কিন্তু একটা কথা। এতেও দিদিমা আছেন তো?

—আমার গল্পে পরকীয়ার কারবার নেই: দাদামশাই আবার ভুরু কোঁচকালেন: ও-সব শুনতে চাও তো এখান থেকে সরে পড়ো।

—আচ্ছা, বলুন—বলুন।

দাদামশাই আরম্ভ করলেন:

রচনা বইতে লেখা থাকে গরু অতিশয় নিরীহ প্রাণী। অত্যন্ত শোষ মানে, দুগ্ধদান করিয়া থাকে—ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এগুলো বাজে কথা। এক-একটা গরু এমন ভয়ানক হয় যে তাদের পাল্লায় পড়লে প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

দাদামশাইয়ের কথায় বাধা দিয়ে বললুম, আমি জানি—আমাকে একবার ষাঁড়ে তাড়া করেছিল। কিন্তু এটা কী হচ্ছে দাদু? বাঘের কথা বলতে গিয়ে আপনি গরু টেনে আনলেন?

দাদামশাই বললেন, আর তোমরা প্রফেসারেরা কী করো? গোরুর কথা বলতে গিয়ে ছেলেমেয়েদের আত্ম-জীবনী শোনাও না?

বললুম, দুটোই এক—কোনো তফাৎ নেই। কিন্তু বাঘে আর গোরুতে—

—কখনো কখনো এক ঘাটেও জল খায়। বাসড়া দিয়ো না, সেই কথাই বলছি।

—আচ্ছা—বলুন বলুন।

—সেবারে তোমার দিদিমা মাসখানেকের জন্যে বাপের বাড়ী রওনা হয়ে গেল। যাওয়ার আগে কস করে আমায় জিজ্ঞেস করে বসল: 'তোমার খুব কষ্ট হবে—না?'

কষ্ট তখন থেকেই হচ্ছিল, কিন্তু কথাটা শুনেই শোকরে ঘা লাগল। বললুম, 'একমাসের জন্যে যাচ্ছ, কষ্ট হবে কেন? তোমরা কি ভাবো তোমাদের বইলে আমাদের একটা দিনও চলে না?'

উল্‌টো ফল হল। সঙ্গে সঙ্গে মুখ ভার।

'বুঝেছি। আমি না থাকলেই তুমি খুশি পাও। আমি তোমার দু চক্ষের বিষ।'

বোঝাতে চেষ্টা করলুম কথাটা সে ভাবে বলিনি, কিন্তু তোমার দিদিমাকে তো জানোই। আমার বড় শালার সঙ্গে যখন নৌকোয় গিয়ে উঠল, তখনো মেঘ থম থম করছে। আর একটু সময় পেলে মিটিয়ে নেওয়া যেত কিন্তু—

দিন চারেক পরে চিঠি এল। শ্বশুর মশাই লিখেছেন। তাঁর পুত্র কন্যা নিরাপদে পৌঁছেছে এবং ভালো আছে। চিঠিটা বাবার নামে। তোমার দিদিমার শ্রীহস্তের একটি লাইনও আমি পেলুম না।

সাতদিন পরে আবার চিঠি এল। এবারও বাবার নামে। তাঁর বৌমা তাঁকে প্রণাম দিয়েছেন, কুশল জানিয়েছেন এবং জানতে চেয়েছেন। কিন্তু বিশ্ব-সংসারে আমার মতো একটা জীবের অস্তিত্ব যে কোথাও আছে সে চিঠি থেকে তার কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না।

প্রচণ্ড রাগ হল প্রথমে। তারপরে বৈরাগ্য এল—এ সংসারে কে কার? 'কা তব কান্তা'—ইত্যাদি ইত্যাদি। তখন মনে হল, 'মংস্য মারিব খাইব সুখে।' পুকুরঘাটে ছিপ নিয়ে বসলুম, কিন্তু ফাতনায় যখন টান পড়ে তখন আমার আর টান দেবার কথা মনে থাকে না।

এভাবে আর কতদিন চলে? শেষ পর্যন্ত একদিন মরীয়া হয়ে মা-কে বলে ফেললুম: শরীরটা ভালো যাচ্ছে না, দিনকয়েক ইসলামপুর মহলে গিয়ে কাটিয়ে আসি।

মা-র কাছে তো আর ফাঁকি চলে না, আমার দিকে এক নজরে তাকিয়েই বুঝতে পারলেন। বললেন, ইসলামপুরে গিয়ে দরকার কী—তার চাইতে বরং শ্বশুরবাড়ী থেকে ঘুরে আয়। ওখানে বৌমা রয়েছে—ঘর-আত্তিও হবে।

—যাই বলুন দাদু, আপনি কিন্তু বেজায় স্ত্রৈণ ছিলেন।

—স্ত্রৈণ!—দাদুর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল: ওরে গর্দভ—সংসারে কে স্ত্রৈণ নয়। স্বয়ং শিব মা-কালীর পায়ের তলায় শুয়ে আছেন—আমরা তো কোন্ ছার! জীবটি দেখতেই অবলা—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কানে ঘোচড় দিয়ে বেড়াচ্ছে। প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্বটা বোঝাতে হবে নাকি নতুন করে?

আমি বললুম, দরকার নেই—গল্পটা চলুক।

—আবার গল্প?

বললুম, ঘাট হ'য়েছে। সত্যি ঘটনাটাই বলুন।

চাকর এসে গড়গড়ায় তামাক বদলে দিয়ে গেল। চোখ বুজে গোটাকয়েক টান দিয়ে দাদামশাই আবার আরম্ভ করলেন:

সন্ধ্যের মুখেই শ্বশুরবাড়ী পৌঁছুব এই রকম একটা হিসেব ছিল। কিন্তু দু-দুটো বড়ো গাং পেরুতে হয়, তার নৌকো পড়ে গেল জোয়ারের সামনে। প্রায় ঘণ্টা চারেক দেরী হয়ে গেল। গুপ্ত চৌধুরীদের বাঁধা ঘাটে যখন নৌকো গিয়ে ভিড়ল, তখন রাত প্রায় এগারোটার কাছাকাছি।

আর পাড়াগাঁয়ের রাত এগারোটা—তার মানে তো বুঝতেই পারছ। গোটা কয়েক শেয়াল-কুকুর ছাড়া একটি প্রাণী জেগে নেই। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ তখনো ওঠেনি, ফাঁকা জায়গায় আবছা তারার আলো আর গাছপালার নীচে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ঘাট থেকে বাড়ীর সদর পর্যন্ত দুধারে ঘন গাছের ছায়া—সেই অন্ধকারেই চেনা পথ ধরে এগিয়ে চললুম।

হঠাৎ শব্দ হল: ফোঁস্।

সাপ? না—না, সাপ নয়। বেশ বড়ো সাইজের একটা জন্তু ঠিক সদরের সামনে। সেই বললে, ফোঁস্!

ভালো করে চেয়ে দেখি একটা সাদা-কালো ষোঁড়। ঠিক সদর দরজার সামনেটিতেই। এতক্ষণ শুয়েছিল বোধ করি, আমাকে দেখে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

বললুম, ভাগ ভাগ—পালা।

কিন্তু পালাবার পাত্র সে নয়। এতক্ষণে চোখ খানিকটা রপ্ত হয়ে গেছে অন্ধকারের সঙ্গে, আমি দেখতে পেলুম তার মাথার প্রমাণ সাইজের দুটো বড়ো বড়ো শিং। চোখে দুটো তার ধপ ধপ করে জ্বলছে।

আমি এক পা এগোতেই সে তিন পা এগোল। আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যেই এগোল খুব সম্ভব। কিন্তু গোরু-ছাগল-ষাঁড় যখন মাথা নিচিয়ে বেশ মন দিয়ে আসতে থাকে, তখন তারা যে ঠিক প্রণাম করতে আসছে না এটা আমার জানা ছিল। বিশেষ করে ওই ফোঁসফোঁসানিটা আরো সন্দেহজনক।

আমি শেষবার বললুম, এই ভাগো—ভাগো—

কিন্তু ভাগলপুরী গোরু নয়, সে ভাগল না। তার মাথা আরো নীচু হল, ফোঁসফোঁসানি আরো জোরালো হয়ে উঠল, তারপর সোজা আমাকে তাড়া করল। অর্থাৎ আমাকেই ভাগালো।

হাতের কাছে লাঠি-সোঁটা কিছু নেই, ইট-পাটকেলও কুড়িয়ে পেলুম না—নেহাৎ কাপুরুষের মতো দৌড়োনো ছাড়া আর উপায় রইল না। গোরুটাও যেমন বেপরোয়া তেমনি দুর্ধান্ত—এমন ভাবে তাড়া করেছে যে চোখে কানে কিছু আর দেখতে পাচ্ছি না আমি। বন-জঙ্গল ভেঙে খানিকটা ছুটেই একটা নারকেল গাছে হোঁচট খেয়ে একেবারে ঝপাং।

অর্থাৎ সোজা পুকুরে।

সাঁতলা আর পাঁকে মাখামাখি হয়ে, খানিকটা নোনতা জল গিলে উঠতে গিয়ে দেখি সেই গোরু! সামনে সোজা দাঁড়িয়ে। তেমনি ফোঁস ফোঁস করছে আর যেদিকেই উঠতে যাই—ঠিক সেখানে গিয়েই পোজিসন নিচ্ছে। এমন সাংঘাতিক হিংস্র গোরু তো জীবনে কখনো দেখিনি। সারারাত এই পুকুরেই কি ফেলে রাখবে নাকি আমাকে!

প্রাণের দায়ে চীৎকার ছাড়ব কিনা ভাবছি, তার আগেই খানিক দূরে একটা দোতলার ঘরে আলো জ্বলে উঠল। শ্বশুর মশাইয়ের হাঁক শুনতে পেলুম: 'ওরে মকবুল, লাঠি নিয়ে বেরো দেখি। পশ্চিমের পুকুরে বোধ হয় আবার মাছচোর এসে জাল ফেলেছে।'

সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর পাইক মকবুল সাড়া দিলে: 'যাই কত্তা, একেবারে ল্যাজা দিয়ে গেঁথে ফেলব।'

সর্বনাশ!

অগত্যা প্রাণপণে আমাকে চেঁচিয়ে উঠতে হল: 'চোর নয়—চোর নয়—আমি।'

'আমি কে!'—দোতলা থেকে শ্বশুর হাঁক ছাড়লেন: 'ব্যাটা রাত্তিরে পুকুরে নেমেছিস কী জন্যে? মকবুল, হতভাগা? মাছ চোরের কান ধরে নিয়ে আয় তো এখানে!'

'আ—আ—আমি জা-জামাই।'

জামাই! কিছুক্ষণ সব নিস্তব্ধ।

তারপরের ব্যাপারটা আর না-ই শুনলে! লোকজন এল, তাড়া খেয়ে গোরুটা পালালো, আমি ডাঙায় উঠলুম, সকলে হাসি চেপে আহা-আহা করতে লাগল। জামাই আদরের ত্রুটি হল না, কিন্তু আড়াল-আবডাল থেকে যে হাসির আওয়াজ উঠতে লাগল, তাতে মনে হল সীতার মতো পাতাল-প্রবেশ না হলে এ যাত্রা আমার আর লজ্জা রাখবার জো নেই।

মকবুল বললে, 'শ্বশুরবাড়ীর সেই রাতচোরা গোরুটা কর্তা। সারা রাত্তির চুরি করে বেড়ায় আর লোক দেখলেই তাড়া করে। বিষম ধনেজাতী। জামাইবাবুর আর দোষ কী—চৌকিদারকে পর্যন্ত চু দিয়ে খালে ফেলে দিয়েছিল।'

চৌকিদার থানে পড়ুক আর নদীতেই ডুবে মরুক, আমার তাতে কোনো সান্ত্বনা ছিল না। তার ওপর তোমার দিদিমা! তিনি যে-সব বাণী আমাকে শোনালেন—ওঃ!

—কী বাণী শোনালেন দাদু?

—চোপ! দাম্পত্য-রসালাপের সে-সব গোপন কথা তোমাকে বলতে আছে নাকি? তবে তাঁর উপদেশের মোদ্দা কথাটা হল, কাল থেকে আমি যেন আর পথে ঘাটে না বেরোই। গ্রামের রাস্তায় বিস্তর ছাগল-ভেড়া চরে বেড়ায় তাদের একটা যদি আবার আমাকে তাড়া করে বসে, তা হলে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

অর্থাৎ শ্বশুরবাড়ীতে, স্ত্রীর কাছে—মান-সম্মান বলে কিছু আর রইল না। একবার ভাবলুম, কালই এখান থেকে সোজা চম্পট দেব, তারপরেই মনে হল, না—তার আগে যেমন করে হোক নিজের হারানো প্রেস্‌টিজ ফিরে পাওয়া দরকার। গোরুর হাতে নাজেহাল হয়ে গর্দভের মতো পালাব না—সিংহের মতো বিক্রম দেখিয়ে বিদায় নেব।

কিন্তু বিক্রমটা দেখানো যায় কী করে?

কেউ জলে ডুবছে দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে উদ্ধার করতে পারি; কারো বাড়ীতে আগুন লেগেছে—প্রাণ তুচ্ছ করে ভেতরে ঢুকে কাউকে বের করে আনলুম। সবই হতে পারে—কিন্তু আপাতত এমন একটা কিছু ঘটবে বলে মনে হল না। নিদেন পক্ষে জঙ্গলে ঢুকে একটা বাঘও যদি মেরে আসতে পারি—

সেটা এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়—অন্তত আমাদের এই জেলায়। বাঘ খুঁজে বের করতে বেশি কষ্ট করতে হয় না, বিশেষ করে শীতকালে তারা নিজেরাই গ্রামে বেড়াতে আসে, কারো কুকুর, কারো ছাগল মুখে করে পালায়। কিন্তু বাঘের কথা ভাবতে নিজেরই পিলে চমকে উঠল। বাবা অবশ্য বাঘ-কুমির মেরেছেন অনেক বার, কিন্তু আমি কোনোদিনই যুদো হাঁসের বেশি এগোতে পারিনি। তা ছাড়া কলেজে সংস্কৃত পড়াই আবার কাল হয়েছিল। তোমার দিদিমার জন্য শিকার করবার জন্যে ভালো ভালো সংস্কৃত শ্লোক বিস্তর শানিয়ে রেখেছিলুম কিন্তু আর শতক কিংবা গাহা সতসই দিয়ে বাঘের বিশেষ কিছু করা যাবে বলে মনে হল না।

পরের দিনটা এমনি করেই দারুণ ছটফটানির মধ্যে কাটল। রুই মাছের মুড়ো খেতে গিয়ে বোধ হল খাবা চিবুচ্ছি, ক্ষীরের বাটি মুখে তুলে মনে হল কেউ যেন নিমপাতা বাটা খেতে দিয়েছে। তার ওপর যখন বিকেলে মকবুল এসে খবর দিলে যে সে শ্বশুরবাড়ীতে বলে এসেছে যতদিন জামাইবাবু এখানে থাকবে ততদিন তারা যেন রাত্রে গোরুটাকে বেঁধে রাখে, তখন আর সহ্য হল না। আমি তাকে—অর্থাৎ তোমার দিদিমাকে বললুম, 'আমি একটু রায়নগর যাচ্ছি।'

রায়নগর পাশের গ্রাম—মাঠ পেরিয়ে মাইল দুই দূরে। কলেজের এক সহপাঠীর বাড়ী সেখানে। জমি জমা আছে, তা ছাড়া গ্রামের স্কুলে মাষ্টারীও করে। শ্বশুরবাড়ী প্রায় কণ্টকশয্যা হয়ে উঠেছিল, ভাবলুম কিছুক্ষণ তার ওখান থেকে আড্ডা দিয়ে আসি।

তারা মুচকে হেসে বললে, 'যাবে যাও। কিন্তু সন্ধ্যের আগেই ফিরে এসো। যদি আবার সেই গোরুটা—'

মাথায় রক্ত চড়ে গেল। বললুম, 'ফিরতে একটু রাত হবে।'

'তা হলে লণ্ঠন নিয়ে একজন চাকর বরং সঙ্গে যাক।'

'আমি তোমাদের মতো অবলা নই'—বলে আমি হন হন করে বেরিয়ে গেলুম।

বন্ধুটি বাড়ীতেই ছিল, দেখা হতে ভারি খুশি হল। তারপর গল্প-গুজব জল-খাবার। এক গ্লাস সরবৎও তার সঙ্গে। কিসের সরবৎ জানিনা, কিন্তু খেতে বেশ লাগল।

'সরবৎটা কিসের ভাই!'

বন্ধুটি হেসে বললে, 'কেন, বুঝতে পারিসনি? সিদ্ধির।'

সিদ্ধি! আমি চমকে উঠলুম: 'বলিস্ কিরে?'

'কেন, খাসনে?'

'না ভাই।'—আমার ভয় ধরল: 'শ্বশুরবাড়ীতে এসেছি—নেশা-টেশা হয়ে শেষ পর্যন্ত কেলেঙ্কারী করব যে।'

'ভয় নেই, সিদ্ধি সামান্যই ছিল। কিছু হবে না ওতে—শুধু মেজাজটা খুলে যাবে একটু।'

আমার দুর্ভাবনার শেষ রইল না। কিন্তু ভয় পেতে পেতে হঠাৎ একসময় টের পেলুম মনটা বেশ খুশিতে ভরে উঠছে। বন্ধুটি যেই কোনো কথা বলছে, আমি সঙ্গে সঙ্গে হাসিতে গড়িয়ে পড়ছি। এমনকি, দেওয়ালের গায়ে যে টিকটিকিটা গোকা ধরছিল, তাকে দেখে পর্যন্ত ভারি হাসি পাচ্ছিল আমার।

বেশ সময় কাটল। তারপর যখন ঘড়িতে টং টং করে ন'টা বেজেছে তখন আমার খেয়াল হল।

'এই যা—অনেক রাত হল যে!'

বন্ধুটি বললে, 'চল, লণ্ঠন ধরে তোকে মাঠ পার করে দিয়ে আসি।'

আমার তখন এমন অবস্থা যে ইচ্ছে করলে প্রজাপতির মতো হাওয়ায় ডানা মেলে দিতে পারি। হেসে বললুম, 'কিছু দরকার নেই, একেবারে নাচতে নাচতে চলে যাব।'

দুধারে ধানকাটা মাঠ, আকাশ ভরা ঝকঝকে তারার আলো। চলতে চলতে চমৎকার লাগছিল। কালকের দুর্ঘটনার কথা ভুলে গেছি—সেই মারাত্মক গোরুটার কথা মুছে গেছে মন থেকে—সারা শরীরে যেন বসন্তের বাতাস বইছে। চলতে চলতে ঝিজু রায়ের গান গলা ছেড়ে গাইতে শুরু করেছি।

'এক যে ছিল শেয়াল,
তার বাপ দিয়েছিল খেয়াল,
আর সে গাইছিল খেয়াল
কা হুয়া কা হুয়া কা হুয়া—'

জুতোর ভেতরে ইট-কিট কিসের একটা টুকরো ঢুকে যাওয়াতে আমাকে থেমে পড়তে হল। সামনেই একটা কালভার্ট, সেইটের ওপর বসে জুতো খুলে সেটা বের করে ফেললুম। তখন অদ্ভুত সুখের আমেজে আমার দুচোখ প্রায় বুজে আসবার দশা হয়েছে। জুতোটা পায়ে পরে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় কী যেন একটা জানোয়ার এসে আমার পায়ে মাথা ঘষতে লাগল।

চমকে উঠতেই আমাদের আওয়াজ উঠল: ঘর্-র্-র্—

চোখ দুটো যেন আমেজে জড়ানো, ভালো করে বুঝতে পারলুম না। মনে হল একটা বড়ো জাতের কুকুর। গোরা কুকুর নিশ্চয়। যে-ভাবে মাটিতে মাথা ঘষছে তাতে মানুষের যে দারুণ অনুগত সেটাও বুঝতে বাকী রইল না।

সিঁড়ির ফলে মেজাজ তখন এতই দিল দরিয়া যে আমি ভয় তো পেলুমই না, বরং দু-তিনবার তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলুম। তারার আলোয় কুকুরটাকে যেটুকু দেখা যাচ্ছিল, তাতে মনে হচ্ছিল চেহারাটা ভালোই—দিব্যি সাদা-কালোয় মেশানো।

আমি উঠে পা বাড়াতেই সেও আমার পিছে পিছে চলল। প্রথমে বললুম, 'বাড়ী যা'— কিন্তু সে গেল না, আমাকেই তার বিশেষ পছন্দ হয়েছে বলে মনে হল। পোষা কুকুর অনেক সময় মনিব কিংবা বাড়ী হারিয়ে ফেললে এ-রকম করে—যাকে মনে ধরে তার পিছু নেয়। আমি বললুম, 'আচ্ছা, চল্ তবে।'

মিনিট পনেরো পরে গ্রামের সীমানায় এসে পড়লুম। রাত পৌণে দশটার মতো হবে, কিন্তু আজও এর মধ্যেই গ্রাম প্রায় ঘুমিয়েছে বলা চলে। এদিক-ওদিক আলো জ্বলছিল বটে, কিন্তু লোকের চলাচল ছিল না। আমি আর সঙ্গী কুকুরটা নির্জন পথ দিয়ে এগিয়ে চললুম।

একটা মজার ব্যাপার চোখে পড়ল এই সময়।

গ্রামের রাস্তায় দু-একটা কুকুর শেয়াল-বাঘুড়ের ছায়া দেখে অভ্যেসমতো চেঁচিয়ে চলেছিল। কিন্তু আমাকে দেখবামাত্র—কিংবা আমার সঙ্গের সাদা-কালো কুকুরটাকে দেখেই তারা ল্যাজ গুটিয়ে 'কুঁ কুঁ' করে অদ্ভুত আওয়াজ করতে লাগল আর যে যেদিকে পারে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগালো।

মনে হল, ব্যাপার তো মন্দ নয়। নিশ্চয় কোনো অবধূতগত বিলিতী কুকুর—যাকে দেখে দেশী নেড়ী কুত্তার নাড়ি ছেড়ে যায়। ঠিক করলুম, কুকুরের মালিক যদি দাবি করতে না আসে, তা হলে এটাকে আমি পুষব। রাত-বিরেতে পথে ঘাটে এ-রকম একটা সঙ্গী থাকা ভালোই।

সেই সময় আবার সেই অলক্ষুণে গোরুটাকে মনে পড়ে গেল। যদি ঘণ্ডেরা সেটাকে না বেঁধে থাকে? যদি আজও সে সদরের সামনে তেমনি করে বসে থাকে?

কিন্তু একটা প্রকাণ্ড কুকুর আছে সঙ্গে। গোরুটার মহড়া সেই আজ নিতে পারবে।

বাড়ীর কাছে পৌঁছুতেই পায়ের আওয়াজে সদর দরজা খুলে মকবুল পাইক বেরিয়ে এল—তার হাতে একটা লণ্ঠন। একগাল হেসে বললে, 'আজ আর ভয় নেই জামাইবাবু, গোরু তাড়ানোর জন্যে আমি—'

মুখের কথা মুখেই রইল, তারপরেই একটা দারুণ চিৎকার ছাড়ল মকবুল: 'ওরে বাপরে!'

হাতের লণ্ঠন আছড়ে পড়ল তার—ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল বাড়ীর মধ্যে।

ব্যাপারটা বুঝতে পারলুম না। নিশ্চয় সঙ্গের কুকুরটাকে দেখেই ভয় পেয়েছে সে। মনে মনে হেসে আমি বাড়ীর ভেতরে পা দিলুম।

—'কী হল রে মকবুল?'—বলে আমার বৃদ্ধপ্রপিতামহী বারান্দা থেকে নেমে এলেন।

আমি হেসে বললুম, 'রাস্তা থেকে একটা কুকুর ধরে এনেছি পুঁটীমা, তাই দেখেই বীরপুরুষ মকবুল—'

আর বলতে হল না। 'ও মাগো'—বলে বৃদ্ধপ্রপিতামহী এক লাফে বারান্দায় উঠলেন, তার পরেই ধড়াম করে খিল পড়ল তাঁর ঘরে। কিন্তু সেইখানেই তিনি থামলেন না। বাড়ী কাটিয়ে তাঁর চিৎকার উঠতে লাগল: 'ওগো, জামাই কী সর্বনেশে কাণ্ড করেছে গো—বাড়ীর মধ্যে কী ধরে এনেছে গো—'

'কী হয়েছে—কী হয়েছে' বলে ঘণ্ডর বেরুলেন এবং তিনিও তৎক্ষণাৎ দ্বিগুন বেগে বারান্দায় চড়ে বসলেন। বললেন: 'ওরে বাবা! বন্দুক—আমার বন্দুক'—

আমি হেসে বললুম, 'রাস্তা থেকে ধরে এনেছি এটাকে। এত ভয় পাচ্ছেন কেন আপনারা?'

'রাস্তা থেকে বাঘ ধরে আনলে ? তুমি মানুষ না আর কিছু ?'—শ্বশুর তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন।

বাঘ।

চারদিকের আলোতে এইবার এতক্ষণে সন্দীটির ওপর চোখ পড়ল আমার। সিন্ধির নেশাও খানিকটা ফিকে হয়ে এসেছে তখন। চেয়ে দেখলুম—বাঘই বটে! প্রকাণ্ড চিতাবাঘ একটা। রাস্তায় আসতে আসতে প্রায়ই কোত্থেকে একটা দুর্গন্ধ আমার নাকে আসছিল, এক মুহূর্তে তার রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল!

আমি তখন লাফিয়ে বারান্দায় কেন, দোতলার ছাদে উঠতে পারলেও বেঁচে যাই। কিন্তু কিছুই করা গেল না। যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলুম, সেইখানেই স্রেফ জমে গেলুম আর মাথার চুলগুলো সোজা খাড়া হয়ে উঠল আমার।

বাড়ীতে তখন তুমুল কাণ্ড শুরু হয়ে গেছে। আর সেই গণ্ডগোলে বাঘটাও কেমন ঘাবড়ে গেল। হঠাৎ 'গাঁক' করে একটা ডাক ছেড়ে—বেড়ালের মতো এক লাফে পাশের প্রাচীরটা টপকে ওদিকের সুপুরি বাগানে উধাও হল সে। শ্বশুর মশাই তখন তাঁর বন্দুকে টোটা ভরবার উপক্রম করছেন।

তারপর? তারপরের টুকুও কি আর বলতে হবে? সোরগুর তাড়া খেয়ে যে বহুনাম হয়েছিল, হাজার গুণ ক্ষতি-পূরণ হয়ে গেল তার। জামাই আদর তো জুটছিলই, এবার রাজ্যের অম্বর পেতে শুরু করলুম। আর গ্রামের লোকে বলতে লাগল: হ্যাঁ, জামাই পেয়েছেন বটে চৌধুরী মশাই! খালি হাতে জলজ্যান্ত বাঘ ধরে আনে।

দাদামশাই থামলেন।

আমি মাথা চুলকে বললুম, কিন্তু দাদু—

—আবার কী?

—বলেছিলেন সত্যি ঘটনা শোনাবেন কিন্তু এযে রূপকথার গল্পকেও ছাড়িয়ে গেলেন। আপনাকে দেখে বুনো বাঘ বশম্বদ হয়ে হাঁটুতে মাথা ঘষতে থাকবে—এতটা তো হজম করা শক্ত।

দাদু বললেন, আরে সে খটকা কি আমারও ছিল না? চুপিচুপি খোঁজ নিতে নিয়ে দিন দুই পরে জানতে পারলুম, পাশের গ্রামে একদল 'বেবাজিয়া' বা বেদে এসেছিল। তাদের নৌকো থেকে একটা পোষা চিতা বাঘ সন্ধ্যেবেলায় কী করে পালিয়ে যায়। পরদিনই অতিশ্যি ভোরে তারা নদীর ধারেই বাঘটাকে খুঁজে পেয়েছিল।

আমি বললুম, পালিয়ে ভালোই করেছিল—নইলে এরপরে আর শ্বশুর বাড়ীতে যাওয়া হত না আপনার। কিন্তু আরো একটা কথা বাকী রইল যে?

—হুঁ, বলো।

—দিদিমা কী করলেন?

—গলায় আঁচল দিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম। বললে, 'আমায় মাপ করো—তোমাকে চিনতে পারিনি।'

আমি আবার জিজ্ঞেস করলুম: শুধুই শুকনো প্রণাম দাদু? আর কিছু নয়?

—বেরোও, বেরোও এখান থেকে—কতক্ষণ কোথাকার।

দাদামশাই গর্জন করলেন, আমিও হেসে বেরিয়ে পড়লুম বারান্দায়।

———

ইতিহাসের পাতা থেকে

বাংলার লুপ্ত গৌরব ঃ তাম্রলিপ্তী

অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কয়েক হাজার বছর আগে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে তাম্রলিপ্তী নামে এক সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ছিল। এই জনপদের কূলে ছিল সমুদ্র। এই স্থানটি এখন একটি ছোট গ্রাম নগরে পরিণত হয়েছে। এর নাম এখন তমলুক।

সমুদ্র অনেক দূরে সরে গেছে। এখন তমলুকের ধার দিয়ে রূপনারায়ণ প্রবাহিত।

পুরাকালে তমলুকের অনেকগুলি নাম ছিল। তমোলিপ্তী, তমোলিপ্ত, তাম্রলিপ্ত, তাম্রলিপ্তী, তমালিকা, তমালিনী, তমোলিপ্তি।

তাম্রলিপ্তী যে কতকালের প্রাচীন নগরী তার নির্ণয় করা দুরূহ। মহাভারত-পুরাণে এর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। দিগ্বিজয় প্রকাশ নামক গ্রন্থে আছে; "যে সময়ে বৃন্দাবনে বাসুদেব রাসলীলা করছিলেন সেই সময় ওঁর ইচ্ছায় চন্দ্রসূর্যের স্তম্ভন হয়েছিল। পরে সূর্যদেব সারথিকে বলেছিলেন আমি তাড়াতে দিন করব, তুমি উদয়াচল থেকে শিগ্‌গির এসো। সারথি রশ্মি নিয়ে উঠলে তাতে জ্যোৎস্না পড়ল, তখন অরুণ সমুদ্রপ্রান্তে লিপ্ত হল। যে স্থানে লিপ্ত হয়েছিল সেই জায়গা তাম্রলিপ্ত নামে খ্যাত হয়।"

আবার কেউ কেউ বলেন, সম্ভবত কোন রাজার নাম অনুসারে এই স্থানের নামকরণ হয়েছে। তাম্রলিপ্ত নামে এই স্থানে একজন যে রাজা ছিলেন তা মহাভারতের সভাপর্বে লেখা আছে: "মোদা গিরিতে পৌঁছে পাণ্ডবরা সেইখানকার রাজাকে যুদ্ধে হারালেন: তারপর বঙ্গরাজ্যের প্রতি ধাবমান হলেন, এবং সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি বঙ্গদেশের রাজাদের মহাসাগর কূলবাসী ম্লেচ্ছদের জয় করলেন।"

মহাভারত থেকে আরও জানা যায়, তাম্রলিপ্তীর রাজা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় গিয়েছিলেন এবং সেখানে বিশেষ খাতির পেয়েছিলেন। এ ছাড়া রাজসূয় যজ্ঞেও তাম্রলিপ্তীর রাজা নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এই সমস্ত বৃত্তান্ত পড়ে বোঝা যায়, পুরাকালে তাম্রলিপ্তী একটি বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ও উল্লেখযোগ্য জায়গা ছিল।

জেনারেল কানিংহাম সাহেবের ভারতের প্রাচীন ভূগোল নামে বইতে পাওয়া যায়। তাম্রলিপ্তীর পূর্বদিকে ছিল হুগলী নদী, উত্তরে বর্ধমান ও কালনা, পশ্চিমে কলিঙ্গদেশ ও দক্ষিণে সমুদ্র।

সংস্কৃত কবিদের লেখা থেকে জানা গেছে, তাম্রলিপ্তী গঙ্গানদীর মোহনার কাছে সমুদ্রকূলে অবস্থিত ছিল। কিন্তু কালক্রমে সেই মোহনায় পলি পড়ে চর হয়। সেই চর ক্রমে বিস্তৃত হয়ে প্রায় পঞ্চাশ ষাট মাইল সমুদ্র বুজিয়ে ফেলে।

তাম্রলিপ্তো প্রদেশস্ত বণিকস্য নিবাসকৃৎ ইত্যাদি।

"বণিকদিগের বাসভূমি তাম্রলিপ্ত প্রদেশ বারো যোজন বিস্তৃত ও হ্রদ অথবা রূপনারায়ণ নদের নিকট অবস্থিত।"

তাম্রলিপ্তীতে কোন্ বংশের রাজারা সব প্রথম রাজত্ব করেছিলেন এবং কে-ই বা প্রথম রাজা ছিলেন তা ঠিক জানা যায় না। সবশুদ্ধ এখানে তিন বংশের রাজারা রাজত্ব করেছেন দেখা যায়। প্রথম মযূরবংশীয়, তারপর রায়বংশীয় এবং পরে কৈবর্তবংশীয় রাজারা এখানে আধিপত্য করেন।

মযূরবংশের মোট চারজন রাজার নাম পাওয়া যায়, মযূরধ্বজ, তাম্রধ্বজ, হংসধ্বজ এবং গরুড়ধ্বজ। এঁদের পরেই রায়বংশের রাজত্ব আরম্ভ হয়। এঁদের প্রথম রাজার নাম বিদ্যাধর রায়। এই বংশের মোট আটাশজনের নাম ইতিহাসে আছে। শেষের দিকে এই রাজ্য দুই অংশে বিভক্ত হয়। তারপর আবার ১৭০৭ সালে রাজা নরনারায়ণ সমস্ত রাজত্বটাই লাভ করেন। নরনারায়ণের দুই ছেলে। বড় রূপনারায়ণ বাপের মৃত্যুর পর রাজা হয়ে ১৭৪২ সালে পরলোকগমন করেন। তখন ছোট ভাই কমলনারায়ণ রাজা হন। ইনি ১৭৫৬ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তারপর মোগল সরকারকে রীতিমত কর দিতে অস্বীকার হওয়ায় রাজ্যচ্যুত হন এবং খোজা নির্জা হেসার আলি বেগ রাজ্য অধিকার করেন; নবাব উপাধি ধারণ করে মাত্র এক বছর রাজত্ব করে হেসার আলি বেগ মারা যান।

তারপর কিছুদিন তমলুক পরগণা মোগল সরকারের হাতে ছিল। তখন মোগল সাম্রাজ্যের পড়তি দশা। ইংরেজরা তখন বাংলা দেশটাকে রীতিমতো কব্জা করে নিয়েছে। তমলুকও ইংরেজদের তাঁবে চলে গেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মহারাজ নন্দকুমার ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের বহু চেষ্টায় জমিদারী কমলনারায়ণের দুই স্ত্রী রাণী সর্বেশ্বরিপ্রিয়া ও রাণী কৃষ্ণপ্রিয়াকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

এই দুই রাণীর দুই উত্তরপুরুষ লক্ষ্মীনারায়ণ ও রুদ্রনারায়ণ পরস্পর বিবাদ করে প্রায় সমস্ত জমিদারীটাই নষ্ট করে ফেলেছেন। মহিষাদলের রাজা এই জমিদারীর অনেকখানি দখল করেছেন। এখন যিনি আছেন তিনি নামেই জমিদার, সে জৌলুষোলাও চটক কিছুই আর নেই।

তাম্রলিপ্তী বা আধুনিক তমলুক এক মহাতীর্থ স্থল। এখানে অনেক দেব দেবী আছেন। পুরাকালে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, পৃথিবীর মধ্যে কোন জায়গায় থাকতে তাঁর সবচেয়ে ভাল লাগে। উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, "তমোলিপ্ত অপেক্ষা আমার প্রীতিকর অপর স্থান আর নেই। লক্ষ্মী যেমন আমার বক্ষঃস্থল পরিত্যাগ করেন না, তেমনি আমিও তমোলিপ্ত পরিত্যাগ করতে পারবো না। হে কৌন্তেয়! তুমি নিশ্চয় জেনো, আমি কালে কালে যুগে যুগে আর আর সমস্ত তীর্থ ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু তমোলিপ্ত তীর্থ কদাচ পরিত্যাগ করব না।"

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে আছে, দক্ষযজ্ঞে সতী স্বামীনিন্দা শুনে দুঃখে প্রাণত্যাগ করেন আর সেই ঘটনায় মহাদেব ক্রোধান্ধ হয়ে যজ্ঞ নষ্ট করে দক্ষের মুণ্ডচ্ছেদ করেন। কিন্তু ব্রহ্মবধ মহাপাপ, তাই দক্ষের ছিন্ন মাথা মহাদেবের হাত থেকে মুক্ত হল না, হাতে আটকেই রইল। মহাদেব এই মহাপাপ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে সকল তীর্থে ঘুরলেন। কিন্তু কোন ফল হল না। শোকে সন্তাপে তিনি মুহ্যমান হলেন। তখন নারায়ণ তাঁর কাছে গিয়ে জানালেন যে তিনি যদি তাম্রলিপ্তী নগরে গিয়ে কপালমোচন নামে পাপ নাশক সরোবরে স্নান করে বর্গভীমা নামে যে দেবী সেখানে আছেন তাঁকে দর্শন করেন তাহলে এই পাপ দূর হবে। মহাদেব তাই করলেন এবং তখন তাঁর হাত থেকে সেই ছিন্নমুণ্ড খসে পড়ল।

এই কপালমোচন দীঘির নামকরণ বিষয়ে দুটি কিংবদন্তী আছে। প্রথমটি এই যে, মহাদেব ঐ সরোবরে স্নান করলে তাঁর হাত থেকে নরমুণ্ড খসিত হয়েছিল বলেই তার নাম হয় কপালমোচন।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের শ্লোকে দেখা যায় যে পুরাকালে এখানে ঐ নামে এক দীঘি ছিল। বহুকাল হল তার অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে। সম্ভবত রূপনারায়ণ নদীর গর্ভে তা বিলীন হয়েছে। এখনও প্রতি বছর নানা যোগে অসংখ্য স্ত্রীপুরুষ বর্গভীমা দেবীর মন্দিরের নীচে যে জলাশয় আছে তাকেই কপালমোচন জ্ঞান করে এবং সেই জলে স্নান করে পুণ্য কাজ সম্পাদন করে।

অন্য কিংবদন্তীটি সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের: মহারাজ যুধিষ্ঠির কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর জ্ঞাতিবধ জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যে অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন। যজ্ঞের আয়োজন হলে তিনি পাণ্ডবসখা শ্রীকৃষ্ণকে সেই ঘোড়ার রক্ষক নিযুক্ত করে করে ঘোড়া ছেড়ে দেন। সেই যজ্ঞাশ্ব বহু দেশ ঘুরে এই রাজ্যে এলে রাজা তাম্রধ্বজের পুত্ররা সেই ঘোড়াকে ধরে রাখে। ফলে অর্জুনের সঙ্গে তাদের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। কিন্তু অর্জুন কিছুতেই তাদের তাড়াতে পারেন না। যুদ্ধের পরিশ্রমে তাঁর কপাল বেয়ে ঘাম ঝরতে থাকে এবং সেই ঘাম নদীর আকার ধারণ করে প্রবাহিত হয়। কপালের ঘাম দিয়ে এই দীঘি উৎপন্ন হয়েছিল বলে এর নাম হয় কপালমোচন।

তারপর শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে ঘোড়া ফিরিয়ে নেবার জন্যে দু'জনে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে তাম্রধ্বজের রাজসভায় উপস্থিত হলেন। সেখানে পৌঁছবার পর যখন শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুন ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করলেন তখন রাজা খুবই বিস্মিত হলেন এবং বিধিমতে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করলেন। শ্রীকৃষ্ণ খুশী হয়ে রাজাকে বর চাইতে বললেন। রাজা তাম্রধ্বজ প্রার্থনা করলেন, তিনি যেন প্রতিদিন নিজের ঘরে কৃষ্ণার্জুনের যুগলমূর্তি দেখতে পান। ভগবান তাঁর বর পূর্ণ করলে তাম্রধ্বজ যজ্ঞাশ্ব ফিরিয়ে দিলেন এবং আর এক দফা তাঁদের স্তবস্তুতি করলেন। অর্জুন আর শ্রীকৃষ্ণ খুশী হয়ে ঘোড়া নিয়ে চলে গেলেন। তারপর তাম্রধ্বজ কৃষ্ণার্জুনের পাথরের মূর্তি তৈরী করলেন এবং একটি সুরম্য মন্দিরের মধ্যে তা প্রতিষ্ঠিত করলেন। সেই মন্দির আজো আছে এবং সেই যুগল মূর্তি জিষ্ণুহরি নামে আজও পূজা পায়।

বর্গভীমা নামে যে দেবীর উল্লেখ করা হয়েছে তাঁর সম্বন্ধেও দুটি কিংবদন্তী আছে।

একটিতে জানা যায়, নরপতি তাম্রধ্বজের নিয়োজিত এক জেলের স্ত্রী প্রত্যহ রাজার সংসারে মাছ সরবরাহ করত। একদিন সে বনের মধ্যে দিয়ে একটি সরু পথ ধরে মাছ নিয়ে যাচ্ছিল এমন সময় দেখতে পেলে পাশে একটি ছোট জল ভর্তি গর্ত রয়েছে। জেলের স্ত্রী সেই গর্ত থেকে জল নিয়ে মাছের গায়ে ছিটিয়ে দিলে, যাতে মাছটা তাজা দেখায়। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, সেই জল মাছের গায়ে পড়তেই মরা মাছ জ্যান্ত হয়ে উঠল। ক্রমে খবরটা রাজার কানে পৌঁছোলো। তিনি কৌতূহলী হয়ে জায়গাটা দেখতে এলেন। দেখলেন, সেখানে একটি বেদী আর তার ওপর একটি পাথরের দেবীমূর্তি রয়েছে। অতঃপর তাম্রধ্বজ তাঁর পূজার ব্যবস্থা এবং একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

অন্য কিংবদন্তীটি থেকে জানা যায়, ধনপতি নামে এক বিখ্যাত সওদাগর বাণিজ্যের জন্যে সিংহলে যাবার পথে এইখানে আসেন। এখানে দু'একদিন থাকার সময় তিনি দেখেন যে পথে একব্যক্তি একটা সোনার গাড়ু নিয়ে যাচ্ছে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন যে এমন সুন্দর সোনার গাড়ু সে কোথায় পেলে। উত্তরে লোকটি জানাল যে নগরের পিছনে জঙ্গলের মধ্যে একটি কুণ্ড আছে তাতে এই পিতলের গাড়ুটি ডুবতেই এটি সোনার গাড়ু হয়ে গেছে। এই কথা শুনে ধনপতি সওদাগর সেখানকার বাজার থেকে বহু পিতলের জিনিষ কিনে সেই কুণ্ডের জলে ডুবিয়ে রাখলেন। একে একে প্রত্যেকটি জিনিষই সোনার জিনিষে রূপান্তরিত হয় এবং সওদাগর সেই ভাল ভাল সোনা নিয়ে সিংহলে

যান আর সেগুলি বিক্রি করে অনেক টাকা লাভ করেন। বাড়ি ফেরার পথে সওদাগর এখানে এসে বহু টাকা খরচ করে একটি দেবী মন্দির তৈরী করে দিয়ে যান।

এই মন্দিরের শিল্পনৈপুণ্য অপূর্ব। সাধারণ লোকের ধারণা, এ-মন্দির স্বয়ং বিশ্বকর্মার সৃষ্টি। ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব এই মন্দিরের উল্লেখ করেছেন।

শোনা যায়, ১৫৬৭-৬৮ সালে দুর্ধর্ষ কালাপাহাড় উড়িষ্যা ধ্বংস করে ফেরবার পথে এই জনপদে আসেন এবং এই মন্দিরের দেবীমূর্তি দেখে এমনই অভিভূত হন যে তিনি এই মন্দিরের ধ্বংস করবার কোন চেষ্টা করেন না।

এমন কি মহানিষ্ঠুর বর্গীসৈন্যরাও এই দেবী দর্শন করে ভয় পায় এবং কোন প্রকার উৎপাত না করেই এই জনপদ পরিত্যাগ করে।

প্রাচীন বাংলায় যে সকল নগরী বাণিজ্যের জন্যে প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল তাদের মধ্যে তাম্রলিপ্তীই সর্বাগ্রগণ্য। সুবর্ণগ্রামও বাণিজ্যের জন্যে বিখ্যাত ছিল বটে, কিন্তু তাম্রলিপ্তীর মত নয়। সে সময় বহু বড় বড় সমুদ্রগামী নৌকা তাম্রলিপ্তী থেকে দূর প্রাচ্য দেশে এবং আরব ও চীন দেশেও যাতায়াত করত। বৌদ্ধদের সময় ঐতিহাসিকরা তাম্রলিপ্তীকে একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধবাণিজ্যকেন্দ্র বলে বর্ণনা করেছেন।

চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান ভারত ভ্রমণ শেষ করে দেশে ফেরবার সময় তাম্রলিপ্তে আসেন এবং দু'বছর এখানে বসবাস করবার পর একটি প্রকাণ্ড বাণিজ্যতরীতে চেপে সিংহলে যান।

অপর চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ-ও এখানে এসেছিলেন। সেকথা ঐতিহাসিক এলফিনস্টোন লিখে গেছেন।

এই সব পরিব্রাজক ও ঐতিহাসিকদের লেখা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে প্রাচীনকালে তমলুক একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল এবং এখানে অন্য দেশের বহু বণিক নানাবিধ দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান রত্নাদি বিক্রির জন্যে নিয়ে আসতো। এখান থেকে সিংহল প্রভৃতি স্থানে নিয়মিত জলপথে যাতায়াত চলত এবং ভারতবর্ষের বণিকরা এখানকার বন্দর থেকে অসমসাহসে বড় বড় অর্ণবযানে সমুদ্র পার হয়ে নানা বিদেশে গমন করত।

লোকশিক্ষা বড় কঠিন।

যদি তিনি আদেশ দেন, তা হলে হতে পারে। আদেশ না হলে কে তোমার কথা শুনবে? আর যদি আদেশ হয়, তখন সে কথার জোর কত? পর্বত টলে যায়।

শুধু লেকচার? দিন কতক লোক শুনবে, তারপর ভুলে যাবে।

—ঠাকুর রামকৃষ্ণ

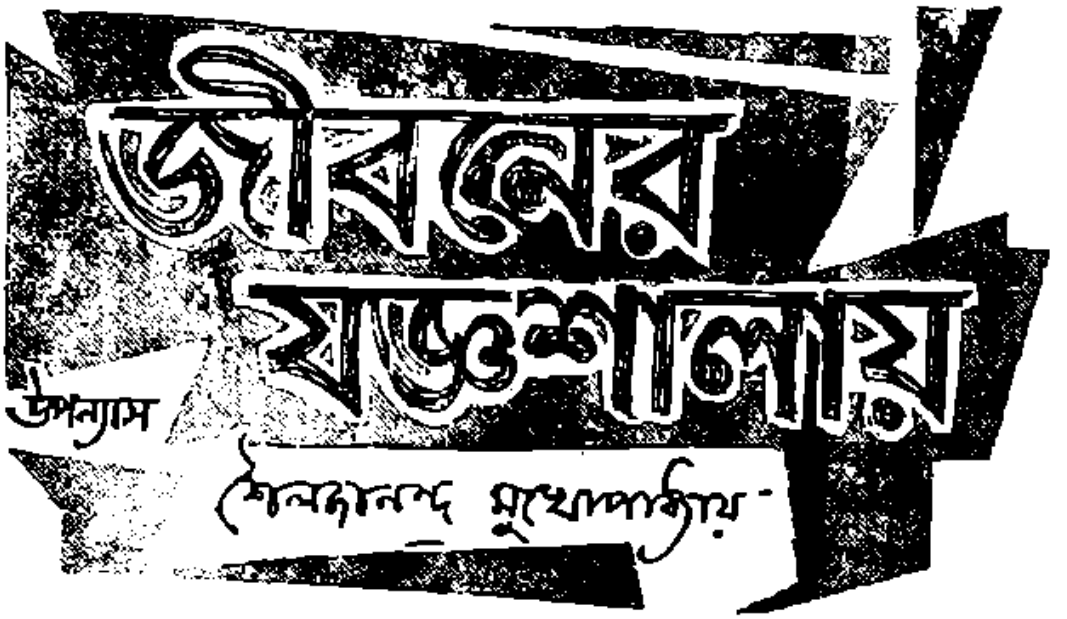

॥ নয় ॥

প্রকাশের সঙ্গে জেলুপুরায় চলে গেল সরমা। স্বামীর সঙ্গে গেল স্বামীর ঘর করতে।

চমৎকার বাড়ী। অনেকগুলো ঘর। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চেয়ার টেবিল আলমারি ড্রেসিং টেবিল খাট পালঙ্ক দিয়ে সাজানো এমন সুন্দর বাড়ীতে যে সে আসবে তা ভাবতে পারেনি।

আবার যে তার বিয়ে হবে তাই কি ভেবেছিল নাকি?

সরমা এ-বাড়ীতে এসে দেখলে তার যেন করবার কিছুই নেই। রান্না করবার জন্যে রাঁধুনী আছে; কাজ করবার জন্য ঝি আছে, চাকর আছে।

একটা কিছু করতে গেলেই ঝি এসে কাজটা কেড়ে নিচ্ছে তার হাত থেকে।

সকালে বিছানার চাদরটা ঝেড়েঝুড়ে আবার ভাল করে পেতে সরমা তার কোমরে কাপড়টা জড়িয়ে নিয়ে বাইরে থেকে ফুলঝাঁটাটা তুলে এনেছিল ঘরটা পরিষ্কার করবে বলে'।

মতিয়া কোথায় ছিল কে জানে। সে যে দেখতে পেয়েই ছুটে এসে ঝাঁটাটা তার হাত থেকে কেড়ে নেবে সরমা তা বুঝতেও পারেনি।

হিন্দুস্থানী গয়লার মেয়ে মতিয়া। কর্সা গায়ের রং। দিব্যি আঁটসাঁট গড়ন। ছোট একটা কাঁচুলি পরে বৃন্দাবনী ছাপা শাড়ীখানা কোমরে জড়িয়ে মতিয়া যখন কাজকর্ম করে তখন তাকে ঝি বলে মনেই হয় না। ফিক্ ফিক্ করে হাসতে হাসতে বলে, চাকরিটা তুমি আমার খাবে দেখছি।

মেয়েটার সঙ্গে এই দুদিনেই খুব ভাব হয়ে গেছে সরমার। সরমা বলে, ঘরটা ঝাঁট দিতেও দিবি না? আমি তাহ'লে কি করবো বসে বসে?

হাসি আর থামতে চায় না মতিয়ার। বলে, মাবাবুকে জিজ্ঞাসা কোরো।

বলেই সে ঝাঁটা নিয়ে বসে পড়ে খাটের কাছে। তার পর খাটের তলাটা পরিষ্কার করতে করতে ফিরে ফিরে তাকায় আর ফিক্ ফিক্ করে হাসে।

সরমা জিজ্ঞাসা করে, হাসছিস কেন রে?

মতিয়া সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কাজ করতে থাকে। কথাটার জবাব দেয় না।

সরমা আবার জিজ্ঞাসা করলে, হাসছিস কেন বল্ না!

এমন সময় ঘরে ঢুকলো প্রকাশ।

—কি বলছো ওকে?

—কিছু না। বলেই সরমা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, প্রকাশ বললে, যেয়ো না। শোনো।

ফিরে দাঁড়ালো সরমা।

প্রকাশ বললে, মতিয়া, তুই একবার যা তো বাইরে।

ঝাঁটাটা হাতে নিয়েই মতিয়া ওদের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল।

প্রকাশ বললে, এই মেয়েটার সঙ্গে বেশি কথা বোলো না।

সরমা জিজ্ঞাসা করলে, কেন?

প্রকাশ বললে, ওর মাথায় একটু ছিট্ আছে। একটু সাবধানে কথা বোলো।

—তাই বুঝি কথায় কথায় ফিক্ ফিক্ করে হাসে?

—হ্যাঁ। আবার দেখবে হঠাৎ একদিন ওর হাসি একদম বন্ধ হয়ে যাবে। তখন আর একটি কথাও বেরুবে না ওর মুখ দিয়ে। কাজেও আসবে না।

—কি করবে?

—কি করবে তা তো জানি না, তবে ওর মা বলে, চুপচাপ শুয়ে থাকবে, পড়ে পড়ে ঘুমোবে, উঠবেও না, খাবেও না—

—তার পর?

—কখনও দু'দিন কখনও একদিন পরে নিজে থেকেই উঠে বসবে, চক্ চক্ করে জল খাবে, গঙ্গার ঘাটে গিয়ে চান করে আসবে তারপর ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে যাবে। এই তো শুনেছি ওর মার কাছ থেকে।

সরমা জিজ্ঞাসা করলে, কতদিন আছে ও এখানে?

প্রকাশ বললে, এই তো তোমার বিয়ের কিছুদিন আগে থেকে। ওর মাকে দেখেছ তো? যে আমাদের দুধ দেয়, ঘুঁটে দেয়—রামপিয়ারী।

সরমা বললে, না দেখিনি।

—ওকে বলেছিলাম, একটি ঝি এনে দিতে। বললে—তোমার বৌ যখন আসবে তখন আমার মেয়েটাই থাক্ এখানে। একা-একা থাকে বাড়ীতে, এখানে তবু একজন সঙ্গী পাবে।

সরমা জিজ্ঞাসা করলে, সিঁথিতে সিঁদুর রয়েছে দেখলাম। মেয়েটা শ্বশুরবাড়ী যায় না?

প্রকাশ বললে, অতসব জানি না। ওকেই জিজ্ঞাসা কোরো। আমি তোমাকে একটু সাবধান করে দিলাম।

সরমা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। দেখলে, ঝাঁটা হাতে নিয়ে দোরের কাছে পা ছড়িয়ে বসে আছে মতিয়া। সরমাকে বেরিয়ে আসতে দেখেই জিজ্ঞাসা করলে, কথাবার্তা হয়ে গেল।

সরমা কোনও জবাব দিলে না। সোজা স্নানের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। আধুনিক আসবাবপত্রে সাজানো স্নানের ঘর। সরমা আসবে বলে বোধহয় দেয়ালের গায়ে মস্ত বড় একটা আশী টাঙানো

হয়েছে। এদিকে দাবানবাসি, ওদিকে তেল রাখবার আরসা, কাপড় জামা রাখবার র‍্যাক্। ফলে সব সময় জল থাকে না, তাই বড় বড় ড্রামে জল ভর্তি করে রেখেছে সীতুয়া চাকর।

সরমা আশীর সুমুখে গিয়ে দাঁড়ালো। নিজেকেই সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলে। মন ভরছে না। দোরটা বন্ধ করে দিয়ে আবার এসে দাঁড়ালো আশীর কাছে। একটি একটি করে চুলের কাঁটাগুলো খুলতে লাগলো। খোঁপাটা খুলে ফেললে। প্রকাশ বলেছে, চুলে এত তেল কেন? শ্যাম্পু নিতে পার না?

শ্যাম্পু কাকে বলে জানতো না সরমা। প্রকাশ একশিশি শ্যাম্পু এনে রেখে দিয়েছে তাকের ওপর। কেমন করে নিতে হয় তাও বলে দিয়েছে।

বেণীর জট খুলতে খুলতে সরমা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো নিজের দিকে। সিঁথিতে টক টক করছে লাল সিঁদুরের রেখা। কপালে টিপ। সর্বাঙ্গে এয়োতির চিহ্ন। আবার সে সধবা সেজেছে। একেবারে নতুন জীবন।

সরমার মাথায় অনেক চুল। কালো চুল ছড়িয়ে পড়লো বুকের ওপর, পিঠের ওপর। চিরুনী দিয়ে আঁচড়াবার আগে চুলে একটুখানি তেল দিয়ে সিঁথির সিঁদুরটা মুছে নিলে। জামাটা খুলে ফেললে গা থেকে।

জামাটা খুলতেই তার মনে পড়লো ছেলেটার কথা। অজয় এতক্ষণ কি করছে কে জানে! মাকে খুঁজছে কিনা তাই-বা কে বলতে পারে?

অথচ এখানে অজয় সম্বন্ধে কোনও কথা কাউকে বলা ঘুরের কথা, ভাবাও চলবে না। জয়নারায়ণবাবুর পা ছুঁয়ে সে প্রতিজ্ঞা করে এসেছে—অজয়ের কথা সে মুখ ফুটে বলবে না কাউকে। প্রকাশ জানতে পারলে তার বাবা অপমানিত হবেন।

এইটিই তার জীবনের সব চেয়ে বড় বিড়ম্বনা। তার এত যে সুখ, এত যে ঐশ্বর্য, এমন সুন্দর স্বামী—সব যেন বিস্বাদ মনে হতে লাগলো। মুখখানি শুকিয়ে গেল হঠাৎ।

রবেশের সঙ্গে যখন তার বিয়ে হয়েছিল তখন সে ছিল নিতান্ত ছেলেমানুষ। জীবন যৌবনের সব কিছুই ছিল তার অজানা। পুরনো সে দিনগুলো মনে হয় যেন স্বপ্ন। সব যেন ঝোঁয়া-ঝোঁয়া। ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনও বালাই ছিল না। পুতুলের খেলাঘর সাজানোর মত একটা যেন খেলাঘর সাজিয়েছিল শুধু। যা কিছু ঘটেছে সবই যেন ঘুমের ঘোরে। এখন সে ঘুম গেছে ভেঙে। স্বপ্ন গেছে কেটে।

পৃথিবীর মত সব-কিছু যেন তার চোখের সুমুখে বাস্তবরূপে জেগে উঠেছে। তার শরীর জেগেছে। মন জেগেছে। চারিদিকের আলোর হাওয়ায় যেন বসন্তদিনের উন্মাদনা। হাতের কাছে মনের মত একজন সঙ্গীও পেয়েছে সে। শুধু কথা বলবার সঙ্গী নয়। শিক্ষিত ভদ্র অনুরাগী ভক্তের মত একজন অতি সুন্দর মানুষ। প্রতি মুহূর্তে সে তার অনুরাগের উত্তাপটুকু অনুভব করছে। অথচ কিছুতেই তা যেন সে পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করতে পারছে না।

বাপের কাছে সত্যবদ্ধ হয়ে এসেছে সে। সে যে বিধবা—তার যে একটি ছেলে আছে সেকথা কিছুতেই সে প্রকাশ করতে পারবে না প্রকাশের কাছে। নিজেকেই কেমন যেন অপরাধিনী মনে হচ্ছে সরমার। জীবনের অতীতদিনের ইতিহাসটাকে সে যেন ভুলতেও পারছে না, মুছে ফেলতেও পারছে না। প্রকাশের কাছে যদি বলতেও পারতো, তা'হ'লেও বা খানিকটা নিশ্চিন্ত হতো।

প্রকাশ যেন তার হৃদয়ের আকাশ মেলে ধরেছে সরমার কাছে। সরমা কিন্তু মুক্ত বিহঙ্গের মত দুই ডানা মেলে সাধ মিটিয়ে উড়তে পারছে না সেই আকাশে। ক্রমাগত মনে হচ্ছে যেন একটা মিথ্যাচারের গ্লানি তাকে আড়ষ্ট করে রেখেছে।

যাক্ আর ভাবতে পারে না। চুল আঁচড়ানো শেষ হয়েছে সরমার। শ্যাম্পু দিয়ে চুলগুলো পরিষ্কার করে তেল মেখে ভাল করে চান করলে সে। তারপর কাপড় জামা খুঁজতে গিয়ে দেখলে —কাপড় জামা আনেনি।

নিজের বোকামীর জন্যে নিজেকেই তিরস্কার করলে একবার। তারপর কোনোরকমে ভিজেকাপড়ে জড়োসড়ো হয়ে বাথরুমের দোরটা একটু ফাঁক করে ডাকলে, মতিয়া!

মতিয়া সব সময় প্রস্তুত। হাসতে হাসতে বললে, আমি জানি তুমি ডাকবে।

—কেমন করে জানলি?

মতিয়া বললে, কাপড় নিয়ে যাওনি যে! এনে দিচ্ছি। তুমি দাঁড়াও।

[ক্রমশঃ

বর্দ্ধমানের মহারাজা নয়, জোড়াসাঁকোর জমিদার নয়, একজন সামান্য গৃহস্থ প্রতাপচন্দ্র রায় নিজের অন্তরের নিষ্ঠায় একা ইংরাজীতে অনুবাদ করেছিলেন মহাভারত, চুয়ান্নটি খণ্ড। শেষ কয়েক খণ্ডের মুদ্রণ বাকী থাকতে প্রতাপ চন্দ্র মৃত্যু-শয্যায় শুতে বাধ্য হলেন। চোখে নেমে আসছে শেষ ঘুম। প্রতাপচন্দ্র স্ত্রীকে ডেকে বললেন আমার শেষ অনুরোধ, আমার শ্রাদ্ধে একটি পয়সাও খরচ করো না, সেই পয়সা দিয়ে মহাভারতের অবশিষ্ট অংশগুলি প্রকাশ করো। তাঁর মৃত্যুর এক বছরের মধ্যে স্বামী স্ত্রী স্বামীর শেষ অনুরোধ রক্ষা করেন। ইতিহাসে কিন্তু প্রতাপের নাম নেই।

এই প্রথম

বিলাস

ফাল্গুনী মিত্র

কী হ'য়েছে সুমনা? কেন এই নিস্তব্ধ নিশুতি রাতে একা বসে চোখের জল ফেলছ? তোমার ত' চোখের জল ফেলার কথা নয়। তুমি ত' খুবই সুখী! (অন্ততঃ তুমি নিজেকে এবং সবাইকে তাই বোঝাতে চেয়েছ) তবে, কান্না কিসের? আর সত্যিই, তোমার সুখের উপকরণ সবই ত' রয়েছে, বিত্তবান, চরিত্রবান স্বামী, সুন্দর ছেলেমেয়ে, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব যা একটি মেয়ের পক্ষে কামনা করা সম্ভব সবই ত' আছে তোমার। তবে? চারিদিকে খুঁজে খুঁজে তোমার এই একা বসে অশ্রুপাতের কোন কারণই ত' খুঁজে পাচ্ছিনা আমি।

আচ্ছা, আজ ত' কুণালের যাবার তারিখ। (শেষ রাতে বোধহয় ওর ট্রেন ছাড়ার কথা। তাই না?) কিন্তু, তাতেই বা তোমার কী? ওর চলে যাওয়াতে ত' তোমার এমনি অঝোরে কাঁদবার কথা নয়। আসলে ওকে ত' স্বেচ্ছত্যাগী তুমিই করলে। ওকে নাকি তুমি আর সহ্য করতে পারছিলে না, একথা নিজের মনে মনে কতবার বলেছ তুমি।

বেচারা কুণাল! এত বছর ধরে তোমাদের এখানে তার যাতায়াত; প্রথম থেকেই তোমাকে ও ভালবেসে ফেলেছিল, কিন্তু কোনও দিন আভাসে ইংগিতে সে কথা তোমাকে ও জানতে দেয়নি। হঠাৎ সেদিন যে ওর কী খেয়াল হ'ল, নিজের মনের অবস্থা তোমাকে বলেই ফেলল। তুমি তখন মনে মনে একটু বিরক্তও হ'য়েছিলে। তোমাদের সাজানো গোছানো সুশৃংখল জীবনে এ আবার কোন্ রাহুর আভাস নয় ত, ভেবেছিলে তুমি। কিন্তু, একথা তোমার মনে হয়নি যে সে বেচারা তোমার কাছে কোনও কিছু প্রত্যাশা করেনি। শুধু এইটুকু বলেছিল যে মাঝে মাঝে তোমাকে একবার চোখের দেখা দেখতে বড় মন অস্থির হ'য়ে ওঠে তখন না এসে পারে না তোমার কাছে, সেটুকু থেকে যেন ওকে বঞ্চিত না করো। কিন্তু, তোমার বড় অহংকার, লোকের মনে দুঃখ দিতে তাই আটকায় না। সেইজন্যই অম্লান বদনে তাকে বললে "দেখুন কুণালবাবু, আপনি আমার হিতাকাঙ্ক্ষী সে বিশ্বাস আমার আছে। তবে দেখুন, আমি বিবাহিতা, আপনার এসব কথা আমার স্বামীর কাণে গেলে তিনি কী ভাববেন।" কুণাল বলেছিল "তোমার সুখের চেয়ে বড় কামনা আমার আর কিছু নেই। তাই, আমি তোমাকে ভালবাসি বলে, তুমিও আমাকে ভালবাসবে এমন কোন দাবী বা অনুরোধ আমি করিনি। তুমি আজ পর্যন্ত আমার প্রত্যেকটি আচরণ তলিয়ে ভেবে দেখো, কোনরকমেই তোমাকে কোন অসম্মান করেছি আমি এমন কথা বলতে পারবে না। আমি ভালবেসেছি, এর বেশী আর কিছু আমার বলার নেই।" কুণাল, বন্ধুর স্ত্রী বলে বন্ধুর পীড়াপীড়িতে প্রথম থেকেই তোমাকে নাম ধরে ডাকতে সুরু ক'রেছিল।

কিন্তু, (তোমার কি তখন মাথার ভূত চেপেছিল) তুমি তখন বলে বসলে "সত্যিই যদি আমার মঙ্গল কামনা করেন, তবে, কখা দিন আর কখনও আমার সাথে দেখা করতে আসবেন না'। লক্ষ্য করেছিলে কী সংগে সংগে কুণালের মুখখানা কিরকম সাদা হ'য়ে গিয়েছিল ? দেখেছিলে নিশ্চয়ই তাই উল্লসিত হ'য়ে উঠেছিলে মনে মনে।

কুণাল মৃদুস্বরে বলেছিল "এমন নিষ্ঠুর আদেশ কি না করলেই নয় ?"

তুমি দৃঢ়স্বরে নিজের কথার ওপরেই জোর দিয়েছিলে। কুণাল আর প্রতিবাদ করেনি। শুধু বলেছিল, "তুমি যদি চাও, তবে আর আসব না। তবে, এটুকু বলে যাই যদি কখনও এতটুকু দরকার হয়, তবে এই বন্ধুকে স্মরণ করতে ভুলো না। এই কথাটা জেনে রেখো, আমার মত এত গভীরভাবে পৃথিবীতে কম লোকেই ভালবেসেছে।" তুমি মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলে।

সেই থেকে কুণাল আসেনি আর।

কিন্তু, তোমার শূন্যতা বোধ যে দিন দিন বেড়ে চলেছে, সেটা বোধহয় তুমি বুঝতে পারনি। কেন এমন লাগে ভেবে নিজের ওপরই বিরক্ত হ'য়েছিলে। আজ যখন কুণালের ভাই এসে খবর দিয়ে গেল যে কিছুতেই কুণালকে ধরে রাখা গেল না, আজকের প্লেনেই ও ভারতবর্ষ ছাড়ছে, তখনও তোমার মনে কোন চাঞ্চল্য আসেনি। কিন্তু, রাতের এই নির্জন নিস্তব্ধতায় বসে যখন মনে পড়ল কুণাল আজ চলে যাচ্ছে, তখন, কেন তুমি এমন করে অশ্রুর বাঁধ খুলে দিলে ? যা চেয়েছ, তাই ত' পেয়েছ।

দুই শতাব্দীর বাংলার ইতিহাস

গত দুই শতাব্দীর বাংলা ইতিহাস, ঠাকুর রামকৃষ্ণের এই দুই লাইন কাহিনীর মধ্যে রয়ে গিয়েছে।

ঠাকুর একদিন কলকাতার এক বিখ্যাত ধনীর বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে দেখলেন, দেওয়াল ভর্তি সব বড় বড় বিলিতী ছবি।

বালকের কৌতূহলে তিনি ধনী মালিককে বললেন, হাঁ গা, এত ছবি, একখানাও ঠাকুর দেবতার ছবি নেই ?

সেখানে একটি বালক ছিল। ঠাকুরের প্রশ্নে সে জবাব দিল, আছে। বাড়ীর ভেতরে, অন্দর মহলে।

বালকের উত্তর শুনে ঠাকুর আনন্দে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন॥

একজন আর কয়েকজন

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

যিনি সত্যিকারের কাহিনীকার তাঁর জীবন দর্শনটাই কাহিনী। অপরের জীবনের সংঘটিত কাহিনীতে যেমন রস প্রয়োগ করে সার্থক কাহিনী সৃষ্টি করে থাকেন কাহিনীকার তেমনি নিজের ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাও তাঁর রসাশ্রিত কাহিনীতে সার্থক গল্প হয়ে ওঠে।

উপেন্দ্রনাথের রচিত অনেক কাহিনীই তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা প্রসূত গল্প। তাঁর সূত্রটি হয়তো একটা ভাবনার আলতো ছায়ামাত্র। সেই ক্ষীণকায়াটা ছায়াই। সম্পূর্ণ দেহ-মন নিয়ে সম্পূর্ণ গল্প এবং বিশাল কাহিনীরূপে উপন্যাসে পরবর্তীকালে তা পরিব্যাপ্ত হতো।

জীবনরসে রসিয়ে নিতে পারলেই যে কোনো ঘটনাকে সাহিত্য-সৃষ্টির কাজে লাগানো যেতে পারে। একটি ব্যক্তিগত ঘটনা কেমন করে ভবিষ্যতে গল্প এবং প্রয়োজনবোধে উপন্যাস হতে পারতো বাংলা সাহিত্যে তার কিঞ্চিৎ আভাষমাত্র একবার পেয়েছিলাম আমরা কয়েকজন উপেন্দ্রনাথের সান্নিধ্য থেকে।

আহ্বান সংস্কৃতির পরিচালিকা শ্রীমতী লক্ষ্মী মিত্র কয়েকজনকে নিয়ে বালিগঞ্জ প্লেসের উপেন্দ্রনাথের বাসভবনে একদিন এসে উপস্থিত হলেন। আজি আছে। দক্ষিণবঙ্গ ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত কামারপোল গ্রামে কামারপোল রিডিং ক্লাবের বাৎসরিক উৎসবে সভাপতিত্ব করবার জন্যে উপেন্দ্রনাথকে যেতে হবে। উপেন্দ্রনাথের শরীর তখন ভালো যাচ্ছে না। সভার নামে কখনো বিমুখ নন উপেন্দ্রনাথ। বিশেষ করে তাঁর অত্যন্ত স্নেহভাজনা স্বয়ং শ্রীমতী লক্ষ্মী মিত্র যখন এসেছেন! আরো একটু বিশেষ বিবেচনার কারণ ছিলো। আহ্বান সংস্কৃতির দু'জন অকৃত্রিম উপেন্দ্র অনুরাগীর বাড়ি কামারপোলে। কামারপোল রিডিং ক্লাবের সঙ্গে তাঁরা সংযুক্ত। তাঁরা দুই ভাই-বোন একজন শ্রীপ্রভাত ঘোষ এবং অপরজন শ্রীমতী বীথি বসু। কামারপোলে যাওয়ার ইচ্ছে উপেন্দ্রনাথের ছিলো।

অসুস্থ শরীরেও তাই তিনি রাজি হলেন। শ্রীমতী লক্ষ্মী মিত্র প্রতিশ্রুতি দিলেন—ভালো গাড়ির ব্যবস্থা তিনি করবেন।

সভাক্ষেত্রে উপেন্দ্রনাথ সস্ত্রীক উপস্থিত হলেন। সঙ্গে সপরিবার আমরা কয়েকজন। সভাপতি অসুস্থ শরীরেও সভা জমিয়ে রেখেছেন। পূর্ণোদ্যমে সভা চলেছে।

হঠাৎ বীথি বসু এসে এক দুঃসংবাদ জানালে। আমরা সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠলাম—অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে সভার চারিদিকে তাকাতে লাগলাম।

সভাপতি আমাদের এই ভাবান্তর লক্ষ্য করে আমাকে ডেকে পাঠালেন,—'কী ভায়া, তোমাদের হলো কী?'

বিমর্ষ কণ্ঠে বললাম, 'বিপদ ঘটেছে দাদা। বৌদির কানের পান্না হারিয়েছে। অনেক খোঁজাখুঁজি করলাম; কিন্তু কোথাও পাওয়া গেলো না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন উপেন্দ্রনাথ। তারপর স্মিতহাসি হেসে বললেন, 'তোমার বৌদি কোথায় ?"

'বললাম, বীথিদের বাড়ীতে।'

উপেন্দ্রনাথ বললেন, 'তাঁকে আশ্বাস দাও। কানের নতুন গয়না গড়িয়ে দেওয়া হবে।'

বললাম, 'সমস্যাটা তা নয়। বৌদির সংস্কার গয়না হারালে বিপদ আসে।"

বললেন, 'কিন্তু এসে আরো বড়ো বিপদ। সভাটা যে পণ্ড হয়ে যাবে !'

কিছুক্ষণ পরে বীথি সহাস্য এসে জানালে, 'গয়না পাওয়া গেছে দাদা। বৌদি আশ্বস্ত। তাঁরই কাপড়ে কর্পাতরণ আটকে ছিলো।'

উপেন্দ্রনাথ স্বগতোক্তি বললেন, 'যাঃ, সবমাটি !'

'কী হলো দাদা ?'

'গল্পের প্লটটাই নষ্ট হয়ে গেলো। এইটে নিয়ে একটা গল্পের কাহিনী ভাবছিলাম,—নতুন গয়না করে গড়াতে হলে তো টাকা চাই হে। একটা গল্পে ওঁর কানের গয়নার দাম উঠতো।'

আমি বললাম, 'না দাদা একটা গল্পে হতো না। গুনলাম—একত্রিরও বেশি ছিলো কানের মূল দু'টি।'

উপেন্দ্রনাথ বললেন, 'তা হলে তো আরো ক্ষতি হলো !'

বললাম, 'কী করে ?'

উপেন্দ্রনাথ বললেন, 'গল্পকে আরো বাড়িয়ে উপন্যাস করতাম। আর তার দাম হতো একত্রিশ কেন, দশত্রিরও ওপর।'

আমরা হাসলাম, কিন্তু উপেন্দ্রনাথ হাসলেন না। গল্প সৃষ্টির একটি সূত্রকে ছেড়ে তিনি সভা পরিচালনার কাজে তখন আবার আত্মমগ্ন হয়েছেন।

সম্পাদকের সঙ্গে লেখকের সম্পর্ক এবং লেখকের সহযোগিতা সম্পাদকের সঙ্গে—এর এক আদর্শ নজির উপেন্দ্রনাথের ব্যবহারে পরিদৃষ্ট হতো।

উপেন্দ্রনাথ নিজে সম্পাদক। শুধু বেতনভোগী সম্পাদক নন, আদর্শ সম্পাদক। বিচিত্রা এবং গল্প-ভারতী তাঁর সম্পাদকীয় জীবনের দুটি শ্রেষ্ঠ স্থানীয় সাময়িক পত্রিকা।

আর লেখক উপেন্দ্রনাথ তাঁর অজস্র লেখার মাধ্যমে অনেক সম্পাদকের সান্নিধ্যে এসেছেন। যেখানে সম্পাদক সেখানে লেখকদের তিনি আত্মীয়। তাঁদের তিনি লেখক। তাঁদের প্রতি তাঁর আনুগত্যের সীমা নেই। সবসময়েই বলেন, 'লেখকদের নিয়েই তো সম্পাদকের কারবার। তাঁরাই তাঁর লক্ষ্মী। তাঁরাই তাঁর সৌভাগ্য। তাঁদের প্রতি কী কখনো বিমুখ হতে আছে ?'

আর যেখানে লেখক সেখানে তিনি সবসময়েই সম্পাদকদের সঙ্গে তাঁর সহযোগিতার কর সম্প্রসারিত করে আছেন, 'কতো ঝঞ্ঝাট সম্পাদকের। লেখকরাও যদি তার ওপর ঝঞ্ঝাট বাধায় তাহলে সম্পাদক কাজ করবেন কেমন করে ?'

একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। কুমারেশ ঘোষ নিজে সাহিত্যিক এবং সম্পাদক। তিনি উপেন্দ্রনাথের স্নেহভাজন।

কুমারেশ ঘোষ তাঁর 'বঙ্কিমবধূ' পূজা-সংখ্যার জন্যে উপেন্দ্রনাথের কাছে লেখা চেয়েছেন। উপেন্দ্রনাথ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন লেখা দেবেন।

পূজোয় বড়ো লেখকদের কাছ থেকে লেখা আদায় করার যে দুষ্কর তপস্যা তা সম্পাদকমাত্রেরই হাড়ে হাড়ে জানা। বিশেষ করে ছোটো কাগজের সম্পাদকের পক্ষে—যাদের লাভ অল্প, আয়োজন স্বল্প। কিন্তু প্রয়োজন বড়ো। বড়ো খ্যাতনামা লেখকদের রচনা না হলে পূজায়-বাজার মাটি। ক্রেতা গ্রাহক দেখেন—কারা লিখেছেন কাগজে; তবে কাগজ কেনেন।

কুমারেশ ঘোষ এলেন, 'দাদা লেখাটা কবে পাচ্ছি?'

উপেন্দ্রনাথ জিগ্যেস করেন, 'কবে দিলে তোমার সুবিধে হয়?'

বঙ্কিমবধূ সম্পাদক অবাক্। সম্পাদকীয়-জীবনের এ এক তাঁর অভিনব অভিজ্ঞতা। লেখক হিসাবেও অপর কোন পত্রিকার সম্পাদকের চাহিদাকে এমনভাবে তিনি মেটাতে পারেন নি।

কুমারেশ ঘোষ উপেন্দ্রনাথকে লেখার সময় দিলেন। লেখা-দেওয়ার নির্দিষ্ট দিনও ধার্য হলো।

সেই নির্দিষ্ট দিনটির কথা বঙ্কিমবধূ সম্পাদকের ডাইরির পাতায় লেখা ছিলো; কিন্তু তেমন কড়া তাগিদ ছিলো না। কেননা, স্বভাবতই তিনি জানেন সময় হাতে রেখে দিন দিতে হয়। বার দশেক দিন পালটে তবে যদি লেখা পাওয়া যায়!

নির্দিষ্ট দিনেই বঙ্কিমবধূ পত্রিকা অফিসে টেলিফোন বেজে উঠলো—'হালো'।

'কে?'

'আমি উপেন।'

'দাদা? কী খবর দাদা?'

উপেন্দ্রনাথ জানালেন তাঁর অক্ষমতার কথা; 'ভাই তোমার লেখাটা আজ হয়ে উঠলো না? আর দুটি দিন অন্ততঃ সময় দাও দয়া করে। আর তোমাকে আর কষ্ট করে লেখা নিতে আসতে হবে না। আমি পাঠিয়ে দেবো।'

'সে কী দাদা!'

'হাঁ, তুমি একলা মানুষ। আমি তো বুঝি সম্পাদকের কাজ। তুমি নিশ্চিন্ত থেকো। লেখা তুমি দু'দিন বাদে নিশ্চয়ই পাবে।'

দুদিনের বেশি তিনদিন লাগেনি। ঠিক দু'দিন বাদে উপেন্দ্রনাথ নিজেই লেখাটি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বঙ্কিমবধূ পত্রিকার কার্যালয়ে।

সাহিত্যিকদের মধ্যে দলাদলি। এ দলাদলি আগেও ছিলো; এখনো আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। অর্থাৎ মতবিরোধ; কেননা, 'যতো মত ততো পথ'—এ-কথা সাহিত্যেও সমভাবে প্রযোজ্য। দলাদলি এককথা; দলাদলিতে মতবিরোধ; কিন্তু ব্যক্তিবিরোধ নয়। ব্যক্তি-সম্পর্ক তাতে ক্ষুণ্ণ হয় না। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিরোধও ছিলো না পূর্বসূরী সাহিত্যিকদের মধ্যে।

কিন্তু দলীয় দলাদলি আর এক কথা। দলীয় দলাদলি রাজনীতি থেকে উদ্ভূত। সাহিত্য-নীতিতে এই দলীয় দলাদলি দিনে দিনে সাহিত্যিকদের মধ্যে গোষ্ঠীবাদের প্রাচীর তুলছে। দলীয় দলাদলির কোন্দল সাহিত্যক্ষেত্রে বিষাক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি করছে।

তুমি থেকে তোমরা কজন বামপন্থী। আমি থেকে আমরা কজন দক্ষিণপন্থী। এমনি ভাবে উত্তর, দক্ষিণ, পূব, পশ্চিম—ছোটো, বড়ো, মাঝারি, দল থেকে দলীয় মত বিরোধে বর্তমান কালে সাহিত্যিকরা গোষ্ঠী এবং ব্যক্তি বিভক্ত। ফলে, তুমি আমি বিভিন্ন শিবিরে পরস্পর যুদ্ধরত। বন্ধু নই, শত্রু। তোমাকে ধ্বংস করে আমার প্রাধান্য। তোমাকে ধ্বংস করবার জন্যে আমার যুদ্ধ সরঞ্জাম, আমার আণবিক অস্ত্র-প্রস্তুতি।

অর্থাৎ সাহিত্য বর্তমানে রাজনীতি। রাজনৈতিক মতবাদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে হাতিয়ার বিশেষ।

সাহিত্য রিলেটিভ কিংবা এ্যাবস্ট্রাক্টও নয়। সাহিত্য বস্তু। ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট। সাহিত্য হচ্ছে ট্রেড। তাই এ-ক্ষেত্রেও আজ ট্রেড-ইউনিয়নের দরকার। তার প্রাধান্যও দেখা যাচ্ছে। ব্যবসা-নীতিতে যে ভেজাল—সাহিত্যেও সেই ভেজালের প্রাধান্য। আর ভেজালকে বিশুদ্ধ-বাবে প্রচারের জন্যে প্রচার-যন্ত্রটি বেশ বড়ো রকমের হওয়া দরকার। কেননা, সেখানে যতো ফাঁক-জমক সেখানে সুকৌশল এবং ততো কার্যসিদ্ধি।

এই নিয়েই একদিন আলোচনা চলছিলো আমাদের কয়েকজনের সঙ্গে উপেন্দ্রনাথের। উপেন্দ্রনাথ বললেন 'আচ্ছা, একটা কমন ফ্রন্ট তৈরী করলে কেমন হয়?'

সাহিত্য-তীর্থের সম্পাদক রমেন মল্লিক উৎসুক হলেন, 'কী রকম দাদা?'

উপেন্দ্রনাথ বললেন, 'সাহিত্যিকদের সব দল যাতে এক জায়গায় মিশতে পারে তার আয়োজন করো।'

সাহিত্যিক শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উৎসাহী হলেন। সরকারি লোকরঞ্জন সংস্থার নাটক বিভাগের নাট্য-পরিচালক তিনি। শচীনবাবু বললেন, 'আমাদের সাহিত্যিকদের নিয়ে একটা নাট্য-সংস্থা গড়ে তুলুন দাদা। আপনি আমাদের দলপতি। আমাদের সকলের লেখা নাটক তাতে পালাক্রমে অভিনীত হবে। আর আমরা সবাই তাতে যোগদান করবো।'

উপেন্দ্রনাথ রাজি হলেন।

উপেন্দ্রনাথের 'উটরোগ'কে প্রথম নাটক হিসাবে সিলেক্ট করা হলো। পরিচালনার ভার নিলেন শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজার রোগ। কঠিন রোগ। সে-রোগ সারাতে রাজবৈদ্য থেকে আরম্ভ করে সকল বৈদ্যই অপারগ। রাজার রাজত্বে লিপ্সা নেই, রাজ-সম্ভোগেও নয়। এমন কি মহারাণীকেও আর ভালো লাগে না। রাজ-নর্তকীদের নৃত্য, গায়ক-গায়িকার গান—কিছুতেই আর চিত্তসম্ভোগ হয় না। মন্ত্রী বিপন্ন বোধ করলেন। প্রজারা বিমর্ষ—রাজকার্যে রাজার মন নেই।

কে সারাতে পারে এই রোগ? বৈদ্য নয়, সম্ভোগ নয়। জীবন থেকেও জীবন নেই। এলো এক তান্ত্রিক বেশধারী দরিদ্র ব্রাহ্মণ। কঠিন শর্ত তার। হয় রাজার চিরতরে রোগমুক্তি—না হয় তান্ত্রিকের মৃত্যু বরণ। মন্ত্রের সাধন কিংবা দেহের পতন। এই হচ্ছে উটরোগের নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত।

কৌতুক নাটিকা 'উটরোগ'। প্রথমে প্রবাসীতে গল্পাকারে এই কাহিনীটি প্রকাশিত হয়। পরে মাসিক বসুমতীকে এটির নাট্যরূপ দেন স্বয়ং উপেন্দ্রনাথই।

এই নাটিকাটিকেই আবার পরিবর্ধিত করা হলো সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের অভিনয়ের প্রয়োজন মাফিক। আরো অনেক চরিত্রকে আনতে হলো নাটকে; কেননা, অভিনেতার সংখ্যা অনেক। মহড়ার সময় থেকে দিন দিন অভিনেতার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে।

'দাদা, আপনি আছেন ; আমরা থাকবো না ?'

উপেন্দ্রনাথ বলেন, 'নিশ্চয়ই।'

নাটকে নতুন চরিত্রের আমদানি করা হলো। পাট পেলেন একজন কনিষ্ঠ-সাহিত্যিক।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় অসুস্থ ছিলেন। নাটক মঞ্চস্থ হবার মাত্র কয়েক দিন পূর্বে এসে হাজির হলেন। উপেন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁর বাড়ি গিয়েছিলেন। তাই শুনে অসুস্থ শরীর নিয়েই অগ্রজের সম্মান দিতে শৈলজানন্দ সমুপস্থিত। সুঅভিনেতা শৈলজানন্দের জন্যে উপযুক্ত পাত্র নির্দিষ্ট হলো।

প্রথমে মহারাণীর ভূমিকায় মহড়া দিচ্ছিলেন শ্রীমতী বারি দেবী। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মহারাণী বিহ্বাটে নাটক যখন সমস্যাকীর্ণ তখন প্রেমেন্দ্র মিত্রের আনুকূল্যে নূতন মহারাণীর সন্ধান পাওয়া গেলো।

শ্রীমতী সুলেখা দাশগুপ্ত এসেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে সাহিত্যিকদের অভিনয়ের মহড়া দেখতে। এসে ফাঁদে পড়ে গেলেন।

উপেন্দ্রনাথ অনুরোধ জানালেন তাঁকে মহারাণীর ভূমিকা গ্রহণ করবার জন্যে। শ্রীমতী দাশগুপ্ত কখনো নাকি অভিনয় করেননি। তিনি কিন্তু কিন্তু করতে লাগলেন। উপেন্দ্রনাথ বললেন, 'পদমর্যাদার কথা ভাবুন। 'শুধু রাণী নয়, মহারাণী।'

অতএব সম্মতির হাসি হেসে শ্রীমতী দাশগুপ্তকে মহড়ায় যোগদান করতেই হলো।

শ্রীমতী বারি দেবীর ব্লাডপ্রেসার কমেছে। নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার দিনকয়েক পূর্বে তিনি মহড়া দেখতে এসেছেন।

রাজবৈদ্য উপেন্দ্রনাথ মন্ত্রীকে ডাকলেন, 'ব্যবস্থা করো।'

'কী ব্যবস্থা হবে দাদা ?'

'কেন, মন্ত্রীর বাড়িটা তো ফাঁকা।'

পরিচালক শচীন বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, 'ভালো ব্যবস্থা হতে পারে দাদা। প্রধান মন্ত্রীর আবির্ভাবের পূর্বে মহামন্ত্রণাদায়িনীকে নাটকে সমুপস্থিত করা হোক্ !'

উপেন্দ্র বললেন, 'চমৎকার পরিকল্পনা।'

রাজকবি রূপে যেমন কবি নীরেন্দ্র চক্রবর্তীকে আনা গেছে ; বিভিন্ন ছোটবাটো চরিত্ররূপে যেমন সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক সন্তোষ ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন বসু প্রভৃতিকে আনা গেছে—তেমনি বারি দেবীকেও আবার আনা গেলো।

অভিনয়ের দিনেও অনেকে এলেন, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, ডক্টর অরুণ মুখোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে—রাজকীয় পরিবেশে সুসজ্জায় যাঁরা ঝলমল করছিলেন। রাজপ্রাসাদের প্রহরীরূপে নরেন্দ্র দেব এবং স্বর্গীয় প্রভাতকিরণ বসু বাঙলা দেশের দুই খ্যাতনামা প্রবীন কবির অপূর্ব প্রহসন লড়াই সহজে বিস্মৃত হবার নয়।

অভিনয়-অংশে সকল সাহিত্যিকই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। আর জোড়াতাড়ায় স্বল্পকায় উটরোগ একটি রীতিমত নাটকে যেভাবে রূপান্তরিত হয়েছিলো—তাও অপূর্ব।

মহাজাতিসদনে এই ঐতিহাসিক অভিনয় সকলদর্শকের মনেই গভীরভাবে রেখাপাত করেছিলো ; কিন্তু অভিনয়ের পূর্ব-পরিকল্পনার আদর্শটি ছিলো অন্যরকম। ছোটো বড়ো সকল সম্প্রদায়ের সাহিত্যিক-দের একটি মিলন ক্ষেত্র অভিনয়ের মাধ্যমে গড়ে উঠুক—উপেন্দ্রনাথের এই আদর্শ আজকের উন্নাসিক সাহিত্যিক সমাজে কে আর বাঁচিয়ে রাখতে পারেন ?

আড়ষ্ট কাঠ

বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়

শ্রীযুক্ত প্রমদারঞ্জন সমাদ্দার বি, এ, জীবনে দুটী জিনিষের সাধনা করেছিলেন। অফিসে 'বস'কে বশ করার সাধনা আর সমাজে এ্যারিষ্টোক্র্যাট হবার সাধনা। 'বস'এর মনোরঞ্জনের ফলে প্রমদারঞ্জনের চাকরীর ঘোড়া কোন বাধা না মেনে একের পর এক বেড়া টপকে খুব অল্প দিনের মধ্যেই তাঁকে হেড়হাজারী মসনদে কায়েম করে দিয়েছিল। কালোকাঠির জমিদারের সেরেস্তা যোগেন সমাদ্দারের ছেলে প্রমদারঞ্জন সমাদ্দার তো দেখে শুনে কূলে কেঁপে জয়ঢাক। কালীঘাটের এঁদো গলি থেকে উড ষ্ট্রীটে বাসা বদল করতে লেগেছিল মাত্র ছ'টী মাস। এর পরে তিনি কায়মনোবাক্যে এ্যারিষ্টোক্রেসীর সাধনায় মগ্ন হয়ে গেলেন। দু'গাঁশ পড়া কলসকাঠির মেয়েকে বিয়ে করে যে-পাপ তিনি করেছিলেন তারই প্রায়শ্চিত্ত করতে লাগলেন ছেলেমেয়েদের দিয়ে। স্ত্রীকে বোঝালেন—এ্যারিষ্টোক্র্যাট হতে গেলে দুটো জিনিষের দরকার। পয়সা আর কালচার।

স্ত্রী অতশত বোঝেন না। বললেন—কালচারটা আবার কী?

প্রমদাবাবু বললেন—কালচার, আঃ কালচার মানে বোঝ না। ভাল আশায় পড়েছি এক পাড়াগাঁয়ের মেয়েকে বে' করে। কালচার মানে হল এই লেখাপড়া, নাচগান এইসব জানা।

স্ত্রী মাতঙ্গিনী সভয়ে বললেন—না না বাপু, ওসব নাচগান আমি বুড়ো বয়সে শিখতে পারব না। বুলু, টুলু, মন্টু, মন্টুরা শিখবে।

প্রমদাবাবু ঝাঁপিয়ে উঠে বললেন—তোমায় কে শিখতে বলেছে।

* * *

সঙ্গে সঙ্গে বুলু, টুলু, মন্টু, মন্টুকে বিলিতী কনভেন্টে ভর্তি করার ব্যবস্থা করলেন প্রমদাবাবু। সহকর্মী হিতেনবাবু বললেন—কি হল প্রমদাবাবু, ছেলেমেয়েদের পাহাড়ে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন কেন? আমাদের এই কলকাতায় কী স্কুল নেই!

প্রমদাবাবু মুখ গম্ভীর করে বললেন—আরে ছ্যা ছ্যা। সারা কলকাতা চুঁড়ে যদি একটা স্কুল পানতো আমায় বলবেন। স্কুল নয়তো যেন ভেড়ার গোয়াল। যান মশাই, দেখে আসুন কনভেন্টে। কী তাদের ডিসিপ্লিন, কী ইংরাজী লেখানর কায়দা, কী রকম স্মার্ট হয় ছেলেপুলে। একটু খরচ বেশী পড়ে বটে তবে এডুকেশান একেবারে গারন্টেড্।। কনভেন্টে না পড়লে ছেলেমেয়েরা এ্যারিষ্টোক্র্যাসী শেখেনা।

কিন্তু নিজের কথা যখন ওঠে তখন অন্য কথা বলেন তিনি। বলেন, ভবতারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষাই যেন আলাদা। দেখনা, আমি তো ভবতারণ বিদ্যালয়ের ছেলে, শুধু গ্রাজুয়েট। কিন্তু একটা পি-এইচ ডি, আমার সামনে ইংরেজী লেখায় দাঁড়াক দেখি! আমাদের কালচারই ছিল আলাদা। গিন্নীর কাছে জাঁক করে বলতেন—আরে কালচার না থাকলে কী সেই তিরিশ টাকায় ঢুকে আজ হেড়হাজার টাকা মাইনে পাচ্ছি শুধু ঘানদুর্যোর জোরে?

নিজেকে প্রমদাবাবু একজন মস্ত কালচারড্ লোক বলে জানেন। কিন্তু স্বভাব-কৃপণ প্রমদাবাবুর বুক করকর করে ছেলেমেয়েদের কালচারের খরচ যোগাতে। এদিকে তো কন্‌ভেন্টএর মাইনে আছেই। ওদিকে ছুটীর দু'মাস ছেলেমেয়েরা নাচ গান শেখে। তাদের ওস্তাদের মাইনে আছে। তাছাড়া কন্‌ভেন্টের আজে বাজে খরচ তো নিত্যি। সেখানেও মেয়েরা ইংরাজী নাচ আর ফরাসী গান শেখে। তার জন্যে বেশী টাকা দিতে হয় প্রমদাবাবুকে। তা হোক, তিনি গর্ব করে পাঁচ জনকে বলে বেড়ান সেকথা। বাড়ীতে কেউ এলেই—কথায় কথায় ওঠে মেয়েদের কৃতিত্বের কথা। তারপর সুরু হয় আনুনাসিক সুরের গান আর পিয়ানোর সঙ্গে বিজাতীয় নৃত্য।

তবে আজকাল রবীন্দ্র সঙ্গীতটাও কালচারড্ মহলে খুব চালু বলে প্রমদাবাবু একজন গাইয়ে ঠিক করেছেন ছেলেমেয়েদের রবীন্দ্র সঙ্গীত শেখাবার জন্যে।

বেটেকথা প্রমদারঞ্জন এখন একজন রীতিমতো এ্যারিষ্টোক্র্যাট। তিনি ছেলেমেয়েদের ক্রমাগত উপদেশ দেন কালচারড্ হবার জন্য। তারই ফলে কলসকাঠির গেঁয়ো মাকে রান্নাঘরে ঠেলে দিয়ে প্রমদাবাবুর ছেলেমেয়েরাও প্রচণ্ডভাবে কালচারের চর্চায় ব্যস্ত।

প্রমদাবাবুর বড় ছেলে পরাশর সমাজায় তো বাংলার কথা বলা পর্যন্ত ছেড়েছে। বাপকে ডাকে ড্যাড, মাকে মামী।

প্রথম প্রথম মামী ডাক শুনে প্রমদাসিনী আপত্তি করেছিলেন—ওকি খোকা? আমি তোমার মা হই। আমাকে মামী ডেকো না।

খোকা জবাব দিয়েছিল—মামী নয় মাম্মি, মাম্মি!

তার মা শুনে মুখ কুঁচকে বলেছিল—বাংলায় কথা বলতে পারিস না? ওসব ইংরাজীতে কিড়ির মিড়ির বাইরে করিস।

কিন্তু গিন্নীর সত্যি সত্যি বৈধব্যচ্যুতি ঘটেছিল যখন তাঁর বিশ বছরের বাড়ী মেয়ে পুষ্পরাগ জুতো পায়ে খটখটিয়ে নাচতে নাচতে রান্নাঘরে ঢুকে মাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছিল।

রাগে গরগর করতে করতে প্রমদাসিনী বলেছিলেন—এসব কী আদিখ্যেতা খুকী! বিশ বছর বয়স হল আজও ফ্রক ছেড়ে কাপড় পরতে শিখলি না। তার ওপর এই সব—

রাগে দুঃখে সেই দিনই গিন্নী প্রমদাবাবুকে বললেন—এসব হচ্ছে কী? বাড়ীতে ছেলে-মেয়েগুলো বাংলায় একটা কথা বলবে না। অত বড় মেয়ে কেবল বেলেল্লাপনা করে নেচে বেড়াবে বয়ে আর ঠোঁটে রঙ মেখে। তুমি ওসব কনভেন্ট টনভেন্ট ছাড়িয়ে দাও। ওতে দরকার নেই।

প্রমদাবাবু চেঁচিয়ে বললেন—কালচারের তুমি বোঝটা কী? যেমন রান্না ঘর নিয়ে আছ তেমনি থাক। ওদের ট্যাক্‌ল্ করা তোমার সাধ্যি নয়।

গিন্নী মনের দুঃখ মনে চেপে চুপ করে রইলেন।

তাঁর অবস্থা সঙ্গীন। একদিন ছেলেমেয়ের সঙ্গে খেতে বসেছিলেন। তা খাওয়া তাঁর মাথায় উঠেছিল ছেলেমেয়েদের উপদেশের ঠেলায়।

—ও মাম্মি। তুমি ওই রকম করে চাকুস চাকুস করে ডাঁটা চিবিওনা, আমার শরীরের ভিতর কেমন যেন করে।—বলেছিল বড়মেয়ে বুলু।

ছোটমেয়ে টুলু বলেছিল—সুপ্, সুপ্, ঘুলু, মা কীরকম বড় বড় হাঁ করে খায়। একটু পরেই খড়হেলে

সান্টু তড়াক করে লাফিয়ে উঠল খাওয়া ছেড়ে—মা: তোমার সঙ্গে বসে খাওয়া যায় না মা। কীরকম হেউ হেউ করে চেঁকুর তোল তুমি।

ছোটছেলে মন্টু বললে—মা কী রকম পাত চাটে দেখলে না ঘিনঘিন করে।

সেদিন প্রমদাগিন্নীর ভাতের ডেলা গলা দিয়ে নামেনি। গলাটা কান্নায় বুজে গিয়েছিল। কিন্তু নালিশ করবেন কাকে? ওরা সবাই কালচারড্, এ্যারিষ্টোক্রোট, তিনি তো আর নন। তিনি কলস-কাঠির মেয়ে।

কালচার আর এ্যারিষ্টোক্রোসি নিয়ে যখন প্রমদাবাবুর বাড়ীতে চৌতাল বাজছে তখন হঠাৎ একদিন খবর এলো কোন বিশেষ কারণে প্রমদারঞ্জন অসময়ে রিটায়ার করতে বাধ্য হয়েছেন। প্রমদা-রঞ্জন অবশ্য পয়সার দিক দিয়ে যতটা গুছোবার তা গুছিয়েছেন। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, ইন্সুরেন্স ইত্যাদিতে মোটা টাকা রেখেছেন। কিন্তু একটা বড় দুঃখু রয়ে গেল। বড়ছেলে পরাশর আর বড়মেয়ে পুষ্পরাগ—বয়স যথেষ্ট হওয়া সত্ত্বেও আর কনভেন্টের পারফেক্ট এডুকেশন পাওয়া সত্ত্বেও ইউনিভার্সিটির দরজায় সেই যে চার বছর আগে হোঁচট খেয়েছে আজও উঠতে পারছে না। পরাশর ফাইন্যাল এম-বি দিল এই চারবার। পুষ্পরাগও বি-এ, অনার্স দিচ্ছে এই তিনবার।

কালচারের ভাটি দু' ভাই বোনে প্রায় তছরুপ করার জোগাড় করেছে। পাটের কারবারী মস্ত ব্যবসাদার ষষ্ঠীবাবুর মেয়ের সঙ্গে পরাশরের বিয়ের কথা তিনি পেড়ে রেখেছেন। ষষ্ঠী লাখ টাকা খরচ করে মেয়ে-জামাইকে বিলেতে পড়তে পাঠাবে। তা কোথায় কী? ছেলে আজও মেডিকেল কলেজের বেড়াই টপকাতে পারল না। চাদ্দিকে কালচারের চোট মেরিয়ে চিংড়িঘাটার জমিদার হাঁদুবাবুর ছেলের সঙ্গে প্রায় নিঃখরচায় মেয়ের বিয়ের ঠিক হয়ে আছে। কিন্তু হাঁদুবাবুর ছেলে চায় বি-এ পাশ করা বৌ। তাইতে আজও সে সম্বন্ধ পাকা হচ্ছে না।

এদিকে খরচের তো অবধি নেই। ডাক্তারী পড়ার মায় পরাশরের ইভিনিংয়ান টোব্যাকোতে পাইপ খাওয়া ও মাঝেমধ্যে বন্ধুদের সঙ্গে পার্টিতে ড্রিঙ্কের খরচ শুদ্ধ অঙ্কটা ক্রমশই মোটা হচ্ছে। পুষ্পরাগেরও নিত্যনৈমিত্তিক পার্টি, তাতে চমক লাগান বেশ-বাস। তারও খরচ কিছু কম নয়।

এর মধ্যে একদিন পাহাড় থেকে চিঠি এল। সেই চিঠি পড়ে কালচারড্ প্রমদারঞ্জনের মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। তিনি একটা চাপা গর্জন ছাড়লেন। গিন্নী কোথায় ছিলেন ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলো। দেখলেন কর্তার হাতে পাহাড়ের চিঠি। পাহাড়ের কনভেন্টে ছোটছেলে মন্টু আর ছোটমেয়ে টুলু তখনও পড়াশুনো করছে। গিন্নী ভয় পেয়ে বললেন—কী হল, পাহাড়ে কী ভূমিকম্প হল নাকি আবার?

কর্তা হাঁক করে উঠলেন—হলেই ভাল হত। ওঃ ছেলে মেয়ে নয় তো শয়তান! এবারও পাশ করতে পারল না। তার মানে আবার এক বছর হাতীর খরচ টানো। তা ছাড়া আবার সঙ্গে কর্ণ এনেছে চার জোড়া স্যুট, আট জোড়া জুতো, ষোল জোড়া মোজা, এক গুচ্ছ ক্রক—উফ্, আমাকে এরা ভিখিরী করে ছেড়ে দেবে।

কর্তার গলার আওয়াজে বাড়ী মাথায় উঠল।

বিরক্ত হয়ে পুষ্পরাগ আর পরাশর নিজের নিজের ঘর থেকে বার হয়ে এল। দুজনেই ঘরে ঢুকে চাপা গলায় বাপকে ধমক দিল—আর এমন আনকালচারড্ ক্রুটের মতো চ্যাচাচ্ছ কেন? লোকে শুনলে বলবে কী?

গিন্নী বললেন—আমি তো আগেই বলেছিলাম ওসবে কাজ নেই। এখন ঠেলা সামলাও।

বলে ঘর থেকে বার হয়ে গেলেন।

প্রমদারঞ্জন ক্ষেপে গেলেন ছেলে আর মেয়ের কথা শুনে। পাগলের মতো চেঁচিয়েচেটে চীৎকার করে বললেন—বেরিয়ে যা হারামজাদারা আমার বাড়ী থেকে। যার খাস তারই বাড়ি ওপড়াস। আমি আন্‌কালচারড্ ব্রুট! বটে! বাড়ী বাড়ী ছেলেমেয়ের এক পয়সা রোজগারের মুরোদ নেই। আমার পয়সায় আজও নবাবী কচ্ছ। চার চার বছর একই কোর্স ঘাড়াচ্ছে—আবার আমায় বলে কিনা আন্‌কালচারড্। যা—যা সব দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে।

পুষ্পরাগ আর পরাশর ঘর থেকে মুখ বিকৃত করে বার হয়ে এল। তাদের মার্তে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে। আর ছি ছি কালচারের অপমান। কথাগুলো অমন করে সিন ক্রিয়েট করে, ড্রামাটিক ভাবে না বললেই চলত না।

পরাশর তখুনি পাশের ঘরে ফিরে গেল। বললে—কাল থেকে তোমার পয়সা চাই না। পুষ্পরাগও বললে—আমায় পনেরো দিন সময় দাও, তারপর তোমায় আমার খরচ দিতে হবে না।

কিন্তু প্রমদাবাবু হৈ হৈ করে তাদের ঘর থেকে বার করে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তার পরের দিন থেকে তিনি ছেলেমেয়ের মুখ দেখা বন্ধ করে দিলেন।

এই ঘটনার এক হপ্তা পরে একদিন সকালে খবরের কাগজ পড়তে গিয়ে প্রমদাবাবু চমকে উঠলেন! কাগজের এক জায়গায় খবর বার হয়েছে—অবৈধ ব্যবসা চালানর জন্য চিকিৎসক গ্রেপ্তার। ডাক্তার হিমাংশু গুপ্ত ও তাঁহার সহকর্মী মেডিকেল কলেজের ফাইন্যাল ইয়ারের ছাত্র পরাশর সমাদ্দারকে পুলিশ গতকাল অবৈধ ব্যবসা চালানর জন্য গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাঁহাদের ক্লিনিকে বহু মৃতপাতি তল্লাসের ফলে পুলিশের হস্তগত হইয়াছে। পুলিশ কয়েকজন রোগিনীকেও সেই সঙ্গে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

খবর পড়ে প্রমদাবাবুর মাথায় বজ্রাঘাত হল। তিনি গিন্নীকে ডেকে খবরটা দেখাতে যাবেন এমন সময়ে গিন্নী নিজেই একটা চিঠি হাতে করে ঘরে ঢুকলেন। বললেন—আখতো খুকীর হাতের লেখা বলে মনে হচ্ছে। গতকাল সে গেছে চুঁচড়োতে তার বান্ধবীর জন্মদিনের পার্টিতে। রাতে ফেরেনি। আখতো চিঠিতে কী লিখেছে। প্রমদাবাবু চিঠি খুললেন। মেয়ে পুষ্পরাগ ইংরাজীতে তার বাবাকে লিখেছে—

তোমার মতো লোক যে আমার বাবা তা ভাবতেই ঘেন্না হচ্ছে। যাই হোক, তোমায় আমি রেহাই দিলাম। আমি যোগে যাচ্ছি কিন্তু-এ যোগ দেব বলে। আমার মনে হয়, আমার সেখানে অনেক প্রস্পেক্ট আছে। ঠিকানা দিলাম না, পাছে তোমরা আমার পিছনে লাগ ফিরিয়ে আনার জন্যে।

চিঠির ওপর চোখ বুলিয়ে প্রমদারঞ্জন আড়ষ্ট কাঠ বনে গেলেন। তাঁর গলার আওয়াজ বার হলনা। চোখ দুটোও গোল গোল হয়ে ঠেলে বেরিয়ে আসার যোগাড় হল। তাঁর এই অবস্থা দেখে গিন্নী তাঁকে সজোরে ঠেলা দিয়ে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলেন—ওগো তুমি এমন কচ্ছ কেন গো? ওগো আমার কী সর্বনাশ হল গো!

If I might control the literature of the household, I would guarantee the well-being of the church and state.

—*Bacon.*

সাহিত্য ও সাহিত্যিক

বানিয়ান

সুধীন্দ্র সিংহ

ইংরাজিতে একটা প্রবাদ বাক্য আছে—Morning shows the day. মানুষের জীবনে এ কথার বোঝানো হয় যে ভবিষ্যৎ জীবন কার কি রকম হবে ছেলেবেলাতেই তার আভাস পাওয়া যায়। হয়তো অনেকের পক্ষেই কথাটা সত্যি হয়ে থাকবে। কিন্তু যাঁর ইংল্যাণ্ডেরই অন্যতম একজন কণজন্মা পুরুষের জীবনে এ প্রবাদটি মিথ্যে প্রমাণিত হয়েছিল। তিনি হলেন ইংরেজি ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ এবং যে কোন ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপক কাহিনীকার The Pilgrim's Progress-এর রচয়িতা জন বানিয়ান (John Bunyan. 1628-1688)। মিথ্যাচার, খিস্তি গালাগাল এবং দুষ্টামি করেই ওঁর বাল্য কৈশোর এবং যৌবনের বেশ কিছুটা সময় কেটে যায়। অথচ শেষ পর্যন্ত ওঁর জীবনে কী বিরাট পরিবর্তনই না হয়েছিল।

বানিয়ান নিজেকে যেভাবে বিনাদ্বিধায় এবং সংসাহসের সঙ্গে পাঠক সমাজের কাছে তুলে ধরেছেন তা' দেখলে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়। ওঁর আত্মজীবনীর নাম Grace Abounding to the Chief of Sinners বানিয়ান স্পষ্টই জানাচ্ছেন যে খুব ছোট ঘরে ওঁর জন্ম। বাবা যদিও ওঁকে লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু নিজের অবহেলার জন্যই স্কুলের লেখাপড়া বলতে গেলে ওঁর তেমন কিছুই হয়নি। অল্প বয়সেই ঘোর নাস্তিক হয়ে উঠলেন বানিয়ান। শুধু তাই নয়, খিস্তি গালি-গালাজ, মিথ্যে কথা বলা এসব ওঁর প্রায় অভ্যাস দাঁড়িয়ে যায়। পাহাড়ের একটা খাঁড়ি থেকে একবার সমুদ্রে পড়ে যান বানিয়ান, আর একবার নৌকা থেকে পড়ে যান বেডফোর্ড নদীতে। তারপর একবার রণক্ষেত্রে একটুর জন্য বেঁচে যান—এভাবে তিনবার নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাবার জন্য বানিয়ান মনে মনে অবাক হয়ে যেতেন এবং হঠাৎ এক এক সময় নিঃসঙ্গভাবে থাকলে কী করে যে এই অসম্ভব সম্ভব হলো অর্থাৎ নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে রেহাই পেলেন—এ কথাটা মনে ওঁর একটু নাড়া দিয়ে যেত। কিন্তু ব্যস, ঐ পর্যন্তই। দুরন্ত বানিয়ানের স্বভাবের তাতে কোন লক্ষণীয় পরিবর্তন আসে না। আসল কথা হচ্ছে খুব গভীরভাবে নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা-ভাবনার কোন শক্তির স্ফুরণ হয়নি তখনো ওঁর জীবনে।

চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বানিয়ান বিয়ে করেন—এমন কি খাবার জন্য ডিসও ওঁদের দু-খানা ছিল না। কিন্তু ওঁর স্ত্রী সঙ্গে করে ওঁর বাবার দেওয়া দু-খানা বই এনেছিলেন, শেষ পর্যন্ত এই বই দু'খানাই বানিয়ানের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। বই দু'খানা হ'লো : The Practice of Piety এবং The Plain Man's Pathway to Heaven বানিয়ান অনেক সময় স্ত্রীর সঙ্গে একত্র হয়ে বই দু-খানা পড়তেন বটে কিন্তু ঐ পর্যন্তই, একটু পরেই বইয়ের সব কথা ভুলে বসতেন। কিন্তু মনের

অবচেতনে বানিয়ানের আলোড়ন আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল ; শুধু একটা আঘাতের প্রয়োজন ছিল। সে আঘাত বানিয়ান অল্পদিনের মধ্যেই পেলেন। একদিন বাড়ীর একটা দোকানের কাছে বানিয়ান গালা-গালি করছিলেন যে রকম উনি স্বভাবতঃই অনেক সময় করে থাকেন, কিন্তু এ ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু অন্যরকম হয়ে গেল। যে বাড়ীর সামনে বসে উনি ঐ রকম মুখ খারাপ করছিলেন সেই বাড়ীর ভেতর থেকে একটি মহিলা বেরিয়ে এসে প্রতিবাদ জানালেন। বললেন : এই সব অশ্রাব্য কথা কানে শুনতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত, সহরের ছেলে-মেয়েগুলি এসব কথা শুনলে বকে যাবে। প্রতিবাদটা নয়রই বলতে হবে, কিন্তু এতেই কাজ হলো। মহিলাটির কথায় বানিয়ানের মনে ভীষণ একটা প্রতিক্রিয়া হলো। নিজের ওপর অপরিসীম ঘৃণা ও লজ্জায় মাথাটা নুয়ে পড়লো। আর সেদিন থেকে ওঁর গালাগালের অভ্যাসটাও চলে গেল।

এর অল্পদিন পরেই বানিয়ানের সঙ্গে একজন পাদ্রীর ঘনিষ্ঠতা হয়। ওঁর কথায় বানিয়ান মাঝে মাঝে বাইবেলটা একটু আধটু পড়তেন। বিশেষ করে গল্পগুলির আকর্ষণে। হঠাৎ বানিয়ানের এই পরিবর্তন দেখে প্রতিবেশীরা অনেকেই আশ্চর্য হয়ে গেল। পাঁচজনে ওঁর সম্বন্ধে আলোচনা করছে জেনে বানিয়ানের খুব ভালো লাগতো, মনটা ওঁর ক্রমশঃ কোমল হয়ে আসতে লাগলো।

একদিন একটা বাড়ীর দরজার পাশে বসে চারজন দরিদ্র মহিলা ঈশ্বর প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলেন। একটু দূরে চুপ করে দাঁড়িয়ে বানিয়ান শুনছিলেন ওঁদের কথাবার্তা। যে রকম ভক্তি আর সরলতার সঙ্গে ওঁরা আলোচনা করছিলেন তা দেখে বানিয়ান অভিভূত হয়ে গেলেন। আবার নূতন করে দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে বাইবেল পড়তে সুরু করলেন বানিয়ান। একদিন হঠাৎ ওঁর মনে হলো : yet there is room.

এরপর কয়েকটা মাস সুতীব্র আত্মবিশ্লেষণের মধ্যে কাটে বানিয়ানের। স্পষ্টই অনুভব করতেন মনটা ওঁর কতো কোমল হয়ে এসেছে—ঠিক এতটা উনি এর আগে কখনো অনুভব করতে পারেন নি। অথচ আর একদিকে নিজের বিগত জীবনের নানা কুকার্যের কথাও ভাবতেন। ভাবতেন আর দারুণ অনুশোচনায় আত্মগ্লানি বোধ করতেন।

আর একদিনের কথা লিখছেন বানিয়ান। সেদিন গ্রামের পথে চলছিলেন উনি আর কিছুটা অন্যমনস্ক ভাবে নিজের কথা ভাবছিলেন। ভাবছিলেন জীবনটাতো প্রায় ফুরিয়েই এলো, কতো কাজ করা যেতো অথচ কিছুই করা হ'লো না। ছেলেবেলা থেকে কুসঙ্গে মেলামেশার জন্য ব্যর্থ হয়ে গেল জীবনটা। এই সমস্তই ভাবছিলেন বানিয়ান।

এমন সময় হঠাৎ ওঁর মনে হ'লো He hath made peace by the blood of His cross এর পর বার্টন লুথারের অনেক পুরনো—প্রায় ছেঁড়া একখানা বই বানিয়ানের হাতে আসে। পড়তে পড়তে বানিয়ানের মনে হ'ত যেন বইখানা ওঁর জন্যই লেখা হয়েছিল—নিজের আধ্যাত্মিক জীবনের সমস্যাগুলির এমন হুবহু মিল পেলেন উনি বইখানাতে।

একদিন সকালে প্রাত্যহিক প্রার্থনার সময় বানিয়ান ঈশ্বর চিন্তায় বিভোর ছিলেন। এমন সময় ওঁর মনে হলো : My grace is Sufficient. প্রায় দু-মাস পর ঐ কথাটাই পর পর তিনবার মনে আসে বানিয়ানের। তখন ওঁর মনে হ'তে লাগলো সমস্ত অন্যায় আর কুকর্মের জন্য মহান ঈশ্বর নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন। এর কয়েক বছর পর বানিয়ান প্রোটেস্টান্ট সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে তখন

কার প্রচলিত আইন অগ্রাহ্য করে প্রকাশ্যে খৃষ্টধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। অন্যান্য অনেকের সঙ্গে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে বানিয়ান গ্রেপ্তার হলেন। এ সময় ওঁর বয়স ত্রিশ বছর কিন্তু তার মধ্যেই বানিয়ানের অন্তর সম্পূর্ণভাবেই ঈশ্বরে সমর্পিত হয়ে গেছে।.....That not one hair of my head can fall to the ground without the will of my father .....এ বিশ্বাস তখন ওঁর বদ্ধমূল হয়ে গেছে। বারো বছর কারাবাসের পর বানিয়ান মুক্তি পেলেন। এই কারাবাস বানিয়ানের পক্ষে তো বটেই সম্ভবত গোটা পৃথিবীর পক্ষেই সুফলপ্রসূ হয়েছে। বন্দী অবস্থায়ও ধর্মপ্রচার করতেন বানিয়ান কিন্তু অবসরও পেতেন এবং তারই মধ্যে কারাজীবনে একাগ্র চিন্তা ও পড়াশুনোর সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলেন। প্রথমবারের দীর্ঘ বারো বছর কারাজীবনে তাঁর ধ্যান ধারণার ফল দেখা গেল দ্বিতীয় কারাজীবনে। ১৬৭৫ খৃঃ অব্দে আবার বন্দী হলেন বানিয়ান The Pilgrim's Progress-এর পরিকল্পনা এবং অর্ধেকেরও বেশী রচনা কারাগারে থাকতেই করলেন উনি।

অধঃপতিত জীবন থেকে মহাধামিকে রূপান্তরিত হয়ে বানিয়ান এই কথাই প্রমাণ করলেন যে জীবনে ভালো এবং উন্নতি করবার সময় কখনোই ফুরিয়ে যায় না। বানিয়ান তাঁর আত্ম-জীবনীতে এই আশার বাণীই শুনিয়ে গেছেন মানুষকে। Grace Abounding নিছক একখানি সরল সুখপাঠ্য আত্মজীবনীই নয়—যে কোনো মনোযোগী পাঠক এ বই পড়ে নিশ্চয়ই অনুপ্রাণিত বোধ করবেন।

গিয়োভানি সান্তির তখন চিত্রকর হিসাবে খুবই নাম। কিন্তু মনে তাঁর সুখ নেই, ছেলেটার ছবি আঁকার দিকে তেমন মন নেই। রং তুলি হাতে নিয়ে সে শুধু বসে বসে ভাবে।

বাপ চটে উঠে একদিন ধমকালেন তাকে,—"কি ভাবিস্ বল ত?"

ছেলে উত্তর দিলে, —"আমি যা আঁকতে চাই, সেটা পুরোপুরি ধরতে পারছি না।"

—"বেশ, চেষ্টা কর।"

ছেলে ত চেষ্টা করতে বসল' কিন্তু তবুও সেই একই ভাব।

বাপ হতাশ হয়ে পড়লেন, কিন্তু ছেলের প্রতিভা তাঁর অজ্ঞাত নয়। রং তুলি হাতে নিয়ে ছেলের নিশ্চেষ্ট ভাবটা দেখে তিনি একরকম হাল ছেড়ে দিলেন।

মাস তিনেক পরে তিনি তাঁর অতন কক্ষের একপাশে একখানি ছবি টাঙানো দেখে চমকে উঠলেন,—এ ছবি কে এঁকেছে? এ যে অপূর্ব সৃষ্টি! এ প্রতিভা যে স্বর্গের দান!

এবার র‍্যাফেল এসে তাঁর বাপের পায়ের কাছে বসলেন, বললেন, এরই কল্পনার জন্যে ত অপেক্ষা করছিলাম বাবা।

সাহিত্য সংবাদ

মননশীলতার কদর ঃ

পবিত্র পাল

অন্নদাশঙ্কর রায় একাডেমী পুরস্কার পেয়েছেন, এদেশে এ এক আশ্চর্য ঘটনা বলে আমি মনে করি। যেহেতু আমি মনে করি মননশীল লেখক এদেশে আজো অবহেলিত এবং যেহেতু অন্নদাশঙ্করের কদর এদেশে নিতান্তই অনুল্লেখযোগ্য, সেহেতু এ সিদ্ধান্ত করা মোটেই অসঙ্গত নয় যেহেতুই আমলা-তান্ত্রিক পদ্ধতিরও মধ্যে 'আকস্মিকতা' নামক শব্দটির যে প্রভাব আছে তারি প্রভাবে অন্নদাশঙ্কর আজ পুরস্কৃত। যেহেতু অতীতে আমাদের দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে, অতি অপাঠ্য একটি উপন্যাস যার লেখক কীরকম ভাবে একাডেমী পুরস্কার পেয়েছেন। সুতরাং যে পুরস্কার লাভের সভায় কোন কোন বিশেষ কারণে অলেখকেরাও লেখকদের সঙ্গে সমান জায়গা কেড়ে নেন, সেখানে অন্নদাশঙ্করেরও ভাগ্যে পুরস্কার লাভ একটি আকস্মিক ঘটনা। এবং এদেশে এ রকম দুর্ঘটনার মধ্যে আকস্মিক শুভঘটনারও খানিকটা মূল্য আছে, সে-হিসেবেই অন্নদাশঙ্করের পুরস্কারলাভ ততখানি মূল্যই বহন করে।

বলাবাহুল্য, তিনি আমার অতিশয় প্রিয় এবং শ্রদ্ধাভাজন লেখক। সে হিসেবে আমি খুব সুখী এবং সুখী বলেই উপরের মন্তব্যটি করতে উৎসাহ বোধ করলাম।

তাঁর পুরস্কার পাওয়া উপলক্ষে আমার মনে কতকগুলো বক্তব্য তৈরী হয়েছে। সাহিত্যের অভাব অভিযোগ নিয়ে দু চার কথা। এগুলো নিয়ে আজকাল আলোচনা বড় একটা চোখে পড়ে না।

কথাসাহিত্য থেকে ব্যক্তিত্ব উঠে গেছে, এমন একটি অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। বুদ্ধি-ঝলমল লেখকগোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়েছে বাংলাদেশে, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। দু'টি কারণে এ লেখক গোষ্ঠীর আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে। প্রথম ও প্রধানতম কারণ, ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধির দীপ্তির যুগপৎ সম্মিলন ঘটিয়েছেন যে একমাত্র পুরুষটি বাংলাদেশে সে-রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা সাহিত্যের প্রতিপালন। দ্বিতীয় কারণ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও ইউরোপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক যোগ। এর ফলে ভারতবর্ষের এবং বিশেষতঃ বাংলার সমাজমানসের ভেতর একটা প্রচণ্ড নাড়া পড়েছে। চেতনার জড়ত্ব যেন খুব বুঝ বড়ে পড়ল। গ্রামীন সংস্কৃতির নিরীহ শান্ত রূপটিকে বর্জন করে শহরে 'স্মার্টনেস'-এ আকৃষ্ট হলাম। এ শহরে 'স্মার্টনেস'ই হল বুদ্ধির ঝলমলানো রূপটি। এ শহরে 'স্মার্টনেস' যেমন ব্যক্তিত্বের সোটা অবয়ব গঠন করে না, তেমনি একার্থে ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে চাতুর্যের সেবায় নিয়োজিত। ব্যক্তিত্ব বুদ্ধিকে সহ্য করে, চাতুর্যকে নয়। জীবন ও জগতকে সোটা দিক দিয়ে বিচার করবার একটি পরিশীলিত ও সংগ্রামময় অনুশীলন ব্যক্তিত্বের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। বিশুদ্ধ সাহিত্যের অর্থে এবং কেতাবী কৃতিত্বের বাহ্যিক অভিজ্ঞান অর্থে ইদানীংকালের বুদ্ধি ঝলমল সাহিত্যিক শ্রেণী অতিশয়

পারছনী। সেখানে জীবন ও জগতের একটা আংশিক দিকই স্পষ্ট। আংশিক দিকে হৃদয়ের অস্তিত্বের আভাস যদিও বা মেলে কখনো সখনো, কিন্তু হৃদয়ের সে-অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। হৃদয়ের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে তখনি যখন নিগূঢ় ভাবাবেশকে বর্জন করে সত্যদৃষ্টিতে পরিচ্ছন্ন ও মানবতাবোধে উজ্জ্বল বুদ্ধির দ্বারা চেতনার শুভবৃত্তির চর্চা সম্পাদিত হয়। অন্নদাশঙ্করের নানা বিষয়ের প্রতি সাধকসুলভ অভিনিবেশ লক্ষ্য করি (এবং প্রতিটি বিষয়ই দীর্ঘ অনুশীলনসাপেক্ষ) আর তাঁর সে অভিনিবেশ যেহেতু নিছক সাংবাদিকসুলভ অথবা একাডেমিক নয়। সে অভিনিবেশে তাঁর চিন্তা আন্দোলন ও সমাজ-বিপ্লবের ব্যাপক লক্ষ্যে পরিচালিত। সমাজ-বিপ্লব তাঁর কাছে সাহিত্যের কতগুলো বৈপ্লবিক চরিত্র সৃষ্টির মধ্যেই নিঃশেষিত নয়। পূর্ববাংলার সাহিত্য ও ভাষা আন্দোলন, এখানকার ভাষা সমস্যা, প্রাদেশিক সম্পর্ক, বাঙালী আসামীর মধ্যে দাঙ্গা, চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ, শিল্পীর দায়িত্ব, ভূদান প্রভৃতি আরো বহু ঘটনার প্রতি তিনি নির্লিপ্ত থাকেননি। ঘটনা-প্রতিক্রিয়ায় নিছকই চালিত নন তিনি। তাঁর প্রতিটি মন্তব্য সুচিন্তিত, ভাবাবেগলেশশূন্য এবং সাময়িকতার ঊর্ধ্বে কাটানো। সমাজের বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য সন্ধান করে ফিরেছেন এবং বিরোধের মধ্যে একটি ব্যাপক সমাধানের সূত্র বেছে নেবার চেষ্টাও করেছেন।

আর যেহেতু নির্মোহ না হলে সাহস সঞ্চয় করা যায় না এবং যেহেতু দ্বিভিন্নীনতায় ভাঙনাপড়া ভিটেতে যে-দেশের চেতনা সঙ্কীর্ণ সেখানে সত্য কথা বলতে গেলে রীতিমত সাহসের দরকার হয়, সেহেতু বলা চলে অন্নদাশঙ্কর নির্মোহ হতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর কপালে বহু নিন্দার পাথর নিক্ষেপে রক্ত বেরুতে দেখেছি। নির্মোহ না হলে যে এদেশে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হয়ে সত্যদৃষ্টির অধিকারী হওয়া যায় না এবং সত্যদৃষ্টির অধিকারী না হলে সমাজমানসের পরিবর্তন কামনা নিষ্ফল—এ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বলেই চাকরী ঘুরোবার আগেই অবসর নিয়েছিলেন। এদেশের মাটিতে সৈরিক উত্তরীয় সমাজ-বিপ্লবের পক্ষে উপযুক্ত বেশ—সে দেহেই হোক আর মনেই হোক। সদ্য আহরণশীল দেশ ভারতবর্ষে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী বিভিন্ন উপজীবিকার দাস। চাকরী-কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালীতে নিষ্পেষিত সে সমস্ত বুদ্ধিজীবীদের কোন সত্যবোধ নেই, অসহায় পরজীবীবৃত্তিকেই (বুদ্ধিতেও) মাথায় তুলে তাঁরা চলেছেন। সাংবাদিকেরও যেমন কোন বলিষ্ঠ চরিত্র নেই, সংবাদপত্র শাসিত ও প্রকাশককুল শাসিত সাহিত্যিকের-ও কোন চরিত্র নেই। তাঁরা নির্মোহ হতে পারেন না। মধ্যবিত্ত আশা আকাঙ্ক্ষা তাঁদের ধনতান্ত্রিক মনোবৃত্তির সাথে সাথে বর্ধিত হয়ে চলে। কেন নির্মোহ হতে পারেন না—এ আলোচনা এখানে অবান্তর। বক্তব্য হল, নির্মোহ না হলে সুস্থ, স্বাধীন, দৃঢ় চরিত্রের পরিচয়ে চিন্তা-আন্দোলনে কোন ভূমিকা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। অন্নদাশঙ্কর নির্মোহ। সেজন্য কর্তব্য নিক্ষেপে তিনি ক্লান্ত হন না, কাপুরুষতার সঙ্কীর্ণ কোটরে প্রত্যাবর্তন করেন না। এ আমরা বহুদিন ধরে লক্ষ্য করছি, তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে অনেকেরই পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর সত্যানুরাগ বিরল এবং সে সম্পর্কে কোন দ্বিধা কারো নেই।

এজন্যেই অন্নদাশঙ্কর এদেশে একজন বিরল পুরুষ। তাঁর বাক্তিত্ব ও নির্মোহ স্বভাব বাংলা সাহিত্যের স্বার্থে যেমন দরকার, তেমি দরকার চিন্তা আন্দোলনের স্বার্থেই। যথার্থ মননশীলতার অনুশীলন এদেশে বড় একটা দেখা যায় না এবং সে পথও সুপ্রসারিত নয়।

সুতরাং আমি যদি, পুরস্কার দিয়েই মনে যেন না করি, অন্নদাশঙ্করকে খুব সম্মান দেওয়া

হল। এটা আকস্মিক ঘটনা। গোটা জীবনের সমস্ত কীর্তির বিবেচনার সুদমঞ্জস ধারার কোন পরিণাম নয় এ পুরস্কার।

জীবনের সমস্ত কীর্তির সম্মিলিত পরীক্ষায় যদি এ পুরস্কার দেওয়া বিবেচিত হত, নিঃসন্দেহে অন্নদাশঙ্করের জুড়ি এবিষয়ে আর কেউ নেই অন্ততঃ বর্তমান বাংলা সাহিত্যে। বাংলার তরুণ সাহিত্যিকদের এবং বুদ্ধিজীবীদের ব্যক্তিত্ব ও নির্মোহ স্বভাব—এ দুটো দুর্লভ প্রয়োজনের দিকে নজর রাখতে অনুরোধ করছি। এ দুটোর অভাবেই বাংলাসাহিত্যের হাটে আজ শুধু শূন্যের কলরব শোনা যাচ্ছে। যারা ভীরু, পরাধীন, ক্লীব, ধনিকতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক সে সমস্ত সাহিত্যিকদের মুখেই স্বাধীন সাহিত্যের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। চিন্তা-আন্দোলনে এঁদের কোন দান কোনকালেই ছিল না এবং আজো নেই।

সবশেষে ব্যক্তিত্ববান, নির্মোহ, সত্যানুরাগী অন্নদাশঙ্করকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাই।

তখন সপ্তদশ শতাব্দীর নামকরা চিত্রকরদের ছবি দেখতে লোকে ছুটে আসত ফ্লোরেন্সে। ওগাস্কার ছবি আঁকার নৈপুণ্য "ফ্লোরেন্টাইন্ আর্ট" হিসাবে এখনও জগদ্বিখ্যাত হয়ে আছে।

কিশোর বালক গিয়োরদানো ছবি আঁকা শিখতে এলেন ফ্লোরেন্সে।

এই বিদেশী ছেলেটিকে প্রথমে আমল দিতে চাইলেন না শিল্পীর দল।

অবশেষে এক গুরুর কাছে অনেক কষ্টে শিক্ষালাভের অনুমতি মিলল।

গুরু বললেন—"আমার আঁকা ছবি প্রথমে অনুকরনকরে' রং তুলি চালাও, অবশ্য, অনেকদিন লাগবে এতে, কিন্তু বারংবার ব্যর্থ হলেও, চেষ্টা করে এগিয়ে চল।

গুরুর আঁকা ছবি দেখে দেখে গিয়োরদানো সেই ছবি নকল করতে লেগে গেলেন।

কয়েকদিন পরে চিত্রাগারে এসে গুরুর ত চক্ষুস্থির। শিষ্যের নকলকরা ছবির কাছে গুরুর ছবি যেন ম্লান হয়ে গেল।

গুরু এবার শিষ্যকে জড়িয়ে ধরে উচ্ছসিত কণ্ঠে বললেন,—"বৎস, তোমার কাছেই আমাকে ছবি আঁকা শিখতে হবে এবার।"

Sulekha

OFFICE REQUISITES

nothing better to choose than

সুলেখা (জেনারেল) ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক 'এস-৪০' সলভেন্ট সমৃদ্ধ। এ কালি সমস্ত কলমেই ব্যবহার করা যায়

পেনসোল: কলম পরিষ্কারক সলিউশন কালির সলভেন্ট সমৃদ্ধ পেনসোল মাত্রিক ঘড়ে কলমের সর্বকিছু পেনসোল (জেনারেল কলমে কালি না দেয়া প্রভৃতি) দূর করে।

সিকুরিটি শীলিং গুণের চার গ্রেডে পাওয়া যায়। ভারতের সর্বত্র সমস্ত ব্যাঙ্ক ব্যবহার করে

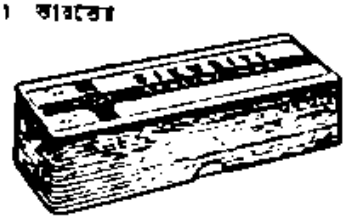

সুলেখা স্পেশাল ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক সলভেন্ট 'এস-১০০' যুক্ত দামী কলমের পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং সত্যে চমৎকার।

এ্যাডসল গাম এ্যাণ্ড পেস্ট— ফুসিরিয়ার ও জেনারেল কোয়ালিটি — আঠার কাজে সবচেয়ে সেরা।

সুলেখা স্টাম্প প্যাড: দুই কোয়ালিটিতে পাওয়া যায়— ফুসিরিয়ার ও অফিস কোয়ালিটি। সুলেখা রাবার স্টাম্প ইঙ্ক দিয়ে প্যাডগুলি কালি মাখানো।

REGISTERED TRADE MARK

Sulekha WORKS LTD.

CALCUTTA · DELHI · BOMBAY · MADRAS

বস্ত্রশিল্পে অগ্রগতি

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলসের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। গত ৫০ বছরেরও উপর বঙ্গলক্ষ্মীর ধুতি শাড়ী আর নানারকম বস্ত্রসম্ভার লক্ষ লক্ষ গৃহের শুধু চাহিদা মেটাইনি সেইসঙ্গে আনন্দও বিতরণ করেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচি আর প্রয়োজনও বদলেছে আর সেইমত বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস ও নিজেকে সম্প্রসারিত করেছে। সম্প্রতি নানারকম নূতন বস্ত্রসামগ্রী আমদানী করে দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

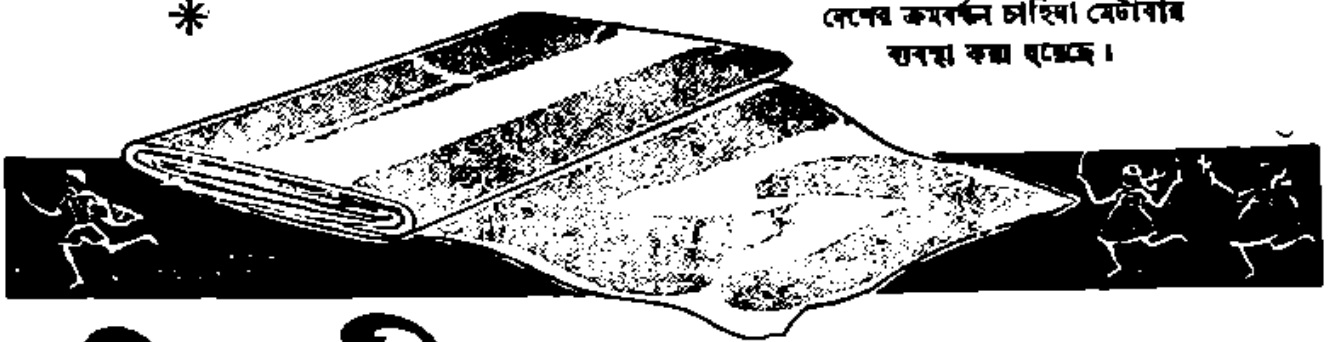

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্ লিমিটেড্

৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

জহরাসঙ্কের আশ্চর্য্য উপন্যাস **ছায়াতীর** (দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হইল) ৫৲

অবধূতের—মরুতীর্থ হিংলাজের পরবর্ত্তী কাহিনী **হিংলাজের পরে** (দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হইল) ৫৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ক্রান্তিকারী উপন্যাস

কাল, তুমি আলেয়া (দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হইল) ১২৷০

সাতপাকে বাঁধা (চতুর্থ মুদ্রণ প্রকাশিত হইল) ৪৷০

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের অনন্যসাধারণ উপন্যাস **সন্ধ্যার কুয়াশা** ৫৲

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের নবতম উপন্যাস **মেঘ ও মৃত্তিকা** ৫৲

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের নূতন উপন্যাস **যাত্রাপথ** ৪৲

বিমল করের নূতন উপন্যাস **পান্থশালা** ৩৷০

নীহাররঞ্জন গুপ্ত ও দেবনারায়ণ গুপ্তের নাটক **তাপসী** ৩৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

রাতের রজনীগন্ধা—৫৲ **উত্তরফাল্গুনী**—৬৷০ **বেলাভূমি**—৮৲

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শ্রীআয়ুর্বেদমের—

মহাভৃঙ্গরাজ তৈল

কেশ ও মস্তিষ্কের
পক্ষে অতুলনীয়

●

বহু পরীক্ষিত ও
দেশবরেণ্যগণ কর্তৃক
উচ্চ প্রশংসিত

●

শ্রীআয়ুর্বেদম.

২৭৯এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬

ফোন : ৫৫-৩২৯৪

বড় বড় ষ্টেশনারী দোকানে পাওয়া যায়।

অনিলকুমার ভট্টাচার্যের

দু'খানি মনোরম উপন্যাস

উপনদী ২·০০

মেঘ পাহাড়ের গান ২·০০

— সুপাঠ্য কবিতার বই —

সাগর আকাশ ২·০০

ডি. এম. লাইব্রেরী

কলিকাতা—৬

ফ্লাওয়ের

সেরা

যদি কিনতে হলে
এই দুটো দেখে

দেখে কিনবেন

বেঙ্গল এনামেল ওয়ার্কস লিঃ ও
সেরামিক সেলস্ করপোরেশন লিমিটেড
২৫ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২

বিশ্বের লোকনৃত্য

সচিত্র সংযোজন

উত্তর ইয়োরোপের লোকনৃত্য

– অমলকুমার নাগ

ইয়োরোপের শিল্প-সংস্কৃতির মূল সূত্র অন্বেষণ করতে চলে গ্রীসের দিকেই সকলে তাকিয়ে থাকেন। একই সময়ে প্রাচীনতা এবং উন্নত রুচির সন্ধান পেতে হলে নিঃসন্দেহে গ্রীসই লক্ষ্য হওয়া উচিত। কিন্তু এই সঙ্গে আর একটি কথাও বলা দরকার। সে হলো, গ্রীসের কথাটা অনেক সময় অনেক প্রসঙ্গেই এমন ভাবে পরিবেশন করা হয়ে থাকে যে সাধারণ মানুষের কাছে এ কথা মনে হওয়া অস্বাভাবিক হয় না যে ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির মূল সম্পর্কেই গ্রীসই শেষ কথা। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়।

আগেই বলেছি প্রাচীনতা এবং উৎকর্ষের দিক দিয়ে নিঃসন্দেহে গ্রীক শ্রেষ্ঠ, কিন্তু অনেক ব্যাপারে তারপরও কথা থাকে—যেমন লোকনৃত্য। লোকনৃত্য সম্বন্ধে এইটুকু বলা চলে যে এ বিষয়ে সমগ্রভাবে ইয়োরোপ গ্রীসের কাছে যতো ঋণী উত্তর ইয়োরোপ, অর্থাৎ নরওয়ে, সুইডেন এবং ফিনল্যাণ্ডের কাছেও বোধ হয় প্রায় ততোটাই।

ইয়োরোপের পূর্ব, পশ্চিম এবং দক্ষিণাঞ্চল যেমন অনেক ব্যাপারেই গ্রীসের ওপর নির্ভরশীল ছিল। হাজার কি দু' হাজার বছর আগে, নরওয়ে, ফিনল্যাণ্ড এবং সুইডেনও তেমনি যথা ইয়োরোপের একটা বিরাট অঞ্চল জুড়ে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। এটা যে সম্ভব হয়েছিল অন্যান্য কারণের মধ্যে তার একটি কারণ হলো স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলির নানা বিষয়ে মৌলিক উদ্ভাবনী শক্তি।

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার প্রাচীন ভাইকিংরা কেবল দস্যুবৃত্তির জন্যেই খ্যাত ছিল না, নৃত্যগীতের আদর করতেও ওরা জানত। তখনকার দিনে ছোটো ছোটো গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে বসবাস করার রীতি থাকার দরুণ ওদের মধ্যে লোকনৃত্যেরও বিশেষ জনপ্রিয়তা দেখা গিয়েছিল।

নরওয়ে, সুইডেন এবং ফিনল্যাণ্ডের লোকনৃত্যের একটি প্রধান গুণ হলো সাধারণত সামরিক পোষাকে ওরা এতে অংশ গ্রহণ করে থাকে। এমন কি আজকের দিনেও নরওয়ের লোকনৃত্যে দেখা যায় নারী অংশগ্রহণকারীরা নিষ্ক্রিয় অংশগ্রহণ করে আছে এবং পুরুষ অংশগ্রহণকারীরা শারীরিক কসরৎ দেখাবার জন্যে নানা ভঙ্গীমার আশ্রয় গ্রহণ করছে।

প্রাচীনকালে, দু'হাজার কি তিন হাজার বছর আগে নরওয়ে তার সে সময়কার শক্তির জন্যে যতো বিখ্যাত হয়েছিল এবং বেশ কিছুটা ভয়ের কারণ হয়েছিল ততোটা আর কেউই ছিল না—তাই লোকনৃত্যে অঙ্গীভাবের বেশটাও নরওয়ের লোকনৃত্যের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা প্রকটভাবে দেখা যায়। সুইডেনের লোকনৃত্যও মোটামুটিভাবে নরওয়েরই অনুরূপ, তবে অঙ্গীভাবের প্রকাশ কিছুটা কম দেখা যায়।

কিন্তু ফিনল্যাণ্ডের লোকনৃত্য নরওয়ে এবং সুইডেন—এই দুই দেশের চাইতেই বেশ কিছুটা ভিন্ন ধরণের। এদেশেও অঙ্গীভাবটা যদিও কিছুটা রয়ে গেছে, সেই সঙ্গে দেখা যায় অন্য একটি

জিনিসের প্রকাশ—যার ফলে ফিনল্যাণ্ডের লোকনৃত্য নরওয়ে এবং ফিনল্যাণ্ডের লোকনৃত্যের অনুসারী হয়েও স্বকীয়তা হারায়নি। এ জিনিসটি হলো ফিনল্যাণ্ডের লোকনৃত্যে একটি বিচিত্র কোমলতার স্পর্শ। বরফের দেশ ফিনল্যাণ্ডের অধিবাসীরা একাদিক্রমে সাদা জমাট বরফ দেখতে দেখতে হয়রাণ হয়ে পড়ে —চোখে যেমন একঘেয়ে লাগে মনেও তেমনি দেখা দেয় একঘেয়েমির রেশ। কিছুই যেন আর ভালো লাগছে না। কিছুতেই যেন আর প্রেরণা পাওয়া যাচ্ছে না। এমনি সময় যদি সাদা বরফের চাকনি ভেদ করে একটি সবুজ কচি পাতা দেখা দেয় তাহলে কার না মন আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠে? ফিনল্যাণ্ডের লোকনৃত্যে তাই দেখা যায় বসন্তকে আমন্ত্রণ করবার একটি বিশিষ্ট ভঙ্গীমা তার লোকনৃত্যের অঙ্গ হয়ে আছে। এবং এই বসন্তকে আহ্বান করবার জন্যে ফিনল্যাণ্ডবাসীদের লোকনৃত্যের শিল্পীগণকে সুদূর প্রাচীন কাল থেকে এমন কি আজকের দিনেও ব্যাপৃত থাকতে দেখা যায়।

নরওয়ে, সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ড তাদের লোকনৃত্যের জন্যে ইয়োরোপে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে এই সমস্ত কারণেই এবং খুবই প্রাচীন দেশ বলে এই দেশগুলির লোকনৃত্যে ঐ গুণগুলির মধ্যে নৃতাত্ত্বিকগণের পক্ষেও অনেক কিছু লক্ষ্য করবার বিষয় রয়ে গেছে।

গল্প-ভারতী

চৈত্র সংখ্যা—১৩৬১

সম্পাদক :

শ্রীবিভূতিভূষণ দাস

সহঃ সম্পাদক : শ্রীকল্যাণ রায়

মূল্য এক টাকা

শ্রীসুধাংশু কুমার রায় চৌধুরী কর্তৃক ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেড ২১৯বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত এবং কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

সাকি লো, সাজা ফুলে
নিবিড় এলো চুলে
চুম্বির পান্থধার
এ লো সে' হাতে তুলে।

—[illegible]

নিবিড় ঘন কালো চুল সবার মন হরণ করে। বহুকাল ধ'রেই কেশচর্চায় অলিভ অয়েলের উপকারিতা স্বীকৃত। ক্যালকেমিকোর ক্যান্থারলে আছে সেই অলিভ অয়েল। আজও মেয়েরা তাই কেশপরিচর্য্যায় ক্যান্থারল ব্যবহার করেন।

ক্যান্থারল

সুগন্ধিযুক্ত ক্যান্থারাইডিন কেশ তৈল

দি ক্যালকাটা কেমিকেল কোং লিঃ কলিঃ-২৯

CALCUTTA UNIVERSITY
CENTRAL LIBRARY

গল্প-ভারতী

অষ্টাদশ বর্ষ,

চৈত্র ১৩৬৯

সম্পাদকীয়

রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ—

ভারত ইতিহাসের দুই মহান চরিত্র স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ। বাঙ্গলার এই দুই সমসাময়িক মহাপুরুষ মিলিত হইয়া ভাবের আদান প্রদান করিতেন ইহা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যদিও সুদীর্ঘ আশী বৎসর জীবিত ছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ মাত্র উনচল্লিশ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। কালের দিক হইতেই যে কেবল তাঁহারা সমসাময়িক ছিলেন শুধু তাহাই নয়, তৎকালীন বিবিধ সমস্যাগুলির সমাধানে তাঁহারা একই পথের যাত্রী ছিলেন। পরলোকগত অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের ডায়েরী পাঠে জানা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ স্বামিজী লিখিত "প্রাচ্য ও প্রতীচ্য" প্রবন্ধের শুধু ভাবধারারই সমর্থক ছিলেন না অধিকন্তু ইহার কথা ভাষারও গুণগ্রাহী ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ও তাহার পূজনীয় পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবেকানন্দের ধর্ম জীবনের ক্রমোন্নতি ও পরিণতির উপর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণদেবের সহিত সাক্ষাতের পূর্বে জোড়াসাঁকোতে বিবেকানন্দ প্রায়ই মহর্ষির সহিত দেখা করিতে যাইতেন এবং মহর্ষিও তাঁহার মস্তক স্পর্শ করিয়া আশীর্বাদ করিতেন এবং তাঁহার যোগীজনোচিত নয়ন যুগলের প্রশংসা করিতেন। ১৮৯৮ সালে যখন ভগিনী নিবেদিতা কলিকাতায় প্রথম আসেন তখন স্বামী বিবেকানন্দই তাঁহাকে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে লইয়া যান। এ সময় স্বামীজী বঙ্গীয় ভিত্তিতে স্ত্রীশিক্ষাদানের পরিকল্পনা করিতেছিলেন। তৎকালে ঠাকুর পরিবারের মাসিক পত্র "ভারতী"তে স্বামী বিবেকানন্দের একটি চিঠি

প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের বড়দিদি স্বর্ণকুমারী দেবী সে সময় উহার সম্পাদক ছিলেন। পরে তাঁহার কন্যাদ্বয় সরলা দেবী ও হিরণ্ময়ী দেবী ও যোগ্যতার সহিত ইহার সম্পাদনা করেন। রবীন্দ্রনাথ ভগিনী নিবেদিতার লেখায় স্বামীজীর আদর্শবাদের যে সন্ধান লাভ করিয়াছিলেন, উহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। আচার্য্য স্যার যদুনাথ সরকার মহাশয়ের লেখা হইতে আমরা জানিতে পারি যে এ সময় ভগিনী নিবেদিতার সহিত রবীন্দ্রনাথ রাজগৃহ, নালন্দা ও অন্যান্য বৌদ্ধতীর্থ ভ্রমণে বাহির হন। "ফ্রাশনেলিজম্" নামক যুদ্ধবিরোধী প্রবন্ধের পরিশিষ্ট "শতাব্দীর সূর্য্যাস্ত" নামক গদ্য কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ইংরাজীতে অনুবাদ করার ফলেই রোমা রোঁলাঁর দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের উপর পতিত হয়। ১৯০১ সালে বিবেকানন্দ তাঁহার শেষ পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হন এবং সুবিখ্যাত ধর্ম ইতিহাস কংগ্রেসে ভগিনী নিবেদিতা ও অধ্যাপক পেট্রিক গেডিস্-এর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়।

শান্তিনিকেতনের শিক্ষাধারা কেবল বেদ ও উপনিষদের ভিত্তিতে রচিত হয় নাই; ইহা ভগবান বুদ্ধ ও তাহার বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাবেও অনুরঞ্জিত। স্বামী বিবেকানন্দ ও বুদ্ধ ও বৌদ্ধ দর্শনের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। কলিকাতার মহাবোধি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সিংহলের অনাগরিকা ধর্মপালের সহিত ১৮৯৩ সালে চিকাগো ধর্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দের দেখা হয়। তিনি স্বামীজী অপেক্ষা এক বৎসর বয়ঃকনিষ্ঠ। আগামী ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাহার জন্ম শতবর্ষ পূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। কলিকাতার মহাবোধি সোসাইটির বর্তমান সম্পাদক দেবপ্রিয় বলিসিংহ শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের প্রাক্তন ছাত্র। রবীন্দ্র ধর্মন সিংহলের স্কুল ও কলেজসমূহে প্রচারে তিনি বিশেষ উৎসাহশীল। আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের অচিন্তনীয় সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া কতিপয় খৃষ্টান পাদ্রী সংবাদপত্রসমূহের মাধ্যমে স্বামীজীকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করেন। কেশবচন্দ্র কিন্তু কলিকাতার সম্ভ্রান্ত মহলে রামকৃষ্ণদেবের কার্যকলাপ বিশেষভাবে প্রচার করেন। যখন খৃষ্টান মিশনারিগণ সুবিখ্যাত মহিলা পণ্ডিত রমাবাইকে স্বামী বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে প্ররোচিত করেন, রবীন্দ্রনাথই "ভারতী"তে স্বামী বিবেকানন্দের সমর্থকরূপে দণ্ডায়মান হন। স্বামী বিবেকানন্দের সহিত ঠাকুর পরিবারের এবং রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধ অতিশয় সহজ ও সরল ছিল। তাই আমরা দেখিতে পাই যে স্বামী বিবেকানন্দের লোকান্তরের অব্যবহিত পরেই দক্ষিণ কলিকাতার "এক্সেলসিওর" হলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত স্মৃতিসভায় রবীন্দ্রনাথই সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বন্ধুবর শ্রীসৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায় হইতে ভগিনী নিবেদিতার এই শোক সভায় ইংরেজী ভাষণের কথা আমরা বিশেষভাবে জানিতে পারিয়াছি। তখনকার সুপ্রসিদ্ধ "বেঙ্গলী" পত্রিকায় এই সভার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আমেরিকায় বিবেকানন্দের সাফল্যে বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়া বিবেকানন্দের পরিজনকে তাঁহার অকুণ্ঠ প্রশংসা জ্ঞাপন করেন। বিবেকানন্দের মাতুল কৈলাশচন্দ্র বসু "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়" নিয়মিতভাবে লিখিতেন। "তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা" তখন ৩ নম্বর সৌরমোহন মুখার্জি লেনে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং পাড়ার ভদ্র মহিলারা সেখানে পাঠাভ্যাস করিতেন। যখনই সন্নিহিত কলেজসমূহ হইতে খৃষ্টান মিশনারিগণ "ত্রি-তত্ত্ব" নিয়া বিরোধে প্রবৃত্ত হইতেন তখনই কৈলাশবাবু বেদান্তের পক্ষ সমর্থন করিতেন। ব্রাহ্ম সমাজে চিরঞ্জীব শর্মা (ত্রৈলোক্য সান্যাল) ও বিবেকানন্দ ভক্তিমূলক গান গাইতেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রায়ই বিবেকানন্দের গান শুনিতে সেখানে যাইতেন। শ্রীঅরবিন্দের মাতামহ ঋষি রাজনারায়ণ বসুর কন্যা "সঞ্জীবনী" সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্রের সহিত বিবাহকালে রবীন্দ্রনাথের

নেতৃত্বে সমবেত সঙ্গীতকালে বিবেকানন্দও উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দ-রচিত কতিপয় ধ্রুপদ সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথের চৌতালি ধ্রুপদের কথা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয়। সুতরাং কেবল দর্শন এবং জনহিতে নহে ধর্ম সঙ্গীতেও তাঁহারা একই পথের পথিক ছিলেন। দুজনেই একান্তভাবে বিশ্বাস করিতেন যে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য উভয়েই একে অন্যের পরিপূরক। একটিকে বাদ দিয়া অন্যটি টিকিয়া থাকিতে পারে না। স্বামী বিবেকানন্দের দিব্য দৃষ্টি দ্বারা আলোকিত "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" প্রবন্ধে আমরা ইহাই দেখিতে পাই। জেনারেল এসেম্ব্লীর কলেজে আচার্য ব্রজেন্দ্র নাথ শীল মহাশয় বিবেকানন্দের সহপাঠি ছিলেন।

৫　　আচার্য-শীলের "পতঞ্জল" যোগসূত্রের ভাষ্য শুনিবার পর আমরা বিবেকানন্দের নিকট হইতে চারিটি অনুপম গ্রন্থ পাই "রাজযোগ", "কর্মযোগ" "জ্ঞানযোগ" এবং "ভক্তিযোগ"। আমেরিকা স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে ভারতের প্রকৃত "যোগী" আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয়। সুবিখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহাকে উচ্চতর অধ্যাপকের পদ দেওয়া হয়, কিন্তু তিনি উহা প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক অধ্যাপক উইলিয়াম জেমস্ "বিবিধ ধর্মির অভিজ্ঞতা" (The Varieties of Religious Experience)" পুস্তকে স্বামীজীর বিশেষ প্রশংসা করেন। স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের পর আমেরিকায় প্রকাশিত স্বামিজীর সম্বন্ধে বিবিধ পত্রিকা ও পুস্তক পাঠেই পাশ্চাত্য জনসাধারণের উপর স্বামিজীর প্রভাব কত সুদূর প্রসারী ছিল জানিতে পারি। মনীষী টলষ্টয়ের ডায়েরী পাঠে জানা যায় যে চিকাগো মহাসভার অধিবেশনের পরে তিনি "রাজযোগের" একটি আমেরিকায় মুদ্রিত সংস্করণ পান।

যদিও স্বামিজী ১৯০২ সনে উনচল্লিশ বৎসর বয়সে কালগ্রাসে পতিত হন তথাপি তিনিই মুখ্য এবং গৌণভাবে বেদান্ত ও বৌদ্ধ ধর্মের সত্য, যোগ ও হিন্দুর বিবিধ দর্শন ধারার সহিত পাশ্চাত্যের দর্শন ধারার মৈত্রী সাধন করিতে বিশেষভাবে সহায়তা করেনও আপাত বিরুদ্ধভাব দূর করিয়া সংহতি সাধনে বিশেষ সফলকাম হন।

হরিসাধন দাশগুপ্ত

উদাত্ত আহ্বান

আমি এই কাল সমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা! কই আমার মা? কোথায় কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি! এ ঘোর কাল-সমুদ্রে কোথায় তুমি? সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল—দিগ্‌মণ্ডলে প্রভাতার্কবিম্বসদৃশ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল—স্নিগ্ধনন্দ পবন বহিল—সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে, দূরপ্রান্তে দেখিলাম—সুবর্ণমণ্ডিতা, এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা! জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে! এই কি মা? হাঁ এই মা। চিনিলাম, এই আমার জননী অন্নপূর্ণা—এই মৃন্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী—অনন্নরত্নভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভুজ—দশদিক—দশদিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানাশক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু বিনর্দ্দিত বীরেন্দ্র কেশরী শত্রু নিপীড়নে নিযুক্ত! এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না, কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব—দিগ্‌ভুজা, নানা প্রহরণ-প্রহারিণী, শত্রু-মর্দ্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠ-বিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বিদ্যা-বিজ্ঞান-মূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোতোমধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা!

কোথায় ফুল পাইলাম, বলিতে পারিনা—কিন্তু সেই প্রতিমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম—ডাকিলাম, "সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে, শিবে, আমার সর্ব্বার্থসাধিকে! অসংখ্য সন্তানকুলপালিকে! ধর্ম্ম, অর্থ, সুখ, দুঃখদায়িকে! আমার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ কর। এই ভক্তি প্রীতি বুদ্ধি শক্তি করে লইয়া তোমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছি, তুমি এই অনন্ত-জলমণ্ডল ত্যাগ করিয়া এই বিশ্ব-বিমোহিনী মূর্ত্তি একবার জগৎসমীপে প্রকাশ কর। এসো মা! নবরাগরঞ্জিণি নববলধারিণি, নবদর্পে-দর্পিণি নবস্বপ্ন-দর্শিনি!—এসো মা, গৃহে এসো—ছয় কোটি সন্তানে একত্রে, এককালে, ষাদশ কোটি করযোড় করিয়া,

তোমায় পাদপদ্ম পূজা করিব। ছয় কোটি মুখে ডাকিব, মা প্রকৃতি অধিকে! ধাত্রি ধরিত্রি ধনধান্য-দায়িকে! নগাত্মশোভিনি নগেন্দ্রবালিকে! শরৎসুন্দরি চারুপূর্ণচন্দ্রভালিকে! ডাকিব,—সিন্ধু-সেবিতে সিন্ধু-পূজিতে সিন্ধু-মঙ্গলকারিণি! শত্রুবধে দশভুজে দশপ্রহরণধারিণি! অতন্দ্রশ্রী অনলকাল-ধারিনি! শক্তি দাও সন্তানে, অনন্তশক্তি প্রদায়িনি! তোমায় কি বলিয়া ডাকিব না? ঐ ছয়কোটি মুণ্ড ঐ পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত করিব—এই ছয় কোটি কণ্ঠে ঐ নাম করিয়া হুঙ্কার করিব,—এই ছয় কোটি দেহ তোমার জন্য পতন করিব—না পারি, এই বাদশ কোটি চক্ষে তোমার জন্য কাঁদিব। এসো মা, গৃহে এসো—যাহার ছয় কোটি সন্তান—তাঁহার ভাবনা কি?

দেখিতে দেখিতে আর দেখিলাম না—সেই অনন্ত কালসমুদ্রে এই প্রতিমা ডুবিল! অন্ধকারে সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশি ব্যাপিল, জলকল্লোলে বিশ্বসংসার পূরিল! তখন মুক্ত করে, সজল নয়নে, ডাকিতে লাগিলাম, উঠ মা, হিরণ্ময়ি বঙ্গভূমি! উঠ মা! এবার সুসন্তান হইব, সৎপথে চলিব—তোমার মুখ রাখিব। উঠ মা, দেবী দেবানুগৃহীতে—এবার আপনা ভুলিব—ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব—অধর্ম, আলস্য ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব—উঠ মা—একা রোদন করিতেছি, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল মা! উঠ উঠ, উঠ মা বঙ্গজননী!

মা উঠিলেন না। উঠিবেন না কি?

এস, ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই। এস আমরা বাদশ কোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া, ছয় কোটি মাথায় বহিয়া ঘরে আনি। এস, অন্ধকারে ভয় কি?

TO BE PREPARED FOR WAR IS ONE OF THE MOST EFFECTUAL MEANS OF PRESERVING PEACE

George Washington :
First Address to Congress.
January 8, 1790.

We have always been a peace-loving people. The idea of a large standing army, of great military establishments, of an officer caste, has always been distasteful to us. But every so often a great international crisis arises and finds us completely unready either to protect ourselves or to make our greatness felt among the other nations of the world. At such times politicians arise and shout, authors and military experts chide us for our want of foresight or planning, our lack of "preparedness". They are all merely echoing, with a great many more words, the simple truth, simply stated by George Washington more than one hundred and fifty years ago.

"To be prepared for war is one of the most effectual means of preserving peace."

ইতালীর স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রদূত স্বদেশপ্রেমিক জোসেফ ম্যাটসিনি

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ···ষোল বছরের এক তরুণ তার মায়ের সঙ্গে জেনোয়া নগরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, হঠাৎ তার নজরে পড়ল অকৃতকার্য পীডমন্টিস বিদ্রোহীরা পালাচ্ছে, ওরা পালাচ্ছে আর সেইদিকে তাকিয়ে আছেন এক ইতালীয় তরুণ, তাঁর হৃদয়ে উঠেছে প্রশ্নের ঝড়, 'আমরা যদি ইতালীর স্বাধীনতার জন্যে প্রাণ দিই তাহলেও কি স্বাধীনতা আসবে না?'

এর উত্তরে যেন দৈববাণী হোল তরুণের অন্তরে, 'ইতালীর মানুষ প্রাণপণে চেষ্টা করলে একদিনেই জাতীয় জয়পতাকা উড়বে দুর্গের ওপর।'

ইতালীয় জাতীয়তাবাদের ঋষি জোসেফ ম্যাটসিনির যেন নবজন্ম হোল সেই মুহূর্তে, সেই দিন থেকে স্বদেশের উদ্ধার সাধন হোল তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত। দিনে যখন জেগে থাকতেন, রাতে যখন নিদ্রা যেতেন—সব সময়েই তাঁর মনশ্চক্ষে ভাসত সেই বিদ্রোহীদের মূর্তি, ওরা যেন তাঁকে তিরস্কার করত, স্মরণ করিয়ে দিত তাঁর বিরাট কর্তব্যের কথা, এক বিপুল উন্মাদিনী উত্তেজনায় তাঁর অন্তর নেচে উঠত।

ছোটবেলাতেই মা বাবার কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন সাম্য আর সাধারণতন্ত্র প্রণালীর উপাসনার দীক্ষা। তাঁর চিত্তের স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল সাম্য ও স্বাধীনতার দিকে। তরুণ বয়সেই তিনি দেশের চিন্তায় বিষণ্ণ ও গম্ভীর। তাঁর স্বদেশ—তাঁর প্রাণের ইতালী পরাধীন—এই শোকে তিনি কালো পোষাক পরিধান করলেন।

ইতালী তখন একটা খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত দেশ—অনেক রাজ্য—অনেক রাজা। নেপোলিয়ন ইতালী জয় করে এক শাসনে এনেছিলেন অল্পকালের জন্যে। তাঁর পতনের পর ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েনা বৈঠকে ইতালীকে আগের মত আবার ভেঙে খণ্ড বিখণ্ড করা হোল। এইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজারা প্রজাদের ওপর চালালেন নিষ্করুণ নিপীড়ন। কিন্তু অন্যদিকে ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা—সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণী মানুষের মনে এনেছে নতুন চেতনা, ইতালীর যুবকরা স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ ইতালীর স্বপ্ন দেখছে। ইতালীর সর্বত্র গড়ে উঠছে গুপ্তসমিতি।

এমনই এক গুপ্ত সম্প্রদায় কারোবোরিজম-এর মন্ত্রে দীক্ষিত হলেন ম্যাটসিনি। কিছুদিন পরে পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন, বহু অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে। যদিও কিছুই প্রমাণ করা গেল না তবুও তাঁকে এক দুর্গের মধ্যে বন্দী করে রাখা হোল। নির্জন নিস্তব্ধ দুর্গ—সম্মুখে অন্তহীন নীল আকাশ আর কখনো দু'একটা পাখীর ডাক—ম্যাটসিনির মনে ভেসে উঠল একটা নতুন সমাজ স্থাপনের সংকল্প—ইয়ং ইতালী—নব্য ইতালী। দেশের কাজ করবে দেশের লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ—তাদের একমাত্র বল হচ্ছে আপন শক্তির ওপর অটল বিশ্বাস আর অবিচলিত ইচ্ছা। 'নব্য ইতালী'র লক্ষ্য হবে একতা ও সাধারণতন্ত্র—কারাকক্ষের নিভৃতে এক মহামন্ত্র উচ্চারণ করলেন ম্যাটসিনি। ইতালীকে উদ্ধার করতে হলে শুধু রাজনৈতিক বিপ্লব যথেষ্ট নয়—সেই সঙ্গে চাই সাধারণ মানুষের নৈতিক উন্নতি।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কারামুক্ত হলেন। তিনি চললেন দেশান্তরে। এবার বিদেশ থেকেই চেষ্টা চলল স্বদেশ উদ্ধারের। বার বার ব্যর্থ হলেন তিনি কিন্তু লাভ করলেন তাঁরই মত সুদৃঢ় সংকল্পবদ্ধ অন্তরঙ্গ কর্মীর দল। সার্ডিনিয়ার সম্রাট চার্লস অ্যালবার্টকে লেখা তাঁর পত্রের ভাষা ইতালীর যুবকদের হৃদয়ে অভূতপূর্ব উত্তেজনা এনে দিল:

ইতালীয়েরা অসংখ্য বিপদপাতের পর—বহুদিনের পরীক্ষার পর—এই সত্য জানতে পেরেছেন যে—তাঁদের সমস্ত আশা ও সমস্ত ভরসা তাঁদের নিজেদের ওপর ও ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করছে।

তাঁর অবিচলিত বিশ্বাস ছিল যে—আত্ম-নির্ভরশীল না হলে কোন জাতি স্বাধীন হতে পারে না—পারে না স্বাধীনতা রক্ষা করতে। এজন্যে চাই আত্মবলিদান—অবিচ্ছিন্ন নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ। ১৮২০-২১ ও ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের জাতীয় অভ্যুত্থান দুইটির পতন থেকেই তিনি ভাবী সফলতার মন্ত্র খুঁজে পেলেন। প্রতিষ্ঠিত হোল—'গিওভানে ইতালীয়া' বা 'তরুণ ইতালী'। এর মূলমন্ত্র হোল—সাম্য, স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা, ঐক্য এবং পরোপকারব্রতিতা। এর লক্ষ্য—ইতালীতে প্রজাতন্ত্র স্থাপন।

নির্জন দুর্গের মধ্যে কারারুদ্ধ অবস্থায় জোসেফ ম্যাটসিনি

বাহ্য বিপ্লবের পূর্বে প্রয়োজন অন্তর্বিপ্লবের। লেখনী ধারণ করলেন ম্যাটসিনি। দেশের মানুষ অনুপ্রাণিত হয়ে উঠল। তাঁর পত্রিকা 'নব্য ইতালী' রাজরোষে পড়ল। পত্রিকা বন্ধ করার জন্যে প্রভূত চেষ্টা চলল কিন্তু সব ষড়যন্ত্র, কৌশল, নির্যাতন অতিক্রম করে পত্রিকা প্রকাশিত হতে লাগল।

ম্যাটসিনি এরপর তিরিশ বছর জীবিত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে বিশ বছর তিনি একটি ছোট্ট বাড়ির মধ্যে স্বেচ্ছা-কারাবাসে সংরুদ্ধ হয়েছিলেন। ফরাসী সরকার তাঁকে খুঁজতে লাগল। একবার ধরা পড়েও তিনি পালিয়ে গেলেন। মার্সেলিসই তার কর্মক্ষেত্র রইল।

ক্রমে পরিশ্রমের ফল ফলল। ইতালীর প্রতিটি অঞ্চলে যুবকদের দ্বারা বৈপ্লবিক ঐক্য বীজ-স্বরূপ গৃহীত হোল। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ···উত্তর-ইতালীতে সুরু হোল বিদ্রোহ। ম্যাটসিনি রোমে চলে এলেন। পোপ বিতাড়িত হলেন, স্থাপিত হোল প্রজাতন্ত্র—এর কর্তা হলেন তিনজন—তাঁদের একজন হলেন ম্যাটসিনি।

কাভুর, গ্যারিবল্ডী ও ম্যাটসিনির প্রাণপণ চেষ্টায় ও কঠোর সংগ্রামের ফলে ক্রমে ইতালী একটি অখণ্ড জাতিতে পরিণত হোল, বিদেশী শাসনমুক্ত হোল। ম্যাটসিনির মহান আদর্শ ছিল ইতালীর একরাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার মূলে। তিনিই দেশবাসীর হৃদয়ে এনেছিলেন জাতীয়তা, স্বাধীনতা ও ঐক্যবোধের প্রেরণা।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ৬৭ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। বীরের মৃত্যু নেই। স্বদেশ-প্রেমিকের স্থান চির অমরতার স্বর্গে। তাঁর আদর্শ আজও বিশ্ববাসীর হৃদয়ে অম্লান।

বিশ্বের স্বাধীনতাকামী প্রত্যেক মানুষই আজ পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে ম্যাটসিনিকে স্মরণ করে। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ নায়ক নেতাজী সুভাষ ম্যাটসিনিকে তাঁর রাজনৈতিক গুরুর মর্যাদা দান করেছিলেন।

———

ম্যাটসিনির বাণী—

ব্যক্তিবিশেষের আধিপত্য বা ব্যক্তিবিশেষের রাজত্বের কাল অতীত হইয়াছে। এক্ষণে সংঘাতপূর্ণ মানবযুগ আবির্ভূত হইয়াছে। সংহত মানবের শক্তি জগতে অনিবার্য। জনসাধারণ কর্তৃক জনসাধারণের জন্যই বিপ্লব আরব্ধ ও সংসাধিত করিতে হইবে।

• • • •

মনুষ্যরা এক্ষণে আর মরুভূমি নহে। স্বাধীনতার নামে ইহা এক্ষণে বীরসিঞ্চনে পরিপূর্ণ হইয়াছে। নবযুগ ধীরে ধীরে বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়া কবিদিগের নয়ন সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে। যাহার জীবন পারিবারিক দুঃখবরণার ভারস্বরূপ হইয়াছে, সে এক্ষণে দেশের জন্য সমরে জাতীয় স্বাধীনতা-সমরে প্রাণ বিসর্জন করিতে পারিবে।

• • • •

মানবজাতির ভবিষ্যৎ অদৃষ্টের উজ্জ্বলতার উপর আমাদিগের অবিচলিত বিশ্বাস। সুতরাং কবিত্বের আবিষ্কারেও আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস। জন্মপরিগ্রহ করিয়া মানব মাত্রেই কতকগুলি কর্তব্যনিচয়ে আবদ্ধ হয় এবং সেই সকল কর্তব্যের সংসাধনে যে গুরুতর মহত্ত্ব আছে ও আত্মবিসর্জনে অলৌকিক ঔদাত্ত আছে, তাহা আমরা বিশ্বাস করি। স্বদেশ ও স্বজাতি সে ধর্মের মধ্যবিন্দু, পৃথিবী ও মানবজাতি সে ধর্মের পরিধি। স্বাধীনতা, একতা ও বিশ্বপ্রেমিকতা যে ধর্মের ব্যাপ্যার্থত্রয়—সে ধর্মে আমাদিগের অচলা ভক্তি ও দৃঢ় বিশ্বাস।

• • • •

বারংবার মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করি যে দেশীয় জনসাধারণ ব্যতীত দেশের মুক্তিসাধন আর কাহারও দ্বারা হইবে না। সেই জনসাধারণের কার্যপরতা—অপ্রান্ত কার্যপরতা এইতেই এরূপ গুরুতর ব্যাপার সংসাধিত হইবে, যেন জনসাধারণের হৃদয় ভীতিসমাকুল ও হতাশা প্রপীড়িত না হয়। সর্বপ্রকার মত সঙ্কোচ পরিত্যাগ করিবে; কারণ ইহা নীতিবিগর্হিত ও বিপদ সঙ্কুল।

• • • •

আমরা জানি যে, প্রেমই সর্বোৎকৃষ্ট মানব-ধর্ম। যেখানে দুই হৃদয় এক সঙ্কল্পে প্রণোদিত সেইখানেই দুটি আত্মা এক ধর্মে দীক্ষিত, সেইখানেই দুই আত্মা এক ধর্মে এক দীক্ষিত, সেইখানেই একদেশ, একজাতি। সমস্ত জগতের সাধু ব্যক্তিদিগকে এক সমাজে আবদ্ধ করার বর্তমান সময়ে যে অভ্যুদার চেষ্টা, তাহার আনুকূল্য সাধন বিষয়ে আমরা বিন্দুমাত্র ও ত্রুটী করিব না।

নব্য ইতালী সমাজ এ সমস্ত বিষয়ই অবগত আছেন। তাঁহারা আপনাদিগের সাধনার মহত্ত্ব অনুভব করিতেছেন এবং তৎসদ্ধি বিষয়েও কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। বিগত দশ বৎসরের মধ্যে যে অসংখ্য ইতালীয় স্বদেশের উদ্ধার সাধন ব্রতে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের পবিত্র নামে শপথ করিয়া আমরা বলিতেছি যে নির্যাতনে আমাদিগের বিশ্বাস পরাজিত না হইয়া বরং দৃঢ়ীভূত হইয়াছে।

যে মহাত্মাগণ স্বদেশ-উদ্ধার যজ্ঞে জীবন বলি প্রদান করিয়াছেন সেই মহাত্মাদিগের রুধিরের অভ্যন্তরে একটি সমগ্র ধর্ম নিহিত রহিয়াছে। যে স্বাধীনতা বীজ বীরপুরুষদিগের রুধিরে অভিসিঞ্চিত, কোন শক্তিই তাহাকে অঙ্কুরে দলিত করিতে সমর্থ নহে। আমাদিগের অন্তরের ধর্ম স্বদেশ উদ্ধার-ব্রতানলে জীবন আহুতি প্রদান, আমাদের কর্মাকার ধর্ম হইবে—জাতীয় বিপ্লবের উদ্বোধন করা।

সঙ্গীত আসর

বিদ্রোহী কবি মুকুন্দদাস

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বিপ্লবী কবি মুকুন্দদাস স্বদেশীযুগে সারা বাংলা দেশকে দেশপ্রেমের বন্যায় প্লাবিত করেছিলেন এবং দেশবাসীর মনে এক উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি স্বাধীনতার ইতিহাসে স্বর্ণ অক্ষরে লিখিত থাকবে। দেশের এই সংকট মুহূর্তে এই অমর কবির একটি প্রসিদ্ধ জাতীয় সংগীতের স্বরলিপি নিয়ে প্রকাশিত হলো।

বাণ এসেছে মরা গাঙ্গে খুলতে হবে নাও
তোমরা এখনো ঘুমাও।
কত যুগ কেটে গেছে দেখেছ কত স্বপন
এবার বদর বলে ধর বৈঠা জীবন মরণ।
দমকা হাওয়ার কাল গিয়েছে ফাগুন বইছে
পাল খাটাও।
অবহেলে থাকলে বসে কাঁদতে হবে সারাজীবন।
যুগ-যুগান্তরের তপস্যাতে মিলেছে এখন লগন
পারের মাঝি হাল ধরেছেন মিছে পরের মুখ তাকাও।

গা -া গা | গা মা মপা I রা সা -া | সন্া ধা -া I ধ্া সা সা | রা রা গা I			
বা ন্ এ | সে ছে ০০ ম য়া ০ | গা ০ দে ০ ধু ন্ তে | হ বে ০			
রসা -া -া | -া -া -া I ধা সা সা | সা সা রা I গা রসা -া | -া -া -া I			
না ০ ০ ০ | ০ ০ ও তো ম রা | এ ব নো ঘু মা ০ ০ | ০ ০ ও			
১´ | ০ ১´			
মা মা -া | মা -া মা I মা মা মপা |			
ক ত ০ | যু ০ গ কে টে ০০ |			

০　　১´　　০　　১´　　০
পা পা -া I পা -া পা | পা পা ধা মা পা -া | -া পা পা I
সে ছে ০ সে খ্ ছ | ক ত ০ খ প ন্ | ০ এ বার

১´　　০　　১´　　০　　১´　　০
ধর্সা র্সা -া | র্সা র্সা -া I না না র্সনা | ধা পা -া I ধা ধপা -া | মা গা -া |
ব০ ধ ন্ ব সে ০ খ ন ০০ বৈ ঠা ০ খা ব০ ০ | ন ম ০ |

১　　০
ধসা -া -া | -া -া -া II
ব০ ০ ০ | ০ ০ প

১´　　০　　১´　　০　　১´　　০
গা মা পা | রা সা -া I সা -া সা | না ধা -া I ধা সা -া | সা সা রা I
ন ম কা | হাও য়া ন্ কা ন্ পি | য়ে ছে ০ কা ন্ ন্ | ব ই ছে

১´　　০　　১´　　০　　১´　　০
গা পা মা | গা -া -া I মা মা -া | মা মা -া | মা পা পা | পা পা -া I
পা ন্ ধা | টা ০ ও অ ব ০ | হে লে ০ ধা ক্ সে | ব সে ০

১´　　০　　০　　০
দা -া দা | দা দা -া I পা পা দা | পা -া -া I
কা ন ভে | হ বে ০ সা রা জী | ব ০ ন্

১´　　০　　১´　　০　　১´　　০
পা -া ধা | ধর্সা র্সা -া I র্সা র্সা -া | র্সা র্সা -া I র্সা র্সা র্রা | র্রা -া র্রা I
ন্ গ ন্ | সাও ন্তে ন্ ত প ০ | স্যা তে ০ মি লে ০ | ছে ০ এ

১´　　০
র্সা র্গা র্রা | র্সা -া -া I
খ ন্ দ | গ ০ ন্

১´　　০　　১´　　০　　১´　　০
পা ধা র্সা | র্সা র্সা -া I র্সা -া -া | র্সা -া র্রা I ধর্সা -া -া | -া পা ধা I
পা য়ে ন্ | মা ঝি ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০০ ০ ০ | ০ ও য়ে

১´　　০　　১´　　০　　১´　　০　　১´
ধা ধা র্সা | র্সা র্সা -া I র্রা -া র্সা | না ধা না | ধা -া -া | ধা -া না I পধা পা -া |
পা য়ে য় | মা ঝি ০ হা ন্ ব | য়ে ছে ০ | ০ ০ ০ | ০ ০০ ০০০০ |

০　　১´　　০　　১´　　০
-া -া -া I ধা ধা না | ধা পা -া I মা পা মা | গা -া মা II II
০ ০ ০ ঝি ছে ০ | প য়ে য় ন্ খ তা | কা ০ ও

অন্তরীক্ষে

ভাবনেই চন্দ্র চক্রবর্তী

……কিন্তু পালিয়ে যাবো কোথায় ?

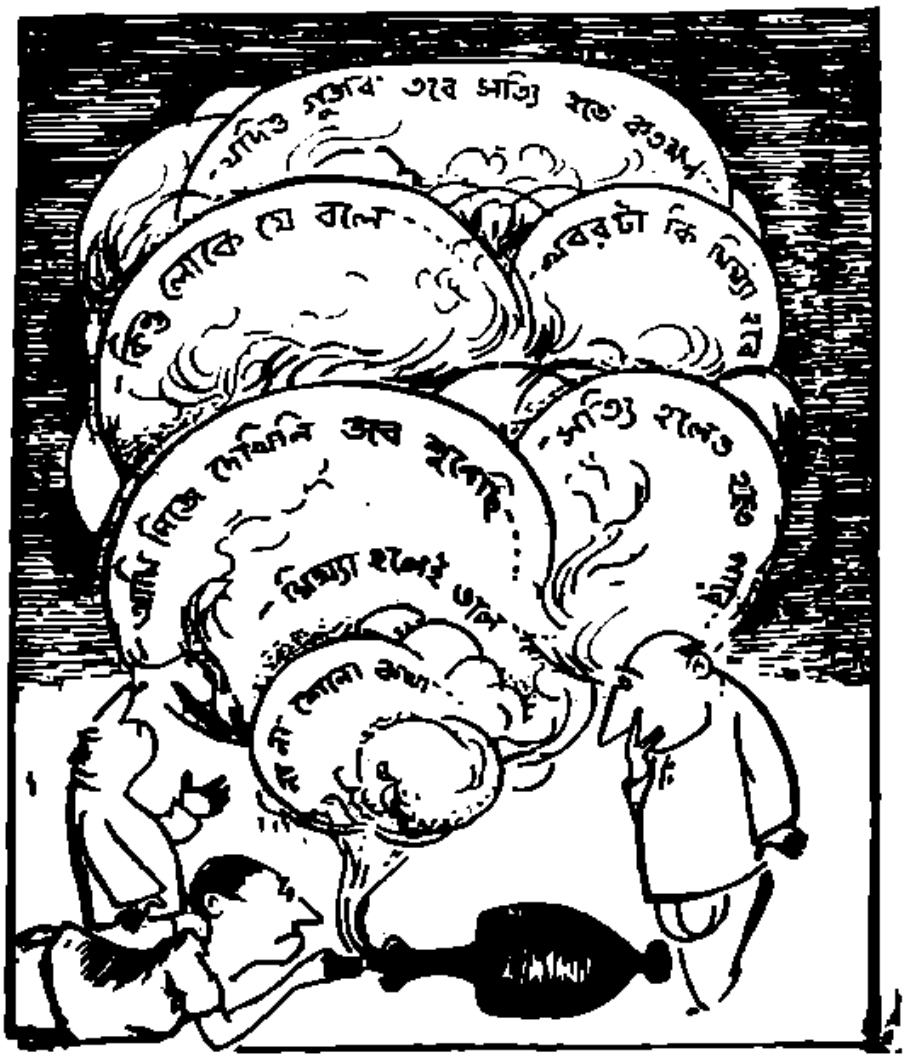
যদিও গুরুর তবে সত্যি মত কতখন...
কি লোকে যে বলে...
এবারটা কি মিথ্যা বল
আমি লিখে দেখিনি তবু শুনেছি...
মিথ্যা হলেই ভাল
সত্যি হলেও ক্ষতি
না শোনা কথা

গুরুর বন্ধ করুন

……না, না, আমি লিখিনা
আমার লেখায়।

স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ আইন

হুজুর একি হল ? — নিরীহ গরীব বেচারী মারা গেল !

অথচ বাঘের লক্ষ্য করে……

তাইতো !

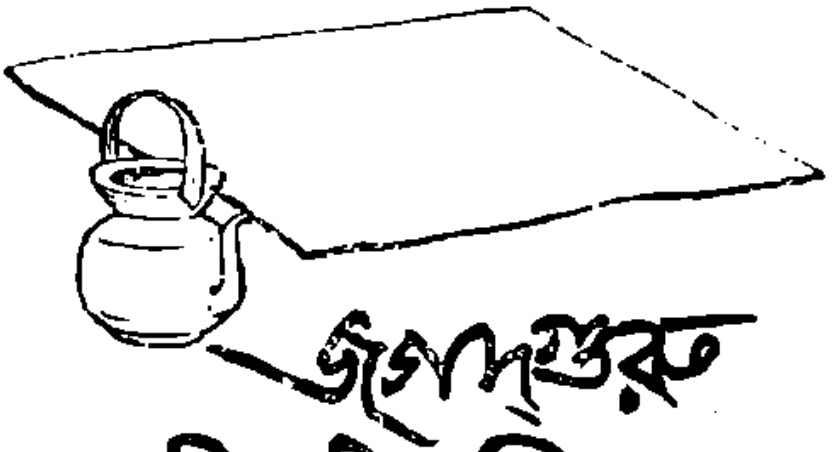

জগদ্গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ

জীবন কাহিনী ॥

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

১০

ব্রাহ্মধর্মের প্রচারে বিজয় কাশী এসেছে। উঠেছে কেদারঘাটে ডাক্তার লোকনাথ মৈত্রের বাসায়।

'আমাকে একটি নির্জন ঘর দিতে পারবেন?' জিগগেস করল বিজয়।

লোকনাথ সবিস্ময়ে তাকাল মুখের দিকে।

'কখন কোথায় যাই কখন কিরি কিছু ঠিক নেই, তাই কাউকে বিরক্ত না করে একটা আলাদা ঘর যদি নিজের এক্তিয়ারে পাই তো এখানে থাকি। নচেৎ অন্যত্র জায়গা দেখতে হবে।'

নির্জনে সাধনা করবার জন্যে নয়, টো-টো করে ঘুরে যখন খুশি এসে বিশ্রাম করবার জন্যে।

লোকনাথ বললে, 'যা, পাবে বৈকি ঘর।'

টো-টো করেই ঘুরছে বিজয়। ঘুরছে মানে তৈলঙ্গস্বামীর সঙ্গ করছে।

দুপুর ঘরে গিয়েছে তবু বিজয়ের বাড়ি ফেরবার নাম নেই। ইশারা করে জিগগেস করছেন, 'কি রে, খিদে পেয়েছে?'

'পেয়েছে বৈকি।'

তৈলঙ্গস্বামী কাকে কী ইশারা করলেন, রাশি রাশি খাবার এসে পৌঁছুল।

'এত কি খাওয়া যায়?' আপত্তি করল বিজয়। প্রশ্ন করল, 'আপনি খাবেন?'

'দাও।' হাঁ করলেন তৈলঙ্গ।

হত খাবার মুখে গোরে তত নিঃশেষ করে নিলেবে। বিজয় দেখল মহাবিপদ, তার জন্যে কিছুই থাকবে না। তাই সে কিছু খাবার বুদ্ধি করে সরিয়ে রাখল নিজের জন্যে।

খাবার যখন শেষ তখন তৈলঙ্গ ইঙ্গিতে জিগগেস করলেন: 'তোমার? তোমার কী হবে?'

বিজয় বললে, 'আমার ভাগটা আগেই সরিয়ে রেখেছি।'

হেসে উঠলেন তৈলঙ্গ। মাটিতে লিখলেন কাঠি দিয়ে: 'বাচ্চা সাচ্চা হ্যায়।'

নির্জন কালীমন্দিরে ঢুকেছেন। হঠাৎ প্রস্রাব করে কালীর গায়ে ছিটিয়ে দিলেন।

'এ কী?' চমকে উঠল বিজয়।

তৈলঙ্গ মাটীতে লিখলেন: 'গঙ্গোদকং।'

'তা কালীর গায়ে ছিটিয়ে দেবার মানে কী?' বিরক্ত হল বিজয়।

'পূজা।'

'এ আবার কোন ধরনের পূজা! এর দক্ষিণা কী?'

'যমালয়।'

'যমালয়?'

'হ্যাঁ, দক্ষিণে যমালয়।'

মন্দিরে লোকজন আসতেই বিজয় নালিশ করল: 'উনি প্রস্রাব করে কালীর গায়ে ছিটিয়ে দিয়েছেন। আর বলছেন, গঙ্গোদকং।'

আশ্চর্য কেউ রুষ্ট হলনা। বরং বললে ভক্তি গদগদ স্বরে, 'অমন করে বলতে নেই। উনি তো সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর। ওঁর প্রস্রাব গঙ্গাজল ছাড়া আর কী।'

একদিন হঠাৎ মৌনভঙ্গ করে বললেন তৈলঙ্গ। বললেন, 'স্নান করে আয়।'

'কেন, স্নান করব কেন?'

প্রায় জোর করে ধরে স্নান করালেন বিজয়কে। বললেন, 'তোকে দীক্ষা দেব।'

'আমি ব্রহ্মজ্ঞানী, আমি গুরুবাদ মানিনা। বললে বিজয়। 'আর আপনি তো সাকার উপাসক। গঙ্গাজল শিবের মাথায় চড়ান—'

খুশি হলেন তৈলঙ্গ। বললেন, 'বাচ্চা সাচ্চা হ্যায়।' পরে গম্ভীর হলেন: 'শোন, তোকে দীক্ষা দেবার আমার অন্য কারণ আছে—এ পুরোপুরি দীক্ষা নয়। সে পূর্ণ দীক্ষা পরে হবে, পরে সে গুরুর সাক্ষাৎ পাবি। গুরুগ্রহণ না করলে শরীর শুদ্ধ হয় না—আমি শুধু তোর শরীরশুদ্ধির গুরু হব। আমার উপর ভগবানের যে আদেশ হয়েছে তা আমাকে পালন করতে হবে।'

বিজয়কে মন্ত্র দিলেন তৈলঙ্গ।

শিশু যেন গর্ভস্থ সন্তান। বলছেন গোস্বামী প্রভু। মা যা কিছু খায় তারই একটু-একটু রস নাড়ীর মধ্য দিয়ে সন্তান গ্রহণ করে। তাতেই গর্ভস্থ শিশু পুষ্ট হয়। তেমনি গুরু যা কিছু লাভ করে তাই প্রয়োজনমত শিষ্যে সঞ্চারিত হয়। গুরুর উন্নতিতে শিষ্যেরও উন্নতি। যার গর্ভে জন্মে ভালো গুরুরা পেলে সন্তান ভালো হবে না কেন? সকলেরই যে এক মা হবে এমন কোনো কথা নয়। ভিন্ন ভিন্ন মার গর্ভে ভিন্ন ভিন্ন সন্তান জন্মে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকুক এই সৃষ্টি কর্তার ইচ্ছে। তাই সকল মায়ের প্রতিই শ্রদ্ধাভক্তি রেখো। সাম্প্রদায়িক হয়ো না।

'গুরুতে যতদিন নির্বিচল নিষ্ঠা না আসে ততদিন অন্য সাধুর সঙ্গ করা চলে?' জিগগেস করল কুলদা।

'অন্য কোথায়? সব সেই এক গুরুশক্তি।' বললেন গোস্বামীপ্রভু, 'অন্য ভেবে কেন অন্যের সঙ্গ করবে? জানবে সমস্ত বিশ্বে এক গুরুশক্তিই পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। রক্তাধারের রক্তই সমস্ত দেহে সঞ্চালিত। শরীরে যত রক্ত সব সেই রক্তাধারের। শোনো, সঙ্কীর্ণ ভাব কিছু নয়। সঙ্কীর্ণ ভাবেই মহতী বিনষ্টি।'

'গুরুতে একনিষ্ঠতাও কি সঙ্কীর্ণ ভাব নয়?'

'না, তাকে সঙ্কীর্ণ ভাব বলেনা। যে রক্তাধারকে চেনে সে ঠিকই জানে সর্বত্র সেই এক রক্ত, এক বস্তু।'

'ভারত-আশ্রমে' টিঁকতে পারল না বিজয়, চলে এল বাগ-আঁচড়ায়। এই গ্রাম্য পরিবেশই ভালো, এই ভাঙন নির্জনতা। এই শান্তিই যেন একটি তন্ময়ী প্রার্থনা। কী দরকার দলে, কোলাহলে? এই নিঃসঙ্গতাই সর্বপূর্বকারক।

একদিন নির্জনে বসে প্রার্থনা করছে বিজয়, হঠাৎ একটা জ্যোতি তার মধ্যে প্রবেশ করল, যেন দৈববাণী হল, 'তুই আর নিজেকে বদ্ধ করে রাখিসনে। গণ্ডির মধ্যে থাকলে ধর্ম হয় না।'

বিজয়ের মনপ্রাণ শীতল হল। নীল আকাশে সে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গম, খাঁচায় বন্দী হয়ে শেখানো বুলিতে সে অস্বীকৃত।

কলকাতার বন্ধুদের পছন্দ হল না এই গ্রাম্যতা। লিখে পাঠাল: 'কলকাতায় চলে এস। নির্জনে থেকে তুমি শুষ্ক হয়ে যাবে। মাতৃগন্ধ না পেলে বাঁচবে কী করে?'

'মাতৃগন্ধ' মানে কেশবের সঙ্গ। কেশবই ভক্তিরসের উৎস।

মনে মনে হাসল বিজয়। এই তো আমি বেশ আছি। শান্তিতে আছি, আছি অচ্ছিন্ন পূর্ণতায়। এরা আবার আমাকে টানে কেন? কেন আবার চায় হৃদয়ের গ্রন্থিতে গ্রন্থি দিতে?

না, বুঝি যেতে হল কলকাতায়।

সে বুঝি অন্য ভূমিকা। অন্য প্রসঙ্গ।

ব্রাহ্মবিধি ত্যাগ করে কেশব কোচবিহারের রাজার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিল। ব্রাহ্মবিধিতে বিয়ের বয়েস ছেলের পক্ষে অন্যূন আঠারো ও মেয়ের পক্ষে অন্যূন চৌদ্দ বলে ধার্য হয়েছে। কিন্তু কেশবের মেয়ের বয়েস চৌদ্দর চেয়ে কম। তাতে কী, হিন্দুশাস্ত্র মতে বিয়ে দিল কেশব।

আগুন জ্বলে উঠল। যখন ব্রাহ্মবিবাহ আইন পাশ হয় তখন কেশব বলেছিল বেদীতে বসে, 'এ বিধি শুধু রাজবিধি নয়, এ ঈশ্বরবিধি, এ আইন ঈশ্বরের আদেশেই প্রবর্তিত হয়েছে।' কিন্তু নিজের মেয়ের বিয়ের বেলায় এ বিধি খাটল না। সবচেয়ে আশ্চর্য, এ বিধি লঙ্ঘনকেও সে ঈশ্বরেরই আদিষ্ট কার্য বলে প্রচার করল। যত অসন্তোষ-আন্দোলন এরই জন্যে।

বিজয় স্থির থাকতে পারল না। নিজে নিয়ম করে নিজেই তা আবার অমান্য করবে! এ কী স্বার্থান্ধতা! তীব্র প্রতিবাদ করে পাঠাল বিজয়। কেশবের অনুগত লোকেরা পাল্টা আক্রমণ করল বিজয়কে। তুমুল গোলমাল সুরু হয়ে গেল।

যোগমায়ার কাছে পত্র এল কলকাতা থেকে: 'তোমার স্বামীকে সাবধান করো যেন কেশবের বিরুদ্ধাচরণ না করে। করলে বিপদ আছে।'

চিঠি রেখে হেসে উঠল বিজয়। এরা কি পাগল? এদের হাতেই কি ঈশ্বরের কর্তৃত্বের ভার? কেশব কি আমার সৃষ্টিকর্তা না পালনকর্তা? আমি কি কেশবকে দেখে ব্রাহ্মসমাজে এসেছি? যে যাই বলুক সত্যের অবমাননা আমি কিছুতেই সহ্য করব না;' আর যাই হোক, লোক মুখাপেক্ষিতা আমার নয়।

এ বিরোধের ফলে দুই দলে ভাগ হয়ে গেল ব্রাহ্মসমাজ। কেশবকে যারা আঁকড়ে রইল তাদের দল 'নববিধান' আর কেশবকে যারা ত্যাগ করল, শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু আর দুর্গামোহন দাস, তারা গড়ল 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ'। এই সম্পর্কে বিরাট সভা হল টাউন হলে। বিজয়ের অগ্রবর্তিতায় স্বতন্ত্র সমাজের প্রতিষ্ঠা হল। মহর্ষি তাঁর সম্মতি দিলেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য ও প্রচারকরূপে নিযুক্ত হল বিজয়। অমিত উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়ল কাজের সমুদ্রে।

'যা সত্য বুঝব তাই নির্ভয়ে প্রতিপালন করব। লিখছে বিজয়: 'হিন্দু সমাজে আদরে ও সম্ভ্রমেই অবস্থান করছিলাম। ঈশ্বর যতই আমাকে সত্যের দিকে আকর্ষণ করতে লাগলেন ততই হিন্দু সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। মনে করলাম ব্রাহ্মসমাজ শান্তিনিকেতন, সেখানে অসত্য-অশান্তির ঠাঁই নেই। কই, সেখানে শান্তি নেই, সত্যেরও সমাদর নেই। অশান্তি ও অসত্যের প্রস্রবণকে কে আর ব্রাহ্মসমাজ বলে গণ্য করবে?

ব্রাহ্মসমাজের দুর্গতি হল কেন? কারণ ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের সম্মানের চেয়ে মানুষের সম্মান ও মানুষের প্রতি ভালোবাসাই বেশি হয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত সাধু ভক্তের কাছে মাথা নত করব কিন্তু ঈশ্বরের সিংহাসনে কাউকে বসতে দেব না। ঈশ্বরের রাজত্ব বিস্তৃত হোক। ব্রাহ্মসমাজে শান্তি-সদ্ভাব বিস্তৃত হোক।'

বিজয়ের সঙ্গে অঘোর গুপ্ত এসে হাত মেলাল। প্রগাঢ় বৈরাগ্যে প্রেরিত হয়ে দুই বন্ধু লাগল ধর্ম প্রচারে।

মেছুয়াবাজার রোড ধরে যাচ্ছে, একদিন বিজয় দেখল সামনেই এক সৌম্যোজ্জ্বল সন্ন্যাসী।

নমস্কার করল বিজয়। সাধু তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করল। সেই স্পর্শে বিজয়ের দেহ মন স্নিগ্ধ হয়ে গেল।

ব্রাহ্মসমাজের কথা উঠল। ধর্মান্দোলনের কথা। নতুন যে এক অভ্যুত্থান হবে বাংলা দেশে তারই আশ্বাসের আভাস।

একদিন আসুননা আমাদের সমাজ মন্দিরে। দেখুন না কেমন কী হচ্ছে?

বেদীতে বসে উপাসনা করছে বিজয়, একদিন দেখতে পেল, এক কোণে সেই সাধু ব'সে। একমনে শুনছে উপদেশ। মুখে বিনম্র আবিষ্টতা।

'কেমন লাগল উপাসনা?' সভা শেষে সাধুকে জিগগেস করল বিজয়।

'চমৎকার। সব তো শাস্ত্রের কথা।' বললে সাধু।

'শাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, তাকে অতিক্রম না করে বলাই তো ভালো।'

'ঠিক। শাস্ত্রের মর্যাদাই কখনো লঙ্ঘন করা উচিত নয়।' সমর্থন করল সাধু।

'কিন্তু সাধুজী, শাস্ত্রীয় জ্ঞানে কিছু হচ্ছে না, যাচ্ছে না প্রাণের অশান্তি।' বিজয়ের স্বরে বুঝি

কাতরতা ফুটে উঠল : 'এই অভাব এই শূন্যতা কী করে যাবে? কবে, কোথায় পাব সেই স্থির নিরাপদ ভূমি?'

সাধু কিছুক্ষণ চুপ করে কী ভাবল। জিগগেস করল, 'তোমার গুরু হয়েছে?'

'আমি গুরুবাদ মানিনা।' বিজয় বললে গম্ভীর হয়ে।

সাধু হাসল। 'তুমি এত শাস্ত্র জান আর এই সার কথাটাই শেখনি করনি। যে অশৌক্ষিত তার সমস্ত পণ্ডশ্রম। কর্ণধার ছাড়া সংসারসাগর পার হবে কী করে?'

'তা হলে আপনিই আমার গুরু হোন।' বিজয় ব্যাকুল স্বরে বললে, 'আপনিই আমাকে দীক্ষা দিন।'

'না, না, আমি তোমার গুরু হব না। তোমার গুরু আসছেন। কাল পরিপক্ক হলেই তিনি উপস্থিত হবেন।' উদার আশ্বাসে বললে সাধু, 'দীক্ষা দিয়ে তোমাকে পূর্ণ করবেন।'

'কাল পরিপক্ক হবে কবে?'

'যখন অন্তরে দৈন্য আসবে। অহঙ্কার ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।'

'ধূলিসাৎ হয়ে যাবে?'

'হ্যাঁ, সকলের পদধূলি নিতে-নিতেই ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।' সাধু বললে, 'বিচলিত হয়ো না। প্রতীক্ষা করো।'

'ধৈর্যই ধর্ম, ধৈর্যই মানুষের মনুষ্যত্ব।' বলছেন গোস্বামী প্রভু, 'চঞ্চলতাই অশান্তি। সকল বিষয়ে ধৈর্য অবলম্বন করাই সাধন। আপন সর্ব অবস্থাতেই উত্তত, তেমনি যে ধার্মিক যে সর্ব অবস্থাতেই ধীর, নম্র, সমবুদ্ধি। বিপদে সম্পদে, নিন্দায় প্রশংসায়, দুই অবস্থাতেই পরীক্ষা হয় মানুষের সত্যি ধর্মলাভ হয়েছে কিনা। যদি দুই অবস্থাতেই সে অচঞ্চল থাকতে পারে, তার বিনয় ও সমতার ভাবান্তর না হয় তা হলেই বুঝবে তার ধর্মলাভ হয়েছে।' আবার বলছেন, 'ধর্ম কি অমনি সহজ জিনিস? অভিমানশূন্য হতে হবে। গাছের যেমন বীজ না পচলে অঙ্কুর বার হয় না তেমনি মানুষের অভিমানটি একেবারে বিনষ্ট না হলে ধর্মের অঙ্কুর গজায় না। অভিমান যতকাল আছে ততকাল ধর্মের নাম গন্ধও নেই। আসল কথা, জীয়ন্তে মৃত হতে হবে।'

কিন্তু কোথায় সদ্‌গুরু?

দেশে বিদেশে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করছে বিজয়, কিন্তু সব সময়ে উদগ্রীব হয়ে রয়েছে কোথায় সেই ভবার্ণবের নাবিক?

প্রথমে কর্তাভজাদের দলে গিয়ে ভিড়ল। ওদের গুরুপতি অগচ্ছন্দ্র গুপ্তের কাছে দীক্ষা নিল। ওদের করবার মধ্যে এক কর্ম, তা হচ্ছে প্রাণায়াম। প্রাণায়ামে তো শরীরের উন্নতি কিন্তু অন্তরবস্তু কই?

কর্তাভজাদের ছেড়ে সেল এবার অঘোরপন্থীদের আস্তানায়। এদের ছেড়ে ধরল কাপালিকদের। হীনাচারের বীভৎসতায়ই বা চিত্তের প্রসন্নতা কই? বাউল রামাইত ধরবেশ ফকির বৌদ্ধনাথ একে একে সকলের দ্বারস্থ হল, কিন্তু কোথায় সেই পারাপারের মাঝি, কোথায় বা সেই ভাসমরণ ঔষধের সন্ধান?

ঘুরতে-ঘুরতে এসেছে বিজয়। আছে সাহেবগঞ্জে। অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল বিজয়।

যেন বিরাট এক নদীর পারে বসে আছে। কত শত লোক পার হচ্ছে নৌকায়, কেউ তাকে

তাকছেনা, ফিরেও তাকছে না। হঠাৎ কে একজন এসে তাকে নৌকোয় তুলে নিয়ে এল ওপারে। ওপারে কতগুলো চেনা লোকের সঙ্গে দেখা। তারা তাকে এক বাগানে নিয়ে গেল। বিচিত্র ফুল ফুটে আছে চারপাশে। ফুলগুলো একত্র হয়ে নিমেষে স্ত্রীরূপ ধারণ করল। বললে, 'তোমার হৃদয়-নাথকে অন্বেষণ করো।'

কোথায় হৃদয়নাথ? উন্মনা হয়ে চারদিকে খুঁজছে, হঠাৎ একটা কুকুর ছুটে এসে বললে, 'এই ফল খাও।' ফল খেল বিজয়। কুকুর চলে গিয়ে এল এক জটাজুটধারী ঋষি। বললে, 'হাত ধরো।' হাত ধরতেই সে বিজয়কে নিয়ে আকাশে উঠতে লাগল, গ্রহ-তারা অতিক্রম করে, ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বলোকে। ক্রমশ নিয়ে গেল এক জ্যোতির্ময় ধামে। দেখল সেখানে আরো সব ঋষি বসে আছে। একজন জিগগেস করল, 'তুমি কে?' বিজয় বললে, 'পৃথিবীতে গঙ্গাতীরে শান্তিপুর নামে এক জনপদ আছে। সেইখানে অদ্বৈত আচার্য নামে এক সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। আমি অকিঞ্চন বিজয়কৃষ্ণ সেই কুলেই জন্মগ্রহণ করেছি।' 'এখানে এসেছ কেন?' 'ভগবানকে দেখতে।' তাঁকে দেখবার লালসায় মনপ্রাণ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।'

'বৎস ধৈর্য ধরো। স্থির। দেখবে সেই দুর্লভ দর্শনকে।' বলে ঋষিরা সমস্বরে স্তোত্র পাঠ করতে লাগল। পাঠ করতে-করতে নাচতে লাগল। ভগবান প্রকাশিত হলেন। অত শোভা সৌন্দর্য বুঝি কল্পনায়ও আনা যায় না। বিজয় মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল।

জ্ঞান পেয়ে দেখল সেই বাগানে পড়ে আছে। কাঁদতে কাঁদতে ছুটতে লাগল। কেন আমি মূর্চ্ছা গেলাম? কেন প্রভুকে দেখলাম না চোখ ভরে? কোথায় তিনি? তাঁকে না দেখে বাঁচব কী করে? কেন সেই জ্যোতির্ধামেই আমার প্রাণ গেল না? কোথায়, কোথায় আমার সেই হরিত দয়ানিধি, আমার করুণাঘন কমলনয়ন?

কে একজন বললে আকাশ থেকে: 'বৎস, স্থির হও। প্রভুর চরণ ধ্যান করো। তোমার আশা পূর্ণ হবে।'

আরো একটা স্বপ্ন দেখল বিজয়।

কোথায় ব্রাহ্মসমাজের বাৎসরিক উৎসব হচ্ছে। সাধারণ সমাজের লোকদের নিমন্ত্রণ হয়নি। বিজয় চলে যাচ্ছে, কতগুলো লোক তার পথ আটকালো। কে বললে, এ ব্রহ্মজ্ঞানী। বীরবেশী এক পণ্ডিত এগিয়ে এসে বিজয়ের একটা দাঁত ভেঙে দিল। জিগগেস করলে, 'আমাকে চেন?' 'আজ্ঞে না।' 'আমি বীর হনুমান। এখানে এসেছ কেন?' 'আমি যে ব্রহ্মজ্ঞানী।' 'ব্রহ্মজ্ঞানী তো আমিই।' হনুমান বললে, "আমি কি রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্রকে পূজো করি নাকি? আমি সেই আত্মারাম পরব্রহ্মেরই পূজো করি। দেখবে?' মুখ চিরে দেখাল হনুমান। বিজয় দেখল পঞ্জরের অস্থিতে, মাংসে, লোমের অক্ষরে ও রাম লেখা।

বিজয় প্রণাম করে বললে, 'আমায় কিছু উপদেশ দিন।' হনুমান বললে, 'চলো, তোমাকে যোগদীক্ষা দেব।' বলে বৃক্ষতলে এক কুটিরে নিয়ে গেল। বললে, 'ইচ্ছে করলে এক মুহূর্তে এই কুটিরের আকারের একটা অট্টালিকা তৈরি করতে পারি। প্রয়োজন থাকে তো বলো।' 'না, প্রয়োজন নেই।' 'তবে এই কুটিরে প্রবেশ করো, তোমার তপস্যা হবে। কুটিরে প্রবেশ করল দুজনে। হনুমান বললে, "ওঁ তৎসৎ ওঁ রামঃ" এই নাম জপ করো, এই নামের ভাব ধ্যান করো। যত সাধনের পথ আমি আবার আসব।'

অনেকদিন কেটে গেল। হনুমান এসে বললে, 'তুমি সিদ্ধ হয়েছ। তোমার শরীরের লোমকূপ দিয়ে আনন্দস্রোত বয়ে যাচ্ছে। নয়নে প্রেমাশ্রু ঝরছে। কী, আত্মা পূর্ণ হয়েছে তো?' 'হয়েছে।' 'তবে অন্য সাধনের উপদেশ নাও।' বিজয় বললে, 'অন্য সাধন আবার কী!' হনুমান বললে, ব্রহ্মে প্রবেশ। আর এরই নাম সন্ন্যাস।' বিজয় আপত্তি জানাল। বললে, 'ব্রাহ্মধর্মে সংসারত্যাগ নিষিদ্ধ। তা ছাড়া প্রচারের কাজে আমি বেরিয়েছি, দেশে ধর্মের বড় অভাব।' 'বেশ, তবে দেশে আনন্দধর্ম প্রচার করো, তাতেই ব্রহ্মের বিস্তার হবে। পরে না হয় ব্রহ্মে প্রবেশ করবে। এস এখন আমরা সংকীর্তন করি।'

সর্বশরীরে ওঁ রাম, হনুমান, বিরাট বানরদেহ ধারণ করে দুই বাহু ঊর্ধ্বে বিস্তার করে নাচতে লাগল। বললে, 'আমার বানরদেহের মূল কী জানো?' 'না।' 'আমার মুখখানা ওঁ। এই ওঁ পুরুষ, আর পুচ্ছ প্রকৃতি। এই পুচ্ছ দিয়েই রাবণের সর্বনাশ করেছি। সাধন করে ব্রহ্মে প্রবেশ করলে তুমিও পুরুষ-প্রকৃতি হয়ে যাবে।'

দেবতারা এসে কীর্তনে যোগ দিল। সহসা এক অপরূপ জ্যোতি প্রকাশিত হল কুটিরে। জ্যোতির মধ্যে লুটোতে লাগল বিজয়। হনুমান জিগগেস করল, 'কী করছ?' 'গায়ে জ্যোতি মাখছি।' 'খুব মাখো। ও ব্রহ্মজ্যোতি। খানিকটা কাপড়েও বেঁধে নাও।' বিজয় বললে, 'নিরাকারকে কী করে বাঁধব?' 'এ জড় কাপড় নয় ভক্তির কাপড়।'

কিছুকাল কীর্তনের পর দেবতারা বিদায় নিল। জ্যোতির্ময় ব্রহ্মও অন্তর্হিত হলেন। 'এখানে রোজ এরকম হয়।' বললে হনুমান, 'এতদিনে তুমি ভগবানের ছিলে তাই জানতে পারোনি।' 'আমার খুব ইচ্ছে এখানে থাকি। কিন্তু থাকবার উপায় নেই। কেশব সেন ব্রাহ্মসমাজের খুব অনিষ্ট করছে, তার প্রতিরোধে আমাকে যেতে হবে।' 'কেশব ভুল করছে। আমি যদি ব্রহ্মে প্রবেশ না করতাম তা হলে তাকে সংশোধন করে আসতাম। মহাভারত পড়েছ? কেমন নষ্ট করেছিলাম ভীমের অহঙ্কার, মনে আছে?'

'আমি তার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করব?' জিগগেস করল বিজয়।

'অসত্যের সঙ্গে সংগ্রাম করো, কিন্তু কেশবকে ভালোবাসো। শুধু প্রেম করো, প্রেম করো। প্রেম—প্রেম ছাড়া কিছু নেই।'

ঘুম ভেঙে গেল বিজয়ের।

বিন্ধ্যাচলে, হিমালয়ে, হরিদ্বারে, স্থানে অস্থানে, গুরুর সন্ধানে ফিরতে লাগল বিজয়। কবিরপন্থী, দাউদপন্থী, গোরখপন্থী, সুন্দরপন্থী সব পথে ধাওয়া করলে। সকলের মুখেই এককথা, আমরা কেউ নই, গুরু তোমার অন্যত্র ঠিক আছে, সময়ে পাবে।

কোথায় সেই গুরু? কোথায় চাতক পাখির ফটিক জল?

'স্বপ্নে দেবদর্শন যদি প্রকৃত হয়,' বলছেন গোঁসাইজি, 'বিষয়াসক্তি দূর হয়ে যায়। মনে হয় আমি ধন্য, আমি উদ্ধার পেয়ে গেছি, আমার আর ভয় নেই। যদি এমন ভাব না জাগে, জানবে স্বপ্নও অবাস্তব।

কলিতে সাক্ষাৎ দর্শন ও সিদ্ধিলাভ একই কথা। এজন্যেই স্বপ্নে দর্শন দিয়ে থাকেন।

স্বপ্নেই চরিত্রের পরীক্ষা হয়। যদি দেখ প্রলোভনে পড়েও মন স্থির আছে, বুঝবে দৃঢ়ভূমিতে এসেছো আর যদি চাঞ্চল্য জাগে, বুঝবে ভিতরের দুর্বলতা জয় করতে পারোনি। গুরু বা দেবতা সম্পর্কে

যে স্বপ্ন দেখা যায়, সন্দেহ করবেনা, তা সত্য বলে জানবে। স্বপ্নের মধ্যে যদি অসংলগ্নও কিছু মনে হয়, জানবে তারও তাৎপর্য আছে।

ভালো স্বপ্ন দেখা মহাসৌভাগ্যের বস্তু। বহুকাল সাধন ভজন করে যে অবস্থা আয়ত্ত করা কঠিন তা কখনো কখনো এক মিনিটের স্বপ্নে লাভ হয়ে যায়।

আমি যখন ডাক্তারি করতাম, তখন রোগ শক্ত দেখলে পরলোকগত দুর্গাচরণ বাঁড়ুয্যে আমাকে স্বপ্নে ওষুধ বলে দিতেন। তাতে রুগীর অব্যর্থ উপকার হত।'

তৈলঙ্গ স্বামীর কথা বলুন।

'বিশ্বাস বনমায়।' এই বলেছিল বিজয়কে। বলেছিল, তোর গুরু নির্দিষ্ট আছে, যথাকালে তার দেখা পাবি।'

দীক্ষা লাভের পর তৈলঙ্গর সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হল বিজয়ের। হাতের তেলোতে লিখে তৈলঙ্গ জিগগেস করলে, 'ইয়াদ হ্যায় ?'

কী রে, ঠিক বলিনি ? তাকাল চোখের মধ্যে।

ক্রমে ক্রমে অজগর ব্রত নিয়ে সমস্ত ছাড়ল তৈলঙ্গ। একস্থানে বসে থাকে, নড়েনা চড়েনা, কোন রকম ইঙ্গিতও করেনা। জীবন্ত শিব মনে করে সবাই তার মাথায় দুধ আর গঙ্গাজল ঢালে। হু-হাঁও করেনা। রাত চারটে থেকে বেলা বারোটা পর্যন্ত পৌষ মাসের শীতেও জল ঢালার বিরাম নেই।

দেহের ধর্ম, দেহ পচে গেল। একভাবে নির্বিকার অবস্থায় থেকে দেহ ছেড়ে দিল তৈলঙ্গ। গঙ্গায় তার জল সমাধি হলো।

[ক্রমশঃ।

প্রাণ-প্রবাহ

বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক হেরাক্লিটাস তখন যুবক শিক্ষার্থী মাত্র।

তাঁর শিক্ষকের ইচ্ছা হল এই পার্থিব সংসারের অনিত্যতা বিষয়ে তাঁকে একটু জ্ঞানদান করবেন। সেই উদ্দেশ্যে একদিন তাঁকে নিয়ে, এক নদীতীরে এলেন, বললেন—দেখ, নদী কত দ্রুত বয়ে চলেছে। একই নদীতে তুমি দুবার স্নান করতে পার না।

তৎক্ষণাৎ হেরাক্লিটাস বিনীতভাবে উত্তর করলেন, একই নদীতে আমি একবারও ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি না। কারণ নির্দিষ্ট নদীতে ঝাঁপ দেবার জন্যে মনস্থির করে যখন সত্যিই আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম, তখন—ওই এক সেকেণ্ডের সহস্র ভাগের এক ভাগ সময় পরে পূর্বের সেই নদী আর নেই।

জীবনের দুর্ধমনীয় বেগ—পরিবর্তন—তার অনিবার্য প্রবাহ ও পরিণতির চিত্র তখনই হেরাক্লিটাসের কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

॥ এক ॥

অদ্ভুত মেয়ে মতিয়া। শাড়ী সায়া জামা—সব-কিছু এনে দিলে সরমার হাতে।

সরমা দোরটা আবার বন্ধ করতে যাচ্ছিল, মতিয়া তার হাতখানা চেপে ধরলে। বললে, শোনো। আমার মা বলে আছে তোমাকে দেখবে বলে।

সরমা বললে, এই বুঝি দেখা করবার সময়? বিকেল বেলা আসতে বল্। বসে বসে গল্প করবো।

তাহলে আর হলো না। বলে রাগ করেই মতিয়া বোধহয় চলে যাচ্ছিল; তার মুখখানা দেখেই সরমা বুঝতে পেরেছিল সে-কথা। বললে, বসতে বল্ তোর মাকে। আমি আসছি।

বাথ্‌রুম থেকে বেরিয়ে সরমা দেখলে মতিয়া তখনও সেইখানে দাঁড়িয়ে।—'কি রে? এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছিস যে? চল্, আগে তোর মার সঙ্গে দেখাটা করেই আসি।'

মতিয়া কিন্তু যেতে দিলে না সরমাকে। হাতে ধরে টানতে টানতে তার ঘরের দোরের কাছে নিয়ে গিয়ে তাকে ছেড়ে দিলে। বললে, তোমার খাবার দিয়েছে। আগে খেয়ে নাও। মার সঙ্গে গল্পে বসলে এখন আর তোমার খাওয়াই হবে না।

ঘরে গিয়ে দেখে, সত্যিই তাই। প্রকাশ বসে আছে দু'জনের খাবার আয়োজন। টেবিলের ওপর থরে থরে ডিস সাজানো। সকালের খাবার।—এত কেন?

সরমা বললে, তুমি খাও। আমি তোমার চা তৈরি করে দিই।

এই বলে সে টি-পটে হাত দিতেই প্রকাশ বললে, আজ থেকে এই নিয়ম করে দিয়েছি। দু'জনে একসঙ্গে খাব।

লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিল সরমার। বললে, না, তুমি আগে খেয়ে নাও। আমি পরে যাচ্ছি।

হাত গুটিয়ে বসলো প্রকাশ।—বেশ তবে আমিও খাব না।

একসঙ্গেই পাশাপাশি বসতে হলো সরমাকে।

উনুনটনো চায়ের কাপ দুটি সোজা করতে যাচ্ছিল সরমা। প্রকাশ বললে, ও কি করছো?

—চা'টা আগে তৈরি করে নিই।

—খেয়ে নাও আগে, তারপর চা চালবে। এখন থেকে চাললে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

সরমা বুঝতে পারলে না কথাটা। বললে, এঁটো হাতে তোমায় চা তৈরি করবো?

—এঁটো কিসের? ছুরি কাঁটা রয়েছে তো! হাতে তো লাগবে না কিছু!

খুব বিপদে পড়লো সরমা। ছুরি কাঁটা দিয়ে কেমন করে খেতে হয় তাও সে জানে না। প্রকাশ দেখিয়ে দিলে। এই ভাখো, ডান হাতে নাও ছুরিটা, আর কাঁটাটা ধরো বাঁ হাত দিয়ে।

ভাজা ডিম, টোষ্ট, আলুর চপ আর পাকা কলা। ছুরি দিয়ে কেটে, কাঁটা দিয়ে তুলে মুখে পুরলে প্রকাশ। বললে, এমনি করে খাও।

ছুরি কাঁটা দু'হাত দিয়ে তুলে নিলে সরমা। একবার চেষ্টাও করলে, তারপর বিষণ্ণ ম্লান মুখখানি প্রকাশের দিকে তুলে বললে, এ-সব আমার কখনও অভ্যেস নেই।

প্রকাশ বললে, অভ্যেস করতে হবে।

—যদি না পারি?

—কেন পারবে না? এই তো আজ কেমন স্নান দিয়েছ মাথায়। কী সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে, ভাখো না একবার আশীর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে!

মাথা হেঁট করে ছুরি দিয়ে সরমা নাড়াচাড়া করতে লাগলো খাবারগুলো। মুখে দিলে না কিছুই।

—এই ভাখো, আমার খাওয়া শেষ হয়ে গেল, অথচ তুমি এখনও মুখে দিলে না।

চোখ দুটি তুলে সরমা বললে, পারছি না।

প্রকাশ বললে, অভ্যেস কর।

সরমা সেকথার জবাব দিলে না। ছুরি কাঁটা নামিয়ে রেখে পেয়ালায় চিনি দিয়ে চা চালতে লাগলো। চা চালতে চালতে বললে, তার চেয়ে বল তুমি কি খেতে ভালবাসো, কাল আমি তোমার জন্যে সেই সব রান্না করে বসে বসে তোমাকে খাওয়াব।

প্রকাশ বললে, না, তোমাকে রান্না করতে আমি দেবো না।

সরমা বললে, বেশ, আমি নিজের হাতে রান্না নাহয় করলাম না; কিন্তু রান্নাঘরে গিয়ে ওদের দিয়েও রান্না তো করাতে পারি?

—না, তাও চলবে না।

চায়ের পেয়ালাটি হাত বাড়িয়ে প্রকাশ তুলে নিলে।

প্রকাশ বোধ হয় মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছে। চা খেতে খেতে এমন-সব কথা সে বলতে লাগলো যার জবাবের ভাষা খুঁজে পেলে না সরমা।

—শুনেছি তোমার বাবা খুব বড়লোক। কলিয়ারী জমিদারী—অনেককিছু ছিল। তুমি তাঁর একটি মাত্র মেয়ে, অথচ আপ্-টু-ডেট্ করে তোমাকে মানুষ করে তুলতে পারেননি? কী করেছেন টাকাগুলো নিয়ে? এতদিন তোমার বিয়েও দেননি, বাড়ীতে বসে বসে কি করতে তুমি? সময় তোমার কাটতো কেমন করে?

সরমার বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠলো। মনে হলো যেন এখান থেকে পালিয়ে যেতে পারলে বাঁচে! ওদিকে মতিয়ার মাকে বসিয়ে রেখে এসেছে। ওদিকে না গেলেও উপায় নেই।

—তুমি কিছু মনে কোরো না বাপু, আমি যাচ্ছি। এই বলে সে হাত দিয়েই খেতে লাগলো। প্রকাশ মুচকি মুচকি হাসছে। হাসি দেখে তবু খানিকটা আশ্বস্ত হলো সরমা।

—মতিয়ার মা কি হিন্দুস্থানীতে কথা বলে, না বাংলায়?

—কেন? মতিয়ার মার কথা কেন?

সরমা নিজের থেয়ালেই চা চালতে চালতে বললে, মতিয়ার মা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

—ওরা বাঙালীটোলায় থাকে তো! বাঙালীদের সঙ্গে বাংলায় কথা বলে। কাশীতে অনেক বাঙালী আছে।

বলবে না বলবে না করেও চা খেতে খেতে সরমা বলে ফেললে, তাহলে তুমি নায়েব হতে চাইছো কেন?

—কেন চাচ্ছি? প্রকাশ হাসলো আবার। বললে, তুমি বুঝবে না। তাহ'লেও শোনো। আমাদের এই দেশে যারাই খুব বড়লোক হতে চায়—সমাজে যারা প্রতিষ্ঠা চায়, মান-সম্মান চায়, তাদের অন্তত ইণ্ডিয়ান হয়ে থাকলে চলে না। ঘরে বাইরে সব জায়গাতেই সায়েবদের মতন আদব-কায়দা চালু করতে হয়। করতে যারা পেরেছে তারাই ভাখো সুখে আছে। বাড়ী, গাড়ী, ব্যাঙ্কে অঙ্কে টাকা, বিষয়-সম্পত্তি—সবই তাদের হাতে। ইণ্ডিয়া—মানে আমাদের এই দেশ এখন স্বাধীন হয়েছে জানো তো?

সরমা বললে, জানি।

প্রকাশ বললে, কিন্তু আমাদের এই হতভাগা দেশ এখনও পর্যন্ত তার সেই প্রাচীন আচার-ব্যবহার কিছুতেই ছাড়তে পারছে না। সেই তেমনি মেটি পরে ভ্যাং ভ্যাং করে বাজনা বাজাচ্ছে আর ঠাকুর পুজো করছে। মেয়েরা সব ভাংটো হয়ে গঙ্গায় চান করছে আর কবচ মাদুলি পরছে। খেতে পরতে না পেয়ে কপাল চাপড়াচ্ছে আর দোষ দিচ্ছে গভর্ণমেণ্টের। গভর্ণমেণ্টের কি দোষ?

আরও হয়ত অনেককিছুই বলতো প্রকাশ। সরমার শুনতে ভাল লাগছিল না, তাই সে থামিয়ে দিলে। চায়ের কাপটা মুখ থেকে নামিয়ে বললে, আজ থাক্, আর একসময় শুনবো তোমার কাছ থেকে। আজ আমি মতিয়ার মাকে বসিয়ে রেখে এসেছি। আমি চললুম।

প্রকাশ তাকে বাধা দিলে না। সরমা উঠলো।

প্রকাশের কথাগুলো শুনে মাথার ভেতরটা তার কেমন যেন করতে লাগলো।

এই কি তার স্বামী নাকি? স্বামীর সঙ্গে তার ক'দিনেরই-বা পরিচয়। কিন্তু এখানে এসেই যে-প্রকাশকে সে দেখেছিল, মনে হলো এ যেন সে-প্রকাশ নয়। স্বাস্থ্যবান, সম্ভ্রান্ত প্রিয়দর্শন যুবক। আদর করে ভালবেসে কাছে টেনে নিয়ে বলেছিল, এতদিন পরে একটি মনের মত সঙ্গিনী পেলাম আমি। আমাকে তুমি ভালবাসতে পারবে তো?

শুধু তার চোখদুটি একবার তুলে আবার নামিয়ে নিয়ে নীরব সম্মতি জানিয়েছিল সরমা।

কিন্তু আজ আবার এ কী কথা বলছে সে?

সরমা তেমনি ভাবতে ভাবতেই ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো। রান্নাঘরের পাশের বারান্দায় চুপটি করে দাঁড়িয়েছিল মতিয়া।

—খুব দেরি হয়ে গেল। মাবে?

মতিয়া হাসতে হাসতে এগিয়ে এলো। হাতে ধরে তাকে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলে তার মায়ের কাছে।

এই মতিয়ার মা—রামপিয়ারী? এর ওই অত বড় মেয়ে?

সরমা অবাক হয়ে গেল মতিয়ার মার দিকে তাকিয়ে। মতিয়ার মতই বর্ণা মায়ের রং। শরীরের বাঁধন যেন আরও আঁট-সাঁট। মতিয়ার মা বলে মনে হয় না। মনে হয় সে যেন তার বড় দিদি।

প্রথমেই রামপিয়ারী গড় হয়ে একটি প্রণাম করলে।

—আহাহা ও কি করছো?

সরমা দু'পা পিছিয়ে গেল।—আমাকে প্রণাম করছো কেন? আমি তোমার মেয়ের বয়েসী।

মেয়েটা কিক্ কিক্ করে হেসে উঠলো। মতিয়া দাঁড়িয়েছিল দোরগোড়ায় ঠেস দিয়ে। রামপিয়ারী তার উল্‌কি-আঁকা বাঁহাতটা তার দিকে বাড়িয়ে বললে, আবার হাসলি? তোকে বারণ করে দিয়েছি না—বাড়ীতে যা করিস করিস, এখানে হাসবি না।

এই বলে সে সরমার দিকে তাকিয়ে বললে, বৌমার কাছে দিয়েছি একটু সহবৎ শিখবি বলে। তুমি ওকে দুম্ দুম্ করে পিটিয়ে দিও মা।

এবার সরমাও হাসলে একটুখানি। মতিয়াকে কাছে টেনে এনে বললে, খুব ভাল মেয়ে। শ্বশুরবাড়ী যায় না? বর কি করে?

হা আমার পোড়া কপাল! বলে রামপিয়ারী তার হাত দিয়ে নিজের কপালটা একবার ঠুকলে। তারপর বললে, তবে আর দুবেলা বাবা বিশ্বনাথের কাছে মাথা ঠুকছি কেন?

সরমা দাওয়ার ওপর পা ঝুলিয়ে চেপে বসলো। জিজ্ঞাসা করলে, কেন? কি হয়েছে?

রামপিয়ারী বললে, আমি কি করব বল বৌমা! ওর ভাগ্যে যা আছে তাই তো হবে।

এই বলে রামপিয়ারী যে-গল্পটি বললে সে এক অদ্ভুত গল্প।

[ক্রমশঃ

স্বামী হরিদাসের গান শুনে বৃন্দাবন থেকে দিল্লীতে ফেরবার পথে আকবর জিজ্ঞাসা করলেন তানসেনকে, 'তুমি কেন ওরকম গাইতে পার না?'

তানসেন উত্তর দিলেন, 'আমি গান করি সম্রাটের আদেশে আর তিনি গান করেন ঈশ্বরের নির্দেশে।'

আর্ত আওয়াজ ঃ বহমান পদধ্বনি

নির্মলেন্দু যাত্রা

আমি অনেকক্ষণ জেগে থাকি, সারা দিন, রাত, রাতের অনেকখানি অংশ, নীল নীল তোর লাল ওড়না ওড়ানো সন্ধ্যে—সমস্ত সময় আমি জেগে থাকি, শুধু আমি যেন জেগে নেই, এমনই আয়গায় সব মন দিতে হয় যা অনর্থক, তুচ্ছ, সারা কথায় সাংসারিক, আর তারই ফাঁকে ফাঁকে যখন এতটুকু ফুরসুৎ পাই, এই বারান্দার ধারে দাঁড়াই, রাস্তা, আকাশ, মোড়ের মনোহারী দোকান—সব দেখতে থাকি—তখন আমি যেন একটুখানির জন্যে আবার জেগে উঠি।

আমার সব মনে পড়তে থাকে, আমাদের গ্রামের বাড়ি, ইস্কুল, ইস্কুলের ধারে মস্ত পুকুর, সেই বিরাট পুকুরটার আরও বিরাট আকাশের ছায়া, তারপর আকাশের রং মুছে আসা, মোটরের ধাক্কায় বাবার জখম হওয়া, হাড়ভাঙা, দীর্ঘ দিন ধরে চিকিৎসা, আমার বড় হওয়া, বড় হওয়া মানেই ভালো পাত্রের আশায় আরো লেখাপড়া, তার সঙ্গে গানবাজনা, সেলাই, দামার কলেজ, ভায়ের হায়ার সেকেণ্ডারী—এই সব কিংবা আরো অনেক কিছু—বাবার বেঁচে থাকা, অর্থাৎ চাকরি বাঁচিয়ে রাখা, ভায়ের মানুষ হওয়া—সব কিছু আমাদের নোংরা ঘিঞ্জি মাহিষদা দিন মশা তাড়ানো রাতের সহরে নিয়ে এল। একে আমি মনে মনে হাওড়া বলি, সহর বলি না। এর পেছনে গ্রাম, সামনে সহর। রাত সোয়া এগারোটার নবরূপম সিনেমা থেকে শেষ দর্শকের মিছিল মার্চ করে গেলে দুয়োরের জলা থেকে একপাল শেয়াল আমাদের বাড়ির সামনে বেড়াতে আসে। আমি একে তাই কিছুই বলি না। এ হোল শুধু গলি, নলিনাক্ষ মল্লিকের গলি, আমি ছোট করে বলি নলিনীর গলি।

ভিরাশী নম্বর বাড়িটার সামনেই গলিটার শাখা, ছয়ের দুই ছয়ের তিন হতে হতে ছয়ের একুশ পর্যন্ত ছোট বড় অনেক বাড়ির লুকোচুরি খেলা।

আমরা আছি মোড় থেকে একখানা বাড়ির পরেই। একটু সুবিধে হোল। এই বারান্দায় দাঁড়ালে মোটরের ধুলো, চীৎকার, কিছুই বিশেষ লাগলো না অথচ নলিনীর গলির কিছুটা আর তার শাখার অনেকটা দেখা গেল।

আর তাই ঘুরে ফিরে এক রূপবান যৌবনের সঙ্গে আমার দেখা হয়।

গলির মনোহারী দোকান চালায় যে মানুষটি—সকালে দোকান খোলে, ছেলেদের ঘুড়ি, লজেন-চুষ আর বিস্কুট গুণে গুণে দেয়, মাঝে মাঝে গুণ গুণ করে গান করে, সুন্দর করে কোঁকড়ান চুল আঁচড়ায়, আয়নায় ডিমের মত লম্বা কর্সা মুখ দেখে, মাঝে মাঝে পাশে হাত দিয়ে চুপ করে বসে ভাবে, দুপুরে খেতে যায়, বিকেলে আসে, রাতে লালনীল আলো জ্বালে—সেই লোকটির সঙ্গে আমার দুবছর ধরে দেখা।

কিংবা এই দুবছর ধরে কিছুই দেখা নয়।

আমি ওকে বছরের পর বছর একই রকম দেখে আসছিলাম। বন্ধু নেই, বান্ধব নেই,

আজ্ঞা নেই, তাস নেই, চুপচাপ বসে আছে, কখনো সামান্য খুশি, কখনো মুখটা ঝুলে আছে। ওর চেয়ে ওর দোকানটা বেশি সাজত, ঘুড়ির সময়ে রঙবাহারি ঘুড়ি, লাটাই, কাঁচের বোয়েমে রঙিন মাঞ্জা, দোলের সময়ে লাল নীল হলুদ রঙের প্যাকেট, আবীরের স্তূপ, কালী পুজোর সময়ে চকচকে ঝকঝকে কাগজে মোড়া বাজী, আর বছরের প্রায় সব সময়েই আমাদের জন্যে প্লাস্টিকের রঙীন পুঁথির প্যাকেট, প্লাস্টিকের সুতোর ছড়। নিজেই দেখি একদিন প্লাস্টিকের ব্যাগ বুনছে। আমি তো সেসেই কুটি কুটি, মেয়েছেলে—ঠিক আমাদের মতো।

ওকে আমি এই রকম মনে রেখেছি। হয় ওকে আমি চিনি নয় আমি ওর কিছুই জানি না।

কেন আমি বিকেলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে এই সব কথা ভাবছি! আমি ভাবছি না। আমি যেন গভীর ঘুমের থেকে মাঝে মাঝে জেগে উঠছি, আমার সব মনে পড়ে যাচ্ছে।

সেদিন সন্ধ্যের আকাশে ছিল গাঢ় লাল, তার ওপর যেন অনেক ইঞ্জিনের ধোঁয়ার অন্ধকারের প্রলেপ জমে জমে উঠছিল, একটা মালগাড়ীর চলে যাওয়ার আওয়াজ ঘুমের থেকে ভেসে আসছিল, অনেক—অনেকগুলো গাড়ী বোঝাই কেলগেছের পুলের ওপর দিয়ে ঘুরে চলে যাচ্ছিল আর সেগুলো ছিল অনেক জিনিসে বোঝাই, তাদের পাগুলো যেন আনন্দে নেচে নেচে উঠছিল, বিলম্বিত লয়ের গুম্ গুম্ ধ্বনির ঢেউ বয়ে যাচ্ছিল।

সেই নগ্ন অন্ধকারে নিজেকে মুড়ে আমি ওর মনোহারীতে গেলাম। ও চুপ করে বসেছিল সুইচ টিপল। আলো জ্বলল না। একটা বাতি জ্বালল। চকিতে ওর মুখটা দেখলাম। দেখলাম ভাবনায় মলিন। কি এত ভাবে ও। আর এত শান্তই বা কেন।

'প্লাস্টিকের পুঁথি দেখাবেন তো', আমি বললাম।

'কি রঙের দেব!'

'সবুজ, হলদে আর—আর—'আমি রঙ খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

'আর সাদা', ও বিনয়ে বলল, 'সাদার পাশে হালকা হলুদ, তারপর কিছে সবুজ, তাহলে হয় কি আপনার ব্যাগটা খুব বেশি চোখের সামনে ফট্ ফট্ করে না, খুব ঠাণ্ডা নরম একটা জিনিস হাতে রইল, না হলে এর উল্টোও করতে পারেন, যেন লাল, গাঢ় বেগুনী, ঘুটঘুটে কালো, জ্বল জ্বল করবে চোখের সামনে—'

'না-না আমাকে হালকা রঙ দিন,' ওকে বাধা দিয়ে বললাম।

বাতির আলোয় ও আমাকে নয়া পয়সা ফেরত দিল, পুঁথির প্যাকেট তিনটে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল, কিন্তু কখনো আমার মুখের দিকে তাকালো না। কি রকম নিস্পৃহ নির্লিপ্ত ভাব। আমার ভালো লাগলো না। এতদিন আমরা এ পাড়ায় এসেছি, ওকে কোনোদিন চোখ তুলে আমাদের বারান্দার দিকে তাকাতে দেখলাম না। সব সময় যেন ও দোকান নয় নিজের মধ্যেই নিজে জড়িয়ে আছে। কতদিন আমার বান্ধবীরা এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েছে, তাদের কেউ কেউ আমার চেয়েও সুন্দরী, ও তাকায়নি, বরং আমিই চোখের ইসারায় আর তর্জনীর অস্পষ্ট সঙ্কেতে জানিয়েছি, 'এক আশ্চর্য ছেলে ভাই, এমনে একদম অচল, বিশেষ করে এই যুদ্ধের সময়ে।'

আরো অনেক কথা বলতাম বলার খুশিতে, যা আমি শুনেছিলাম ঝিয়ের কাছ থেকে, যা আমি কুড়িয়েছিলাম পাড়ার বুড়িয়ের কাছ থেকে, যারা মায়ের কাছে গল্প করতে আসত।

'জানিস তাই ঘণা, ওই ছেলেটার না—মাথার ওপর কেউ নেই, বাপ নেই, দাদাও নেই। বড়দাদা না—দুছেলে আর স্ত্রী রেখে—হোলো কি একদিন—খুব জ্বর—একশো ছয়—বোঝো—একশো ছ' ডিগ্রী—আর পেটে খুব যন্ত্রণা, হাসপাতালে নিয়ে গেল, ডাক্তার বললে অ্যাপেণ্ডিসাইটিস, ওখানটায় ঘা হয়ে গেছে, পেট কাটল ডাক্তারে, তারপর দুদিনও গেল না, ডাক্তার বললে, ঘা ছড়িয়ে পড়েছিল নাড়ীতে, ওর বৌদি কত কাঁদে আর বলে, আমি তোমায় কত করে খেতে বলতাম, তুমি সময়ে দুমুঠো খেতে না ভাল করে, এখন তুমি যে চলে গেলে, আমায় কে খাওয়াবে।'

'তা ওর দেওর তো সংসার চালাচ্ছে এই বাজারে,' কেউ একজন বলত, 'ছেলেটাকে ভালো বলতে হবে।'

'কে জানে ভাই!' আমি হাত উল্টে বলতাম, 'ওর ছোটো ভাই-টা তো শুনি একেবারে বিশ্বকাটে, অথচ আমাদের বাড়িতে গল্প শুনি ওর ছোটো ভাইটা কি সুন্দর, কি সুন্দর দেখতে, রঙ যেন ফেটে পড়ছে, এই লম্বা নাক, এই টানা টানা চোখ, ব্যাক ব্রাশ করা কোঁকড়ানো চুল, কে বলবে অমন সুন্দর লোকটা তিন তিনটে মানুষের খুনি বিজের হাতের গুলিতে উড়িয়ে দিয়েছে।'

'তুই দেখেছিস তাকে?' ব্রতী জিজ্ঞেস করত আমাকে।

'কি করে দেখব ভাই, তিনটে মানুষের খুলি ওড়াবার পর তিনি এখন কেবল মাত্র রাতের অন্ধকারে উঁকি মেরে বেড়াচ্ছেন।'

ওরা হাসত আমার কথায়।

এই সব কথা আজ আমার মনে পড়ে যাচ্ছে, যা আমি শুনেছিলাম, যা আমি শুনিয়ে ছিলাম, যা আমি শুনতে শুনতে বলতে বলতে বিশ্বাস করতে চাইছিলাম, একটা চরিত্রের পরিমাপ করতে চাইছিলাম, কিংবা হয়তো বেশি কিছু নয়, একটা অলস কৌতূহল, কিংবা আমার মত মেয়েরা যারা মাঝে মাঝে জেগে উঠতে চায়, সংসারের গভীর ঘুমের ঘোর ছেড়ে জগৎটাকে দেখতে চায়, তারা হয়তো অনেক বিষয়ে সচেতন না হয়েই পারে না। হয়তো বিশেষ কিছুই ঘটেনি, শুধু তার ভেতর থেকে একটা গভীর তাৎপর্যে তারা সন্ত্রস্ত শঙ্কিত কিংবা আনন্দিত না হয়েই পারে না।

সেই বিশেষ কিছুই না ঘটার ছবিটা আমার মনে ভাসছে।

সেদিনও এমনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে। বিকেলের রঙ লেগেছে আকাশের কোণানো মেঘে। সব শান্ত সুস্থির মনে হচ্ছিল।

আমি দূরের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। এলোমেলো অনেক কথা ভেসে যাচ্ছিল মনের মধ্যে। হঠাৎ উঁচু পর্দার অনেকগুলো পুরুষ হাসি আমায় চমকে দিল। আমি নীচের দিকে তাকালাম। গুটি কয়েক ছেলে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে চলেছে, বয়েস কুড়ি পঁচিশের মধ্যে, হাসিটা উঠছে সেইখান থেকে।

আমার কে যেন হিস্ হিস্ করে চাবুক মারল। চকিতে চাইলাম। কী বিশ্রী ওদের চাউনি। একটা ক্যামেরার শয়তান চোখও উঁকি মারছিল লাটের আড়াল থেকে। আমি ছুটতে ছুটতে পালিয়ে গেলাম বারান্দা থেকে।

মা বলল, তুই আর বারান্দায় যাসনি।

বলে মা নিজেই গেল বারান্দায়।

আমার ভারি কষ্ট হতে লাগল, আমি আর খোলা বারান্দায় অনেক আকাশের নীচে ইচ্ছেমত দাঁড়াতে পারব না, আমার এ যন্ত্রণা কেউ বুঝবে না।

কিছুক্ষণ পরে মা ফিরে এল। গম্ভীর। উদ্বিগ্ন।

'মনোহারী দোকানের ছেলেটা ওদের কি বলেছে, তাই নিয়ে ওদের মধ্যে খুব বচসা চলেছে মোড়ের মাথায়।' বলেই মা চুপ।

'পাড়াটা খুব খারাপ,' দাদা রাত্তিরে খেতে খেতে বলল, 'কোনো ছেলে ছোকরার দল যদি থিয়েটারের চাঁদা চাইতে আসে তবে—'

'কি তবে—'মা হেসে উঠল।

'চাঁদাটা ভালোয় ভালোয় দিয়ে দিও।'

'না দোব না।'

'তাহলে বোমা পড়বে,' দাদাকে খুব শান্ত মনে হচ্ছিল, 'এই পাড়াতেই এই রকম কেস হয়ে গেছে, কতকগুলো কেরারী এই পাড়ায় আড্ডা গেড়েছে শুনছি, পাড়াটা খারাপ, কিন্তু অন্য জায়গায় বাড়ির সন্ধান পাই কোথায়!'

আমার কারা যেন বন্দী করে ফেলল। কিছুই দেখি না। শুধু শুনি। পাড়ায় একটা থিয়েটারের আখড়া হয়েছে। সন্ধ্যে বেলায় মহলা সুরু হয়, চলে অনেক রাত পর্যন্ত। পাড়ায় আর একটা দল তৈরী হয়েছে, হোমগার্ডের দল। যারা থিয়েটার করে তাদের এরাও নাম দিয়েছে—'হুটনদার দল'—কেননা ওদের কাজ নাকি পাড়ায় পাড়ায় হুটন দেয়া। ওরাও এদের নাম দিয়েছে 'পল্টনদার দল', এরা সব পল্টন হয়ে গেছে। মনোহারী দোকানে এখন নতুন মুখ। সে ছেলেটিকে নাকি বেশিক্ষণ দেখা যায় না।

পাড়ায় একদিন চুরি হোল। বড় বড় ট্রাঙ্ক পর্যন্ত নিয়ে গেছে। সিন্দুক ভেঙে টাকা তো নিয়েছেই। চুরি না ডাকাতি!

মাঝ রাত্তিরে ঘুম ভেঙে যায় এক একদিন। আতঙ্কে উঠে বসি। ঘুট ঘুট আওয়াজ। অনেকক্ষণ ঘুম জুড়ানো চোখে বসে থাকি, বসেই থাকি, জানলা খুলে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকি। ঘুমের কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করতে থাকে। কারা যেন চলাফেরা করে। গাঢ় ঘুমের রাত অশান্ত হয়ে ওঠে।

অমনি এক রাতে তাকে দেখেছিলাম। প্রথমে দুজন পুলিশ হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল। তার অনেক পরে আবার ভারী বুটের শব্দের মিছিল। চারজন হোমগার্ড। পরণে ছাই রঙের সার্ট, খাকি ফুল প্যান্ট, মাথায় লাল টুপি। ওরা চলে যাচ্ছে। ওদের মধ্যে তাকেও আমি দেখতে পেয়েছি, চিনে নিয়েছি। ওদের মিলিত বুটের শব্দ আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। আমি কিন্তু শুনছি সারা পথ ঘাট মাঠ যেন জুড়ে মানুষের বিরাট মিছিল চলেছে অন্ধকারে—যেন অগুনতি ঢেউয়ের বিপুল বহমান নদী—যেন বিপুল বহমান ধ্বনি—ধ্বনির ভেতরে পুঞ্জিত আবেগ স্পন্দন সব আমি অহরহ শুনছি।

গভীর রাত্রে অকারণে উঠে বসেছি সেদিনও। তালে তালে পা ফেলার আওয়াজ কানে এল যেন। তারপরেই বুটের ছন্দ এলোমেলো হয়ে গেল—একটা মর্মভেদী তীক্ষ্ণ তীব্র হুইসিলের চীৎকার—এলোমেলো ছোটার শব্দ, তারপর কিছুক্ষণ রহস্যময় স্তব্ধতার পর্দা।

আমি জানলার রড ধরে দাঁড়িয়ে আছি—দাঁড়িয়েই আছি—হঠাৎ একটা মোটরের শব্দ, ঝড়ের মত বেগে সেটা চলে গেল দক্ষিণে সার্কুলার রোডের দিকে, একটা কালো বেড়াল যেন একলাফে গলির মোড় পেরিয়ে গেল। আমার বুকটা কাঁপছে—পাঁচ—সাত—দশ—দশ সেকেণ্ডও পেরোল না—আর একটা মোটর এই গলিতে ঢুকে পড়ছে, খুব জোরে মোড় ঘুরেই ছুটছে—হল্ট্—হল্ট্—কে যেন চীৎকার করে উঠল—এক ঝটকায় মনোহারী দোকানের দরজা খুলে এক লাফে কে যেন রাস্তায় নামল—একটা বন্দুকের আওয়াজ, টায়ার ফাটার শব্দ, পিস্তলের গুলি, পরপর অনেকগুলো, গাড়িটা গড়িয়ে গড়িয়ে তবু যাচ্ছে—তখনো যাচ্ছে—আর একটা বন্দুকের গুলি—একটা আর্ত আওয়াজ—গাড়ীটা থেমে যাচ্ছে—পেছনে পুলিশের গাড়ি—অনেক ভারি পায়ের শব্দ……

'এ গাড়িটায় কারা ছিল ?' চাপা গলার প্রশ্ন।

'যেন গ্যাঙ্—যারা ওয়াপন বেচে—' অসমাপ্ত উত্তরের ওপর আবার প্রশ্ন—'গুলি লেগেছে নাকি ?'

'হ্যাঁ'

'কাকে ?'

'আমার ভাইকে। ছোট ভাইকে।'

আমি এই পথ ঘাট মাঠ পাহাড় পেরিয়ে অনেক সশস্ত্র মানুষের বহমান পদধ্বনি শুনছি—তারা চলেছে—চলেছে—দেশ কাল উষা সব তাদের আহ্বান করছে—পবিত্র প্রভাতের প্রার্থনায়—তাদেরই ডাকে সাড়া দিয়ে তারা চলেছে—চলেছে……

একবার এক বিখ্যাত ধনীলোকের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইবার সময় তিনি (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর) কলিকাতার ধনীদের মূল রুচিকে কসিয়া ঘা দিবার ইচ্ছায় পোষাক তৈরী করাইলেন এক সাদাসিধা ধরণের সাটিনের লম্বা জোব্বা,—তাহাতে কেবল সাচ্চা রুপালি জরির কাজ করা। আর ইচ্ছা করিয়া গায়ে না পরিয়া তাঁহার জুতায় বসাইলেন বড় রাজ্যের মণি-মুক্তা-জহরৎ। ঐ জিনিসগুলি পরে করিয়া সেই নিমন্ত্রণ সভায় গিয়া তিনি হাজির হইলেন, যেন মূল রুচিবিশিষ্ট ধনী লোকগুলি তাঁহার পায়ের দিকে চাহিয়া দেখে।

—অজিতকুমার চক্রবর্তী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

যাক! পর্ণা এবার নিশ্চিন্ত। চোর কুঠুরিতে আর আনাগোনা হবেনা। উদ্দাম ইচ্ছেগুলিকে শিকলি পরিয়ে পরিয়ে আর ক্লান্ত হ'তে হবেনা ওকে। কালই তো চলে যাচ্ছে ফুলমু, সকাল সাড়ে আটটার গাড়িতে ও নিজে তুলে দিয়ে আসবে ফুলমুকে।

এখন ফুলমুর সঙ্গে একটু গল্প করা চলে। এটুকু প্রশ্রয় দেয়া চলে ফুলমুকে, নিজেকে। ফুলমুর দিকে সকরুণ চোখে তাকালো একটু,—সত্যি, চমক লাগানো রূপসী বটে ফুলমু। আর, ওর মুখের ডৌলে, না গ্রীবার মরাল ভঙ্গিতে, কিম্বা চোখের টানে, কোথায় যেন ইস্পাতের দৃঢ় কাঠিন্য, এই মুহূর্তে আবিষ্কার করলো পর্ণা। আর আবিষ্কার করতে পেরে খুশি হলো,—মুগ্ধ হলো। যেন, এ মেয়ে মামুলি নয়, সহজলভ্যা নয়। দূর থেকে দুচোখ ভ'রে ওর রূপ দেখে মুগ্ধ হওয়া চলে, কিন্তু, কাছে সবাই যেতে পারবেনা, কাছে এগোনো খুব শক্ত। ফুলমুকে নতুন ক'রে আবিষ্কার ক'রে পর্ণার মনটা যেন কেমন ক'রে উঠলো। তাড়াতাড়ি চোখ নামালো, বললো, একলা যেতে ভয় করবেনা তো মিলরাজ?"

এখনও সেই মিলরাজ! নামুর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলো ওকে, তবুও ফুলমু ব'লে কী ডাকা যায়না?...কিন্তু, ও গাঁয়ে ফিরে যাচ্ছে শুনে, কী সহজ হয়ে গেছে সর্দার। সেই পরিচিত সম্বোধনের-সুর আবার ফিরে এসেছে গলায়। বোঝা নেমে যাচ্ছে কাঁধ থেকে সেই আনন্দে অস্থির, কিন্তু, সর্দার ভাল করে একবারও ওর কথাটা ভাবলোনা। গাঁয়ে গিয়ে ফুলমু বলবে কী? সন্ধ্যার অন্ধকারে, নদীতে গা ধোবার ছল করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলো, তারপর ঘরে আর ফেরেনি। পাহাড়ীদেরও যে সমাজ আছে—বিচার আছে, সে কথা একেবারে কেমন করে ভুলে গেলো সর্দার! সে যাক—! যা হবার, তা হবে ওর কপালে। নামুর বউ হতে না পারুক, অন্য কিছু হবে। কিন্তু পর্ণাকে মুক্তি ও দেবেই কালকে। মুখের চেহারা, গলার স্বর, ও বিকৃত হতে দেবেনা পর্ণার।

পর্ণা উত্তরের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে তারপর বললো। তর পাচ্ছো বুঝতে পারছি। কিন্তু, তার ব্যবস্থাও করে দেব আমি। গাড়িতে তুলিয়ে দেব, কারা চাষায় যাচ্ছে—,তাদের বলে দেব তোমার খবরদারি করতে।"

নিঃশব্দে শান্ত হাসলো ফুলমু, বললো, "তুমি কেন এত ব্যস্ত হচ্ছো সর্দার, আমার কোনো ভয় নেই। আমি ভয় পাইনা—"

"তাইতো চাই আমি..." অনেক কিছু যেন বলতে চেয়েছিলো পর্ণা, কিন্তু চুপ ক'রে গেলো। একটু চুপ। তারপর। বললো, তোমার কাপড় কোন দোকানে বেচে দিয়েছো? যাওয়ার সময় সেটা উদ্ধার ক'রে নিয়ে যেতে হবে।"

ফুল্‌মু বললো, না, সর্দার, তা হবেনা। বাদুর বছর কী কাঙড়ুর অভাব হবে নাকি? তার চেয়ে ওটা রোকানেই থাক। আমি মাঝে মাঝে মনে করতে পারবো,-আমার নিজের পয়সা দিয়ে সর্দারকে একদিন মাংস-খাইয়েছি…।"

পর্দা হঠাৎ আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো। ঠিক এই কথা না হলেও, এমনি ধরণের কথা ফুল্‌মু ওকে আর একদিন শুনিয়েছিলো। কোথায়? কবে? না, না, উদ্দাম ইচ্ছেগুলিকে অনেক চেষ্টায় শোষ মানিয়েছে, আর খোঁচানো নয়। বেশ, তাই হবে—"পর্দা বললো।

হঠাৎ ফুল্‌মু দ্রুত সরে এলো ওর কাছে, মুখটা উঁচু করে তুলে ধরে বললো, "সর্দার, ভাখোতো, আমার চোখে যেন কী পড়্‌লো।"

"তাইতো! চোখটা তো খুবই লাল হয়েছে দেখছি—" পর্দা বাঁহাত দিয়ে ফুল্‌মুর চোখটা টেনে দেখতে লাগলো। পর্দার আগোচরে, চোখ ডলে ডলে, কতক্ষণ ধরে এই কাণ্ডটা ঘটিয়েছে ফুল্‌মু। এমন সুযোগ কী আর সহজে ছাড়ে! মাথাটা হেলিয়ে, পর্দার বুকের সঙ্গে মিশিয়ে, চোখে ভয়ানক যন্ত্রণা হচ্ছে বলে, সমানে উঃ, আঃ করতেই থাকলো। ফুল্‌মুর চোখের পাতা টান করে ধরে, পর্দা চোখের ভেতরটা তীক্ষ্ণ নজর দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলো।

না, কুটো কী কাঁকড় কিছুই তো দেখা যাচ্ছেনা। একটা চোখের পালক পর্যন্ত না। এদিকে নিচু হয়ে দেখতে দেখতে, ওর গালের সঙ্গে ফুল্‌মুর গালের, চিবুকের, বারে বারে ছোঁয়াছুঁয়ি হতে লাগ্‌লো। অনেক পরে, যখন পর্দার নিঃশ্বাসটা ভারি হ'য়ে উঠ্‌লো, তখন বুঝলো ফুল্‌মুর ছলটা। অথচ যেন বোঝেনি, এম্‌নি ভাব করে, দুহাত ফুল্‌মুর মাথাটা তুলে ধরে নিজেকে সরিয়ে নিলো ফুল্‌মুর সান্নিধ্য থেকে, হাসিমুখে বললো, "থাক্ পাথর, ওতে কিছু হবেনা—"

কাল তো চলেই যাচ্ছে ফুল্‌মু, ওর এ তরলতাটুকু মাপ করা চলে—মনে মনে বললো পর্দা।

"ফুল্‌মু, কী ভাবছো?" চারপা চলেই পর্দা জিগ্যেস করলো।

উত্তর দিতে ফুল্‌মুর দেরী হলো। নিজেকে স্বাভাবিক করতে, গলাটা পরিষ্কার করতে কিছুটা সময় ওর লাগ্‌লো। তারপর বললো, "সর্দার, ফেরার পথে আমাকে কিছুটা মাংস কিনে দিও, আজ রাত্রেও মাংস পাকাবো—"

নিশ্চয়ই, মাংস তো কিনবোই আজকে, তাছাড়া পুরী-মিঠাই-চাটনী-সব কিনবো—"পর্দার আনন্দ ঘন কণ্ঠস্বরের নিচে ফুল্‌মুর করুণ কণ্ঠস্বর মিলিয়ে গেলো।

অনুমতি নিয়ে ওরা কাঙড়া দুর্গে ঢুকে গেলো।

পর্দার মনটা হাল্‌কা। কর্ণাক্ষর কাছ থেকে শোনা কিছু কিছু কাহিনী ফুল্‌মুকে শোনাতে লাগলো। আজ দুপুরে যখন গল্প বলছিলো কর্ণাক্ষ, তখন ফুল্‌মু সে ঘরে ছিলোনা। ছোটোঘরে উপুড় হ'য়ে শুয়ে ছিলো। শুয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবছিলো।

মন্দিরের সম্বন্ধে ফুল্‌মুর আগ্রহ বেশী দেখে, পর্দা সব মন্দিরের গল্প সংক্ষেপে বললো।

মহাতীর্থ জ্বালামুখীর বর্ণনা করলো, যাহাত্তি পীঠের মধ্যে জ্বালামুখী একটি পীঠস্থান। সুদর্শন-চক্রে খণ্ডিতা সতীর দেহত্যাগ কাহিনীও ছোটো ক'রে পর্দাকে বলতে হলো। ফুল্‌মু এ পৌরাণিক কাহিনী জানতো না। সতীর কাহিনী শোনার পরই ফুল্‌মুর ভার-মনটা কেমন ক'রে যেন লঘু হয়ে গেলো।

জিজ্ঞেস করলো, "সর্দার আলামুখী মন্দিরটা কোথায় ?"

"কাওড়া থেকে তেরো মাইল ঘুরে আলামুখী। এ মন্দিরে কোনো দেবী মূর্তি নেই। দেবী আজও অগ্নিশিখা হ'য়ে মন্দিরে বিরাজ করছেন। দর্শকরা, ভক্তরা, যারা আলামুখী দর্শন করতে যায়, তারা মন্দির প্রদক্ষিণ ক'রে মহাদেবীর উদ্দেশে লোটায় ক'রে দুধ নিবেদন করে। অগ্নিশিখা জিভ বাড়িয়ে যার লোটা থেকে সমস্তখানি দুধ নিঃশেষে গ্রহণ করেন, মহাদেবী এর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হ'লে —মন্দির মধ্যে সবাই হৈ-হৈ ক'রে ওঠেন। আর যার প্রতি দেবী বিমুখ, তার লোটার দুধ লোটাতেই পূর্ণ থাকে।"

এ কাহিনী শুনে ফুলমু একেবারে অভিভূত হ'য়ে গেলো। যদিও, কোনোমতে আলামুখী মন্দির দর্শন করতে পারতো, তাহলে, দেবীকে একলোটা দুধ নিবেদন ক'রে নিজের ভাগ্যটা যাচাই ক'রে নিতো। এরপর, লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির, অম্বিকাদেবীর মন্দির, চামুণ্ডাদেবীর মন্দির, ব্রজেশ্বরীর মন্দির, তারাদেবীর মন্দির,—সব মন্দিরের সঙ্গেই মুখে মুখে গল্প পরিচয় করিয়ে দিলো পর্ণা।

ফুলমু কোনো প্রশ্ন না ক'রে নীরবে সব শুনে যেতে লাগলো।

পর্ণা যখন, বাবা কেদারনাথের পরিচয় দিলো, তারাদেবীর মন্দিরের পাশেই,—একটি পাথরে বাঁধানো চৌবাচ্চার মধ্যে বিরাজ করছেন বাবা কেদারনাথ, অনাবৃষ্টির সময় এই চৌবাচ্চার মধ্যে জল দিলেই বর্ষা নামে; ফুলমু বড় বড় চোখ ক'রে তাকিয়ে রইলো। ওর চোখের সামনে চাষার অনাবৃষ্টি কালের ছবি ফুটে উঠলো। ক্ষেতের পর ক্ষেত, মাঠের পর মাঠ খাঁ-খাঁ করছে। কোথাও এতটুকু সবুজের আভা নেই। কোনো ক্ষেতে যদিও বা কিছু ফসল মাথা তোলে, রোদের খরতাপে তা জীর্ণ-বিবর্ণ হ'য়ে মিলিয়ে যায় জমিতে। জল চাই—প্রচুর জল চাই। অথচ একফোঁটা মেঘও নেই আকাশে। চাষীরা মলিন মুখে আকাশের দিকে তাকিয়ে কেবল হা-হুতাশ ক'রে আর মেঘতাকে ডাকে। তারপর, হাহাকার ওঠে ঘরে ঘরে। ফুলমু ভাবলো, সমস্ত চাষা সহরের হ'য়ে, ও যদি আগে থেকেই বাবা কেদারনাথের চৌবাচ্চায় জল ভ'রে রেখে তো—কেমন হয়! কিন্তু ও জানে, ভাগ্য ওর প্রতি প্রসন্ন নয়, ছোটো-বড় কোনো ইচ্ছেই ওর পূর্ণ হবেনা। তবু, ও ধীরে ধীরে বললো, "বাবা কেদারনাথ ভারি জাগ্রত দেবতা,—না সর্দার ?"

"হ্যাঁ।" পর্ণা বললো, "কেদারনাথ মন্দিরের শিবলিঙ্গ আর এই বাবা কেদারনাথ, দেখতে নাকি একেবারে একরকম। স্বপ্নে বাবা জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর চৌবাচ্চার ধারে পাশে যা কাছাকাছি কারো ঘর-দুয়ার তোলা চলবে না। কারা কারা যেন না যেনে ঘরবাড়ি তুলেছিলো, সঙ্গে সঙ্গে সব প'ড়ে গেছে।"

ফুলমুর চোখ আবার বিস্ফারিত হলো।

ওরা এবার থান বাঁধানো বিরাট চত্বরে এসে দাঁড়ালো।

ছায়া ছায়া দুটো চঞ্চল শরীর ওদের পেছনে মোটা মাথাভাঙা দুটো থামের আড়ালে লুকালো। চত্বরের এক প্রান্তে উঁচু জায়গাটা দেখিয়ে, পর্ণা বললো, "এখানে বোধহয় রাজসিংহাসন স্থাপিত ছিলো। আমার যতদূর মনে হয়—" ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চত্বরটা আবার একবার জরীপ ক'রে নিলো পর্ণা,—থামের পেছনের মানুষ দুটো নিজেদের শরীরকে যথাসম্ভব গুটিয়ে একেবারে ঠেসে দাঁড়ালো থামের গায়ে,—এটাই ছিলো কাটোচ রাজাদের দরবার ঘর—"

ফুলমু বললো, "ঘরবার ঘরই তো ছিলো, কর্ণাফুলীতে কাল তো তাই বললো—"

পর্ণা অবাক হ'য়ে ভাবলো, কাল তাহলে কী আন্দাজ অন্যমনস্ক ছিলো ও।

নরম আলো ক'মে গিয়ে আকাশে এখন ফিকে আলো ছড়িয়েছে। পর্ণা আকাশের বিদায়ী আলোর দিকে তাকিয়ে নিয়ে মুখটা গম্ভীর করলো, তারপর বলেই ফেললো, "কাঙড়া দুর্গ আজও ভাল ক'রে দেখা হলো না।"

ফুলমু বুঝলো ওর জন্যই এটা হলো। এ নিয়ে একটু ভেবে ফুলমু বললো, "সর্দার! দুর্গ চুলোয় আজ আর আমি উঠবো না। আমি এখানটায় বসি, ফেরার পথে তুমি এপথ দিয়ে আমায় ডেকে নিয়ে যেও—" চত্বরের সেই উঁচু জায়গাটায় ফুলমু ব'সে পড়লো ধপ্ ক'রে।

পর্ণা চিন্তা ক'রে দেখলো, ফুলমুর প্রস্তাব মন্দ নয়, ফুলমুর চেয়ে অনেক দ্রুত ও দুর্গ শিখরে উঠতে পারবে। পকেট ক'রে মোটাকয়েক মোমবাতি নিয়ে এসেছে অবশ্য, কিন্তু, অন্ধকার নামার আগেই দুর্গ ছেড়ে যাওয়া ভাল। তবু, পাহাড় দেশের সন্ধ্যা খুব ধীরে ধীরে নামে,—এই যা রক্ষে।

ফুলমুকে ঠিক ওখানেই ব'সে থাকতে ব'লে, পর্ণা ক্ষিপ্রপায়ে ভেতরে ঢুকে গেলো।

ঘরবার ঘরের ছাদও নেই, প্রাচীরও নেই, ফুলমু চারপাশটা কিছুক্ষণ দেখে নিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে রইলো। এখন, দুটো মানুষ একটা থামের আড়ালে। দুটো মাথা এক হ'য়ে ফিসফিসিয়ে পরামর্শ করতে লাগলো।

লালসাহেব বললো, "না ডিক, এমনি সরাতে যাওয়া ঠিক হবে না। ঐ পাহাড়ী ছোকরাটা একটা ডেন্‌জারাস্ চ্যাপ্। ছট্ ক'রে যদি এসে প'ড়ে, তাহলে ছোরা চালিয়ে ফালা ফালা ক'রে দেবে আমাদেরকে। এ কাজ ফিকিরে সারতে হবে, তুমি গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য আটকাও ওকে। যেন, তুমি একেবারে নতুন এসেছো, দুর্গের ইতিহাস জানতে চাও, এমনি কৌতূহল দেখিয়ে ওকে প্রায় ঘণ্টাখানেক আটকে রাখো, তাহলে, আমি নিরাপদে একাই কাজ হাসিল করতে পারবো। ক্লোরাফর্ম নিয়ে এসেছি, একটু নাকে ছোঁয়াতে পারলেই—ব্যস্। তারপর রূপবতীর অচেতন দেহটা কাঁধে করে নিয়ে একবার মোটরে তুলতে পারলে, আর আমাকে পায় কে? একেবারে সোজা বাঙ্গলা বাঙলোয় নিয়ে তুলবো।"

"আর আমি ফিরবো কী ক'রে?" ডিক বললো।

"তুমি বাসে যেও আজ। বন্ধুর জন্য এ যেহনতটুকু আজ তুমি কর, আমি ফিরে আসলে তোমাকে সেটা পুষিয়ে দেব।"

"আচ্ছা তাই। দাও দেখি একটা বোতল, আর কিছু টাকাও দাও। আমার পকেট একেবারে গড়ের মাঠ।"

লালসাহেব দুটো পকেটে চোকালো। কোটের পকেট থেকে বার ক'রে আনলো একগোছা নোট, আর প্যান্টের পকেট থেকে একটা বাদামি আকারের চেপ্টা বোতল।

ডিক্ হাত বাড়িয়ে নোটের গোছা আর চেপ্টা বোতলটা নিলো। পকেটে নোটগুলো রেখে, দাঁত দিয়ে শিশির ছিপিটা খুলে, অর্ধেকটা গলায় উপুড় ক'রে দিলো। তারপর ছিপি এঁটে শিশিটা রেখে দিলো পকেটে।

কথায় কথায় ওরা একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলো, হঠাৎ খেয়াল হতেই দেখলো, ফুলমু উঠে ভেতর দিকে চলতে আরম্ভ করেছে।

: এই সেরেছে। শিকার বুঝি হাতের নাগালে এসে, আবার হাতছাড়া হ'য়ে গেলো।

দুজনেই নিঃশব্দে দ্রুত অনুসরণ করলো।

ফুলমু কিছুটা সোজা গিয়ে, পুবদিকের একটা তোরণ দিয়ে ঢুকে গেলো। এখানে একটা সুড়ঙ্গ-পথ আছে। কালকে ওরা শুধু ওপর থেকে এপথ দেখে গেছে। এই সুড়ঙ্গপথটা বরাবর গিয়ে পৌঁচেছে বানগঙ্গায়। অনুর্বশ্পশ্য ক্যাটোচ-রাণীরা নাকি এ পথ দিয়ে গিয়ে বানগঙ্গায় অবগাহন করতেন।

বাঁধানো চত্বরে পর্দা ওকে বসে থাকতে বলেছে, সে কথা ফুলমু একেবারে ভুলে গেলো। সুড়ঙ্গর সামনে এসে, সুড়ঙ্গপথে নামার প্রচণ্ড একটা কৌতূহল হলো ওর।

পর্দার কথা সাময়িক ভাবে বিস্মৃত হয়ে, এক পা দুপা ক'রে সুড়ঙ্গপথে নামতে লাগলো ফুলমু।

বেশ অন্ধকার সুড়ঙ্গমুখটা, একটু নামার পরেই আর ততটা অন্ধকার নেই। অসংখ্য ফাটল দিয়ে কিছুটা আলো এসেছে সুড়ঙ্গপথে, ফুলমু এবার তরতরিয়ে নেমে গেলো।

ভাগ্য এমন সুপ্রসন্ন! লালসাহেব আহ্লাদে একেবারে আটখানা। হাতের ইশারায় ডিক্‌কে পর্দার অনুসরণ করতে ব'লে, কোমরের বেল্টটা একটু এঁটে নিলো। তারপরই বেড়ালপায়ে সুড়ঙ্গ-পথে নেমে গেলো লালসাহেব।

আগে, সুড়ঙ্গ-পথের শেষেই ছিলো বানগঙ্গা, এখন কিছুটা সরে গেছে। ফুলমু সুড়ঙ্গপথের শেষে দাঁড়িয়ে ভাবছে,—এগিয়ে বানগঙ্গার তীরে যাবে নাকি! শুনেছে, খুব পবিত্র এই বানগঙ্গার জল, এখন, এই সন্ধ্যের বেলা চানতো আর করা যাবেনা। আর তাছাড়া, প্রকাশ্যে স্নান করার দিনরাতের উপায়ও নেই,—তীরে গিয়ে মাথায় একটু জল দিয়ে আসলে কেমন হয়!

—না, আজ আর দেরী করা চলবে না, অন্ধকার হ'য়ে আসছে—আকাশ তার নিজের খেয়াল নিয়েই আছে, চোখ-ভুলোনো আলোটাকে আর অল্পকিছুক্ষণ ধ'রে রাখলে ক্ষতিটা কী হতো, আকাশের দিকে তাকিয়ে, ফুলমু বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে, ফেরাটাই মনস্থ করলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে, আচমকা বানগঙ্গার বুকে ঝপাং ক'রে শব্দ হলো একটা। পাহাড়ীকন্যার বুকটা ছমছম ক'রে উঠলো হঠাৎ। একটা আতঙ্কের শিহরণ ছুটে এসে বুকে পশলো ওর, ছুট দিয়ে উঠতে গেলো সুড়ঙ্গপথে, কে যেন শক্তহাতে ওকে জাপটে ধরলো, নাকে লাগলো বিশ্রী একটা কটু গন্ধ, মাথা ঝাঁকি দিয়ে ব্যাপারটা বোঝবার আগেই ফুলমু চেতনা হারালো।

ফুলমুর চাদরে ঢাকা অচেতন শরীরটা কাঁধে ফেলে লাল সাহেব বেশ দ্রুতপায়ে মোটরের সামনে চলে এলো। মোটরের পাশে ডিককে দাঁড়ানো দেখে, যেন আকাশ-পড়া ক্যাকাশে মুখ হ'য়ে গেলো ওর, কণ্ঠস্বরও কেঁপে গেলো একটু।

"সে কী ডিক! তুমি চ'লে এলে কেন? তোমাকে ব'লে দিলাম কী?"

"ডরো মাৎ লাল—" চল্‌মলে হাতে মোটরের দরজাটা ঘটাং ক'রে মেলে ধরলো ডিক্, "পরগাছাটাকে ফুলমেত উপ্‌ড়ে ফেলে দিয়ে এসেছি। আর কোনো ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট রইলোনা, ধরস্রোতা বানগঙ্গা এতক্ষণে, পাহাড়ীটার মৃতদেহ কোথায় কতদূরে নিয়ে ফেলেছে কে জানে!

"হাঃ-হাঃ-হাঃ, কিস্তিমাৎ—" হাততালির ভঙ্গিতে ডিক্ বাঁহাতের তালুতে ডান হাত দিয়ে সজোরে চাটি মেরেই, বেসামাল শরীরটা নিয়ে ধপ্ ক'রে মোটরের দরজার সামনে ব'সে পড়লো।

লালসাহেব ডিকের দিকে একটা জলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে, তাড়াতাড়ি ফুলমুকে মোটরের পেছনের সিটে শুইয়ে দিলো, গাড়িতে আরো দুটো ভাল্পনের বোতল ছিলো, খালি অবস্থায় সিটের এক কোণে বোতলদুটো প'ড়ে আছে।

"ইডিয়েট! স্কাউণ্ড্রেল! দাঁতে দাঁত পিষে গালাগালি দিলো লাল। তারপর, বন্ধুর বে-সামাল শরীরটা মাটি থেকে টেনে তুলে, মোটরের সামনের সিটের এককোণে চুপ ক'রে বসিয়ে দিলো, আবার দাঁতে দাঁত চেপে লালসাহেব গর্জন ক'রে উঠলো, "ড্যাম! স্কাউণ্ড্রেল···!"

"হোয়াট্! হোয়া-ট্!" ডমডমে লালচোখ টান ক'রে, রথলীন্ত মুখে দুহাতে মুষ্টি পাকিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে উঠলো ডিক।

পেছনের জানলা ছুটোর কাঁচ ঝিপ্রহাতে উঠিয়ে, লালসাহেব ঘুরে গিয়ে স্টিয়ারিংএর সামনে বসেছে। গাড়ির চাবি ঘুরিয়ে স্টিয়ারিংএ হাত রেখে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠলো। "আর একটি কথা যদি উচ্চারণ করেছো ডিক, তাহলে ঘুঁসিয়ে সবক'টা-দাঁত ভেঙে রেখে দেব—"

পাহাড়ের আড়াল থেকে গাড়িটা বেরিয়ে আস্তে আস্তে নামতে লাগলো। এখন অনেকখানি পথ উৎরাই। এঁকে বেঁকে কেবল নেমেই চললো গাড়িটা।

হি-হি ক'রে হেসে উঠলো ডিক। মাথাটাকে গাড়ির পাশে হেলান দিয়ে বললো, "নো, মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড নো, ডোণ্ট বি সো ক্রুয়েল—, ট্রা-লা-লা—" তারপর গলাছেড়ে গান জুড়ে দিলো, উল্লাসে উত্তরোল তার কণ্ঠ। এখন যে পথ দিয়ে গাড়িটা নামছে, তার দুপাশেই পাহাড়ের অবরোধ। এই চেনা সংকীর্ণ-পথটা বারে বারে আজ অচেনা ঠেক্‌ছে লালসাহেবের কাছে। যেন এটা পথ নয়, গোলকধাঁধা একটা। বাঁহাত দিয়ে রুমাল বার ক'রে ঘন ঘন মুছে নিলে চোখ। পাহাড়ের অবরোধ শেষ হলো, ছোটোবড় অজস্র চা ঝাড়ের পাশ দিয়ে গাড়িটা এগিয়ে চললো, এরপর শুরু হলো—পাইন-দেওদারের জঙ্গল, মাঝে মাঝে উইপিং-উইলোর ঝাড়। লালসাহেবের মুখখানাকে রেখায় রেখায় ক্ষত বিক্ষত করছে, কী একটা চিন্তার দাহ। পকেট থেকে বোতল বা'র ক'রে গলায় ঢালতে গিয়ে দেখে বোতলটা খালি। গাড়িতে যা রাখা ছিলো তাও নিঃশেষ করেছে ডিক। বিশ্রী একটা কটুক্তি ক'রে খালি বোতলটা জানলা গলিয়ে ছুঁড়ে দিলো জঙ্গলে, বনের সঘন-ঘন রূপের দিকে তাকিয়ে থাকলো একটু, হঠাৎ যেন বাতাসটা রুদ্ধ হ'য়ে গেছে, এম্‌নি মনে হচ্ছে লালসাহেবের। খুব গরম লাগছে। একা অস্বস্তিকর ওভারকোট। না কি, ডিকের মত পানের মাত্রাটা ওরও বেশী হ'য়ে গেছে আজ।

জনবিরল পাহাড়তলি দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে, তবু লালসাহেবের সতর্কচোখ ফিরে ফিরে দেখছে, গাড়ির আশপাশ, গাড়ির পেছন। ডিকের দিকে তাকালো,—ঘুমিয়ে যেন একটা পিণ্ডাকৃতি হ'য়ে গাড়ির কোনায় প'ড়ে আছে।

"একটা লাইকার—" অনুভ্রসলায় আবার গাল দিলো লালসাহেব।

গাড়ির গতি কমিয়ে পেছনের সীটটা নিরীক্ষণ ক'রে নিলো।

—না, রূপবতীর অচেতন দেহটা সেই একই ভাবে চিৎ হ'য়ে রয়েছে, চাদরের আচ্ছাদন সরে যায়নি, মুখ ফেরালো, হাত তুলে সময়টা দেখে নিয়ে, মনে মনে বাঙ্গলা-বাঙ্গলোয় পৌঁছোনোর সময়টা একটু হিসেব করলো। এ হিসেব, এরমধ্যে আরো একাধিকবার হ'য়ে গেছে।

হঠাৎ বুকটা যেন ধর ধরিয়ে কেঁপে উঠ্‌লো লালসাহেবের। গুরু-গম্ভীর পথে অনেকগুলি মানুষের মিলিত কণ্ঠস্বর, আর ঠকাঠক্ লাঠির শব্দ।

: পাহাড়ী সর্দারের চ্যালারা নিশ্চয়ই। এইবার গাড়িটাকে ঘিরে ফেলে আটক্ করবে। রাস্তা এত চালু, আর এত খারাপ, গাড়ির গতি বাড়াবার এতটুকু উপায় নেই। গাড়িটা আচম্‌কা ব্রেক দিয়ে লাফিয়ে উঠলো। স্পিডোমিটারের কাঁটা ত্রিশের ওপর চলে গিয়েছিলো।

ঝাঁকুনি খেয়ে নেশার ঘোর কিছুটা কাটলো লালসাহেবের। চোখে পড়লো গাড়ির আশে-পাশে বা পেছনে কোনো লোক নেই। আর ঠকাঠক্ আওয়াজটা গাড়ির নয়, শাবলের। দূরে কতগুলো পাহাড়ী গান গেয়ে গেয়ে পাথরের খাঁজে শাবল চালাচ্ছে।

: ড্যাম্ রট্, রেট কাটছে কতগুলো বোম্বি—ভেতরের ভয়টাকে যেন মুখ ভেংচালো লালসাহেব।

পাহাড়ের অবরোধ শেষ হলো। এবার চড়াইপথে উঠছে গাড়িটা। পূর্ণিমার কাছাকাছি তিথি, চাঁদের চোয়ানো আলো গায়ে মেখে দূরের গাছগুলো যেন সুন্দর ছবি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেদিকে চেয়ে চেয়ে ফুলুর যৌবন সম্ভারের কথা ভাবছিলো লালসাহেব, রোমাঞ্চিত ভাবনার ঘুর দিয়ে গুনগুনিয়ে গান ভাঁজছিলো। হঠাৎ গান থেমে গেলো। চারদিক আবছা, অস্পষ্ট মনে হচ্ছে কেন? বুকটা দুলে উঠলো লালসাহেবের। আধপোড়া সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ভুরু কুঁচকে তাকালো। ঘন কালো বিরাট একখণ্ড মেঘ, আকাশের কোণ থেকে দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে দেখতে দেখতে আকাশটা যেন ছেয়ে গেলো কালো মেঘে। আর, কী সোঁ-সোঁ শব্দ বাতাসের! আতঙ্কে শিউরে উঠলো রোমাঞ্চিত মনটা।

—চেনা রুট তো নয় এটা! এটা কী সাইক্লোন!

—এ আবার কী! অসময়ে মেঘের এমন ঘোরালো কেন?—মনের বিরক্তি মনেই র'য়ে গেলো লালের, সমস্ত শরীর কেঁপে উঠলো, সোঁ-সোঁ শব্দটা বেগে ছুটে আসছে যেন। আরো—আরো, ক্রমশঃ একেবারে যেন মাথার ওপর এসে পড়েছে ঝড়ের ঝাপট্। নিষ্ঠুর, খামখেয়ালী প্রকৃতিকে গালাগালা দিতে লাগলো লাল। চড়াইপথের একপাশে খাড়াপাহাড়, আর এক পাশে গভীর খাদ্। গাড়ি থামিয়ে, আকণ্ঠ-উদ্বেগ নিয়ে শক্তহাতে স্টিয়ারিং চেপে ধরলো লালসাহেব, প্রতি মুহূর্তে পদক্ষেপ গুনতে লাগলো।

—এলো, এলো, আর দেরী নেই,—আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই, ঝড়ের ঝাপটে, খাদের অতল অন্ধকারে গড়িয়ে প'ড়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে যাবে গাড়িটা, সেই সঙ্গে ওরাও। তারপরেই বোধহয় হিসেব নিকেশ দিতে হবে পাহাড়ী সর্দারটাকে!

এমন মর-যন্ত্রণা ভোগ করার চেয়ে মৃত্যু ভাল।

হৃৎপিণ্ডের বাজনা থেমে যেতে যেতে, আবার টিক্ টিক্ ক'রে চলতে শুরু করলো। গাড়ির কাচগুলোকে শুধু ঘন ঝনিয়ে, ঝড়ের ঝাপট্ আস্তে আস্তে দূরে সরে গেলো। গল-গল করে ঘাম হ'য়ে সমস্ত পোষাক ভিজিয়ে দিলো লালসাহেবের।

—কী ব্যাপার! কালো চলোমান মেঘের দিকে মুখ ক'রে লালসাহেব তাকিয়ে রইলো অনেকক্ষণ।

"ওঃ গড্! পাহাড়গুলি কাঁপিয়ে হো-হো ক'রে হেসে উঠলো লাল। ঝাঁকে ঝাঁকে-লাখে লাখে সারবেঁধে পাখির দল উড়ে যাচ্ছে। কালো কালো পিঠ পাখিগুলির, ভুরোকালির রং ডানা আর আকৃতি অনেকটা যেন বকের মত। পাশাপাশি ঘেঁসাঘেঁসি ক'রে, এতটুকু ফাঁক না রেখে লাখ লাখ পাখি ডানা ঝাপ্টে উড়ে যাচ্ছে।

সারিবদ্ধ পাখির মিছিল চলে গেলো। আবার আকাশ আলো হলো। পাখিদের শেষ সারিটা একেবারে দৃষ্টির বাইরে চলে যাবার পর, গাড়ির চাবিতে হাত দিলো লালসাহেব।

গাড়ি আবার চললো, ধুস্ আটকানো থানটা ফেলে, লালসাহেব একটা সিগারেট ধরালো।

[ক্রমশঃ

গীতার সেই শ্লোকটি

শ্রীরাজপদ মুখোপাধ্যায়

স্বামীজী রিকশা ঠিক করে দিলেন। বললেন, আজ আর কাল দুটো দিন ঘুরিয়ে আনবে এঁদের। আজ বিকেলে থানেশ্বর মহাদেব আর ভদ্রকালী দেখিয়ে আনবে। জায়গা দুটো শহরের বাইরে একটেরে। খানিকটা কাঁচা রাস্তা ভাঙতে হবে—যেতে আসতে সময় লাগবে। ওদিকটা আজ সেরে রাখাই ভাল। কাল সকালে রাণসঙ্গা জ্যোতিঃসর বিড়লা মন্দির প্রবণনাথের মঠ কুরুক্ষেত্র তালাও হয়ে আসবে সন্নিহিত সরোবরে। কেমন—বুঝলে?

রিকশা-চালক মাথা নেড়ে বলল, বহুৎ আচ্ছা।

চালকের নাম অর্জুন সিং। যুবকের সুস্থ সবল যুবক। ঘন দাড়িগোঁফে আচ্ছন্ন মুখের আধখানা যেমন ঢাকা—বয়সটাও তেমনি অনুমানে ধরা কঠিন। কঠিন আরও একটি কারণে অত্যন্ত চটপটে খুব মেজাজী স্ফূর্তিবাজ বলে। তবু আন্দাজ করে নিলাম ত্রিশের মধ্যেই হবে। পথ চলতে চলতে নানা বয়সী মানুষের সঙ্গে কতভাবে যে আনন্দ-বিনিময় করল। কাউকে জানাল প্রণাম—কারও সঙ্গে করল কৌতুক—কাউকে শোনালে যুদ্ধ সমাচার—, কুশল বার্তার আদান প্রদান সকলকার সঙ্গেই হলো। আমাকেও অনেক ইতিহাস শোনালে। ওদের পূর্ব জন্মের ইতিহাস। সেজন্যে রিকশা চালকের ভূমিকা ছিল না ওর। —ও ছিল ইস্কুলের ছাত্র। ওরা ছিল অবিভক্ত পাঞ্জাবের অধিবাসী। ভারত স্বাধীন হবার পর এখন যে দিকটাকে পশ্চিম পাঞ্জাব বলা হয়।

শন্ শন্ করে রিকশা চলছিল—ও গল্প বলে যাচ্ছিল ফাঁকে ফাঁকে। হাঁ—আমরা উদ্বাস্তু। ভারত ভাগের পর পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে চলে এসেছি। আছি নালোখেরিতে। মাঠের মাঝে শহর গড়ে তুলেছি সব উদ্বাস্তু মিলে। ওখানে মাথা গোঁজবার ঠাঁই একটা হয়েছে, কিন্তু রুজি রোজগারের জন্য এবার ওখান ছড়িয়ে পড়েছি। ভারত ভাগ হ'ল—আমরাও যেন যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে পড়লাম।

যাই হোক—খানিকটা সামলেও নিয়েছে তো। রিক্‌শাও করো একখানা। চলনায়।

রিক্‌শা! একি আমার নিজের রিক্‌শা—এ হল মহাজনের সম্পত্তি। আমরা তেলি রেটে ভাড়া নিই। তা হোক—ভালই আছি আমরা।

এবার ও অনর্গল গল্প বলে যেতে লাগল।

হাঁ—ওরা ভালই আছে—প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠেছে। দেশ গেছে—আপশোষের কথা বটে। কিন্তু উপায় কি। জীবনভোর এক জমিতে বাস করার ভাগ্য আর ক'টা মানুষের হয়। বৃত্তি গেছে—নূতন বৃত্তি ব্যবসায় নিতে হচ্ছে। তাতেই বা অসুবিধা কি! জীবন মানেই তো যুদ্ধ। যুদ্ধ না করলে চলবে কেন? বাবা পিতামহেরা সিপাহী হয়ে কত দেশ দেশান্তর ঘুরেছেন। শেষ বয়সে ফিটের এসে শান্তিতে মরতে পেরেছেন কি? না—ভারতবর্ষেই ফিরতে পারেন নি। ওর ঠাকুরদা কৈত হয়েছেন আর্মানীর লড়াইয়ে—ফ্রান্সের মাটি কেনা ছিল তাঁর। এক কাকা মেসোপটেমিয়ায়—আর এক কাকা

তক্তকে মাটি নিয়েছেন। বাবাও অথম হয়ে ফিরেছিলেন দেখে। পেন্‌শান পেতেন মাস মাস। কিন্তু ভারত ভাগের আগুনে পুড়ে মরলেন নিজের ভিটেয়। বড় লোকের ইজ্জৎ বাঁচাতে গিয়ে মরলেন।

একটু থেমে বলল, সবই নসীব। আমরা কোন রকমে পালিয়ে এলাম। বাঁচলাম, তবু যুদ্ধ থামল না। যুদ্ধ করেই চলেছি। আগে দিল্লী ষ্টেশনের বাইরে মাল বইতাম—কুলির কাজ—তারপর মোটর কারখানায় মজুরের কাজ। তারপর পুনায় গিয়েছিলাম মিলিটারি ট্রেনিং নিতে। বেশী সৈন্য রাখার নিয়ম ছিল না তো—চাকরি হলো না। আবার এলাম দিল্লীতে। দু'চারটে কল কারখানা ঘুরে এলাম নালোথেরিতে। নিজেদের একটা আস্তানা বানিয়ে নিলাম। তারপর এখানে। রিক্‌শা ভাড়া নিই—দৈনিক হারে। মহাজনকে টাকা মিটিয়ে যা থাকে খাওয়া পরা হয়েও কিছু জমে। হাঁ—বাড়ীতেও পাঠাই টাকা। মা আছে, দু'টো বাচ্চা বোন আছে। ভাই নেই। মা-ও কিছু উপায় করে। আচার তৈরী করে—বড়ি পাপর তৈরী করে। চাচর বোনে। ওরাও কিছু জমায়—আমিও জমাই। টাকা জমিয়ে রিক্‌শা কিনব একখানা। তখন বেশী বেশী জমবে টাকা—আরও রিক্‌শা কিনব। তারপরে কোনমতে যদি একখানা লরি কিনতে পারি—

সেই সম্ভাবনার কথা মনে আসতেই ওর সর্বাঙ্গ অস্থির হয়ে উঠল। শন্ শন্ করে এগিয়ে চলল রিক্‌শা।

রিক্‌শা খানেশ্বর শহরের মাঝখান দিয়ে চলছিল। অত্যন্ত পুরাতন শহর। বহুকালের যুদ্ধ ও লুণ্ঠনক্ষত এখনও এর সর্বাঙ্গে। ইঁটবারকরা খোয়াওঠা অসমতল পথ—ঝরঝর শব্দ তুলে কোনমতে টাল সামলে রিক্‌শা ছুটছিল। পাতলা ইঁটে গাঁথা পুরনো বাড়ীগুলো মিলে শহরটাকে ঝুরঝুরে করে রেখেছে। মানুষজন বেশির ভাগই ময়লা কাপড় জামা আর রুক্ষ চেহারা নিয়ে পথ চলছিল। পথের দুধারে রোয়াকে বা দোকানঘরে বসে যারা গল্প করছিল—যারা আনাজ পাতির গাড়ী ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল—যারা দোকানে জিনিসপত্র কিনছিল—সকলকারই যেমন হতছাড়া ভাব। মানুষজন—দোকান-পসার—বাড়ীঘর সব থেকেও শূন্যতাকে দূর করতে পারছে না।

অর্জুন সিং বলল, এখানকার বেশীর ভাগ লোকই পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গেছে—যেমন আমরা চলে এসেছি ওদিক থেকে। ওই দেখুন বড় মকবারাটা খাঁ খাঁ করছে। ওখানে এখন সরকারী ইস্কুল বসে।

ওরই সামনে দিয়ে রিক্‌শা কাঁচা রাস্তায় এসে পড়ল।

বললাম, সে-ও তো তের বছর উৎরে গেছে—এতদিনে একটা শহর জমজমাট হয়ে ওঠা উচিত নয় কি?

ও হেসে বলল, হবে একদিন। তবে মানুষ সুস্থ না হলে শহরের স্বাস্থ্য ফিরবে কি করে। আমরা নীলোথেরিতে নতুন বাড়ীঘর তৈরী করেছি তবু—সবদিক সামলে উঠতে পারিনি। নতুন মাটিতে নতুন করে গাছ পুঁতলে ফল তো সঙ্গে সঙ্গে ফলে না। সময় নেয়। গাছ বড় হবে—ফুল ফুটবে—ফল ধরবে—

ওর কথা বেশ লাগছিল। আরও শুনতে ইচ্ছা করছিল। বললাম, তা বটে, ফুল না ফুটলে গাছের শোভা কি! ঘর বানালেই তো বসতবাড়ী তৈরী হয় না—সাধী টাধি করে সংসারে রোশনাই না আনলে—

ওর মুখখানা চক্‌চক করে উঠলো। খুশি উপচানো স্বরে বললো, ওহি বাত বাবুজী। চিরাগ না জ্বললে ঘর আবার ঘর নাকি!

আলাপের সুতো ধরে আরও একটু অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করলাম। ঠিক বলেছ সিংজী। তা তোমাদের ঘরে চিরাগ জ্বালার ব্যবস্থা নিশ্চয় হচ্ছে।

বেশক। লজ্জিত হাসে মুখখানা ভাঙ করলে অর্জুন সিং।

এতক্ষণে বাস্তহারা শিখ যুবকের সংসার রচনার মূল-উৎসটির ধারে পৌঁছলাম যেন। শ্যামল বাংলার সংসার পদ্মে যে মধু সঞ্চিত হয়ে যুবমনে কর্ম প্রেরণা সঞ্চার করে—ভিন্নতর পরিবেশে রুক্ষ শুষ্ক ভূমি-গর্ভেও সেই মধুবিন্দু অলক্ষিতে জমে ওঠার সুযোগ পায়। আসলে সব দেশের মানুষই বাস্তব আর কল্পনাকে একই মনের পাশাপাশি রেখে সংসার রচনা করে।

পরের দিন। দেহ্‌ওয়া রোড ধরে চলেছে গাড়ী। চলেছে জ্যোতিঃসর। বাঁ দিকে কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানা। মাঠের বুকে নতুন একটা শহর গড়ে উঠছে।

মাঠের পর মাঠ—অফুরন্ত মাঠ পার হয়ে চলেছি। কূলকিনারা নাই মাঠের। একদা অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা শক্তি পরীক্ষার্থে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল এই বিপুল বিস্তারের মাঝখানে। প্রায় চল্লিশ লক্ষ লোক দশ বিশ ক্রোশ জুড়ে বিশাল দুটো শহর তৈরী করেছিল। তারপর সেই বিশাল শহর দু'টো সৈন্য সামন্ত সমেত নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল আঠারো দিনের যুদ্ধে। সেই চিহ্ন বয়ে এখনও এখানকার মাটি লাল।

এসব কথা আমি জানি—রিকশা চালকও কিছু কিছু শোনালো। জ্যোতিঃসরে পৌঁছে বলল, ভাল করে দেখুন। ওই যে উঁচু জায়গাটা দেখছেন—ওইখানে রথ থামিয়ে অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছিলেন ভগবান।

বললাম, গীতা তুমি পড়েছ নিশ্চয়!

ও মাথা নাড়লে, না বাবুজী—শুনেছি কিছু কিছু।

বললাম, গীতা প্রত্যেকের পড়া উচিত। শ্রীকৃষ্ণ যা বলেছিলেন—

ও বলল, আগে জায়গাটা দেখুন বাবুজী—তারপর আপনার মুখে শুনব।

জ্যোতিঃসর দেখে ফিরছিলাম। সামান্য বিহ্বল-অন্যমনা। কিছুক্ষণের জন্য সেই মহাযুদ্ধের সন্ধিক্ষণে ফিরে গিয়েছিলাম যেন। একটা উঁচু টিলার উপরে উঠে সামনে পিছনে বামে দক্ষিণে যখন অকূল সমুদ্রের মত মাঠ দেখতে পেলাম—কিছুতেই পা রাখতে পারলাম না বর্তমানের মাটিতে। পা পিছলে গেল মাটি থেকে—মন উজিয়ে গেল কালের স্রোত ঠেলে। ছবির মত দেখলাম—দক্ষিণে পাণ্ডব বাহিনী—বামে কৌরব চমূ-মাঝখানে নিশ্চল রথে শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুন।

অর্জুন দেখলেন দু'পাশে রথ অশ্ব গজ পদাতিকের সমুদ্র। দেখলেন শত্রু মিত্র দুই পক্ষকে। দুই পক্ষই—আত্মীয় জ্ঞাতি বন্ধু-বান্ধব ভরা। এদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে হবে—এই আত্মীয় স্বজন ভাই বন্ধু জ্ঞানক শিক্ষক নিধনযজ্ঞে তিনি হবেন হোতা! নির্বেদ উপস্থিত হল অর্জুনের। বললেন, না—যুদ্ধ করব না।

পরেই উত্তর দিলেন শ্রীকৃষ্ণ। শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করে—শুধু শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করে নয়—মনস্তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করে মানুষের প্রবৃত্তি নিবৃত্তির মর্ম কথাটি ব্যাখ্যা করে তার সমাজনীতিকে একটি ভারসাম্যে স্থিত করে উপদেশ দিলেন। অদ্ভুত সেই বাণী। ধার্মিকরা বলেন—সর্ব ধর্মের সার কথা, রাজনীতিজ্ঞরা বলেন—সর্বোত্তম রাজনীতি, সমাজহিতৈষীরা উৎকৃষ্ট সমাজতন্ত্রের সন্ধান পান তার মধ্যে। যার যেমন বিদ্যা আর রুচি তার চিন্তাধারাতে সেই মত ছায়াপাত করে সেই বাণী।

ফিরছিলাম বিহ্বল মনে।

রিকশা চালক সেহ্‌ওয়া রোডে এসে বলল, এইবার বলুন তো—ভগবান কি বলেছিলেন? এই বেলা শুনে নিই—আর হয়তো শীঘ্র শুনতে পাব না।

আশ্চর্য হয়ে বললাম, তার মানে? এখানে কি কেউ গীতার আলোচনা করেন না।

অর্জুন সিং বলল, করবেন না কেন—আমাদের শোনবার সময় কই। এই তো আসছে সপ্তাহে চলে যাব লড়াইয়ে—তখন কি আর ফুরসুৎ থাকবে।

বললাম, লড়াই-এ যাবে! বেশী মাইনে পাবে বুঝি?

ও হেসে উঠল, মাইনে! মাইনের কথা কে বলছে! কতই বা পাব। তার চেয়ে রিকশা চালিয়ে বেশী রোজগার করি।

বললাম, তবে যাচ্ছ কেন পল্টনে!

হঠাৎ গাড়ীর গতি মন্থর হল। ও অবাক হয়ে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল আমার পানে। বলল, যাব না? আমরা জোয়ানরা যদি না যাব তো দেশ রক্ষা করবে কারা? দুশমনের সঙ্গে মোকাবিলা করবে কারা?

উত্তেজিত হওয়াতে মাথাটা ওর বেশী করে দুলে উঠলো। অমনি পাগড়ীটা আলগা হয়ে ঝাঁকড়া চুলগুলো কাঁধের উপর পড়লো ছড়িয়ে। বাতাসের ঠেলায় সেগুলো কেঁপে এমন হয়ে উঠল—যেন কেশর ফোলানো একটি ক্রুদ্ধ সিংহ থাবা গেড়ে বসেছে আমার সামনে। আমি অবাক হয়ে ক্ষত্রিয়-বীর্যের এই আশ্চর্য উন্মেষ দেখছিলাম।

গাড়ীটা থামিয়ে সীটের উপর বসেই ও পাগড়ীটা ঠিক করে নিলে। তারপর প্যাডেলে পায়ের চাপ লাগিয়ে বলল, এইবার বলুন—ভগবান কি বলেছিলেন?

বললাম, এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে না শুনলে সে কথা ভাল করে বোঝানো যাবে না।

একটু ভেবে অর্জুন সিং বলল, ঠিক আছে। কাছেই তো স্টেশন—আপনি বেড়াতে আসবেন—আজ বিকেলে? আমিও যাব।

তখন যদি কোথাও ভাড়া নিয়ে চলে যাও?

না—যাব না। ও বেলা রিকশা বার করব না। আমার দু'জন আত্মীয় আসছে আম্বালা ক্যান্ট থেকে—নীলোখেরি যাবে। ওরা এখানে নামবে না—ওদের সঙ্গে দেখা করতে যাব স্টেশনে।

আমি যখন স্টেশনে পৌঁছলাম—গাড়ীটা তখন ছাড়ে-ছাড়ে। এদিক ওদিক চেয়ে দেখি একটা কামরার সামনে হাসিমুখে অর্জুন সিং দাঁড়িয়ে আছে—আর জানালায় ঝুঁকে পড়ে একটা যুবতী মেয়ে হাত নেড়ে হেসে হেসে গল্প করছে। তার পাশে এক প্রৌঢ়া—তারও হাসিমুখ। গাড়ী ছাড়ার আগে

ওদের হাসি আর গল্প দুই-ই যেন জমে উঠল। তারপর এক সময়ে গাড়ী নড়ে উঠল—অর্জুন সিং কামরার ধারে ধারে আস্তে আস্তে পা ফেলতে লাগল। মেয়েটি একবার ওর হাতখানা চেপে ধরল—হাসল—কি যেন বলে যেতে লাগল অনর্গল। গাড়ীর গতি বাড়ল—অর্জুন সিংএর গতিও দ্রুত হ'ল। শেষ পর্যন্ত গাড়ীর গতি দ্রুততর হতে অর্জুন সিং থেমে গেল। ট্রেনটা দৃষ্টির বাইরে চলে না যাওয়া পর্যন্ত ও একদৃষ্টে চেয়ে রইল সেই দিকে।

এইবার আমি ওর সামনে এলাম।

আমায় দেখে ও হাসিমুখে বলল, এসেছেন বাবুজী। চলুন বেঞ্চিতে বসি।

চলতে চলতে বললাম, ওঁরা বুঝি তোমার নিকট আত্মীয়?

হাঁ বাবুজী। মুখটা নামিয়ে নিলে হঠাৎ। একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, এই মাসেই সাদীটা হয়ে যেত—তা আমি তো যুদ্ধে যাচ্ছি—

আশ্চর্য হয়ে বললাম, ওই কথা ওদের বললে বুঝি।

বলব না! অর্জুন সিং ঘাড় নেড়ে হাসল। এই খবরটা বলবার মতই তো। শুনে প্রেম-কুমারী ভারি খুশি। বললে, বাঃ বেশ হবে তাহলে। তুমি যুদ্ধে গিয়ে একটা মেডেল টেডেল নিয়ে আসবে—আরও উঁচু পদে উঠবে—সুবেদার হাবিলদার হয়ে ফিরবে—তাহলে খুব ভাল হবে। আমি তোমাদের জন্যে পশমী মোজা, সোয়েটার, জাম্পার, বাকলার বুনে পাঠিয়ে দেব।

বললাম, সে তো ভাল কথা। কিন্তু যুদ্ধটা কি দু'চার দিনেই খতম হবে?

ও হেসে উঠল, দু'চার বছরে নিশ্চয় খতম হবে। দুশমনদের আমরা বেশীদিন থাকতে দেব নাকি আমাদের জমিনে! আঃ, ছুটে যাবার জন্য দিন গুনছি।

বললাম, তা এখনই তো যাচ্ছ না। ট্রেনিং নিতেই দু'মাস কেটে যাবে।

ও মাথা নেড়ে বললে, না—না, ট্রেনিং তো নেয়াই আছে—মাত্র দিন পনেরো লাগবে। তারপরেই ছুটে যাব।

কোথায়? লাডাকে, না নেফায়? শুধোলাম।

শুনছি তো নেফায়। ওখানেই লড়াইটা জমে উঠেছে।

কথা বলতে বলতে আমরা একখানা বেঞ্চিতে এসে বসলাম। ওর চকচকে মুখখানার সঙ্গে মেয়েটির হাসিমাখা জমিটুকু মিশিয়ে নিচ্ছিলাম ততক্ষণে। আর ভাবছিলাম নেফার রণাঙ্গনে জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্ব।

বেঞ্চিতে বসে ও বলল, এইবার বলুন গীতার কথা—যা ভগবান বলেছিলেন অর্জুনকে।

গীতার সেই শ্লোকটি অবশ্য মনে পড়ল—কিন্তু চিরাচরিত প্রথার ব্যাখ্যা করতে ইচ্ছা হ'লো না। ওর জীবনোচ্ছল মুখের পানে চেয়ে আর একটি প্রাঞ্জল অর্থ আবিষ্কার করলাম সেই মুহূর্তে।

বীরবলের কৌতুক

বরুরুচি

এক কবির সম্রাট আকবরকে একটি কাকাতুয়া উপহার দিয়েছিল।

পাখীটি দেখতেও যেমন সুন্দর তেমনি ছিল তার বুলি। কয়েকটা কথা শিখেছিল আর সম্রাটকে দেখলেই সেই কথাগুলি আওড়াতো।

কাকাতুয়াটি সম্রাটের ভারী প্রিয় ছিল। তার জন্যে সোনার খাঁচা তৈরী করে দিয়েছিলেন আর উজীরকে বলে একজন ওস্তাদ ভৃত্য নিযুক্ত করিয়েছিলেন, যার একমাত্র কাজ ছিল সেই পাখীর দেখাশোনা করা।

ফুলবাগিচার ওপরের কামরায় কাকাতুয়াটিকে রাখা হল। রাজকাজের ফাঁকে সময় পেলেই তার প্রিয় পাখীটির কাছে গিয়ে তাকে আদর করে আসতেন।

কড়া হুকুম জারি করেছিলেন সম্রাট: তিনি দরবারে ব্যস্ত থাকলেও দুবেলা কাকাতুয়ার সংবাদ চাই, যদি তার অসুখবিসুখ করে তাহলে তৎক্ষণাৎ তা যেন সম্রাটকে জানানো হয়, কিন্তু তাঁকে যে তার মৃত্যু সংবাদ দেবে তার গর্দান যাবে।

বিচিত্র আদেশ পক্ষীপালক ভৃত্যটি তো প্রাণ হাতে করে পাখীটির দেখাশোনা করতে লাগল, কিন্তু দুর্দৈব। একদিন রাত্রে কাকাতুয়াটির অসুখ করল এবং পরদিন প্রাতে দেখা গেল পাখীটা মৃত অবস্থায় খাঁচায় ঝুলছে।

সর্বনাশ! এখন এখবর যে সম্রাটকে জানাবে তার তো গর্দান যাবে। অথচ সেই ভৃত্যটি ছাড়া এসংবাদ সম্রাটকে দেবেই বা কে? ভৃত্যটি প্রাণভয়ে দিশাহারা হল।

একবার করে সে দরবারের কাছে যায়, আবার ফিরে আসে। সম্রাটের কাছে যাবার সাহস হচ্ছে না তার। এমন সময় সে দেখলে, বীরবল সভায় আসছেন। সে তাড়াতাড়ি গিয়ে একেবারে বীরবলের পায়ের ওপর পড়ল।

বীরবল চমকে উঠলেন—কী ব্যাপার।

—হুজুর, আমায় বাঁচান।

সবিস্ময়ে বীরবল বললেন—হয়েছে কি!

ভৃত্যটি তখন কাকাতুয়ার মৃত্যু সংবাদে তাঁকে জানালে। সেই সঙ্গে সম্রাটের আদেশও তাঁকে জানিয়ে দিলে।

বীরবল বললেন—হাঁ, শুনেছি বটে। সম্রাট এই রকম একটা অদ্ভুত হুকুম জারি করেছেন। যাই হোক তুমি ভেবো না খবরটা আমিই তাঁকে জানাবো। এই বলে বীরবল বাগানে গিয়ে মরা পাখীটাকে একবার দেখে এলেন।

বীরবল দরবারে প্রবেশ করতেই বাদশা বললেন—এসো, বীরবল। মেজাজ শরীফ।

বীরবল বললেন—হাঁ খোদাবন্দ। আছি ভালই। তবে আমাদের কাকাতুয়াটি…

এই বলে বীরবল থামলেন।

সঙ্গে সঙ্গে বাদশা বললেন—কী হয়েছে। সে কি মরে গেছে?

বীরবল ঘাড় নেড়ে বললেন—না, খোদাবন্দ। সে কি মরতে পারে। সে একজন মহা তপস্বী। বর্তমানে সে বোধ হয় গভীর ধ্যানে মগ্ন আছে। দাঁড় থেকে সে ঝুলে পড়েছে, তার দুচোখ বোজা। সারা দেহ স্থির অচঞ্চল। সে যেন ভাব-সমাধির মধ্যে তলিয়ে গেছে।

অসহিষ্ণু হয়ে সাহানশা বললেন—এসব তুমি কি বলছ! সোজা কথায় বল না সে মরে গেছে।

—তা কেমন করে বলি হুজুর। আমার তো বোধ হয় সে কোন যৌগিক ক্রিয়া করছে। আপনি একবার গিয়ে দেখবেন নাকি।

বাদশা বললেন—নিশ্চয়। চল এখনি যাই।

রাজকর্ম স্থগিত রেখে তিনি উঠে পড়লেন।

বীরবলের সঙ্গে ফুলবাগিচায় এসে শুন্য ঘরে ঢুকে পাখীটাকে একনজর দেখে নিয়েই আকবর বললেন—বীরবল। এ তো মরে গেছে!

—তাই নাকি জনাব।

—নিশ্চয়! দেখলেই তো বোঝা যায়। বাদশা বললেন—কী আশ্চর্য। তোমার মতো একজন বিজ্ঞ লোক এটা বুঝতে পারল না। তুমি না নিজেকে খুব বুদ্ধিমান বলে প্রচার কর। এই তোমার বুদ্ধি! দরবারে এটা আমায় জানালে, আমাকে এভাবে জরুরী কাজ ফেলে আসতে হত না।

হাত জোড় করে বীরবল বললেন—সম্রাট। আপনার বিচিত্র হুকুমটি দয়া করে স্মরণ করুন।

—কি হুকুম।

—আপনি আদেশ জারি করেছিলেন, কাকাতুয়ার মৃত্যু সংবাদ যে আপনাকে জানাবে, তার গর্দান যাবে। সুতরাং সরাসরি এই সংবাদ আপনাকে দিয়ে আমার গর্দানটি হারাবার ইচ্ছে ছিল না খোদাবন্দ!

সম্রাট আকবর ব্যাপারটা বুঝলেন। বললেন—আর একবার তোমার বুদ্ধির তারিফ করতে হল আমায়। সত্যিই বড় গোলমেলে হুকুম জারি করেছিলাম।

শিল্পী সুন্দর রসবস্তুর স্রষ্টা।
শিল্পকে প্রকাশ করে শিল্পীকে প্রচ্ছন্ন রাখাই আর্টের লক্ষ্য।

—অস্কার ওয়াইল্ড

জেলেপাড়ার সঙয়ের ছড়া নিয়ে মামলা

—বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

সেকালের কলকাতায় চৈত্র সংক্রান্তির দিন বার হতো জেলেপাড়ার সঙ। যে যে পথে সঙ ঘুরতো সেই সব পথের দু-ধারে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকতো মানুষ। সারি সারি ঘোড়ার টানা বগি গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যেত সঙয়ের পরিক্রমার পথে। গাড়ীর ছাদে বসে অনেকে সঙ দেখতেন। তা'ছাড়া পথের দু-পাশে বাড়ীর ছাদে ও বারান্দায় অসংখ্য নরনারী ব্যাকুল আগ্রহে সঙ দেখবার জন্য প্রতীক্ষা করতেন। বিপুল উদ্দীপনা এবং আনন্দ উত্তেজনার মধ্য দিয়ে বার হতো কলকাতার জনপ্রিয় সমারোহ জেলেপাড়ার সঙ।

সেকালে মানুষের মধ্যে ছিল স্ফূর্তি। নিজেরা সঙ সেজে কষ্ট করে অন্যদের আনন্দ দিতেন। তার জন্য ছিল কত উৎসাহ। শারীরিক এবং মানসিক শক্তিতে তাঁরা ছিলেন বলীয়ান। তাই তাঁদের পক্ষে চৈত্রমাসের গরমে মাথার ওপর মধ্যাহ্নের খরতাপ তার ভেতর সঙ সেজে পথে বার হওয়া সম্ভব হতো। যদিও এটা আরামদায়ক মোটেই নয়। কিন্তু নিছক অন্যকে আনন্দ দেবার জন্যই এত আয়োজন। একে সহস্র মানুষের চাপ এবং যানবাহনের ভিড়ে রাস্তায় প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম, এর মধ্যে জেলেপাড়ার সঙয়ের অভিনেতারা কষ্ট করে পথের মানুষকে আনন্দ দান করতেন। সেকালের সঙয়ের পরিক্রমার ট্রাম রাস্তা ছিল পাথর বাঁধানো। পাথর রৌদ্রে গরম হয়ে থাকতো। তার ওপর দিয়ে খালি পায়ে চলা খুবই কষ্টকর ছিল। কিন্তু বহু সঙ পায়ে ঘুঙুর বেঁধে খালি পায়ে নাচতে নাচতে যেতো। সে সব কথা ভাবলে বিস্ময় লাগে। সেকালে দূরের মানুষকে শোনাবার জন্য "লাউড স্পীকারের" ব্যবস্থা ছিল না। যাতে দূরের মানুষ শুনতে পায় সেজন্য সঙয়ের অভিনেতারা চিৎকার করে ছড়া কাটতেন। দর্শকরা বিশেষ আগ্রহ সহকারে দাঁড়িয়ে থাকতেন ছড়া ও গান শোনার জন্য। সেকালের মানুষ ছিল কৌতুকপ্রিয়। নিজেরাও হাসতেন এবং অন্যকে হাসাতে পারতেন। হাসির কথায় নাসিকা কুঞ্চিত করতেন না। প্রাণখোলা হাসি ও রঙ্গ পরিহাসই ছিল মূলধর্ম।

কলকাতার রাজপথে যখন জেলেপাড়ার সঙ বার হতো সে সময় ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে রঙ্গ পরিহাসের রসাস্বাদনে সকলেই আনন্দ লাভ করতেন।

জেলেপাড়ার সঙয়ের কর্তৃপক্ষরা সঙয়ের ছড়া বা গানা ছাপাতেন না। সেই কারণে কি নতুন ছড়া বার হবে তা' আগে থেকে জানা যেতনা। সেকালের বহু শক্তিশালী লেখক ও কবিরা এগিয়ে এসেছিলেন জেলেপাড়ার সঙয়ের ছড়া, গান ও গানা লেখার জন্য। যেমন—অমৃতলাল বসু, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন গোস্বামী, সতীশচন্দ্র ঘটক, নিত্যবোধ বিদ্যারত্ন, শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। তা' ছাড়া হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, সজনীকান্ত দাস, কবিশেখর কালিদাস রায়, শরৎ পণ্ডিত প্রমুখ সাহিত্যিক ও কবিরা জেলেপাড়ার সঙয়ের জন্য বহুবার বহুসেবা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন।

প্রথমদিকে অর্থাৎ প্রায় শতবর্ষ পূর্বে যাঁরা গান ও ছড়া রচনা করতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ছপচায় পক্ষী, ওরফে দাস ও নেপালবাবু। পূর্বেই উল্লেখ করেছি জেলেপাড়ার সঙয়ের কর্তৃপক্ষরা

ছড়া বা গানা ছাপাতেন না। কিন্তু সেকালে কোন কোন ব্যবসায়ীবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা নিজেরাই ছড়া লিখে বই ছাপিয়ে বিক্রী করতেন। সেই সব বই বার হতো ১৬ থেকে ৪৮ পৃষ্ঠার মধ্যে। দাম দুই পয়সা থেকে পাঁচ পয়সা। কোন কোন বইতে থাকতো লোজা সেফটিপেড কিম্বা আয়ুর্বেদীয় ঔষধ প্রভৃতির বিজ্ঞাপন। বইগুলির নাম—"চৈত্র সংক্রান্তির ছড়া", "চড়ক সংক্রান্তির ছড়া", "চৈত্রমাসের ছড়া' ইত্যাদি। কোন কোন বইতে জেলেপাড়ার সঙয়ের প্রথম দিকের অর্থাৎ প্রায় শতবর্ষ পূর্বেকার জেলে পাড়া সঙয়ের একটি গান যাহা সেকালের বিখ্যাত কবি রূপচাঁদ পক্ষীর লেখা বলে শোনা যায় সেই গানটিও থাকতো। সেই গানটি হলো—"সোনার খোকা" বর্তমানে এই গান রুচিসঙ্গত নয় বলেই সম্পূর্ণ উল্লেখ করলাম না। উল্লিখিত বইগুলি প্রসঙ্গে জেলেপাড়ার সঙ সম্বন্ধে একমাত্র অভিজ্ঞ ব্যক্তি শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় বলেন—

"সেকালে এক শ্রেণী ব্যবসায়ীবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা ছড়া রচনা করে ছাপিয়ে বিক্রয় করতেন। তাঁদের সঙ্গে জেলেপাড়ার সঙয়ের কর্তৃপক্ষের কোন সম্পর্ক ছিল না। সেকালে এই বইগুলিকে বলা হতো "বটতলার" বই। বর্তমানে ঐসব বইয়ের উল্লিখিত ছড়াগুলিকেই যদি মনে করা হয় জেলেপাড়ার সঙয়ের ছড়া তা' হলে ভুল হবে। উক্ত বইগুলির মধ্যে কোন কোন ছড়া ও গানের মধ্যে জেলেপাড়ার সঙয়ের ছড়া ও গানের প্রায়ই কয়েক লাইন নিয়ে জোড়া তালি দিয়ে ঐসব ব্যবসায়ীরা বই বার করতেন। ছড়াগুলিও তাঁদের মনগড়া। কিন্তু কোন কোন বইতে জেলেপাড়া সঙয়ের কয়েকটি ছড়া ও গান দেখা যায়।"

"জেলেপাড়ার সঙ" নামে একটি বই প্রকাশিত হয়েছিল চৈত্র, ১৩০২ সালে। বইটির প্রথমেই উল্লেখ দেখা যায় —

"জেলেপাড়ার সঙ বের হচ্ছে শুনে লোকের মুখে,
বৎসরের হিসাব নিকাশ সবার কাছে নিয়ে এলুম বুকে।
একটি আনা খরচ করে
নিয়ে যাও যতনে ঘরে।
মনের সাধে বসে পড়ে
শুনাও সবায় ঘরে।"

অথচ কলকাতার হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার জন্যে উক্ত বছরে কোন সঙ বার হয়নি। সেই কারণেই তার পরের বছরে সঙয়ের মুখদিয়ে বলা হয়েছিল—

"বিগত বত্রিশ সন
পাননি সঙয়ের দরশন,
তার কারণ, পুলিশের বারণ—
ক্ষমা ভিক্ষা তাই করছি নিবেদন।"

ইত্যাদি—

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় বললেন—"সেই কারণেই ১৩০২ সালের প্রকাশিত "জেলে-পাড়ার সঙ" নামে বইটি দেখে যদি কেহ মনে করেন ইহাই সত্যিকারের জেলেপাড়ার সঙয়ের বই তা হলে ভুল হবে।"

মনোমোহন গোস্বামী লিখিত "হোমরুল" পালা প্রসঙ্গে শ্রীবিশ্বাস মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন—

"মনোমোহন গোস্বামী লিখিত "হোমরুল" পালা জেলেপাড়ার সঙ্ঘের কর্তৃপক্ষরা গ্রহণ করেছিলেন। এবং সঙ্ঘের যুবদিয়ে উক্ত পালার ছড়া কাটানো হয়েছিল। কিন্তু সে বছর অর্থাৎ ১৩২৪ সালে সঙ্ঘের পরিক্রমার পথে অনেকের চোখে পড়ে "জেলেপাড়ার সঙ" নামে বই। ঐ বইতে ছাপা হয়েছিল মনোমোহন গোস্বামী লিখিত "হোমরুল" পালার ছড়া ও গান। যা রাজপথে বিক্রয় করা হচ্ছিল। তা' দেখে জেলেপাড়ার ছেলেরা আপত্তি জানায়। কথায় কথা বাড়ে। তর্ক-চিৎকার বাড়তে থাকে। এমন কি তৎকালীন জেলেপাড়ার সঙ্ঘের কর্তৃপক্ষের সহিত বিবাদ ঘটে এবং সেই বিবাদের ঢেউ পুলিশ থেকে কোর্ট পর্য্যন্ত গড়ায়।"

ছেড়ে আসা দিনের কথা যা' সংগ্রহ করা হয়েছে তা' এখানে লিপিবদ্ধ হলো। এবার "হোমরুল" পালার কিয়দংশ উল্লেখ করলাম :—

"এ'বার পা'ব যে হোমরুল,
তা'র নাইক কোন ভুল।
ওই এসেছিল মণ্টেগুরা,
লাগাবে হুল খু॥
(এ'বার পা'ব যে হোমরুল।)
ছিলুম যখন কমিশনার,
দেখেছ ত ভোটের বাহার।
বড় কেউ কেটা নয়—'এম পি' হ'লে,
দেখবে তখন ইশের মূল॥
(এ'বার পাব যে হোমরুল।
—ইত্যাদি।

উক্ত পালার গানটি—
'লা'পল দেশে হুলুস্থুল—পা'ব যে হোমরুল।
চ'খ রাঙ্গিয়ে চুনোপলি—বাগিয়ে ধরে বিষমরুল॥
কেউ আল্লাদে আটখানা, কেউ দেখেন ধরা সরাখানা,
কা'রও মুখে ভুবড়ি ছোটে, কেউ শুকনো ডালে কোটান মূল॥"

—ইত্যাদি।

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় আরও বললেন—"মনোমোহন গোস্বামী ছিলেন সেকালের গ্রাজুয়েট অভিনেতা। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে শিশির ভাদুড়ী, নরেশ মিত্র প্রমুখ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রদের যোগদানের বহুপূর্বে তিনি অভিনয়ে যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কয়েকটি নাটকও লিখেছিলেন। তাঁহার লেখা ঐতিহাসিক নাটক পৃথ্বীরাজ, শিবাজী, সামাজিক নাটক সংসার ও কর্মফল।"

———

এই প্রথম

নীড় ভাঙা ঝড়

গীতা সেন

শেষ পর্য্যন্ত বেশ জোরেই বৃষ্টি সুরু হ'ল। বিকেল থেকেই আকাশের অবস্থা ভালো ছিলোনা। একটু রাত বাড়তেই সুরু হ'ল ধারাবর্ষণ। মফস্বল শহর। এসময়টাতে এমনিতেই লোক থাকেনা পথে। তাতে আবার আজকের এই প্রচণ্ড বর্ষণ। তাই একেবারেই নির্জ্জন ছিলো সহরের বুক-চিরে যে রাস্তাটা বেরিয়ে গেছে সোজা, অনেকদূর পর্য্যন্ত সেই রাস্তাটা। সামনে কোন বাধা ছিলনা। গাড়ীর স্পীডটা বাড়িয়েই দিলেন সুমন্ত। সামনের কাঁচখানা স্বচ্ছ রাখতে গিয়ে অনবরত মাথা দুলিয়ে চলেছে ওয়াইপার দুটো। সুমিত্রা বললো—এই দুর্য্যোগ। কেন-যে আজ লোকারটাকে ছুটি দিয়ে দিলে একথাতেই জানিনা বাবা!' হাসলেন সুমন্ত, বললেন, 'কেন এই অধমের হাত দু'টো কি এতই অবিশ্বাস্য? ভাবছো বুঝি আনাড়ি হাতে গাড়ীর স্টিয়ারিংটা ঘুরিয়ে দেব কোন বিপথে।' 'তা কেন? বলছিলাম যে অনেকদিনতো গাড়ী চালাওনি তাই।' সাতবছরের মেয়ে চন্দনা কিন্তু বাবাকে উৎসাহ দিয়ে বললো, '—না বাবা, ভয় পেয়েনা, তুমি গাড়ী চালালে আমার ভীষণ মজা লাগে।'

একটা ঝাঁকুনী খেয়ে গাড়ীটা থামলো। হঠাৎ ব্রেক কষতে বাধ্য হয়েছেন সুমন্ত।

—'একটা মানুষ না? সুমিত্রার দিকে চেয়ে প্রশ্ন ক'রলেন সুমন্ত।—'হবে কোন মাতাল টাতাল। পাশ কাটিয়ে চলোনা।' বিরক্তি ভরা কণ্ঠ সুমিত্রার।

—'না বাবা, উঠিয়ে নিয়ে এসো। বৃষ্টিতে একেবারে ভিজে গেছে লোকটা।' ঝুঁকে পড়ে দেখতে দেখতে বললো চন্দনা।—'তুই থামতো চন্দা, যেমন বাপ তার তেমন মেয়ে। জানা নেই, শোনা নেই রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখলেই তাকে বাড়ী নিয়ে যেতে হবে। সুমিত্রার ধমক খেয়ে চুপ ক'রে থাকে চন্দনা। একটু ইতস্তত: ক'রে সুমন্ত নেমে গেলেন। লোকটার দু'খানা হাতে টেনে তুললেন ভিজে সপসপে দেহটা। গাড়ীর ভেতরে সুমিত্রার পাশে শুইয়ে দিতে দিতে বললেন, 'তুমি সামনে এসো সুমি।' বিরক্তিতে ভুরুটা কুঁচকে উঠলো সুমিত্রার। এ অভ্যেসটা কিছুতেই ছাড়তে পারলেন না সুমন্ত। শত অনুরোধ অভিযোগ জানিয়েও কোন ফল হয়নি তাই আর কিছু বললো না সুমিত্রা। গাড়ীর ভেতরের আলোটা জেলে দিতেই চমকে উঠলো ও, একি, শেখর রাস্তায় পড়ে আছে?

—'খুব বেতী ভোজ হয়ে গেছে বেচারার।' মৃদুহেসে সুমন্ত বললেন। চুপ করে বসে থাকতে চেষ্টা করছিলো সুমিত্রা। তার মনের অশান্ত ঝড়ের খবর রাখবার কথা নয় সুমন্তর তাই সামান্য একটু হেসে প্রশ্ন ক'রলেন-'অমন চুপ ক'রে রইলে কেন? তোমার কি ভয় করছে? অনেক কষ্টে স্বাভাবিক হ'ল সুমিত্রা, বললো, 'ভয় করলে চলবে কেন? তোমারতো আর এ

স্বভাব যাবার নয়।' বাঁ হাতে সুমিত্রার হাতে একটু চাপ দিয়ে সুমন্ত বললেন,—আমার এ স্বভাব পাল্টালে কিন্তু সবচেয়ে দুঃখ পাবে তুমি।' জবাব দিলোনা সুমিত্রা। সে মনের অবস্থাও ওর ছিলোনা, সামান্য ব্যবধান ওর আর শেখরের মধ্যে তবু এখন ওকে স্পর্শ করতে পারবেনা সুমিত্রা। সে অধিকার নেই আজ আর প্রবৃত্তিও নেই। ওর জন্য আজ সুমিত্রার মনে করুণা না ঘৃণা উথলে উঠছে বুঝতে পারছেনা ও।

সকালবেলাও জ্ঞান হ'লোনা শেখরের। ডাঃ নন্দীকে ফোনে জানালেন সুমন্ত। তিনি আশ্বাস দিয়ে জানালেন যে চিন্তার কোন কারণ নেই। সুমন্ত নিশ্চিন্তে কোর্টে যেতে পারেন। সুমিত্রাকে সবরকম নির্দেশ দিয়ে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেই প্রস্তুত হ'ছিলেন সুমন্ত কোর্টে যাবার জন্যে। দু'পা যেমে গিয়ে আবার ফিরে এলেন সুমন্ত, বললেন,—'লোকটি কে, জানো?' শিউরে উঠলো সুমিত্রা। রুদ্ধশ্বাসে অস্ফুট কণ্ঠে বললো,—'নাতো, জানিনা। তুমি কি চেনো ওকে?'—'জানি, কিন্তু অন্য ভাবে, মানে ডায়েরী'টা খুলেছিলাম, অবশ্য ভেতরটা পড়িনি। ইনিই হচ্ছেন তোমার সেই প্রিয় লেখক 'ছদ্মক' আসল নাম শেখর চৌধুরী।' তারপর একটু হেসে বললেন,—'ভক্তের দ্বারে এসেছেন ভগবান, কাজেই যত্নের ত্রুটি নিশ্চয়ই হবেনা, কি বল?'

—'শেখর চৌধুরী মাতাল?' আপনমনেই বলে উঠলো। আপনমনে।

—সত্যিই, এতবড় একটা লোকের এই দুর্গতি দেখলে কষ্টই হয়। জীবনে বড় কোন আঘাত না থাকলে সাধারণতঃ মানুষ এমন হ'তে পারেনা। জ্ঞান হোক, সুস্থ হলে সবটা না হোক কিছুটা জানা যাবে কি বলো! আচ্ছা চলি। সুমন্ত বেরিয়ে গেলেন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো সুমিত্রা। সুমন্ত তাহ'লে ডায়েরীটা পড়েনি। এখনকার মত নিশ্চিন্ত হ'ল ও। পর্দার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখলো সুমিত্রা, শেখরকে ও দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু জ্ঞান এলেও শেখর ওকে দেখতে পাবেনা। পাশা-পাশি ঘরে ওরা দু'জন। মাঝের ভারী পর্দাটাই একমাত্র আড়াল। কিন্তু কতক্ষণই বা নিজেকে আড়াল ক'রে রাখবে ওর কাছ থেকে? আর কেমন ক'রেই বা ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াবে? কি জানতে চাইবে? প্রথমে কি বলবে? এতদিন পর সুমিত্রাকে দেখে শেখর যদি উত্তেজিত হয়ে ওঠে তবে কি করবে ও? তারপর, শেখরের প্রকৃত পরিচয় যদি প্রকাশ হয়ে যায় সুমন্তর কাছে, তখন সুমিত্রা মুখ দেখাবে কেমন করে সবার কাছে? সুমন্ত কি আগের চোখেই সুমিত্রাকে দেখবেন না করুণা করবেন? ভাবতে পারেনা সুমিত্রা।

কেমন ক'রে এরই মধ্যে দশটা বছর কেটে গেছে চিন্তা করতেও অবাক লাগে। আজ মনে হ'চ্ছে, এইতো সেদিনের কথা। শেষ বারের মত শেখরের মুখের দিকে একবার চাইতে চেষ্টা করেও পারেনি সে। সে সাহসও বুঝি তার ছিলোনা। যে মিথ্যের বোঝা শেখরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে সে, সেই মিথ্যেকে বিনা প্রতিবাদে মাথা নীচু করে মেনে নিয়েছে ও। ও হয়ত বুঝেছিলো ভিত আল্গা হ'লে দালান ভেঙেই পড়ে। তাকে হাজার জোড়াতালি দিলেও টেঁকানো যায় না। তাই চুপ করেই ছিলো সে। কোর্ট থেকে বেরিয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলো সুমিত্রা। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কৃষ্ণচূড়া গাছটার যে অজস্র রক্ত প্রদীপের সার জ্বলতো এতদিন সেগুলো একনিমেষে নিভে গেল কেমন ক'রে? আর পল্লবের বসন্তের অমন সোনালী রোদ্দুরের এমন কালো রং হয়ে গেল কি ক'রে? পা দুটো অবশ লাগছিলো। মামা মেঘনাদ বিশ্বাস গম্ভীর গলায় বললেন—'এত নার্ভাস

হ'লেও চলবেনা মিতু। মনকে শক্ত করো। বি ষ্ট্রং।' মামাতো বোন কথা হাতের সোনালী রঙের বটুয়াটা দোলাতে দোলাতে বললো,—'তুই বড্ড বেশীরকম সেন্টিমেন্টাল মিতুদি। আমি হ'লে দেখতিস গান গাইতে গাইতে বাড়ী ফিরতাম। ভেবে ছাখতো, তুই আজ স্রি আর বিরক্তিকর 'মিসেস চৌধুরী' বলে কেউ ডাকবেনা। 'মিস রয়' বলে যখন স্রাবে সবাই ডাকবে তখন তোর কেমন একটা আনন্দ হবেনা? বেশ থ্রিলিং, তাইনা? চল্‌চল্ বাড়ী গিয়ে দু'জনে গলা মিলিয়ে গাইবো,—আজি পরাণে দক্ষিণা বায়ু লাগিছে ·····মৃদু ধমক দিলেন মেথনাদ,—'আঃ তুমি একটু থামবে কমি?' কারো কোন কথার জবাব দিতে পারেনি সুমিত্রা, শুধু বুঝেছিলো তার মনের গহনে যে বেদনার গ্লানির সৃষ্টি হ'ল তার সমব্যথী কেউ নেই। সে আজ বড় একলা, বড়ই অসহায়। বাড়ীতে এসে অবসন্ন দেহটা বিছানায় এলিয়ে দিয়ে চুপ ক'রে শুয়েছিলো সুমিত্রা। মনে হ'তে লাগলো পৃথিবীর সব শুঞ্জনে একেবারে থেমে গেছে। সব আনন্দ নিঃশেষ হয়ে গেছে। শেখরের কাছ থেকে মুক্তি নিয়ে হারিয়ে ফেলেছে জীবনের সবটুকু আশা, সমস্ত মনোবল আর বেঁচে থাকবার মত সমস্ত সম্বল। সারাজীবন সে দীর্ঘশ্বাসের বোঝা নিয়ে বাঁচবে কি করে? কিন্তু যখন সে শেখরের বিরুদ্ধে ডিভোর্স কেস এনেছিলো তখনতো জানতোনা যে ঐ অপদার্থ, ভবঘুরে শেখর চৌধুরীর জন্যে অগাধ ভালো-বাসার ফল্গুধারা বইছে তার মনের নিভৃতে। এখন কি করবো? সেওতো হিন্দুমেয়ে। পারলোনা কেন স্বামীর সামান্য একটু দোষ ত্রুটি ক্ষমা করে নিতে? মমতার স্পর্শ দিয়ে মালিন্যহীন করে নিতে? ভুল কি এগিয়ে গেছে না পিছিয়েছে? মানুষের সভ্যতার অগ্রগতিই যদি হবে তবে মা ঠাকুমার ভেতরকার সেই সহিষ্ণুতা কই এখনকার মেয়েদের মধ্যে? শেখরতো তারই নির্বাচিত স্বামী ছিলো। স্বেচ্ছায় বিয়ে করেছিলো শেখরকে আবার স্বেচ্ছায়ই যবনিকা টেনে দিলো সেই বিবাহিত জীবনের ওপর। নিজের মনটাকে কি চিনতে ভুল হয়েছিলো সুমিত্রার।

বুড়ি ঝি সাতুর মা ঘরের আলোটা জ্বালিয়ে দিয়েই চমকে উঠেছিলো:—'একিগো, বড়দিদিমণি, ভর-সন্ধ্যে-বেলা চুল এলো ক'রে শুয়ে থাকতে আছে নাকি, সধবা মানুষের? ওতে যে সোয়ামীর অকল্যেণ হয়গো।' কেঁপে উঠেছিলো সুমিত্রা। আজ আর স্বামীর কল্যাণ বা অকল্যাণ কোনটাতেই কিছু এসে যায়না ওর একথা হাজার বোঝালেও বুঝতে চাইবেনা সাতুর মা'র অশিক্ষিত মন। হয়ত বলবে,—'ওমা সেকি কথা? সোয়ামী কত অত্যেচার, অনাচার করে ইস্তিরির উপর, তবুতো সে পরম গুরু। তার সাথে আবার কখনও সম্পক্য চুকে যায় নাকি? আর এ ব্যাপারে আদালত কাছারি জানেই বা কি?' সুমিত্রা চুপ ক'রেই শুয়ে ছিলো। কিছুই বলেনি সাতুর মাকে। তার মত আধুনিকা যে কাণ্ডটাকে ন্যায় ব'লে ভাবছে অশিক্ষিতা সাতুর মা হয়ত তাকেই ভাববে 'মহাপাপ'।

ছ' বছর বয়সে মা হারিয়ে বাবার কোলে আশ্রয় পেয়েছিলো সুমিত্রা। দশ বছর বয়স হ'তেই সে আশ্রয়টুকুও ঘুচে গেল। মামা মেথনাদ নিয়ে এলেন নিজের কাছে। ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য্য আর মামার অকারণ প্রশ্রয়ের মধ্যে দিয়েই বড় হয়ে উঠেছে সুমিত্রা। শৈশবের দিনগুলো জলতরঙ্গের মিষ্টি সুরের মত মিলিয়ে যেতেই এসেছে শরতের সোনালী আলোর মত কৈশোর। আবার সেই কৈশোরও যে কখন মিলিয়ে গেছে পাহাড়ীয়া নদীর মত খরস্রোতা যৌবনের মধ্যে লক্ষ্য করেও করেনি সে। বুঝেও যেন বোঝেনি। কলেজ, ক্লাব, থিয়েটার আর টেনিস খেলা নিয়েই মেতে থাকতো ও। নিজেকে সেই প্রথম আবিষ্কার করলো সে যেদিন পরিচিত হ'ল উদীয়মান নাট্যকার শেখর চৌধুরীর সঙ্গে।

ওরই লেখা নাটক অভিনীত হচ্ছিলো সুমিত্রাদের কলেজে। কলেজের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানাতে যারা গিয়েছিলো সুমিত্রা ছিলো তাদের মধ্যে অন্যতমা।

শেখর চৌধুরী শুধু প্রতিভাবান নয় অপূর্ব দীপ্তিমান একথাটাও আবিষ্কার ক'রে ফেললো সুমিত্রা। ওর উদার হাসি আর গম্ভীর কণ্ঠস্বর, সব ছাড়িয়ে কথা বলার ছন্দ মুগ্ধ করলো সুমিত্রাকে। হারিয়ে গেল সে নতুন অনুভূতির সমুদ্রে। ক্রমে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হ'লো। দু'জনেই দু'জনকে একান্ত ক'রে চাইলো। কিন্তু বিয়ের সময় এলো বাধা। মামা সেই চিরন্তন মামুলী আপত্তি তুলে বললেন,—ও তোমার যোগ্য নয় মিনু। আমি তোমাকে যেভাবে মানুষ করেছি তাতে এরকম ফ্যামিলিতে গিয়ে তুমি মানাতে পারবে না।

—'ওর আপন জন বলতে কেউই নেই মামা। ওকে আমি ভালোভাবেই জানি সেজন্য তুমি ভেবোনা।' অতি আধুনিকা সুমিত্রা নিঃসঙ্কোচেই জানিয়েছিল মামাকে।—'শুধু বলছি, ঐ দারিদ্র্য তুমি সইতে পারবেনা। আজ তোমার যে মন আছে চিরদিন তা নাও থাকতে পারে। তুমি শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী, এর বেশী তোমায় আর কি বলবো!' মামা বলেছিলেন।

কোনো বাধা, কোনো কথাই সেদিন মানতে পারেনি সুমিত্রা। শেখরকে কথা দিয়েছে। সে কথার খেলাপ করতে পারবেনা সে। বিয়ে হয়ে গেল। নিতান্তই অনাড়ম্বর ভাবে। মামার গম্ভীর মুখ দেখে সুমিত্রার বুকের ভেতরটা, যে তোলপাড় করছিলোনা তা নয় তবুও হৃদয়াবেগকে জয় করে হাসিমুখেই লালচেলীর অবগুণ্ঠন তুলে দিয়েছিলো মামার। বউবাজারের একটি ফ্ল্যাটের নিতান্তই সামান্যাঠা ঘরের গৃহিণীর মর্য্যাদা পেয়েই সে যেন ধন্য হয়ে গিয়েছিলো। পরিতৃপ্তির আনন্দের বুক ভরে উঠেছিলো সেদিন। আত্মীয় স্বজন দু'এক জন এসেছিলেন, বৌ দেখে তাঁরা শেখরকে ভাগ্যবানই বলে গেছিলেন। শেখরও গর্বে তৃপ্তিতে প্রশান্ত মুখে আতিথেয়তায় মুগ্ধ করেছিলো সবাইকে।

চোখ মেলেই বিস্ময়াহত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল শেখর। চন্দনা সেই মুহূর্তেই এসে পৌঁচেছে স্কুল থেকে। হাতে একটা নানারঙের ছোট্ট একটা ফুলের তোড়া। ওর দিকে তাকিয়ে শেখর বললো,—'আমি কোথায়? শেখরের প্রশ্নে পর্দার আড়ালে চমকে উঠলো সুমিত্রা। চন্দনা বললো,—'কেন, আমাদের বাড়ীতে। আমার বাবা এখনকার এস ডি ও। আপনাকে কাল রাত্তিরে রাস্তায় পেয়েছি বুঝলেন? এই নিন। ব'লে ফুলের তোড়াটা এগিয়েছিলো শেখরের দিকে। অবাক ভাবে তাকিয়ে রইল শেখর। যেন জ্যোৎস্নারাতের আলোর ধোওয়া একটি মালতীলতা। কি স্নিগ্ধ, কি মধুর, কি সুন্দর। কিন্তু এমুখখানা যেন বহুচেনা আর একখানা মুখের আদল, কিন্তু সে মুখে ছিল তারুণ্যের ঝলমলে দীপ্তি। এত স্নিগ্ধ নয় বরং প্রখর। সুমিত্রা তাকে অস্বীকার করেছে কিন্তু একটি সন্তান যদি উপহার দিয়ে যেতো এই চন্দনার মত তবে হয়ত পিতৃত্বের গরিমা তাকে অধঃপতনের হাত থেকে বাঁচাতে পারতো। ঐ একটুখানি আকর্ষণই হয়ত তাকে বেঁধে রাখতো ঘরের মায়ায়।

তিন চার দিন শুয়ে শুয়ে আর ভালো ভালো খেয়েই কেটে গেল শেখরের। সুমন্ত রায় একটু বিরক্ত ও চিন্তিতভাবে দিন কাটাচ্ছেন। মিসেস রায়ের অসুস্থতা নিয়ে বাড়ীর মধ্যে বেশ একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর মাথায় নাকি একটা অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। আগে কোনও দিন নাকি এ উপদ্রব ছিলোনা তাই সুমন্ত একটু বেশী চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। সুমন্তর কাছে এর মধ্যে অনেকবারই বিদায়

চেয়েছে কিন্তু তিনি বলেছেন,—আরে মশাই, আপনি তো আর চাকরী করেন না, থাকুন না ক'দিন, যত খুসী লিখুন। দয়া করে এখন যেতে চাইবেন না। সুমি সুস্থ হোক। আগামী ২৮শে ফাল্গুন আমাদের ম্যারেজ অ্যানিভারসারি। সেদিন আপনার মত একজন লোক থাকবে না? শুনলে সুমি ভীষণ দুঃখিত হবে। শেখর নিরুপায় হয়ে চুপ করে থাকে।

মিসেস রায় একটু সুস্থ হোয়েছেন। এ খবরটা চন্দনার মুখেই জেনেছে শেখর। মাঝে মাঝে চন্দনা ওর বিছানায় বসে। বকে যায় অনর্গল। একদিন কি একটা ভাবতে ভাবতে প্রশ্ন করলো,—'আচ্ছা কাকু, মা আজকাল একা থাকলেই বসে বসে কাঁদেন কেন? আমাকে দেখলে অবশ্য হাসেন। আমি কিন্তু মা'র চোখের জল দেখে ফেলি।' শেখর জবাব দিয়েছে—'শরীরটা খারাপ তো তাই! এমন সুন্দর সংসারের কর্ত্রী যিনি, এমন কি দুঃখ তাঁর থাকতে পারে, যার জন্য তিনি সোপনে কাঁদেন। হয়ত এই ঐশ্বর্য্য ঝলমল সংসার ও সদাহাস্যময় স্বামীটির হয়ত এমন একটি রূপ আছে যা তাঁকে কাঁদায়।

সুমিত্রা অবশ্য অনেকবার সুমন্তকে বলেছে,—'ভদ্রলোক যখন যেতে চাইছেন তখন বাধা দিচ্ছো কেন?'—'সে তুমি বুঝবে না। তোমার সাথেও ভদ্রলোকের আলাপ হয়নি তাই'লে বুঝতে কি চমৎকার মানুষ!' সুমন্তকে কথা শেষ করতে না দিয়েই সুমিত্রা ঝংকার দিয়ে উঠলো,—'থাক্ থাক্ সবাইতো তোমার কাছে চমৎকার। রাস্তায় যে লোক মাতাল হয়ে প'ড়ে থাকে সে আবার চমৎকার!'

গম্ভীর হয়ে গেলেন সুমন্ত। আহত কণ্ঠে বললেন,—'একটা কথা কি জানো সুমি, টাকার জোর থাকলে আমরা সে মানুষকে মাতলামি করতে দেখলেও মাতাল বলিনা। বলি, ওরা বড় লোক, ওদের একটু আধটু ওরকম হয়েই থাকে। তাছাড়া খাটুনীর শরীরে মাঝে মাঝে না খেলেও শরীর ঠিক থাকে না। আমরা তো জানিনা সুমি, কেন ও লোকটা রাস্তায় পড়ে থাকে। অত যার প্রতিভা, সামাজিক নীতিজ্ঞান তার নেই কেন? জীবনে বড় কোন আঘাত না থাকলে কোনো মানুষই এরকম হ'তে পারে না। এখানে এসে একদিনও মদ খায়নি। ঐ সময়টা চন্দনার সাথে গল্প করেই কাটায়। জীবনে যদি কোন বন্ধন না থাকে তবে এমনই হয়ত হয় সুমি। তাই অনুরোধ করছি ওঁকে তুমি ঘৃণা করো না।

সুমিত্রা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে ধীর পায়ে। নিজের ঘরে ইজি চেয়ারে চোখ বুজে শুয়ে পড়লো। আর কেউ না জানুক, সুমিত্রা তো জানে শেখরের জীবন কেন বন্ধনহীন। কেন কোন আকর্ষণ নেই তার জীবনে। ও যদি ভরিয়ে রাখতো শেখরের জীবন তবে আজ এমনতরো হ'তোনা। শেখরের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর মামার নির্বাচিত পাত্র সুমন্ত রায়ের সঙ্গে বিয়ে হয় সুমিত্রার। মানুষ হিসেবে সুমন্ত রায় অতুলনীয়। তিনি জানেন সুমিত্রার জীবনের বিবাহ-বিচ্ছেদের ইতিহাস। এ নিয়ে কোনোদিন কোন আলোচনা করেননি তিনি বরং এ জাতীয় প্রসঙ্গ উঠলে এড়িয়েই যান। অবশ্য শেখরকে কেন সুমিত্রা জীবন থেকে বিদায় দিয়েছে জানতেন, কোন মতেই হয়ত ক্ষমা করতে পারবেন না তাকে। সুমিত্রা জানে শেখরকে কেন মিথ্যে কলঙ্কে ভূষিত করে বিদায় দিয়েছে জীবন থেকে। দারিদ্র্য ছাড়া কোনো অপরাধই তার ছিলোনা। আজন্ম ঐশ্বর্য্যের চেউয়ে ভেসে ভেসে সুমিত্রা ক্ষমা করতে পারেনি স্বামীর সংসারের নগ্ন দারিদ্র্যকে। পারেনি বুকভরা ভালোবাসা দিয়ে সকল দৈন্যকে ভরিয়ে তুলতে। প্রথম ক'টি বছর দুর্বার আনন্দাবেগের মধ্যে কেটেছিলো। কিন্তু সেই আনন্দমুখর দিনগুলো হারিয়ে গেল কোন এক অতৃপ্তির কুয়াশার মধ্যে। শেখর কিন্তু ছিলো পূর্ণ সুখী। সুমিত্রা

কেন শেখরের মত তৃপ্ত হ'তে পারলো না? বান্ধবীদের ভ্যাডিনাক আর বুইক্‌গুলো যখন ওর ফ্ল্যাটের সামনে এসে দাঁড়াতো সঙ্কুচিত হয়ে পড়তো সে। আর মাসকাবারী মোটা দামের শাড়ীটার দিকে তাকিয়ে বিরক্ত বোধ করলেও বদলাবার সময় না থাকায় জোর করে একটা হাসির ঝলক ছুটিয়ে তুলতো ঠোঁটের কাঁকে। বলতো, -'কিরে মিলি, হঠাৎ যে?'—'কেন আসতে নেই নাকি? তুই তো একেবারে আদর্শ গৃহিণী হয়ে কোথাও বেরোস না।' বলতে বলতে মিলি হয়ত দামী শাড়ীটার সামনের প্রান্তটা আলগোছে দু' আঙুলে ধ'রে সীমান্বিত হাসে শেষ সিঁড়িটা ডিঙিয়ে ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। 'আসবি যে আগে একটু জানাসেই ত পারতিস আমিও একটু ঘুরে আসতাম তোর সঙ্গে।' সুমিত্রা বললে—'জানাবার কি আর উপায় রেখেছিস? মিঃ চৌধুরীকে কতদিন বলেছি একটা টেলিফোন বসাতে তা আজ পর্য্যন্ত তো কিছুই হ'লনা দেখছি।'

নিজের কথায় নিজেই লজ্জা পেল সুমিত্রা। আগের অভ্যেস মতই বলে ফেলেছিলো। এটা যে মেঘনাদ বিশ্বাসের নিউ আলিপুরের 'এলার গ্রীণ' নয় তা বোধহয় মনেই ছিলোনা ওর।—'নিজের দিকেতো একটু লক্ষ্য রাখিস না দেখছি—'কেন?' হাসতে চেষ্টা করতো সুমিত্রা। 'কি ছিরি করে রেখেছিস আয়নায় গিয়ে ভাখতো; বিয়েত আমরাও করেছি, তাবলে এভাবে থাকতে হবে?' কথার শেষে মিলির কৃত্রিম ভুরুটা কুঁচকে যায়। পাশের ঘরে ঢোকে চাপানো আলুর তরকারীর গন্ধটা মিলির রুমালের দামী সেন্টের গন্ধটাকে একটা বিকট গন্ধে পরিণত করেছে। অপ্রস্তুত সুমিত্রা তাড়াতাড়ি একটু অনুকম্পার ভাণ করে বলতো,—শরীরটা তেমন ভালো নেইরে।' ততক্ষণে শেখর হয়ত একটা ছেঁড়া গেঞ্জী আর রং ওঠা লুঙ্গি পড়ে বেরিয়ে এসেছে। এক গাল হেসে বলছে,—'একি, মিসেস মজুমদার যে! আজিনে মনে পড়েছে তাহ'লে।' লজ্জায় আরক্তিম হয়ে যেতো সুমিত্রা। দারিদ্র্য দেখিয়ে বেড়ানো একটা স্বভাব শেখরের। ব্যারিষ্টার গৃহিণী মিলি ঘোষের সামনে এভাবে না এলেই কি হ'তো না? ওর জন্যেই মাথা নীচু ক'রে থাকতে হয় তাকে বান্ধবীদের কাছে। শেখর যে কেন লেখা নিয়েই প'ড়ে থাকতে চায় বুঝতে পারে না সুমিত্রা। আয়ও বর্ত্তমানে তেমন কিছু হচ্ছেনা। সুমিত্রাকেও চাকরী করতে দিতে আপত্তি ওর। মামা বিজনেস করবার জন্যে একটা মোটা রকমের ক্যাপিটালও দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু সেটা নিতে আত্মসম্মানে বেধেছিলো শেখরের। সুমিত্রার মনের অসন্তোষের কালো মেঘে বিবাহিত জীবনের স্বচ্ছ আকাশটা কালো হয়ে যেতে লাগলো। নিত্য নতুন অশান্তির ঝড় উঠতে লাগলো। অপরাধীর মত চুপ করেই থাকতো শেখর। তবুও সুমিত্রার কাছে অসহ্য হয়ে উঠলো স্বামী, সংসার, সব সব। তারপর ছোটখাটো কোন একটা কারণেই ঝগড়া ক'রে মামার কাছে চলে যাওয়া থেকে মামার পরামর্শে বিবাহ বিচ্ছেদ-এর কেস চলা এবং শেখরের কাছ থেকে মুক্তি পাওয়া সবই হয়েছিলো খুব অল্প সময়ের মধ্যে। সুব্রতকে মামা সুমিত্রার জীবনের সব কথাই জানিয়েছিলেন, জানাননি শুধু শেখরের নাম ও পরিচয়। সুব্রতও জানতে চায়নি। দ্বিতীয় বার বিয়েতে রাজী হয়নি সুমিত্রা। শেষ পর্য্যন্ত মামার অনুরোধে আর তরাবহ নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি পাবার জন্যেই রাজী হ'লো সে। জীবনের সব আনন্দ বিসর্জন দিয়ে এক অতল অন্ধকারে তলিয়ে যেতে যেতে সুব্রতকে অবলম্বন হিসেবে পেয়ে সুখীই হয়েছিলো সে। স্বামী হিসেবে আদর্শ ও মহান্। তবুও সুমিত্রা কেন পূর্ণ হ'তে পারলো না? অনেক চেষ্টা ক'রে সে ভুলে ছিলো একটি ভাগ্যাহত দুঃখহারা মানুষকে। আবার যে এমনভাবে তার সাথে দেখা হয়ে যাবে কখনও ভাবেনি সুমিত্রা।

সকাল থেকেই আজ নানা আয়োজন চলছিলো। সুমন্ত আজ কোর্টে বেরোননি। বাড়ীর চাকর-বেয়ারা সকলেই ব্যস্ত। আজ সেই স্মরণীয় দিন—'আটাশে ফাল্গুন' সুমন্ত রায়-এর বিবাহ বার্ষিকী। শেখর বাইরের ঘরে একখানা বই হাতে নিয়ে বসেছিলো। অনেক অতিথি আগমনে বন্ধু হবে যে হলঘরখানি সেখানাকে সুন্দর রুচিতে সাজিয়ে তুলতে ব্যস্ত সুমন্ত রায়। শেখর উঠে এসে ওর জন্যে নির্দিষ্ট ঘরে বসলো একটা চেয়ারে। আজকের দিনে উল্লেখযোগ্য কোন উপহার দেবার সামর্থ্য ওর নেই সুমন্ত রায় ও মিসেস রায়কে। একটা কবিতা লিখতে চেষ্টা করছিলো শেখর। জীবনে সে অনেক লোকের সাথেই মিশেছে কিন্তু সুমন্ত রায়ের মত দিলখোলা মানুষ সে কমই দেখেছে। শ্রদ্ধায় বিগলিত মন নিয়ে লিখতে বসলো শেখর।

বেড়িয়ে ফিরতে সন্ধ্যেটা বেশ ঘনিয়ে গিয়েছিলো। গেটের মধ্যে পা দিয়েই পিয়ানোর টুং টাং আওয়াজ কানে এলো শেখরের। চন্দনা বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলো। হয়ত শেখরেরই পথ চেয়ে। খুশীতে চিক চিক ক'রে উঠলো শেখরের মুখখানা।—বাঃ খুব মানুষ আপনি! সন্ধ্যাই এসে গেছে আর আপনার আর ফেরবার নাম নেই। শীগ্‌গির চলুন ভেতরে।' অভিজ্ঞা নারের মত কণ্ঠে শাসনের সুর এনে বললো চন্দনা। শেখরকে একরকম টানতে টানতেই সুমন্তর পাশে এনে বসিয়ে দিলো চন্দনা।

মুখ তুলে সামনের দিকে চাইতেই চমকে উঠলো শেখর। যেমন ফিরে যে ভদ্রমহিলা পিয়ানো বাজাচ্ছিলেন, ঠিক যেন তার মত। মুখটা অবশ্য দেখা যাচ্ছে না। বাজনা শেষ হ'তেই জড়ির আঁচলটা সামান্য একটু টেনে নিয়ে পুরো কার্পেটের বুকে শান্তিনিকেতনী স্যাণ্ডেল ডুবিয়ে ডুবিয়ে হেঁটে নিজের জায়গায় এসে বসলো সে, ও কে? নিজের চোখ দু'টোকে বিশ্বাস করতে পারে না শেখর। এতবড় একটা বিস্ময় যে তার জন্য অপেক্ষা করছিলো, বিশ্বাস করতে পারলোনা সে। সুমিত্রা যেন শেখরকে দেখেনি এমনভাবেই বসেছিলো।

—ওহো, তোমাদের দু'জনের মধ্যে ত আলাপই নেই। মিঃ চৌধুরী, ইনি আমার সহধর্মিনী মিসেস রায় মানে সুমিত্রা রায়। আর সুমি, ইনিই সেই বর্ষণমুখর রাতের কুড়োনো মাণিক বিখ্যাত লেখক 'হুমকু' অর্থাৎ শ্রীশেখর চৌধুরী। সুমিত্রা প্রায় না তাকিয়েই নমস্কার জানালো। শেখরও হাত দু'খানা প্রায় না তুলেই প্রতি নমস্কার জানালো। হঠাৎ শিরার ব্যথাটা চাড়া দিয়ে উঠলো, না বুকের ভেতরটা টনটনিয়ে ছিঁড়ে যেতে চাইলো বুঝতে পারলোনা শেখর। সুমন্ত যখন মিঃ ভদ্রের ইংরেজী আবৃত্তি শোনার মত তখন শেখর সুমিত্রাকে দেখছিলো ব্যথাহত দৃষ্টিতে। সুমিত্রা যা চেয়েছিলো তার চেয়ে অনেক বেশীই পেয়েছে। সুমন্তর মত স্বামী, চন্দনার মত মেয়ে আর অতুল ঐশ্বর্য্য ক'টা মেয়ে পায় একই সঙ্গে? শেখর যা দিতে পারেনি সুমন্ত তা দিয়েছেন দু'হাত ভরে। রিক্তা সুমিত্রা আবার পুলিতা হয়ে উঠেছে। অসহ্য উত্তেজনার অসহনীয় ব্যথার দমকে শেখরের সমস্ত শরীরটা কাঁপছিলো থর থর ক'রে। সুমন্তর দিকে চেয়ে কোনমতে বললো,—'আমি বড্ড অসুস্থ বোধ করছি মিঃ রায়, ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিচ্ছি। কিছু মনে করবেন না প্লিজ্।'

—'নিশ্চয়ই। আপনি বিশ্রাম করুনগে, কিন্তু আবার কি হ'লো। চিন্তিত সুরে বললেন সুমন্ত। টলতে টলতেই প্রায় বেরিয়ে গেল শেখর।

—'এখন কেমন আছো?' চোখ খুলেই বিস্ময়ের ভারে চোখ বুজলো শেখর। মাথার কাছে বসে আছে শেখরের বহু চেনা সুমিত্রা।—'আবার এখানে এলাম কেমন করে?'—'বেশী কথা বলা নিষেধ আছে ডাক্তারের।'

—'না, না আমি জানতে চাই আবার আমি কি করে এলাম এখানে ?'

—'যেমন ক'রে প্রথমবার এসেছিলে। মদ খেয়ে বেহুঁস হয়ে পড়েছিলে রাস্তায়।'

—'তারপর তোমার স্বামী সুমন্তবাবু তুলে এনেছেন, তাইনা ? আমিতো এখান থেকে চলে যেতেই চেয়েছিলাম।' কান্নায় ভেঙে এল শেখরের কণ্ঠ।

—'চলে যেতে চাইলেই কি যাওয়া যায় ? জ্ঞান না থাকলেও ঈশ্বরের পথেত যাওনি এই বাড়ীর গেটের সামনেইত পাওয়া গেছে তোমায়।'

—'উঃ এত ক'রে মনকে বাঁধলাম তবু পারলামনা !' আক্ষেপের সুরে বললো শেখর। —'আর কথা ব'লোনা। চুপ ক'রে শুয়ে থাকো একটু।' সুমিত্রার কণ্ঠে আকুতি।—'চুপ করেইত চলে যাবো ভেবেছিলাম সুমিত্রা। কিন্তু তা যখন হয়নি তখন একথাটা তোমায় ব'লেই যাই,—ঠিক এমনটিই তোমাকে মানায়। আমার ভুল হয়েছিলো তাই তোমাকে ধ'রে রাখতে পারিনি। তোমার কোন দোষ নেই সুমিত্রা, সব দোষ আমার অক্ষমতার।' একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপতে গিয়েও পারলোনা শেখর।—'এতদিন পরেও কি আবার আমায় দুঃখ দিতে চাও ?'

—'না, না সুখ যাকে দিতে পারিনি, দুঃখ তাকে দেব কোন অধিকারে ? কিন্তু একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস না করে পারবোনা সেজন্য আমায় ক্ষমা ক'রো। চন্দনা বলছিলো মাঝে মাঝে তুমি একলা ঘরে কাঁদো, কেন ? আমাতে কি তোমার আপত্তি আছে ?'

সেকথার জবাব না দিয়ে সুমিত্রা বললো,—'আমারও একটা প্রশ্ন আছে, ঘর সংসার ফেলে এমন ক'রে ঘুরে বেড়াও কেন পথে পথে ?'

ম্লান হাসিতে শেখরের দীর্ণ মুখখানা আরও বিষণ্ণ হয়ে উঠলো।—'ঘর সংসার তো দশবছর আগেই ঘুচে গেছে। কিসের টানে পথকে ভুলবো বলো ! তোমার দেওয়া অপবাদগুলোও তো সত্যি করে ভুলতে হবে তাই ....'

—'দয়া ক'রে ও কথাগুলো আর আমায় শুনিয়োনা। এটুকু দয়া করতে নিশ্চয়ই তুমি কৃপণতা করোনা।'

—'এখন আর একটি প্রশ্ন, যদিও আগেরটার উত্তর পাইনি এখনও। এই পনের দিনের মধ্যে একটিবারের জন্যেও আমার সঙ্গে দেখা করোনি, অথচ আজ একেবারে একান্ত কাছে এসে বসেছ। সে কি ধরা পড়ে গিয়ে ?'

—'আর কোন মিথ্যে তোমায় বলবোনা। নিজের মধ্যে সাহস খুঁজে পাইনি, তাই আসিনি, কিন্তু ধরা যখন পড়লামই তখন নিজেকে আর সামলাতে পারলামনা। মনে মনে হয়তো আমায় ব্যঙ্গ করছো, তবুও কয়েকটি কথা তোমায় জিজ্ঞেস না করে পারছিনা।'

—'করো।' নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলো শেখর।

—'একটু আগে জিজ্ঞেস করছিলে না আমি মাঝে মাঝে কাঁদি কেন ?'

—'এর উত্তর কি তুমি দেবে সুমিত্রা ?'

—'ভেবেছিলাম দেবোনা, কিন্তু না দিয়ে আমার উপায় নেই। বলোতো কেন ভুলতে পারিনা আমার অভিশপ্ত অতীতকে ? কেন আমাকে উতলা করে তোলে দশবছর আগেকার প্রত্যেকটি ছোট ছোট ঘটনা ? বউবাজারের ফ্ল্যাটের সেই জীর্ণ সংসার কেন আমাকে আবার হাতছানি দেয় আমি কেন ভুলতে পারিনা আমার সেই ভয়ঙ্কর ভুলের আলাকে।

—'এ হয়ত তোমার একরকমের বিলাস।'

—'এখনও তুমি একথা বলবে?' কান্নায় রুদ্ধ হয়ে এলো সুমিত্রার গলার স্বর।

—তাহ'লে দুর্বলতা। কিন্তু এমন দুর্বলতা তো তোমাকে মানায়না সুমিত্রা। যা হারিয়েছ, পেয়েছ তার চেয়ে অনেক বেশী। এতেও তোমার আক্ষেপ? উপদেশ দেবার ইচ্ছে আমার নেই। শুধু একটা কথা না ব'লে পারছি না। মনটাকে ছোটোনা রেখোনা। সংসারের হাল যখন তোমার হাতে, মন শক্ত করে সে হাল তোমায় ধ'রে রাখতে হবে। তাই বলছি। ধৈর্য হারিয়োনা।'

'না, তা আমি পারিনা, পারিনা।' দু'হাতে মুখ রেখে ডুকরে উঠলো সুমিত্রা।

—'তুমি ভুল করছো সুমিত্রা।' —'না, না, ভুল আজ করছিনা, করেছি দশবছর আগে, নইলে তিলে তিলে এমন ক'রে জ্বলে মরতে হতোনা আমাকে। বলতে পারো, আমি সব পেয়েও কেন গ্রহণ করতে পারছিনা?'

—'এতখানি উতলা হয়ে পড়বে, কোনোদিন ভাবিনি। আইনতঃ আমি তোমার অনাত্মীয়, তাই আমার কাছে এমনভাবে.....'

—'পারোনা আমায় তুমি ফিরিয়ে নিতে?' উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়লো সুমিত্রা।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো শেখরের বুক ঠেলে। শান্ত গলায় বললো,—আমি আবার ঘরের মানুষ হবো মিতু। আজ আমি সুখী। তুমি অবুঝ হয়োনা। শান্ত হও। ফিরিয়ে নিতে তোমায় আমি পারবোনা। সমাজ, আইন, লোকভয় সব কিছু বাদ দিলেও সুমন্তবাবুর মত উদার মানুষকে অতি বড় পাষণ্ডও এরকম আঘাত দিতে পারেনা। ঘর ভাঙার দুঃখ যে জানে, সে কি পারে আর কারো ঘর ভাঙতে? সব চাইতে বড় কথা, তুমি চন্দনার মা। এ বাড়িতে সবচেয়ে বড় মর্যাদা পেয়েছো তুমি এখন সেই পরিচয়ে। সে মর্যাদা তুমি অস্বীকার করবে কেমন ক'রে? মনটাকে যারা যাচাই না ক'রে তোমার মত দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ে, তাদের কারো সাথে যদি তোমার পরিচয় হয় তবে তাদের দিও না দিশেহারা হয়ে পড়তে। বিবাহ-বিচ্ছেদেই সব সমস্যার সমাধান হয় না। মনটাকে আগে বিচার ক'রে দেখতে হয়। অনেক অশুভকে জয় করা যায় নিজের অন্তরের আলোকে। একথাটা তাদের বুঝিয়ে ব'লো। আর আমার শেষ অনুরোধ, অতীতকে তুমি ভুলে যাও, নইলে বর্তমান তোমার কাছে হয়ে উঠবে ভয়াবহ। তুমি কথা যাও, আমাকে ভুলতে চেষ্টা করবে।

—'তাই হবে। তুমি যাতে শান্তি পাও তা করতে আমি চেষ্টা করবো।'

—'কাকু, এখন ভালো আছেন তো?' কল কল করতে করতে চন্দনা ঢুকলো।

—খুউব ভালো আছি মামণি। তুমি আমার কাছে এসো। চন্দনা কাছে আসতেই দুহাতে ওকে কাছে টেনে ওর বুকে মুখ গুঁজে পড়ে রইল শেখর। একটা প্রচণ্ড আর্তনাদে সে যেন ঠেকিয়ে রাখতে চায়। সুমিত্রা বুঝলো, আজ তার ওপর সকল অধিকার হারিয়ে তারই আত্মার মধ্যে তাকেই খুঁজছে শেখর। বাৎসল্য আর ভালোবাসার অধীর আবেগে শেখরের ঠোঁটটা একটু কাঁপছিলো। হয়ত চোখ দু'টো ওর জলে ভরে গেছে। এইটিই মানুষের চিরন্তন স্বভাব। মায়ের বুকে শুয়ে যে মানুষ ভুলতে চায় সমস্ত দুঃখ বেদনা, আবার প্রিয়ার বুকেও সেই মানুষই খোঁজে সান্ত্বনা আর আশা—শান্তি আর সান্ত্বনা যখন তার জীবনে থাকেনা এতটুকু। শেখরও সেই মানুষ। চোখের জল আঁচলে মুছলো সুমিত্রা।

মোটরের হর্ণ শুনে বারান্দায় বেরিয়ে এলো সে। সুমন্তর গাড়ীখানা সবে এসে থেমেছে। রোজকার মতই সুমিত্রার চোখে চোখ পড়তেই হাসলেন সুমন্ত। এগিয়ে দিলেন বেগুনী রঙের ডালিয়া একটা। একটু চেষ্টা ক'রেই হেসে সুমিত্রা হাত বাড়িয়ে নিল ফুলটা। এক অজানা আকর্ষণে পেছন ফিরে তাকিয়েই দেখলো ও শেখর হাসছে। কিন্তু সে হাসি যে বেদনায় বিবে নীল হয়ে গেছে তাকি বুঝতে পেরেছে শেখর?

অমৃত কথা ও কাহিনী

শ্রীশ্রীবুদ্ধদেবের কথা—

প্রজ্ঞা বা প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে বিশিষ্ট স্বরূপ—জ্ঞানই দুঃখ নিরোধের পথ। যখন প্রজ্ঞা চক্ষু দ্বারা সমস্ত সংস্কার অনিত্য বলিয়া দেখে তখনই মানব দুঃখ সমূহ সম্বন্ধে নির্বেদ (নিস্পৃহতা) প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তিতে ধ্যান ও প্রজ্ঞা আছে, নির্বাণ তাহার কাছেই উপস্থিত হয়।

কর্ম্ম, বিদ্যা, ধর্ম্ম ও শীল অর্থাৎ নৈতিক আচারই মানুষের জীবনকে উন্নীত করে। ইহা দ্বারাই মর্ত্ত্য জীব শুদ্ধিলাভ করে, বংশ বা ধনের দ্বারা ইহা হয় না।

রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ হইতে ইন্দ্রিয়কে রক্ষা কর, ইন্দ্রিয় সংযম কর। এই সকল দ্বার খোলা থাকিলে অরক্ষিত, অবারিত দ্বার গৃহ হইতে যেরূপ পরস্বাপহারী চোর সব নিয়া যায়, সেভাবে তোমার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে। অবথা মর্কট বা মূকের মত চিত্রচাকল্য প্রদর্শন করিও না। বালকের মত হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ও উদ্ধত হইও না।

• • • •

শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যের কথা—

বহির্মতাবলম্বী কতকগুলি লোক আচার্য্যের নিকট আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহারা আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, প্রভু, আমরা বহি মতাবলম্বী। বেদমধ্যে অগ্নিকে দেবগণের মধ্যে প্রথম বলা হইয়াছে। অগ্নিই দ্বিজগণের দেবতা। ব্রাহ্মণগণ ইঁহার উপাসনা করিয়া মুক্ত হন। ইনি পাপাহারী এবং অলক্ষ্মীনাশক। বেদমধ্যে অগ্নিদেবতার শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে এইরূপ বহু প্রমাণ আছে। আপনারাও ইহার উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হন। ইঁহাদের কথা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন, দেখুন, বহি দেবতাদিগের মধ্যে অবম, বিষ্ণুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং দেবতাগণ তন্মধ্যবর্ত্তী বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। অতএব বহিঃসাধ্য যে সমস্ত কর্ম্ম আছে, আপনারা তাহাদের অনুষ্ঠান এবং বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া শুদ্ধি অর্থাৎ ব্রহ্মপরায়ণ হন, তাহা হইলে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। আচার্য্যের এই বাক্যে তাঁহাদের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইল।

• • •

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের কথা—

যে নিজে কর্ত্তা হইয়া বসিয়াছে তাহার হৃদয়ের মধ্যে ঈশ্বর সহজে আসেন না। কৃপা হইলেই দর্শন হয়। তিনি জ্ঞানসূর্য্য। তাঁহার একটি কিরণে এই জগতে জ্ঞানের আলো পড়িয়াছে। তবেই আমরা পরস্পরকে জানিতে পারিতেছি। আর জগতে কত রকম বিদ্যা উপার্জ্জন করিতেছি। তার আলো যদি একবার তিনি নিজে তার মুখের উপর ধরেন, তাহা হইলে দর্শন লাভ হয়। সার্জ্জেন সাহেব রাত্রে অন্ধকারে লণ্ঠন হাতে করিয়া বেড়ায়। তার মুখ কেহ দেখিতে পায় না। কিন্তু ঐ আলোতে সে সকলের মুখ দেখিতে পায়। আর সকলে পরস্পরের মুখ দেখিতে পায়। যদি কেহ সার্জ্জেনকে দেখিতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে প্রার্থনা করিতে হয়। দয়া করিয়া আলোটি তোমার মুখের উপর ফেল।

The triumphs of the warrior are bounded by the narrow theatre of his own age; but those of a Scott or a Shakespeare will be renewed with greater and greater luster in ages yet unborn, when the victorious chieftain shall be forgotten, or shall live only in the song of the minstrel and the page of the chronicles.

—*Prescott.*

সাহিত্য ও সাহিত্যিক

ডরোথী পার্কার

শিহির সিংহ

ভদ্রমহিলার পুরো নাম ডরোথীরথস্‌চাইল্ড পার্কার। আমাদের বাংলা সাহিত্যে বনফুলের মতন লেখকের ছোট ছোট গল্প বা চিত্র যেমন বিদেশী ভাষায় অনুবাদ করে বিদেশী পাঠকদের কাছে পরিচিত করানো সহজসাধ্য নয়, ডরোথী পার্কারের রচনাগুলির সম্বেও বাংলা অনুবাদের মধ্যে দিয়ে এদেশের পাঠকদের সঙ্গে পরিচয় করানো খুবই কষ্ট সাধ্য। বলা বাহুল্য ডরোথী পার্কার ইংরেজি সাহিত্যের লেখিকা।

ডরোথী পার্কারের জন্ম ১৮৯৩ সালে ২২শে আগষ্ট তারিখে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত নিউ জার্সির ওয়েষ্টেতে। বাবার নাম জে, হেনরী রথস্‌চাইল্ড এবং মার নাম এলিজাএ, (মার্কটন) রথস্‌চাইল্ড। 'রথস্‌চাইল্ড। 'রথস্‌চাইল্ড' নামের মধ্যেই এঁদের পারিবারিক পরিচয় খানিকটা মিলবে।

সে দেশের অবস্থাপন্ন বাড়ীর মেয়েদের মতন ডরোথীর শিক্ষাও হয়েছিল নিতান্ত অভিজাত বিদ্যালয়ে; নিউ জার্সির মরিস টাউনে অবস্থিত মিস ডানা পরিচালিত বিদ্যালয়ে ও পরে নিউইয়র্ক শহরে অবস্থিত ব্লেসেড্‌ স্যাক্রামেণ্ট কন্‌ভেণ্টে। ১৯১৭ সালে ২৪ বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় এড্‌উইন পণ্ড পার্কারের সঙ্গে। এ বিবাহ সুখের হয়নি, ১১ বছর বিবাহিত জীবনযাপনের পরে ১৯২৮ সালে তাঁদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। অভিনেতা এ্যালান ক্যাম্পেলের সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ হয় ১৯৩৩ সালে —এ বিবাহের ও বিচ্ছেদ হয় ১৯৪৭ সালে।

১৯১৬ সালে তিনি বিখ্যাত পত্রিকা 'ভোগ' (Vogue)-এর সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান করেন। পনের বছর 'ভোগ' ছেড়ে দেন এবং 'ভ্যানিটি ফেয়ার' নামক পত্রিকাতে যোগদান করেন। 'ভ্যানিটি ফেয়ারে' ১৯১৭ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত তিনি নাট্য-সমালোচকের কাজ করেছিলেন। ১৯২০ সালের পর থেকে অবশ্য তিনি আর কোনও পত্রিকার সঙ্গে এভাবে যোগ রাখেননি। তাঁর কবিতা ছোট গল্পের খ্যাতি তখন থেকেই তাঁকে আমেরিকার সাহিত্য জগতে একটি বিশেষ স্থান দিয়েছে।

নানা ধরণের রচনা ডরোথী পার্কারের লেখনী থেকে বেরিয়েছে। সংখ্যায় কম হলেও কবিতা, ছোট গল্প, ছোট ছোট সামাজিক চিত্র, নাটক ইত্যাদি সব কিছুই তিনি লিখেছেন। তবে ছোট গল্পের লেখিকা হিসেবেই প্রধানত: তাঁর নাম উল্লিখিত হয়ে থাকে।

১৯২৯ সালে আমেরিকার সাহিত্য জগতের বিশেষ কাম্য 'ও হেনরী স্মৃতি পুরস্কারটি লাভ করেন—ছোট গল্পের জন্যে। সাম্প্রতিক কালে তাঁর রচিত নাটকও প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

কিন্তু আমাদের মন বিশেষ করে আকর্ষণ করে ডরোথী পার্কারের অপূর্ব সামাজিক চিত্রগুলি। এগুলি প্রধানত: প্রকাশিত হয়েছে। 'নিউ ইয়র্কার' পত্রিকার পাতায়। টাইনবেক যেমন সমাজের নীচতলা নিয়ে বা সিনক্লেয়ার লিউস যেমন মফঃস্বল শহর নিয়ে আন্তরীক্ষণিক আলোচনা করেছেন, ডরোথী পার্কার সেই রকম শহরের সমাজে উচ্চ-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষের চরিত্রের উপরে আলোক-পাত করেছেন।

প্রধানতঃ ব্যঙ্গ-ধর্মী এই রচনাগুলির মধ্যে অকস্মাৎ এমন গভীর দরদের সন্ধান পাওয়া যায় যে অভিভূত না হয়ে পারা যায় না। তুচ্ছতম চারিত্রিক দুর্বলতাকে অবলম্বন করেও যেমন তিনি অপূর্ব রসের সৃষ্টি করেছেন, মানুষের জীবনের সবচাইতে অপ্রত্যাশিত কোণে তেমনি মর্মস্পর্শী করুণরসের উৎস তিনি আবিষ্কার করেছেন। আর তাঁর ভাষাটিও যেন তাঁর নিজেরই আবিষ্কার। ইংরাজী ভাষার উপরে দক্ষতা তাঁর অসাধারণ, কথ্য ভাষার ব্যবহারে তাঁর জুড়ী মেলা মুস্কিল।

লেখকের প্রকৃত পরিচয় তাঁর সাহিত্য কর্মেই। সেই কারণে অনুবাদের অসুবিধা সত্ত্বেও ডরোথী পার্কারের 'হিয়ার লাইজ' (Here Lies) নামক সংকলন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'এ্যারেঞ্জমেণ্ট ইন ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট' (Arrangement in Black and White) নামক রচনাটির একটি প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ পরে প্রকাশিত হইবে।

কৌতূহলী পাঠকের জন্য ডরোথী পার্কারের প্রকাশিত বইগুলির একটি তালিকাও এই সঙ্গে দেওয়া হোলো: Close Harmony (1924), Enough Rope (1926), Sunset Gun (1931), After Such Pleasures (1933), Not So Deep as a Well (1936), Here Lies (1939), Ladies of the Corridor (1953).

ক্যান্সার রোগের প্রতিষেধক কোন ওষুধ আজ পর্যন্ত কেউ বের করতে পারেনি।

ক্যান্সার ভ্যাকসিন তৈরী করতে হলে চাই সুস্থ মানুষের দল যারা সাহস করে মৃত্যু বরণ করতে পারবে। তাদের দেহে ক্যান্সার সেল প্রবেশ করিয়ে পরীক্ষা চালাবেন বিজ্ঞানী, ধীরে ধীরে অত্যন্ত কঠোর যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু আসবে তাদের ওপর।

আমেরিকার ওহিও জেল হাসপাতালে আবেদন প্রচারিত হল—কয়েকজন স্বেচ্ছা-মৃত্যুবরণকারী চাই।

কয়েকজন বন্দী এগিয়ে এলেন, যাঁদের নামে চুরি-খুন-জখমের রেকর্ড ছাড়া আর কিছুই নেই।

—কেন, তাঁরা প্রাণ দান করছেন? প্রশ্ন করা হল।

—সমাজের কাছে ঋণ শোধ করতে, উত্তর এল।

একজন বন্দী, পুস্তকের পাণ্ডুলিপি নকল করে বিক্রী করার অপরাধে যাঁর জেল হয়েছে তিনি কেবল বললেন, আমি একাজে এগিয়ে এসেছি কারণ এতেই আমি আনন্দ পাব!

একজনে আর কয়েকজনে

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

আসানসোলে আলাপ শামু ভট্টাচার্য এবং তাঁর স্ত্রী করুণা দেবীর সঙ্গে।

প্রথম আলাপেই উপেন্দ্রনাথ 'উপেনদা' এবং ভট্টাচার্য পরিবারের একজন অন্তরঙ্গজন হয়ে উঠলেন।

শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি শ্রীমতী ভট্টাচার্য শিক্ষিতা এবং সম্ভ্রান্ত মহিলা। ডিসেরগড়ে ম্যাকনিলের পারসোন্যাল অফিসারের চমৎকার দোতলা বাংলো সামনেপ্রকাণ্ড লন যেন—সবুজ ঘাসের আস্তরণ। দোতলার বারান্দা থেকে দেখা যায় দামোদরের জলরেখা—দূরে ধূসর পাহাড়।

আসানসোলের রবীন্দ্র স্মরণীর উৎসব—অনুষ্ঠান থেকে একটি বেলা ছিনিয়ে নিয়ে ডিসের গড়ে এসেছেন উপেন্দ্রনাথ। উপেন্দ্রনাথের সঙ্গে আছেন তাঁর অনুজ প্রতিম সাহিত্যিক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় কবি শুভদর বসু এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কের সৌজন্যে আমি।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর্ব শেষ হলে শীতের বিপ্রাহরিক রৌদ্রে পিঠ ছুঁইয়ে আমরা সবাই বসেছিলাম ডিসেরগড়ের ভট্টাচার্য পরিবারের বাংলোর ছিতলের বারান্দায়।

'তোমার নাম কী?'

উপেন্দ্রনাথের প্রশ্নে শামু ভট্টাচার্যের জ্যেষ্ঠ কন্যা মিষ্টি হেসে বললে, 'পুতুল।'

'পুতুল? বাঃ, বেশ নামটি তোমার, চেহারার সঙ্গে নামের তোমার অদ্ভুত মিল!'

করুণা দেবী বললেন, 'এই নিয়ে কিন্তু তিনবার হলো দাদা। তিনবার আপনি ওর নাম জিগ্যেস করেছেন।'

উপেন্দ্রনাথ সকৌতুকে আমার দিকে তাকালেন। ইঙ্গিতটা উপলব্ধি করলাম আমি। আর একজন অনুরাগিণী প্রিয় পাত্রীকে যেন এই পুতুলের মধ্যে তিনি খুঁজছিলেন, যার গান, যার ভাবভঙ্গি যার কণ্ঠস্বর উপেন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয়। যে মেয়েটি উপেন্দ্রনাথের অতি আপনজন। সেও পুতুল—এমনি উজ্জ্বল শ্যামলাঙ্গী, সুমধুরভাষিণী।

উপেন্দ্রনাথ বললেন পুতুলকে, 'একটা গান শোনাও পুতুল।'

পুতুল টের পেয়েছে উপেন্দ্রনাথ নিজে একজন সুগায়ক, তাই একেবারে গান জানিনে বলতে বাধলেও এককথায় গান শোনাতে ইতঃস্তত করতে লাগলো।

তার কিন্তু কিন্তু ভাব দেখে উপেন্দ্রনাথ বললেন, 'গান জানিনে, বলতে আটকাচ্ছে, আবার গান গাইতেও বুঝি লাগছে; কিন্তু ভয় নেই তোমার আমি জানি রবীন্দ্র-সঙ্গীতে তোমার কণ্ঠ সুরেলা। অতএব আর দেরী নয়। একজন পুতুলের গান এখন আর আমরা যখন-তখন শুনতে পাই নে। আশঙ্কা জাগছে, তোমার গানও তেমনি ইচ্ছে করলেই আর শুনতে পাবো না। নাও, গান ধরো।'

করুণা দেবী জিগ্যেস করলেন, 'সে পুতুলটি কে দাদা?'

উপেন্দ্রনাথ আমার দিকে আবার সকৌতুকে তাকালেন, 'শালিবাহনের প্রিয় শালিকা। মৃত্যুর পর যমরাজ যদি আমাকে প্রশ্ন করেন, 'উপেন্দ্র পর জন্মের জন্যে তুমি কি বর চাও?' আমি বলবো, 'যমরাজ পর জন্মে যদি কিছু সৎকার্য ক'রে থাকি, তবে আমাকে এই বর দিন আমি যেন জন্মান্তরে শালি হয়ে জন্মাই!'

উপেন্দ্রনাথের রসিকতায় আমরা সকলেই হেসে উঠলাম।

উপেন্দ্রনাথ বললেন, 'পুতুল সেই শালিকা। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, নাচে-গানে পারদর্শিনী সুরসিকা, সুশিক্ষিতা। সম্প্রতি তার শোক দহন হওয়ায় আমরা সুখী, কিন্তু বিরহী। আর আকশোষ যখন তখন আর তার নাচ দেখতে এবং গান শুনতে পাচ্ছিনে।'

শামু ভট্টাচার্য বললেন, 'দাদা, আমাদের পুতুলের সঙ্গে সেই পুতুলের সর্বাংশে মিল দেখছি।'

'আর সেই জন্যেই তো বার বার তিনবার পুতুলের নাম জিগ্যেস করলাম!'

করুণা দেবী বললেন, 'এক আয়গায় কেবল অমিল। এ পুতুলের সোভাগ্যের জন্যে আমরা চিন্তিত হয়ে পড়েছি। এ ভার দাদা আপনার ওপর।'

'কিন্তু তার আগে পুতুলের গান শোনা যাক্।' আমার কথায় সবাই সায় দিলেন।

পুতুল পর পর কয়েকটি রবীন্দ্র-সঙ্গীত শোনালে।

ডিসেরগড় থেকে আলমসোল ফেরবার পথে উপেন্দ্রনাথ পুতুল প্রসঙ্গ তুললেন, 'আচ্ছা অমিল বলাই-এর ছেলের সঙ্গে পুতুলের সম্বন্ধ করলে কেমন হয়?'

বলাই অর্থাৎ সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বনফুল (ডাক্তার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়)। কিছুদিন পূর্বে ভাগলপুর সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক উৎসবে উপেন্দ্রনাথ সভাপতিরূপে ভাগলপুরে গিয়েছিলেন এবং বনফুল আলয়ে একবেলা কাটিয়েছিলেন। আমিও সঙ্গে ছিলাম।

বলাইদার জ্যেষ্ঠ পুত্র—তিনি এম-বি, বি-এস। উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত সন্তান। মাত্র কিছুক্ষণের জন্যে তাঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়েছিলো। বনফুল অগ্রজ সাহিত্যিকরূপে আমাদের দাদা। তাঁর পুত্র সাদাসিধা, নিরহঙ্কার, সুপুরুষ।

বনফুলের পুত্রকে জামাইরূপে পাওয়া নিতান্তই সৌভাগ্যের কথা। শামু ভট্টাচার্য মহাশয় উপেন্দ্রনাথের এ-প্রস্তাবে আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন, 'সে-সৌভাগ্য কি হবে দাদা?'

আমি বুঝলাম উপেন্দ্রনাথের স্নেহশীল হৃদয়ে পুতুল আশ্রয় লাভ করেছে। শামু বাবুকে বললাম, 'দাদা যখন সম্বন্ধ করেছেন তখন আমার মনে হচ্ছে পুতুলের বিয়ে এইখানেই হবে!'

বনফুল উপেন্দ্রনাথকে আপন অগ্রজের ন্যায় মনে করেন। কলকাতায় ফিরেই উপেন্দ্রনাথ বনফুলকে এই সম্পর্কে চিঠি লিখলেন। বনফুল সানন্দে জানালেন উপেন্দ্রনাথের এই প্রস্তাব তাঁদের পরিবারস্থ সকলের পক্ষেই সম্মতিসূচক। পাত্রী-পাত্র দেখা, কথাবার্তা পাত্র-পাত্রী আশীর্বাদ ইত্যাদি বিবাহের সকল পূর্ব আনুষ্ঠানিক কাজ সমাপ্ত হবার পর বিবাহের পাকা তারিখ ঠিক হয়ে গেলো।

বিবাহের ঘটক বলে এ-বিবাহে উপেন্দ্রনাথের উপস্থিতির বিশেষ তাৎপর্য ছিলো। বলাইদা আমাকে পত্র লিখলেন, 'ভাই, উপেনদাকে আনতেই হবে।'

আমি তো দু'পায়ে এগিয়ে ছিলাম। উপেন্দ্রনাথও ঠিক সেই রকমই।

পুতুলকে আশীর্বাদ জানিয়ে একটি বিয়ের কবিতা লিখলেন উপেন্দ্রনাথ। নিজ হাতে কবিতাটি লিখে, তাকে সুচিত্রিতও করলেন তুলি এবং রঙে। তা দেখে মনে হলো, সত্যিই উপেন্দ্রনাথ এককালে ভালো ছবি আঁকতেন।

সেই সময় উপেন্দ্রনাথের একখানি গল্প-সংগ্রহের বই ছাপা হচ্ছিল। 'বেল কুঁড়ি' বইখানির নাম। প্রকাশকদের ডেকে অত্যন্ত তাগিদ দিলেন বইখানি তাড়াতাড়ি ছাপবার জন্যে।

আমি জিগ্যেস করলাম, 'দাদা, হঠাৎ এই বইখানি ছাপা সম্বন্ধে এত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন কেন।'

উপেন্দ্রনাথ বললেন, 'পুতুলের বিয়েতে নিয়ে যাবো। তাই তার আগেই বইখানি ছাপা হওয়া দরকার।'

'পুতুলের বিয়ের সঙ্গে এ বই-এর সম্পর্ক কি?'

আমার প্রশ্নের উত্তরে উপেন্দ্রনাথ বললেন, 'বলাইকে বইখানি উৎসর্গ করছি। বিয়ের দিন নিজে হাতে বলাইকে বইখানি দিতে চাই।'

ইতিপূর্বে বনফুল উপেন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেছেন তাঁর অদ্বিতীয় উপন্যাস 'অগ্নিশ্বর।'

উপেন্দ্রনাথও একখানি উপন্যাস বনফুলকে উৎসর্গ করবেন এ মনোবাসনা আমার কাছে ব্যক্ত করেছিলেন এবং সে উপন্যাসের একটি খসড়াও মনে মনে আঁকছিলেন।

আমি বললাম, 'দাদা, আপনার সঙ্কল্প তো বলাইদাকে উপন্যাস দেওয়ার!'

উপেন্দ্রনাথ বললেন, 'সে বাসনা পূর্ণ হয়তো হবে না।'

'কেন?'

'ততোদিন আর তোমরা আমাকে ধরে রাখতে পারবে না।'

আমি বললাম, 'কেন দাদা, পঁচাশির তো এখনো বছর ছয়-সাত দেরি!'

আমার কথায় উপেন্দ্রনাথ হেসে বললেন, 'ও তুমি সেই জ্যোতিষীর কথা বলছো—যিনি বলেছেন যে আমার পরমায়ু পঁচাশি বছর পর্যন্ত।'

বললাম, 'হ্যাঁ! আরো বলেছেন এই ছয় সাত বছর আপনার সুবর্ণ কাল। এর মধ্যে আপনি আরো লিখবেন, মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত লিখবেন,—আর সে লেখা বাঙলা-সাহিত্যের স্থায়ী লেখা বলে পরিগণিত হবে। সেই স্থায়ী লেখা বই-ই তো আপনি বনফুলকে, হুমায়ুন কবীরকে দিয়ে এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রকে উৎসর্গ করে যাবেন বলে সঙ্কল্প করে রেখেছেন।'

'এজন্মে তাই তো আর হয়ে উঠলো না। তবে শাস্ত্র বলে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নেই। এই আকাঙ্ক্ষা থেকেই জন্ম-জন্মান্তর। আকাঙ্ক্ষা কিছু নিয়ে চললাম যাতে জন্মান্তরে আবার এই বাংলা দেশেই লেখক হয়ে জন্মগ্রহণ করি। আর এমন কিছু লিখি যা জন্ম-জন্ম ধরে মানুষের মন ছুঁয়ে থাকে।' —উপেন্দ্রনাথের গলা ধরে উঠলো।

'বেল কুঁড়ির' প্রকাশক নতুন ঝকঝকে কয়েকখানি গল্প প্রকাশিত 'বেলকুঁড়ি' নিয়ে উপেন্দ্র-সদনে উপস্থিত হলেন।

বইগুলি সাগ্রহে উপেন্দ্রনাথ গ্রহণ করলেন। চোখের কোণে তাঁর আনন্দাশ্রু।

'তাহলে বলাইকে নিজের হাতে বইখানি দিতে পারলাম অনিল!' উপেন্দ্রনাথের কথায় আমি যেন বিহ্বল হয়ে পড়লাম। উপেন্দ্রনাথের মধ্যে এমন ভাবান্তর আমি বড় একটা লক্ষ্য করিনি।

বইখানি হাতে করে নাড়াচাড়া করছিলাম। বাইরে ট্যাক্সির হর্ণ শুনলাম।

উপেন্দ্রনাথ বললেন, 'চলো, ট্যাক্সি এসে গেছে।'

আমরা পুতুলের বিবাহের কয়েকদিন পূর্বেই ডিসেরগড় রওনা হচ্ছি। উপেন্দ্রনাথের ইচ্ছা এই উপলক্ষে দিনকয়েক তিনি ডিসেরগড় এবং আলানসোলে কাটাবেন।

আসানসোলে প্রিয় সুহৃদ উপেন্দ্রনাথের একান্ত স্নেহের পাত্র রম্যাশিখীক্ষ্যের লেখক সুবোধ চক্রবর্তী বসবাস করছিলেন—তাঁর রান্নাঘরটির প্রতি আমাদের দু'জনেরই রসনার লোভ অত্যন্ত বেশি। সুবোধ চক্রবর্তীর গৃহে এবং রবীন্দ্র স্মরণির পদস্থ মায়াদেবীর গৃহে এক-আধ বেলা কাটিয়ে আমরা শ্যামু ভট্টাচার্যের বাংলোয় উপস্থিত হবো পুতুলের বিবাহে।

উপেন্দ্রনাথ আবার তাগিদ দিলেন, 'মালপত্তর সব তোলা হয়ে গেছে—চলো এইবার।'

'বেলকুঁড়ি' কয়েকখানি নেওয়া হলো।

উপেন্দ্রনাথ বললেন, 'প্রথম বলাইকে দিয়ে তারপর তোমাদের পাওনা!'

বললাম, 'তথাস্তু!'

প্রথম মহাযুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে, একজন বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ পশ্চিম এসিয়ার কয়েকটি দেশে এসেছেন পেট্রোলের সন্ধানে। সন্ধান করে কোনই ফল হল না। তিনি পরিহাস ঘোষণা করলেন, আরবের উপদ্বীপে যদি পেট্রোল পাওয়া যায় তবে আমি তা পান করব।

তিনি কুয়াইৎ (Kuwait)-এর একটি স্থানে দাঁড়িয়ে একথা ঘোষণা করেছিলেন।

এখন সে স্থানটি বিশ্বের বৃহত্তম একক খনিজ তৈল উৎপাদন কেন্দ্র।

বিশেষ-অজ্ঞ!

সোভিয়েত সংবাদপত্রগুলির জন্যে সংবাদ সংগ্রহ করে। বর্তমানে নোভোস্তি ২০টি বিদেশী বার্তা সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা করছে।

ভারতের রাজধানী দিল্লীতে সম্প্রতি এ. পি. এন. তার ব্যুরো স্থাপন করেছে। এর ফলে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ভারতীয় সংবাদপত্র-জগতের সঙ্গে তার বন্ধন শক্তিশালী হয়ে উঠবে। নোভোস্তি কর্তৃক পরিবেশিত প্রবন্ধ ও ফটোচিত্র ভারতের সংবাদপত্রগুলিতে ব্যাপকভাবে মুদ্রিত হয়। এটা স্বাভাবিক, কারণ, নোভোস্তির ঘোষিত নীতি হল আন্তর্জাতিক বোঝাবুঝি, শান্তি ও সৌহার্দ্য এবং ভারতের মহান জনগণও ঠিক এই আদর্শগুলিকেই অনুসরণ ক'রে চলেছেন।

নোভোস্তি কর্তৃক পরিবেশিত সংবাদ ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ নিয়েই বর্তমানে দিল্লী কলকাতা বোম্বাই ও মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় "সোভিয়েত দেশ" পাক্ষিক পত্রিকা ও "সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদ ও অভিমত" বুলেটিন সহ বিভিন্ন দেশ থেকে মোট ২০টি পত্রিকা, ৪টি সংবাদপত্র ও ৪১টি বুলেটিন প্রকাশিত হয়।

সেই সঙ্গে, এ. পি. এন. সোভিয়েত জনসাধারণের কাছেও ভারতকে আর তার যুক্ত জনগণকে আরও ভালোভাবে পরিচিত ক'রে তোলার কাজে সাহায্য করছে। ভারতের জনসাধারণ যে আজ তাঁদের জাতীয় অর্থনীতি ও সংস্কৃতিকে উন্নত ক'রে তোলার কাজের মধ্যে দিয়ে তাঁদের স্বাধীনতাকে সুসংহত করছেন, নোভোস্তি সেদিকে বিশেষ জোর দিয়ে থাকে। সংঘাত-সংঘর্ষ নয়, এই পারস্পরিক লেনদেনের মনোভাবই হল আজ মানুষে মানুষে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কথা। নতুন এই সোভিয়েত বার্তা সরবরাহ সংস্থা এ. পি. এন-এর বোর্ডের প্রধান হলেন অতি বিশিষ্ট একজন সাংবাদিক ও "ইজভেস্তিয়া" সংবাদপত্রের ভূতপূর্ব সম্পাদক বোরিস বুরকক। নোভোস্তি কর্তৃক আয়োজিত এক ফটোচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষে সম্প্রতি তিনি দিল্লী এসেছিলেন। ভারতের রাজধানীতে অবস্থানকালে বোরিস বুরকক শ্রীজওহরলাল নেহেরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং উভয়ের মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনা হয়। এই সাক্ষাৎকালে শ্রীনেহেরু "সোভিয়েত দেশ" পত্রিকার বিষয়বস্তু ও রচনাগুণের উচ্চ প্রশংসা করেন।

———

॥ সচিত্র সংযোজন ॥

বর্ষশেষ

卐 卐 卐 卐 卐 卐 卐

বাংলার সংস্কৃতি

বর্ষশেষ

বাংলার সংস্কৃতি

পূর্বাভাস

সারা চৈত্র মাস ধরে বাংলার ঘরে ঘরে উৎসব। এ-উৎসব গ্রাম-বাংলার প্রাণের স্পন্দন। রুক্ষ প্রকৃতির বুকে 'ও তোর চারিয়ে যাওয়ার' রিক্ততা—কি যেন বিচ্ছেদ বেদনা! তাই বুঝি গাজনের মেলা, তাই বাতাসে তাদের প্রস্থানের বেদন-ধ্বনি।

শূন্যময় আকাশ, ধূসর মেঘে ঢাকে বিদায় নেয়? যে ছিলো তিনশো পঁয়ষট্টি দিন ধরে এক একটি মুহূর্তে প্রাণবন্ত হয়ে—আজ তার বিদায়ের দিন। চৈত্র শেষে সেই স্মৃতি প্রোজ্জ্বল। কতো দিনের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, জয়-পরাজয়—স্মৃতি-চারণায় আজ তার স্মরণোৎসব। পুরাতনের স্মৃতি পশ্চাৎপট—সামনে নববর্ষের আবাহন। নতুন প্রত্যাশা—আগামী দিনের নববর্ষ।

চৈত্র তাই পুরাতন এবং নূতনের যুক্তবেণী। চৈত্র-উৎসব তাই জাতির মুক্তি এবং মঙ্গলের সমন্বয় কাল।

কোন সুপ্রাচীনকাল থেকে এই উৎসব সুরু হয়েছে—তার সঠিক বিবরণী পাওয়া না গেলেও অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত এই উৎসব সামাজিক উৎসব রূপে সারা বাঙলা দেশে প্রবহমান।

চৈত্র উৎসব বাঙালীর গার্হস্থ্য জীবনের কামনা-বাসনার মূর্ত প্রতীক। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে মাটি শুধু—ধূলি-ধূসর পৃথিবী তৃষ্ণার্ত। আকাশ তৃষ্ণায় কাঁপে, বায়ু করে হাহাকার! রিক্ত মাঠে কৃষক-কণ্ঠে আকুতি—'আল্লা মেঘ দে, পানি দে!' বর্ষাকে আহ্বানের সুর চৈত্র থেকেই সুরু হয়।

বাঙলার পল্লীর মাঠে মাঠে তাই মৈলা গানের আকুতি ভরা সুর। কৃষক দেবতা শিবের আরাধনা সারা চৈত্র মাস জুড়ে। পথে পথে গাজন, গম্ভীরা এবং নীলের সন্ন্যাসীদল—শিব পূজারী।

গৈরিক বাসের সঙ্গে গৈরিক উত্তরীয়—হাতে বেতের ছড়ি, কণ্ঠে শিব নাম—'শিবনাথ কি মহেশের জয়!' চাক ঢোল কাঁসির বাদ্য ধ্বনিতে শিবনাথের কীর্তন—তারই নাম গাজন বা গম্ভীরা।

সন্ন্যাসী শিব—সন্ন্যাস বেশেই তাঁকে আরাধনা করতে হয়। এক মাস ধরে শিব-পূজার গাজন সন্ন্যাসীদের কঠোর কৃচ্ছ্র সাধন। সন্ন্যাসী শিবকে পরিতুষ্ট ক'রে কৃষিপ্রধান বাঙ্‌লা দেশ কৃষি-পূজায় রত হয়। সারা মাঠ ছুড়ে শ্যামল শস্যের সম্ভাবনাকে আরাধনা করার মানসিকতাই প্রকৃতপক্ষে চৈত্র-উৎসব।

প্রকৃতি-প্রাণ এবং প্রকৃতি-প্রিয় বাঙালী ঘরোয়া জীবনের কামনাকে রূপ দিয়েছে গাজন-পার্বণে। গৃহ-ধর্মের সঙ্গে সমাজ-ধর্ম একপ্রাণতায় মিশে আছে বাঙালীর চৈত্র-উৎসবে।

নীলষষ্ঠী

শিব বিয়ে করতে চলেছেন। সেই শিব যিনি চাষ করেন, তাঁত বোনেন—সমাজ এবং সংসারের যিনি প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যক্তি। বাঙ্‌লার প্রাণ-সম্পদ তিনি। তিনি সন্ন্যাসী—

কেননা, ত্যাগই তাঁর মহান ব্রত। তিনি ত্যাগী না হলে সংসারের সঙ্গল হবে কেমন করে? সমাজের কল্যাণ হবে কেমন করে? গ্রাম-সমাজের এই পরম পুরুষই আবার সংসার-কামনায় বিমুখ নন। শিবের ঘরে পার্বতী। পার্বতীও সর্বং-সহা ধরিত্রী-মাতা। হর-পার্বতীর বিবাহে সন্ন্যাসীরা বরযাত্রী। বরযাত্রী সন্ন্যাসীদের গর্জনই—'গাজন।' অর্থাৎ হর-পার্বতীর আদর্শকে যাঁরা প্রচার করেন—তাঁরাই গাজন-সন্ন্যাসীর দল।

চৈত্র মাসে বাঙ্‌লা-দেশের গার্হস্থ্য-ধর্মের আদর্শকে অর্চনা করা হয়; তার সঙ্গে থাকে প্রয়োজন সংযুক্ত হয়ে। তাই সৈন্নিকবাহী সন্ন্যাসীরাই শুধু গাজন বা গম্ভীরা উৎসব পালন করেন এমন নয়—পুত্রবতী রমণীও সংসার এবং পুত্র-কন্যার মঙ্গল কামনা করে থাকেন নীল ষষ্ঠীর পূজায়। শিবের মাথায় সদ্যজল ঢেলে বেল পাতার অর্ঘও নিবেদন করা হয়—গার্হস্থ্য-জীবনের সুমঙ্গল কামনায়।

চৈত্র মাস জুড়ে বাঙালীর সামাজিক এই উৎসব বারব্রত পাল-পার্বণে মুখর।

সামনে নববর্ষ। সেই নববর্ষ নব নব সম্ভাবনায় মুখর হয়ে উঠুক—এই কামনায় ধ্বনি প্রতিধ্বনি বর্ষ শেষের চৈত্র মাসকে মুখর করে রাখে চৈতালী ঘট-ব্রত, গাজন প্রভৃতি উৎসবে। সে কামনা শুধু ব্যক্তির নয়—তা সমষ্টির। সেই সমষ্টির শুভতায় সংসার-সমাজ বড়ো হয়ে উঠুক—এই হচ্ছে বাঙলার বর্ষ শেষের মঙ্গল-চরণ।

বাঙ্‌লার ধর্মই হচ্ছে বাঙলার লোক-ধর্ম। এই লোক-ধর্মের অধিদেবতা যাঁরা—তাঁরা গৃহস্থ। সাধারণ মানুষের মধ্যেই তাঁদের অধিবাস। অসম্ভবের পায়ে মাথা কুটে তাঁদের অর্চনা করতে হয় না। লোক-জীবনের সুখ-দুঃখের অকপট সঙ্গী তাঁরা। তাঁদের জীবন-ধর্মে শুধু মহান জীবনাদর্শ। এই জীবনাদর্শকেই সমাজের মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা বাঙলার লোক-উৎসবে। এই লোক-উৎসব শুধু আনুষ্ঠানিক পর্ব নয়—বাঙ্‌লার মর্ম এর সঙ্গে জড়িত।

সেই মর্ম উৎসবের মানসিকীকে আমরা অভিনন্দন জানাই আজ চৈত্রের বর্ষ শেষ দিনে।

আমাদের এই যাত্রার পথে আমাদের মুখে চক্ষে, আমাদের বাক্যে, মনে, আমাদের সমস্ত কর্মচেষ্টায়, হে রুদ্র, তোমার প্রসন্ন মুখের জ্যোতি উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক। আমরা এখানে সকলে যাত্রীর দল তোমার আশীর্বাদ লাভের জন্য দাঁড়িয়েছি, সম্মুখে আমাদের পথ, আকাশে নবীন সূর্যের আলোক, 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' আমাদের মন্ত্র; অন্তরে আমাদের আশার অন্ত নেই।

—রবীন্দ্রনাথ

বাংলার চড়ক ঃ চিরদিনের চৈত্র-সংক্রান্তি

শ্রীঅনুযাত্রিক

পল্লী বাংলার প্রাণের উৎসব হোল চড়ক। গ্রামের সাধারণ মানুষের প্রাণের দেবতা হলেন শিব—তাঁরই বিবাহের অনুষ্ঠানে হোল গাজন—আর সেই গাজনের শেষ পর্ব হোল চড়ক-পার্বণ। তাই বছরের শেষ দিনটিতে হাটে বাটে মাঠে মন্দিরে গ্রামে শহরে বাংলার সহজ সরল মানুষগুলি বিরাট উৎসবে মেতে ওঠে। শিব বিবাহের বরযাত্রীরা সারা চৈত্রমাস ধরে কঠোর ও সংযত সন্ন্যাস জীবন যাপন করেছেন, সংক্রান্তির আগের রাত্রে বুড়ো শিবের মন্দিরে নীল-উৎসব হয়ে গেছে, শুধু সন্ন্যাসী নয়, পুত্রবতী নারীও সেদিন উপবাসে দিন কাটিয়েছেন, মহাদেবের কাছে পুজো দিয়েছেন, প্রার্থনা করেছেন তাঁর সন্তান সন্ততি তাবৎ সংসারের সকলে যেন সুখে থাকে। পরিসমাপ্তির পূর্বে সংক্রান্তির দিনে এই উৎসব সবচেয়ে উজ্জ্বল শোভাময় ও আনন্দদায়ক হয়ে উঠল। আজ ওই চড়কের গাছটিকে ঘিরে যত উল্লাস। আজ মেলা বসেছে চড়কতলা জুড়ে।

আজ চড়কের চেয়ে চড়কতলার মেলাটাই অবশ্য বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু ভুললে চলবে না এ উৎসব ধর্মীয় উৎসব—আর এ ধর্ম লোকায়ত ধর্ম। এর পশ্চাতে রয়েছে বহুদিনের বহু কালের ইতিকথা।

দেখতে হবে এ উৎসবের কেন্দ্রে যিনি রয়েছেন তাঁর পরিচয়টি কেমন হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের প্রথা বিশ্বাস আচারের মধ্য দিয়ে বিচিত্র হয়ে উঠেছে। হিন্দুর অন্যতম প্রধান আরাধ্য দেবতা শিব রয়েছেন এই উৎসবের কেন্দ্রে। তিনি সন্ন্যাসীর দেবতা, তিনি নিজেই যে শ্মশানবাসী সন্ন্যাসী। আবার তিনি গৃহীরও দেবতা। তিনি রুদ্র। আবার তিনিই আশুতোষ। ভয়েরও তিনি ভয়। আবার তিনিই পরম আনন্দময়, কল্যাণময়। তিনি কৈলাসের অধিপতি, তিনি বিশ্বাতীত, তিনিই বিশ্বরূপ, বিশ্ব তাঁর চরণতলে স্থান লাভ করেছে। প্রাগ্-বৈদিক দেবতা শিব আর্যদের ধ্যানে সর্বসমন্বয়ের চিন্ময় স্বরূপ। আবার তিনিই লৌকিক দেবতারূপে কখনো শ্মশানবাসী, কখনো অনার্য কৃষক, কখনো ঘরোয়া ঠাকুর।

মানব সভ্যতার আদিযুগ থেকে ভারতের এই দেবতাটি ভারতকে কেন্দ্র করে ভূমণ্ডলে আপনার মহিমা বিস্তার করেছেন। উত্তরে সাইবেরিয়া, পশ্চিমে মিশর, ব্যাবিলন, পূর্বে যবদ্বীপ, বালী, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ, এদিকে আসাম, কাম্বোডিয়া—সর্বত্র শঙ্করের অবস্থান। এই শিবপূজা থেকেই বৃহত্তর ভারতের বিকাশ। হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে কেদারনাথে তিনি পূজিত, বারাণসীতে তিনি বিশ্বেশ্বর, তিনিই আবার পল্লী-বাংলার নিভৃত মন্দিরকক্ষে চিরজাগ্রত।

স্মরণে আসছে স্বামী বিবেকানন্দের সেই কথা: "এদেশে সেই বুড়ো শিব বসে আছেন, যা কাশী পাঞ্জা খাচ্ছেন, আর বংশীধারী বাঁশী বাজাচ্ছেন। ঐ বুড়ো শিব ষাঁড় চড়ে ভারতবর্ষ থেকে একদিকে সুমাত্রা, বোর্ণিও, সেলিবিস, মায় অষ্ট্রেলিয়া আমেরিকার কিনার পর্যন্ত ডমরু বাজিয়ে এককালে বেড়িয়েছেন, আর একদিকে তিব্বত, চীন, জাপান, সাইবেরিয়া পর্যন্ত বুড়ো শিব ষাঁড় চরিয়েছেন, এখনও

চলছেন। ঐ যে মা কালী—উনি চীন, জাপান পর্যন্ত পূজা পাচ্ছেন, ওঁকেই বীশুর মা মেরী করে ক্রশ্চানরা পূজা করছে।.....ঐ বুড়ো শিব ডমরু বাজাবেন, মা কালী পাঁঠা খাবেন, আর কৃষ্ণ বাঁশী বাজাবেন—এ দেশে চিরকাল।"

সমস্বরের দেবতাটিকে নিয়ে যে চড়ক উৎসব তাতে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, নাথ, অনার্য প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মীয় আচার এসে মিশেছে। এ উৎসব অতি বিচিত্র, ব্যাপক, সমাজের সর্বস্তরগামী। এর বৈশিষ্ট্য হোল এতে ব্রাহ্মণ আধিপত্য নেই, এ হোল বাংলার সর্বসাধারণের উৎসব। হাড়ী, বাসদী, ডোম, জেলে, তাঁতী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির ভেতর থেকে পূজারী নির্বাচিত হয়। পূজার মন্ত্রও আঞ্চলিক ভাষায় রচিত।

গ্রামের সর্বজনের উৎসব বলেই বোধহয় এর নাম হয়েছে গাজন। কেউ কেউ বলেন, সন্ন্যাসীর গর্জন থেকে নাম হয়েছে গাজন।

এর পশ্চাতে রয়েছে পুরাণ কথা। কথিত আছে, বাণ রাজা এই উৎসবের প্রবর্তন করেন।

বাণ রাজার কন্যা উষা হলেন পরম শৈব। এদিকে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ উষার প্রেমে মুগ্ধ। অনিরুদ্ধ একদিন উষাকে নিয়ে হিমালয়ে পালালেন। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বাণ রাজার লড়াই বাধল। যুদ্ধে বাণ রাজা হেরে গেলেন, তাঁর একখানা হাত কাটা গেল। রক্তাক্ত কলেবরে বাণ রাজা হাজির হলেন কৈলাসে। শিব তাঁকে অমরত্বের বর প্রদান করলেন। কিন্তু তাতেই তিনি সন্তুষ্ট হবার পাত্র নন। তিনি সমস্ত শিবভক্তদের জন্যই আশীর্বাদ চেয়ে বসেছেন। তখন শিব বর দিলেন যে, তোমার মত রক্তাক্ত দেহে যে নৃত্য করবে আমার সম্মুখে সেই লাভ করবে আমার পুত্রত্ব।

উৎসবের উৎপত্তি নিয়ে আরো অনেক কথা শোনা যায়।

একবার দেশে বৃষ্টি নেই। সর্বত্র হাহাকার উঠেছে। গুরুর নির্দেশে বাণ রাজা শিবের পূজো করলেন এবং নিজের রক্ত ঢেলে দিলেন অর্ঘ হিসেবে। শিব সন্তুষ্ট হয়ে বৃষ্টি দিলেন। সেই থেকে 'বাণ পূজা' চলে আসছে।

অনেকের মতে সম্রাট বিক্রমাদিত্যের সময়ে গাজন উৎসবের সূত্রপাত হয়।

এ পূজা মহাকালের পূজা, যে মহাকাল মহাদেবতা—যিনি জন্ম জরা মরণকে কালের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করছেন। চৈত্র মাসের শেষ দিনটিতে একটি বৎসর—জীবনের পরমায়ু থেকে একটি বৎসর কালের অতল অন্ধকারে হারিয়ে গেল। এই দিনটিতে সূর্যদেব মেষরাশিতে আসেন। সূর্যের এই ভূস্বর্গে অবস্থান প্রতীকবদ্ধ হয়েছে চৈত্রের শেষ দিনের চড়ক ঘোরার মধ্যে।

অনেকের মতে চড়ক গাছে ঘোরার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব। মানুষ যতদিন না নির্বাণ লাভ করতে পারে ততদিন পর্যন্ত সে বার বার আবর্তিত হয়ে চলেছে, চলেছে তার জন্ম আর মরণের পৌনঃপুনিক লীলা। ঐ ক্লান্তিহীন চক্রাবর্তের প্রতীক চড়ক গাছে ঘূর্ণপাক।

বাংলা দেশে পাল রাজাদের সময়েও নাকি চড়ক উৎসব প্রচলিত ছিল। প্রজাদের মনোরঞ্জন হেতু এই উৎসব প্রচলিত হয়েছিল।

আসুন, এবার আমরা পুরাণ, কিংবদন্তী এবং লোকশ্রুতির জটিল জিজ্ঞাসা থেকে বিরাম হয়ে চড়ক মেলায় প্রবেশ করি। বাংলার প্রতিটি গ্রামাঞ্চলেই দেখতে পাবেন শিবমন্দির, মন্দিরের সম্মুখে অনেকক্ষেত্রেই থাকে আটচালা, এইখানে গতকাল সন্ন্যাসীরা মাথা ঠেকেছে, শিবের মাথায় চাপানো

ফুল পড়তে 'ভম্বেশ্বরে শিবো মহাদেব', 'বল, শিবনাথ কি মহেশের জয়' ধ্বনিতে গগন কাঁপিয়েছেন। এরই সামনে শিবতলা বা চড়কতলা। যেখানে আবার চড়কগাছ পোঁতা হয়েছে, সেটাকে অনেকে বলে চড়কপোতা। আজ ভর-দুপুর থেকেই মানুষজন ভিড় করছে সেখানে। আস্তে আস্তে ঢাকের আওয়াজ নিকটতর হচ্ছে। সন্ন্যাসীর দল আসছে এক এক করে। চড়কতলার লোক সব সরে যাচ্ছে, রাস্তা করে দিচ্ছে সন্ন্যাসীদের, তাঁরা চলেছেন চড়ক গাছের কাছে। সেখানে গিয়ে চড়ক গাছের সঙ্গে কোলাকুলি করলেন তাঁরা। তারপর চড়ক গাছে উঠে ঘুরতে লাগলেন। লোকসব ঘাড় উঁচু করে সেই দৃশ্য দেখতে লাগল।

ঐ দেখুন একজন সন্ন্যাসী দীর্ঘদেহ খেজুর গাছ বেয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছেন, অনুদিন কর্কশ দেহ এই গাছটিতে উঠতে কত কষ্ট, আজ শিবের বরে ওঁর কোনো যন্ত্রণা নেই, খেজুর পাতাগুলো সরিয়ে দিচ্ছেন, মাথায় সন্ন্যাসজল ঢালবেন এইবার। ঐ যে পাতা-গুলো বিছিয়ে দিচ্ছেন, ওর মাথায় উঠে নৃত্য করবেন তিনি, সেও একটা দেখবার জিনিষ।

সন্ন্যাসীর দল

আপনার দৃষ্টি হয়তো চড়ক-তলার আর এক প্রান্তে চলে গেছে যেখানে শক্ত শক্ত বাঁশের খুঁটির ওপর অনেক উঁচুতে বাঁধা হয়েছে বাঁশের মাচা। বাঁশের গাঁটে গাঁটে পা দিয়ে সন্ন্যাসীরা এক এক করে উঠে যাচ্ছেন মাচায়। তাঁদের হাতে রয়েছে দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত ফল—কারুর হাতে ডাব, কারুর হাতে কলা। নিচে ভক্তদের কেউ কাঁচল পেতে, কেউ গামছাখানি মেলে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন অধীর আগ্রহে। ওপর থেকে সন্ন্যাসী ফল ছুঁড়ে দেবেন আর সেইটি পাওয়ার জন্যে সকলে আকুল হয়ে উঠবে।

ঝাঁপের মঞ্চের চারপাশে ক্রমশঃ ভিড় জমে উঠছে। একজন সন্ন্যাসী মাচায় উঠে প্রাণপণে মাচা দোলাচ্ছেন, মচ্‌মচ্‌ করছে কাঁচা বাঁশ আর সবাই চীৎকার করছে—জয় বাবা মহাদেব।

ভিড় ঠেলে ভক্তের দল নিয়ে আসছে ধড়পোরা লম্বা বলের গদি। ওরই ওপর সন্ন্যাসী ঝাঁপ খাবেন।

ঝাঁপের পর সন্ন্যাসী গদির প্রদক্ষিণ না করে ভূমি স্পর্শ করবেন না। একজন জোয়ান তাঁকে তুলে নিল কাঁধে। এইবার ছুটেছে সে। পেছনে পেছনে চলেছে ছেলের দল।

বাংলার বিভিন্ন স্থানে ঘুরলে আপনি এই চড়ক উৎসবের বহু প্রকারভেদ বহু বৈচিত্র্য দেখতে পাবেন। এবং সেই সঙ্গে শুনবেন অতীতে আরও বহু প্রথা প্রচলিত ছিল, কালক্রমে অনেক প্রথা বিলুপ্তির পথে এসে দাঁড়িয়েছে। এখনও কোথাও কোথাও বাণ ফোঁড়া, বঁড়শি ফোঁড়া, আগুন ঝাঁপ, কাঁটা ঝাঁপ, বঁটি ঝাঁপ ইত্যাদি দেখা যায়। এই উৎসবে নরমুণ্ড নিয়ে নৃত্য, মরা খেলা, শব খেলাও প্রচলিত আছে কয়েকটি স্থানে।

তবে সবচেয়ে বেশি করে দেখতে পাবেন নাচ আর শুনতে পাবেন মনোহারী গান। চড়ক মেলার এ এক মস্ত বড় আকর্ষণ। এরই মধ্যে কখনো-সখনো ছোটখাটো নাটকও যে অভিনীত হয় না তা নয়। মূল গায়ক গান ধরেন গলা ছেড়ে, যে বছর চলে যাচ্ছে তার বড় বড় ঘটনাই হচ্ছে তাঁর গানের বিষয়। সে ঘটনা রাজনীতিক হতে পারে, সামাজিক হতে পারে আবার অন্য কিছু রকমারী রংদার হতেও আপত্তি নেই। পল্লীকবি সেই সব গানের ভেতর দিয়ে সামাজিক দুর্নীতি আর অন্যায় অনাচারের রূপটি ফুটিয়ে তোলেন, সেই সঙ্গে জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার কথাও বাদ যেন না। তাঁদের সহজাত বাগ্‌ভঙ্গী, বর্ণনরীতি এবং তীব্র শ্লেষ আমাদের মনে বিস্ময় সঞ্চার না করেই পারে না। কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধিকে উপলক্ষ করে একবার একজন প্রৌঢ় লোককে মেয়েছেলে সেজে হাতে একটা মোটা মরলা চট নিয়ে গাইতে দেখেছিলাম: এই যে আমার বেনারসী শাড়ি, আহা মরি মরি, কি বাহারি, বেনারসের শাড়ি। এবারে হয়তো স্বর্ণশিল্পীর বেকারদশা আর দারিদ্র্য নিয়ে শিল্পী গান বেঁধেছিলেন, আপনাদের কারুর নজরে পড়তে পারে।

সমকালীন সমাজকে লক্ষ্য করে শ্লেষের চাবুক হাঁকড়ানোর কথায় আপনার মন নিশ্চয় একশো বছর আগেকার দিনগুলিতে ফিরে গেছে, যখন একজন অদ্ভুতকর্মা পুরুষ কলকাতার আচার-ব্যবহার, পাল-পার্বণ ইত্যাদি উপলক্ষ করে সমাজের সত্যিকার রূপ ফুটিয়ে তুলেছিলেন। 'আমি এই নক্সায় একটি কথাও অলীক বা অমূলক ব্যবহার করি নাই'—আপনার নিশ্চয় মনে পড়ছে 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র ভূমিকায় কালীপ্রসন্ন সিংহের 'ভূমিকা উপলক্ষে একটা কথা'।

'১২০২ সাল। কলিকাতা সহরের চার দিকেই চাকের বাদ্যি শুনা যাচ্ছে, চড়্‌কীর পিঠ সড়্‌ সড়্‌ কচ্চে, কামারেরা বাণ, দশলকি, কাঁটা ও বঁটি প্রস্তুত কচ্চে—সর্ব্বাঙ্গে গয়না, পায়ে নূপুর, মাথায় জরীর টুপী, কোমোরে চন্দ্রহার, আর সিপাই পেড়ে ঢাকাই শাড়ী মালকোচা করে পরা, ছোপানো তারকেশ্বরে গামছা হাতে, বিষপত্র-বাঁধা সুতা গলায় যত ছুতর, মরদা, গন্ধবেণে ও কাঁসারীর আনন্দের সীমা নাই—"আমাদের বাবুদের বাড়ী গাজন!"

এই ঘোল হুতোমের কলমে 'কলিকাতার চড়ক পার্বণ'-এর সূত্রপাত।

আজ চড়ক।.....

চড়ক গাছ পুকুর থেকে তুলে, মোচ বেঁধে মাথায় ঘি-কলা দিয়ে খাড়া করা হয়েছে। ক্রমে রোদ্দুরের তেজ প'ড়ে এলে চড়কতলা লোকারণ্য হয়ে উঠলো।

এদিকে চড়কতলায় টিনের ঘুরঘুরী, টিনের মুহুরী-দেওয়া তলতা বাঁশের বাঁশী, হলদে রং করা বাঁখারির চড়ক গাছ, ছেঁড়া জাকড়ার তাইরি গুড়িয়া বিক্রী করতে বসেছে; "ড্যামাক্ ড্যামাক্ ড্যাডাং ডাং চিংড়ি মাছের দুটো ঠ্যাং" ঢাকের বোল বাজছে; দোলাপট্টি খিলির দোনা বিক্রী হচ্ছে। একজন চড়্‌কী পিঠে কাঁটা ফুঁড়ে নাচতে নাচতে এসে চড়ক গাছের সঙ্গে কোলাকুলি করছে—বৈরে করে তাকে উপরে

ঝুলে পাক খেওয়া হতে লাগলো। সকলেই আকাশ পানে চড়কীর পিঠের দিকে চেয়ে রইলেন। চড়কী প্রাণপণে দড়ি ধ'রে, কখন ছেড়ে পা নেড়ে নেড়ে ঘুরতে লাগলো। কেবল "সে পাক, সে পাক" শব্দ, কার সর্বনাশ, কার পৌষ মাস। একজনের পিট ফুঁড়ে ঝোলান হচ্ছে, হাজার লোক মজা দেখছেন।'

কলকাতার চড়কের মেলা জমে ছাতুবাবুর বাজারে, পদ্মপুকুরে এবং আরো কয়েকটি স্থানে।

এবার আমরা কলকাতা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ব পশ্চিম বাংলার পথে প্রান্তরে।

রাঢ়বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ শৈব তীর্থক্ষেত্র হোল তারকেশ্বর। বাবা তারকনাথ হলেন জাগ্রত দেবতা।

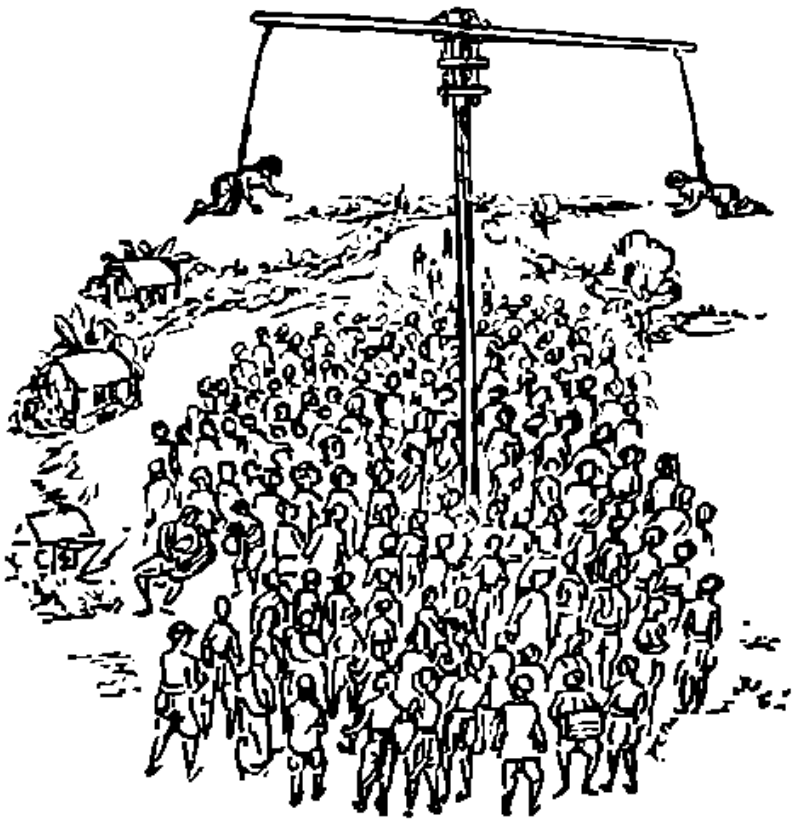

চড়ক

চৈত্রের গাজন উৎসবে বিরাট মেলা বসে তারকেশ্বরে। ভারতের নানাস্থান থেকে ছুটে আসেন পুণ্যকামী নরনারী। ধর্মের এই মহামিলন তীর্থে কোন ভেদাভেদ নেই, সকলেই শিবের পূজারী। উত্তরীয় গলে, গৈরিক বসনে শিবের গাজন সন্ন্যাসীর দল আসতে দেখা যায়।

গাজন উৎসবে যোগদানের জন্ত অনেক মানতকারী সেওড়াফুলি ও অন্যান্য স্থান থেকে পবিত্র গঙ্গাজল নিয়ে পায়ে হেঁটে তারকেশ্বরে উপস্থিত হন। মনস্কামনা পূর্ণের জন্যই ভক্ত মানত করেন।

গাজনের অঙ্গীভূত বোলান উৎসবে কাটোয়ার বিরাট মেলা বসে চৈত্র-সংক্রান্তিতে আর নবান্ন চলে কাটোয়া, সীতাহাটি, উদ্ধানপুর, মৌগ্রাম, কাগ্রাম, সাগার, বালিহাটী, কালিপুর, সোমপাড়া, প্রভৃতি গ্রামে।

কালির রুদ্রদেবের মূর্তি নিয়ে চৈত্র সংক্রান্তিতে যে শোভাযাত্রা বেরোয় শহরের শিবতলার উদ্দেশ্যে তা খুব খেলা যা মানুষের মৃতদেহ নিয়ে নৃত্যের জন্ত বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। শহরে বিরাট মেলা বসে এই উপলক্ষে।

আদমতলার চড়কগাজন উৎসবে শিব ঠাকুরকে উপলক্ষ করে মুসলমান গায়ক ঘন ঘন বল দিয়ে গায় রাধাকৃষ্ণের গান। বিচিত্র এই সমন্বয়।

মেদিনীপুরের কসবা এগরা গ্রামের কেন্দ্রস্থলে হটনাগর নামক শিবের বহু পুরাতন মন্দির। গাজন উপলক্ষে হরপার্বতীর পিতলনির্মিত ভোগমূর্তি একুশ দিন ধরে কৃষ্ণসাগর পুষ্করিণীতে নৌকাবিহার চলে।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত মল্লেশ্বরপুরে মল্লরাজ-স্থাপিত শীতলানন্দ বা উজাড়নাথের প্রধান-পর্ব হোল গাজন।

হুগলীর অন্তর্গত তত্রেশ্বরে অনাদিলিঙ্গ শিবের মন্দির। এটি বর্ধমানের মহারাজা তৈরী করে দিয়েছিলেন। চৈত্র-সংক্রান্তিতে পূজা দেবার জন্য ভক্তেরা এখানে মিলিত হন এবং সারা বৈশাখ মাস ধরে তাদের ভিড় চলতে থাকে।

চুঁচুড়া শহরের অধিকোণে গঙ্গাতীরে আছেন বঙ্গেশ্বরশিব। গঙ্গায় মাছ ধরার সময় জেলেরা বাবাকে পেয়েছিল—প্রবাদ। সেইজন্যে চড়কের ব্যবস্থা করে স্থানীয় জেলেরা। ২১শে চৈত্র থেকে ২৮শে চৈত্র পর্যন্ত বাবার বিরাট অন্নভোগ, তারপর চন্দ্রেশ্বরতলায় মেলা বসে।

খানাকুলে বিরাজ করছেন ঘণ্টেশ্বর শিব। গাজনের সময় এখানে বিপুল সংখ্যক সন্ন্যাসীদের সমাগম ঘটে।

বাঁকুড়ার একতেশ্বর গ্রামে একতেশ্বরনাথ মণিমহাদেব নামে শিব বিরাজমান। গাজনে শত শত সন্ন্যাসী আসেন, সংক্রান্তি পর্যন্ত বিরাট মেলা বসে। রামায়ণ গান চলে। সন্ন্যাসীদের ভূরি ভোজন করানো হয়, এরই নাম শিবযজ্ঞ।

বাঁকুড়ার আর একটি স্থান জয়রামপুর। এখানেও রত্নেশ্বর শিবের গাজন ও চড়ক মেলায় বহু লোক সমাগম হয়।

বাংলাদেশের আরো বহু স্থানে নানা রূপে দেবাদিদেব পূজিত হচ্ছেন এবং বহু বিচিত্র রূপে চৈত্রের চড়ক উৎসব চলে। বাংলার নারী কামনা করে সংসারের শান্তি ও সুখ, বাংলার পুরুষ শিবের কাছে প্রার্থনা করে শক্তি। এ হোল শক্তি ও শান্তির উৎসব। আমরা ভুলতে পারি না স্বামীজীর ও বাণী—"হে ভারত, ভুলিও না তোমার আদর্শ, উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর।" এই হোল আমাদের সাধনা—জগৎকে অতিক্রম করে মহত্বত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

এই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় চিরদিনের চৈত্র-সংক্রান্তি।

বাংলার ব্রত

হাসি ভট্টাচার্য

পুরাতন যায় নূতন আসে
বৃক্ষ পাতায় সূর্য হাসে।

পুরাণ বছর চলে যায় নতুন বছর আসে—বাংলাদেশের মেয়েরা প্রকৃতি বন্দনার সুর গায় ব্রতের ছড়ায়। ব্রত হচ্ছে তাদের মনের কামনা—প্রকৃতিপ্রিয় মনের সৌন্দর্যবোধ। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে প্রকৃতির কাছে সুখ-সম্পদ প্রার্থনা করে যে কামনাকে ব্যক্তি সমাজ এবং সমষ্টির কল্যাণকল্পে ব্যক্ত করা হয় ব্রত হচ্ছে তাই। চিত্রে, বেখাঙ্কনে, গানের ছড়ায় আপন শিল্পানুভূতিকে প্রকাশ করেন বাংলাদেশের নারী-সমাজ ব্রতের মাধ্যমে। তাঁদের ক্ষুদ্র গৃহাঙ্গন থেকে বাইরের বিশাল আকাশকে স্পর্শ করার প্রচেষ্টা আর মনের কামনার সমাজ সংসারের উন্নতি সাধনই ব্রতের উদ্দেশ্য। তাই ব্রতের ছড়ায় শোনা যায় ব্রতীদের মনের অভিলাষ—

ধনে ধান্যে বাড়ন্ত
সুখে থাকে আদি অন্ত।

আর ব্রতের ফলে প্রার্থনার সুর—এ ব্রত করিলে ঘোচে ভবের আঁধার।

চৈত্র-সংক্রান্তি বছরকে বিদায় দেয়। বছরের এই বিদায়ের দিন থেকে নারী-সমাজ সুরু করে নানা ব্রত অনুষ্ঠান—নতুন বছরের আশা প্রত্যাশা, সুখ-সম্পদ এবং কল্যাণকে কামনা করে।

বৃক্ষ-নারায়ণ অশ্বত্থের ছায়ায় ছায়ায় ব্যক্তি এবং সমাজ জীবন ছায়ার নির্ভরতা লাভ করুক অশ্বত্থ পাতার মতন সবুজ এবং প্রসারিত পরমায়ু লাভ করুক—অশ্বত্থ পাতার ব্রতের অনুষ্ঠান তারই জন্যে।

চাকুন্দে সুন্দরী ছিল তার পণ্ডিতের ঝি,
খেতে তার সাধ হলো পান্তা ভাতে ঘি।
কর্তা বলে, সিন্ধী ওগো একি তব আশা
অশ্বত্থ পাতা ব্রতে তব মিটিবে পিপাসা।

গ্রাম্য ছড়ার মধ্যে ব্রত মাহাত্ম্যকে প্রচার করা হয়েছে। পাঁচ রকমের পাঁচটা অশ্বত্থ পাতা নিয়ে নদীতে কিংবা পুকুরে এই ব্রত চৈত্র-সংক্রান্তি থেকে আরম্ভ করা হয়। একটি কাঁচা, একটি পাকা, একটি শুকনো, একটি খরখরে আর একটি কচি—সব পাতা হাতে করে জলের ধারে এসে দাঁড়ায় ব্রতীরা। পাকা পাতাটী মাথায় করে স্নান করলে পাকা চুলে সিঁদুর পরার সৌভাগ্য লাভ করা যায়। কাঁচা পাতাটী মাথায় দিয়ে স্নান করলে কাঁচা সোনার বর্ণ হয়। শুকনো পাতাটী মাথায় করে স্নান করলে সুখ-সম্পত্তি বৃদ্ধি হয়। খুরখুরে পাতাটী মাথায় দিয়ে স্নান করলে মণিমুক্তার নুড়ি পায়। কচি পাতাটী মাথায় করে স্নান করলে কোলে কমল পুত্র পায়।

চার বছরে এই ব্রতের উদ্‌যাপন।

ব্রতের ছড়ায় দেখা যায় সুখ-সম্পদে ভরা একটি সুখী গ্রাম্য পরিবার।

সাত বেটা যার সাত ঘোড়ায় চড়ে
সাত বউ যায় সাত দোলাতে মনের সাধ ভরে
কর্তা যান হাসিমুখে হাতির উপরে
গিন্নী যান রত্ন-সিংহাসনে হর্ষ ভরে॥

বৃক্ষ-নারায়ণ অশ্বত্থ পূজার এই মাহাত্ম্য বাংলার নারী-সমাজের প্রকৃতিপ্রিয়তা এবং মনের কামনার প্রতিচ্ছবি।

শঙ্কর ব্রত বা শিবের ব্রতে ব্রতীরা গঙ্গা মাটী, আঁটালো মাটী বা শুদ্ধ মাটী দিয়ে শিব ঠাকুর তৈরী করে শিব ঠাকুরের প্রিয় আকন্দ ফুল, বেল পাতায় তাঁর পূজা করে। গঙ্গা জল, ফুল-পাত্র চন্দন, আতপ চাল আর নৈবেদ্য সাজিয়ে পিটুলী দিয়ে বেদি এঁকে শিবঠাকুরকে বসিয়ে ব্রতীরা তাঁকে স্নান করায়—

অশ্বত্থ ব্রত

হর হর শিব ব্যোম্ ব্যোম্ ভোলা,
স্নান করে তুষ্ট হও এই গঙ্গার জলে।

স্নান করান হয়ে গেলে আকন্দ ফুল, বেলপাতা, চন্দন, আলোচাল এই সব নিয়ে শিবঠাকুরকে উদ্দেশ করে পূজার মন্ত্র বলা হয়—

শিল শিলাটন শিলে বটন
শিব আছেন ঘরে
স্বর্গ থেকে শিব বলেন
কি ব্রত করে গৌরী।
বাঘ নড়ে আঘ নড়ে নড়ে সিংহাসন
ব্রতে আছেন শিবঠাকুর ভোলা পঞ্চানন॥

তারপর নৈবেদ্য দিয়ে ব্রতীরা শিবঠাকুরের কাছে অঞ্জলি দেয়—

নীলকণ্ঠ জটাধর হে শিবশঙ্কর
ত্রিদিবের নাথে তুমি, ভোলা মহেশ্বর।
কৈলাসের পতি তুমি, কর কত লীলা
অঙ্গেতে মাখিয়া ছাই ভিখারীর খেলা।
পরিধানে ব্যাঘ্র চর্ম বলদ বাহন
নন্দী ভৃঙ্গী সহচর তুমি ত্রিলোচন।
ভক্তের পুরীতে যাহা তোমাদের নাই
তোমায় বন্দিয়া প্রভু এই বর চাই॥
রোগ শোক দুঃখ দৈন্য হর হে শঙ্কর
ভুবন ভরাও প্রভু এই মাগি বর॥

অঞ্জলি দেওয়া হয়ে গেলে ব্রতীরা পূর্ব অঞ্জলি দেয় শিবঠাকুরের মাথায়—

ধুতুরা বিল্বপত্র ভোলা গঙ্গাজল
এসব পেয়ে তুষ্ট হয় ভোলা মহেশ্বর॥
ভোলা মহেশ্বর দেখি অতি তুষ্ট অতিশয়
স্বর্গের দেবতা তাই মর্ত্যস্থানে ধায়।
হর বলেন, গৌরী ওগো কি বর চাই
গৌরী বলেন, জন্ম জন্ম হরকৈলাস পাই॥

পূর্ব অঞ্জলির পর ব্রতীরা শিবঠাকুরকে প্রণাম ক'রে শঙ্কর ব্রত শেষ ক'রে।

বসুমতী মাগো তুমি বস পদ্মপাতে
শঙ্খ চক্র গদা হাতে।

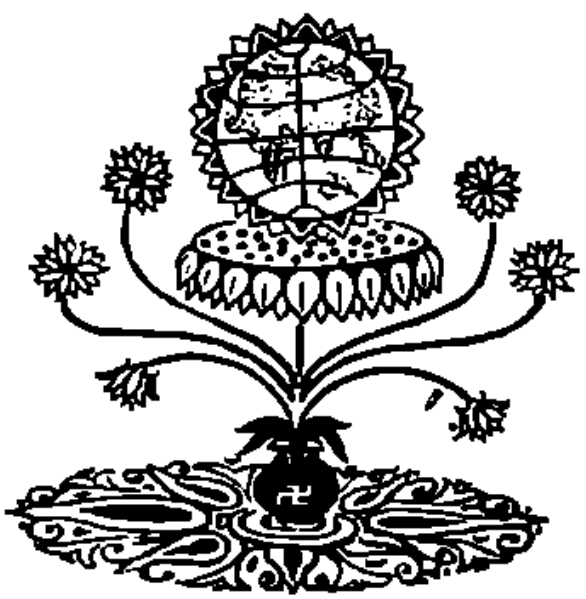

পৃথিবী ব্রত

চৈত্র-সংক্রান্তি থেকে সুরু ক'রে সারা বৈশাখ মাসে ঘরে পৃথিবী ব্রত ক'রে থাকেন বাংলাদেশের কুমারী, সধবা, বিধবা সকল শ্রেণীর নারীগণ। চার বছরে এই ব্রতের প্রতিষ্ঠা বা উদ্‌যাপন।

ব্রতীরা উঠানের পরিষ্কার জায়গায় পদ্মফুল, পদ্মের পাতা এঁকে তার ওপরে পৃথিবীর আলপনা অঙ্কিত করে। তারপর ব্রতী একটি করে শাঁখ, একটু

মধু, একটু দুধ ও ঘি নিয়ে আলপনায় ঢেলে দিয়ে মন্ত্র বলে—

এস পৃথিবী বস পদ্মে
শঙ্খ চক্র গদা হস্তে
খাওয়াব দুধ মাখাব নবী
মনে হবে রাজরাণী॥

এই মন্ত্র তিনবার বলে ব্রতীরা উলু দিয়ে শাঁক বাজিয়ে মা বসুমতীতে প্রণাম করে—

বসুন্ধরা দেবী মাগো করি নমস্কার
এই পৃথিবীতে জন্ম যেন না হয় আমার।

যে পৃথিবী সুখ-সম্পদে, আশা-আকাঙ্ক্ষায় নারী-জীবন ভরিয়ে রাখে, সেই পৃথিবীর প্রতি কৃতজ্ঞতাকেও যেমন লক্ষ্য করা যায় আবার এই ইহলোকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য নয়—বাংলার নারী মনের সে আকাঙ্ক্ষাকেও ব্যক্ত হতে দেখা যায় এই ব্রতে—পৃথিবীতে জন্ম যেন না হয় আমার।

"জাতির জীবনে ভালবাসার স্থান, তাহার রাজনীতিতে কোথায়? সে ভালবাসা দেশের প্রতি ভালবাসা, স্বজাতির প্রতি ভালবাসা, জাতির গৌরব মহত্ত্ব ও সুখের প্রতি ভালবাসা, স্বজাতির জন্য সর্বত্যাগের—স্বদেশীয় আনন্দের জন্য—তাহাদিগের দুঃখ-দুর্দশা দূর করিবার আগ্রহের জন্য ভালবাসা। দেশের ভূমি স্পর্শে যেন দেহও পুলকে শিহরিয়া উঠে। ভারতে সাগর—সলিল—গন্ধ—স্নিগ্ধ বায়ুর স্পর্শ মানুষকে সুখী করে। ভারতের পর্বত হইতে প্রবাহিত নদীর দর্শনে ও ভারতীয় ভাষার শ্রবণে যে আনন্দ তাহাই সেই ভালবাসার মূল। আমাদের অতীতের জন্য গর্ব, বর্তমানের বেদনা ও ভবিষ্যতের জন্য আগ্রহ তাহার কাণ্ড ও শাখা।

আত্মত্যাগ ও আত্মবিস্মৃতি, আর দেশের জন্য কষ্ট সহ্য করা তাহার ফল। আর যে রস তাহাকে জীবিত রাখে, তাহা দেশে ভগবানের মাতৃরূপ উপলব্ধি, দেশ মাতৃকার ধ্যান ধারণা ও সেবা।"

—শ্রীঅরবিন্দ

গম্ভীরা

মণিপদ্ম

বর্ষ শেষ হয়ে আসে। শিবপ্রসাদে অশিব অর্থাৎ অমঙ্গল দূর হোক্—সমাজ, সংসার, পরিজন থেকে সকলেরই মঙ্গল যাতে হয়—তারই জন্যে শিবের পূজা।

গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে, পথে পথে সন্ন্যাসীর মেলা—লাল রঙের পথের ধুলোয় গেরুয়া রঙের সমাবেশ—'শিবনাথ কী জয়!'

গম্ভীরা

সন্ন্যাসী শিব আজ থেকে পূজা পাবেন। কিসের পূজা? সামনে নব বৈশাখ—নতুন বছরের নব-সম্ভাবনাকে নিয়ে আসুক! কৃষিপ্রধান বাংলা-দেশের মাঠ জুড়ে নতুন ধানের বীজ রোপন করা হবে—নবজলধারার স্নেহস্পর্শে সবুজের প্রাণ-সঞ্চারিত হয়ে উঠবে—দেশের লোক খেতে পাবে,—এই তো বর্ষ-কামনার মূল মন্ত্র!

রোগ, শোক, আধিব্যাধি—সামাজিক অকল্যাণ—রুদ্রশিব ধ্বংস করুন—মঙ্গলকে প্রতিষ্ঠা করে দেশ এবং ঘরের কল্যাণ সাধিত হোক—গম্ভীরের নিকট সমবেতভাবে এই প্রার্থনাই শিবের পূজার সামাজিক রূপ।

আধ্যাত্মিক উন্নয়নের সঙ্গে দৈহিক পরিতৃপ্তি—তার সঙ্গে সমাজ-কল্যাণ-বোধই বাংলার ধর্ম-অনুষ্ঠান রীতি।

'ড্যাডাং ড্যাডাং ড্যাং ড্যাং-আ ড্যাং'—চাকের বাজনায় শুধু মনের কামনা নয়, শুধু আত্মিক উৎকর্ষের গর্জন নয়,—ব্যক্তি এবং মূল সমাজ সংস্কার সাধনার সুর।

'শিব তোমার লীলাখেলা কর অবসান
ছাপে হল নাকো ধান।'

দেশে যান হয়নি, আসন্ন দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া থেকে কৃষিবলকে উদ্ধার করো তবেই তো শিবনাথের মাহাত্ম্যকে অনুভব করা যাবে।

'ধর ধর ধর ছিল না ছাড়্যা!'

দেশের এই দুর্দিনে বাংলার গ্রাম-সমাজের নায়কের দায়িত্ব অনেক। তাঁকে গ্রাম এবং সমাজ ছেড়ে উর্ধ্বে কৈলাসে যেতে দেওয়া হবে না—গম্ভীরার লোকশিল্পীর এই আকুতি। উত্তরবঙ্গের গ্রামে গ্রামে, জেলায় জেলায় বর্ষশেষ এবং বর্ষারম্ভের সন্ধিক্ষণে শিবপূজার এই হচ্ছে লৌকিক রীতি—যার নাম গম্ভীরা।

মালদহে গম্ভীরার প্রসার সর্বাধিক। ধর্মীয় সংস্কার থেকে লোক-সংস্কৃতির পথে মালদহের গম্ভীরার পালচারণা।

অতীতকালের ধর্মনিরঞ্জন দেবতা ধবল খাটে ধবল পাটে অধিশয়ান ছিলেন, তাঁকে মৃত্তিকার ভূমিতে এনে পূজা দেওয়া হয় 'শিবনাথ কী মহেশ' বলে। এই শিবনাথ শ্মশানচারী, তিনি নন্দীভৃঙ্গী সমেত সপার্ষদ গ্রামের মানুষ। তাঁর অঙ্গের বিভূতি হচ্ছে ভস্ম; অর্থাৎ বৈরাগ্য। হাতে ত্রিশূল—তিনি গ্রামের শাসনকর্তা। কণ্ঠব্যাপী ভাসটা,—অর্থাৎ সর্প।

এই শিব শ্মশানে রাত কাটান; ক্ষেতে চাষবাস করেন, তাঁত বুনেন।

বর্ষশেষে এবং বর্ষারম্ভে তাঁরই পূজা—উত্তরবঙ্গের গ্রামীন সন্ন্যাসীদের মধ্যে।

গম্ভীরা হচ্ছে শিবের পূজা। শিবের অপর একটি নাম গম্ভীর। গম্ভীর থেকেই উৎপন্ন শব্দ গম্ভীরা।

চণ্ডীমণ্ডপ গৃহবিশেষকে গৌড়বঙ্গে গাম্ভীরি বা গম্ভীরা নামে অভিহিত করা হত পূর্বকালে। শিবালয় বা শিবের পূজাস্থানকেও বলা হয় গম্ভীর।

গম্ভীরা অর্থাৎ শিবের পূজা উৎসব বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গে গাজন, পূর্ববঙ্গে নীল এবং উত্তরবঙ্গে শিবের উৎসব গম্ভীরা নামে খ্যাত।

চৈত্রের গাজনের অনুরূপ গম্ভীরা উৎসব। শিবভক্ত সন্ন্যাসীগণ শিবনাম কীর্তন করে থাকেন এই উৎসবে।

'ধান ভানতে শিবের গীত'—বাংলাদেশের এই প্রবাদ বাক্যটির মধ্যে গম্ভীরার গীত গান গুলিকেও ফেলা যায়। কেননা গম্ভীরা গানে নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়। চৈত্র মাস থেকে শিবের উৎসবে অনুষ্ঠিত যে সব নৃত্যগীত তাই উত্তরবঙ্গের গম্ভীরা। আজের গম্ভীরা থেকে আজকের গম্ভীরায় শিবঠাকুরই হচ্ছেন নায়ক। ধর্ম-সংস্কার থেকে সমাজ-সংস্কারে গম্ভীরা প্রগতিশীল। ধর্ম-সংস্কারের যাবিছু আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কার্য তা সাধন করা হয় গম্ভীরায়। শিবভক্ত সন্ন্যাসীরা কঠোর সংযম পালন করেন—নিত্য শিব পূজাও করেন একমাস ধরে। দেহশুদ্ধি, অন্তরশুদ্ধি হয় কঠোর বিধিনিষেধের তপশ্চারণায়। ভক্ত ভগবানকে পরিতুষ্ট করবার জন্যে পূজা-অর্চনা নিয়মিত করে থাকেন। আহারে, বিহারে সংযম পালনের সুকঠিন সর্ত। গম্ভীরার আনুষ্ঠানিক ধর্মীয় সংস্কার সেগুলি। আবার অপরপক্ষে শিবভক্তগণ নৃত্যগীতে শিবের আরাধনা করে শিব নাম মাহাত্ম্য প্রচার করে থাকেন।

গাজনের ন্যায় গম্ভীরার শিব শুধু ধর্মের অধিনায়ক নন। তিনি বাঙালী গ্রাম্য-সমাজের একজন সামাজিক মানুষও বটে। তাই গম্ভীরার আসরে শিবকে আহ্বান করে তাঁর অবগান সাঙ্গ

করা হলে সাধারণ মানুষের নানা সমস্যা—দুঃখ, অভাব-অনটনের কথাও ব্যক্ত করে তার প্রতিকার প্রার্থনা করা হয়। পদ্মকুলে সুসজ্জিত গম্ভীরা গানপীঠ—যেখানে শ্মশানেশ্বর শিব আসেন, সঙ্গে নন্দীভৃঙ্গি। কৈলাসাধিপতি শিব শুধু পরমজন হয়ে সমাজ-সংসারের উর্দ্ধে ধর্মের সামনে বসে পূজা পাবেন গম্ভীরায়—তা হবার উপায় নেই।

ধর্ম থেকে সমাজ এবং সমাজ থেকে রাজনীতি পর্যন্ত গম্ভীরা নৃত্যগীতের উপজীব্য বিষয়-বস্তু। গম্ভীরা গানে ব্যঙ্গের সুরটিই প্রধান।

'গাঁয়ের মানুষ উজাড় হইল ইনফ্লুয়েঞ্জার জ্বরে
ভোলা, বাঁচি কানুন কইরে!
আইলো ম্যাথ পাঁসিয়া—ধান গ্যাল ফাঁসিয়া
মহাজনের চোরা বাজারে—
ভোলা তুই তাদের করিলি গাঁয়ের রাজারে—!
সকলি দেইখ্যা—তবু নাক ডাইক্যা
ঘুমাও গইয়া খাইয়া গাঁজারে!'

ধর্মনীতি থেকে গম্ভীরা গান সমাজনীতি এবং রাজনীতিতেও প্রগতিশীল। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে গম্ভীরা গানের অবদান বহু। গম্ভীরা নৃত্যও ধর্মীয় অনুষ্ঠান। পৌরাণিক নানা কাহিনী অবলম্বন করে এই নৃত্য প্রচলিত। গ্রাম্য শিল্পীরা এই নৃত্যে মুখোস ব্যবহার করে থাকেন এবং সে এক অভিনব দৃশ্য হয়।

ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে গ্রামের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিচ্ছবিও গম্ভীরা নৃত্যে দেখা যায়। যেমন, চাষী চাষ করছে, জেলে মাছ ধরছে। এই সব নৃত্যের কলা-কৌশলও চমৎকার।

গম্ভীরায় পরী নৃত্য—শীতিধর্মী বা লিরিক্যাল। সাদা পোষাকে পাখনা মেলে পরীর দল মাটির জগৎ থেকে ঊর্ধ্বলোকে উড়ে যায়—গম্ভীরার সেই নৃত্যদৃশ্য অপূর্ব।

শিবকে উপলক্ষ্য করে শিবভক্ত উত্তরবঙ্গের গ্রামীন মানুষ গম্ভীরার মধ্যে নিজেদের শিল্প-চেতনাকে জনসমাজে মেলে ধরে। বাংলার এই লোকশিল্প বর্ষশেষ এবং বর্ষারম্ভকে সম্বর্ধনা জানিয়ে গ্রামের মানুষের মনের কথাই নিবেদন করে।

বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক আনাতোল ফ্রান্সের মতে পুস্তক সমালোচনা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মধ্যে আত্মার অভিযান।

চৈত্র মাসের সঙ

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

চৈত্র মাসের শেষে—রৌদ্র যখন "কাটকাটা", আকাশ যেন আগুনভরা, তখন এই সঙ বাহির হইত। বাঙ্গালী সঙ সাজিত, বাঙ্গালী পুরুষ ও নারী সঙ দেখিত। তখন বিদ্যুচ্চালিত পাখা ছিল না—"এয়ারকণ্ডিশন" তো পরের কথা। কিন্তু বাঙ্গালী মূর্চ্ছিত হইত না—রৌদ্রে দাঁড়াইয়া সঙ দেখিত, হাসিত, রঙ্গব্যঙ্গ উপভোগ করিত।

গল্প আছে—বড় অফিসের "বড় সাহেব" খসখসের ভিজা পর্দা দেওয়া ঘরে টানাপাখার নিম্নে বসিয়া বুঝিতে পারিতেন না—তাঁহারই বিল "সরকার" কিরূপে দ্বিপ্রহরে রৌদ্রে ক্যাম্বিসের ব্যাগ হাতে করিয়া বিল ছাড়িত—টাকা আদায় করিয়া আনিত। একদিন তিনি অফিসে আসিয়া "বড় বাবুকে" ডাকিয়া পাঠাইলেন—তাঁহার "খুলিল মনের দ্বার"—হাসিয়া তিনি বলিলেন, এত দিনে তিনি রহস্য ভেদ করিয়াছেন। তখন ছেলেদের তৈলসিক্ত করিয়া সিঁড়িতে শয়ন করাইয়া রৌদ্রে কিছুক্ষণ রাখা হইত যাহাকে sunbath বলে তাহাতে তাহাদিগের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইত। "বড় সাহেব" গাড়ীতে অফিসে আসিবার সময় পথের ধারে ঐ দৃশ্য দেখিয়া স্থির করিয়াছিলেন—ছেলে ভবিষ্যতে "সরকার" হইবে বলিয়া শৈশব হইতে তাহাকে ঐ ভাবে প্রস্তুত করা হইতেছে—অর্থাৎ তিনি বুঝিয়াছেন—"সরকার বানাতা।" তিনি জানিতেন না—বাঙ্গালী শীতের শৈত্য, বর্ষার বৃষ্টি, গ্রীষ্মের রৌদ্র সহ্য করিতে পারিত—কাতর হইত না।

কিন্তু চৈত্র মাসের শেষে এই সঙের পরিকল্পনা কেন? চড়কে শিবের বিবাহ—শিব বিবাহ করিয়া পার্ব্বতীকে লইয়া কৈলাসে যাইতেছেন—সঙ্গে বহু ভূত। সেই ভূতরাই সঙ।

সেকালে সঙের ছড়া ও গান মোটা রসিকতায় পূর্ণ থাকিত। কিন্তু সে সকল রচনার বৈচিত্র্যের সঙ্গে নৈপুণ্য দেখা যাইত। গানগুলির অর্থ দুই প্রকার—"বুঝিবে যেমন যার মন।" সে সব গান তুলা ধুনা—সাঁধা পরা ইত্যাদি সম্বন্ধীয়। এখন আর উদ্ধৃত করিতে প্রবৃত্তিও হয় না, সাহসও হয় না।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

"আগেকার দেশীয় ব্যঙ্গ প্রণালী এক জাতীয় ছিল—এখন আর এক জাতীয় ব্যঙ্গে আমাদিগের ভালবাসা জন্মিতেছে। আগেকার লোক কিছু মোটা কাজ ভালবাসিত। এখন সরুর উপর লোকের অনুরাগ। আগেকার রসিক, লাঠিয়ালের ন্যায়, মোটা লাঠি লইয়া সজোরে শত্রুর মাথায় মারিতেন, মাথার খুলি কাটিয়া যাইত। এখনকার রসিকেরা ডাক্তারের মত, সরু স্যানসেটখানি বাহির করিয়া কখন কুচ করিয়া ব্যথার স্থানে বসাইয়া দেন, কিছু জানতে পারা যায় না, কিন্তু হৃদয়ের শোণিতকণ্ঠ মুখে বাহির হইয়া যায়।"

ঈশ্বর গুপ্ত ও দীনবন্ধু মিত্র সাহিত্যে সেকালের রসিকতা ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের হাতে পাকা বাঁশের মোটা লাঠি, বাহুতেও অমিত বল, শিক্ষাও বিচিত্র।"

সেকালের সঙের ছড়ায় ও গানে আমরা সেই বিচিত্র শিক্ষার পরিচয় পাই। কিন্তু সে সব বর্ত্তমান রুচিবিরুদ্ধ—অনেক স্থানেই বর্জন করিতে হয়।

কলিকাতার কাঁসারী পাড়ায় সঙের পৃষ্ঠপোষকদিগের অন্যতম ছিলেন—কৃষ্ণদাস পাল।

জেলে পাড়ার সঙ প্রথমে নেকালের সঙের মত ছিল। তাহার পরে যখন কলিকাতায় প্লেগভীতি দেখা দিল, তখন এমন অবস্থার উদ্ভব হইল যে জেলেপাড়ার সঙ বন্ধ করিতে হইল। প্লেগ বোম্বাই সহরে দেখা দিলে বিদেশী সরকার তাহার বিস্তার নিবারণ করিতে যে ব্যবস্থা করিলেন, তাহা প্লেগ অপেক্ষাও ভয়াবহ হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহারা তাঁহাদিগের অনুমোদিত স্বাস্থ্যোন্নতিকর ব্যবস্থা প্রয়োগ করিতে ইংরেজ সৈনিকও নিযুক্ত করিলেন—তাহারা কেবল যে লোকের সংস্কারবিরোধী কাজই করিতে লাগিল, তাহা নহে—স্ত্রীলোকদিগের উপর অত্যাচারও করিল। তাহার প্রতিবাদ করায় বালগঙ্গাধর তিলক ('কেশরী' পত্রের সম্পাদক) আদালতে অভিযুক্ত হইয়া গুরু দণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। দীর্ঘ চারি বৎসর পরে ভারত সরকার স্বীকার করিলেন, তাঁহারা ভুল করিয়াছিলেন—লোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা সফল করা যায় না। তখন ইংলণ্ডের 'রিভিউ অব রিভিউজ' পত্র লিখিলেন :—

"The Government last month publicly confessed its mistake and abandoned an attempt to force upon the population a sanitary supervision which did violence to their feelings. It would be well if this axiom were written up at large in every Government office."

বোম্বাই সহরে যাহা হইয়াছিল, তাহার সংবাদ কলিকাতার লোককে আতঙ্কিত করিল; লোক দলে দলে সহর ত্যাগ করিতে লাগিল। বন্দরের কাজ বন্ধ হইল। শেষে ছোটলাট অনন্যোপায় হইয়া ঘোষণা করিলেন—অসম্মতি থাকিলে কোন স্বামীকে স্ত্রীর নিকট হইতে বা কোন স্ত্রীকে স্বামীর নিকট হইতে (হাসপাতালে) লইয়া যাওয়া হইবে না। ঘোড়ার গাড়ীতে যাওয়া রেল ষ্টেশনে যাইবার পথে গর্ভিণী সেতুর উপর প্রসূত হইল। যাহারা গ্রামে—বহুদিনের ত্যক্ত গৃহে গেল, তাহারা কেহ কেহ ম্যালেরিয়ায় মরিল—ইত্যাদি।

এই অবস্থায় সঙ বাহির করা যায় না।

এই সঙের জন্য ব্যয় অল্প হইত না। সে ব্যয়—বাজের অধিক মূল্য দিয়া কলিকাতার অধিবাসীরা indirect taxation সহ্য করিত। তবে তাহা লোক অনুভব করিতে পারিত না। সঙের জন্য রাস্তার ৩ ঘণ্টার জন্য "পাশ" লইতেই যে টাকা দিতে হইত, তাহা নহে—সারা বৎসর অন্যরূপে ব্যয় হইত।

জেলে পাড়ার সঙ

আজ পুলিসের বড়কর্ত্তার বাড়ীতে সমারোহ—ভেটকী মাছ দিতে হইবে ; আজ বড় দারোগাবাবুর বন্ধার "সাধ"—চিতল মাছ যোগাইতে হইবে—ইত্যাদি লাগিয়াই থাকিত। তাহার পরে ছোট দেবতাদের কুচো নৈবেদ্যে পূজা দিতে হইত। তদ্ভিন্ন লাভ-সরস্বতী, যষ্ঠিদেবীর গাড়ী ভাড়া—এসব অনিবার্য্য ছিল।

কলিকাতার জেলেপাড়ার মৎস্য ব্যবসায়ীরা ঐ এক দিন আনন্দ করিতে ও লোককে আনন্দ দিতে—এসব অনায়াসে সহ্য করিতেন।

সে যাহাই হউক প্রেগের আতঙ্কে যখন সঙ বন্ধ হইয়া গেল, তখন মৎস্য ব্যবসায়ীরা যেমন দুঃখিত হইলেন—সহরের ও সহরতলীর লোকও তেমনই দুঃখিত হইল। এই সঙ দেখিতে বর্দ্ধমান, তারকেশ্বর, রাণাঘাট প্রভৃতি স্থান হইতেও বহু লোক আসিতেন। ইহা একটি বার্ষিক অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল।

দীর্ঘ পঞ্চদশ বর্ষকাল কাটিয়া গেল। লোক ভুলিলেও মৎস্য ব্যবসায়ীরা কিন্তু সঙ ভুলিতে পারিলেন না। তাঁহারা আবার সঙ বাহির করিলেন। কিন্তু এক নূতন ও অপ্রত্যাশিত বিঘ্ন দেখা গেল। দীর্ঘ পঞ্চদশ বর্ষে সেকালের স্থানে একাল আসিয়াছিল—লোকের রুচির পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। সেকালের ছড়া ও গান আর লোককে আকৃষ্ট করিতে পারিল না।

তখন তরুণরা কি করিবেন, ভাবিতে লাগিলেন। গোষ্ঠবিহারী বিশ্বাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র যতীশচন্দ্র তখন কলেজের ছাত্র। তিনি ও তাঁহার বন্ধুরা অনেক চিন্তার পরে স্থির করিলেন—সঙের রঙ পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে—তাহাকে কালোপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে।

তখন—ওদিকে যেমন "পঞ্চানন্দ"—ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—এদিকে তেমনই অমৃতলাল বসু—"রঙরাজ"। কয়জন যুবক টার থিয়েটার হইতে অমৃতবাবুর ঠিকানা (সে-ও ভুল) সংগ্রহ করিয়া একদিন মধ্যাহ্নে শ্যামবাজার পল্লীতে অমৃতবাবুর গৃহে উপনীত হইয়া তাঁহাকে জেলেপাড়ার সঙের জন্য ছড়া ও গান রচনা করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন।

অমৃতবাবু সব শুনিলেন—প্রস্তাব নূতন ; কিন্তু প্রস্তাব শুনিয়া তাঁহার "চক্ষুকে পিঠে" চকল হইয়া উঠিল। তিনি যুবকদিগকে বলিলেন—পুরাতন ছড়া ও গান কতকগুলি তাঁহাকে দিলে তিনি চেষ্টা করিয়া দেখিবেন।

তাঁহার কথায় তরুণরা যেন "উৎসাহে বসিল রোগী শয্যার উপরে।" তাহারা পুরাতন ছড়া ও গান—যাহা পারিলেন সংগ্রহ করিয়া আবার অমৃতবাবুর দ্বারস্থ হইলেন।

কল ভালই হইল। অমৃতবাবু লিখিতে সম্মত হইলেন।

অমৃতবাবু প্রথম যে গান রচনা করিলেন—তাহা পুরাতন ভাবের—তাহাতে সেকালের রুচির ছাপই অধিক। কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় রচনা কালোপযোগী—নবীন রুচির অনুমোদিত হইল। তাহাই নূতন সঙের ছড়ার ও গানের আদর্শ হইয়া রহিল। পরে—নানা সঙের জন্য ছড়া ও গান বাঁধিবার সময়ের অভাব ঘটিলে তাঁহারই পরামর্শে সঙের পরিচালকগণ অন্যান্য লেখকের নিকট যাইতে লাগিলেন। আমি তাঁহাদিগের একজন—আর একজন কবি কালিদাস রায়—তখন তিনি, বোধ হয়, কেবল কলেজ ছাড়িয়াছেন।

সমসাময়িক একটি ঘটনা লইয়া অমৃতবাবুর গান—"বিদ্যার মন্দিরে সিঁধ" (১৯১৭ খৃষ্টাব্দ)। তখন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পরে দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ; ডক্টর নরেন রেজিষ্ট্রার,

আর চন্দ্রমুখ মৈত্র তাঁহার সহকারী। যানে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের সঙ্গে মিল রাখিয়া পরীক্ষার প্রশ্নপত্র। চুরির ব্যাপার এইরূপে কীর্তিত হয় :—

"বিদ্যার মন্দিরে সিঁদ কেটেছে কোন্ চোরে ?
সখীরা সেবকী নাকি পড়ল ফাঁকে—
কেউ দেখেনি ঘুমের ঘোরে ?
বিদ্যে সর্ব্ব বিদ্যে অধিকারী
দেব প্রসাদে ওমোর যেভারি
নইলে নারী হয়ে অন্যের নারি
করেন তিনি কোন্ জোরে ?
বিদ্যে নিত্য পূজে আশুতোষে থাকে উপোষে
আজকে পূজোর দেরী বলো মালিনীর দোষে
সে আসেনি ভোরে ॥
সেই রোষে কি নন্দী ভৃঙ্গী
শিবের বরে সবাই বিজ্ঞী
ক'রে ভূতের ভঙ্গী রঙ্গময়ীর
গোপন প্রশ্ন নে যায় হ'রে ?
চন্দ্রমোহন বদনখানি
ঘোমটা দিয়ে ঢাকেন রাণী
নিলেন বত্রিশ বুক্কল ফুলের শয্যা
লজ্জায় বুঝি যা'ন ম'রে ?
জয়ী হ'তে প্রবেশ পরীক্ষায়
পাড়ুয়াবেশে এসে হায়
শুপসিদ্ধুসুত মুখরায়
এই সহরে।
এখন ধূমকেতু তাঁ'র ভাগ্যাকাশে
মশান ভাসে নয়ন-লোরে ॥

একটি ছড়ায়—

"বাপে বাপে ভিন্ন ভঙ্গী
ব্রাহ্মণ বংশে চৌদ্দ ফিরিঙ্গী"

প্রথমে নিঠাবান পণ্ডিত—

ইনি বিজ্ঞান-মণ্ডিত, পরম পণ্ডিত, মুণ্ডিত মুণ্ড
শিরে শিখাধারী ;
উপাস্য তাঁর, নাতের দাস, শিব গোর
হবিষ্য-আচারী ॥

কৌশেয় বসন, কুশের আসন রক্তসূত্রে শোভিত অঙ্গ
কথঞ্চিৎ ক্ষিপ্ত, প্রফুল্লিত চিত্ত শুদ্ধব্রত সদা সাধুসঙ্গ।
শুদ্ধা বিদ্যাদান সর্ব্বত্র সম্মান বিষয়-বিভব-ঘৃণ-চিন্তাশূন্য
হৃদয়ে অমলা গৃহিণী কমলা সাক্ষাৎ তীর্থ স্বামিসেবা পুণ্য
চিরকান্ত আত্ম বীরতা প্রকাশ্য নাহিক আলস্য
রন্ধনে আনন্দ অধিক।
ভোজনের জন্য আয়োজন অল্প প্রয়োজনে পায়
অতিথি পথিক ॥

কিন্তু—

"এ পবিত্র চিত্র যার নেত্র হ'তে স'রে।
পাশে দেখ পুত্র ব'সে অন্যরূপ ধ'রে।

এই পুত্র—

"পণ্ডিতের পুত্র ইনি পুরুতঠাকুর।
কলুর কলার লুসে ভুলেন ঢেকুর ॥

তাঁহার পুত্র—

ভট্টাচার্য্যের তেউড় ক্রমে এল, এ করে পাশ ;
বংশের মাঝে হ'লেন খাড়া বেয়াড়া বেউড় বাঁশ

আর এক বাঁশ—ইঁহার পুত্র—

ব্রাহ্মণত্ব চুলোয় যাক, নাই যজ্ঞচিহ্ন অঙ্গে।
ফিরিঙ্গী সেজে দাঁড়িয়ে আছে কে দেখছ রঙ্গে।
ইনি ঐ পরম পণ্ডিত বিপ্রবরের প্রপৌত্র,
পবিত্র গঙ্গাজলের স্থলে যেন গর্দ্ধভের মূত্র।
ছিলেন প্রপিতাম' অগ্নিহোত্র
বাপ পোড়ালেন যজ্ঞসূত্র
ইনি এখন গোত্রহারা ঘা-ঘরে।

ইনি বাঙ্গলা অশন, বাঙ্গলা বসন, বাঙ্গলা আসন
বাঙ্গলা ভাষণ
সব ভাসালেন সাগরে ॥

বাবু খাতা খুলে চাঁদা তুলে নিয়ে টাকার রাশ
গিয়েছিলেন বিলেত বাসে শিখতে অরীচার।
হয়ে পাশকরা চাঁদা দেশের আশা—দেশে এসে কি
ভাবছেন, দোকা করবেন কলুপাড়ে, শুকা বামনা
চিরে ॥

পটোল গাছে ঝাঁকনী দিয়ে পাড়বেন বলে কল,
কাগজে একেছেন ইনি আশ্চর্যি এক কল।
অনেক আলু কেটে বীজ না পেয়ে ভিতরে
আগানেতে ইন্‌ভেণ্ট দেছেন আলুর বীজের তরে।
নিজের গোঁকে চাব দিয়েছেন কামিয়ে দু'টি ধার
বাঁচের দিকে বেড়া মাথা, সামনে বাস-বাহার।
মাথার উপর বুচুনী চাপা, গায়ে মস্ত কোট
চুরুট চেপে ধ'রে আছে দু'টি ভস্মমাখা ঠোঁট।
বড় জুটেনি গলায় দিতে তাই নেকটাই আছে এঁটে
পেটটি ভরান পেলেটিতে পাতের পোলাও চেটে।
এর আছে আবার মেম—ঘরাসী ঘরের miss
mother homeএ কাপড় কাচতেন
three pence a piece.

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ফিরিঙ্গী পুত্র
ভট্টাচার্যের বংশধর এখন মিষ্টার ভ্যাট
বিশিতি বামনী কিবলে বিউবে তাবছি আমি that,

সুরেন্দ্রনাথ—শেষে যখন সার সুরেন্দ্রনাথ হইলেন
তখন—
হায়! হায়! যিনি এতদিন ছিলেন টাইট
ব'লে—রাইট—রাইট—রাইট—
করলেন যেথায় সেথায় ফাইট—
যিনি আজ নাইট হয়ে নাইটদারা
সাইট কেবল বেড়ান।

সেকালের বিল সরকার

যখন "বয়কট" প্রবর্তিত হইল, তখন বাঙ্গালীর
গৃহিণীদিগকে আহ্বান—
বল মা ডেকে তোর পতিকে
উকিলী ছাড়ুক কোন গতিকে

তুচ্ছ করে টাকা কড়িকে, তুইকরুক ঘরের সতীকে　　ঘুচিয়ে অনেক দিনের ভুলভ্রান্তি
কিনে ত্যাগী যোগী নাম।　　ঘরের কাজে মন যে সবাই হয়ে শান্তিহারা॥
তুইও বল মা তাঁকে ডেকে　　কাজ কি শক্তির রাজনীতিতে
আজি যেন আর না দেখে　　থাকুক সিঁদুর বজায় তোর সিঁথিতে
দেখেছ ত অচল চেকে　　চ'লে সুচরিতে নিজের রীতিতে,
কেবল পাওনাদারে ঘরে ছেঁকে　　উড়বে নিশান এ জগতে,
পেট ভরে না ঝরিয়ে মাথার ঘাম॥　　উপর থেকে আশীষ দিতে
আজ চৈত্র মাসের শুভ সংক্রান্তি　　আসবেন হরহারা।
চুকিয়ে গুঁড়ির যেনা কড়াক্রান্তি

সুভাষচন্দ্র বলিয়াছিলেন—পরাধীন জাতির রাজনীতি ধাতীত কোন চিন্তা নাই ; রাজনীতি তার জাগরণের চিন্তা—নিদ্রায় স্বপ্ন। দেশ যখন স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল হইল—সব ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইল—বাঙালীর ছেলে যখন গাহিল—

সঙ

আমায় বেত মেরে কি মা ভুলাবি ?
আমি কি মা'র সেই ছেলে ?
দেখে রক্তারক্তি বাড়াবে শক্তি—
কে পালাবে মা ফেলে ?

তখন জেগে পাড়ার সঙ—দেশের প্রতিষ্ঠান কি রাজনীতির প্রভাবমুক্ত হইতে পারে ? তাহা সম্ভব নহে।

সঙ

কিন্তু এক সম্প্রদায়ের লোক তাহাতে প্রমাদ গণিল—তাহারা বাঙালী পুলিসের কর্মচারী ; তাহারা প্রভু ইংরেজকে তুষ্ট করিয়া বেতন বৃদ্ধি ও পদোন্নতির জন্য সব করিতে প্রস্তুত হইতে হইবে—এই শিক্ষা

পাইয়াছিল। হাজার হাজার লোক কাতারে কাতারে এই সব হুড়াগুনে—গান শুনে—মুগ্ধ হয়,ইহা এই সব পুলিস কর্মচারীর কাছে অসহ্য মনে হইতে লাগিল।

পুলিস ৬ ঘণ্টার শোভাযাত্রার নিয়ম কড়াকড়ি পালন করাইতে চেষ্টা করিল—কোন্ পথে শোভাযাত্রা যাইবে তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া শোভাযাত্রার অসুবিধা সৃষ্টি করিতে লাগিল—ইত্যাদি।

আবার এই সময়ে পশুক্লেশ নিবারণী সভা আইন করিলেন, চৈত্র মাসে রৌদ্রের সময় গাড়ীতে মহিষ ব্যবহার করা চলিবে না।

সে যুগের Sunbath দেখিয়া হতবাক বড়সাহেব

টানা পাখার নীচে অফিসের বড় সাহেব

নানা কারণ এক সঙ্গে জুটিল—যেন সপ্তরথী অভিমন্যুবধে সমবেত।

মনে পড়িল—একশ বছর সমান টানে
সঙ্গে সঙ্গে ছিল চাট
বাতাল ছিলেন মস্ত গানে
প্যাণ্ট কোট টাই শার্ট
বিলিতি বোতলে গোরা
উঠিয়ে দিয়ে পুজো পাঠ
গোরার চোলাই করা সে সুরা
ইংরিজি ঠাট, ইংরিজি নাট
নাম তার এডুকেশন।
ইংরিজি ক্যালাস—ইত্যাদি।

কিন্তু আর সঙ রক্ষা করা গেল না। বাঙ্গালীর মন চাহিলেও তাহার সে রঙ আর রাখা গেল না।

সেই জন্য বর্ষান্তে বর্ষশেষে যে সঙ ছিল—একাধারে শঙ্করমাছের চাবুক আর হাসির ফোয়ারায় তাহার আয়ু শেষ হইল।

জেলে পাড়ার সঙ শেষ হইয়া গেল। সে একটি শূন্য রাখিয়া গেল—সে শূন্য কিসে পূর্ণ হইবে?

গল্প-ভারতী

বৈশাখ সংখ্যা—১৩৭০

সম্পাদক :

শ্রীবিভূতিভূষণ দাস

সহঃ সম্পাদক : শ্রীকল্যাণ রায়

মূল্য এক টাকা

শ্রীসুধাংশু কুমার রায় চৌধুরী কর্তৃক ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেড ২১৯বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত এবং কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

এখন থেকে লীটার

এখন থেকে সমগ্র দেশের ব্যবসা বাণিজ্যে পরিমাণমূলক মেট্রিক ওজন ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক ● গত বছরে কিলোগ্রাম ও মীটার বাধ্যতামূলক হয়েছে ; কাজেই মেট্রিক পদ্ধতির ওজন ও পরিমাপ এখন ভারতে একমাত্র বৈধ ওজন পদ্ধতিতে পরিণত হ'ল ● মেট্রিক এককগুলির অন্তর্নিহিত গুণ অনুযায়ী সেই রকম ভাবেই (লীটার, মীটার, কিলো) যদি এগুলি ব্যবহার করেন তাহ'লে মেট্রিক পদ্ধতির সরলতা, আপনার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে ● পুরাণো সের, ছটাকের অনুপাতে মেট্রিক ওজন ব্যবহার করবেন না।

তাড়াতাড়ি কেনাকাটা এবং ন্যায্য লেনদেনের জন্য

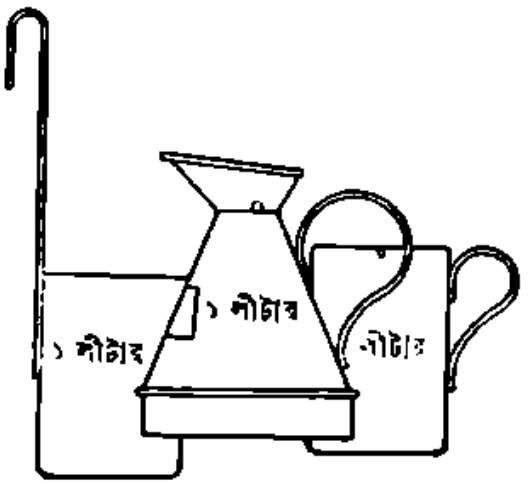

পূর্ণ সংখ্যার

মেট্রিক একক

ব্যবহার করুন

DA 62/819

১৮৮৮ সাল থেকে

ঐতিহ্যের একটি গৌরবময় ধারা বহন করে চলেছে

বিনোদ বিহারী দত্ত

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেণ্টস্

১-এ, বেন্টিক ষ্ট্রীট (মার্কেণ্টাইল বিল্ডিংস্), কলিকাতা

ফোন : ২২-২২৭০

ব্রাঞ্চ :—৮৪, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

ফোন : ৪৭-১২৫৮

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas

Ex. Judge, Calcutta High Court,
Ex-Law Member, Govt. of India

আমি লক্ষ্মী ঘি ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল জিনিষ।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

লক্ষ্মী ঘৃত ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই ভেজালের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—যুগান্তর

লক্ষ্মীঘৃত ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজার প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

লক্ষ্মী ঘৃত ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল।

শ্রীসীতা দেবী

লক্ষ্মী ঘি ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখরোচক।

শ্রীশান্তা দেবী

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়—	৮০৯
উদাত্ত আহ্বান—	৮১০
সঙ্গীত আসর—যে গান বাঙ্গালী কোনদিন ভুলিবে না—রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৮১৩
স্মৃতি দোলায়—প্রেমেন্দ্র মিত্র	৮১৬
অন্তরীক্ষে—(ব্যঙ্গচিত্র)	৮২০
জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৮৩৩
একজন আর কয়েকজন—অনিলকুমার ভট্টাচার্য	৮৩৮
জীবনের যজ্ঞশালায় (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	৮৪১
অমৃত কথা ও কাহিনী—	৮৭৮
ইমান—সমুদ্ধ	৮৪৯
বীরবলের কৌতুক—বররুচি	৮৭৩
পাহাড়ী গাঁয়ের কথা—নীলিমা দাশগুপ্ত	৮৭৯

...এখানার নাম ডেজার্ট ছোটদের
দাক্ষায় মাটখানা,—কে. সি.
দাসের চকোলেট হলে তো কথাই
নেই। কে. সি. দাসের টিনের চক-
োলেট যেমনি সুস্বাদু তেমনি বিশুদ্ধ,
পুষ্টিও ঢের খানা। একটা টিন
খাইই দিখুন—নিজেরাও খান
ছেলেমেয়েদেরও খাওয়ান।

দাম ঃ

ছোট টিন টাঃ ১.২৫
মাঝারি টিন টাঃ ২.৫০
বড় টিন টাঃ ৫.

কে. সি. দাস প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা • বোম্বাই

JWTKCD 2A

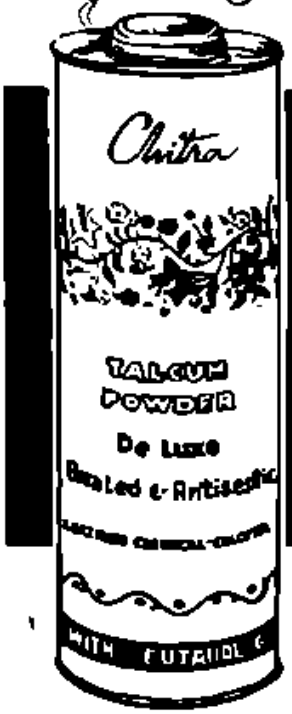

অনুপম প্রসাধনী!

চিত্রা

ট্যালকাম্ পাউডার

ও

স্নো

লোকনাথ কেমিক্যাল

কলিকাতা-২৮

॥ নববর্ষের নূতন সাহিত্য-সম্ভার ॥

জরাসন্ধের নূতন উপন্যাস

ছায়াভীর ৫৲

অবধূতের 'মরুতীর্থ হিংলাজে'র পরবর্তী কাহিনী

হিংলাজের পরে ৫৲

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের নূতন উপন্যাস

মেঘ ও মৃত্তিকা ৫৲

বিমল করের নবতম উপন্যাস

পাঠশালা ৩৷৷০

নীহাররঞ্জন গুপ্তের নবতম উপন্যাস

রাতের রজনীগন্ধা ৪৷৷০ **কিরীটী রায়** ১০৲

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের নূতন উপন্যাস

সন্ধ্যার কুয়াশা ৫৷৷০

প্রশান্ত চৌধুরীর নূতন উপন্যাস

নদী থেকে সাগরে ৮৲

সুমথনাথ ঘোষের নূতন উপন্যাস

রোশনাই ৩৷৷০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের নূতন উপন্যাস

যাত্রাপথ ৪৷৷০

মৈনাকের বিচিত্র উপন্যাস

বহ্নিবলয় ৮৷৷০

বিমল মিত্রের

কড়ি দিয়ে কিনলাম ১ম—১৬৲ ২য়—১৪৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

সাত পাকে বাঁধা ৪৷৷০

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মানসিক পরিশ্রমে মস্তিষ্কের যত্ন একান্ত প্রয়োজন !

যাঁহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, মহাভৃঙ্গরাজ তাঁহাদের পরম কল্যাণকর। এই স্নিগ্ধকর ও আরাম-দায়ক তৈল সর্ব্বপ্রকার ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে, দেহ ও মনকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও কর্ম্মক্ষম রাখে

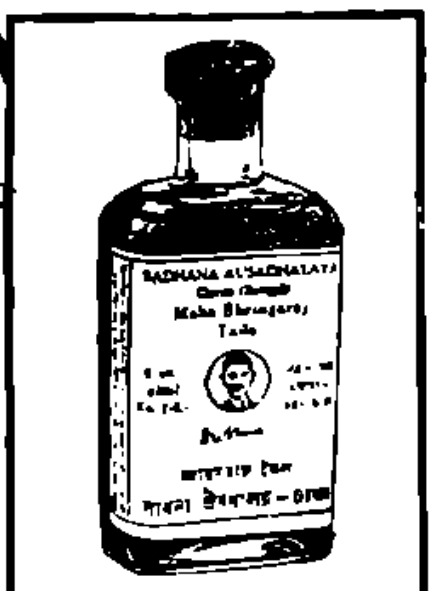

সাধনার

মহা ভৃঙ্গরাজ

তৈল

সাধনা ঔষধালয়-চোঁকা

সাধনা ঔষধালয় লেন কলিকাতা-৫৮

৪৯-3/60

কলিকাতা কেন্দ্র – ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম. বি, বি, এস. (কলিঃ) আয়ুর্বেদাচার্য

অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ.
আয়ুর্বেদবারিধি, এল, সি, এম, (লণ্ডন) এম, সি, এস (আমেরিকা)

এই সংখ্যায়

বিশ্ব-সাহিত্য—

সাহিত্য ও সাহিত্যিক—লরেন্স ডুয়েল—সুকুমার ঘোষ ৮৯২

সাহিত্য সংবাদ—সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠপোষকতা—পবিত্র পাল ৮৯৫

এই প্রথম—বিপ্রলব্ধ—শঙ্করী বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৯৭

দেশ-বিদেশ— ৯০১

বেলাধূলা— ৯০৬

রবীন্দ্রনাথ—

রবীন্দ্রনাথের চিত্রচর্চ্চা—অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ৩

রবীন্দ্রযুগ—ডঃ বাসিদাস নাগ ৬

রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা চিত্রধর্মী লেখন—কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ৮

আশ্রমের কোণে—শ্রীশান্তা দেবী ১৪

রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য—রথীন্দ্রনাথ রায় ১৭

রেখাচিত্রে রবীন্দ্রনাথ ২১

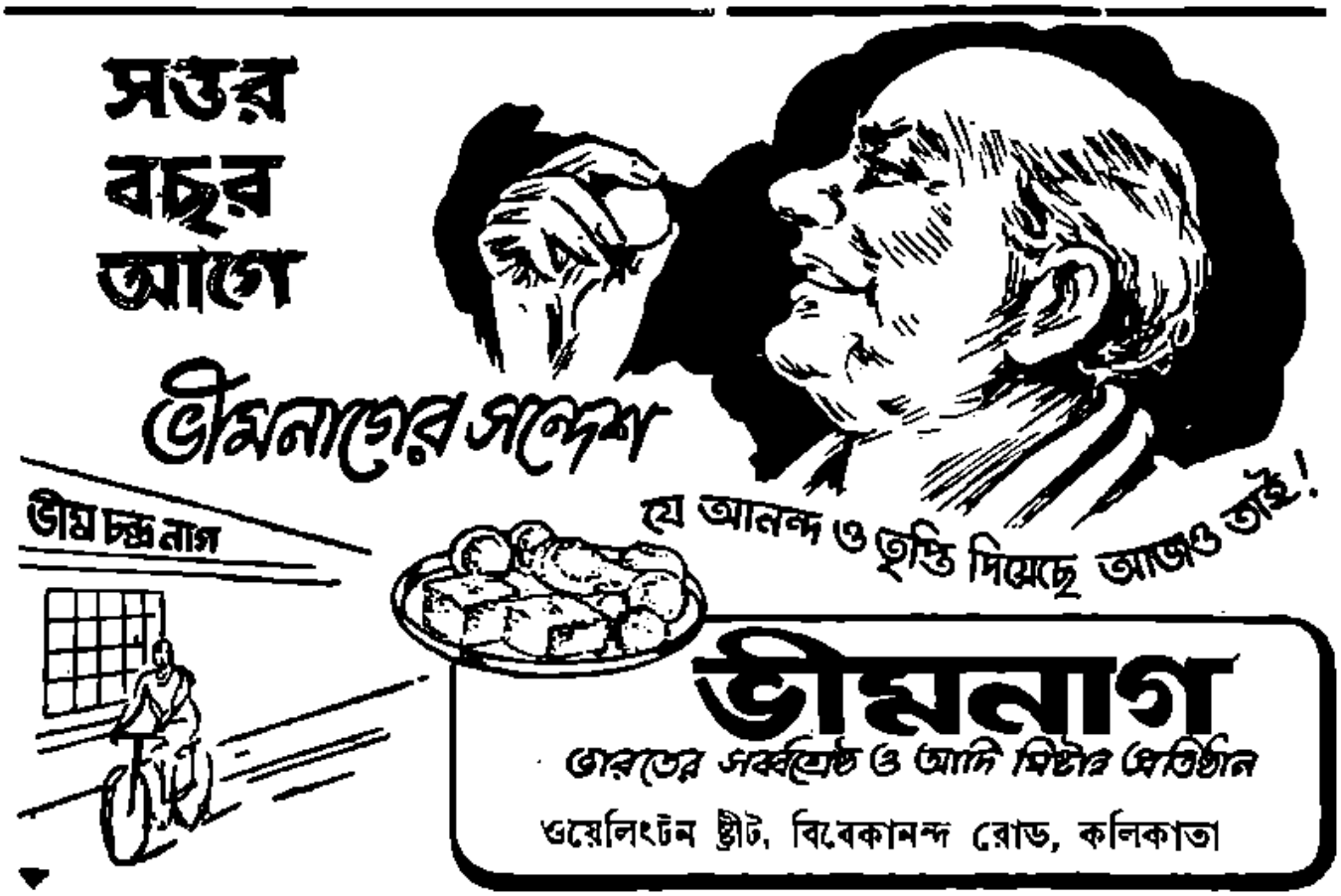

ভয়েস অব আমেরিকার

বাংলা অনুষ্ঠান শুনুন—

প্রত্যহ :

সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৭-৩০ মিঃ

১৯·৭৬, ২৫·৫৮ ও ৪২·১৯ মিটারে

❋ সুলেখা ছোটগল্প প্রতিযোগিতা ❋

সভাপতি : ***তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়*** অবৈতনিক সম্পাদক : ***সাগরময় ঘোষ***

১ম পুরস্কার : ৫০০ শত টাকা ২য় পুরস্কার ২৫০ শত টাকা ৩য় পুরস্কার : ১০০ শত টাকা

এতদ্ব্যতীত যোগ্যতানুযায়ী প্রত্যেককে ২৫ টাকা করিয়া ২২টি পুরস্কার দেওয়া হইবে।

নিয়মাবলী :

১। গল্প বাংলা ভাষায় লিখিত হইবে।

২। যে কেহ এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিতে পারেন।

৩। গল্প পূর্বে কোন প্রতিযোগিতায় দেওয়া বা প্রকাশিত বা হওয়া চাই। গল্প মৌলিক হওয়া চাই।

৪। নকল রাখিয়া লেখা পাঠাইতে হইবে কারণ লেখা কোনও পাঠান সম্ভব নয়।

৫। লেখা এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে বা ব্যক্তিগতভাবে নিম্ন ঠিকানায় জমা দিতে হইবে।

৬। প্রতিযোগিতায় প্রেরিত গল্পের প্রথম প্রকাশনের অধিকার সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেডের থাকিবে।

৭। কমিটির বিচারই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৮। প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের শেষ তারিখ ৯ই জুলাই, ১৯৬৩।

৯। প্রতিযোগিতা কমিটি প্রয়োজনবোধে নিয়মাবলীর পরিবর্তন বা পরিবর্জন করিতে পারিবেন।

সুলেখা ছোটগল্প প্রতিযোগিতা কমিটি

সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২

নতুন রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড

— ৩৩½ আর-পি-এম্ লং প্লেয়িং রেকর্ড —

রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্য

চিত্রাঙ্গদা ECLP 2272

৫৫ আর-পি-এম্ এক্সটেন্ডেড্ প্লে রেকর্ড

পঙ্কজ মল্লিক

আমারে তুমি অশেষ করেছ ; তাই তোমার আনন্দ আমার'পর

দিন যদি হলো অবসান ; ভয় হতে তব অভয় মাঝে

7 ERE 2

কণিকা বন্দ্যোঃ ও শ্যামল মিত্র

এ শুধু অলস মায়া ; বজ্র মাণিক দিয়ে গাঁথা

কণিকা বন্দ্যোঃ ও দ্বিজেন মুখোঃ

আমরা দু'জনা স্বর্গ খেলনা ; আমরা নূতন যৌবনেরি দূত

7 EPE 1007

কৃষ্ণা চট্টোঃ ও তরুণ বন্দ্যোঃ

বাঁধন ছেঁড়ার সাধন ; আমরা পথে পথে যাবো

হেমন্ত মুখোঃ ও লতা মঙ্গেশকর

তোমার হ'ল শুরু ; বধূ গন্ধে ভরা

SEDE 3001

সুচিত্রা মিত্র

জীবন যখন শুকায়ে যায় ; দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে

আগুনের পরশমণি ; কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ

7 EPE 1009

চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়

তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা ; প্রমোদে চালিয়া দিনু মন

পূরবী মুখোপাধ্যায়

এ মণিহার আমায় নাহি সাজে, আমার সোনার বেলা

7 EPE 1008

—— বিস্তারিত তালিকা ডীলারদের কাছে পাবেন ——

হিজ মাস্টার্স ভয়েস * কলম্বিয়া

অনিলকুমার ভট্টাচার্যের

দু'খানি মনোরম উপন্যাস

উপনদী ২·০০

মেঘ পাহাড়ের গান ২·০০

— সুপাঠ্য কবিতার বই —

সাগর আকাশ ২·০০

ডি. এম. লাইব্রেরী

কলিকাতা—৬

কলাইয়ের

সেরা

বাসন কিনতে হলে

এই দুটো দেখেন

দেখে কিনবেন

বেঙ্গল এনামেল ওয়ার্কস লিঃ এর এক্সপোর্ট-ইম্পোর্ট

সেরামিক সেলস্ করপোরেশন লিমিটেড

২৪ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২

নীলিমা দাশগুপ্ত প্রণীত

"পাহাড়ী গাঁয়ের কথা"

পুস্তকাকারে প্রকাশিত হল

দাম — পাঁচ টাকা

●

প্রকাশক : .

এস. সি. সরকার এ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ

১সি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

গল্প-ভারতী
অষ্টাদশ বর্ষ,
বৈশাখ ১৩৭০

"সম্পাদকীয়"

পঁচিশে বৈশাখ :

শুভ পঁচিশে বৈশাখ বাংলা ও বাঙালীর তথা ভারতবাসীর জীবনে আবার ফিরে এসেছে। সমগ্র দেশবাসীর সংগে কবির এই শুভ জন্মদিনে আমরাও কবিকে স্মরণ করছি—স্মরণ করছি সেই মৃত্যুঞ্জয়ী রবীন্দ্রনাথকে যিনি মহৎ এবং বিরাটত্বের প্রতীক—যিনি শুভ এবং মঙ্গলের প্রতীক—যিনি সমস্ত অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে মূর্ত প্রতিবাদ। সমস্ত জীবন ধরে যিনি সত্যের ও সুন্দরের জয়গান গেয়েছেন। স্মরণ করছি সেই রবীন্দ্রনাথকে—যিনি চরমতম বিপর্যয় ও সঙ্কটেও বিশ্বাস হারাননি—আশা প্রকাশ করেছেন—বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে—ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে যিনি অপরাধ বলে মনে করেন।

কবির সংগে আমরাও আজ আশা করব নবযুগের—নব অভ্যুদয়ের।

জাতীয় জীবনের এই চরমতম সঙ্কট মুহূর্তে কামনা করি পঁচিশে বৈশাখ—আমাদের নতুন উৎসাহে—নতুন উদ্দীপনায় স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার মন্ত্রে উদ্দীপ্ত করুক।

আজ আমাদের একান্ত প্রয়োজন সম্মিলিত সাধনার—প্রয়োজন একান্ত শুভবুদ্ধি ও সক্রিয় কর্মপন্থার। আজ ভাববার সময় এসেছে জাতির জীবনে প্রত্যেকের প্রয়োজনীয় দায়িত্ব গ্রহণে আমরা যথাযথ অংশ গ্রহণ করতে পারছি কিনা। আমাদের আজ এক চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হচ্ছে।

আশা করি, বিশ্বাস করি, দুর্গতির রাত্রি অবসানে নবসূর্যোদয়ের সূচনা করুক এই শুভ পঁচিশে বৈশাখ।

ভবানীপ্রসাদ নাগ

উদাত্ত আহ্বান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন—
বন্দেমাতরম্ ॥
আসুক সহস্র বাধা, বাধুক প্রলয়,
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়—
বন্দেমাতরম্ ॥
আমরা ডরাইব না কটিকা-ঝঞ্ঝায়,
অযুত তরঙ্গ বক্ষে সহিব হেলায়,
টুটে তো টুটুক এই নশ্বর জীবন,
তবু না ছিঁড়িবে কভু এ দৃঢ় বন্ধন—
বন্দেমাতরম্ ॥

•

দাও আমাদের অভয়মন্ত্র, অশোকমন্ত্র তব,
দাও আমাদের অমৃতমন্ত্র, দাও গো জীবন নব।
যে জীবন ছিল তব তপোবনে, যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে চিত্ত ভরিয়া লব,
মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ দাও সে মন্ত্র তব।

•

বলো জয় বলো, জয় বলো, জয়—
মুক্তির জয় বলো, ভাই।
চলো দুর্গম দূরপথ যাত্রী
চলো দিবারাত্রি
করো জয়যাত্রা,
চলো বহি নির্ভয় বীর্যের বার্তা
বলো জয় বলো, জয় বলো, জয়—
সত্যের জয় বলো, ভাই।

আজ আমরা ইহা উত্তমরূপে বুঝিয়াছি যে, তফাতে গা-ঢাকা দিয়া বসিয়া থাকাকেই আত্মরক্ষা বলে না! নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে সর্বতোভাবে জাগ্রত করা ও চালনা করাই আত্মরক্ষার প্রকৃত উপায়। ইহা বিধাতার নিয়ম। কোণে বসিয়া কেবল 'গেল' 'গেল' বলিয়া হাহাকার করিয়া মরিলে কোনো ফল নাই।

জয় হইবে, ভারতবর্ষেরই জয় হইবে। যে-ভারত প্রাচীন, যাহা প্রচ্ছন্ন, যাহা বৃহৎ, উদার, যাহা নির্বাক, তাহারই জয় হইবে……

আমাদের যে-শক্তি আবদ্ধ আছে তাহা বিদেশ হইতে বিরোধের আঘাত পাইয়াই মুক্ত হইবে—কারণ, আজ পৃথিবীতে তাহার কাজ আসিয়াছে। আমাদের দেশের তাপসেরা তপস্যার দ্বারা যে শক্তি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, তাহা মহামূল্য, বিধাতা তাহাকে নিষ্ফল করিবেন না! সেইজন্য উপযুক্ত সময়েই তিনি নিশ্চেষ্ট ভারতকে সুকঠিন পীড়নের দ্বারা জাগ্রত করিয়াছেন।

আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরাও ক্ষণে ক্ষণে হতবুদ্ধির ন্যায় বলিয়া উঠেন, দেশ তুমি কাহাকে বলো, আমাদের দেশের বিশেষ ভাবটা কী, তাহা কোথায় আছে, তাহা কোথায় ছিল? প্রশ্ন করিয়া ইহার উত্তর পাওয়া যায় না। কারণ, কথাটা এত সূক্ষ্ম, এত বৃহৎ যে, ইহা কেবল মাত্র যুক্তির দ্বারা বোধগম্য নহে। ইংরাজ বলো, ফরাসী বলো, কোনো দেশের লোকই আপনার দেশীয় ভাবটা কী, দেশের মূল মর্মস্থানটি কোথায়, তাহা এক কথায় ব্যক্ত করিতে পারে না; তাহা দেহস্থিত প্রাণের ন্যায় প্রত্যক্ষ সত্য, অথচ প্রাণের ন্যায় সংজ্ঞা ও ধারণার পক্ষে দুর্গম। তাহা শিশুকাল হইতে আমাদের জ্ঞানের ভিতর, আমাদের প্রেমের ভিতর, আমাদের কল্পনার ভিতর নানা অলক্ষ্য পথ দিয়া নানা আকারে প্রবেশ করে। সে তাহার বিচিত্র শক্তি দিয়া আমাদিগকে নিগূঢ়ভাবে গড়িয়া তোলে; আমাদের অতীতের সহিত বর্তমানের ব্যবধান ঘটিতে দেয় না; তাহারই প্রসাদে আমরা বৃহৎ, আমরা বিচ্ছিন্ন নহি। এই বিচিত্র উদ্যম-সম্পন্ন গুপ্ত পুরাতনী শক্তিকে সংশয়ী জিজ্ঞাসুর কাছে আমরা সংজ্ঞার দ্বারা দুই-চার কথায় ব্যক্ত করিব কী করিয়া?

ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা কী, এ কথার স্পষ্ট উত্তর যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন সে উত্তর আছে; ভারতবর্ষের ইতিহাস সেই উত্তরকেই সমর্থন করিবে। ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া, এবং বহুর মধ্যে একেকে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতম রূপে উপলব্ধি করা, বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।

•

• আজ আশা করে আছি পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্য লাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে, অপেক্ষা করে থাকব সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্ব দিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম—ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট—সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ! কিন্তু, মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর—একদিন অপরাজিত মানুষ

নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।

এই কথা আজ বলে যাব, প্রবল প্রতাপশালীর ও ক্ষমতামদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয় তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে ; নিশ্চিত এ সত্য প্রমাণিত হবে যে—

অধর্মেনৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।

•

The Great One comes,
sending shivers across the dust of the Earth.
In the heavens sounds the trumpet,
in the world of man the drums of victory are beaten.
the hour has arrived for the great Birth.

To-day the gates of night's fortress
Crumble into the dust—
On the crest of awakening dawn
assurance of new life
proclaims "Fear Not."

The great sky resounds with paeans of Victory
to the Coming of Man.

•

সঙ্গীত আসর

যে গান বাঙ্গালী কোন দিন ভুলবে না

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান সম্বন্ধে বলেছেন, "বাঙ্গালী কোনদিন তাঁর গান ভুলবে না।" তাঁর গান বাঙ্গালীর মনে, ভারতবাসীর মনে গভীর রেখাপাত করেছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে তাঁর গান এনেছে সুষমা। তাঁর গানের সুরে, কথায় মানুষ প্রকৃতির সান্নিধ্য লাভ করে। প্রকৃতির রূপ রস গন্ধ তার হৃদয় ভরে দেয়। বাঙালী ভাবপ্রবণ জাতি, তাই গান তার চির সঙ্গী। রবীন্দ্রনাথের গানে সকল উৎসব অনুষ্ঠান সার্থক হয়। আনন্দে মানুষ সে গান উপভোগ করে—দুঃখে সে গানে সান্ত্বনা পায়।

বাঙলা দেশ গানের দেশ—তাই বারশ শতকের চর্য্যাগীতি থেকে সুরু করে আজ পর্যন্ত বাঙলার সঙ্গীতের ক্রমবিকাশ শুধু সঙ্গীতের ক্রমবিকাশ নয়—সাহিত্য ও কাব্যেরও ক্রমবিকাশ। মানুষ ভাষায় বিবিধ ভাব, বিবিধ চিন্তা, বিবিধ কামনা ব্যক্ত করে, সুরেও তদ্রূপ অভিব্যক্ত হয়। সাহিত্য ও কাব্যের ন্যায় সঙ্গীতের সুরলহরী অন্তর্নিহিত ভাবগুলিকে সরস করে। তাই কাব্যের সহিত সঙ্গীতের যোগ।

সঙ্গীতের মধ্যে আবার গানই শ্রেষ্ঠ। কারণ তার মধ্যে আছে কথা ও সুর। সেইজন্য গানই মানুষের মনকে অভিভূত করে। বাঙলার গান আলোচনা করলে জানা যায় যে, তার মধ্যে এক এক ধারায় সুর প্রাধান্য লাভ করেছে। টপ্পার সুর অবলম্বনে বাঙলা টপ্পা রচনা করে রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু) খ্যাত হয়েছেন। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, বাঙলার সুরের বিশেষ ধারাকে গ্রহণ করেন, তাঁদের রচিত গানে সুর সংযোজনায়। মহাত্মা রামমোহন রায় ধ্রুপদ, খ্যাল প্রভৃতি সনাতন সঙ্গীত ধারাকে আশ্রয় করে ব্রহ্ম সঙ্গীত রচনা করেন। বলা বাহুল্য কীর্ত্তন পদাবলীর প্রভাব বাঙলার গানে বিশেষ ভাবে বর্ত্তমান। কীর্ত্তন বাঙলার নিজস্ব সঙ্গীত, তাকে সম্পূর্ণ ক্লাসিক আখ্যা দেওয়া যায়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের গান সকল ধারার সঙ্গীতের মিলন ক্ষেত্র; এরূপ বিচিত্র ধারার সমন্বয় জগতের আর কোন কবি বা গীতিকারের গানে নেই।

ঠাকুর পরিবারে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের যথেষ্ট চর্চ্চা ছিল। অনেক গুণী জ্ঞানী এঁদের বাড়িতে গান শুনিয়ে—বা স্বীয় জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে ধন্য হতেন। তৎকালীন বাঙলার তথা ভারতের স্বনামধন্য গায়ক যদুভট্ট কবিগুরু এবং তাঁর পরিবারের সকলের বিশেষ শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেছিলেন। যদুভট্ট শুধু গায়ক ছিলেন না, একজন শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদ রচয়িতাও ছিলেন। কবিগুরু তাঁর উচ্চাঙ্গ সুরের গান রচনার প্রথম প্রেরণা পান যদুভট্টের গান থেকে। যদুভট্টের রচিত গানগুলি, কথা, ভাবে সুরে ছন্দে অতি মনোরম। সে গান কবিগুরুকে আকৃষ্ট করেছিল। 'কাফী সিন্ধু'

রাগে বহুভট্ট যে কয়েকটি গান রচনা করেছিলেন, তন্মধ্যে "রুম ঝুম বরখে" গানটি বিখ্যাত। বর্ষার গান সাধারণত মল্লার রাগে রচিত ও গীত হয় কিন্তু বহুভট্ট প্রচলিত প্রথা অনুসরণ না করে উক্ত সুরে বর্ষার গান রচনা করে নতুনত্ব আনেন। 'রুম ঝুম বরখে' গানের অনুকরণে রবীন্দ্রনাথ 'শূন্য হাতে ফিরিহে' গান রচনা করেন। মূল গানটির স্বরলিপি এই সংখ্যায় প্রদত্ত হল।

কাফীসিন্ধু—সুরফাক্তা

রুম ঝুম বরখে আজু বদরুবা
পিয়া বিদেশ মোরি
থরথরাত ছতিয়ন নিশদিন মন ভাঁওরে।
নৈন ন নীদ আবে দামিনী দমক লাগে
উন বিন কল ন পড়ত নাথ নাথ বাওরে॥
রহন যাত বরি পল ছিল তন দহে মোরি
আবে মদন মো সন জুরু সময় পাওরে॥
নিকসত নহি প্রাণ হো রহি চিত পাষাণ
তাপর করত ধ্যান তানরাজ গাওরে॥

| | | |

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
পা র্সনা র্সা র্রা | র্সনা র্সা | গা ধা পা মা I পা র্সা ণা ধপা | ধা পা | মা গা মা পা II
উ ন ০ দি ন | ক০ ল | ন প ড় ত না ০ প না ০ | ০ ধ | ধা ও রে ০

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
সা র্সা না র্সা | র্রর্জ্ঞা র্রা র্সা ণা ধা I পা পা ধা পা | পধা পা | মা গা মা পা I
র হ ম ধা | ০ত০ | ধ রি প ল ছি ন ত ন | দ ও হে | মো ০ রি ০

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
মা I জ্ঞা রা | রমা জ্ঞা | সরা I সা সা I সা ণা ধা পা | পধা পা | মা গা মা I II
আ ০ রে ম | ধ০নে | মো০ ০ স ম ভূ ০ ধ স | ম ০ ন | পা ও রে ০

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
মা মা পা ধা | সা I | না র্সা I র্সা I না র্সা র্রা র্জ্ঞা | র্রর্সা র্রা | র্সা ণা ধা পা I
নি ক ন ত | মা ০ | হি প্রা ০ ণ হো ০ য় হি | চি০ ত | প ০ থা ণ

১´ ২ ৩ ১´ ২
পা র্সনা I র্সা র্রা | র্সনা র্সা | ণা ধা পা মা I পা র্সা ণা ধপা | ধা পা |
ভা ০ ০ প য় | ক০ য় | ত ধ্যা ০ ন ভা ০ ন রা ০ | ০ ধ |

৩
মা গা মা পা II II
গা ও রে ০

স্মৃতি দোলায়

খামটায় ওপর যত ডাকঘরের ছাপ তত ঠিকানার কাটাকুটি।

শেষ পর্যন্ত অত হাত ঘুরে আমার কাছে যে পৌঁচেছে সেই আমার ভাগ্য।

এত জায়গায় ধাক্কা খেয়ে খেয়ে আসার কারণ খামটার ঠিকানা ভুল শুধু নয়, নামটার পর্যন্ত গোলমাল। নামটা আমার কাটা ছাঁটা বাহুল্য বর্জিত। অনেকেই তাই সে নামের ওপর একটু কারিকুরি করার লোভ সংবরণ করতে পারেন না। কিংবা নামটা ঠিক সাধারণ নয় বলে ওই ছাড়া নামের পেছনে আরো কিছু নিশ্চয় উহ্য আছে মনে করে তা নিজেদের খুশিমত পূরণ করে দেন।

এই সেদিন কোনো এক সভায় গিয়ে হঠাৎ এতদিন বাদে কৌমার্যে অভিসিক্ত হয়ে চমকে গেছি। অনাথ দশা ও অহরহঃ ঘুচিয়ে দেবার লোকের অভাব নেই।

খামের ওপর নামটার কৌমার্য গৌরব ও রক্ষা হয়েছেই, আসল নামটাও সেখানে সাঙ্কিপ্ত ও কিঞ্চিৎ বিকৃত।

নামের এই দশা, ঠিকানার তত্তোধিক।

যে-একটি বাংলা সাময়িক পত্রের সম্পাদকের কেয়ারে লেফাফাটি পাঠান হয়েছে, সে কাগজই বেশ কিছুদিন হ'ল উঠে গেছে। দয়া করে সেখান থেকে কেউ কোনো এক প্রকাশকের দোকানের নাম ঠিকানা সেখানে কেটে বসিয়ে দিয়েছেন। সে প্রকাশকের সঙ্গে আমার কোন ব্যবসায়িক সম্পর্ক নেই, তবু তিনি যে আমার নাম ঠিকানা যথাযথ ভাবে লিখে চিঠিটি আমার কাছে পাঠিয়েছেন এ তাঁর উদার মহত্ব নিশ্চয়।

এত হাত ফেরত খামের মধ্যে যে চিঠিটি অবশেষে পেলাম তা নিয়ে ফাঁপরে পড়লাম আরো বেশী। চিঠিটা আমাকেই লেখা সন্দেহ নেই, কিন্তু যিনি লিখেছেন স্মৃতির চোরকুঠুরি তন্নতন্ন করেও তাঁর কোন চিহ্ন খুঁজে পেলাম না।

যাঁর যেমন রুচি সেই হিসাবে একথা জানিয়ে হতাশ বা আশ্বস্ত করছি যে চিঠিটি কোন মহিলার লেখা নয়। যিনি লিখেছেন তাঁর সঙ্গে একদাদে আমার বেশ একটু পরিচয় যে ছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ দু একটি যে ঘটনার কথা তিনি উল্লেখ করছেন ঘনিষ্টতা একটু না থাকলে সেগুলি তিনি ভাবতে পারতেন না। ঘটনাগুলো মনে পড়লেও তার অংশীদার হিসাবে পত্র লেখকের উপস্থিতি আমার মন থেকে একেবারে মুছে গেছে। চিঠির নিচে সই আছে শুধু নিখিল। কিন্তু টিকিট আঁটা খিকটির তলায় পুরো নাম ঠিকানা ছোট ছোট আকারে লেখা আছে। ঠিকানা উত্তর বিহারের একটি নগণ্য শহর আর নামটা হ'ল, নিখিলেশ্বর ধর।

নিখিল বা নিখিলেশ্বর ধর, কোন নামেই স্মৃতির ওই মহলের বরফে ঘেরা কবাট কিন্তু খুলল না।

মনের ওই অসাড় অংশেতে কোন চমক লাগে কি না দেখতে বৃথাই চিঠিটা বার বার পড়ে প্রায় মুখস্থ করে ফেললাম।

যথাবিহিত সম্ভাষণের পর চিঠিতে নিখিল লিখেছে,—তাই এ চিঠি পেয়ে নিশ্চয় তুমি অবাক হয়ে যাবে। 'বরেন্দ্র হোমে' থাকবার সময় অরে পড়ে আমি দেশে চলে যাই তোমার বোধহয় মনে আছে। তারপর এখানে ত নয়ই, ঢাকাতেও আর ফিরিনি। আমার সেই অর থেকেই যত দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত। বাড়িতে ফিরে আমার অর সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়ায়। আমি যদি বা সেরে উঠলাম, মা আর ভাই-বোনেরা এক এক করে সেই সাংঘাতিক রোগে পড়লেন। কি অরের বিষই আমি নিয়ে গেছলাম কে জানে। বাবা যে তার আগেই কি শোচনীয় দুর্ঘটনায় মারা গেছেন তাও তোমায় বলেছিলাম। সাপে কেটে মারা যাওয়াই একটা অভিশাপ, তার ওপর সে মৃত্যুর পেছনে যদি অমন শয়তানি থাকে তাহলে দেবতার বা অপদেবতার কারুর হিংসায় এসব ঘটছে সন্দেহ করা খুব অস্বাভাবিক নয়।

আমাদের পরিবারের ওপর সেই সময় একটা অভিশাপই যেন বর্ষিত হচ্ছে বলে সেদিন দৃঢ় ধারণা হয়েছিল। নিজে কোন রকমে সেরে উঠেছিলাম শেষ পর্যন্ত। কিন্তু একটি ভাই আর বোনকে হারালাম। শোকে তাপে জর্জর মা শুধু যেন শাস্তিভোগ করবার জন্যেই পঙ্গু আর জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে গেলেন। দেশে আমাদের কোন সম্বল নেই। দেশ বিভাগের অনেক আগেই সামান্য একটা চাকরী নিয়ে বাংলার বাইরে চলে আসতে বাধ্য হ'লাম।

শুধু এ সব দুঃখের কাহিনী শোনাবার জন্যে কিন্তু তোমাকে চিঠি লিখতে বসিনি। ঢাকার সেই ছাত্রজীবনে কেন আর ফিরে যেতে পারিনি, কেন আর সেদিনের বন্ধু সহপাঠীদের কারুর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তাই বোঝাবার জন্যে এই ভূমিকাটুকু করলাম।

তোমার কাছেও এ চিঠি লেখবার সুযোগ আমার হত না যদি না একটি পুরাণো মাসিকপত্র দৈবাৎ আমার হাতে না পড়ত আর তাতে তোমার নামটা দেখে লেখাটা না পড়ে ফেলতাম। আমি এখন যে জগতে থাকি তার সঙ্গে সাহিত্যটাহিত্যের কোন সংস্রব নেই। হ্যাঁ সে কথাটাও বলে রাখা ভালো। একদিক দিয়ে আমাদের সংসারের ওপর থেকে সে অভিশাপের বিষাক্ত হাওয়া সরে গেছে বলতে পারি। সাধারণ ভাবে আমি এখন বেশ স্বচ্ছল, একদিক দিয়ে সম্পন্নও বলতে পারো। আমি এখানে এসেছিলাম তখনকার দিনের একটা দেশী ওষুধের কারবারের ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি হয়ে। এ কাজটা নেবার মূলে অজান্তে তোমার একটু প্রভাব ছিল শুনলে তুমি অবাক হবে। 'বরেন্দ্র হোম'-এ থাকতে একবার ডাক্তারের রেস্তোরাঁয় একজন মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়েছিল মনে আছে; আমরা তখন সবুজ বোকাসোকা ছাত্র। ভদ্রলোক হিপ্নি মিল্লী ঘুরে বেড়াবার গল্প করে আমাদের একেবারে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তোমার উৎসাহই হয়েছিল সবচেয়ে বেশী। মনে আছে তার চপ কাটলেট চা-এর দামটা তাঁকে তুমি দিতে দাওনি। তারপর ডাক্তারের দোকান থেকে বেরিয়ে আমরা কখন অনেকক্ষণ সে ভদ্রলোকের সঙ্গে ঘুরে শেষ পর্যন্ত তাঁকে চাঁদপুরের ট্রেনে তুলে দেবার জন্যে স্টেশনে পর্যন্ত গেছলাম। ফিরে আসবার সময় তুমি এই ধরণের টহলদারী কাজের সুখের কথা যেরকম উচ্ছ্বাসের সঙ্গে কল্পনা করেছিলে তাতে মনে হয়েছিল এরকম একটা কাজ পেলে তুমি যেন নিয়ে ফেলো। তোমার বরাতে সে কাজ একদিন আমাকেই নিতে হবে তা কি জানতাম। ভদ্রলোকের নাম ছিল অনীশ না অমর বক্সী আমিই এখন ভুলে গেছি, যদিও আমার সঙ্গে তার দ্বিতীয়বার দেখা হওয়াই আমার ওষুধের দালালীর কাজ পেওয়ার মূল।

লেখাটেখা অভ্যাস কোন কালে নেই। বিশেষ করে পুরোণ সব স্মৃতি মনে পড়ে যাচ্ছে বলে এক বলতে আর এক কথায় চলে যাচ্ছি। আশাকরি তুমি লেখার জট ছাড়িয়ে আসল সুতোগুলো আলাদা করে নেবে।

তারপর যা বলছিলাম, নিজেদের অমিজমা সামান্য যা ছিল তা সরিকদের মামলা মকদ্দমার বেড়াজাল থেকে ছাড়িয়ে আনা অসম্ভব। তবু সেই চেষ্টায় একবার বরিশাল যেতে হয়েছিল। সেখানেই একদিন সেই বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা। বন্ধু চিনতে পারেনি। কিন্তু আমি চিনেছিলাম। চাকার সেই ডাক্তারের দোকানে খাওয়া আর তারপর স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দেবার কথা বলায় ব্যাপারটা তার মনে পড়ল। তোমার কথা জিজ্ঞাসা করলে। বললাম খোঁজ রাখিনে। আমি কি করছি জিজ্ঞাসা করায় কেন জানিনা হাউ হাউ করে সব দুঃখের কথা বলে ফেললাম।

বন্ধু চুপ করে সব শুনল। তারপর সেদিন সন্ধ্যেয় আমায় দেখা করতে বলল একটা ডিসপেনসারীতে। দেখা করতে যাবার পর ওষুধের বাঙালীর চাকরীর গুরুক সন্ধান সে আমায় দেয়। তখনকার দিনে যাদের কোথাও কিছু জুটত না তারাই এ ধরণের চাকরীতে যেত তা 'ত আমার জানা ছিল। ইণ্টারমিডিয়েট সায়েন্স-এ সেকেণ্ড ইয়ার পর্যন্ত পড়েছিলাম। তারই জোরে ও চাকরী আমি পেয়ে গেলাম। অবশ্য প্রায় থালা বাটি বেচে তার জন্যে কলকাতায় ওষুধের হেড আফিসে একবার দেখা করতে হয়েছিল।

আমার প্রথম কাজের জায়গা হল উত্তর বিহারের এই অঞ্চল। পাণ্ডব বর্জিত দেশ বললেই হয়।

এখানে এসে কিছুদিনের মধ্যেই দেশাদার মুলাকির হবার সুখ কি তা জানতে পারলাম। তখন তোমার কথা মনে হত। বেশী দিন সে চাকরী করতে হয়নি অবশ্য। কলকাতার কোম্পানীই কিছুদিন বাদে উঠে যায়। তখন বুঝতেই পারছ এখানে এই আত্মীয় বন্ধুহীন অজানা জায়গায় আমি একেবারে অকূল পাথারে। কিন্তু আত্মীয় বন্ধুর অভাবটাই আসল দুর্ভাবনা নয়। আত্মীয় বন্ধু'ত দেশেই ছিল। কি সুবিধে তাতে হয়েছে।

বিবরণটা সংক্ষেপে সেরে এবার আসল কথায় আসি। এই বিদেশ বিভূঁয়ে বেকার কপর্দকহীন অবস্থাই আমার এখনকার উন্নতির মূল। মা আর যে বোনটি সেই সর্বনাশা জ্বর থেকে সেরে উঠেছিল, তাদের তখনও দেশ থেকে আনাতে পারিনি। কোনদিন আর পারবনা জেনে আর সেই নিয়তিই মেনে নিয়ে আমি যাকে বলে 'সেটিল্ড' হয়ে যাই। চলে যাই ওখান থেকে তরাই অঞ্চলের এক কাঠের কারবারীর জমা নেওয়া জঙ্গলে ঠিকাদারের তল্প তল্প ঠিকাদারের অধীনে অতি সামান্য কাজ নিয়ে।

চিঠি বড্ড বড় হয়ে যাচ্ছে সুতরাং আরো সংক্ষেপে সারছি। সেই কাজ থেকেই আমার বরাত ফিরল। একেবারে নিচের তলা থেকে প্রায় চূড়োয় পৌঁছে গেলাম। আমি এক ব্যবসা থেকে আর এক ব্যবসা ধরেছি। যা ধরেছি তাতেই ধুলো মুঠো সোনা মুঠো হয়েছে এ যেন আমাদের পরিবারের ওপর সেই ভাগ্যের অভিশাপের উল্টো পিঠ। এর আগে পর্যন্ত যে পিঠটায় শুধু দুর্ঘটনা দুঃখ শোক ক্ষতি ছিল সেটা হঠাৎ উল্টে গেছে।

আমি এ দেশে একরকম গণ্যমান্য হয়েছি। অবস্থার উন্নতির সঙ্গেই মা বোনকে এখানে আনিয়ে ছিলাম। মা আমার জমি জমা পয়সা কড়ি বাড়ি দেখে নিশ্চিন্ত মনেই গত হয়েছেন। বোনের

বিয়ে দিয়েছি খুব জাঁকজমক করে বড় ঘরে ভালো পাত্রে। নিজেও সংসারী হয়েছি আমার সুখ সৌভাগ্য চারিদিকে যখন উথলে উঠছে তখনই এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটতে সুরু করেছে।

তুমি অদৃষ্ট ভাগ্যের অভিশাপ দেবতারদোষ এসমস্ত কুসংস্কারে বিশ্বাস করো কি না জানি না। আমার না করে উপায় নেই। জন্ম থেকে এ সবের প্রমাণ আমি প্রত্যক্ষভাবে পেয়ে আসছি।

গত মাস দুয়েক ধরে এমন কিছু আমার জীবনে ঘটছে যার অন্য কোন ব্যাখ্যা পাই না। এসম্বন্ধে কাউকে কিছু বলতে পারি না। হাতের কাছে পাওয়া একটা পুরোণ বাংলা কাগজে তোমার লেখাটা পড়ে ফেলে হঠাৎ মনে হ'ল তোমাকে সমস্ত ব্যাপারটা জানিয়ে অন্ততঃ পরামর্শ নিতে পারি। চিঠিতে তা অবশ্য হবে না। তোমার কাছে আমি যেতে চাই। তোমার ঠিকানা জানিনা। তাই এই কাগজের ঠিকানায় চিঠি দিলাম। এ চিঠি পাওয়া মাত্র তোমার ঠিকানা জানাবে। আমার প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরী। হপ্তাখানেকের বেশী অপেক্ষা করতে পারব বলে মনে হয় না। তোমার চিঠির আশায় রইলাম। তুমি চিঠি দিয়ে আসতে লিখলে এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে আমি তোমার কাছে গিয়ে হাজির হব। পুরোণ বন্ধুত্বের খাতিরে আমাকে নিরাশ তুমি করবেনা বলে আমার বিশ্বাস।

আমার ভালোবাসা জেনো।

তোমার—

নিখিল

এ চিঠি পেয়ে কেন যে এত বিব্রত ও বিচলিত হয়েছি তা এখন বোঝবার বোকানো বাহুল্য। নিখিলের দরকার এত জরুরী যে সাতদিনের বেশী অপেক্ষা করার ধৈর্য বা সময় তার নেই। অথচ আমি চিঠি পেয়েছি পাঠাবার প্রায় একমাস বাদে। এতদিনে তার সমস্যার আমার কোন সহায়তার প্রয়োজন আছে কিনা সন্দেহ। কি তার সমস্যা তাতে আদৌ আমার পক্ষে কোন পরামর্শ দেওয়া সম্ভব কি না তাও জানি না। তা ছাড়া কে নিখিলেশ্বর ধর তাই যদি আমার স্মৃতির পাতায় খুঁজে না পাই তাহলে তার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টাই বা করব কোন অধিকারে!

খুব ইচ্ছে হয়েছিল একবার ধরা ছোঁয়া না দিয়ে একটা ভালভাবে চিঠি তাকে লিখতে। তার এলোমেলো জটপাকানো কাহিনীতে একটা ছুটো যে আমগা যেই বেরিয়ে আছে তার অমীমাংসিত রহস্যই এই কৌতূহল ও ইচ্ছা জাগিয়েছিল। সে লোভ কোন রকমে সংবরণ করেছি।

মনে কিন্তু শান্তি নেই!

কেবলই মনে হচ্ছে স্মৃতি এমন বিশ্বাসঘাতকতা করে কেন? প্রাণপণ চেষ্টা করেও মনের চোর কুঠুরিতে একটা ধরবার ছোঁয়ার মত চিহ্ন কেন পাচ্ছিনা।

অন্তরীক্ষে

কি ভাবছেন
কি হলো
মনে হচ্ছে কিছু ভাবছেন
ব্যাপার কি
ভদ্রলোক সারাদিন কি যেন ভাবছেন
ভাবছি সত্যিই কি টাকায় সব হয়?

আমাদের বিশেষত্ব

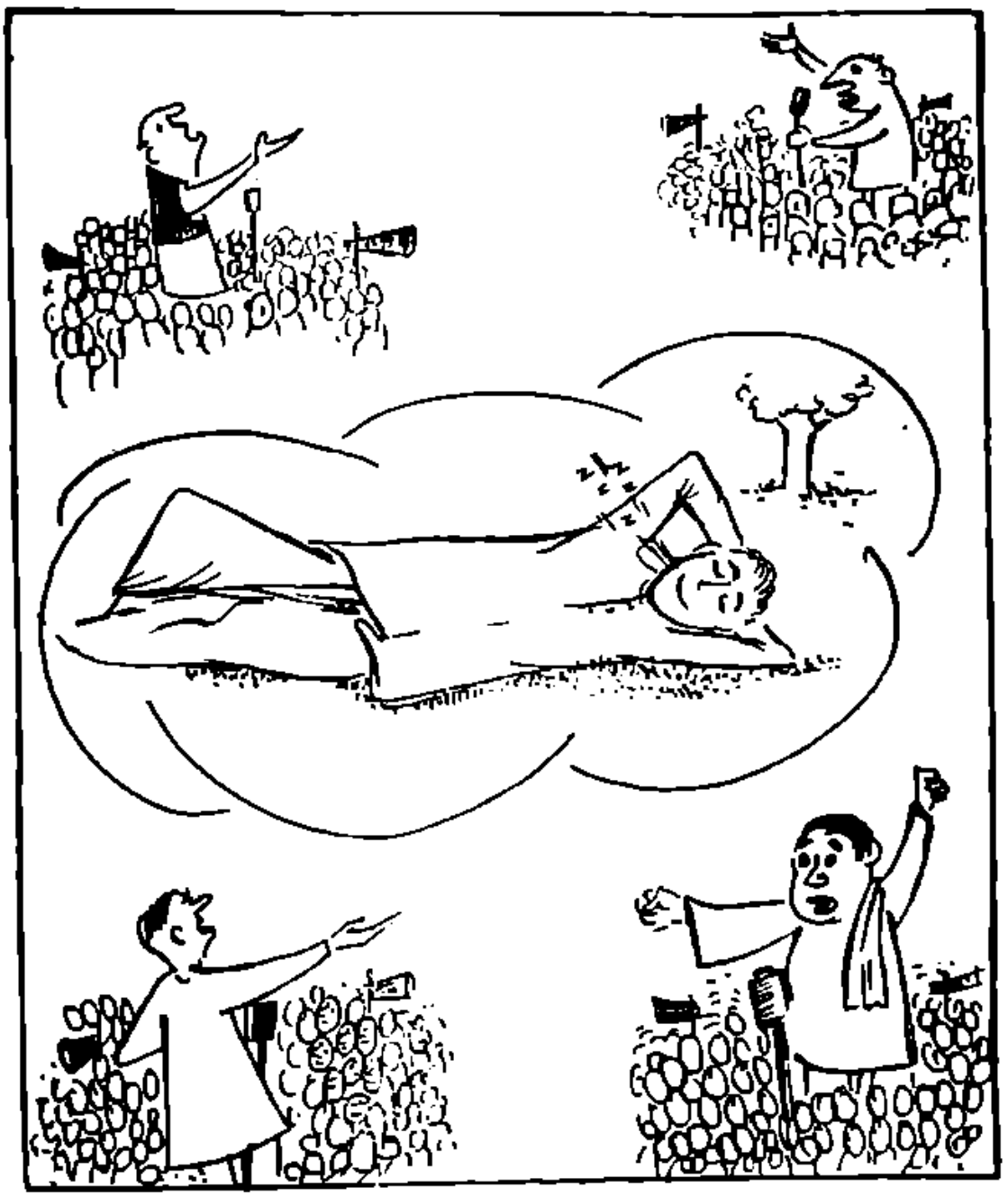

কেবল বক্তৃতা ও বড় বড় কথা।

জীবনযাত্রা সংকট

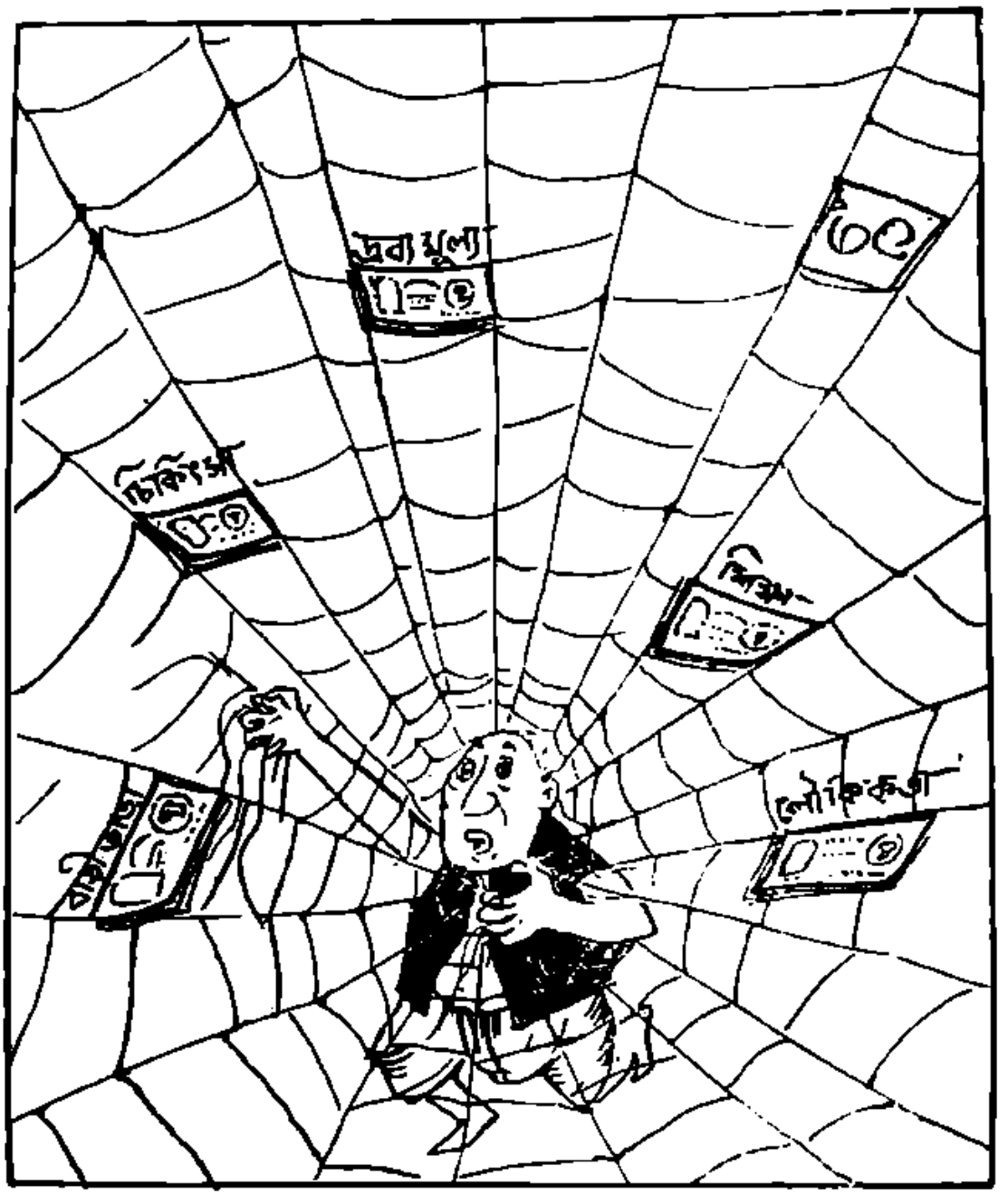

বল মা তারা দাঁড়াই কোথা।

ভেজাল খাদ্য ও ঔষধ

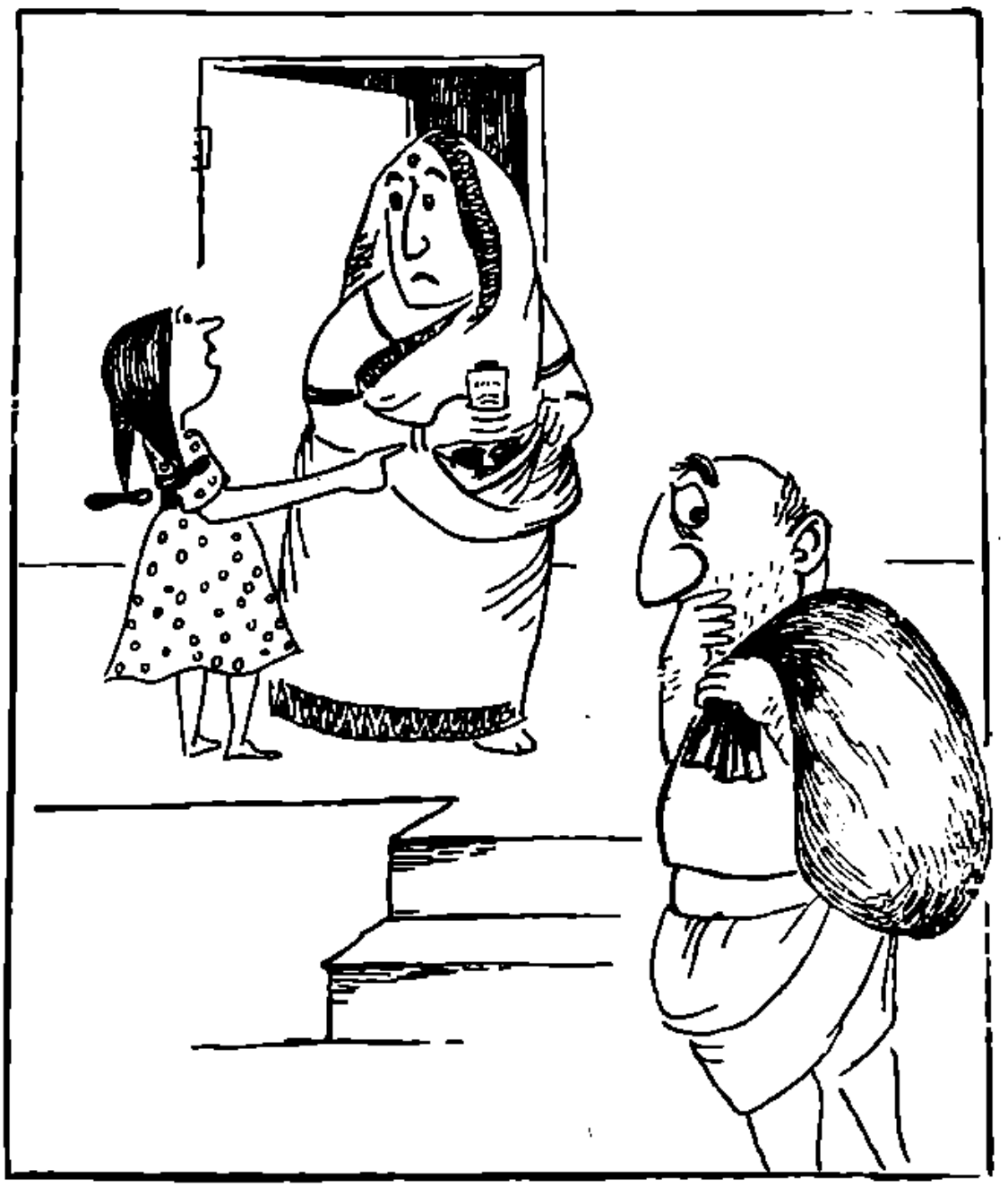

তুমি করছো কি মা! আমনা ঐ সব খালি টিন নিয়ে গিয়ে ভেজাল ভর্তি করবে
আর না জেনে কত লোক কিনবে ও মরবে

অশ্লীল সাহিত্য

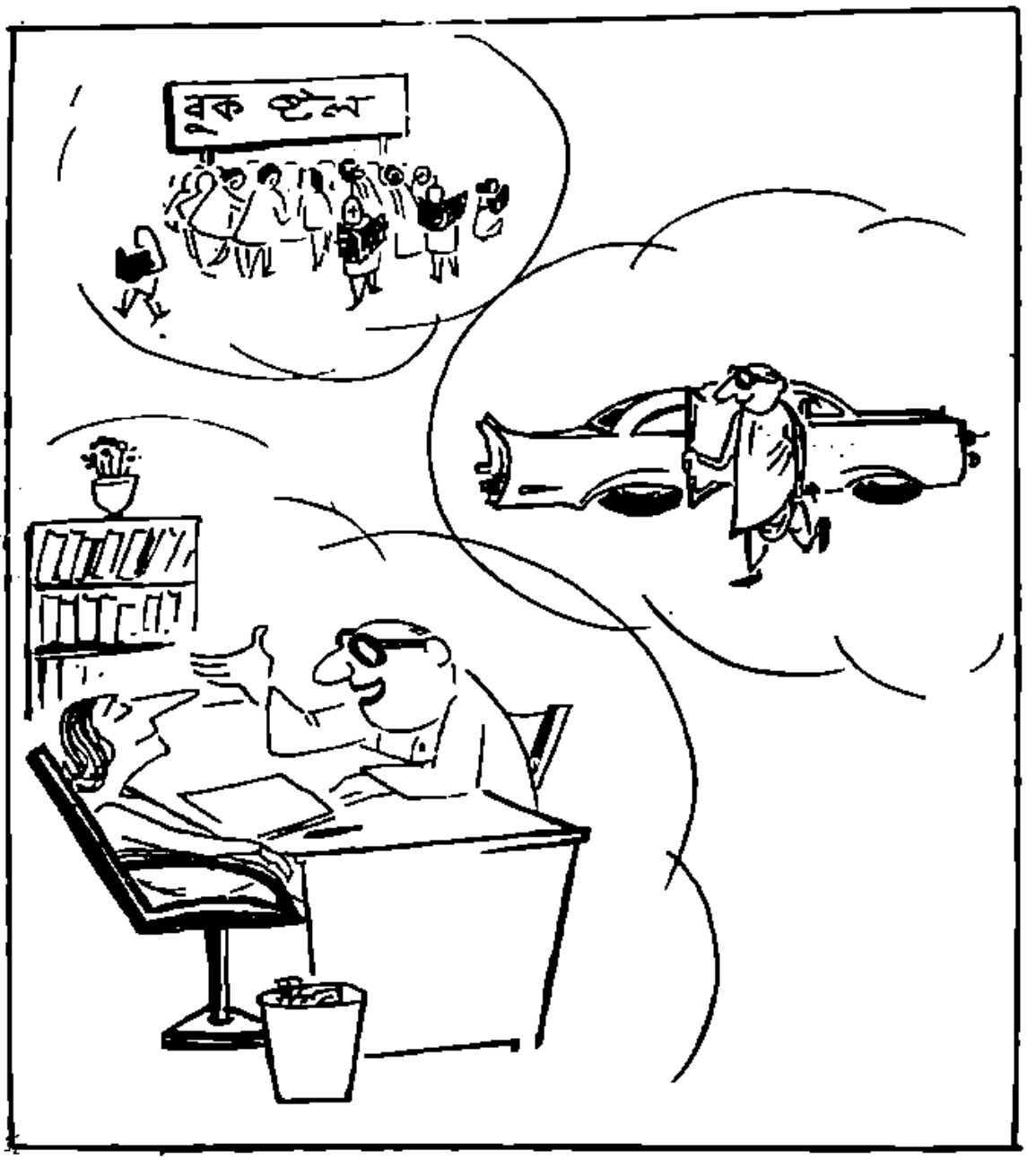

পত্রিকার মালিক—আপনার প্রাণে যা চায় তাই লিখবেন, কেবল আইনটা বাঁচিয়ে,
তা না হলে কাগজ hot cakeএর মত বেচবো কি করে ?

সাহিত্যিক—বলেন কি ! প্রাণে যা চায় তাই !!

জগদ্গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ

জীবন কাহিনী ॥

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

১১

ধর্মের ভিত্তি কোথায়? নিশ্চিন্ত হবার উপায় কী? সম্পূর্ণ নিরাপদভূমি কি কোথাও নেই?

নিরন্তর এ জিজ্ঞাসায় ছিন্নভিন্ন হচ্ছে বিজয়। সমাধান ঠিক বার করে ফেলল। ব্রহ্মনাথ ও ত্রিনয়নীনী তাঁর সংবাস ছাড়া অন্য উপায় নেই। তাঁর সঙ্গে সমস্ত প্রাণের যোগ ছাড়া এই মহাব্যাধির ওষুধ নেই কোনোখানে।

ওষুধের খোঁজে নানা জায়গায় ঘুরতে লাগল বিজয়।

ঘুরতে-ঘুরতে বিদ্যাচল চলে এসেছে। খবর পেয়েছে একজন মহাপুরুষ আছেন এ অঞ্চলে, তিনি বাইয়ে দিতে পারেন ওষুধ। কিন্তু কোথায় সেই মহাপুরুষ? খুঁজতে-খুঁজতে ঢুকে পড়েছে এক বনের মধ্যে। ভাঙা পুরোনো একটা বাড়ি দেখতে পেয়ে এগুলো বিজয়। পরিত্যক্ত, মানুষবসতির চিহ্ন নেই। ঠিক করল এইখানে, এই মহারণ্যের নির্জনেই রাত কাটাবে।

গভীর রাতে সেই পোড়ো বাড়িতে একদল ডাকাত এসে উপস্থিত হল। ডাকাতি করতে নয়, লুট-করা সম্পত্তি নিজেদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করতে। কিন্তু এ কী উৎপাত! এই লোকটা এখানে এল কী করে? দেখলে সাধু-টাধু বলে মনে হয়, কিন্তু কে জানে কী আসল মতলব? এই, ওঠ। শালা, ভাগ এখান থেকে।

বিজয়কে তাড়িয়ে দিল ডাকাতেরা।

জিনিসপত্র ভাগ বাঁটোয়ারা করবে কী, ডাকাতদের ভাবনা ধরল। লোকটা যদি পুলিশকে গিয়ে খবর দেয়। যদি দেখিয়ে দেয় আমাদের আড্ডা! যদি আমাদেরও সনাক্ত করে!

'ওকে কেটে ফেল।' ডাকাতেরা হুঙ্কার করে উঠল।

দলপতি বুঝি চাইল বাধা দিতে। সাধুকে হত্যা করলে বিপরীত কিছু না ঘটে বসে।

দলপতির কথা কেউ গ্রাহ্য করল না। বিপদ এড়াতে হলে সাধুকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়াই উচিত।

দুজন ডাকাত খোলা তলোয়ার নিয়ে এগুলো সাধুর সন্ধানে।

ঘুরে কোপঝাড়ের পাশে ঐ বুঝি বসে আছে। কিছুদূর এগিয়েই ডাকাতেরা থমকে দাঁড়াল। সাধুর মুখোমুখি একটা বাঘ বসে আছে। কী ভয়ঙ্কর! সাধু যেমন নিশ্চল বাঘও তেমনি নিশ্চল। দরকার নেই সামনে থেকে আক্রমণ করে। ঘুরে যাই, পিছন দিক থেকেই কোপ বসাব। ডাকাতেরা ঘুরে পিছন দিকে হাজির হল। কী সর্বনাশ, সেখানেও একটা বাঘ ব'সে। সাধুকে রক্ষা করবার জন্যে যেন দুই দুর্দান্ত প্রহরী মোতায়েন।

ফিরে গেল ডাকাতেরা। দলপতিকে বললে। মারতে পারলাম না।

কে কাকে মারে!

প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি সুরু হল, ধসে পড়ল ডাকাতে আড্ডার ছাদ। দলপতি বাঁচল বটে, কজন ডাকাত প্রাণ হারাল।

কতক্ষণ পরে, কোথায় বজ্রবিদ্যুৎ, গগনের থালায় চাঁদ উঠল। ইতিমধ্যে কোথায় কী হয়ে গেছে বিজয় বিশ্বসংসর্গও টের পেল না, ঘাসের উপর শুয়ে ঘুমিয়ে রইল। ভোরে উঠে শুনল কোথায় যেন মঙ্গল আরতির বাজনা বাজছে। বাজনা লক্ষ্য করে চলতে-চলতে পৌঁছল এসে বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরে।

ডাকাতদের সর্দার খুঁজতে-খুঁজতে চলে এসেছে। এই সেই সাধু, চিনতে পেরেছে বিজয়কে। চিনতে পেরেই কাঁদতে-কাঁদতে পায়ে লুটিয়ে পড়ল। বিজয় তো হতবাক। তখন সমস্ত বৃত্তান্ত বললে সর্দার। 'সাধুজী, বহুৎ গুণা হুয়া, মাপ কিজিয়ে।'

যে অহিংসক তাকে কেউ হিংসে করে না।

'পড়েছ তো মহাভারত? তাতে কী লিখেছে?' বললেন গোসাঁই-প্রভু, 'লিখেছে যাদের ভেতরে হিংসে নেই তাদের বাইরেও হিংসে নেই। হিংস্রজন্তুরাও তাদেরকে গাছ পাথরের মতই মনে করে।'

একটা ঘটনা বলি শোনো।

এণ্ডারসন সাহেবকে চিনতে তো? হাতিশেকার সাহেব। হাতিতে চড়ে জয়দেবপুরের জঙ্গলে শিকার করতে গেছে। নিবিড় বন, এণ্ডারসন একা। ভারি বাতাসে বাঘের গন্ধ পাওয়া গেল। হাতি ভয় পেয়ে হাওদা থেকে এণ্ডারসনকে ফেলে দিয়ে ছুট দিল। বাঘ একেবারে এণ্ডারসনের চোখের সামনে। বাঘকে লক্ষ্য করে দু তিনবার গুলি ছুঁড়ল এণ্ডারসন। লক্ষ্য ব্যর্থ হল। বাঘ ধাওয়া করতেই এণ্ডারসন ছুট দিল, এখানে-ওখানে, নানান দিকে, কিন্তু সঙ্গ ছাড়বার পাত্র নয় বাঘ। উপায় কী? হঠাৎ এণ্ডারসন দেখতে পেল অদূরে এক উলঙ্গ সাধু চুপচাপ বসে আছে। আমাকে বাঁচাও, সাধুকে ঘিরে পড়ল এণ্ডারসন। কী হয়েছে? অত ছুটোছুটি করছ কেন?

'বাঘ!'

'বাঘ? তাতে কী?' সাধু একবিন্দু চাঞ্চল্য প্রকাশ করল না। শান্ত স্বরে বললে, 'স্থির হয়ে বোস।'

'বলব কী, বাঘ যে আমাকে ধরে ফেলল।'

হাত নেড়ে বাঘকে অগ্রসর হতে বারণ করল সাধু। বললে, 'বৈঠ বাচ্ছা, আটর নসিব মত, আও।'

আশ্চর্য, বাঘ থেমে পড়ল; মুখে গোঁ-গোঁ শব্দ, লেজ নাড়তে লাগল। কতক্ষণ নিশ্চেষ্ট হয়ে থেকে চলে গেল একদিকে।

'বাঘ গেলে কোথেকে?' এণ্ডারসনের মুখের দিকে তাকাল সাধু।

'শিকার করতে বেরোছিলাম।' বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল এণ্ডারসন: 'সব গুলিই ব্যর্থ হল, বাঘ পালিয়ে গেল না। ক্রুদ্ধ হয়ে আমার পিছু নিল।'

'তা তো বোঝাই। তুমি ওকে গুলি মারতে গেলে কেন? তুমি কি বাঘ খাও?'

'তা নয়—'

'তোমার আমোষ হবে বলে তুমি তাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলে।' সাধু হাসল, 'কিন্তু সে যদি সুযোগ পায় সে একটু আমোষ করবে না?'

'তাই তো ভাবছি। আপনাকে দেখে সে স্তব্ধ হয়ে গেল। আচ্ছা, কী করে আপনি বনের বাঘকে বশ করলেন?'

'কোনো মন্ত্রে-তন্ত্রে নয়, শুধু ভালোবেসে।' সাধু স্নিগ্ধস্বরে বললে, 'শুধু মনের থেকে হিংসাকে বিসর্জন দিয়ে। যতক্ষণ হিংসা ততক্ষণই প্রতিহিংসা। জন্তু তোমাকে হিংসা করে যেহেতু তোমার নিজের মনের মধ্যেই হিংসা আছে। হিংসামুক্ত হও, দেখবে সাপে বাঘেও কিছু করবে না।'

এণ্ডারসনের কী হল কে জানে, কাতর হয়ে সাধুর আশ্রয় প্রার্থনা করল। সাধু তাকে দীক্ষা দিল, শিখিয়ে দিল ভজন সাধন। বাবুচি ফুলে দিয়ে রাঁধুনে বামুন রাখল এণ্ডারসন, নিরামিষ খেতে লাগল। এখন সে বৈষ্ণব হয়ে গিয়েছে।

আরো একবার গহন অরণ্যে পথ হারিয়েছিল বিজয়। পথশ্রমে দেহ অবসন্ন। একটা বৃক্ষের নিচে আশ্রয় নিয়েছে। হিংস্র পশুর গর্জন কানে আসছে, অন্ধকারে পথ দেখিয়ে কে নিয়ে যাবে বাইরে? যা হবার হবে, নির্জন বনেই করবে রাত্রিযাপন। মাটির উপর ঘুমিয়ে থাকবে।

হঠাৎ কোথেকে লাঠি হাতে একটা লোক এসে উপস্থিত, বলা নেই কওয়া নেই বিজয়ের পা টিপতে বসল।

'কে, কে তুমি?'

লোকটা কোনো উত্তর দিলনা। বিজয় ছাড়িয়ে নিতে চাইলেও ছাড়লনা পা, আঁকড়ে রইল।

'এ কি, পাগল নাকি?'

তবু লোকটা উচ্চবাচ্য করল না, পা টিপতে লাগল।

ঘুমিয়ে পড়ল বিজয়। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল, চেয়ে দেখল লোকটা কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে। পাহারা দিচ্ছে।

ভোর হতেই ধড়মড় করে উঠে বসল বিজয়। কোথায়, কোথায় সেই প্রহরী? কখন কোন দিকে চলে গিয়েছে কে জানে।

বিজয় তখন লাহোরে, হঠাৎ বাড়ি থেকে চিঠি এল তার মা স্বর্ণময়ী পাগল হয়ে গৃহত্যাগ করেছে। বিজয় অস্থির হয়ে উঠল। তখুনি ফিরে চলল বাড়ি।

সন্দেহ কী, সংসারের জ্বালা যন্ত্রণায়ই মার এই উন্মাদ অবস্থা। দুঃখী দেখলেই তাঁর মন গলে, বাড়ির লোক কী খাবে না খাবে হিসেব না করেই সব খাদ্য-দ্রব্য বিলিয়ে দেন। কারু মুখ মলিন দেখলেই হল, স্বর্ণময়ীর কাছে এলেই তিনি তা সোনা করে দেবেন।

বাড়িতে এসে অনেক খোঁজাখুঁজি করল বিজয়, কিন্তু মার কোনো সন্ধান পেলনা। ঘোষণা করে দিল যে মাকে এনে দিতে পারবে তাকে যাতায়াতের খরচ ও পঁচিশ টাকা পুরস্কার দেবে।

রাণাঘাটের পথে চলেছে বিজয়, শুনতে পেল রাস্তায় একজন আরেকজনকে বলছে, 'পাগলী কিন্তু অদ্ভুত, নক্ষত্রবেগে ছুটে চলে।'

'কোথায়, কোথায় সেই পাগলীকে দেখলে?' ব্যাকুল হয়ে জিগগেস করল বিজয়।

বনগ্রামের কাছে কী একটা গ্রামের নাম করল।

বিজয় চলল সেই গ্রামের দিকে। কানে এল রাস্তার কতগুলো কাঠুরে বলাবলি করছে 'কী অসম্ভব ব্যাপার, পাগলী বাঘের গায়ে শিয়র দিয়ে ঘুমুচ্ছে।'

'সত্যি?' বিজয় থমকে দাঁড়াল।

'বনে কাঠ কাটতে গিয়ে নিজের চোখে দেখে এলাম। আপনি যান না ওদিকে, আপনিও নিজের চোখে দেখতে পাবেন।'

বনের মধ্যে গিয়ে সত্যি বিজয় দেখল, মা একটা বাঘের গায়ে মাথা রেখে অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। বাঘ অনুগত ভৃত্যের মত শান্ত হয়ে বসে আছে।

গ্রামে গিয়ে লোকজন নিয়ে এল বিজয়। দেখল, মা উঠেছেন ঘুম থেকে। বাঘকে জিগগেস করছেন, 'বাঘ, তুই কার?'

বাঘ স্থির হয়ে রইল।

'বল, তুই কার? আমার? যদি আমার হোস, আমাকে পিঠে কর দিকিনি!' ঘরে অভিমান আনলেন স্বর্ণময়ী: 'বুঝেছি তুই আমার লোক। আমি উলঙ্গিনী কালী কিনা তাই তুই কর পাচ্ছিস। আমি যদি দুর্গা হতাম, দশভুজা হতাম, তাহলে তুই ঠিক আমাকে পিঠে চড়াতিস।'

বাঘের এতটুকু হিংসা নেই, আশা নেই, চাঞ্চল্য নেই।

'তুই এখানে থাক, তোর জন্যে কিছু খাবার নিয়ে আসি।' বন থেকে বেরিয়ে এলেন স্বর্ণময়ী। বিজয় ছুটে গিয়ে তাঁর পায়ে পড়ল। চমকে উঠে জিগগেস করলেন, 'তুই কে?'

বিজয় বললে, 'আমি আপনার দাস।'

'দাস কী রে? দাস হওয়া কি সোজা কথা? স্বর্ণময়ী তাকালেন মুখের দিকে: 'আরে, তোকে যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে।'

'আপনি তো বিজগতে সকলকেই চেনেন।'

'না, না, সে চেনা নয়, তোকে কোথায় যেন একদিন দেখেছি।'

বাঘে বারে-বারে প্রণাম করতে লাগল বিজয়।

কিছুক্ষণ পরে স্বর্ণময়ী দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লেন। মনে হল যেন দেহজ্ঞান ফিরে আসছে। জিগগেস করলেন, 'এত দিন কোথায় ছিলি?'

'আহোরে।'

'তা তো জানি, এখানে এলি কবে?'

'বাড়ি এসে দেখি তুমি নেই, তাই তোমাকে খুঁজতে বেরিয়েছি।' বিজয় ছুটে গিয়ে তেল জোগাড় করে আনল, মার মাথায় মাখিয়ে দিল সযত্নে, তারপর মাকে তিন-তিনবার স্নান করাল। নববস্ত্র পরিয়ে তুলসীতলায় আসন পেতে দিল। বললে, 'মা, আহ্নিক করো।'

স্বর্ণময়ী শুধোলেন, 'আহ্নিক কাকে বলে?'

'আহ্নিক কি তোমার মনে নেই? মা, আমি বলে দেব?'

'বল তো।'

বাল্যকালে মা যে মন্ত্র দিয়েছিলেন, বিজয় তাই এখন মার কানে দান করল। থরথর করে কাঁপতে লাগলেন স্বর্ণময়ী।

সুস্থ হলে মাকে ঘোড়ার গাড়িতে করে শান্তিপুর নিয়ে এল বিজয়।

স্বর্ণময়ীর বাবা গৌরীপ্রসাদ। বহুদিন সন্তান হয় না, গ্রামে কোথায় এক সিদ্ধ ফকির এসেছে, একদিন তার কাছে গিয়ে বর চাইলেন।

ফকির বললে, 'সন্তান হবে, কিন্তু দ্বিতীয় সন্তান আমাকে দান করবে বলো।'

'দেব।'

দ্বিতীয় সন্তান এই মেয়ে, স্বর্ণময়ী। কিন্তু মুসলমান ফকিরকে মেয়ে দেব কী করে?

প্রতিশ্রুতি রাখলেন না গৌরীপ্রসাদ। ফকির ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দিল: 'এ মেয়ে তোমার স্বরূপে থাকবে না, উন্মাদিনী হয়ে যাবে।'

'মার প্রাণে যেরূপ দয়া তার এক আনাও আমার নেই।' বলছেন গোস্বামী-প্রভু, ছেলেবেলায় দেখেছি, ঝিয়ের ছেলেটিকে মা আমাদের সঙ্গে বসিয়ে প্রত্যহ খাওয়াচ্ছেন। তারও ঠিক আসন ছিল আমাদের মত। থালা বাটি গ্লাস আমাদেরই মত মা তাকে কিনে দিয়েছিলেন। কোনরকম আলাদা মনে করতেন না। আমাদের যেমন দুটি চাদর জামা জুতো, তারও।'

'ওরে বিজয়, নে, পেরনাম কর।' শ্যামরাজারে থাকতে স্বর্ণময়ী ভোরে উঠে গঙ্গাস্নানে যেবার আগে ডাকছেন ছেলেকে, 'তোর হয়েছে দেখছিস না?'

মাকে প্রণাম করে কচি শিশুর মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন প্রভু।

'ঠাকুরার দিকে আপনি ওভাবে চেয়ে থাকেন কেন?' কে একজন জিজ্ঞেস করল, 'আপনার ওরকম চাউনি দেখে আমাদের ভেতরে কেমন যেন করে ওঠে।'

'মা যখন এসে দাঁড়ান', বললেন গোস্বামী-প্রভু, 'দেখতে পাই মার প্রতি রোমকূপে ব্রহ্মজ্যোতি ফুটে বেরুচ্ছে।'

[ক্রমশঃ

একজনে আর কয়েকজনে

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

'আমি কিন্তু তা হলে পালাবো।'

আনন্দময় পুরুষ উপেন্দ্রনাথ। আনন্দঘন তাঁর পরিবেশ। আনন্দ তাঁর সান্নিধ্য, আনন্দ তাঁর সাহিত্য। যেখানে নিরানন্দ সেখান থেকে তিনি দূরে সরে থাকেন। সেখানে তাঁর মন নেই। সেখান থেকে পালান তিনি।

শুধু নিজেকে নিয়ে উপেন্দ্রনাথের আনন্দ নয়, আর পাঁচজনকে নিয়েও তাঁর আনন্দ।

ডিসেম্বরের শীতে ভট্টাচার্যের মেয়ে পুতুলের বিয়েতে উপেন্দ্রনাথ চলেছেন আনন্দঘন পরিবেশে কয়েকদিনের আনন্দ কুড়োবার জন্যে।

শিয়ালদহ এক্সপ্রেসের সেকেণ্ড ক্লাস কম্পার্টমেণ্ট থেকে আসানসোলে নামলেন—ঘণ্টা দুয়েক পরে 'রম্যাণি বীক্ষ্য'র লেখক পরমপ্রিয় স্নেহভাজন অনুজতুল্য সাহিত্যিক সুবোধ চক্রবর্তীর রমা গৃহে রমণীর পরিবেশে আনন্দের সান্নিধ্য দান করে উঠলেন তিনি শীতু ভট্টাচার্যের মোটরে।

সুবোধ চক্রবর্তী জিগ্যেস করলে, 'আবার কবে যাবা?'

উপেন্দ্রনাথ বললেন, 'যেদিন তুমি ডাকবে।'

শ্রীমতী করুণা ভট্টাচার্য আসানসোলে এসেছিলেন উপেন্দ্রনাথকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। তাঁর কন্যা পুতুল। পুতুলের বিয়েতে উপেন্দ্রনাথ সশরীরে যোগদান করছেন—এ আনন্দের আর সীমা নেই।

চলন্ত মোটরে শ্রীমতী ভট্টাচার্য বললেন, 'ওঁরা এতোক্ষণে ঘর-বার করছেন। বড্ড দেরি হয়ে গেলো আমাদের!'

ওঁরা মনে সৌরবার্থে বহুবচন বুঝিবা। উপেন্দ্রনাথ তাই বুঝি বুঝেছিলেন। বললেন, 'করুণা, ওঁরা তো জানেন ওঁদের দাদাটি কী চীজ। বারোমাসে তাঁর তের পার্বণ!'

শ্রীমতী করুণা ভট্টাচার্য বললেন, 'ওঁরা তাতোটা পরিচয় এখনো তো পাননি। এতোদিন ছিলো শুধু বাঁশি শোনার অনুরাগ। এইবার যে সাক্ষাৎ দর্শনের পালা।

'তার মানে? কোথায় তা হলে নিয়ে চললে আমাদের? তবে যে শীতুকে টেলিফোন করলে!'

'ওঁকে টেলিফোনে জানালাম শুধু পৌঁছানোর খবর। কিন্তু গচ্ছিতের দায়িত্ব এখনো থেকে গেছে।

রহস্যটা গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠছে ক্রমশঃ।

রসিক উপেন্দ্রনাথ কিন্তু অনুমান করে নিলেন ব্যাপারটা। বললেন, 'দেখো, আমি কিন্তু এখন সাবালক; তুমি যে গায়েজোরের দায়িত্বে আমাকে ফেলে রেখে পালাবে সেটি হবার উপায় নেই। তাহলে কিন্তু আমি পালাবো।'

শ্রীমতী করুণা ভট্টাচার্য আবেদন জানালেন, 'আপত্তি করবেন না উপেনদা। আমার বাড়িতে বিয়ের ভিড়। সব সময় ঠিক আপনাকে হয়তো যেখাতনা করে উঠতে পারবো না।'

উপেন্দ্রনাথ বাধা দিলেন, 'তোমার যত্ন-আত্তি পেতেই কী আমি এবার এসেছি! সবার যাত্ন-খান থেকে আমাকে সরিয়ে রাখবে—না, তা চলবে না।'

শ্রীমতী করুণা চট্টোপাধ্যায় আবার আবেদন জানালেন, 'না, তাতে আমাদের, মন পরিতৃপ্ত হবে না। আর ওঁদের বিশেষ আগ্রহেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

'ওঁরা কারা?'

'ওঁরা দুই স্বামী স্ত্রী। চাটার্ড ইঞ্জিনিয়ার শ্রীঅনিল সরকার এবং তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী মধু সরকার। চমৎকার পরিচ্ছন্ন বাংলো ওদের।'

'পরিচ্ছন্ন বাংলো তো জানলাম। কিন্তু অতবড় লোক—সাহেবী মেজাজ।'

শ্রীমতী করুণা চট্টোপাধ্যায় বাধা দিলেন, 'না, না, মোটেই তা নয়। একেবারেই বাঙালী।'

'সোমড়া মুখ নয়? হাসতে জানেন তো? হাসতে না জানলে কিন্তু সত্যিই আমি পালাবো।

মোটর এসে থামলো একটি বাংলোর সামনে। পৌষের ঘনায়মান সন্ধ্যায় নিওনের ছিকে আলো। দু'পাশে কেয়ারি করা বাগান। লাল কাঁকড় মেলা রাস্তায় সত্যিই ঘর-বার করছিলেন ইঞ্জিনিয়ার সরকার দম্পতি।

দুটি তরুণ-তরুণী আর তাঁদের পুত্র বীরকে এক নজরে দেখেই গাড়ি থেকে নামতে নামতে উপেন্দ্রনাথ বললেন, 'না করুণা! তোমার আর ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই! এখান থেকে নিশ্চয়ই আমি পালাবো না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।'

বর এসেছেন।

চন্দন-চর্চিত ললাট, সুকোমল যুবকান্তি, সুবেশ সুপুরুষ বর। বরের উপবেশনের ঘরটি সুমনোহর। চারিদিকে আলো ঝলমল করছে। পুষ্প স্তবকের সুগন্ধ আমোদিত ঘরে দক্ষিণের বাতাস বইছে। শানাইয়ের সুমধুর আলাপন। পৌষের ঘরে মনে হচ্ছে, আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।

ঘরকে ঘিরে প্রশস্ত মনে বহু সম্ভ্রান্ত নিমন্ত্রিত পুরুষ এবং নারীর কলগুঞ্জন। উপেন্দ্রনাথ এক অভিনব সভার আয়োজন করলেন বরের আসনের সামনে।

বরযাত্রীরূপে সমাগত সাহিত্যিকবৃন্দের উপস্থিতিতে বিবাহ-আসরে এক সাহিত্য-বাসর অনুষ্ঠিত হলো। উপেন্দ্রনাথ স্বয়ং সে আসরের পরিচালনা করলেন। পরলোকগত খ্যাতনামা সাহিত্যিক সজনীকান্ত দাস, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, কুমারেশ ঘোষ এবং আরো অনেকে বর-বধূকে শুভাশীর্বাদ এবং শুভ কামনা জানালেন। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটালেন সভাপতি উপেন্দ্রনাথ। তাঁর অনুরোধে বরের পিতৃদেব সাহিত্যিক বনফুল নব বর-বধূর উদ্দেশে একটি মনোরম স্বরচিত কবিতা পাঠ করলেন। উপেন্দ্রনাথ নিজে যে কবিতাটি রচনা করেছিলেন সেটিও সভায় পঠিত হলো।

'অন্তরালে বধূরূপী পুতুল অনুষ্ঠানের সব কিছুই শুনতে পাচ্ছিল; কারণ মাইক্রোফন সগর্বে অনুষ্ঠানের সকল বৃত্তান্তই ঘোষণা করছিল।

আনন্দময় পুরুষ উপেন্দ্রনাথের স্বকীয় পরিকল্পনায় পরিবেশিত এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান পুতুলের বিয়ের এক আনন্দময় 'রুচি-সম্পন্ন আসর'— যার কথা সভায় সকলেরই মনে থাকবে দীর্ঘ দিন ধরে।

সরকার দম্পতির আতিথ্যে সরকার-বাংলোয় যে কদিন উপেন্দ্রনাথ ছিলেন তার মধ্যে একদিনও মনে করা যাচ্ছিল না যে উপেন্দ্রনাথের সঙ্গে কারুর সত্তা পৃথক।

কয়েকদিনের অবস্থিতিতে সরকার দম্পতির পরমপ্রিয় উপেনদা সরকার বাংলোর প্রতি যে অনুরাগ প্রকাশ করেছিলেন তা তাঁর সেখানে অবস্থিতির প্রতিটি মুহূর্তেই অনুভব করা যাচ্ছিল।

গান, বাজনা, রস-রসিকতার আসর প্রতিদিনই অনুষ্ঠিত হতো। উপেন্দ্রনাথ নিজে গান গাইতেন,—আর গান শুনতেনও। শ্রীমতী মঞ্জু সরকারের রবীন্দ্র সঙ্গীতে অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছিলেন উপেন্দ্রনাথ।

গভীর রাত্রি পর্যন্ত আড্ডার আসর জমছিলো সরকার বাংলোয়।

ডাক্তার সেন বড় সার্জেন, ডাক্তার মুখোপাধ্যায় খ্যাতনামা চিকিৎসক এবং আর এক ডাক্তার সেন গাইনোকোলজিষ্ট ;— সবাই গৃহিণীসমেত এসে জমিয়ে তুলতেন সরকার বাংলোয়।

'কাটি দিনো গনা হায়।'—উৎকল-গীতির কয়েকটি পঙ্‌ক্তি কোরাসে যখন গীত হতো তখন সত্যিই মনে হতো 'আনন্দেরই সাগর হতে এসেছে আজ বান।'

সেই আনন্দ সাগর বন্যায় অবগাহন করে সবাই অনুভব করতেন আনন্দই জীবন।

এই আনন্দময় জীবনকে ঘিরেই উপেন্দ্রনাথের রসচর্চা, সাহিত্যচর্চা এবং জীবনচর্চা। উপেন্দ্রনাথ তাই জীবন-শিল্পী।

'তোমাকে নিয়ে মঞ্জু গল্প লিখবো এইবার।'

উপেন্দ্রনাথের কথায় শ্রীমতী সরকার উৎসুক হলেন, 'কী লিখবেন ?'

'লিখবো এমন একটা মেয়ে দেখলাম যার ছায়ার আশ্রয়, সে আশ্রয় পরম নিরাপদের, পরম নিরুপদ্রবের ; আর যার প্রভায় দুঃখের গ্লানি নেই।'

'কী করে জানলে দাদা ?'

'জানলাম অনিল সরকারকে দেখে। কিন্তু এই দেখো, এইবার তোমাকে আমি তুমি বলতে পেরেছি।'

'এখন যে সত্যিই তুমি আমাদের অত্যন্ত কাছের জন।'

সেই কাছের জন উপেন্দ্রনাথ যখন সরকার-দম্পতির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠছেন তখন তাঁর চোখ দুটো আনন্দ-অশ্রুতে চিকচিক করছে। অনিল সরকার তাঁর বাংলোর একখানি ঘরকে দেখিয়ে বললেন, 'এই ঘরটি দাদা তোমার জন্যেই সাজানো-গুছানো রইলো। যখনই ক্লান্তি অনুভব করবে—সোজা চলে আসবে এই ঘরে।'

'কিন্তু আর কী তাই আসতে পারবো। আর একটা ঘর অনেকদিন ধরে খালি পড়ে রয়েছে যেখানকার ডাক নিত্যই শুনছি আমি। তবে এ-কথা বলতে পারি—'সে, ঘরে গিয়েও কিন্তু তোমাদের ঘরটিকে ভুলতে পারবো না!'

উপেন্দ্রনাথের এ-কথায় আমি বললাম, 'এ কেমন কথা হলো দাদা ?'

উপেন্দ্রনাথ বললেন, 'জানো না, ছোঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে! ধান ভানার আনন্দ তো স্বর্গে নেই ; তখন স্বর্গের কথা মনে হলেই ধান ভানার বিরহের কথা আমার মনে পড়ে।'

আমি বললাম, 'তা'হলে আর ওদেশে যাওয়ার জন্যে পা-বাড়াতে উৎসুক কেন ?'

উপেন্দ্রনাথ বললেন, 'সত্যিই অনিল, এক একবার আমার মনে হয় ঈশ্বরের রাজত্বে সেই পরম শ্লেষটিতে শুধুই কী বৈরাগ্য ? সেখানে কী মর্ত্যের এই স্নেহ প্রেম ভালোবাসা কিছুই নেই ?

রাত্রিশেষেই ডাক্তার সেন সস্ত্রীক কলকাতায় চলেছেন তাঁর নিজের গাড়িতে চড়ে—উপেন্দ্রনাথকে সঙ্গী পেয়ে সেন দম্পতি অত্যন্ত উৎফুল্ল। ডাক্তার সেন ঘন ঘন হর্ণ দিচ্ছিলেন—উপেন্দ্রনাথের সঙ্গে আমিও ভালবাসাবাসির মিষ্টি স্মৃতিকে বুকে নিয়ে অপেক্ষমান গাড়ির দিকে পা বাড়ালাম।

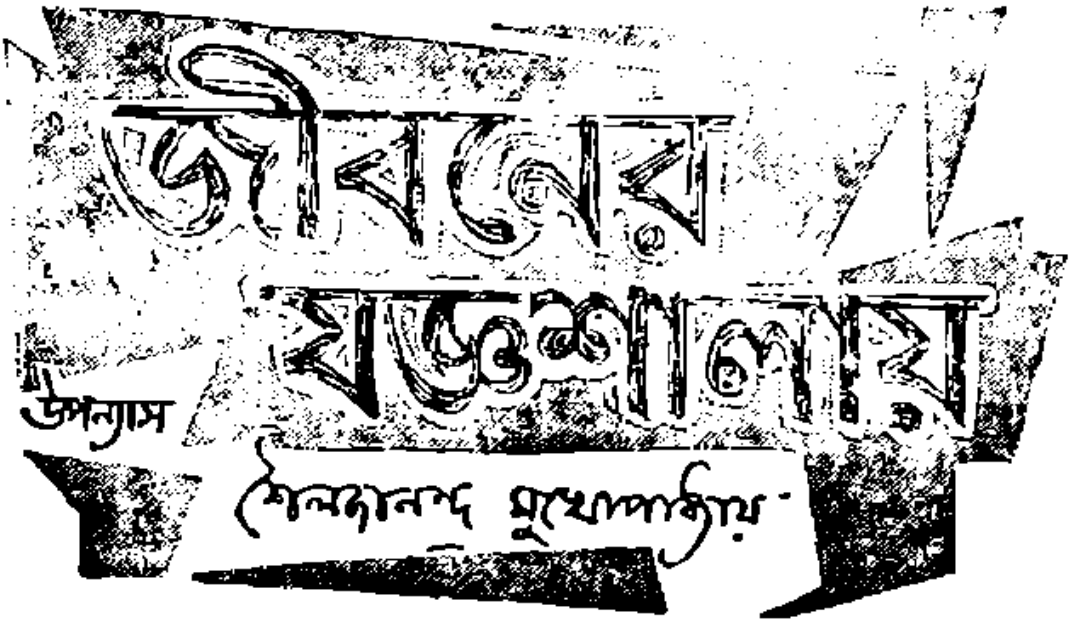

॥ এগারো ॥

নিজের দুঃখু নিজেই ডেকে আনলে মুখপুড়ী। নিজের জিন্দগী নিজেই বরবাদ্ করে দিলে।

আধা হিন্দী আধা বাংলায় রামপিয়ারী তার মেয়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বললে, ওকে পুছো বৌমা।

বৌমা কিন্তু মতিয়াকে পুছ্‌লে না। বললে, ওকে আমি অনেকবার জিজ্ঞাসা করেছি। ওর বয়ের কথা বললে ও শুধু কিক্ কিক্ করে হাসে।

মুখে হাঁসি যে আসে কেমনে জানি না মা। তবু শুনো—

রামপিয়ারী বললে। সরযূ শুনলে বসে বসে।

তখন ছিল গ্রীষ্মকাল। ফাগুন সবেমাত্র। সে যে কী—যারা ভুক্তভোগী তারাই জানে। খুব ভোরে উঠে মতিয়া রোজ চলে যেতো দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করতে। দেবনাথপুরার মানুষ হয়েছে। বাঙ্গালীটোলার পথঘাট সব জানা।

রামপিয়ারী হাতে তার কিছু পয়সা দিয়ে দিত। বলতো, 'আসবার পথে বাজারসে কুছ্ আনাজ্-উনাজ্ নিয়ে আসবি।'

তাই আনতো রোজ।

বাড়ী-বাড়ী দুধ দিয়ে ফিরতে বেশ বেলা হতো রামপিয়ারীর। একদিন বাড়ী ফিরে দেখে কি—মতিয়া তখনও ফেরেনি।

রামপিয়ারী গলির মোড়ে পথের দিকে তাকিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলো। আসছে না দেখে ভয় হলো তার।

'কাশীর মত জায়গা। আজব শহর মা। ভালাভি বেংনা, বুরাভি হোত্‌না।'

রামপিয়ারী পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল দশাশ্বমেধের দিকে। পথ-ঘাট তখন জেগে আগুন হয়ে উঠেছে। ঘাটে লোকজন খুব কম। মতিয়াকে দেখতে পেলে না।

বাজারে ঢুকলো রামপিয়ারী। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে হঠাৎ তার নজরে পড়লো —একটা আলুর দোকানে বসে বসে হতভাগী ছোঁড়াটা হাতে নিয়ে কিক্ কিক্ করে হাসছে আর আলু ওজন করছে। দোকানদার-ছোঁড়াটা তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে।

তামাম্ খরিদ্দার একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে সেই দোকানে। আলু ছাড়া পৃথিবীতে যেন কেনবার জিনিস আর কিছু নেই।

রাগে থর্ থর্ করে কাঁপতে কাঁপতে রামপিয়ারী এগিয়ে গেল সেইদিকে।

এই পর্যন্ত বলেই রামপিয়ারী বেই একটু থেমেছে, মতিয়া তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করলে।

—এবার কিন্তু বৌদিকে আমি এখান থেকে তুলে নিয়ে যাব মা।

—কি'উ? শরম লাগ্‌তি?

রামপিয়ারী বললে, শোনো বৌমা, সেদিন আমি আচ্ছাসে পিটুনাম ওকে। কাঁদতে লাগলো খুব। বললাম, এর চেয়ে গঙ্গায় তুই ডুবে মরলি না কেন?

সেদিন থেকে মতিয়া হলো বন্দিনী। বাড়ী থেকে বেরুতে পায় না। মা তাকে চোখে-চোখে রাখে। দুধ দিতে যায় তো সঙ্গে নিয়ে যায়। মা মেয়ে দু'জন একসঙ্গে গিয়ে গঙ্গায় স্নান করে আসে।

রাত্রে মেয়েকে তার কাছে শুইয়ে আদর করে রামপিয়ারী চুপি-চুপি তাকে অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করে। আলু-ওলা ওই ছোঁড়াটার সঙ্গে তোর ভাব-ভালবাসা কতদিন হয়েছে—কেমন করে হয়েছে বল্।

কিছুতেই কিছু বলে না মতিয়া।

শেষে একদিন যা ভেবেছিল তাই হলো। আলুর দোকানদার ছেলেটি এসে দাঁড়ালো রামপিয়ারীর কাছে। রামপিয়ারীকে প্রণাম করে ডাকলে, মা!

সেদিন সে রাগের মাথায় এত ভাল করে তাকে দেখেনি। দেখলে, ফর্সা টক্ টক্ করছে গায়ের রং, বেশ চওড়া বুকের ছাতি, মাথার চুল থেকে পা পর্যন্ত কোথাও এতটুকু খুঁৎ নেই। তাদেরই স্বজাতি। বাড়ী বললে মথুরায়। নাম সীতাপতি। ডাকনাম—সীতুয়া।

একটি একটি করে সবই তাকে জিজ্ঞাসা করলে রামপিয়ারী। বাড়ীতে তার এক বুড়ো দাদা ছাড়া আর কেউ নেই। সেই দাদা তার বিয়ের ঠিক করেছে মস্ত বড়লোক এক ঘিয়ের ব্যবসাদারের একটি মেয়ের সঙ্গে। মেয়েটা দেখতে ভাল নয়। তাই সে বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছে কাশীতে। সঙ্গে এনেছিল আড়াই শ' টাকা। সেই টাকা নিয়ে প্রথমে সে আরম্ভ করেছিল কফির ব্যবসা। কফি ছেড়ে ধরলে রামনগরের বেগুন। বেগুন ছেড়ে আম। সব-কিছু ছেড়ে এখন সে ধরেছে আলু। এখনও দেড় বছর হয়নি—নিজের থাকা খাওয়া দোকানের ভাড়া, সব-কিছু দিয়ে খুয়ে তার লাভ হয়েছে হাজার টাকা।

সীতাপতি তার কোমরের গেঁজে থেকে একহাজার টাকার নোট বের করে রামপিয়ারীর পায়ের কাছে নামিয়ে দিলে।

নামিয়ে দিয়ে বললে, সে মতিয়াকে বিয়ে করতে চায়।

টাকাটা দেখেই রামপিয়ারীর মুখটা বোধহয় ঘুরে গেল। সে কথা স্বীকার করলে রামপিয়ারী।

—এক হাজার রুপিয়া নাকা! বাপরে বাপ!

সীতাপতির বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশি নয়। দেখতে শুনতে ভালই। তার ওপর মেয়ের যখন গহনা, তখন আর বলবার কি থাকতে পারে!

তবু মায়ের কর্তব্য, রামপিয়ারী করেছিল বই-কি!

ট্রেণভাড়া খরচ-খরচা দিয়ে লোক পাঠিয়েছিল মথুরায়। সীতাপতি যেমন-যেমন হদিশ বলে দিয়েছিল ঠিক তেমনি-তেমনি ঠিকানায় গিয়ে সব-কিছু জেনে এলো লোকটা।

দাদাকে জানালে বিয়ে সে এখানে দিতে চাইবে না—এই কথা বলেছিল সীতাপতি। তাতেই দাদাকে কিছু না জানিয়েই বিয়ে তার হয়ে গেল মতিয়ার সঙ্গে।

পাড়াপড়শি জ্ঞাতি কুটুম—জামাই দেখে খুশী হলো সবাই।

মেয়ে জামাই বেশ আনন্দেই রইলো রামপিয়ারীর চোখের সামনে।

কিন্তু সে আর কতদিন?

রামপিয়ারী তার হাতের আঙুল গুণে বললে, সাত মাহিনা।

সরমা অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকালো। মতিয়া তখন সরে গেছে সেখান থেকে।

রামপিয়ারী তার উল্‌কিপরা হাতটা একবার কপালে ঠেকিয়ে বললে, আমার পোড়া কপাল বহমা!

সরমা ভেবেছিল, সাতমাস পরে জামাই বুঝি মারা গেল।

কিন্তু তাই-বা কেমন করে হয়? মতিয়ার সিঁথিতে সে সিঁদুর দেখেছে।

সিঁদুরের কথা মনে হতেই তার নিজের সিঁথির সিঁদুরের কথা মনে পড়লো।

সরমা জিজ্ঞাসা করলে, কি হলো জামাইএর?

রামপিয়ারী বললে, কি বেমারি যে হলো কুছ্ মালুম্ তি পেলো না। বহুৎ কিসিম্‌কা দাওয়াই খেতে লাগলো।

এবার বুঝি নিঃসন্দেহ হলো সরমা। বললে, জামাই মারা গেল?

—আরে নেহি নেহি। জিব কাটলে রামপিয়ারী। মরবে কেনো? মতিয়াই ওকে তাড়িয়ে দিলো। ঘর থেকে তাড়ালো। শেষে কাশী থেকে ভেগে গেল সীতাপতি। দোকানভি বন্ধ্ হো গেলো।

সরমা জিজ্ঞাসা করলে, তুমি খোঁজ খবর নিলে না?

—হাঁ-হাঁ হামি নিজে গেলো মথুরায়। যমুনামায়ীকা কিনারমে 'কান্‌মে লাজ্জু' পাণ্ডাজিকো মোকান্‌কা নসিজ্,—বাঙ্গালী ঘাটের কাছেই আছে বাড়ী। তাইতি একঠো আছে, লেকিন্ আপ্‌না ভাই না-আছে।

সরমা বললে, দেখা হলো তোমার সঙ্গে?

ঘাড় নেড়ে রামপিয়ারী বললে, না। ছোকরা বদ্‌মাশ্ আছে। মথুরা সে যায় না। যাবে কিস্‌কা পাশ? কোই নেই উস্‌কা।

রহস্য কিছু বুঝতে পারলে না সরমা। রামপিয়ারীও আর ভাঙলে না কিছু।

সেই দিনই বিকেলে সরমাই জিজ্ঞাসা করলে মতিয়াকে। কেউ যাতে না শুনতে পায় তাই সরমা তাকে ডেকে নিয়ে গেল বাড়ীর ছাতে। বললে, সীতাপতির সঙ্গে কি হয়েছিল তোর? ঝগড়া করলি কেন?

বলতে কি সে চায় সহজে?

শেষে বলতে গিয়ে লজ্জায় একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে গেল যেন।

মতিয়া বললে, আমি চিনতে পারিনি মানুষটাকে। প্রথম প্রথম বলতো, আর-কাউকে তুমি ভালবেসেছ কিনা তাই বল। যত বলি—না, সে তত্তই বলে, তাই কি কখনও হয়? কাশীর মতন জায়গা, তুমি এমন সুন্দরী সরলার মেয়ে, এর আগে নিশ্চয়ই কাউকে ভালবেসেছ। এই নিয়ে আমাদের ঝগড়া চলতে লাগলো।

সরমা জিজ্ঞাসা করলে, তারপর?

—তারপর বলে কিনা—আমি তোমাকে হুকুম দিলাম—যে-কোনও ছেলের সঙ্গে তুমি যা খুশী তাই করতে পারো। আমি কিছু বলবো না।

এ আবার কিরকম কথা?

মতিয়া বললে, আমি তো তাজ্জব বনে গেলাম তার কথা শুনে। সে বললে, কিষণ-কানাইয়ার সঙ্গে রাধিকার যে সম্পর্ক ছিল, তোমার সঙ্গে আমার সেই সম্পর্ক। রাধিকার ছেলেপুলে হয়নি, তোমারও ছেলেপুলে হবে না।

সরমা হাঁ করে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল মতিয়ার মুখের দিকে। মতিয়া আবার মাথা হেঁট করে নিজেরই পায়ের দিকে তাকিয়ে রইলো লজ্জায়।

সরমার কাছে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা।

বোকা মেয়ে—কথাটা সরমা ভাল করে বুঝতেও পারেনি বোধ হয়। বললে, মথুরার বাড়ী, তাই বোধ হয় কেষ্ট-ঠাকুরের ওপর অত ভক্তি!

'ধেৎ!' বলে মতিয়া ফিক্ করে হেসে ফেললে।

তুমি ভারি বোকা বৌদি, বুঝতে পারলে না?

স্বীকার করতে দোষ নেই। সরমা বললে, না বাপু, তোদের ও হেঁয়ালী আমি বুঝতে পারছি না। এদিকে বলছিস মানুষটা ভাল—

হাঁ-হাঁ ভালই তো।—মতিয়া এবার লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে স্পষ্ট পরিষ্কার ভাষায় সরমাকে বুঝিয়ে দিতে বাধ্য হলো। বললে, ভাল হলে কি হবে? মরদ তো নয়!

এতক্ষণ পরে সরমা বললে, বুঝেছি।

মতিয়া তখনও বলে চলেছে—শুধু শুধু আমাকে টাকা-হ্যাঁচড়া করে আর বলে, তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। খালি খালি টাকাপয়সা খরচ করে, ডাক্তার দেখায় আর দাওয়াই খায়। হয়ত সে ভেবেছিল ভাল হয়ে যাবে, কিন্তু কিছুতেই যখন কিছু হলো না তখন নিজেই একদিন পালিয়ে গেল। আমি কিন্তু যেতে ওকে বলিনি। সত্যি বলছি বৌদি।

সরমা চুপ করে কি যেন ভাবছিল। খানিক পরে জিজ্ঞাসা করলে, তোর মা এ-কথাটা জানে?

মতিয়া বললে, না।

দিন-তিনেক পরে সেদিন বিকেলে রামপিয়ারীর সঙ্গে দেখা হলো সরমার। দুধ দিতে এসেছিল। দুধ দিয়েই চলে যাচ্ছিল সে। সরমার দিকে একবার তাকিয়ে একটুখানি হেসেছিল শুধু। বলবার মত সব কথাই তো তার বলা হয়ে গেছে।

সরমার কিন্তু মনে হলো যেন রামপিয়ারীকে কিছু বলা উচিত।

রান্নাঘরের বাঁদিকে যে-ঘরখানা খালিই পড়ে থাকতো, সরমা তাকে সেইখানে ডাকলে। বললে, শুনছো মতিয়ার মা, তোমাকে একটা কথা বলি শোনো। তোমার কি মনে হয় সীতাপতি আবার আসবে?

রামপিয়ারী তার সেই উলকিপরা হাতখানি আকাশের দিকে তুলে বললে, বাবা বিশ্বনাথ জানে!

সরমা বললে, সে আর আসবে না। তুমি মতিয়ার আবার বিয়ে দাও।

কথাটা শুনে রামপিয়ারী যেন চমকে উঠলো। সরমা যে এ-কথা বলতে পারে তা সে ভাবতেও পারেনি। খানিকক্ষণ সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো সরমার মুখের দিকে। ভাল করে যেন সে তাকে চিনতে চায়।

আজকালকার ছেলেমেয়েগুলো এই রকম হলো নাকি? কাশীর বাঙালীটোলায় সে আছে অনেক দিন। বহু 'বাঙালীন্'কে সে দেখেছে। অনেকের সঙ্গে তার ভাব-ভালবাসাও আছে। কিন্তু এমন কথা কাউকে সে কোনোদিন বলতে শোনেনি। ঠাকুরদেবতায় তাদের অচলা ভক্তি। হিন্দুর আচার-আচরণ তারা বারো মাস পালন করে। অথচ সেই হিন্দু ব্রাহ্মণের মেয়ে হয়ে প্রকাশের এই নতুন বৌটি মতিয়ার আর-একবার বিয়ে দেবার কথা বলে কেমন করে?

মতিয়ার কপালই নাহয় ভেঙেছে, বিয়ে দেবার পর স্বামীটা নাহয় পালিয়েই গেছে, তাই বলে আর-একবার তার বিয়ে দেবে কেমন করে? তাই আবার হয় নাকি?

অন্য কেউ হলে রামপিয়ারী হয়ত তাকে শক্ত কথা শুনিয়ে দিত। কিন্তু প্রকাশবাবুর বৌকে সে তো কোনও শক্ত কথা শোনাতে পারে না। তাই বললে, 'মতিয়া যদি আমার বিধবাই হতো বৌমা, তাহ'লেও কি আমি তার আবার সাদি দিতে পারতাম? কি করব বল মা। ওর কপাল।'

কথাটা বজ্র করে বাজলো এসে সরমার বুকে। বিধবার বিয়ে!

কিন্তু এ-সমস্যা তার নয়। সমস্যাটা মতিয়ার। স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী মেয়ে মতিয়া। ভরা যৌবনের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সে এগিয়ে গিয়েছিল স্বাস্থ্যবান সুন্দর একটি ছেলের দিকে। মানুষের স্বভাবের ধর্ম সে পালন করেছিল। অন্যায় সে কিছু করেনি। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস যে এতখানি নিষ্ঠুর হতে পারে তা সে ভাবতেও পারেনি।

আজ তার সেই তাপাবিড়ম্বিত জীবনে যে বলবার মত কোনও কথা থাকতে পারে—রামপিয়ারী তা বিশ্বাস করে না।

মতিয়া ডাকলে, 'বৌদিদি!'

'যাই' বলে মাথার কাপড়টা টেনে দিয়ে সরমা তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে এলো।

'দাদাবাবু তোমাকে ডাকছে।'

সরমা তাকাতে পারলে না মতিয়ার মুখের দিকে। সোজা নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

প্রকাশ অপেক্ষা করছে বেরিয়ে যাবার জন্যে। সরমাকে সে সঙ্গে নিয়ে যাবে।—'ভাল করে সেজেগুজে নাও। প্রথমে যাব মলিতবাবুর বাড়ী, তার পর ক্যানটন্‌মেণ্টে গিয়ে মিস্ শর্ম্মার সঙ্গে তোমার পরিচয় করে দেবো। দেখবে কিরকম মেয়ে। এখান থেকে ডাক্তারী পাশ করে গিয়েছিল জার্ম্মানী। সেখান থেকে ডিগ্রি নিয়ে ফিরেছে।'

'বিয়ে হয়েছে ?'

'কার ?'

'ওই যার কথা বলছো। ওই যে শর্মা না কে—'

প্রকাশ হাসলে একটুখানি। বললে, 'মিস্ শর্মা বললাম তাও বুঝতে পারলে না ? বিয়ে যাদের হয়েছে তাদের বলে মিসেস্, আর বিয়ে যাদের হয়নি তারা মিস্। মিস্ মানে কুমারী।'

সরমা বললে, 'তোমাকে খুব বিপদে ফেললাম আমি।'

'কেন ?'

আশীর সামনে দাঁড়িয়ে চুলটা ঠিক করে নিতে নিতে বললে, 'ও-সব কিছু জানি না। হয়ত ওদের সঙ্গে কথাই বলতে পারব না।'

প্রকাশ বললে, 'সব আমি শিখিয়ে দেবো। তোমার ইচ্ছে থাকলে দু'দিনেই শিখে নিতে পারবে।'

'শাড়ীটা নাই-বা বদলালাম !'

প্রকাশ বললে, 'না না, ও শাড়ী পরে তোমার যাওয়া চলবে না। খুব ভাল একখানা শাড়ী পরে নাও।'

শাড়ী বদলাবার জন্যেই বোধকরি সরমা ঢুকছিল পাশের ঘরে। প্রকাশ বলে দিলে—'সেই জুতো জোড়াটা পরবে, ভ্যানিটি ব্যাগ্ নেবে। আর হ্যাঁ, লিপষ্টিক্ নেবে।'

ফিরে দাঁড়ালো সরমা। আবদারের সুরে বললে, 'না, দোহাই তোমার, ওইটি বোলো না, ও আমি পারব না।'

প্রকাশ তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। কাঁধে হাত রেখে বললে, 'লিপ্‌ষ্টিক্ মেখা অভ্যেস না করলে কলকাতায় যখন নিয়ে যাব তোমাকে, তখন কি হবে ?'

'কী আর হবে ? মেখো না। সত্যি বলছি—মিছেমিছি ঠোঁটে রং মাখতে আমার ভারি লজ্জা করে।'

এবার যেন হুকুম করলে প্রকাশ। বললে, 'লজ্জা করলে চলবে না সরমা। যে-সব জায়গায় তোমাকে নিয়ে যাব—সেখানকার কোনও মেয়ে লিপ্‌ষ্টিক না নিয়ে বাড়ী থেকে বেরোয় না।'

সরমা আর প্রতিবাদ করতে পারলে না। সকরুণ দৃষ্টিতে প্রকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'নিচ্ছি।'

বলেই সে ঘরে ঢুকলো।

ঘর থেকে বেরিয়ে যখন এলো, দেখা গেল প্রকাশ ঠিক যেরকমটি চেয়েছিল সরমা ঠিক তেমনি সেজে এসেছে। শাড়ী, সায়না, ভ্যানিটি ব্যাগ, জুতো—কিছুই বাদ যায়নি। তার ওপর যে বস্তুটির ওপর তার ঘৃণা থাকা স্বাভাবিক, তার সেই স্বভাবরাঙা ঠোঁটদুটির ওপর আদ্‌ভো ভাবে লিপ্‌ষ্টিক্ বুলিয়ে পতিব্রতা প্রতিপালন করেছে।

প্রকাশ তার দিকে তাকিয়ে আর চোখ ফেরাতে পারলে না !

—'তাখো তো কেমন সুন্দর মানিয়েছে !' বলতে বলতে সে এগিয়ে গেল সরমার কাছে।

দু'হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে কি যেন বলবার জন্যে তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়েছিল প্রকাশ। কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য, ঠোঁটের কাছে কিসের যেন একটা আওয়াজ হতেই মুখটা

তাকে সরিয়ে নিতে হলো। রাঙা মুখ আরও রাঙা করে সরমাও বোধকরি একটুখানি সরে দাঁড়ালো লজ্জায়। বললে, 'কে ?'

দোরটা খোলাই ছিল। আর সেই খোলা দরজার সরমার ওপার থেকে মতিয়ার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। বললে—'আমি বৌদি।'

ঠোঁটের ফাঁকে একটুখানি হাসি ফুটে উঠলো সরমার।

'তুই এখানে কি করছিস মুখপুড়ী ?'

চোখে একটুখানি রাগের ঝিলিক্ নিয়ে দোরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল সরমা। প্রকাশ বাধা দিলে। বললে, 'যাক্ আর যেতে হবে না। রাধা পড়লো যখন, আজ আর বেরুবো না। এসো।'

প্রকাশ তার হাতখানা চেপে ধরলে।

খুব যে খারাপ লাগলো তা নয়। লজ্জায় কেমন যেন বিহ্বল হয়ে গিয়ে চুপিচুপি বললে, ওকে তাড়িয়ে দিই।'

তাড়াতে কিন্তু হলো না। যে-খবরটা দেবার জন্যে মতিয়া দোরের আড়ালে এসে দাঁড়িয়ে ছিল সেটা কিন্তু আরও মারাত্মক। মুখ ফুটে বলবার আগেই জয়নারায়ণবাবুর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

'সরমা কি এই ঘরে রয়েছে বাকি ?'

মতিয়া বললে, 'হাঁ বাবুজি।'

দোরের পর্দাটা সরিয়ে সরমা দেখলে জয়নারায়ণবাবু একা আসেননি। পেছনে দাঁড়িয়ে উমেশ।

[ক্রমশঃ

"আমার ধারণা, ভারতের দুর্বলতার প্রধান কারণ পরাধীনতা নয়, ধর্মের অভাব নয়, কিন্তু চিন্তাশক্তির হ্রাস, জ্ঞানের জন্মভূমিতে অজ্ঞানের বিস্তার। ·····বাঙালী শক্তি সাধনা ছেড়ে দিয়েছে তাই শক্তিও তাকে ছেড়েছে। প্রেমের সাধনা করি, কিন্তু যেখানে জ্ঞান ও শক্তি নেই, সেখানে প্রেমও থাকে না। সঙ্কীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা আসে, ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ মনে, প্রাণে হৃদয়ে প্রেমের স্থান নাই।··· নাথ নাথ শিব চাই না, একশো ক্ষুদ্র আমিত্বশূন্য পুরো মানুষ ভগবানের স্বরূপ যদি পাই, তাই যথেষ্ট।

—শ্রীঅরবিন্দ

অমৃত কথা ও কাহিনী

শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যের কথা—

ষোড়শ বৎসরের পর দেখা হল। আচার্য্য জিজ্ঞাসা করলেন, মহারাজের আর কোন গ্রন্থাদি রচনা হয়েছে কি? রাজা রাজশেখর মহা দুঃখিত হয়ে বললেন, ঋষিবর! দুঃখের কথা আর কি বলব? কিছুদিন পূর্ব্বে রাজপ্রাসাদে অগ্নি সংযোগ হয়, তাতে আমার এই গ্রন্থ তিনখানি ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। আমি মনের দুঃখে আর কোন গ্রন্থই রচনা করি নাই। আচার্য্য ঈষৎ হাসতে হাসতে বললেন, মহারাজ, এজন্য এত দুঃখ করছেন কেন? আপনি যদি ইচ্ছা করেন তো আমি বলছি, আপনি লিখে নিন। উহা আমার অবিকল মনে আছে। রাজা রাজশেখর বিস্ময়ে ও আনন্দে যেন বিহ্বল হয়ে গেলেন। তিনি অতি বিস্মিতভাবে বললেন, আপনার সমস্তই স্মরণে আছে? আমি এখনই লিখছি—আপনি অনুগ্রহ করে বলুন। আচার্য্য বলতে লাগলেন, রাজা লিখতে লাগলেন। রাজার যতদূর মনে ছিল, তাতে তাঁর মনে হ'ল আচার্য্য অবিকল তাঁর গ্রন্থই বলছেন, কোনরূপ অন্যথাই হচ্ছে না। রাজা অন্য কথা পরিত্যাগ করে যারপরনাই আনন্দিত চিত্তে কেবল গ্রন্থই লিখতে লাগলেন। পরদিন রাজা একটি লেখককে লিখতে আদেশ করলেন এবং তিনি স্বয়ং শুনতে লাগলেন। অন্য কোন কথাই নাই, কেবলই লেখা চলতে লাগল। আচার্য্য অনর্গল বলতে লাগলেন, লেখক রাজার সামনে বসে লিখে যেতে লাগলেন। দর্শকবৃন্দ সকলেই বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন। এইভাবে কয়েকদিন উপর্য্যুপরি পরিশ্রমের পর 'বাল রামায়ণ', 'বাল ভারত' প্রভৃতি গ্রন্থ তিনখানি লিখিত হল। রাজার আর আনন্দ ধ'রে না।

• • • •

শ্রীশ্রীরামানুজের কথা—

রামানুজ বললেন, আমি সনাতন বিষ্ণুমতে থেকে অজ্ঞানমুগ্ধ জনগণকে পঞ্চসংস্কারযুক্ত, দ্রাবিড়-বেদবিশারদ এবং নারায়ণের শরণাগত করে সর্ব্বদা তাদিকে রক্ষা করব। আমি লোকরক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বার্থ-সংগ্রহ, সর্ব্ব-কল্যাণাকর তত্ত্বজ্ঞান প্রতিপাদক গ্রন্থত্রয়ের একখানি তার প্রণয়ন করব। যে মুনি শ্রেষ্ঠ পরাশর ও শঠকোপ, পুরাণ ও দ্রাবিড়বেদ রচনা করে সর্ব্বভূতের উপকার সাধন করেছেন, আমি তাঁদের নামানুযায়ী দুইজন মহাপুরুষের নামকরণ করব। আশ্চর্য্যের বিষয়, রামানুজের বাক্য যেন একে একে উচ্চারিত হতে লাগল, সমাধিস্থ মহামুনি যামুনের অঙ্গুলি তিনটিও একে একে খুলতে লাগল। সকলে এই ব্যাপার দেখে চমকিত হলেন। তাঁরা সকলেই রামানুজকে ভূরি ভূরি সাধুবাদ করতে লাগলেন এবং পরস্পর বলতে লাগলেন, এই যুবকই ভবিষ্যতে সমগ্র বৈষ্ণব সমাজের নেতা হবেন।

• • • •

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা—

জাহাজ যেদিকে থাক না কেন কম্পাসের কাঁটা উত্তর দিকেই থাকে, তাই জাহাজের দিক ভুল হয় না; মানুষের মন যদি কোন ছাপযুক্ত গোড়ান হয় তো গোড়াবার পর সে ছাপ আর কিছুতেই উঠে না। সেইরূপ ভগবানে ভক্তি লাভ করে একটু থেকে যদি তোমরা সংসারে ঢোক, তাহলে সে ভক্তি চিরকাল থাকবে; কাম কাঞ্চন তোমাদের একেবারে সংসারে ডুবিয়ে ফেলতে পারবে না। সংসার ধর্ম্ম, তাতে দোষ নেই, কিন্তু ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন রেখে কামনাশূন্য হয়ে কাজ কর্ম্ম করবে। এই দেখ না, যদি কারু পিঠে একটা কৌড়া হয়, সে যেমন সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়, হয়তো কাজকর্ম্মও করে, কিন্তু কৌড়ার দিকে তার মন পড়ে থাকে, সেই রকম।

ইমান

বড় গল্প :—

'সমর্জ'

একটা খুনের মামলা লইয়া কলিকাতা শহরে কিছু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল।

অনেক দিনের কথা, তবু হয়ত সে মামলার কথা অনেকের মনে আছে। কিন্তু অনেকে ভুলিয়াছেন, এবং এখনকার পাঠকরা হয়ত তাহার কথা শুনেন নাই কোনদিন। আমি তাই ব্যাপারটার সামান্য পরিচয় দিয়া লইতেছি।

খুন হইয়াছিলেন একটি মাদ্রাজী ভদ্রলোক। বড় এক বিদেশী ব্যাঙ্কের কর্মচারী ছিলেন, ঘটনার অল্পদিন পূর্বে অবসর লইয়াছেন। অবসর লইয়াছিলেন বয়সের সীমার জন্য, স্বাস্থ্য ও কর্মশক্তি ক্ষুণ্ণ হয় নাই। অত্যন্ত ভোরে উঠিতেন, পায়ে হাঁটিয়া অনেকদূর বেড়াইয়া আসিতেন। সেক তখন হয় নাই। সাধারণত যাইতেন গড়ের মাঠের দিকে। ঐটাই তখন বেড়াইবার স্থান ছিল। গড়ের মাঠেরই মধ্যে তিনি খুন হন, ছুরির আঘাতে।

সজ্জন ও সৌখিন মানুষ। দামী আংটি, সোনার বোতাম, সোনার ঘড়ি—ঘড়ির চেন পরা ছিল, টাকা ছিল—তাহার লোভেই খুন।

পুলিশ কিন্তু মামলা সাজাইয়াছিল অন্যভাবে। তাহাদের কথা ছিল, মৃত ব্যক্তি ব্যাঙ্কের কর্মচারী ছিলেন, আসামী একদা সেই ব্যাঙ্কের চাকুরিতে নিযুক্ত হয়, এবং কোন কারণে তাহার চাকুরি যায়। মৃতের নির্দেশে, অন্তত তাহার সেই বিশ্বাস। সেই আক্রোশের বশে সে তাঁহাকে খুন করিয়াছে। আংটি ঘড়ি খুলিয়া লওয়াটা আনুষঙ্গিক মাত্র।

আসামী নিজেকে নির্দোষ বলিয়াছিল। কিন্তু নির্দোষিতা প্রমাণ করিবার বিশেষ কোন চেষ্টা করে নাই। নিজে হইতে উকিলও দেয় নাই। তাহার পক্ষে উকিল নিযুক্ত হইয়াছিলেন সরকারের বদান্যতায়। আসামী নিজে উকিল দিতে না পারিলে তাহার পক্ষে সরকারই উকিল দিবেন, এইরূপ প্রথা বৃটিশ আমলে প্রচলিত ছিল।

ঘটনা অসম্ভব নয়, আক্রোশে বা লোভে মানুষ মানুষকে খুন করে। কিন্তু এই মামলাটার প্রধান আশ্চর্য বস্তু ছিল, পুলিশের কর্মদক্ষতা। শীতের ভোর, তাহাতে কুয়াশা—পথে জনমানব নাই, থাকিলেও বেশীদূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে না, এবং মাঠের মধ্যে খুন। প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিল না, থাকা সম্ভবও ছিল না। মৃত্যুর আধঘণ্টা পরে, আলো ফুটিবার পর, দেহ আবিষ্কৃত হয়, পথচারীর দ্বারা। পুলিশের কুকুর ছিল না সেক দে। যে সকল সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার দ্বারা একালেও অপরাধীর সন্ধান করা হয়—তাহাও বিশেষ ছিল না এদেশে। অথচ, আশ্চর্য, দুই বা তিন দিনের মাথায় পুলিশ আসামীকে ধরিয়া ফেলিল। মৃতের আংটি ঘড়ি প্রভৃতি অপহৃত হইয়াছিল, তাহার কিছুই পাওয়া গেল না। কিন্তু একটা প্রমাণ স্পষ্ট পাওয়া গেল—ঘটনার পর সেই দুই বা তিন দিনের মধ্যে আসামী অনেক টাকা ব্যয় করিয়াছে। সে দরিদ্র লোক, হঠাৎ এত টাকা পায় কোথায়? ইহাই ছিল তাহার বিরুদ্ধে একটি বৃহৎ যুক্তি। সে নিজে ইহার কোন উত্তর দেয় নাই। তাহার উকিল যে ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন তাহাও একেবারেই দুর্বল ও অস্বীকার্য।

শুধু তাহাই নয়, ঘটনার কয়েকদিন পূর্ব হইতে গ্রেপ্তারের মুহূর্ত পর্যন্ত তাহার প্রতিটি গতিবিধি ও কার্যকলাপের এমন সূক্ষ্ম ও সম্পূর্ণ বিবরণ পুলিস-পক্ষ আদালতে উপস্থিত ও প্রমাণ করিতে লাগিলেন যে

এখনকার এই আধুনিক যুগেও তাহা আশ্চর্য বলিয়া মনে হইবে।

মামলার সাক্ষ্য-প্রমাণ ও বিবরণ সকল সংবাদপত্রে সবিস্তারে ছাপা হইতে লাগিল। সেকালে রাজনৈতিক নেতা ও সরকারী কর্মচারীর বক্তৃতায় ভ্রমণ কাহিনীতে আর সিনেমার বিজ্ঞাপনে সংবাদপত্রের বারো আনা জায়গা ভরা থাকিত না। সংবাদও থাকিত কিছু কিছু। মফঃস্বলের কথা জানি না, কলিকাতা শহরের সর্ববিধ পাঠক নিবিড় আগ্রহ লইয়া সে বিবরণ পাঠ করিলেন এবং একবাক্যে মন্তব্য করিলেন, হাঁ এরকম দক্ষতা যদি পুলিস দেখায় তবে ট্যাক্স দেওয়া সার্থক।

মোকদ্দমা বেশীদিন চলিল না। সহজ সরল ও প্রচুর প্রমাণ, দীর্ঘ ও জটিল তর্ক বা আইনের মারপ্যাঁচ খুলিবার মত মামলাও নয়, বোধহয় ছয় বা সাতদিন শুনানীর পরই সারা হইয়া গেল। জুরীরা একবাক্যে রায় দিলেন। জজ ফাঁসির হুকুম দিলেন। হাইকোর্টে আপীল হইল না—আপীল কে করিবে? রায়ের পরে নেহাৎ যে-কয়দিন অপেক্ষা করা আইনের বিধি, তাহার পরই আসামীর ফাঁসি হইয়া গেল। মামলাটি জন-সাধারণের কৌতূহলের বিষয় ছিল বলিয়াই হয়ত, ফাঁসি হইয়া গিয়াছে এই সংবাদটিও কাগজে বাহির হইল। তারপর যা হয়, মানুষের মন হইতে সে কাহিনী ক্রমে মুছিয়া গেল।

মামলাটির বিবরণ এইটুকুই সকলের জানা। যেটুকু অজানা, তাহা এতদিন পরে বলিতেছি। কিন্তু এতদিন পরে হইলেও সকল নামধাম উচ্চারণ করিয়া বলা কঠিন হইবে; যে-কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পারিব না, দীর্ঘকাল পরেও তাহা হঠাৎ বলিতে যাওয়ার বিপদ আছে। অতএব যদি কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু বিবরণ ও যথার্থ পরিচয় বাদ দিয়া যাই, পাঠক ক্ষমা করিবেন।

খুনটা হইয়াছিল জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি। আসামী ধরা পড়ে তাহার তিনদিন পরে। সাধারণত এ সকল ক্ষেত্রে পুলিশ বহুদিন ধরিয়া সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ ক'রে মামলা সাজায়; অনেক সময়ে মাসের পর মাস, এমন কি বৎসরাধিক কালও ধরিয়া আসামী হাজতে পচিতে থাকে। এই মামলায় তাহা হইল না। বোধহয় জানুয়ারি শেষ হইতে না হইতেই মামলা নীচের আদালত পার হইয়া সেশনে চলিয়া গেল। তারপর সপ্তাহখানেক শুনানী এবং আর দুই দিনের মধ্যে রায়।

ডাঃ বোস বহুদিন কলিকাতায় ছিলেন না, বাংলা দেশেই ছিলেন না, অভ্যাসমত স্বতন্ত্র নিরুদ্দেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। কলিকাতায় যেদিন ফিরিলেন, মামলার তখন কয়েকদিন পার হইয়া গিয়াছে।

রাত্রে ফিরিয়াছেন। পরদিন সকালে আমি দেখা করিতে গেলাম। কহিলাম, মামলাটার কথা শুনেছেন?

ডাক্তার কহিলেন, আজকের কাগজে দেখলাম।

—তার আগেরটা দেখেননি?

—না। বাংলাদেশের কোন কাগজই চোখে দেখিনি এই মাস-দুয়েক!

তারপর কহিলেন, কিসের মামলা এটা? বেশ জোর শব্দ সাড়া পড়েছে মনে হল।

কহিলাম, হাঁ। কলকাতার সব কাগজেই দারুণ লিখছে। আমার ধারণা ছিল বাইরের কাগজেও দিয়েছে, কিছু কিছু অন্তত।

—দিয়ে থাকলেও আমি দেখিনি। কি ব্যাপারটা, বলই না শুনি।

আমি একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম, দিয়া কহিলাম, এইবার সব পড়ে নিন।

ডাক্তার কলিকাতায় না থাকিলেও তাঁহার কাগজ বন্ধ হইত না। সেগুলি যথানিয়মে বাড়িতে দিয়া যাইবার নির্দেশ থাকিত। আমি গত কিছুদিনের সকল কাগজের সকল কপি খুঁজিয়া মিলাইয়া তাঁহাকে দিলাম। ডাক্তার ক্রমপর্যায়ে পর পর তারিখের কাগজ

পড়িয়া চলিলেন, মুখের ভাবে বুঝিলাম তাঁহার মনোযোগ তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

ঘোরদৌড় ঘণ্টাখানেক, বা আরও বেশীক্ষণ ধরিয়া, ডাক্তার একটানা পড়িয়া গেলেন—পূর্বের বিবরণ, কোর্টের সাক্ষ্য, সম্পাদকীয় মন্তব্য, সমস্তই। তারপর কাগজ রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ কহিলেন, কটা বাজল?

আমি কহিলাম, নটা প্রায়।

ডাক্তার কহিলেন, খেয়ে নাও। দেখতে যাব।

—মামলা?

—হাঁ। তুমি যাচ্ছ।

—না।

—কেন? যেতে হয়।

—যাইনি, কাজ ছিল। আর মামলা ত তেমন কিছু নয়, সাধারণ একটা খুন। গিয়ে লাভও হবে না—অসম্ভব ভিড় হচ্ছে, জায়গা পাওয়াই শক্ত।

—খুব ভিড়?

—হাঁ। যাবার দরকার কি। সাক্ষীর কথা প্রতিটি অক্ষরে ছেপে দিচ্ছে কাগজে।

—তা হোক। কাগজে পড়া আর চোখে দেখা এক নয়। চল।

আদালতে যখন গিয়া পৌঁছিলাম, বিচার আরম্ভ হইবার তখনও বেশ দেরি, কিন্তু ঘর তখনই ভিড়ে ঠাসা হইয়া গিয়াছে। শুধু বাইরের দর্শক নয়, উকিলরাও অনেকে ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে একাধিক ব্যক্তি ছিলেন যাঁহারা ডাক্তারকে চিনিতেন, অতএব আমাদের কোন অসুবিধা হইল না। উকিলদের সঙ্গেই সম্মুখের সারিতে জায়গা পাইয়া গেলাম।

জজ আসিলেন, ফুরিয়া বসিলেন, মামলা শুরু হইল। অনেক সাক্ষীর জবানবন্দী নেওয়া হইল সেদিন। বাড়িওয়ালা বলিল, আসামী হামিদের ছয়মাস ভাড়া বাকি ছিল। তিনটাকা ভাড়া। ঘটনার দিন বিকালে হামিদ নিজে হইতে ডাকিয়া তাহাকে পুরা আঠারো টাকা চুকাইয়া দিয়াছে। হঠাৎ টাকা পাইল কোথায়, জানিতে তাহার কৌতূহল হইয়াছিল, হামিদ সে প্রশ্নের উত্তর দেয় নাই। মুদী, তেলওয়ালা, কাপড়-কিরিওয়ালা ইত্যাদি আরও বহুজন একই মর্মে সাক্ষ্য দিল। সকলেরই প্রাপ্য ছিল, অনেক তাগাদা বকাবকি করিয়াও তাহারা টাকা পায় নাই; কিন্তু ঘটনার দিন হইতে গ্রেপ্তারের দিন, ইহার মধ্যে হামিদ অকস্মাৎ সকলেরই দেনা মিটাইয়া দিয়াছে। হঠাৎ টাকা সে পাইল কোথায় ইহারা কেহ জানে না। হামিদের টাকা ছিল না। এ-বিষয়ে সকলেই নিশ্চিত।

ঘটনার দিন বাঁটের পাহারাওয়ালা তাহাকে অত্যন্ত ভোরে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়াছে। তখনও রাস্তার গ্যাস নিবে নাই। হামিদকে সে চেনে, কারণ সে সন্দেহজনক ব্যক্তি—চুরি পকেটমারা ইত্যাদির জন্য পুলিশ তাহাকে সন্দেহ করে, যদিও কোনদিন সে ধরা পড়ে নাই।

এক পান-কিরিওয়ালা বলিল, ঘটনার দুইদিন পূর্বে এই ব্যক্তি তাহাকে দিয়া একটি ছুরি শান দেওয়াইয়া লইয়াছিল। ইহার নাম সে জানে না, কিন্তু লোক ভুল করে নাই। শান দিতে দুই আনা রেট, একটা ঘষা আনি লইয়া দুইজনে তর্কাতর্কি হইয়াছিল, সেইজন্যই মুখটা ভাল করিয়া মনে আছে। সে ঐ পাড়ায় যাতায়াত করে, পূর্বে কখনও হামিদ তাহাকে দিয়া কাজ করায় নাই। হামিদের বাড়িতে ছুরি একটা পাওয়া গিয়াছিল, পানওয়ালা সেটাকে সনাক্ত করিল।

ওয়েলেসলির এক চা কারবারের দোকানের ম্যানেজার বলিল, খুনের দিন সকালে, তখন সাতটা হইবে, হামিদ তাহার দোকানে বসিয়া শিককাবাব ও চা খাইয়াছে, চা খুব বেশী কড়া করিয়া দিতে বলিয়াছে, একটা ব্যাগ হইতে পয়সা দিয়াছে, ব্যাগে আরও অনেক টাকাকড়ি ছিল সে দেখিয়াছে।

এক রিকশাওয়ালা বলিল, চায়ের দোকান হইতে বাহির হইয়া হামিদ তাহার রিকশা চড়িয়া বাড়ি ফিরিয়াছে। সাহেবের কবরখানার পিছনে তাহার বাড়ি।

ইহারা, এবং অনুরূপ আরও অনেকে, পর পর অনেক তথ্যই বলিয়া গেল; সকলের কথা একত্র মিলিয়া হামিদের সেই কয়েকটি দিনের প্রতিটি কাজের ও গতিবিধির এমন নিখুঁত হিসাব মিলিয়া গেল, যে ইহারা এমন সুশৃঙ্খলে একত্র জুটিল কি করিয়া তাহাই বিস্ময়কর।

সরকার পক্ষের উকিল সর্বজন-পরিচিত ব্যক্তি, দক্ষ লোক। আসামী পক্ষের উকিল ভদ্রলোককে দেখিলাম, বয়স, ঈষৎ কীণকায় বা ক্ষীণজীবীই বলা যায়; বুদ্ধিমান ব্যক্তি কিন্তু আত্মপ্রত্যয় কিছু কম। জেরা করিলেন প্রত্যেককেই, কিন্তু কোন সাক্ষীকেই বিশেষ বিব্রান্ত করিতে পারিলেন না।

ডাক্তার সাক্ষীদের প্রতিটি কথা তীক্ষ্ণ মনোযোগ দিয়া শুনিতেছিলেন। আমিও শুনিতেছিলাম নিশ্চয়ই, কিন্তু আমার মন এবং চক্ষু ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বিশেষ করিয়া আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছিল দুইটি লোক।

একজন, হামিদ স্বয়ং। পাহারাওয়ালারা তাহাকে আসামীর কাঠগড়ায় তুলিয়া দিল, সে বিশেষ কোন চাঞ্চল্য বা কৌতূহল ব্যক্ত করিল না, যেন যা যা হইতেছে তাহার প্রতি তাহার বিশেষ কোন আগ্রহই নাই। রেলিংটি দুই হাতে ধরিয়া, কিরকম একটা নিস্পৃহ উদাসীন ভঙ্গীতে সে ঠায় দাঁড়াইয়া রহিল; প্রায় চার-পাঁচ ঘণ্টা ধরিয়া মামলা চলিল। এই দীর্ঘ কালের মধ্যে একবারও বিশেষ নড়াচড়া করিল কিনা সন্দেহ। একএকজন নূতন সাক্ষী আসে, মুহূর্তের জন্য তাহার একটু চেতনা জাগে, দৃষ্টি উন্নত করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া দেখে, তারপরই আবার সে দৃষ্টি নিস্পৃহ ও নিষ্প্রভ হইয়া যায়। যেন, মানুষটা কে আসিল তাহার অপরাধের প্রমাণ দিতে, চিনিয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার কৌতূহল নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে; সে কি বলিল, তাহার অপরাধ কতটুকু সপ্রমাণ করিল বা করিল না, তাহা লইয়া তাহার বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য নাই।

নিজের ফাঁসির জন্য দড়ি পাকানো হইতেছে, এমন নিস্পৃহ নির্বিকার হইয়া তাহা কেহ চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে পারে তিলমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করে না, ইহা আমার ধারণা ছিল না। বোধহয় সেইজন্যই, যতক্ষণ মামলা চলিল, তাহার অধিকাংশ সময় আমার কাটিল হামিদের দিকে চাহিয়া। চাকা ঘনঘন করিয়া ঘোরে, অবিচল থাকে শুধু তাহার মধ্যবিন্দুটি, হামিদকে দেখিয়া, যেন গণিত-শাস্ত্রের এই তথ্যটির নূতন করিয়া অর্থবোধ হইয়া গেল। শুধু তাই নয়। হামিদ কাঠগড়ায় উঠিল, তাহার দিকে প্রথম তাকাইয়াই আমার মনে একটা চমক লাগিল, হঠাৎ মনে হইল, ইহাকে চিনি। বয়স পঁচিশের কাছাকাছি, ক্ষুদ্র কিন্তু সুগঠিত দেহ, ক্ষিপ্রতা ও শক্তি রাখে বুঝা যায়। হাজতের কষ্টে কিছু মলিন; চুল রুক্ষ, ছাঁটা গোঁপ ও সামান্য দাড়ি; অধরে কিছু বিশৃঙ্খল। চেহারার ঘোটের উপর তেমন বিশেষত্ব কিছু নাই, এমন কোন বিশেষ অঙ্গ বা ভঙ্গী নাই যাহার জন্য চেহারাটা মনে গাঁথিয়া থাকিবে, ভিড়ের মধ্যে অক্লেশে হারাইয়া যাইবে এমনই একটি সর্বাবহেলাবর্জিত আকৃতি। অথচ দেখিবামাত্র আমার মনে হইল ইহাকে চিনি, এই মুখ, এই দৃষ্টি, এই দাঁড়াইবার ভঙ্গী আমার অত্যন্ত পরিচিত। অথচ, কবে কোথায় ইহাকে দেখিয়াছি কিছুতেই মনে করিতে পারি না। বারবার তাকাই, আবার অন্যদিকে চাহিয়া বা চক্ষু বুজিয়া মনে আনিতে চেষ্টা করি কতদিন পূর্বে বা কোন্ পরিবেশে ও পশ্চাৎপটে ইহাকে আমি দেখিয়াছি—বৃথা চেষ্টা। আবার তাহার দিকে তাকাইয়া থাকি।

দ্বিতীয় জনকে লক্ষ্য করিলাম, হামিদেরই দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া। আদালতে কি হইতেছে তাহার প্রতি তাহার চরম ঔদাসীন্য, কিন্তু তবুও তাহার চক্ষু ঘুরিয়া ফিরিয়া ঘরের একটি কোণে গিয়া পড়িতেছে, মুখে ভাবাভিব্যক্তি নাই তবু যেন চোখের দৃষ্টি কেমন ব্যথিত হইয়া উঠিতেছে, আবার চক্ষু ফিরাইয়া লইতেছে। সেই কোণে বসিয়া আছে একটি মেয়ে, বোরখা পরা। মুখ দেখা যায় না কিন্তু গড়ন ও ভঙ্গী দেখিয়া বোঝা যায় বয়স কুড়ি-একুশের উপরে নয়। সঙ্গে একটি শিশু,

বছরখানেক বয়সের মেয়ে। তাহাকে যথাসাধ্য সাজানো হইতেছে, আর বোরখার মধ্য হইতেই দৃষ্টি মেলিয়া হামিদের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। মধ্যে মধ্যে মুখ অন্যদিকে ফেরে; নূতন সাক্ষী আসিলে, উকিল কিছু বলিলে, একবার সেইদিকে চাহিয়া দেখে; আবার দৃষ্টি হামিদের উপরে আসিয়া নিবদ্ধ হয়। বুঝিতে কষ্ট হয় না হামিদের কোন আত্মীয়, হয়ত বোন বা স্ত্রী। করিবার কিছু নাই, তাহাকে যথাসাধ্য দেখিয়া লইতেছে, কে জানে ইহাই শেষ দেখা কিনা।

আদালতের কাজ যতক্ষণ চলিল, হামিদ একইভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, মেয়েটিও সেই একইভাবে বসিয়া রহিল। তাকাইয়া দেখিতে দেখিতে আমার মনের মধ্যে টন্‌টন্ করিয়া বাজিতে লাগিল—নিজের জন্য, পরের জন্য এতখানি দুঃখের সৃষ্টি যাহাতে, সেই অপরাধের পথে কেন মানুষ পা বাড়ায়!

একজন উকিল, তিনি এই মামলায় সংশ্লিষ্ট নন, দর্শক হিসাবেই উপস্থিত, ডাক্তারের বিশেষ পরিচিত। তিনিই ব্যবস্থা করিয়া ডাক্তারকে ও আমাকে বসাইয়া দিয়াছিলেন। ডাক্তার নিশ্চয়ই তাঁহাকে কিছু নির্দেশ দিয়াছিলেন; আদালতের কাজ যখন শেষ হইল, জজ উঠিয়া গিয়াছেন, ঘরের জনতাও ইতস্তত ছড়াইয়া ক্রমশ অন্তর্হিত হইতেছে, সেই ভদ্রলোক আসামীর উকিলকে সঙ্গে করিয়া ডাক্তারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ডাক্তার ও উকিলের মধ্যে অতি সংক্ষেপে ও মৃদুস্বরে কি কথা হইল আমি শুনিতে পাইলাম না, শুধু দেখিলাম ভদ্রলোক মাথা হেলাইয়া ডাক্তারকে বলিলেন, আচ্ছা।

তারপর আমরা বাহির হইয়া আসিলাম। কথাটা কি, ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলাম না, তিনিও বলিলেন না।

গাড়ীতে, এবং বাড়িতে আসিয়াও, ডাক্তার অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া রহিলেন, যেন বিশেষ চিন্তামগ্ন। হয়ত নিজেই কিছু বলিবেন ভাবিয়া আমি বহুক্ষণ অপেক্ষা করিলাম। শেষে একসময়ে কহিলাম, অত কি ভাবছেন?

ডাক্তার কহিলেন, ভাবছি? অনেক কিছু। আচ্ছা, বল ত, গেলে, কি কি দেখলে?

—কি আর দেখব। যা সবাই দেখল তাই দেখলাম।

—শুধু তাই? আর কিছু মনে হল না?

—কি মনে হবে।

—হতে ত পারত অনেক কিছুই। আচ্ছা, আসামীকে ত খুব করে দেখছিলে দেখলাম, তার দিকেই তাকিয়ে রইলে দিনভর। কি বুঝলে তাকে দেখে?

কহিলাম, বুঝবার কি আছে। কিন্তু হাঁ, একটা কথা মনে হল। লোকটাকে দেখে মনে হল খুব চেনা। আগে দেখেছি এবং খুব ভাল করেই দেখেছি। অথচ কোথায় দেখলাম কিছুতেই মনে করতে পারলাম না।

ডাক্তার কহিলেন, ও হয়। এক-একটা চেহারা থাকে ইউনিভার্সাল টাইপ—দেখলেই মনে হয় দেখেছি। তাতে প্রমাণ হয় না সত্যি দেখেছ, তোমাকে তার সাক্ষাত বলে ধরে নিয়েও যাবে না।

—তাই বলেছি?

—তুমি কেন বলবে। আমি বললাম। অত দিলাম। কিন্তু তামাসা নয়, সত্যি বল ত, হামিদকে দেখে কি রকম বলে মনে হল লোকটাকে।

—কিছুই মনে হয়নি। মানে, ভেবেই দেখিনি তেমন করে কিছু। কি মনে হওয়ার কথা, বলুন?

—ধর, তার বুদ্ধিবৃত্তি? খুব কি তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন বলে মনে হল? বা প্রখর স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন? বা বিশেষ চিন্তাশীল বিবেচক ব্যক্তি? যারা কোন কথাকে অনেক দিন ধরে মনে পুষে রাখতে পারে? দীর্ঘদিন ধরে তার ভালমন্দ নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করতে পারে অনেক ভেবেচিন্তে তবে কাজে হাত দেয়?

—না, তা ত মনে হয় নি। বরং মনে হয়েছে কিছু ভাসা প্রকৃতি: হঠাৎ কিছু একটা করে ফেলতে পারে সামনে এসে গেলে; কিন্তু তা নিয়ে বিশ্লেষণের শক্তি নেই, চেষ্টাও করে না—না আগে না পরে।

—মনে হল ত? বেশ বেশ। দৃষ্টিশক্তির উন্নতি হচ্ছে।

খুশি হইয়া কহিলাম, ভুল হয়েছে ত? তা আমি কি করব।

ডাক্তার কহিলেন, আরে না না। ভুল করনি মোটেই, অত্যন্ত ঠিক-রকম বুঝে ফেলেছ তাকে। কিন্তু সেইখানেই খটকা লাগছে আমার।

—খটকা কিসের?

—অনেক। ওর যা প্রকৃতি আর বুদ্ধি বলে মনে হল, তাতে হঠাৎ কিছু করে ফেলতে পারে—রাগে হোক, ভয়ে হোক, লোভে হোক; কিন্তু বহুদিন আগের একটা ঘটনাকে মনে পুষে রেখে, জপ করে করে, শেষে সেই রাগের শোধ তুলতে যাবে দু আড়াই বছর পরে, একথা ওর সম্বন্ধে ভাবা কঠিন।

—হ্যাঁ।

—অথচ পুলিশ তাই বলছে—চাকরি খেয়ে দিয়েছিলেন বলে ওর রাগ ছিল সে ভদ্রলোকের ওপর। প্রশ্ন হচ্ছে, চাকরি হয়ত গিয়েছিল। রাগও হয়েছিল। কিন্তু সে-খুন সে আড়াই বছর পরে করতে যায় কেন? তখন-তখন করে ফেলাই ত স্বাভাবিক ছিল।

—তখন করেনি, হয়ত সুযোগ পায়নি।

—তাই আড়াই বছর ধরে তপস্যা করেছে সুযোগের জন্যে? তা করলে ত সবদিক আঁটঘাট বেঁধেই করত—এত সাক্ষীসাবুদ রেখে করল কেন? অত সহজ নয় যে, এর ভিতরে মেলা ঘোরালো আছে।

—কিসের ঘোরালো?

—সেইটেই ত বুঝতে পারছি নে। সে যাক। কাল আসছ? এসো। সকালবেলা।

—সকালবেলা, কখন?

—সাতটার আগে। কাল রবিবার, ওরা আসবে।

—কারা?

—দেখতে পাবে।

পরদিন আমি সাতটার বহু পূর্বেই ডাক্তারের বাড়িতে গিয়া হাজির হইলাম।

সাতটার অল্প পূর্বে একটি ঘোড়ার গাড়ি আসিয়া বাড়িতে ঢুকিল। একটি ভদ্রলোক নামিয়া এদিক ওদিক তাকাইতেছেন, ডাক্তার দরজায় দাঁড়াইয়া কহিলেন, আসুন।

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকিলেন। আগের দিন দেখিয়াছি, সেই আসামীর উকিল। বসিয়া কহিলেন, এলাম। কি ব্যাপার বলুন ত।

ডাক্তার কহিলেন, মহীতোষ কিছু বলেছে আপনাকে?

—বলেছেন। আমিও তাঁর কথাতে ভরসা পেয়েই চলে এসেছি। কিন্তু, সত্যি কি পারা যাবে কিছু করতে?

ডাক্তার কহিলেন, সে আপনি জানেন ভাগ্য। আমরা চেষ্টা করতে পারি—এই পর্যন্ত। আপনি কতদূর বুঝছেন, মামলার অবস্থা?

ভদ্রলোক কহিলেন, সত্যি বলতে, ভাল বুঝছি না, ওরা এমন নিখুঁত মামলা সাজিয়েছে, এত পরপর ডিটেইল যোগাড় করে ফেলেছে, তার কোথাও ছিদ্র বার করা শক্ত।

ডাক্তার কহিলেন, আমারও সেইটেই আশ্চর্য লেগেছে। এমন নিখুঁত ডায়েরি পেয়ে গেল তার প্রতিটি কাজের কি করে?

—আমি কি বলব।

—ও নিজে কি বলে?

—সেটাও অদ্ভুত। একেবারে কিছুই বলছে না। আমার সঙ্গে পরামর্শ যাকে বলে, তাও করতে চাইছে না কিছু।

—তার মানে? উকিলকে কথা বলছে না?

—না। তার একটা কারণ হতে পারে, আমাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। মানে আমি গবর্মেণ্টের দেওয়া উকিল, আমাকে হয়ত পুলিশের আততায়ী বলেই ধরে নিয়েছে।

—অসম্ভব নয়। কিন্তু তা হলে ত মুশকিল। মক্কেল নন্-কোঅপারেশন দিলে আপনি চলবেন কি করে?

—তাই পারছিও না বলতে। আসামীর তাহ থেকে কোন কথা নেই, সাহায্য নেই। এক, যদি কোর্টে দাঁড়িয়ে সাক্ষীর কথার ছিদ্র বা অমিল বার করা যায়, সেইটুকু ভরসা।

—সে ভরসা জিরোর বেশী নয়। সাক্ষীরা রীতিমত তৈরি, কাল যা দেখলাম। দাঁড়ানো শক্ত হবে।

—হচ্ছেও।

—আসল ব্যাপারটা সম্বন্ধে কিছু বলছে? খুনটা করেছে?

—জানিনে। করে থাকতে পারে।

—স্পষ্ট জিজ্ঞেস করেছিলেন?

—জবাব দেয়নি। পুলিশও অত্যন্ত কড়া পাহারা দিচ্ছে, ইন্টারভিউতে পর্যন্ত বাগড়া দিচ্ছে, নিজেরা হাজির থাকছে। কথা কওয়াই মুশকিল তার সঙ্গে।

ডাক্তারের ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। কহিলেন, ব্যাঙ্কের চাকরিটা এর গিয়েছিল, কতদিন আগে?

—প্রসিকিউশন বলছে, বছর আড়াই।

—ও নিজে?

—কিছু বলছে না।

—ব্যাঙ্কের লোক আইডেন্‌টিফাই করেছে ওকে?

—বোধ হয় না। ব্যাঙ্ক থেকে কাউকে ডাকাই হয়নি প্যারেডে।

—বৌ কিছু বলে?

—কিচ্ছু না।

ডাক্তার একটুকাল কি ভাবিলেন, তারপর কহিলেন, বৌটা এসেছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। গাড়িতে বসে আছে। ডেকে আনব?

—হ্যাঁ। আর, মানে আপনার কাছে যখন মুখ খুলছে না—

—ঠিক আছে। তাকে এনে দিয়ে আমি গাড়িতে গিয়ে বসছি। আপনি দেখুন যদি কিছু পারেন বার করতে।

—এটা অবশ্য বলা আমার উচিত হল না। কিন্তু—

—কেন নয়। আমার মক্কেল, আমারই গরজে আপনার কাছে এসেছি। এতে আমার দ্বিধা হবে কেন। আপনারই বা সঙ্কোচের কি আছে।

ভদ্রলোক গাড়ির কাছে গেলেন। গাড়ি হইতে পূর্বদিনের সেই মেয়েটি শিশুকন্যা সহ নামিয়া আসিল। মেয়েটি নিজেই আসিয়া দরজায় উঠিল। উকিলবাবু গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন।

ডাক্তার কহিলেন, ভদ্রলোক উকিল যেমনই হোক, মানুষ সিন্‌সিয়ার।

আমি কহিলাম, নিঃসন্দেহ।

মেয়েটি ততক্ষণে দরজার কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ডাক্তার কহিলেন, এস।

বলিয়াই আমাকে চোখের ইঙ্গিত করিলেন। আমি ঘরের অপর প্রান্তে, কিন্তু অল্প-আলোকিত স্থানে গিয়া বসিলাম।

মেয়েটি ঘরে ঢুকিল, এদিক ওদিক চাহিয়া, ডাক্তারের সম্মুখে মেঝের উপরেই বসিয়া পড়িল। আমি ঘুরে, এবং তাহার পাশের দিকে। আমি তাহাকে দেখিতে পাইতেছি, সে আমাকে দেখিতে পায় না। শিশুটিকে পাশে নামাইয়া রাখিল, সে কিছু আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল, ডাক্তার একটা কৌটা খুলিয়া কয়েকটা লজেন্স ও মোটাদুই রঙিন পুতুল তাহার হাতে দিলেন। কহিলেন, তোমাকে আমি ডেকেছি। কেন ডেকেছি, উকিলবাবু কিছু বলেছেন?

মেয়েটি মুখ তুলিয়া চাহিল, মুখ হইতে ঘোমটার ঢাকা সরাইয়া দিল। বয়স কুড়ি বা আরও কম হইবে, বেশ সুন্দরী। আধ-ময়লা রং, কিন্তু মুখ-চোখের গঠন ভাল। বিশেষ করিয়া টানা-টানা চোখ ও ভ্রূ। কহিল, জী।

—কি বলেছেন?

মেয়েটির স্বর মৃদু কিন্তু মিষ্টি, ভাষা ভাঙা-উর্দু।

কহিল, বলেছেন, আপনি যদি ওকে বাঁচাতে চেষ্টা করবেন। বলিতে বলিতে হঠাৎ সে চঞ্চল হইল, একটা হাত বাড়াইয়া ডাক্তারের গায়ে রাখিল। কহিল, আমার বাপ নেই বাবুজী। আপনি আমার বাপ। ওকে আপনি বাঁচিয়ে দেবেন?

ডাক্তার একটি হাত তাহার মাথার উপরে রাখিলেন। কহিলেন, বাঁচিয়ে দেওয়া ত আমার হাত নয় বেটী। আমি চেষ্টা করব।

মেয়েটির চক্ষু হইতে জল ঝরিয়া পড়িল। কহিল, বাপজী, এইটুকু ভাল কথা আমাকে কেউ বলেনি।

ডাক্তার চুপ করিয়া রহিলেন। মেয়েটি নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল। তাহার কান্নায় কোন শব্দ নাই, দীর্ঘশ্বাস নাই, শুধু দুই চক্ষু হইতে জল ঝরিয়া পড়ে।

অনেক ক্ষণ পরে ডাক্তার কহিলেন, আমি চেষ্টা করব যদি বাঁচাতে পারি। কিন্তু আমাকে কতগুলো কথার জবাব দিতে হবে। দেবে? বিশ্বাস হবে?

মেয়েটি চক্ষু তুলিয়া তাকাইল, অদ্ভুত দৃষ্টি। কহিল, হবে। বলুন।

ডাক্তার কহিলেন, তোমাদের দেশ কোথায়?

—আমার? বিহার-শরীফ।

—কে আছে?

—বাপ নেই। মাও নেই। চাচা আছে। চাচাই মানুষ করেছে। চাচা বড় গরীব।

—ওর?

—ওর কলকাতায়ই ঘর।

—আর কে আছে?

—কেউ না। এক নানী ছিল। সে মরে গেছে পরশাল।

—বিয়ে হয়েছে কতদিন?

—দু'বছর। বা বেশী হল।

—যখন বিয়ে হল তখনই কি ও ব্যাণ্ডে চাকরি করত?

—আমি জানিনে।

—চাকরি করত জানতে?

—না।

—তুমি লিখতে পড়তে জান?

—না।

—ও কতদূর জানে?

—জানে না।

—একটুও না?

—না।

একটুও লেখাপড়া জানে না। ব্যাণ্ডে চাকরি করত? আমি আশ্চর্য হইলাম। হয়ত কিছু বলিয়া ফেলিতাম, ডাক্তার চোখের ইঙ্গিতে থামাইয়া দিলেন। কহিলেন, তুমি এসে কি দেখলে? কি করে চলে ওর?

—নানীর টাকা ছিল। নানী মরে গেল। তখন মুসকিল হল।

—ও কিছু করত না? কি করে চলত?

মেয়েটি একটু দ্বিধা করিল, কহিল, মাঝে মাঝে টাকা আনত। তখন ভাল চলত। আবার আনত না। তখন কষ্ট হত। সব দিন খাওয়া হত না।

তবু কিছু করত না? করত, বলতে পারছ না। কি করত? পকেটমার?

—আমি জানিনে। বলত না।

শিশু কাঁদিয়া উঠিল, মেয়েটি তাহাকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল, কোলে তুলিয়া লইয়া দোলা দিয়া থামাইতে লাগিল।

ডাক্তার হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন, অত্যন্ত স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ কণ্ঠে: কত টাকা পেয়েছিল?

মেয়েটি কহিল, দু'শো। বলিয়াই বিবর্ণ হইয়া গেল।

ডাক্তার কহিলেন, ভয় নেই, আমি বলব না। কিন্তু তোমায় আমাকে বলতে হবে। তুমি আমাকে বাবা বলেছ।

মেয়েটি কথা কহিল না।

ডাক্তার কহিলেন, কে লাগিয়েছিল ওকে? তার নাম জান?

মেয়েটি ঘাড় নাড়িল: না।

—জানতে পারবে? জানতে পেলে আমাকে বলবে?

—না। তাহার স্বর স্পষ্ট ও দৃঢ়।

—কেন বলবে না। তুমি আমাকে বাপ বলেছ।

মেয়েটি স্পষ্ট মৃদুস্বরে কহিল, বাপ ত বেটীকে ইমান বরবাদ করতে বলবে না।

—ওকে বাঁচাতে হলে বলতেই হবে তার নাম।

—ইমান নষ্ট করে?

—কিন্তু সে কি তোমার সঙ্গে ইমান রেখেছে?

—তার ইমান তার কাছে। আমার ইমান আমি জানি।

—হামিদ বলবে?

—না। বলেনি।

—তুমি জান। বলছ না।

—জানিনে। সচ্। জানলেও বলতাম না।

তারপর প্রায় পনর মিনিট ধরিয়া দুইজনের এই একটি কথা লইয়াই যুদ্ধ চলিল। ডাক্তার তাহাকে বহু প্রকারে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন।

তাহার সেই একই উত্তর, সংক্ষিপ্ত এবং দৃঢ়: হম্ মুসলীম, ইমান নহী ছোড়্, শক্‌তী।

শেষ পর্যন্ত ডাক্তারই হার মানিলেন। কহিলেন, তুমি এখন কি করবে?

—থাকব। ও যদি ছুটে যায়, ওকে নিয়ে মুলুক চলে যাব। সেখানে খেতী করে খাব।

—কলকাতায় থাকবে না?

—না। কলকাতা হারামীর জায়গা। তাহার কণ্ঠে চরম ধিক্কার ও ঘৃণা ঝরিয়া পড়িল।

ডাক্তার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর কহিলেন, 'আর যদি—'

কথাটা শেষ করিতে পারিলেন না।

মেয়েটি তাঁহার দিকে চাহিল, সহজ কণ্ঠে কহিল, যদি ছুটে না যায়?

ডাক্তার কথা কহিলেন না। মেয়েটি কহিল, তাহলেও দেশে চলে যাব। বাবার কাছে। আর আসব না কলকাতায়।

অনেকক্ষণ মৌন থাকিয়া ডাক্তার কহিলেন, আচ্ছা। তুমি এখন বাড়ি যাও। আবার যদি আমি ডেকে পাঠাই, আবার আসবে?

—বলেন, আসব। কিন্তু কি হবে এসে?

—মানে, এলেও নাম তুমি বলবে না।

—বাবুজী, আমরা গরীব। কিন্তু আমরা মুসলীম।

আমি সারাক্ষণ চক্ষু মেলিয়া এই মেয়েটিকে দেখিতেছিলাম। ডাক্তারের প্রশ্নটা কি, অনুমানে বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু মেয়েটির ভঙ্গীগুলি আমাকে বিস্ময়ে নির্বাক করিয়া ফেলিয়াছিল। নিজেই বলিল, সবদিন খাইতে পায় না; অথচ ইমান রাখিবার জন্য সে কথাটা বলিবে না। যদিও বলাই হয়ত বাঁচিবার একমাত্র পথ। 'হম্ মুসলীম' কথাটা কয়েকবারই উচ্চারণ করিল, প্রতিবারেই দেখিলাম তাহার মুখশ্রী দৃঢ় ও গর্বিত হইয়া উঠিল। দেখিয়া আমি সঙ্কুচিত হইয়া গেলাম। এই অশিক্ষিত রমণী যতখানি দর্প ও দৃঢ়তা লইয়া বলিতেছে, হম্ মুসলীম্, আমি—আমি শিক্ষিত সভ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি—আমি ত অতখানি জোর দিয়া কোনদিন বলিতে পারি নাই 'আমি হিন্দু' কোনদিন বলিতে পারিব না।

ডাক্তার একটা নিঃশ্বাস ফেলিলেন। কহিলেন, তোমার হাতে টাকা আছে?

—আছে বিশ-পঁচিশ।

ডাক্তার কহিলেন, এই টাকাটা রাখ। না বোলো না, বাপ বলে ডেকেছ।

মেয়েটি হাত বাড়াইয়া টাকা লইল।

ডাক্তার কহিলেন, দেশে চলে যদি যাও, আবার দেখা করে যাবে?

—কি হবে বাপ্‌জী। যদি ও ছুটে যায়, সেলাম জানাতে আসব। আর যদি—' কথাটা শেষ করিতে পারিল না। কহিল, যাই বাপ্‌জী।

ডাক্তার কহিলেন, এস।

মেয়েটি নামিয়া গেল, নিজেই গিয়া গাড়িতে উঠিয়া বসিল। ডাক্তার পিছনে নামিয়া গেলেন, গাড়ির

সম্মুখে দাঁড়াইয়া উকিলবাবুকে কি বলিলেন। গাড়ি চলিয়া গেল।

ঘরে ফিরিয়া ডাক্তার নতমুখে একটা আসনে বসিয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। তারপর নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, হেরে গেলাম।

তাঁহাকে এমন বিচলিত কখনও দেখি নাই।

অনেক প্রশ্ন মনে ঠেলিয়া উঠিতেছিল, অথচ বুঝিতেছিলাম প্রশ্ন করিয়া তাহাকে উত্যক্ত করার সময় এ নয়। তবুও একটা প্রশ্ন মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল: দু'শো টাকা কি বললে?

ডাক্তার মুখ ফিরাইলেন না। শ্রান্ত স্বরে কহিলেন, এরা গরীব। দু'শো টাকা এদের কাছে রাজার ঐশ্বর্য। বলিয়া আবার নিস্তব্ধ হইয়া গেলেন।

আমিও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া রহিলাম, তারপর কহিলাম, আমি এখন যাই?

ডাক্তার কহিলেন, যাবে? আচ্ছা।

আমি যখন দরজা পার হইতেছি, সহসা ঈষৎ সচেতন হইয়া কহিলেন, আবার কবে আসবে?

আমি কহিলাম, আপনিই বলুন।

ডাক্তার কহিলেন, আমি? বেশ আমিই ডেকে পাঠাব।

ইহার দিনচারেক পরে, সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ ডাক্তারের ফোন আসিল। চলিয়া গেলাম। ডাক্তার বাগানে পাইচারি করিতেছিলেন। কহিলেন, এস। কাগজ দেখেছ?

—না।

—ফাঁসি হ'ল।

—হাবিবের?

—হ্যাঁ।

সান্ধ্য সংবাদপত্রের সেই পৃষ্ঠাটাই খোলা ছিল। রুদ্ধশ্বাসে পড়িলাম। সংবাদ দীর্ঘ নয়—জুরিরা এক বাক্যে তাহাকে অপরাধী বলিয়াছেন, জজ ফাঁসির হুকুম দিয়াছেন।

আমি কহিলাম, কবে হবে, ফাঁসি?

—কি করে বলব। হবেই একদিন।

—বাঁচানোর পথ কিছু পাওয়া গেল না?

—আর পেয়েই বা কি হবে।

—আপীল?

—ক্ষেপেছ। কে করবে আপীল?

—কেন, বৌ?

—টিকবে না। টাকা আমি দিতে রাজি ছিলাম; কিন্তু ফল হবে না। তারপর অত্যন্ত মৃদুস্বরে কহিলেন, বড় শক্ত করে আটঘাট বেঁধেছে। বলিতে বলিতে তাঁহার মুখ ক্রমে কঠিন হইয়া উঠিল।

তারপর হঠাৎ আমার দিকে চাহিলেন, কহিলেন, তুমি আর কদিন আছ এখানে?

কহিলাম, আর কি। দু'চার দিন।

—ডাকলে আসতে পারবে? ধর মাসখানেক বা মাসদেড়েক পরে?

—পারব।

ইহার তিন দিন পরে কলিকাতা হইতে বাহির হইয়া গেলাম। আরও দিন পনের পরে কাগজে দেখিলাম, হাবিবের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে।

মাসখানেক পরে, হঠাৎ একদিন চিঠি পাইলাম, এক জ্ঞাতি-ঠাকুরদাদা মারা গিয়াছেন। শ্রাদ্ধ আমার করণীয় নয়, কিন্তু অশৌচ বাধে। ব্রাহ্মণ নই, তিনি অনুপনীত আমিও তাই—পুরা একমাস অশৌচ। উপায় নাই, পালন করিতেই হইবে। মাসের শেষ, চুল কাটিতে যাইব-যাইব করিতেছিলাম, এমন সময়ে সংবাদ। একমাস ধরিয়া চুলের উপরে চুল বাড়িল, দাড়ি-গোঁপে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেলাম। অনভ্যস্ত দাড়ি-গোঁপের কুটকুটানি, মাথায়ও সেকালে টাকের আবির্ভাব হয় নাই, রীতিমত ভাপ সাইয়া উঠিলাম।

অশৌচান্তের আর দিন দুই বাকি। ডাক্তারের চিঠি পাইলাম, অবিলম্বে চলিয়া আইস। অতএব সেই আবশ্যক মূর্তি লইয়াই ট্রেণে চাপিলাম।

ষ্টেশন হইতে তাঁহার বাড়িতে গেলাম। ডাক্তার

বাহিরে গিয়াছেন, বলিয়া গিয়াছেন আমার যেন কোন অসুবিধা না হয়। রাত্রের ট্রেণে আসিয়া আসিয়াছি, স্নান ও আহার সারিয়া শুইয়া পড়িলাম। রীতিমত একটি লম্বা ঘুম দিয়া উঠিয়া দেখিলাম, ডাক্তার পাশে বসিয়া বই পড়িতেছেন। কহিলেন, ভাঙল?

কহিলাম, ডাকেননি কেন?

—কি হবে ডেকে।

তারপর বেশ মনোযোগ সহকারে আমার দিকে তাকাইয়া দেখিলেন, পরিতৃপ্ত স্বরে কহিলেন, বেশ দেখাচ্ছে।

কহিলাম, তা কি করব। আর দিন দুই।

—না না, থাক না। গোঁপদাড়ি ভাল জিনিষ, অনেক কাজে লাগে।

—তার মানে? ডেকেছেন কেন?

—বলব, বলব বলেই ত ডেকে আনা।

বলিলেন আরও অনেকক্ষণ পরে। হঠাৎ কহিলেন, তোমার ত অভ্যেস আছে। বিয়েটায় করবে?

—হঠাৎ?

—বড় বড় কাজ হঠাৎই হয়। করবে কিনা বল।

—করব না কেন। কিন্তু আপনি ডেকেছেন, বিয়েটায় করবার জন্য—ব্যাপার কি বলুন ত?

—ব্যাপার আবার কি। আমার ঘরে শখ থাকতে নেই? ভয় নেই, আমিও থাকব কাছে।

আমি কহিলাম, কি প্লে?

—প্লে নাথিং। একটি পার্টি হচ্ছে, অনেক বড় বড় লোকের সমাগম। হোটেল থেকে খানা আসবে, হোটেলের বয়রা পরিবেশন করবে। তুমি বয় হয়ে তাদের দলে ভিড়ে যাবে।

—সর্বনাশ। শেষে যদি গুলিয়ে-ফেলি?

—ফেলবে না, খেয়াল রাখবে। পরিবেশন মানে যে সবাইকেই সত্যি সত্যি খাবারের ডিস ঘিরে বেড়াতে হবে তার মানে নেই, ঘুরঘার করে বেড়ালেই চলে যাবে। শুধু চালচলন কায়দাটা যেন ঠিক থাকে। বরং দুচারবার যাও, সে হোটেলে বসে খেয়ে এস, তাদের চং-চাংগুলো দেখে এস ভুল চুক না হয়।

—তার দরকার হবে না। কিন্তু তাদের দলে কিছু তারা চিনে ফেলবে না।

—না। দরকার মত ওরা একটা লোক নিয়ে নেয় বাহিরে কাজের জন্যে। সে আমি বুঝব। তোমার ভাবনা কি। শিখতে যাওয়া যদি দরকার না হয় তবে আর কি, পড়ে পড়ে ঘুম লাগাও এই দু'দিন।

—সে কি। বাড়ি যাব না?

—না। তাদের জানাবেই না এসেছ।

—কি কাণ্ড, কিছু বুঝতে পারছি না।

—ক্রমশ পারবে। আপাতত একটা খবর দিতে পারি। বাড়িতে যাবার এখনই দরকার নেই, উচিতও হবে না। এই চেহারা দেখলে তারা আঁৎকে যেতে পারে।

—মানে?

—মানে, অহেতুক কতগুলো চুল-দাড়ির জঙ্গল নিয়ে গিয়ে চুকলে—

আমি বোকার মত চাহিয়া রহিলাম।

ডাক্তার কহিলেন, নাঃ, দিয়েই দিই শুভ-সংবাদটা। কেউ মারা যায়নি। চিঠিটা আমি লিখেছিলাম।

—সে কি! কেন?

—কারণ ছিল নিশ্চয়ই।

—তাহলে, এগুলো?

—আহা থাক্ না। কষ্ট করে রেখেছ। বিশ্বসুন্দোহপি সংবর্ধা।

পার্টির দিন আসিল। আমি কহিলাম, আমি কি এই বিকট-কটাহ হয়ে যাব নাকি?

ডাক্তার কহিলেন, ছটফটাচ্ছ কেন। যা হবার হবে, দেখতেই ত পাবে।

বিকালের দিকে একটি ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার কহিলেন, কই হে, এস, মেক-আপ নাও।

সত্যই মেক-আপ-ম্যান সে ভদ্রলোক। আমাকে

এক চোখারে বসাইয়া তিনি আমার রূপসজ্জায় ব্যাপৃত হইলেন। চুল কাটিয়া গোঁফদাড়ি ছাঁটিয়া সে মহাকাণ্ড বাধাইয়া দিলেন। ঘণ্টা দুই পরে, পোষাক-টোষাক পরাইয়া দিয়া কহিলেন, ফিনিশ্‌ড্‌।

আমার দেহে হোটেল-বয়ের সাদা সস্তা পোশাক, কোমরে লাল-ফিতির ঘড়ি, পায়ে নিঃশব্দ জুতা, মাথায় পাগ্‌ড়ি। চাহিয়া চাহিয়া যতদূর টের পাইলাম, নিখুঁত সজ্জা। কহিলাম, আয়না কই, কি-রকমটি হলাম একবার দেখে নিই।

ডাক্তার কহিলেন, না। দেখলে ঘাবড়ে যাবে। সেল্‌ফ-কন্‌শাস্‌ হয়ে যাবে। এবার চল। এই নাও, তোমার আইডেন্‌টিটি কার্ড।

পথে যাইতে যাইতে ডাক্তার আমার কর্তব্য বুঝাইয়া দিলেন। পরিবেশনের কাজে আমার লাগিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই, কিন্তু ঘোরাঘুরি মালপত্র টানাটানি করিলেই চলিবে। মোট কথা, পার্টি যেখানে, সেই হলটিতে বা তাহার কাছাকাছি উপস্থিত থাকা। শুধু কয়েকটি বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হইবে—সেই ঘরে থাকিব—কিন্তু না ডাকিলে তাহার কাছে যাইব না, তাঁহাকে চিনি এমন কোন ভাব বাক্ত করিব না। একটানা দীর্ঘকাল সে ঘরে উপস্থিত থাকিব না, অথচ ঘরের বাহিরেও দীর্ঘ সময় কাটাইব না। ঘর ছাড়িয়া ঘুরে, বা কোন নির্জন স্থানে, বা একাকী কখনও থাকিব না—সব সময়েই কিছু লোকজন যেন দৃষ্টির মধ্যে থাকে।

কহিলাম, কেন?

ডাক্তার ধমক দিয়া কহিলেন, শুনে নাও। আমার চোখের বা ডাকার বাইরে যাবে না, লোকজনের ভিড়ে ছাড়া একা কোথাও যাবে না, কেউ ডাকলেও যাবে না। গেলে বিপদ ঘটতে পারে।

বুঝিলাম না কিছুই, কহিলাম, বেশ। আর?

—আর, আমার দিকে চোখ রাখবে। কোন লোককে যদি আমি চিনিয়ে দিই ইশারা করে, তাকে দেখে রাখবে, চিনে নেবে। সোজাসুজি তাকাবে না, কিন্তু একটু চোরা-দৃষ্টি ফেলে তাকে বারবার করে দেখবে, সে যেন বুঝতে পারে তুমি তাকে লক্ষ্য করছ। কিন্তু খবরদার তার কাছে যাবে না, সে ডাকলেও শুনতে পাওনি বলে ভান করবে। আর, চেঁচিয়ে কখনও কথা বলবে না, কথা যতদূর না বলে পার তত ভাল। বললে, বলবে ভাঙা উর্দু, বাংলা বা ইংরেজী নয়। বাংলা তুমি শুনলে বোঝ, ভাল বলতে পার না, ইংরেজী একেবারেই জাননা। হ'ল?

—হ্যাঁ।

—ব্যস্‌। এবার নেমে পড়। এই তোমার হোটেল। ঢুকে যাও, ম্যানেজারকে কার্ড দেখাও।

কার্ডটি একটি চিঠি, হোটেলের টাইপ-করা নিয়োগ পত্র, কফেরা-নিবাসী আলি মহম্মদের নামে তাকে প্রেরিত।

হোটেলের গাড়িতে করিয়া আরও অনেকজন সহকর্মীর সঙ্গে কর্মস্থলে গিয়া পৌঁছিলাম। প্রকাণ্ড বাড়ি, মস্ত কম্পাউণ্ড। বৃহৎ আয়োজন, এলাহী কাণ্ড। জনকুড়িক বয় আসিয়াছে হোটেল হইতে, তাহার মধ্যে অঙ্কেশে হারাইয়া গেলাম। বাহির হইতে ঠিকা বন্দোবস্তে আসিয়াছে অন্তত আটদশ জন। তাহারা পরস্পরকে চেনে না। কাজেই আমার হঠাৎ ধরা পড়িবার ভয় ছিল না। তবুও যথাসাধ্য সতর্ক হইয়া চলিতে লাগিলাম।

আমরা পৌঁছিয়াছি সন্ধ্যায়, ভোজের আয়োজন রাত্রি প্রস্তুত হইল। রাত্রি আটটার পরে অতিথিদের আগমন শুরু হইল। প্রকাণ্ড হল ঘর, অন্তত দেড়শত লোকের স্থান। সারিসারি ছোট ছোট টেবিল আর চেয়ার, তাহার ফাঁকে ফাঁকে ঘুরিয়া আমরা পরিবেশন করিতে লাগিলাম। আমি অবশ্য পরিবেশনের দিকে বেশী গেলাম না। যোগান দিবার কাজেই রহিলাম, ফলে ঘরের মধ্যে ঘোরাঘুরি আমার বেশী করিতে হইল না। দ্বারের বাহিরে ও ভিতরে, দ্বারের কাছাকাছি প্রায় স্থায়ী হইয়া রহিলাম।

ডাক্তার বসিয়াছেন, ঘরের অপর প্রান্তে। তাঁহার ডান পাশে এক ব্যক্তি, ডাক্তার ইঙ্গিতে তাঁহাকে চিনাইয়া দিলেন। ইঁহারই দিকে আমার লক্ষ্য রাখিতে হইবে, এবং আমি ইঁহাকে লক্ষ্য করিতেছি, এটাও আমাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। অতএব লক্ষ্য করিয়া দেখিতে হইল। বয়স পঞ্চাশের মত, বেশ দৃঢ় ও তয়াট চেহারা। মুখখানা গোল ও ভারী, মাথার চুল ছোট করিয়া ছাটা, সমস্ত মুখশ্রী ও ভাব-ভঙ্গীতে একটা প্রচণ্ড জিদ ও রক্তের ছাপ। উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, বিশেষ করিয়া উচ্চপদস্থ পুলিস অফিসার বা ঐরকম কিছু বলিয়া মনে হয়। অবস্থাপন্ন, সিল্কের প্যাণ্টশার্টে সেটা স্পষ্ট—তাছাড়া এই আসরে হীনাবস্থ বা হীনপদস্থ ব্যক্তির প্রবেশও অসম্ভব।

আমি তাঁহাকে লক্ষ্য করিলাম। তাঁহারও লক্ষ্য আমার প্রতি পড়িল—হঠাৎ মনে হইল অত্যন্ত চমকাইয়া গেলেন। তাঁহার চমকের মানে আমি বুঝিলাম না, কিন্তু চমকটা লক্ষ্য হইবামাত্র আমি নিঃশব্দে সরিয়া গেলাম। তারপর আবার সে ঘরে গেলাম, বহুক্ষণ রহিলাম, ডাক্তারের নির্দেশমত তাঁহাকে বক্র দৃষ্টিতে দেখিলাম ও দেখিতেছি সেকথাটা স্পষ্ট বুঝিতে দিলাম। তিনিও দেখিলাম অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে শুধু লক্ষ্য নয়, পর্যবেক্ষণ করিতেছেন, ডাক্তারও দেখিলাম আমার দিকে এবং তাঁহার প্রতিটি ভাবভঙ্গীর দিকে তাঁহার অজ্ঞাতেই অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি উদ্যত করিয়া রাখিয়াছেন। ডাক্তারের সহিত তাঁহার কোন পরিচয় আছে বলিয়া মনে হইল না; অন্তত থাকিলেও উভয়ের কেহই ভাবভঙ্গীতে তাহা কিছুমাত্র প্রকাশ করিলেন না।

আহার যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে, ডাক্তার হঠাৎ মুখ তুলিলেন, একটি হাত তুলিয়া ইঙ্গিতে আমাকে কাছে ডাকিলেন।

আমি নিকটে গেলাম। ডাক্তারের ইঙ্গিত মানিয়া তাঁহার ডানপাশে গিয়া দাঁড়াইলাম, ডাক্তার কহিলেন, একটা কাজ কর। বাইরে আমার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে দেখবে, বারান্দার বাঁ-পাশে, এই নম্বর লিখে দিয়েছি। ইংরাজী হরফ পড়তে জান?

কহিলাম, জী।

—বেশ। এই নম্বর দেখে নাও। কালোরঙের গাড়ি, মার্সিডিজ। ড্রাইভার বসে আছে। তাকে এই চিঠি দেবে। একটি ছোট স্লিপে কি লিখিয়া তিনি আমার দিকে বাড়াইয়া দিলেন।

—জী। সেলাম করিয়া চিঠি লইলাম। চিঠি হাতে লইয়া ঘর হইতে বাহিরে আসিলাম। ডাক্তারের গাড়ী মার্সিডিজ নয়, কালোরঙেরও নয়, এবং তাঁহার গাড়ীতে কোন ড্রাইভার নাই। বাহিরে আসিয়া স্লিপটি পড়িলাম। লেখা আছে, পোশাক খোল। গাড়িতে উঠে বসে থাক। আমি যাচ্ছি।

খাওয়া তখন প্রায় শেষ, বয়ের কাজের চাপ কমিয়াছে। সরিয়া পড়িলে কেহ লক্ষ্য করিবে না। তবুও একবারে সোজা পথে নামিয়া না গিয়া আমি পাশের একটি ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম। ঘর পার হইয়া তাহার অন্যদিকের দরজা দিয়া বাহির হইয়া যাইব। দরজাটির দিকে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছি, হঠাৎ দেখিলাম, আমার ঠিক মুখোমুখী বিপরীত দিক হইতে এক ব্যক্তি আমার দিকে আগাইয়া আসিতেছে—তাহারও পরনে বয়ের পোশাক। কিন্তু তাহারও মুখের দিকে চাহিয়া আমি চমকাইয়া উঠিলাম। সে মুখ ভুল হওয়া সম্ভব ছিল না।

—হামিদ।

অল্পদিন পূর্বে যাহার মৃত্যুর সংবাদ জানিয়াছি তাহাকে অকস্মাৎ সম্মুখে জীবন্ত দেখিয়া আমি থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলাম। নিজেরই অজ্ঞাতে ডান হাতটা তুলিয়া কপাল ও চক্ষু মার্জনা করিলাম। সেও একই সঙ্গে একই ভঙ্গীতে বামহাত কপালে তুলিল।

সমস্তই তিন-চার সেকেণ্ডের ব্যাপার। প্রথম দৃষ্টিতে চমক খাইয়াছিলাম। উল্টা চমকের ধাক্কায় বুদ্ধি ঘটে ফিরিল। চাহিয়া দেখিলাম, ছায়াই বটে। আমার সম্মুখে ঘরের অপর পার্শ্বের দেওয়ালে একটি

বৃহৎ আয়না খাড়া করিয়া বসানো, তাহার মধ্যে আমার নিজের প্রতিবিম্বই আমি দেখিয়াছি। নিঃসংশয় হইবার জন্য বামহাতের মুঠা খুলিলাম ও বন্ধ করিলাম, আমার সম্মুখে হামিদও তাহার ডান হাতের মুঠা খুলিল ও বন্ধ করিল।

হামিদ নয়। আমি। ডাক্তার আমাকে হামিদ বানাইয়াছেন। সেই জন্যই আমাকে আয়না দেখিতে দেন নাই।

ডাক্তারের কোন্ উদ্দেশ্য সাধন ইহাতে হইবে জানি না, কিন্তু আমার মাথায় একটি কথা বিদ্যুতের মত খেলিয়া গেল—এখানে এভাবে দাঁড়াইয়া থাকা আর চলিবে না। তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়া আমি ডানদিকে ফিরিয়া দরজা পার হইয়া বারান্দায় পড়িলাম. বারান্দা পার হইয়া উঠানে আসিলাম; উঠানের দুই পাশে সারি সারি গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে, তাহার সম্মুখ দিয়া হাঁটিয়া চলিলাম। বারান্দার বাম পার্শ্বে নয়, গাড়িটিকে পাইলাম ডানদিকে, গেটের গায়ে, একটা বড় গাছের নীচে ছায়া-ঢাকা জায়গাতে।

কাছাকাছি কেহ ছিল না, নিঃশব্দে দরজা খুলিয়া গাড়িতে উঠিয়া বসিলাম। মাথার পাগড়ি ও গায়ের উর্দি খুলিয়া পুটুলি পাকাইয়া পায়ের কাছে ফেলিয়া রাখিলাম। স্লিপটিকে নখ দিয়া কুচিকুচি করিয়া ছিঁড়িয়া বাতাসে উড়াইয়া দিলাম। তারপর গাড়ির পিছনে অন্ধকার কোণে ঘনসাধা হেলিয়া বসিয়া ভাবিতে চেষ্টা করিলাম ব্যাপারটা কি।

আমি হামিদ। ডাক্তার আমাকে হামিদ সাজাইয়া এখানে আনিয়াছেন, কাহাকেও দেখাইবার জন্য। কাহাকে? তাঁহার ডানপাশের সেই বৃহৎকায় ব্যক্তিটিকে, যাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে এবং যাঁহার লক্ষ্য আকৃষ্ট করিতে তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু কেন? কে সে ব্যক্তি? আমাকে দেখিয়া তিনি চমকাইয়া উঠিয়াছিলেন—আমাকে নয়, হামিদকে দেখিয়া। হামিদের সঙ্গে কি সম্পর্ক তাঁহার?

ভাবিয়া এ প্রশ্নের উত্তর মেলে না; চুপ করিয়া বসিয়া অপেক্ষা করাই একমাত্র কাজ। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। দশ কি পনর মিনিটের মধ্যেই আমন্ত্রিতের দল ঘর হইতে বাহিরে আসিতে আরম্ভ করিলেন। আমি তীব্র উৎকণ্ঠা লইয়া চাহিয়া রহিলাম।

সেই ভদ্রলোক প্রথম দিকেই বাহিরে আসিলেন। মন ছিল কিছু চিন্তামগ্ন বা উদ্বিগ্ন। চকল দ্রুত দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া যেন কাহাকে খুঁজিলেন, দ্রুত পদে নামিয়া আসিলেন, সোজা গেট পার হইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

তাহার সামান্য পিছনেই ডাক্তার নামিয়া আসিলেন। একটু পাশের দিকে ফিরিয়া উঠান পার হইলেন। গাড়ির কাছে আসিয়া প্রায় শব্দহীন স্বরে কহিলেন, আছ?

আমিও তেমনই নিঃস্বরে কহিলাম, হুঁ।

ডাক্তার গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন। একটু অপেক্ষা করিয়া ইঞ্জিন চালু করিলেন, ধীরে ধীরে গাড়ি চালাইয়া গেট পার হইলেন।

এই বাড়িটি রাস্তার উপরে নয়। পুরানো কালের ধনীব্যক্তির বাড়ি যেমন হইত—বড় রাস্তা হইতে একটি লম্বা গলি ঢুকিয়াছে, তাহার মাথায় বাড়ি, গলিটি এই বাড়িরই নিজস্ব অঙ্গ—মনে করুন জোড়াসাঁকোর বাড়ির মত।

অতিথিদের গাড়ি উঠানের উপরে সারি সারি দাঁড়ানো। যে সকল গাড়ির স্থান উঠানে হয় নাই তাহারা আছে এই পথের উপরে। পথের দুই ধারে উঁচু পাঁচিল, বামদিকে পাঁচিলের গায়ে পিঠ ঠেকাইয়া পাশাপাশি গাড়িগুলা দাঁড়াইয়া আছে। তখনও অতিথিরা গেটের বাহিরে বিশেষ পদার্পণ করেন নাই। আমরা গেট পার হইতে হইতে দেখিলাম, সম্মুখে গলি নির্জন। তাহার বাম পাশে গাড়ির সারি, ডান পাশের পরিষ্কৃত পথ, সেই পথের মাঝখান ধরিয়া সেই ভদ্রলোক সোজা হাঁটিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার গাড়ি হয়ত

পথের শেষ প্রান্তে, যা হয়ত তিনি গাড়িতে আসেন নাই।

ডাক্তার মন্দগতিতে গাড়ি চালাইয়া তাঁহার ঠিক পিছনে গিয়া পৌঁছিলেন, হর্ণে সামান্য শব্দ করিলেন। তিনি ডানদিকের হেওয়ালের গায়ে সরিয়া গিয়া পথ দিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে ডাক্তার ডান হাতটি গাড়ির বাহিরে বাড়াইয়া দিলেন, তাঁহার হাতের পিস্তলে দুম্ দুম্ করিয়া দুইবার আওয়াজ হইল, হাত টানিয়া লইয়া ডাক্তার গাড়ির বেগ বাড়াইয়া দিলেন, অত্যন্ত দ্রুতবেগে গলিটুকু পার হইয়া বড় রাস্তায় বাহির হইলেন, গতি কিছুমাত্র মন্থর না করিয়া গাড়ি ছুটাইয়া চলিলেন।

আমি গাড়ির পিছনের জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিলাম—ভদ্রলোক লাফ দিয়া সরিয়া যাইতে গিয়া একটা টাল খাইলেন, এক হাতে হেওয়ালে ভর করিয়া ঝোঁক সামলাইলেন, আবার খাড়া হইয়া দাঁড়াইলেন, চিৎকার করিয়া কি একটা বলিলেন। এই পর্যন্ত দেখিতে না দেখিতে গাড়ি গলি ছাড়িয়া বাহির হইল।

একটা বাঁক, দুইটা বাঁক, তারপর একটা খুব বড় রাস্তা।

তখন রাত্রি গভীর হইয়া আসিয়াছে, পথের ভিড় অল্প, দ্রুত চলার বাধা নাই। আমাদের সম্মুখে দীর্ঘ পথ একটানা চলিয়া গিয়াছে। অনেকটা সামনে একটি গাড়ি, ডাক্তার বেগ বাড়াইয়া তাহাকে প্রায় ধরিয়া ফেলিলেন। মুখ না ফিরাইয়াই আমাকে কহিলেন, পেছনে দেখ। গাড়ি আসছে?

আমি দেখিয়া কহিলাম, না।

ডাক্তার সম্মুখের গাড়িটির অত্যন্ত নিকটে পৌঁছিলেন, সেই বেগের উপরেই হঠাৎ গাড়ি ঘুরাইলেন, রাস্তা পাড়ি দিয়া অপর তীরে বিপরীতমুখী করিয়া গাড়ি থামাইলেন। বাতি নিবাইলেন, ইঞ্জিন বন্ধ করিলেন ফুটপাথের দিকে দরজা খুলিয়া গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িলেন, গাড়ির পিছনে গিয়া কি যেন করিলেন, ঘুরে ফুটপাথের উপরে কিছু একটা আছড়াইয়া পড়িল টিনের পাতের মত শব্দ করিয়া। ফিরিয়া আসিয়া গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন। আমাকে কহিলেন, ডুব দাও। আমি মাথা যথাসাধ্য নীচু করিয়া বসিলাম।

মুহূর্ত পরেই সম্মুখ দিক হইতে অর্থাৎ আমরা যেদিক হইতে আসিয়াছি সেই দিক হইতে দুইটি গাড়ি অত্যন্ত তীব্র গতিতে ছুটিয়া আসিল; আমাদিগকে লক্ষ্য না করিয়া সোজা সম্মুখে ছুটিয়া গেল—পিছনের জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিলাম, যে-গাড়িটি আমাদের আগে-আগে ছিল তাহার পশ্চাতের লাল আলোটি বহু দূরে দেখা যাইতেছে, ইহারা তাহাকেই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে।

ডাক্তার ইঞ্জিন চালু করিলেন, পাশের একটি রাস্তায় ঢুকিয়া, ঘুরপথে বাড়ির দিকে চলিলেন। পথের পাশে একটি পুকুর, হাত বাড়াইয়া কি একটা তাহার জলে ছুড়িয়া দিলেন, কব্ করিয়া শব্দ হইল।

আমি কহিলাম, কি?

ডাক্তার কহিলেন, চোরাই মাল।

বাড়িতে আসিয়া দুইজনে বসিলাম।

আমি কহিলাম, এবার বলুন ত, ব্যাপারটা কি?

ডাক্তার কহিলেন, হবে। তোমার এখনও খাওয়া হয়নি।

আমি কহিলাম, তা হোক। আপনি বলুন আগে। আমাকে হামিদ বানিয়েছেন কেন?

ডাক্তার কহিলেন, জেনে গেছ? বানিয়েছি। বিনা কারণে নিশ্চয়ই নয়।

—কারণটা কি?

—ভেবে নাও।

—আমি? বেশ, দেখছি ভেবে। কাউকে দেখাতে চেয়েছিলেন হামিদ ওখানে আছে। তার মানে, হ্যাণ্ড আছে। সেই ভদ্রলোককে, আপনার ডান পাশে যিনি বসেছিলেন।

—ধরা যাক তাই। তারপর?

—তারপর, আমাকে আপনি যেমনটি ভেবেছিলেন তাঁকে লক্ষ্য করতে। দেখলাম তিনিও আমাকে লক্ষ্য করছেন; বেশ ভাল করেই। প্রথমবারে দেখে ভয়ানক চমকে উঠেছিলেন।

—তা উঠুন।

—কে ভদ্রলোক?

—বলব না। তারপর, বলে যাও।

—তারপর, ঠিক যখন দেখলাম তিনি আমাকে বিশেষ করে দেখে নিচ্ছেন এবং কিছুটা বিচলিত হয়ে উঠেছেন যদিও সেটা গোপন করতে চেষ্টা করছেন প্রাণপণে, সেইসময়ে আপনি আমাকে ডাকলেন, গাড়ির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। বুঝে নিলাম, এইবার খাওয়া শেষ হবে, সবাই উঠে পড়বে, তিনিও উঠবেন এবং পারলে আমাকে ধরে ফেলবার চেষ্টা করবেন। তাই ভেবেই আমাকে সরিয়ে দিলেন। ঠিক ত?

—ঠিক বেঠিক আমি কিছু বলছি না।

—তারপর?

—তারপর, গাড়িতে বসে আমিও বেশ করে তাকিয়ে রইলাম। ভদ্রলোক বেরোলেন, খুব তীক্ষ্ণ চোখে চারদিক তাকিয়ে দেখলেন, বোধ হয় খুঁজছিলেন আমাকে দেখতে পান কি না। না পেয়ে হতাশ হলেন হয়ত।

—হতাশ নয়। আশ্বস্ত।

—হল তাই। কিছু একটা হলেন, আর কোন দিকে তাকালেন না, সোজা গেট পার হ'য়ে বেরিয়ে গেলেন। তারপর আপনি এলেন। কিন্তু, ভদ্রলোকের দিকে আপনি দু'বার করে গুলি ছুড়লেন, একবারও লাগল না। কেন? ব্ল্যাঙ্ক ছিল?

—থাকবার কথা নয়। লাগল না কারণ লাগানোর আমার ইচ্ছে ছিল না।

—আমারও তাই মনে হয়েছিল। তাঁকে ভয় দেখালেন, তারপর গাড়ি ছুটিয়ে দিলেন। তিনি পেছনে তাড়া করবেন এটা বুঝেছিলেন, তাই পথের মধ্যে গাড়ি ঘুরিয়ে অন্য পাশে রেখে গেলেন, তিনি বা তাঁরা বুঝতে না পেরে আমাদের সামনের গাড়িটার পেছনে ছুটলেন। গাড়ি থামিয়ে আপনি তার পেছনে চলে গেলেন, একটা কিছুকে ছুড়ে ফেলে দিলেন ফুটপাত পেরিয়ে। কি সেটা?

—তুমি বল।

—একটা ভুল নাম্বার-প্লেট? লাগিয়ে নিয়েছিলেন, যাতে কেউ পেছন থেকে দেখে নিলে ভুল নম্বরটাই দেখবে?

—নাঃ বুদ্ধি সত্যি খুলেছে। তারপর?

—তারপর, আসতে আসতে পুকুরের জলে ছুড়ে ফেলে দিলেন রিভলভারটা। কিন্তু, ফেলে দিলেন কেন?

—দিলাম, কারণ সেটা আমার সম্পত্তি নয়।

—কার?

—সেই ব্যক্তিরই। তার পকেট থেকে সরিয়েছিলাম। যার নাম হাত সাফাই। চোরাই মাল হাতে রাখতে নাই, দুর্গাম হয়।

—কখন নিলেন?

—তোমাকে যখন ডেকে নিলাম, আমার আর তার মাঝখানটায় দাঁড় করিয়ে নিলাম ত? ঠিক তার পরেই। সে ঠিক ভেবে নিয়েছে তোমার কাজ।

—ভারি খুশী হলাম জেনে। কিন্তু, সব ঠিক বলেছি তাহলে? ভুল করিনি?

—ভুল নয়। অন্যায় করেছ একটি। বারবার।

—কি?

—তাকে 'ভদ্রলোক' বলে বলেছ।

—তার মানে?

—মানে এখন নয়। পরে বলব। এখন যাও, খেয়ে ঘুমিয়ে পড়।

—তারপর এই হাবিলদার ঘুচবে না?

—আজ নয়। আরও কিছু কাজ আছে আমার হাবিলদারকে দিয়ে। তার পরে।

—কি কাজ?

—আলাদা। বলছি, যাও না খেতে ততে।

পরদিন, বেলা আটটা আন্দাজ, ডাক্তার কহিলেন, চল হে হামিদ মিঞা একটু বেড়িয়ে আসি।

তাঁহার নির্দেশ মত কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইলাম—ঢিলা পাজামা, আদ্ধির লম্বা পাঞ্জাবি তাহার বুকের ও কাঁধের সেলাই ধরিয়া সবুজ ফুল তোলা, পায়ে পাম্পশু চোখে সুর্মা। মাথার চুলে পূর্বদিন বাবড়ি রচিত হইয়াছিল, তাহাকে আরও একটু ফুলাইয়া ও কাঁপাইয়া লইলাম।

একটি ছোট গলির মোড়ে ডাক্তার আমাকে নামাইয়া দিলেন। আমার কর্তব্য তিনি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। গলি ধরিয়া আমি অলস গতিতে অগ্রসর হইলাম।

গলিটি ক্ষুদ্র শ'দুই গজ মাত্র। মাঝামাঝি জায়গায় একটি লাল রঙের দোতলা বাড়ি। সেই বাড়িটির দিকে, তাহার একতলা ও দোতলার জানালাগুলির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে আমি গলি পার হইয়া গেলাম। গলির প্রান্তে পৌঁছিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইলাম, আবার ফিরিয়া আসিলাম, সেই বাড়িটির দিকে তেমনই করিয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে। ক্রমে গলির এদিকের মোড়ে আসিয়া পৌঁছিলাম, যেখানে ডাক্তার আমাকে নামাইয়া দিয়াছিলেন। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, ডাক্তার অন্তর্হিত হইয়াছেন। আবার ফিরিলাম। এবার কিছু দ্রুত পদে। আবার সেই একই ভাবে গলিটি অতিক্রম করিলাম। চোখে বিশেষ কিছু পড়িল বলা শক্ত, তবু কেমন যেন অনুভব করিলাম বাড়িটির মধ্য হইতে, হয়ত কোন অর্ধ-উন্মুক্ত জানালার আড়াল হইতে, কেহ সতর্ক দৃষ্টিতে আমাকে লক্ষ্য করিতেছে।

গলি শেষ করিয়া আবার ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছি, পিছন দিক হইতে একটি ট্যাক্সি আসিয়া আমার পাশে দাঁড়াইল।

ডাক্তার কহিলেন, উঠে পড়।

মোটা দুই মোড় বাঁকিয়া ট্যাক্সি থামিল। আমরা নামিলাম। ট্যাক্সি চলিয়া গেল। ডাক্তার আমাকে লইয়া একটি ছোট গলিতে ঢুকিলেন। গলির অপর প্রান্তে তাঁহার নিজের গাড়িটি দাঁড়াইয়া ছিল। গাড়িতে উঠিয়া আমরা বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

ঘরে ঢুকিয়া আমি কহিলাম, এর পরে?

ডাক্তার কহিলেন, এর পরে আপাতত তোমার কর্তব্য শেষ। এবার দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে নাও—গুড্‌বাই টু হামিদ। একটু পরে নাপিত আসবে, চুল ছেঁটে দিয়ে যাবে। তারপর সারাদিন বসে শুয়ে নভেল পড়বে ঘুমোবে, রাতের গাড়িতে ফিরে চলে যাবে চাকরি করতে। আমার চিঠি পেলে চলে আসবে। তা না হলে আপাতত কিছুদিন কলকাতায় না থাকাই ভাল।

—কেন?

—সাবধানের বিনাশ নেই।

—কিন্তু কাণ্ডটা কি, আমাকে বলবেন না?

—বলব, এখন নয়। আর, একটি কথা মনে রাখবে—যে-বেশে এই দু'দিন বেড়ালে, মানে হামিদ বলে মনে হতে পারে এমন পোশাক বা চুল-বাড়ি, খবরদার রাখবে না, কিছুতেই না।

—বাবড়ি বা দাড়ি-গোঁফ ত আমি রাখিনে।

—রাখবে না, কিছুতেই না। থিয়েটার করতে হলেও, ওর কাছাকাছি যেখতে হয় এমন কোন পার্ট নেবে না।

—কেন?

—হঠাৎ প্রাণ চলে যেতে পারে।

—সে কি।

—হ্যাঁ। যা বলছি শুনে যাও। কালকের সে লোকটার চেহারা মনে আছে? আবার দেখলে চিনতে পারবে?

—পারব।

—যদি কোথাও হঠাৎ তাকে দেখতে পাও—পাবে না হয়ত, তবু যদি দৈবাৎ হ'য়ে যায়—খবরদার কিছুতেই তার কাছাকাছি যাবে না, তার দৃষ্টিও এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করবে যতটা পার, বুঝেছ কথাটা?

বুঝিলাম না কিছুই, তবুও কহিলাম, হাঁ।

ইহার মাস-ছয়েক পরে একটি সহকর্মীর অনুরোধে তাঁহার সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম, ফিরিবার পথে, একটি স্টেশনে আমাদের গাড়ি দাঁড়াইয়াছে, বিপরীত দিক হইতে একটি ট্রেন পাশের লাইনে আসিয়া দাঁড়াইল, এক মিনিট বা দুই মিনিট পরে আবার ছাড়িয়া গেল। তাহার একটি ফার্স্টক্লাস কামরা আমার সোজাসুজি, অকস্মাৎ চোখে পড়িল তাহার মধ্যে বসিয়া সেই ভদ্রলোক।

চিনিতে কষ্ট হইল না, কিন্তু তাঁহার চেহারার এত পরিবর্তন হইয়াছে যে চিনিতে পারিয়া আমি চমকাইয়া গেলাম। অনেকখানি শীর্ণ; কিন্তু শুধু শীর্ণতাই নয়; যে আত্মপ্রত্যয় ও দম্ভের ভাব মুখে-চোখে প্রকট বলিয়া প্রথম দিন তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াছিলাম, সেই ভাবটাই যেন কোন্ মন্ত্র বলে অন্তর্হিত হইয়াছে; তাহার স্থানে প্রকাশ হইয়া উঠিয়াছে একটা অত্যন্ত রুগ্ন ও ক্লিষ্ট ভঙ্গী, যেন কি একটা ব্যাধি বা যন্ত্রণা সারাক্ষণ আসিয়া আছে তাঁহার মধ্যে। অমন সুন্দর স্বাস্থ্যের এই অদ্ভুত পরিবর্তন দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। অবশ্য বেশীক্ষণ চাহিয়াও রহিলাম না তাঁহার দিকে, ডাক্তারের সতর্কবাণী মনে ছিল। তাঁহার দিকে আর না তাকাইয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলাম, আড়ামোড়া দিয়া আলস্য ভাঙিয়া আবার বসিলাম, ততক্ষণে সে গাড়ি ছাড়িয়া দিয়াছে। তিনি আমাকে লক্ষ্য করেন নাই বলিয়াই ধারণা হইল।

ডাক্তারকে চিঠিপত্র আমি বিশেষ লিখিতাম না। এই ঘটনার কথাও কিছু লিখিলাম না। ইহার মাস দুই পরে নিজস্ব প্রয়োজনে কলিকাতায় আসিতে হইল, তখন তাঁহাকে বলিলাম। তিনি মন দিয়া শুনিলেন, কহিলেন, তাই নাকি, খুব রোগা হয়ে গেছে? দুঃখের কথা!

তাঁহার কথার ভঙ্গীতে কোন দুঃখ প্রকাশ পাইল না, বরং যেন কেমন একটা কৌতুকের আভাস।

আমি কহিলাম, কি হয়েছে ভদ্রলোকের?

ডাক্তার কহিলেন, কত কি হয় কত জনের। আমি বলব কি করে তার কি হয়েছে।

আমি কহিলাম, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আপনি জানেন কিছু।

—মনে অমনি হলেই হল, ট্যাক্‌সো লাগে না? তারপর কহিলেন, ক'দিন থাকবে?

—থাকতে বলেন?

—না। কাল একবার এসো সকাল বেলা। ধর, আটটায়। কাজ আছে কোন?

—না।

পরদিন আটটার আগেই গেলাম। বসিয়া আছি, এটা সেটা গল্প হইতেছে, একটি গাড়ি আসিয়া গেটে ঢুকিল। ডাক্তার সেইদিকে চাহিয়া হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, এই, তুমি স'রে পড়। ওঠ, ও ঘরে গিয়ে বোসো।

আমি উঠিতে উঠিতে কহিলাম, কি হ'ল?

—আমার রুগেন আসছে। সম্ভ্রান্ত মহিলা, গোপনীয় ব্যাধি। ও ঘরে গিয়ে বসে থাক চুপ করে। না ডাকলে খবরদার আসবে না বা মুখ বাড়াবে না এদিকে।

তারপর ঈষৎ চক্ষু টিপিয়া কহিলেন, তবে, কান বা চোখ বাড়াতে পার, অলক্ষ্যে থেকে।

বুঝিলাম না, পাশের ঘরে গিয়া দরজা ভেজাইয়া দিলাম। রুগেন আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন।

কোথায় মহিলা। যেন ভারী পায়ের শব্দ, আরও ভারী গলার আওয়াজ—সে শুধু পুরুষের আওয়াজ নয়, মহাপুরুষের যোগ্য মহা-আওয়াজ।

ডাক্তারের নির্দেশ মনে পড়িল, দেখা দিতে বারণ, দেখিতে বারণ নাই। অতএব দেখিতে হইল, দরজার ফাঁকে চোখ পাতিলাম।

সেই ভদ্রলোক। আরও শীর্ণ, আরও দুর্বল জীর্ণ মূর্তি। সে বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় ও স্বাস্থ্যের দীপ্তি একেবারেই অন্তর্হিত হইয়াছে; রীতিমত ঝুঁইয়া ভাঙিয়া

পড়িয়াছেন। তাঁহার সেই অবসন্ন মূর্তি ও অসহায় মুখভাব দেখিয়া আমার মন খারাপ হইয়া গেল।

বেশীক্ষণ বসিলেন না ভদ্রলোক। অল্প কিছু আলাপ হইল ডাক্তারের সঙ্গে, নিম্নস্বরে। বিশেষ শুনিতে পাইলাম না, চেষ্টাও করিলাম না—নিশ্চয় রোগের আলোচনা। বসিলেন, ডাক্তার শুনিলেন, প্রেস্‌ক্রিপশন লিখিয়া দিলেন, দার পর্যন্ত আগাইয়া দিলেন।

তাঁহার গাড়ি গেটের বাহির হইয়া গেলে আমাকে ডাকিলেন, ঘুমিয়ে পড়লে?

আমি কহিলাম, হ্যাঁ।

এঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

ডাক্তার কহিলেন, দেখলে?

—দেখলাম। এবং অবাক হয়ে গেলাম অবস্থা দেখে। কি হয়েছে ওঁর? অমন স্বাস্থ্য ভেঙে এমন হয়ে গেল এই ক' মাসের মধ্যে, কি অসুখ?

ডাক্তার কহিলেন, চিত্তে সুখ নেই।

—মানে?

—মানে, চিন্তা অরো মহুক্কাণাম্।

—বুঝতে পারছি না।

—আচ্ছা, দিচ্ছি বুঝিয়ে। এবার বলতে পারি, এতদিন বলিনি।

—কি বলেন নি?

—অনেক গল্প। হামিদের গল্প।

—বলবেন?

—বলব। শখ বলে নয়, দরকার বলেই বলব। মানে তোমার জানা দরকার বলে।

ডাক্তার একটুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তারপর কহিলেন, গোড়া থেকেই শুরু করি।

হামিদের ব্যাপারটা তুমিই আমাকে প্রথম বলেছিলে। আমাকে বলেছ, কিন্তু নিজে ভেবে দেখনি, বা বুঝতে পারনি। ধোঁয়াটাই করনি আসল কথাটা। আমার কিন্তু প্রথম শুনেই খটকা লেগেছিল।

—কিসের খটকা?

—মামলার প্রমাণ সম্বন্ধে। খুন একটা হয়েছে, অনেক হয়। মামলা হচ্ছে, তাও হয় কোন কোন ক্ষেত্রে। কোনটার বা আসামী ধরা পড়ে প্রমাণ মেলে, কোনটার বা ধরা পড়ে না বা পড়লেও প্রমাণ হয় না। এই কোনটার মধ্যে লক্ষ্য করবার হল, অমন চট্ করে তার ধরা পড়া এবং এমন সুন্দরভাবে তার সমস্ত সাক্ষী আর প্রমাণ পরপর জুটে যাওয়া। যেন সাজানো নাটক—সাক্ষীরা আর প্রমাণরা যেন শুনেই তৈরি হয়ে বসে ছিল ষ্টেজে এসে হাজির হবার জন্য।

কাগজে পুলিশের কর্মদক্ষতার বিস্তৃত প্রশস্তি লিখেছিল। আমার জাগল সন্দেহ। আমাদের দেশের পুলিশকে সবাই চেনে, এদের বুদ্ধি আর উৎসাহ যেটুকু আছে ছিটেফোঁটা, তার সবটাই এরা লাগায় চাকরি ভাল করবার জন্যে, মানে স্বদেশীওয়ালা ধরবার জন্যে। তার বাকিতে সাধারণ ক্রাইম নিয়ে এরা মাথাই ঘামায় না, গবর্ণমেণ্টও তাইতেই খুশী।

তাহলে, এই কেসটাতে এমন অযাচিত উদ্যম, বা অধিকান্ত কর্মক্ষমতা এদের গজিয়ে উঠল কোথা থেকে, উঠল কেন? মনে হল, এর ভেতরে গোলমাল আছে নিশ্চয় এমন কেউ এই সাক্ষ্য প্রমাণ পুলিশের হাতে তুলে তুলে দিচ্ছে, যে আগে থেকেই ঘটনা জানত, প্রমাণ সংগ্রহ করে রাখত।

কোর্টে গেলাম। হামিদকে দেখলাম। তার মধ্যে এমন স্থির বুদ্ধি বা বিচারশক্তির লক্ষণ দেখলাম না, যা থাকলে লোক আড়াই বছরের ঘটনা মনে রেখে তারপর কাজ করে। মানে, হামিদ যে-টাইপের লোক সেটা হচ্ছে যাকে হালকা টাইপ। ক্ষেপে গেলে সেই মুহূর্তে খুন করে বসা তার পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে ভেবেচিন্তে তারপর খুন করতে যাওয়া তার ধাতে বা ধৈর্যে কুলোবে না। বিশেষত যখন সে খুন করলে তার মুনাফা কিছু নেই শুধু ঝিক্কই আছে।

কথাটা আরও স্পষ্ট বুঝলাম, যখন জানলাম তার উকিলের সঙ্গেও সে কথা কইতে রাজী হয়নি।

খুন সে করেছে, কিন্তু করেছে অন্যের হুকুমে বা

টাকা নিয়ে। সেই লোক ওকে ফাঁসিয়েছে, খুন করিয়ে নিয়ে তারপর ওর সম্বন্ধে সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। হামিদ নিজেও সেটা বুঝেছে এবং বুঝতে পেরে একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছে। সেই অদ্ভুত ডাল্‌নেস আমি তার মধ্যে স্পষ্ট দেখতে পেলাম কোর্টে।

—কিন্তু তাই যদি হয়, কেউ ওকে দিয়ে খুনটা করিয়েছে, তবে সেই বা কেন পুলিশের হাতে প্রমাণ তুলে দেবে?

—দেবে, নিজে নিষ্কণ্টক হবার জন্য। নইলে হামিদ রইল তার সে কাজের সাক্ষী। ভবিষ্যতে সে ওর ওপরে চাপ দিতে পারে ধাকে বলে ব্ল্যাকমেল, বা অন্যভাবেও তার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়তে পারে কথাটা। হামিদ মরলে সবদিক থেকেই নিশ্চিন্ত।

—হল। কিন্তু, যদি তাই হয়, আর যদি হয় হামিদ নিজেও বুঝেছিল তার সে বিশ্বাসঘাতকতায় তবে কেন সে নিজে সব কবুল করল না, প্রকাশ করে দিলে না?

—কেন দেয়নি আমি কি করে বলব, পরচিত্ত অন্ধকার। হতে পারে সে জানত বলে ফল হবে না, তার মুখের ওকথা কেউ বিশ্বাস করবে না। সে প্রমাণও করতে পারবে না কিছু। এও হতে পারে, প্রকাশ করতে তার ইমানে বেধেছে।

—নিজের মৃত্যু জেনেও?

—ঐ ত মজা। বড়লোকে ধর্মকে নিয়ে ভড়ং করে, গরীবরা মানে তাকে। তার বৌকে ত আমি স্পষ্টই জিজ্ঞেস করেছিলাম। বললে। আমাকেই উলটে চোখ রাঙিয়ে গেল, তারা মুসলীম, ইমান ভাঙে না। এরা আছে বলেই ঈশ্বর এখনও বেঁচে আছেন, এদের মনের মধ্যে।

বৌটাকে জিজ্ঞেস করলাম, বললে না। তার কাছেই জানতে পেলাম হামিদের অক্ষর-পরিচয়ও নেই। তা যার নেই সে ব্যাঙ্কের কোন্ চাকরি করবে?

খটকা লাগল, ভাবতে লাগলাম ইতিমধ্যে মামলা সারা হয়ে গেল। আমার করবার কিছু ছিল না। তারপর তার ফাঁসিও হয়ে গেল। অত্যন্ত তাড়াতাড়ি, বলতে গেলে প্রায় অশোভন-রকম তাড়াতাড়ি করে। তার মানে, যত শিগগির সে মরে ততই হকে এবং এর পেছনে এমন কেউ আছে যে, শক্তি রাখে হত্যাদেশ এবং ফাঁসি দুটোকেই যথাসম্ভব এক্সপিডাইট করবার মত কলকাঠি যার হাতে আছে। হামিদ খুন করেছে, কিন্তু আংটি-ঘড়ির লোভে নয়, প্রতিহিংসার জন্যও নয়, করেছে অন্য কারো প্রয়োজনে—এবং সেই লোকই তাকে পুলিশ দিয়ে বধ করালে।

বেটী আমাকে বাপ ডেকে কথা বললে। সে ডাকের মান রাখতে আমি পারলাম না। ফাঁসি ঠেকাতে পারলাম না। তখন বাকি রইল এর গোড়ার তথ্য খুঁজে বার করা। মানে, হামিদ যাকে খুন করেছে তার কথা পুলিশ ভাবুক, হামিদকে যে খুন করল তাকে আমি খুঁজে বার করব। করেছি।

আমি হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম, ঐ ভদ্রলোক।

—হ্যাঁ। কিন্তু ভদ্রলোক নয়। এক এক করে শোন।

হামিদ যদি ব্যাঙ্কে চাকরি করবার মত বিদ্যেই না রাখে, তবে ওকথা উঠল কেন? তখন খোঁজ নিতে গেলাম সে যাকে মেরেছে সেই লোকের। সেখানে খুঁজে দুটি খবর পাওয়া গেল।

প্রথম হচ্ছে, ব্যাঙ্কে হামিদ কাজ করত, ওয়াশ-কুলির কাজ, তাও সামান্য দিনের জন্যে ঠিকে। তার চাকরি দিয়েছিল এবং দিয়েছিল এঁর ছোটাই-সুপারিসে একথা ঠিক। কিন্তু সে রিপোর্টের তত্ত্ব হামিদের জানবার কথা নয়। তাঁকে সে চিনত কিনা তাই সন্দেহ। ব্যাঙ্কের সে চাকরির গল্পও হামিদের মনে ছিল না সম্ভবত, থাকলে বৌকে বলত। হামিদকে দিয়ে যিনি খুনটি করিয়েছেন তিনি সে ঘটনা জানতেন। কৌশলে সেই গল্পকে জুড়ে দিয়েছেন, যাতে হামিদ কেন তাঁকে খুন করল তার একটা বিশ্বাস-যোগ্য কারণ

প্রমাণিত হয়ে যায়, ফলে সত্যকার কারণ যা উদ্ঘাটনের দিকে কারো চোখ না পড়ে। হয়ত সেই জন্যেই বেছে বেছে হামিদকে দিয়ে কাজটি করিয়েছেন তিনি।

দ্বিতীয় তথ্য যেটি আবিষ্কার করা গেল সেটি হচ্ছে সেই ভদ্রলোকটির সম্বন্ধে, এবং তাই থেকেই খুনের রহস্যটা বার হয়ে পড়ল।

তিনি ব্যাঙ্কের কর্মচারী, মানে এ্যাকাউন্ট্যান্ট। বিলেতের ডিগ্রী। প্রচণ্ড ক্ষমতা ছিল কাজে। রিটায়ার করেছিলেন। কিন্তু কর্মশক্তির হানি হয়নি। এ জাতের লোক নিষ্কর্মা বসে থাকতে পারে না। হয়ত সেইজন্যেই, রিটায়ার করে তিনি নিজস্ব ব্যবসা শুরু করেছিলেন—অডিটরের ব্যবসা। বড় বড় কার্মের কমিশন নিয়ে তিনি অডিট করে দিতেন। বাজারে নামডাক ছিল দক্ষ এবং সৎ অডিটর বলে।

গবর্মেন্টের নিজস্ব অডিটর থাকে, দরকার মত গবর্মেন্ট বাইরে থেকে স্পেশাল অডিটরও ডেকে নিতে পারে বিশেষ কাজের জন্যে। আমাদের জানাশোনা, যাঁর ওপরে তোমার খুব ভক্তি, ভদ্রলোক ছাড়া নাম নাও না—

—নাম জানি নাক।

—তাই জানলে। তিনি গবর্মেন্টের চাকরে, বৃহৎ ব্যক্তি। অনেক মান, অনেক ভাঁট, অনেক মাইনে, অনেক চুরিও। টাকায় টাকায় লোভ বাড়ায়। মোটামুটি কিছু হাতিয়ে চলেছিলেন বেশ কিছুদিন ধরে। ওপরওলা সাহেবের সন্দেহ হল। সাহেব স্থির করলে প্রাইভেট্ অডিট করাবে। ডাকল আমাদের মাস্ত্রাজীকে। তিনি এলেন, খাতাপত্র দেখলেন, চুরি ধরলেন এবং সব নোট নিয়ে চলে গেলেন। এইবার তিনি রিপোর্ট দেবেন, এবং রিপোর্টটি এসে গেলেই আমাদের প্রভুর লীলাখেলা খতম। অডিটের ব্যবস্থাটা হঠাৎ হয়েছিল, সতর্ক হবার সুযোগ পাননি। টাকা দিয়ে বা চোখের জল দিয়ে সে অডিটরকে ভেজানো যাবে না। অতএব অডিটরকে সরিয়ে দেওয়া দরকার হল।

হামিদের খবর তিনি জানতেন—পেশাদার গুণ্ডারা প্রায় কেউই পুলিশের অপরিচিত নয়। হামিদকে ধরলেন, তাকে দিয়ে অডিটরকে খুন করালেন, এদিকে খাতাপত্রও যথাস্থান সরিয়ে বা সামলে ফেলা হল—নিশ্চিন্ত।

এখন সমস্যা হইল, হামিদ। তার মুখ থেকে যদি কথা বেরিয়ে পড়ে, তবেই চিন্তির। অতএব হামিদকে ফাঁসিয়ে দিলেন। হামিদ গরীব, ইমান নষ্ট করত না। কিন্তু নিজে যে বে-ইমান সে অন্যের ইমানদারির ওপর ভরসা রাখতে পারে না।

তত্ত্ব খুঁজে বার করলাম, লোকও চিনে নিলাম। কিন্তু সময় লাগল, কারণ আমাকে এগুতে হয়েছে আস্তে আস্তে এবং সাবধানে, যাতে পুলিশও টের না পায়। ইতিমধ্যে হামিদের ফাঁসি হয়ে গেল। বৌটা দেখে চলে গেল. আমার সঙ্গে আর-একবার দেখা হয়েছিল। আমিই ডেকে এনেছিলাম। কাঁদলে না। কাঠ হয়ে গেছে। কিন্তু আশ্চর্য, তখনও নামটা বললে না আমাকে। শুধু বললে, খোদা জানেন।

সে দেশে চলে গেল। আমিই পাঠিয়ে দিলাম। নইলে, যে বদমায়েস, হয়ত ওকেও দেবে সাবাড় করে। টাকাকড়ি কিছু দিয়ে দিলাম, কিছুদিন অন্তত খেয়ে বাঁচবে। বেশী টাকা হাতে দেওয়াও যায় না, দিলে হয়ত সেই টাকাই তার বিপদ ডেকে আনবে।

হামিদকে বাঁচাতে পারলাম না, হেরে গেলাম। তখন বড় রাগ হল। ভাবলাম খুন্তোর ভগবান, আছেই যদি, ত সে কি এইসব বদমায়েসদের জিম্মাদার জন্যে? তারপর মনে হল, ভগবান যা করেন তা নিজের হাতে করেন না, মানুষকে দিয়েই করান। তা দেখাই যাক না একবার তাঁর দেমাগটি কেমন। ও লোকের শক্ত খুঁটি, ওকে ধরিয়ে দেওয়া বা ওর দোষ প্রমাণ করা আমার সাধ্যে কুলোবে না। ভেবেচিন্তে স্থির করলাম পারি ত আমি নিজেই ওর শাস্তির ব্যবস্থা করব।

মেরে ফেলা না। আমি ডাক্তার, খুনে বা অন্যায়

নই। মেয়ে কেনা ওর শাস্তিও নয়। ভেবেচিন্তে প্ল্যান স্থির হল।

প্রথম যেদিন কোর্টে গেলাম, হামিদকে দেখে তুমি চমকে গিয়েছিলে। ব'লি মনে হয়েছে ওকে তুমি খুব দেখেছ, তোমার খুব চেনা মুখ, কোথায় দেখেছ মনে করতে পারছিলে না। আমাকেও বলেছিলে কথাটা মনে আছে?

—আছে।

—তাকে তুমি দেখনি। দেখেছ, নিজের মুখ। মানুষের কাছে সবচেয়ে বেশী চেনা হচ্ছে তার নিজের মুখ। অথচ সেই নিজের মুখই তার সবচেয়ে বেশী অচেনা, কারণ সে মুখকে সে কখনও নিজের সামনে খাড়া দেখে না। তুমি চমকে গেছ মনে করতে পারনি। আমিও একবার দেখেই লক্ষ্য করেছি তোমাদের দুজনের অদ্ভুত সাদৃশ্য। তখনই কল্পিটা মাথায় গজাচ্ছিল কিনা বলতে পারব না, খুব সম্ভবত গজায় নি। কিন্তু একটা কথা তখুনি মনে হল, তোমাদের এই সাদৃশ্যটা অন্য কারো চোখে না পড়া ভাল। তাই তার পরের কদিন আমি নিজে কোর্টে গিয়েছি, তোমাকে নিয়ে যাইনি।

—আপনি গিয়েছেন?

—না গেলে চলবে কেন। তোমাকে বলিনি, বললে তুমি যেতে চাইতে বা নিজে থেকে চলে যেতে। সে যাক।

তত্ত্ব সব জানা হয়ে গেছে, হামিদের বৌ দেখে চলে গেছে; এবার আমার কাজের পালা। সরকারী হাই সার্কেলে আমার গতিবিধি কম, কিন্তু আমাকে চেনে এমন লোকও আছে দু'টো-একটা। পার্টিটার কার্ড যোগাড় ক'রে নেল কোনক্রমে। আমাদের প্রভু সেখানে যাবেন, জানা কথা। অডিটর মরেছে, খাতাপত্র সামলে গেছে, হামিদ নাবাড় হয়েছে, এবং সর্বোপরি, ওপরওয়ালা সেই সাহেব রিটায়ার করবে বলে বিলেত চলে গেছে। ইতিমধ্যে তাঁর সবদিক থেকেই নিরবচ্ছিন্ন ও নিশ্চিন্ত আনন্দ। হেন আনন্দে বাজ পড়ল—জলজ্যান্ত হামিদ মিঞা তাঁর সামনে আবির্ভূত হল হোটেল বয়ের মূর্তি ধারণ করে। তিনি ব্যাঙ্গো-হত্যা করিয়েছেন, আমি তাঁকে ব্যাঙ্গের-ভূত দেখিয়ে দিলাম। চেঁচিয়ে উঠল না এইটেই আশ্চর্য, প্রচণ্ড পৌরুষের পরিচয়।

হাতের ছুরিকাঁটা যখন কেঁপে যাচ্ছে বারবার, ঠেসে তাকে সিধে রাখছেন, এমন সময়ে হামিদ তাঁর একেবারে পাশ ঘেঁষে এসে দাঁড়াল এক অতিথির কথা শুনতে। এবং সে চলে যাবার পরেই আবিষ্কার করলেন তাঁর বাঁ-পকেট থেকে রিভলভারটি অদৃশ্য হয়েছে। বৃহৎ ব্যক্তি পাশের আসনে বসে যাচ্ছে কোন্ ক্ষীণপ্রাণ পার্শ্বচর বেমালুম তাকে তাকিয়েও দেখেননি,—এ কাজ হামিদের সে বিষয়ে সন্দেহ রইল না। রিভলভারটা পকেটে থাকলে হয়ত ঐখানে বসেই হামিদকে গুলি করে বসতেন, আচম্বিতে ভয়ে মানুষ সব করতে পারে। অতএব আমারও সতর্ক হতে হয়েছিল। রিভলভারটা হাত-সাফাই করা সেই জন্যেই।

হামিদকে দেখলেন, চিনলেন, রিভলভার সেই নিয়েছে স্থির বুঝলেন। অতএব কিছু কম্পিত কলেবরে ঘর থেকে বেরোলেন। তাকিয়ে দেখলেন সে কোথাও চোখে পড়ছে কিনা। থাকলে হয়ত হঠাৎ তাঁকেই তাক করে গুলি ছুঁড়ে বসবে। দেখতে পেলেন না, পা চালিয়ে গাড়ির দিকে চললেন—ইতিমধ্যে তাঁর ওপরে দুবার গুলি চলে গেল।

শক্তি রাখেন বলতে হবে, ঘাবড়ালেন না, তখুনি নিজের গাড়ি হাঁকিয়ে সে গাড়ির পেছনে ছুটলেন। একা ছোটেননি, নির্ভরযোগ্য সঙ্গী এক-আধজনকে ডেকে নিয়েছিলেন। একটু দেরিও সেই জন্যেই হয়ে গিয়েছিল।

ধরতে পারলেন না। মন শঙ্কিত হয়ে রইল। এবং পরদিন সকালেই যখন হামিদ দুবার তিনবার করে তাঁর বাড়ির সামনে টহল দিয়ে গেল—বাড়ির দিকে বারবার তাকিয়ে তাকিয়ে, তখন তাঁর মন বিচলিত হবারই কথা।

—আমাকে তাহলে সত্যিই দেখেছিল সেদিন, আমারও মনে হয়েছিল কেউ আমাকে আড়ালে থেকে লক্ষ্য করছে, অস্বস্তি লাগছিল।

—লক্ষ্য করছিল, এবং অস্বস্তি নয়, গুলিও একটা এসে লাগতে পারত অনায়াসে। লাগেনি, তার দুটি কারণ। এক, সকালবেলা, রাস্তায় লোকজনের ভিড়, নির্গোলে কাজ হাসিল হবে না। দুই, তাঁর রিভলভার হাতের কাছে ছিল না। সেটা পুকুরে ডুবে রয়েছে সন্ত রাত্রে, নতুন অস্ত্র হয়ত তখনও যোগাড় হয়ে ওঠেনি।

—থাকতে ত পারত।

—অন্তত অসম্ভব ছিল না। তুমি অবশ্য রাগ করতে পার একথা শুনে, তোমাকে কিছু রিস্কের মধ্যে আমি পাঠিয়েছিলাম সেদিন, জেনেশুনেই। কিন্তু এ ছাড়া উপায় ছিল না।

—তা হোক।

—অবশ্য আমিও তোমার খুব কাছেই ছিলাম সারাক্ষণ; এবং ঠিক রিক্তহস্তে ছিলাম না।

ভয় ধরানো হল। তখন তোমাকে বাইরে পাঠিয়ে দিলাম। বলে দিলাম হঠাৎ এখানে আসবে না, কোন গন্ডিকে তার চোখে না পড়ে যাও। গেলে ভয়ের ঝোঁকে তোমাকে মেরে ফেলতে পারে; বা তার চেয়েও বড় রিস্ক সেদিনের সেটা হামিদ নয় তুমি, একথা বুঝে ফেলতে পারে। গেলে আমার সমূহ কর্মহানি।

তুমি চলে গেলে। তাঁর ধারণা হয়ে গেল হামিদ বেঁচে আছে, তাঁর সন্ধান পেয়েছে, এবং তাঁর পেছনে ঘুরছে। বাগে পেলে হামিদ তাকে ছেড়ে দেবে না নিঃসন্দেহ, অতএব তাঁর ভয় দেখা দিলে। মৃত্যুভয়, এবং মৃত্যুভয়ই মৃত্যুযন্ত্রণা।

আমি কহিলাম, কিন্তু, কেন। যদি সত্যি বড় অফিসারই হয়, হামিদকেই দেখল কি দেখল না, সে সংশয় ত দূর করবার সহজ পথ ছিল, হামিদের কবর খুঁড়ে দেখা। কবর কোথায় দেয়, জেলের ভেতরেই ত?

—না। বাইরে।

—তবে কেন খুঁড়ে দেখেনি?

ডাক্তার ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, এই যে রয়েছে। আরে, বললাম যত বড় লোক। আস্ত একটা সরকারি ডিপার্টমেন্ট চালাচ্ছে। তোমার চেয়েও কি তার বুদ্ধি কম? কবর খুঁড়ে দেখা হয়েছে, তার দু'এক দিনের মধ্যেই। অবশ্য খুব সোপনে।

—তবে?

—তবে আবার কি। কবর খালি।

অতএব হামিদের রিসারেক্‌শন নিশ্চিত প্রমাণ হ'য়ে গেল।

—কি হ'ল? হামিদের দেহ কি আপনি সরিয়ে ফেলেছিলেন?

—ছি ছি ছি। আমি কুলীন কায়েতের সন্তান, কবর খুঁড়ে মোছলমানের মড়া চুরি করতে যাব, ধর্মভয় নেই?

—তবে কি হল মড়া?

—সৎকারে লেগে গেল। একরকম লোক আছে তাদের নাম ডোম। তারা মেডিকেল কলেজে থাকে, সরকারি শবকাটা ঘরে থাকে। বাইরেও থাকে—যার নাম প্রাইভেট প্র্যাকটিশনার। ফুৎমত মড়া-টড়া হাতে এলে তারা কঙ্কাল বানায়, মেডিকেল ছাত্রদের কাছে বিক্রী করে। হামিদের কঙ্কালটা হয়ত এই মুহূর্তে কোন ভবিষ্যৎ বসুবংশাবতংসকে লেখাপড়ায় সাহায্য করছে; মাংসগুলো সদ্যায় পড়ে জীবজন্তুর আহার হয়েছে। সেদিক থেকে বলতে পারি, হামিদের সদ্গতিই হয়েছে। আমার অমন হলে বর্তে যাব।

—সে ডোমেদের নিশ্চয় আপনিই শিখিয়ে দিয়েছেন?

—বোকার মত কথা বোলো না। সংসারে কে কাকে শেখায়? যার ব্যবসা সে আপনি বুঝে নেয়।

আমি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। তারপর কহিলাম, তা পুলিশকে দিয়েই ত খোঁজ করতে পারত হামিদের।

—পারে না। হামিদের লাশ কবরে নেই এ খবর ইনি জানলেন কি করে, হামিদকে নিয়ে এত মাথাব্যথাই বা কেন এঁর, ইত্যাদি রকম বহু খারাপ প্রশ্ন উঠে পড়বে। মরা মানুষের নামে ওয়ারেণ্টই বা বার হবে কি করে? ফাঁসি হয়ে গেছে যাদের হাতে, সেই জেলার ডাক্তার পুলিশ সবসুদ্ধ জড়িয়ে পড়বে না? তাতেই এ চোরের কিল চুপসে হজম করা ছাড়া উপায় নেই তার।

—তা ভাল। কিন্তু এখন সে ব্যক্তির অবস্থাটা কি? আপনার কাছে ছুটল কি করে।

ডাক্তার কহিলেন, ছুটল, প্রাণের দায়ে। হামিদকে দেখল। তার মতো তবরে নেই এ বিষয়ে নিশ্চিত হল। তারপরেও হামিদের গতিবিধির খবরাখবর কানে এল দু'চারবার। ক্রমাগত আতঙ্কের ফলে হল নিদারুণ স্নায়ুভঙ্গ। তার ত চেহারা নিজেই দেখেছ, আজও দেখলে। ঘুম হয় না, খিদে হয় না, হজম হয় না: বুক ধড়ফড়ানি, ইত্যাদি সে বহু কাণ্ড। ওদিকে, না পারে ডাক্তারকে সত্যি কারণটা খুলে বলতে, না পারে ডাক্তার সে কারণ আন্দাজ করতে। রাশিরাশি ওষুধ খাচ্ছে, জল অখাদ্য। কলকাতা ছেড়ে পালাবে তাও পারছে না—চাকরি এখানে; আর আর উপরি, দুটোরই চরম ক্ষেত্র, তার মায়া কাটানো শক্ত। তাছাড়া কলকাতায় অনেক মানুষ অনেক পুলিশ, এখানে তবু যাহোক নির্ভয়। যাইতে গেলে সে সীমাহীন ভারতভূমি, যেখানে ইনি যাবেন সেখানে হামিদেরও যেতে বাধা নেই। অতএব আছেন এবং প্রতিমুহূর্তে মনে মনে যমদূতের ডাক শুনছেন চাঁচাতে পারছেন না—এর যা যোগ্য শাস্তি।

একটু থামিয়া কহিলেন, তোমার কিন্তু কাজ শেষ হয়নি। আরও দু'একবার কর্তাকে দেখা দিতে হতে পারে হামিদের। মানে ভয়টাকে জীইয়ে রাখা।

—কবে?

—দরকার বুঝে আমি বলব।

—বলবেন। কিন্তু আপনার সঙ্গে এর কিসের সম্পর্ক? আগে থেকে ছিল?

—মোটেই না। সম্পর্ক হয়, ঘাড়ে ঠেকলে। ডাক্তারের পর ডাক্তার ঘেঁষিয়ে বেড়াচ্ছিল, নো কট্। আমি জানতে পেরে করুণা করে আমার পক্ষচ্ছায়ায় টেনে এনে ফেললাম। চিকিৎসা করছি।

আমি কহিলাম, চিকিৎসা করছেন মানে? দিতে হয় ভাল করে খানিক ঘুমের ওষুধ খাইয়ে, ঘুম যাতে আর না ভাঙে।

ডাক্তার কহিলেন, মাথা খারাপ। ডাক্তারে তাই পারে কখনও? আমি ওকে বাঁচিয়ে রাখছি। যতদিন পারি বাঁচিয়ে রাখব। মরে গেলে ও বেঁচে গেল, বেঁচে যতদিন থাকবে ততদিনই ওর মৃত্যু-যন্ত্রণা। সেইজন্যে আমি নিজে চিকিৎসা করছি ওর। হঠাৎ মরে-টরে না যায়।

———

বীরবলের কৌতুক

বররুচি

সম্রাট আকবরের সবচেয়ে প্রিয় মহিষী ছিলেন যোধপুরী বাই। কিন্তু কে জানতো যে ওঁকেই একদিন সম্রাট নির্বাসন দণ্ড দেবেন!

নির্বাসন ছাড়া আর কি! বাপের বাড়ি চলে যাও আর সেইখানেই থাকোগে, স্বামীর ঘরে আর কোনদিন ফিরো না—স্ত্রীলোকের পক্ষে এর বাড়া নির্বাসন আর কি হতে পারে?

সামান্য ব্যাপার থেকে এতখানি! যাকে বলে তিল থেকে তাল। কথা কাটাকাটি, মতান্তর, যোধপুরী বেগমের সম্রাজ্ঞীজনোচিত গোঁসাঘরে অবস্থান—ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে সম্রাটের এই কড়া আদেশ।

হুকুম শুনে বেগম তো চোখে অন্ধকার দেখলেন। সম্রাটকে অনেক অনুনয় করলেন, ওঁর আদেশ ফিরিয়ে নেবার জন্যে। কিন্তু আকবর অটল। বললেন, হুকুম যখন দিয়েছেন তখন তার আর নড় হবে না। তা, যোধপুরীকে আর যোধপুর পর্যন্ত যেতে হবে না। বহারাণা সম্প্রতি দিল্লীতে এসে শহরের পূর্বপ্রান্তে প্রকাণ্ড প্রাসাদ বানিয়ে অবস্থান করছেন, যোধপুরী বাই সেখানেই যাবে, বহুদূর যাত্রার পথশ্রম হবে না।

বেগমসাহেবা হতাশ হয়ে নিজের মহলে চলে গেলেন। তারপর বহুক্ষণ চিন্তা করে বীরবলের কাছে এক লিপি পাঠালেন। সম্রাটের অগোচরে বীরবল যেন একবার দয়া করে কটিতি ওঁর সঙ্গে দেখা করেন। তিনি বড় বিপন্না।

যথাসময়ে বীরবল এলেন।

বেগমসাহেবা ওঁকে সম্বর্ধনা করে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। বললেন—সম্রাট জানতে পারেন নি তো?

মাথা নেড়ে মৃদু হেসে বীরবল বললেন—না, সম্রাজ্ঞী। সম্রাট আজ সারাদিন খাজাঞ্চিখানার রাজস্বসচিবের সঙ্গে কাজে ব্যস্ত থাকবেন, তাই আজ আমদরবার বসেনি। এখন বলুন, কী আপনার আদেশ।

যোধপুরী বললেন—আদেশ নয়, শেঠজি। আমার অনুরোধ আছে।

—কী আপনার অনুরোধ?

—আগে বলুন, আমার অনুরোধ আপনি রাখবেন।

—না শুনেই বলব? হাসলেন বীরবল, তারপর বললেন—আপনি অসংকোচে বলুন। অসম্ভব বা অসাধ্য না হলে, রাখবো।

যোধপুরী বাই তখন সম্রাটের অবহেলের কথা বললেন। বলতে বলতে ওঁর চোখে জল এলো। এ যে ওঁর ভীষণ অপমান। বাপমায়ের কাছে মুখ দেখাবেন কী করে? কী করেই বা বাপের বাড়িতে বারোমাস দিন কাটাবেন। বীরবলকে এর একটা উপায় করে দিতে হবে। তা যদি না করে দিতে পারেন তাহলে যোধপুরী বেগম আত্মঘাতী হবেন নিশ্চয়।

সর্বনেশে কথা। একদিকে সম্রাটের অযোধ আদেশ। অন্যদিকে এই আত্মহননের সম্ভাবনা। বীরবল সত্যিই চিন্তিত হলেন। অনেকক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন—বেগমসাহেবা। একটা যুক্তি মাথায় এসেছে। জানি না, তা কাজে লাগবে কি না।

—আপনার বুদ্ধি যদি কাজে না লাগে তো বুঝবো, আমার কপালের এ দুর্ভোগ এড়াবার নয়। বলুন, কি করতে হবে।

যোধপুরী একাগ্রমনে বীরবলের পানে তাকালেন। বীরবল ধীরে ধীরে তাঁর পরিকল্পনাটি বেগম-সমীপে পেশ করলেন।

সব শুনে বেগম বললেন—কঠিন কাজ। কিন্তু এই ব্যবস্থাই আমি করব। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। কিন্তু যদি ঐ কৌশল ভেঁসে যায়।

বীরবল বললেন—তখন আমি আবার আছি।

বিদায় নিলেন বীরবল।

• • • •

পরদিন সন্ধ্যার পর বেগমের যাত্রার সময় নির্দিষ্ট হয়েছে। সম্রাজ্ঞী নিজেই এই ব্যবস্থা করেছেন। দিনের আলোয় তিনি প্রাসাদ ত্যাগ করে লোকালয় দিয়ে যাবেন না।

সম্রাট রাজী হয়েছেন।

সকালবেলা যোধপুরী বাই সম্রাটের ঘরে গেলেন। সম্রাট তখন দরবারে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন।

প্রিয় মহিষীর ম্লান মুখ দেখে তিনি হয়ত কিছু বেদনা বোধ করলেন, কিন্তু পরক্ষণেই আত্মসংবরণ করে নিলেন। তিনি ভারতের সম্রাট। কোন একজন নারীর বিষণ্ণ মুখ দেখে বিচলিত হওয়া তাঁর সাজে না।

সম্রাজ্ঞী বললেন—আজ সন্ধ্যায় পর আমি চলে যাব।

সম্রাট মাথা নাড়লেন।

বেগম বললেন—একটি আর্জি আছে।

—কী বল।

—যাবার আগে আপনার দর্শন পেতে চাই। আপনার কাছে শেষ বিদায় নিতে চাই। তাই প্রার্থনা, সন্ধ্যায় আমার মহলে যদি পায়ের ধুলো দেন।

সম্রাট মাথা হেলিয়ে বললেন—বেশ তো। যাবো।

মহিষী ধীরে ধীরে চলে গেলেন।

• • • •

সন্ধ্যাকাল।

যোধপুরী বেগম নিজের মহলে মহার্ঘ বসন-ভূষণে সজ্জিতা হয়ে অপেক্ষা করছেন। তাঁর দুই চোখে ভয় অস্থিরতা। সারা দেহে মৃদু আলোড়ন।

দাসদাসীদের বহু অর্থ দিয়ে বশীভূত করা হয়েছে। এবং যথাযথ নির্দেশ দিয়ে তাদের নিজের নিজের কাজে পাঠানো হয়েছে।

অল্পক্ষণ পরেই প্রধানা পরিচারিকা এসে জানালো, সম্রাট তাঁর মহল থেকে বেরিয়ে এদিকেই আসছেন।

সম্রাট এলেন। আভূমিপ্রণত কুর্ণিশ করে বেগমসাহেবা তাঁকে নিজের পালঙ্কের উপর বসালেন। তারপর নিজে সম্রাটের পায়ের কাছে কার্পেটের উপর বসলেন।

সম্রাট কিছু অভিভূত।

বেগম সাহেবা বললেন—শিল্পীবরের কাছে দাসীর প্রার্থনা আছে।

—কী প্রার্থনা? আমার আদেশ প্রত্যাহার করা ছাড়া অন্য যে কোন প্রার্থনাই আমি মঞ্জুর করব।

বললেন আকবর। আর মনে মনে ভাবলেন, যে নারীকে অন্যের মতো বিদায় করে দিয়েছেন, তার প্রতি তিনি নিশ্চয়ই উদার হতে পারেন।

বেগম সাহেবা মুখ তুলে বললেন—আজ আমি আপনাকে নিজের হাতে আপনার প্রিয় মিঠাই আর সরবৎ খাওয়াবো। জীবনে তো এ সৌভাগ্য আর পাবো না সম্রাট!

—বেশ তো। এর আর কথা কি। কই, কোথায় তোমার মিঠাই আর সরবৎ।

—এখনি আসবে জাঁহাপনা।

দরজার পাশে পরিচারিকা অপেক্ষা করছিল। সম্রাজ্ঞীর আদেশ পেয়ে পাশের কক্ষে চলে গেল।

—সম্রাট।

—বল।

বেগম সাহেবার স্বর বড় করুণ। বললেন—বাদের বাড়ি গিয়ে কী নিয়ে থাকবো জাঁহাপনা। কোন্ স্মৃতিকে অবলম্বন করে আমার জীবন কাটবে? এমন কিছু স্মৃতিচিহ্ন কি আমায় দিতে পারেন না, যা বুকে করে আমি বিনিদ্র রজনী যাপন করতে পারি।

সম্রাট কি উত্তর দেবেন ভেবে পেলেন না। বললেন—স্মৃতিচিহ্ন! তা, তুমি এই প্রাসাদের যে কোন বস্তুকে প্রিয় মনে কর, সেই বস্তু নিয়ে যেতে পারো।

ঘাড় নীচু করে সম্রাজ্ঞী বললেন—তাই দেব সম্রাট।

ইতিমধ্যে দু'জন পরিচারিকা মিঠাই এবং সরবৎ নিয়ে এসে যথাস্থানে রাখলো।

স্বর্ণপাত্রে নানাবিধ মিঠাই। আর বড় স্ফটিকের আধারে রঙীন পানীয়। তার গোলাপ-গন্ধে ঘর আমোদিত হল।

সম্রাট কয়েকটি মিঠাই খেলেন। তারপর সরবৎটুকু নিঃশেষে পান করে বললেন—তোমার পরিচারিকা খাসা সরবৎ বানিয়েছে। তাকে ভাল বকশিস্ দিও।

বেগম বললেন—বকশিস আপনিই দেবেন জাঁহাপনা। আমি তো আর এখানে থাকবো না।

সরবতের মধ্যে মিশ্রিত ছিল ঘুমের ওষুধ। মাঝে মাঝে সম্রাটের যখন পরপর কয়েক রাত অনিদ্রা হত তখন সেই ওষুধ খেতেন। বেগম সাহেবার তা জানা ছিল। হাকিমের কাছ থেকে বিশেষ ব্যবস্থায় আজ সকালে বেগম সেই ওষুধ আনিয়েছিলেন। কড়া ওষুধ কিন্তু নির্দোষ।

কয়েক লহমার মধ্যেই ওষুধের ক্রিয়া সুরু হল। সম্রাট হাই তুলতে লাগলেন। তারপর পালঙ্কের উপর শুয়ে পড়লেন এবং দেখতে দেখতে গভীর ঘুমে ডুবে গেলেন। পরক্ষণেই তাঁর প্রবল নাসিকা গর্জন আরম্ভ হল।

কয়েক মুহূর্ত শুধু থেকে সম্রাজ্ঞী পরিচারিকাকে আহ্বান করে জিজ্ঞাসা করলেন—সব প্রস্তুত?

—হাঁ, হুজুরাইন। সব ঠিক আছে।

—ডাকো ওদের।

সঙ্গে সঙ্গে চারজন বাহক ঘরে ঢুকল। নির্দেশ আগে থেকেই দেওয়া ছিল। তারা ঘুমে অচেতন সম্রাটের দেহ বহন করে নিয়ে চলল।

বেগমের মহলের পিছনে যে গুপ্ত পথ ছিল সেই পথ দিয়ে সবার অলক্ষ্যে তারা সম্রাটকে বহন করে দরজার মুখে এগিয়ে গেল। দরজার সামনেই প্রস্তুত ছিল সম্রাটের নিজস্ব সুবৃহৎ পাল্‌কি। কাশ্মীরী কাপড় দিয়ে ঘেরা চতুর্দোলা। তার মধ্যে বিছানা পাতা। সেই শয্যায় তারা সম্রাটকে শুইয়ে দিলে। সম্রাজ্ঞী পাশে বসলেন। পালকী বেহারারা চতুর্দোলা নিয়ে রওনা দিল।

মহারাণার বাড়িতেও আগে থাকতেই সংবাদ পৌঁছেছিল। আজ রাত্রে এখানে এক চমকপ্রদ নাটকের অভিনয় হবে।

ঘণ্টা দু'য়েকের মধ্যেই ঘুমন্ত সম্রাটকে নিয়ে যোধপুরী বাঈ সিরালয়ে পৌঁছোলেন। সম্রাটের জন্যে সবচেয়ে ভাল ঘরটি বিশেষ ভাবে সজ্জিত করে রাখা হয়েছিল। কাশ্মীরী কাজ-করা পালঙ্কে নতুন শয্যা। সেই ঘরে নিয়ে গিয়ে সেই পালঙ্কে সম্রাটকে শুইয়ে দেওয়া হল।

ভারতেশ্বর সম্রাট আকবর নিজের অজ্ঞাতে শ্বশুরালয়ে পৌঁছে নতুন বিছানায় শুয়ে অকাতরে ঘুমুতে লাগলেন। সম্রাটের শিয়রে বসে সম্রাজ্ঞী সে-রাত জেগে কাটালেন। মনের মধ্যে তাঁর দারুণ উদ্বেগ। সকালে সম্রাটের যখন ঘুম ভাঙবে তখন তিনি কী ভাবে সম্রাজ্ঞীর এই কৌশল গ্রহণ করবেন, সেই দুশ্চিন্তায় তাঁর মন আচ্ছন্ন হয়ে রইল।

পরদিন অনেক বেলায় ওষুধের ঘোর কাটল। সম্রাট আকবর চোখ মেলে তাকালেন। অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে শরীর বেশ হালকা বোধ হচ্ছে। কিন্তু এ তিনি কোথায় রয়েছেন?

চোখ বড়ো করে চারিদিকে দেখতে লাগলেন। বিস্ময়ে দু'চোখ আরও বিস্ফারিত হল। এ ঘর এই শয্যা—এ সবই তো অপরিচিত। তিনি কি এখনো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছেন নাকি।

যোধপুরী বেগম সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন—সম্রাটের আজ ঘুম ভাঙতে দেরী হয়েছে। তা হোক। সামনেই গোসলঘর। সম্রাট স্নান করে প্রার্থনা সেরে নিন। প্রাতঃরাশ প্রস্তুত।

সম্রাট কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন। না। স্বপ্ন তো নয়। তিনি তো জেগেই আছেন। বললেন—বেগম সাহেবা। এ আমি কোথায় এসেছি। আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

বেগম বললেন—না, জাঁহাপনা। স্বপ্ন নয়। আপনি জেগে আছেন।

—কিন্তু আমি কোথায় এসেছি। এ ঘর তো আমার প্রাসাদের কোন ঘর নয়।

বেগম বললেন—না সম্রাট, তা নয়।

—তবে?

কণ্ঠস্বর নীচু করে বেগম বললেন—এ আপনার শ্বশুরবাড়ীর ঘর।

সম্রাট বিস্ময়ের ধমকে সোজা হয়ে বললেন—শ্বশুরবাড়ীর ঘর। তার মানে?

—তার মানে আপনি শ্বশুরবাড়ী এসেছেন। এ ঘর আমার বাবার দিল্লী-প্রাসাদের সবচেয়ে ভাল ঘর। আপনার জন্যে রাখা হয়েছে।

মাথা ঝাঁকিয়ে আকবর বললেন—কী বলছ তুমি, আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। এখানে

আমি এলাম কেমন ক'রে? কাল সন্ধ্যায় তোমার মহলে গিয়ে মিঠাই আর সরবৎ খেয়ে আমি বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তারপর তো আর কিছু মনে পড়ছে না।

—তারপর আমি আপনাকে এখানে নিয়ে এলাম।

—তুমি আমাকে নিয়ে এলে! কেন নিয়ে এলে?

বেগম বললেন—কাল সন্ধ্যার কথা স্মরণ করুন খোদাবন্দ। আপনি আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করে বলেছিলেন, প্রাসাদের মধ্যে যে বস্তুকে আমি সবচেয়ে প্রিয় বলে মনে করি তা আমি সঙ্গে আনতে পারি।

ঘাড় নেড়ে সম্রাট বললেন—হাঁ, তা বলেছিলাম।

—সেই বস্তুকেই আমি সঙ্গে এনেছি জাঁহাপনা। দিল্লীর প্রাসাদের মধ্যে, শুধু দিল্লীর প্রাসাদের মধ্যে কেন, সারা দুনিয়ার মধ্যে আপনার চেয়ে প্রিয় আমার আর কে আছে! তাই আমার প্রার্থনা অনুসারে সেই প্রিয়তমকেই সঙ্গে করে এনেছি। বাঁদীর গোস্তাকি মার্জনা করবেন জাঁহাপনা।

অশেষ বুদ্ধিমান ভারতসম্রাট চোখের পলকে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝলেন। চিরকালের কৌতুক-প্রিয় তিনি। কোন সার্থক কৌতুককে সানন্দে স্বীকার করে নিতে তিনি উন্মুক্তহৃদয়। বেগমের কথা শুনে অট্টহাস্যে ঘর উচ্চকিত করে শুধু বললেন—সাবাস। সাবাস!

যোধপুর প্রাসাদে আনন্দের ঘুম পড়ে গেল। যেন নববিবাহিত জামাতা প্রথম শ্বশুরবাড়ী এসেছে।

সন্ধ্যায় মহিষীকে একান্তে পেয়ে সম্রাট বললেন—আজ আর ফিরলাম না। এমন আনন্দ ছেড়ে কে যায়, বল!

—বেশ তো, মা বাবা কত খুশী হবেন একথা শুনলে। তাঁদের বলে আসি।

—তা এসো। কিন্তু শোন, কাল খুব ভোর ভোর চলে যাব। ব্যবস্থা করে রেখো।

—তা রাখবো। এই বলে মহিষী থামলেন। তারপর কণ্ঠে ছদ্মকারুণ্যের সুর এনে বললেন—আপনি তো চলে যাবেন। আমি এখানে একাই থাকবো। আমার কাছে স্মৃতিচিহ্ন কিছুই থাকবে না।

মহিষীর চিবুক নেড়ে দিয়ে সম্রাট বললেন—থাকবে গো থাকবে। তোমার স্মৃতিচিহ্ন তোমারই থাকবে।

পরদিন ফেরবার পথে আকবর বললেন—আচ্ছা, বেগম সাহেবা, বল তো?

—কি বলব?

—এমন অদ্ভুত বুদ্ধি তোমায় কে দিলে? খোদ্ ভারতসম্রাটকে শুদ্ধ। ইতিহাসে যদি একথা রাষ্ট্র হয় তাহলে আমার ইজ্জত চিলে হয়ে যাবে যে!

অপরিমিত হাসিতে সম্রাটের মুখ উদ্ভাসিত।

বেগম বললেন—তবে বলি না নির্ভয়ে?

—নির্ভয়ে। নির্ভয়ে।

বেগম বললেন—আমাদের পরম হিতৈষী বীরবল শেঠ।

মাথা নেড়ে সম্রাট বললেন—ঠিক। আমিও ঠিক এমনি অনুমান করেছিলাম। দাঁড়াও, প্রাসাদে ফিরে তাকে দেখাচ্ছি মজা!

প্রাসাদে ফিরেই যোধপুরী বেগমের মহলে গিয়ে সম্রাট তলব করলেন বীরবলকে। বীরবল এসে দাঁড়ালেন। উভয়ের হর্ষদীপ্ত মুখ দেখে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন।

সম্রাট বললেন—বীরবল! তোমার কঠিন শাস্তি পাওয়া দরকার।

হাত জোড় করে বীরবল বললেন—কেন সম্রাট। সম্প্রতি আমি তো কোন কুকর্ম করেছি বলে মনে পড়ছে না।

—থাক! কী করেছো, সে কথা প্রকাশ না করাই ভাল। শোন, আজ থেকে একমাস প্রত্যেক দিন রাত্রে যোধপুরী বেগমের মহলে তোমার নেমন্তন্ন। স্বয়ং সম্রাট আকবরের এই আদেশ। এর যেন অন্যথা না হয়।

মাথা হেলিয়ে বীরবল বললেন—আদেশ শিরোধার্য করলাম খোদাবন্দ্।

যে মানুষ সুদীর্ঘকাল থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেছে তার রচনার ধারাকে ঐতিহাসিকভাবে দেখাই সঙ্গত। যেমন একথা বলা চলেনা যে ব্রাহ্মণ আদি চারিবর্ণ সৃষ্টির আদিকালেই ব্রহ্মার মুখ থেকে পরিপূর্ণ স্বরূপে প্রকাশ পেয়েছে, যেমন স্বীকার করতেই হবে আর্য জাতির সমাজে বর্ণভেদের প্রথা কালে কালে নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে পরিণত, তেমনি করেই অন্ততঃ আমার সম্বন্ধে জানা নাই যে রাষ্ট্রনীতির মতো বিষয়ে কোনো বাঁধা মত একেবারে সুসম্পূর্ণভাবে কোনো বিশেষ এক সময়ে আমার মন থেকে উৎপন্ন হয়নি, জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্যে তারা গড়ে উঠেছে। সেই সমস্ত পরিবর্তন পরম্পরার মধ্যে নিঃসন্দেহ একটা ঐক্যসূত্র আছে। সেইটিকে উদ্ধার করতে হলে, রচনার কোন অংশ মুখ্য, কোন অংশ গৌণ, কোনটা তৎসাময়িক, কোনটা বিশেষ সময়ের সীমাকে অতিক্রম করে প্রবহমান, সেইটে বিচার করে দেখা চাই। বস্তুতঃ সেটাকে অংশে অংশে বিচার করতে গেলে পাওয়া যায় না, সমগ্রভাবে অনুভব করে তবে তাকে পাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বাম্‌লা চা বাগানের প্রবেশপথে, সারাদিনের সংগৃহীত চা-পাতা ওজন করা হচ্ছিলো। কুলি-কামিনের দল লাইন দ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের প্রত্যেকের পিঠে একটা ক'রে পাতার ঝুড়ি। এরা সকলেই কাওড়ার লোক। প্রায় পাঁচশ' কুলি-কামিন বাম্‌লা বাগিচায় কাজ করে। এরা কেউই চা-বাগানের বাইনাকরা কর্মচারী নয়, দিন-মজুরি হিসেবে কাজ করে। সাধারণতঃ পুরুষ কুলিরা দৈনিক এগারো আনা মজুরি পায়, কামিনরা পায় সাড়ে আট আনা আর অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েরা পায় ছ'আনা। তবে, ওরা নির্দিষ্ট পরিমাণ পাতার চেয়ে যদি বেশীপাতা সংগ্রহ করতে পারে, তাহলে প্রতি পাউণ্ডের জন্য দুপয়সা হিসেবে বেশী মজুরী পায়। বাম্‌লার আশে-পাশের পাড়াতেই এসব কুলি-কামিনরা থাকে।

লালসাহেবের মোটরটা বাগানের প্রবেশপথ দিয়ে সা-ক'রে ভেতরে ঢুকে গেলো, কালো একটা রেখা যেন ঝিলিক দিয়ে উঠলো লাইন দেয়া কামিনের চোখের সামনে। ওরা অবাক হ'য়ে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো।

: এমন তীরবেগে কখনো তো সাহেব গাড়ি ছোটায় না! নিশ্চয়ই লালপানি আজ অনেক বেশী পড়েছে সাহেবের পেটে!

ওরা হেসে দুলে চোখ ঠেরে ঠেরে মিটি মিটি হাসতে লাগলো।

খরস্রোতা বাসন্তী, এখানে যেন লাজুক-লক্ষ্মী-মেয়েটি। আধমাইলের ওপর দুকূল সাবলে প্রবাহিত। নদীর একপাশে প্রান্তর, আর এক পাশে পাহাড়ের সারি। যতদূর চোখ চলে কেবল পাহাড়, পাহাড় আর পাহাড়। পাহাড়ের বুকে বুকে, বহু সমান্তরাল ঘন পাইন বৃক্ষশ্রেণী, তার সেডার আর প্রাচীন গম্ভীর ওকের সারি। মেঘহীন নির্মল আকাশ। একমুখ হাসি নিয়ে উন্মুক্ত-অবারিত হেমন্তের আকাশখানা চোখে পড়ে।

সে দিকে স্থির চোখে চেয়ে ছিলো পর্মা। রাওয়ার ওপর, বাঁশ-চেরা বেড়ায় ঠেস দিয়ে, আকাশের দিকে মুখ ক'রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে আছে। যেন খাদহীন স্রোতে ওর মনটা ভেসে বেড়াচ্ছে, হাবুডুবু খাচ্ছে। নদীতীরের শান্তি, আদিগন্ত প্রান্তরের উদারতা কিছুই ওর মনকে স্পর্শ করতে পারছে না, যেন ভাবনার সঙ্গে যুঝে যুঝে ক্লান্ত হ'য়ে পেছে ও।

একদল পাহাড়ী এসেছিলো ওদ্ সাধুবাবাকে প্রণাম করতে। ওরা সকলেই ভাগচাষী। একটুকরো জমি ওদের কারো নেই। দুখানা রুটির জন্য বড় কষ্ট, বড় মেহনত করতে হয় ওদের। তাই, ওরা দলবেঁধে যোগীজনগরে যাচ্ছে।

সেখানে, জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কলকারখানা শুরু হয়েছে। শ্রমিকরা অনেক পয়সা মজুরি পাবে সেখানে। সারামাসে যা ওরা রোজগার করে সেখানে তারচেয়ে অনেক বেশী রোজগার করবে এক হপ্তায়, অনেক পরিশ্রম সেখানে, দিনভর খাটুনি। তা হোক্। পাহাড়ী জোয়ানরা শ্রমকে কোনো কালে ভয় করে না।

কলকলিয়ে এসব কথা ব'লে, পাহাড়ী মরদগুলো কাড়াকাড়ি ক'রে সাধুবাবার পায়ের ধুলো নিচ্ছিলো, পর্মার শরীর নাকি এখনো যথেষ্ট সুস্থ হয়নি, সাধুবাবা ওদের ডাক দিয়ে তাই কিছুটা দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে।

পর্মা, নদীর তীরে, যে ঘরের দাওয়াতে বসে আছে, সেটা ওস্ সাধুবাবার একটা আস্তানা। এমন একাধিক আস্তানা সাধুবাবার আছে। জলমগ্ন পর্মার অচেতন দেহটাকে ওস্ সাধু উদ্ধার ক'রে এনেছেন আজ আটদিন হলো।

তৃতীয়দিনের শেষাশেষি দিকেই সম্পূর্ণ জ্ঞান ফিরে এসেছে পর্মার। তিনদিন আগেকার, তিক্ততায়-ভরা-সান্ধ্য-স্মৃতিটাকে ও একটু একটু ক'রে মনে আনতে চেষ্টা করেছে। যেন একটা দুঃস্বপ্নের মত সমস্ত ঘটনাগুলি ভেসে উঠেছে ওর চোখের সামনে।

একেবারে হুড়হুড়িয়ে, বাড়াবাড়ি, সেদিন ও দুর্গচূড়োয় উঠে গিয়েছিলো। শিবমন্দিরের শুভ্রতার দিকে ও নির্নিমেষ চেয়েছিলো কিছুক্ষণ, কেমন এক ধরণের অনুশোচনার রংগুলি অন্তরে অনুভব করছিলো, এমন সময় পেছনে তিনসেপাঈর গলা।

"ওরেল, তুমি কী একজন গাইড?"

পর্মা ঘুরে দাঁড়িয়ে একজন সাহেবকে দাঁড়ানো দেখে ভুরু কোঁচকালো। বললো, "না, আমি গাইড নই।"

সাহেব আগের মত নরম গলাতে আবার বললো, "কাঙড়াদুর্গের কিছু কিছু তোমার পরিচিত কী?'

সাহেবদের ওপর পর্মার বিজাতীয় ক্রোধ চিরকাল, কিন্তু, আজের কাঙড়া দুর্গ যে মস্ত একটা জাতীয় সম্পদ ছিলো, সেটা জানানোর জন্য মনের বিরক্তি চেপে রেখে জবাব দিলো, "হাঁ, দুর্গ সম্বন্ধে আমি অল্পস্বল্প জানি—"

"সেটুকু জানিয়ে আমার আগ্রহ মেটাবে কী?" সাহেব স্মিতমুখে বললো।

পর্মা সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে ভাবলো একটু। তারপর কাঙড়াদুর্গের পরিচয় দিতে শুরু করলো, ভাবলো,—সাহেব যখন ওপরে উঠে এসেছে, ওপর থেকেই তাহলে শুরু করা যাক, আর সেইসঙ্গে আর একটা কথাও ভাবলো। এ সাহেবগুলো কী সকলেই একরকম দেখতে নাকি! বিজয় পরবের দিন, মিছিলের পেছনে, ঘোড়ায় চ'ড়ে করেকটা সাহেব যাচ্ছিলো, ঠিক মনে হচ্ছে, যেন তাদেরই একজন কেউ। অবিকল সেই মুখ, সেই চেহারা। অবশ্য, সেই হারামী বদমাস্টার মুখ লাল টক্‌টকে, তাকে দেখলেই ও চিনতে পারতো—তার কথা মনে হতেই ভেতরে ভেতরে বেশ গরম হ'য়ে উঠলো পরমরাজ, সাহেবের প্রশ্নে নিজেকে সংযত করলো, তবু ওর গলা দিয়ে রুক্ষ-কঠিন আওয়াজ বেরুলো।

"...এ টিবিটা হলো ধারধারীর অংশেষ, কাটোচ পুরনারীরা এখানে অবসর যাপন করতেন।

সাহেব! তুমি এটাকে ভাল ক'রে দেখো, ভাল ক'রে দেখে রাখো,—তোমার দেশের লোক কাবুলের আমীরকে আর তার পরিবারের সবাইকে সুদীর্ঘ বারো বৎসর বন্দী ক'রে রেখেছিলো। এই বারদ্বারীতে, কাবুলের আমীর ইয়াকুব খাঁ, বারো বৎসর বন্দীযন্ত্রণা ভোগ করেছেন এখানে।"

সাহেব পর্দার মুখের মেঘ আর অসহ্য চোখ দুটো দেখে প্রমাদ গুনলো, এমন নরম মসৃণ গলা যার করলো, যে স্বর ভারতীয়ের সামনে, ওর জীবনে এই প্রথম যার হলো কণ্ঠ দিয়ে।

"কিন্তু, পর্দার, আমাকে তোমাদের একজন দোস্ত্ মনে করতে পার। ছোটোবেলায়, তোমাদের দেশের গল্প শুনে, কাহিনী শুনে, চোখে না দেখেই ভারতকে আমি ভালবেসেছি, ভারত-বাসীদের শ্রদ্ধা করেছি,—বড় হ'য়ে, কিছু অর্থ কোনোমতে সংগ্রহ করেই বেরিয়ে পড়েছি, তোমাদের দেশ দেখতে, তোমাদের সঙ্গে পরিচিত হ'তে। তোমাদের দেশ বড় সুন্দর, তোমাদের আদর্শ বড় অনেক—ফিরে যাবো শিগ্‌গির, কিন্তু এদেশকে, এ দেশবাসীকে ভুলবোনা কোনোদিন, চিরদিন মনে রাখবো—" আবেগদিয়ে এমন নাটকীয় ভঙ্গিতে কথাগুলি বলেছিলো সাহেব, পর্দার চোখের আগুন নিভে গেলো।

বারদ্বারী দেখে, রংমহল দেখে, সাহেব পুবদিকে এসে দাঁড়ালো, দুর্গের অসংখ্য ভাঙাচোরা চূড়ো ডিঙিয়ে, ঢিবি পেরিয়ে একেবারে বানগঙ্গার কাছাকাছি এসে পড়লো, আগ্রাগোড়া প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে পর্দাকেও সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। বানগঙ্গার কাছাকাছি এসে জিগ্যেস করলো, "দুর্গের নিচে দিয়ে, এখানে একটা সুড়ঙ্গপথ আছে ব'লে শুনেছি, তুমি জানো, সেটা কোন্ দিকে, কোথায়?"

"হাঁ, এই দিকেই—" পর্দা বললো। ওপর থেকেই একটু ঝুঁকে আঙুল দিয়ে জায়গাটা নির্দেশ করতে গেলো,—ঠিক্ সেই মুহূর্তে, পেছন থেকে প্রবল ধাক্কা খেয়ে পর্দার বিশাল শরীরটা প্রথমে শূন্যে উঠে গেলো, তারপর ঘূরপাক খেয়ে, ডিগবাজি খেয়ে, উপলখণ্ডে ধাক্কা খেতে খেতে ক্ষত বিক্ষত হ'য়ে বানগঙ্গার খরস্রোতে ঝুপ ক'রে গিয়ে পড়লো। বানগঙ্গার জলে আলোড়ন তুলে, জল স্পর্শ করলো পর্দার শরীরটা, সেই দণ্ডে পর্দার মনে হয়েছিলো,—আকাশটা ওর সামনে যেন ঝুলে পড়লো, সব আলো নিভে গেলো, আর, ও, আর অন্ধকার মিলে মিশে একাকার হ'য়ে গেলো। তারপর আর কিছু মনে নেই।

তারপর, প্রথম যখন চোখ মেললো পর্দা, সমস্ত শরীরে চাপ চাপ ব্যথা, মাথায় চাপ চাপ ব্যথা,—অসহ্য সে ব্যথা আর চোখের সামনে একটা যেন গাঢ় ধূসর পর্দা ঝুলে আছে। আধোল চোখে ও অনেকক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়েছিলো। সাধুবাবা সামনে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে একটা ওষুধ ওকে খাইয়েছিলেন, তখন সাধুবাবাকে ও একেবারে চিনতে পারেনি।

তিনদিনের পোড়ার দিকে, তারপর, যখন ও চোখ মেলেছে, তখন ও পুরোপুরি সুস্থ। একেবারে হাল্কা শরীর, হাল্কা মাথা। সেই বিশ্রী ধূসর পর্দাটা চোখের সামনে থেকে সম্পূর্ণ অপসারিত।

সাধুবাবার আশ্চর্য অলৌকিক ক্ষমতা এ যাত্রা রক্ষে করলো ওকে। এতদিন শুধু কানে শুনে এসেছে, ওম্ সাধুবাবার অদ্ভুত মহিমার কথা,—এবার প্রত্যক্ষ করলো, কিন্তু, তবু পর্দার বাবার ওপর অভিমানের শেষ নেই।

—কেন বাবা বলছেন না? কেন?

এই পাঁচদিন ধ'রে, ফুলমুর কোনো সংবাদ বাবা বলছেন না কেন? ফুলু কোথায়, কী ভাবে এখন আছে,—সবই তো সাধুবাবা দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন। আর, পর্ণাও যে একটা ঘোরা-কঠিন যন্ত্রণা বুকে নিয়ে ছট্‌ফটিয়ে মরছে, তাও বাবার অজানা নয়। অথচ ও ফুলমুর কথা জিগ্যেস করতে গেলেই, বাবা অন্য কোনো প্রসঙ্গের অবতারণা ক'রে এড়িয়ে যান, নয়তো হেসে হেসে বলেন,—জান্‌বি, সব জান্‌বি, এখনো সময় হয়নি,—কিসের সময় হয়নি? কেন সময় হয়নি…?

অবশ্য, ফুলমুর ভাবনাটা ঝোঁয়া ঝোঁয়া, অস্পষ্ট একটা আকার নিয়েছে ওর অন্তরে—

: সেই হারামী সাহেবের বচ্চাটাকে চিনেছিলো ও ঠিকই। মিত্তির পরবের দিন, সেই লালমুখো বদমাস্‌টার সঙ্গে, এ ব্যাটাও মিছিলের পেছনে ছিলো। এ পাজী দুটো কাণ্ডজ্ঞানেই থাকে নিশ্চয়ই। ওদের শয়তান-চোখ ফুলমুর ছদ্মবেশ ধরে ফেলেছে, তারপর, ওদের চক্রী-মন ঘোর-লাগস ক'রে ঘটিয়েছে কাণ্ডটা। এই অস্পষ্ট ভাবনাটা পর্ণার ভেতর ঘোরপাক খায়, আর সাপের মত কিলিয়ে ওঠে ওর চোখ দুটো। তবু, ছোবল মারবার আগে, কুয়াশার এতটুকু আবরণ পর্ণা রাখবে না, একেবারে স্পষ্টাস্পষ্টি শুনে নিতে চায় সাধুবাবার মুখ থেকে। তারপর, ও দুটো বাঙ্গলা-পোকার কয়কয়ানি থামাতে পর্ণার আর লাগবে কতক্ষণ। তাই, ওর অভিমানের অন্ত নেই। সব জেনেও, সব বুঝেও বাবা বুঝতে কেন চাইছেন না।

দূরে, পাহাড়ের চূড়াটা চিক্ চিক্ করছে, সে দিকে চেয়ে আছে পরমযোগী। চোখের দৃষ্টি স্থির, ধ্যানে তাঁর স্থির, কিন্তু, ওর অস্থির মনটা একটা হাহাকার জাগিয়ে যেন পাগল ক'রে ছাড়ছে ওকে।

ওম্ সাধুর মধুরাপ্লাবী কণ্ঠ শুনে পর্ণা চোখ নামালো, তাকালো বাবার মুখের দিকে।

"খুব ভাল হলো বেটা, খুব আনন্দ সংবাদ—"

আগ্রহী চোখে পর্ণা চেয়ে রইলো, সাধুবাবা ওর পাশে ব'সে, ওর কাঁধের ওপর হাত রাখলেন, আর একহাত বাড়িয়ে দেখালেন অপসৃয়মান পাহাড়ী দলটাকে।

ওরা গান গেয়ে গেয়ে বড় বড় পা ফেলে চলেছে। আনন্দের গান।

"পর্ণা, দেখ্ বেটা,—ওদের মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখ্, পেটভ'রে দুবেলা দুটো খেতে পাবে, সেই আনন্দে অস্থির। বড় ভাল হলো। সব দিক দিয়ে বড় ভাল হলো। বিদ্যুৎ-শক্তির বড় প্রয়োজন ছিলো, পূব-পশ্চিম পাল্লাবে কলকারখানাগুলো এবার চালু হবে ভাল ভাবে। হাজার হাজার শ্রমিকের প্রয়োজন হবে। সহায়-সম্বলহীন শ্রমিকরা খেতে পাবে পেট ভ'রে, হাসি ফুটবে তাদের মুখে, তাদের ছেলেমেয়ে পরিবারের মুখে, বড় আনন্দ হলো রে বেটা…।"

পর্ণা মানসিক যন্ত্রণাটা ভুলে অবাক চোখে বাবার দিকে তাকালো। সাধু সন্ন্যাসীরা ঠিক এ ধরণের কথা বলেন না তো।

"বুঝলি বেটা—" ওম্ সাধু ভাবাবেগে বলে চললেন, "মণ্ডির সর্বশেষ রাজা ছিলেন যোগীন্দ্র সেন। বড় পুণ্যবান, বড় প্রজাবৎসল রাজা ছিলেন এই যোগীন্দ্র সেন। ওঁর নামে সিকোটি শহরের নাম হয়েছে যোগীন্দ্রনগর। সেই যোগীন্দ্রনগরে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্র হচ্ছে, সেই পুণ্যবান ধার্মিক রাজার নাম আরো ফিরবে সবার মুখে মুখে বড় খুশি হলাম, বড় আনন্দের দিন আজকে আমার।"

সবিস্ময়ে পর্দা লক্ষ্য করলো, সাধুবাবার যেন বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হলো। চোখবুজে বিড় বিড় ক'রে কী সব মন্ত্র আওড়াচ্ছেন ওম সাধু। সাধুবাবার এ চেহারা পর্দা কখনো দেখেনি। ধ্যানমগ্ন নির্নিমেষ যোগীপুরুষের দিকে চোখ বড় বড় ক'রে তাকিয়ে রইলো।

পর্দা অপেক্ষা করতে লাগলো। একঘণ্টা নয়, কিন্তু পর্দার কাছে মনে হলো যেন এক যুগ পরে, ওম সাধু চোখ মেললেন। বাবার প্রশান্ত দৃষ্টি ধীরে ছেড়ে বিস্তৃত হলো ঊর্ধ্বে। তারপর চোখ নামলো। পর্দার উৎকণ্ঠিত মুখের দিকে চেয়ে সুন্দর স্মিত হেসে বললেন, "বেটা, মনটা খুলে বল আমার কাছে, কী করতে চাস তুই?"

একমুহূর্ত ইতস্তত: ক'রে পর্দা বললো, "বাবা, আশীর্বাদ কর, অনুমতি দাও, দেশের শত্রুদের ওপর আমি এবার ঝাঁপিয়ে পড়তে চাই। প্রস্তুতির জন্য অনেক বিলম্ব করেছি, আর নয়—"

ওম্ সাধুর লাবণ্যমুখে হাসির আভা ছড়িয়ে পড়লো। "বেটা, মনের কথা আর মুখের কথা এক ক'রে নে। তোর মন বলছে এক কথা, আর তুই মুখে বলছিস আর এক কথা—"

পর্দা আড়ষ্ট ভঙ্গিতে অধোবদন হ'য়ে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর সব লুকিয়ে ফেলা নিঃস্বের মত চোখদুটি তুলে সাধুবাবার দিকে তাকালো।

"ফুলমুর কথা জানতে চাস্ তো?" হাসিমুখে ওম্ সাধু বললেন। "তোর মন যা ভেবেছে, ঠিক তাই,—সেই লালসাহেবের বাড়িতে আটক আছে ফুলমু···তাকে—"

সাধুবাবার কথার মাঝখানেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো পর্দা। ওর ভেতরের গর্জিত স্রোতকে আলোড়ন ক'রে প্রচণ্ড শব্দ উঠলো। সংযত পর্দা সহসা যেন বিদীর্ণ হলো। চোখের দিকে তাকানো যায়না, এমনি আগুন চোখে। অনন্ত চোখ জোড়া যেন জোড়া ফুলের তলা দিয়ে ঠিকরে আসছে, যেন তলকে তলকে লাভা বা'র হচ্ছে চোখের দৃষ্টি দিয়ে। ওম্ সাধু মুগ্ধচোখে চেয়ে রইলেন পর্দার দিকে।

যেন একটা ধাতুমুক্ত তরবারি ঝলসে উঠছে নিজের আভায়। সাধুবাবা উঠে দাঁড়িয়ে পর্দার প্রশস্ত কাঁধের ওপর আবার হাত রাখলেন, বললেন, "বেটা, অস্থির উত্তেজনা নিয়ে কোনো কাজ সফল করা যায় না। বোস্ বেটা, আমার দুচারটে কথা শুনে নে।"

পর্দা ব'সে প'ড়ে সাধুবাবার দিকে উদভ্রান্ত চোখে চেয়ে রইলো। ওর দুচোখের কোনায় কোনায় অনেক অভিযোগ।

পর্দার চোখের চেহারা দেখে সাধুবাবা হাসলেন, বললেন, "তুই ভাবছিস, আরো কত আগে ফুলমুকে উদ্ধার করা যেতো, কিন্তু, আমি কেন বিলম্ব করলাম। কেন আমি ফুলমুর কথা এতদিন বলিনি, তার কারণ ছিলো, তার প্রয়োজন ছিলো, কিন্তু, শুধু তোর মৌলিক বিকলতার জন্যই আমি দেরী করিনি এত, আমি অপেক্ষা করছিলাম।

বাংলো বাগানে লালসাহেবের বন্ধু এসেছিলো দশজন। তাদের প্রত্যেকের কাছেই এক একটা বন্দুক ছিলো, আর নির্ভুল নিশানা তাদের প্রত্যেকের। তুই হোরা নিয়ে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে, সেটা করেক সাহেবের প্রাণ নিলেও, ফুলমুকে উদ্ধার করা তোর হতোনা। তার আগেই বন্দুকের গুলিতে তোর প্রাণটা দিতে হতো, তোর প্রাণটার দাম অনেক। তোকে আমি হারাতে পারিনা, ফুলমুরও আমি মুক্তি চাই।"

এক মুহূর্ত বিরতি দিয়ে, সাধুবাবা আবার বললেন, "সেই শিকারের দল আজ বান্দ্লা

বাগান থেকে চলে গেছে। আজ তুই না বললেও, বাব্‌লার আজ তোকে আমি রওনা করিয়ে দিতাম—"

পর্ণার গলা দিয়ে কাটা আওয়াজ বার হলো, "বাব্‌লা বাগানে আছে ফুল্‌লু?"

"হ্যাঁ, বাব্‌লা চা বাগানের ম্যানেজারের বাড়িতে—"

"ঐ লালমুখোটা বাব্‌লা চা বাগানের ম্যানেজার বুঝি?"

"হ্যাঁ, তাই—" সাধুবাবার গলাটা হঠাৎ মন্থর হ'য়ে এলো।

পর্ণার মস্তিষ্কে যেন আগুন জ্বলে উঠলো। ও কিছুক্ষণের জন্ত অক্ষমনস্ক হ'য়ে গেলো একেবারে। ও মনের চোখে পৌঁছে গেছে বাব্‌লার। লালমুখোটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখে ভাবছে,—কী ভাবে শেষ করা যায় এই হুষমনটাকে! ছোরা চালালে তো এক মুহূর্তেই সব কিছুর অবসান। তা করা চলবে না। তিলে-তিলে দণ্ডে দণ্ডে শেষ ক'রতে হবে শয়তানটাকে। আগুনে পুড়িয়ে মারবে? না, একটু একটু ক'রে, খণ্ড খণ্ড ক'রে কাটবে? নাকি, অর্ধেক পুঁতে ফেলে কুত্তা দিয়ে খাওয়াবে? কীভাবে লালসাহেবকে শেষ করবে, সেটাই এখন ওর সমস্যা।

"বেটা···!" ওম্ সাধুর আহ্বানে পর্ণা নিজের মধ্যে ফিরে এলো।

"ফুল্‌লুকে উদ্ধার ক'রে, তারপর তুই কী করবি? ওকে সাদী করবি?"

"না না, অসম্ভব—" পর্ণা যেন আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো, "তবে? ও ঠাঁই পাবে কোথায়?"

ওম্ সাধু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন পর্ণার মুখের দিকে।

পরমরাজের ভেতরটা একটা অদ্ভুত আকুলতায় ছটফটিয়ে উঠলো। কতকিছু যেন ওর বলার আছে, বলতে চায়, কিন্তু ব্যক্ত করতে পারছে না।

মিনিট খানেক পরে পর্ণা উত্তর দিলো, "বাবা, তুমি ওকে আশ্রয় দিও। আমি ফুল্‌লুকে উদ্ধার ক'রে তোমার কাছে নিয়ে আসবো—"

হা-হা ক'রে ওম্ সাধু প্রাণখুলে হেসে উঠলেন, "আমি আশ্রয় দেব কিরে বেটা। আমার নিজের কী কোনো আশ্রয় আছে? আমি ন্যাংটো ফকীর, বগল বাজিয়ে মনের আনন্দে চলি, এবেলা এখানে থাকি তো, ওবেলা ওখানে—আমার কী কোনো পিছুটান চলে?"

পর্ণা নীরবে সাধুবাবার দিকে তাকিয়ে রইলো।

বাবা বললেন, "কিন্তু বেটা, কেন তুই সাদী করবি না? সংসার-রাজের একমাত্র সেড়কা তুই, তার প্রাণস্রোতকে অব্যাহত রাখার জন্ত সাদী তো তোকে করতেই হবে। সাদী ক'রে আওরত নিয়ে দেশের কাজে লেগে যা। আওরত নিয়ে কী কোনো কাজ করা যায়?"

পর্ণা চুপ।

ওম্ সাধু পরমরাজের মুখের দিকে চেয়ে, পর্ণার মুখে যেন দেখলেন চোখে দেখলেন, বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্ন। মধুর হেসে বললেন, "মুসব্বীকুলকে পিষে মাড়িয়ে গেলেও, তার সৌরভ কী একফোঁটা নষ্ট হয় রে? ফুল্‌লু সেই মুসব্বীকুল,বেটি তোর জন্ত অনেক কষ্ট সয়েছে, আর কষ্ট দিস না—"

পর্ণা তবুও নীরব।

"কী তুই চাস বেটা? কী তোর অন্বেষণ?" আবেগে পরিস্ফুট হলো ওম্ সাধুর কণ্ঠ, "পর্ণা! তুই নিজেকে নিজে ছলনা করছিস, বেটি তোকে ভালবেসে শেষে কী এই পুরস্কার

সোনো! চাষার সেরা মেয়ে। দেওতা তাকে শরীরেই শুধু দুখন সুন্দর রূপ দেয়নি, অন্তরেও প্রচুর সম্পদ দিয়েছেন। সে কিনা সাতদরিয়ার পানিতে নাকানি চোবানি খেয়ে খেয়ে জীবনটা শেষ করবে। স্রোতের ভাওলার মত ঘাটে ঘাটে ভেসে বেড়াবে! তারপর, কিছুকাল পরে, ডুবে যাবে একেবারে অন্ধকারের অতলে!"

যেন বিস্ফোরক ফাটলো। দুরন্ত আক্রোশে ওঠাধর দংশন ক'রে, পর্মা কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে টান টান হ'য়ে উঠে দাঁড়ালো। মুহূর্ত একটা ক্রোধ-দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে, দারোগা ছোঁয়াটা এক টানে বা'র ক'রে দাওয়ার কোনায় আমূল গেঁথে দিলো, তারপর এক হেঁচকায় সেটাকে তুলে নিয়ে যথাস্থানে রেখে, কোমরে হাত দিয়ে সাধুবাবার সামনে এসে দাঁড়ালো। যেন জীবনপথের একটা মোড় ঘুরে, নতুন পথে রওনা হওয়ার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ক'রে নিলো ও। বললো, "বাবা, তাই হবে, ফুলমুকে উধার ক'রে, আমরা তোমার কাছে চলে আসবো। তুমি বিয়ে দিও আমাদের।"

সাধুবাবার মুখে গভীর তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠলো।

"খুব সুখী করলি বেটা, খুব আনন্দ দিলি ···। সে বেটির কান্না যে আমি অহোরাত্র শুনতে পাচ্ছি। আমি এখানে অপেক্ষা করবো। বেটিকে নিয়ে তুই চলে আয়, আমি তোদের বিয়ে দেব। পর্মা, বড় খুশি করলি আমাকে, আমিও তোকে মস্ত একটা আনন্দ সংবাদ দেব।···আর তিনদিনের মধ্যেই বাপুজীর আহ্বান আবার সবাই শুনতে পাবে, এবার বাধা-বন্ধন ছিঁড়ে, ভয় হটিয়ে, সবাই বাপুজীর ডাকে সাড়া দেবে। সেই আশ্চর্য মানুষের আশ্চর্য কণ্ঠের আহ্বান আবার সবাই শুনবে। এ আহ্বান বন্ধ করার ক্ষমতা নেই বৃটিশ শক্তির, থরথরিয়ে কেঁপে উঠবে।"

মুহূর্তে পর্মার মনের হাওয়া বদলে গেলো। চোখ-মুখের চেহারা অন্যরকম হলো। সাধুবাবার পায়ের কাছে ধপ ক'রে ব'সে প'ড়ে, দুহাত বাড়িয়ে বাবার পা জড়িয়ে ধরলো।

"বাবা, এই আহ্বান শোনার জন্য, আমি যে ন'বছর ধরে একটা একটা ক'রে দিন গুনছি। বাবা, তুমি আশীর্বাদ কর, বাপুজীর ডাকে আমি যেন অন্তরের সঙ্গে সাড়া দিতে পারি···।"

"পারবি বেটা পারবি, আমি আশীর্বাদ করছি তোদের, তোদের দুজনের মিলিত শক্তি দিয়ে তোরা বাপুজীর কাজে লেগে যা। এই হতভাগ্য দেশের বুকের ওপর দিয়ে রক্তের কত চল ব'য়ে গেছে, রক্তস্রোতে ভেসে গেছে নদী-গিরি-জনপদ, কিন্তু রক্তস্রোতে শেষ মীমাংসা হয়না রে। সেই পরম-সত্য উপলব্ধি করেছেন বাপুজী। তাই, বিনা অস্ত্রে বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে আহ্বান করেছেন ভারতবাসীর সবাইকে। বেটা স্থির জানিস, ঐ মস্ত ফকীর এইভাবেই স্বাধীনতা এনে দেবে ভারতের।"

—তবে আর বিলম্ব কেন? ঐ একটি কথা, ঐ একটি নাম, পর্মার সমস্ত উত্তেজনাকে, হৃদয়ের অসহ্য আলোড়নকে শান্ত ক'রে ভারসাম্য এনে দিলো। সে আবার সেই সংযত, আত্মস্থ, অবিচলিত, আগেকার সেই পর্মার পরমরাজ।

ওম্ সাধু উঠে দাঁড়িয়ে প্রশান্ত আনন্দময়-মুখে পর্মার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন, বললেন, "তোমার যাত্রা শুভ হোক, জয়যুক্ত হোক। তুমি সত্যান্বেষী হও, তোমার অন্তর্দৃষ্টি উন্মীলিত হোক্।" আশীর্বাদ ক'রে সাধুবাবা পকেট থেকে একটা মুখবাঁধা থলি বার ক'রে পর্মার হাতে দিয়ে বললেন, "এ থলিটা তোমার জন্যই পকেটে নিয়ে নিয়ে ঘুরছি। বাসে চেপেই খেও, ট্রেনে অসুবিধা হবে, তোমার যাত্রাপথ এতক্ষণে উপস্থিত। বাবা কৈলাসবঙ্গীরের নাম নিয়ে তুমি এ বার রওনা হও।

আমি তোমাদের জন্ত অপেক্ষা করবো এখানে। ঘুলোনা—বাপুজীর মন্ত্র। ঘুলোনা, তুমি বাপুজীর মন্ত্রে মনে মনে নিজেকে দীক্ষিত করেছো।

বেলান্তের প্রথম রাত্রি। আকাশ মেঘে মেঘে ঢাকা। যেন সারা আকাশ জুড়ে মিশ কালো রঙের বিরাট একটা ছাতা মাথার ওপর কে টাঙিয়ে রেখেছে। বাঙ্গলা বাগানের চায়ের কারখানার দরজা আজ তাড়াতাড়ি বন্ধ করতে হয়েছে। এলোমেলো ঝড় শুরু হয়েছে, আর তার সঙ্গে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি। কারখানার কুলি-কামিনরা চা-এর নির্দিষ্ট প্যাকেট-সংখ্যা শেষ না করেই, অনুনয় ক'রে আজ ছুটি নিয়ে গেছে, কাল তারা প্যাকেট পুরিয়ে দেবে ঠিক।

কুলীদের সর্দার মাংরুর মনটাও আজ উদাস, ভাল নেই। ওর বাড়ি কাছাকাছি পল্লীতে নয়, কাঙড়া শহরে। ওর বউ কাকে ক'য়ে প'ড়ে যেন একখানি চিঠি লিখিয়ে পাঠিয়েছে। অনেকদিন যায়না ব'লে অনেক মান অভিমান জানিয়েছে চিঠিতে। আরো জানিয়েছে, একটিন ছলির (ভুট্টার) ছাতু বানিয়ে রেখেছে। মাংরুর শনিবার আসা চাই। ও গেলে পরে তরবিৎ ক'রে কাড়ি—(বেসনের বড়া বানিয়ে ঘি দিয়ে রান্না ক'রে। কাঙড়াবাসীদের সব চেয়ে প্রিয় খাদ্য)—বানাবে, আর ছলির রুটি, তারপর দুজনে ব'সে একসাথে খাবে।—এমন একখানা চিঠি পেলে কোন্ পাহাড়ী মরদ স্থির থাকতে পারে। মাত্র দুটো দিনের ছুটি চেয়েছিলো, সাহেব দেয়নি।—নিজে বদ আর মেয়েমানুষ নিয়ে দিনরাত ডুবে আছে, আমাদের প্রাণে আর কোনো সখ সাধ নেই! ভেতরে ভেতরে গজরাচ্ছিলো কুলিদের সর্দার মাংরু।

মাংরুর মনের এই অবস্থায়, কুলি-কামিনরা উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় ক'রে ছুটি চাইতেই, ওদের ছুটি মিলে গেলো।

লাঠির গুঁতোর বদলে ছুটি, তাও বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে,—এতটা ওরা যেন আশা করেনি। বাদল হ'লেই যেমন ওরা যেমন ছুটি ছুটি ক'রে, আজও তেমনি করেছিলো। ছুটি মিলতেই,—হো-ও-ও-ক'রে পুরুষরা উল্লাস ধ্বনি করে উঠলো, আর মেয়ে কুলিরা অস্থির হাতে—এ ওর গায়ে লুটোপুটি খেয়ে নিলো খানিক। তারপর হৈ-হৈ করতে করতে, বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বাড়ির পথ ধরলো সবাই।

কুলি-কামিনদের মধ্যে কেউ কেউ পথের পানাগার থেকে বাঁশের পানপাত্র পূর্ণ ক'রে মদ্য চালালো, আবার কেউ কেউ এক একটা মদের বোতল বগলে নিয়ে চললো। ঝড়-বৃষ্টিকে ওরা পরোয়া করে না। আজ মজা জমবে খুব। কিছুক্ষণ পরেই, কুলি-কামিনদের পল্লীতে পল্লীতে মাদল বেজে উঠলো,—

ধেই কুড় কুড়, ধাই ধাই,
ধিতাং টেং ধিতাং টেং।

এই দুর্যোগের মধ্যে বাঙ্গলা চা বাগানের অনতিদূরে, একটা প্রাচীন শিমুল গাছের তলায় অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে পর্ণা। একটু বেশী রাত্রির জন্ত অপেক্ষা করছে। একটা বরী (চটের বস্তা) মাথায় দিয়ে, ঘুলোর আর করাপাতার কাপ্‌টা হাওয়ার চেউ আর প্রবল ধারায় বর্ষণের

ভেতর একটুও না ন'ড়ে, না চ'ড়ে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাথার ওপর গাছের ডাল ভেঙে উড়ে গেলো, বাজের কড় কড় শব্দ, তবু পর্ণার নিজের জন্ত এতটুকু ভাববার সময় নেই।

মাঝে মাঝে প্রাচীর ঘেরা ম্যানেজারের বাড়ির মাথার ওপর এক একবার হিংস্র চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে। যেন দিগন্তজোড়া একটা ধূসর আস্তরণ হুমড়ি খেয়ে পড়েছে বাংলো বাড়িটার ওপর। বাংলোর পেছনের সারি দেয়া গাছগুলো যেন কালো এক একটা বোরখায় ঢাকা।

বাঙ্গলা বাংলোর ছাদের মাঝখানে চিমনীর মাথা দুটো, দুটো কালো বিন্দুর মতো নজরে পড়ছে। সেই কালো দুটো বিন্দু যেন ফুলমুর—দুটো কালো চোখের স্থির বিদ্যুৎ।

একটু দূরের সোজা সড়ক দিয়ে, দলে দলে কুলি-কামিনকে যেতে দেখা গেলো। তুমুল বৃষ্টিতে ওদের ভ্রূক্ষেপ নেই। প্রকৃতির এই উদ্দাম উৎসবে, ওরাও যেন উল্লাসে মত্ত হ'য়ে যোগ দিয়েছে :

ফুলেরো পটেনো দিশা ওলেরা প্রাঁও,
যশ কি রোটি সে খানো মশ্‌রি প্রাঁও।

আনন্দিত কোলাহলে ওরা যেন উন্মাদ হ'য়ে গান গেয়ে গেয়ে চললো।

আকাশ-ঝরানি বৃষ্টিটার এতটুকু বিরাম নেই।

আকাশের দিকে তাকালো পর্ণা। তেমনি ঘোলাটে থমথমে আকাশ। হু-হু দমকা বাতাসে ভিজে মাটির গন্ধের সঙ্গে মেশানো, টেসু আর গাঁটিয়া ফুলের আর পচাপাতার একটা বিচিত্র গন্ধ।

তারি যেন চেনা গন্ধ পর্ণার। ওর চৌরাশী গাঁয়ের বাড়ীটাতে শুয়ে শুয়ে কত বর্ষার রাতে এমন গন্ধ পেয়েছে পর্ণা। বিশেষ ক'রে, এই যে সেদিন, যেদিন ফুলমু বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে এলো ওর বাড়িতে, সেদিন ঠিক এমনি গন্ধ ওর বাড়ির চারপাশে পেয়েছিলো পর্ণা। আর এই গন্ধটাই ওকে যেন মাতাল ক'রে তুলেছিলো সেদিন।

ভেতরে বাগানমুখো ঘরটায় আছে ফুলমু।

মুষলধারায় বৃষ্টি। সে দিকে চেয়ে চেয়ে চমিয়ালী কাঁদছে। বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা, বাংলো বাড়ির টিনের ছাদে প'ড়ে, ছিটকে ছিটকে এপাশে-ওপাশে ছড়াচ্ছে,—ঠিক ওর মনটার মতন।

এই নরককুণ্ড থেকে ওর মুক্তি হবে কতদিনে? ওর চিরকালের স্বপ্নটা এমনভাবে মুছে গেলো?

আরো বৃষ্টি হোক, বাজ পড়ুক, প্রলয় নামুক বাঙ্গলায়। আকাশ ভেঙে পড়ুক চালুক। বাঙ্গলা বাংলো শেষ হ'য়ে যাক। সেই সঙ্গে শেষ হ'য়ে যাক মেহুলা গ্রামের ফুলমু। দেবতা! এই সামান্ত প্রার্থনাটা ফুলমুর তুমি পূরণ কর।

এই ভীষণ ভাগ্যের জন্ত কোনোদিন তো প্রস্তুত ছিলো না ফুলমু। আঁচড়ে, কামড়ে, পা চালিয়ে কারার হাট বসিয়ে, ওর ওই জন্মের পরিণামকে কিছুতেই ও ঠেকাতে পারেনি। ও নত হইয়েছে। এখন ওর কান্নাই সম্বল। সারা জীবন ধ'রে, কত দীর্ঘদিন ও বাঁচবে কে জানে, ওকে কেঁদে কেঁদে কাটাতে হবে। জলে জলে, পুড়ে পুড়ে একেবারে অঙ্গার হ'য়ে যেতে হবে ওকে।

ঝকঝকে পালিশ করা ঘরে, পুরু গদীর ওপর, চামরীর লোম দিয়ে তৈরী নরম কম্বলের নিচে শুয়ে চমিয়ালী অঝোরে কেঁদে যাচ্ছে। পর্ণার নাম ক'রে ক'রে কাঁদছে।

একটু আগে, নেশায় টলোমলো শরীরটাকে তুলে নিয়ে ওর কাছ থেকে চলে গেছে সাহেব। সাহেবের অত্যাচারে ওর ঘুম আটকে আসে। কিন্তু, তবু শ্বাস কেন বন্ধ হয় না।

এই নরককুণ্ড থেকে ও কোনোদিন নিষ্কৃতি পাবে না। ওরা ওকে মরতেও দেবে না। পর্দার নেয়া ছোরাটা ওর চোলির ভেতর ছিলো। সেটা বুকে বসিয়ে প্রথমদিন ফুলমু মরতে গিয়েছিলো, ওরা কেড়ে রেখেছে। তারপর, ওর চারপাশে রেখেছে সতর্ক পাহারা, এরা ওকে মরেও বাঁচতে দেবেনা। পর্দার কথা ফুলমুর কাছে এখন কল্পনার আকাশ-লোকের মত, তবু ঐ নাম জপ করতে করতে, কেঁদে কেঁদে অস্থির হয়ে, গভীর রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ে একসময়।

একটা কথা মাঝে মাঝে ওর অন্তরে ঝিলিক্ দিয়ে ওঠে: সর্দার বেঁচে আছে তো? এই শয়তানরা শেষ করেনিতো সর্দারকে?

···· না, না, না—বুকে হাত চাপা দিয়ে চীৎকার ক'রে ওঠে ফুলমু,—বাবা কেলউবজীর! যা কিছু অশুভ, যা কিছু অমঙ্গল, সব আমার ওপর হাও,—সর্দারকে অটুট রাখো তুমি।

"পর্দা—! পর্দা···! পর্দা···!" ফুলমু ফুকরে ফুকরে কাঁদছে।

"ফুলমু!"···

কম্বল সরিয়ে ফুলমু ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো।

বাঙ্গলার বৃষ্টি-ঝরা রাত্রে, ফুলমু কী জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছে! ওর এক হাত ঘুরে টান টান হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে সর্দার পরমরাজ। "সর্দার—!!!" ফুলমুর চঞ্চল শরীরটা তরল বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্র গতিতে উঠে দাঁড়ালো, কিন্তু এক পা বাড়িয়েই, পা টেনে নিয়ে স্থির নিষ্পলক চোখে পর্দার দিকে চেয়ে রইলো। শুধু ওর চোখ নয়, সর্বাঙ্গ,—যেন ওর সমস্ত সত্তাটাই চেয়ে রইলো পর্দার চোখের দিকে।

পর্দা স্পষ্ট তার বুকের নিভৃত অংশের আলোড়ন অনুভব করতে লাগলো। যেন আচম্বকা ওর বুকের তলায় ভূমিকম্প শুরু হলো। তবু, ও ধরে রাখলো নিজেকে। দীর্ঘ-অপলক-নিমিষের দৃষ্টিতে ফুলমুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। কতক্ষণ ধ'রে তাকিয়ে রইলো নিঃশব্দে, যেন ফুলমুর মনের কোনায় কোনায় ঘুরে বেড়িয়ে সবখানি দেখে নিলো ও।

ফুলমু নিঃশব্দে হাসলো একটু। কিন্তু, এই হাসিতে ফুলমুর মুখের চেহারা এমন হলো কেন? ওর দিকে পর্দা যেন আর তাকিয়ে থাকতে পারছে না। ওটা ফুলমুর হাসি? না, কান্না?

হাসি কী কান্নার চেয়েও করুণ হ'তে পারে।

থির থির ক'রে কাঁপছে ফুলমু। কিন্তু, চোখের চাউনি আশ্চর্য নিথর—একেবারে ভাষাহীন। কোনো প্রার্থনা নেই, কোনো প্রত্যাশা নেই, কোনো আবেদন, অনুযোগ কিছু নেই।

ফুলমুর শীতল ভাষাহীন চাউনি সর্দার পরমরাজকে যেন চাবুক মারলো। মুঠিতে ধরা ছোরাটাকে ঘুরে ছুড়ে, পর্দা দুহাত বাড়িয়ে আকর্ষণ করলো ফুলমুকে।

"—না, না, না—" ফুলমু নিজেকে ছিনিয়ে ঘুরে স'রে দাঁড়ালো, "সর্দার, আমাকে ছুঁয়োনা তুমি, আমি ছুঠা, আমি অনেকের পাতের ছুঠা—" ফুলমুর সারা মুখে গাঢ় বিষাদের ব্যঞ্জনা ছড়িয়ে পড়লো। পর্দা জানে তা, সব জানা পর্দার।

তবু, ফুলমুর মুখ থেকে একথা শুনেই, পর্দার সারা পেশীময় দেহে আগুনের একটা অসহ্য জ্বালা

ছুটোছুটি শুরু করলো। হঠাৎ মনে হলো ওর, সমস্ত জগৎটা যেন ফাঁকা হয়ে গেলো। যেন ওর আর কিছু করবার নেই। করবার রইলো না।

ফুলমু মাটির দিকে চেয়ে বললো, "সর্দার, তুমি আমাকে শুধু এই নরককুণ্ড থেকে উদ্ধার কর, আর কিছু চাইনা—"

পর্দা সেই পলকহীন চোখে নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে ফুলমুর দিকে। ওর সন্ধানদৃষ্টি আরো তীব্রতর হলো।

: না, ঠিক সেই আছে ফুলমু। ওর শরীরে যে আলোর ঝলক ছিলো, মুখের যে মধুর দীপ্তি ছিলো, তা এখনো তেমনি অম্লান। এতটুকু ম্লান হয়নি তো!

একটা বোবা ধিক্কার পর্দার বুকের ভেতরে মোচড় দিয়ে উঠলো। আর এক মুহূর্ত দেরী করলো না। স'রে এসে দু'হাত বাড়িয়ে একেবারে বুকে টেনে নিলো ফুলমুকে। জড়িয়ে ধরলো, যেন নিবিড় আলিঙ্গন দিয়ে মুহূর্তে মুছে নিতে চাইলো ফুলমুর সকল গ্লানি, সমস্ত যন্ত্রণা।

ফুলমুর বাধা দেয়া ধীরে ধীরে শান্ত হ'য়ে গেলো, পর্দার বুকে মুখে চেপে ও কাঁদতে লাগলো নিঃশব্দে।

পর্দা বললো, "এই ফুলমু, আর কেঁদোনা। একটা খবর শোন, কাল আমাদের সাদী হবে।"

কান্না সিলে চমকে মুখ তুললো ফুলমু, "না তা হয়না সর্দার, তা হবে না। চাষার সর্দার তুমি, তোমার কত নাম, কত মান,—আমি তা নষ্ট হ'তে দেবোনা—"

পর্দা আরো গাঢ় আকর্ষণ করলো ফুলমুকে, "ওস্ সাধু বলেছেন, ভগবান তোমার ভেতর এত ঐশ্বর্য দিয়েছেন, তোমাকে কেউ নষ্ট করতে পারবে না। আমাদের বিয়ে দেবেন সাধুবাবা নিজে।"

হেসে-কেঁদে ফুলমু পর্দার কণ্ঠলগ্ন হলো। কিছুক্ষণ ওর ফোঁপানী শোনা গেলো শুধু। শান্ত হ'য়ে আস্তে আস্তে বললো, "সর্দার। বানজদায় চান ক'রে, বাবা বৈজনাথকে দর্শন ক'রে, তারপর আমরা ঘর বাঁধবো।"

"আচ্ছা, তাই হবে। কিন্তু ফুলমু—" পর্দা সুন্দর হাসলো।

"আমারও কিন্তু একটা নাম আছে—"

ফুলমু পর্দার বুক থেকে মুখ তুললো। ওর গোলাপী ঠোঁটদুটি স্ফুরিত হলো একটু, "পর্দা—। পর্দা! পরমরাজ!"

পর্দা দুহাত দিয়ে ফুলমুর শঙ্খের মত গ্রীবা তুলে ধরলো। যেন একটা আশ্চর্য পুলক এসে ফুলমুকে আস্তে ছুঁলো। তারপর পুলকের বন্যায় ভেসে গেলো, ডুবে গেলো ফুলমু।

পর্দা উঁচু দেওয়াল টপকে বাঙলোর ভেতর ঢুকছিলো। নেপাতুর লালসাহেবকে পেছন থেকে অতর্কিতে শক্ত হাতে বেঁধে ফেলেছিলো। সতর্ক হবার এতটুকু সময় দেয়নি। ঘরে চিমনী জ্বলছিলো। বড় বড় করলার চাঙড়া তাতে ভ'রে দিয়ে, ও ভেতরে গিয়েছিলো ফুলমুর খোঁজে। হারামী সাহেবটাকে একটু একটু ক'রে পুড়িয়ে মারবে ফুলমুর চোখের সামনে। চিমনীতে আগুন দেখেই, এ ইচ্ছেটা পর্দার হ'য়েছে।

সাহেব মরবে ধাপাধাপি ক'রে, আর ওরা পৈশাচিক উল্লাসে হাস্যহাসি ক'রে অস্থির হবে।

পর্দাকে দেখামাত্রই, অসহায়ী লাম্পট্য ভেবে, আতঙ্কিত, নেশায় অপ্রকৃতিস্থ লালসাহেব ভয়ে

কুঁচকে এতটুকু হ'য়ে গেছে। ঘড়ি দিয়ে বাঁধার সময়, তার কাছ থেকে তাই ক্ষীণতম প্রতিবাদও আসেনি। মুহূর্তে একটা ঠক্-ঠক্ কাঁপুনী লালসাহেবের শিরদাঁড়া বেয়ে, শরীরের সমস্ত শিরাতে স্নায়ুতে ছেয়ে গেছে। সাহেব হলেও ভূত-ভীতি ওদের সকলেরই আছে ?

বিশেষ ক'রে বাঙ্গলার এবং তার আশপাশ জায়গাগুলিতে অমাটি-বংদার বহু ভূতের গল্প প্রচলিত।

সাহেবের পকেট থেকে রুমালটা টেনে নিয়ে পর্দা যখন তার মুখ বাঁধতে গেলো, দেখলো,—এই ক'টি মুহূর্তেই, কড়ু লালসাহেব একেবারে গ্রাজ। গোল-গোল মুখটা সাদা হ'য়ে, লম্বা হ'য়ে ঝুলে পড়েছে। চোখের তারায় মৃত্যুর ছায়া। চোখের বাদামী মণিদুটো যেন চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে। যেন অস্থি-মজ্জা সমস্ত ভেদ ক'রে মৃত্যুর হিম-শীতল স্পর্শ হৃৎপিণ্ডে গিয়ে পৌঁছেছে লালসাহেবের।

রুমালটা মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে, হা-হা ক'রে অট্ট হেসে, মুঠিতে ছোরাটা তুলে নিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে গেলো পর্দা।

আলিংগন মুক্ত হ'য়ে, বাবা বৈজনাথকে স্মরণ ক'রে হাতজোড় ক'রে ফুলমু প্রণাম জানালো,—অপরাধ নিয়োনা দেওতা, অপরাধ নিয়ো না। ওগো দেওতা, তোমরা আমার জীবন থেকে ভয়ানক অভিশাপের ছবিটা মুছে দাও···। ফুলমু নতজানু হলো তারপর।

পর্দাও নতজানু হলো। মেজেতে মাথা ঠেকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করলো বাবা বৈজনাথকে, বাবা কৈলাশ বজীরকে।

প্রণাম ক'রে ফুলমু আর পর্দা যখন মাথা তুললো, তখন ওদের চোখমুখের চেহারা একেবারে সহজ সুন্দর স্বাভাবিক। সংশয়ের কোনো কিটে কুয়াশাও ওদের মনের ধারে পাশে কোথাও নেই। সমস্ত জটিল হিসাব-নিকাশের সমাধান হ'য়ে গেছে। পর্দার মনে হলো, যেন যাদুমন্ত্রে ওর মনের মেঘ কেটে গেলো ; সেখানে আলো, আনন্দ আর তৃপ্তি।

ফুলমু অনুভব করলো, সেই সাধু মহারাজের ঝুলি ধোওয়া জল ওর মাথায় এসে পড়লো যেন ; ওর শরীরের কালো, মনের কালো সব যেন ধুয়ে মুছে গেলো।

ফুলমুর হাত ধরে পর্দা যখন উঠে দাঁড়ালো, তখনকার পর্দা আর একঘণ্টা আগেকার পর্দা, একেবারে আলাদা লোক। হিংস্র-লালসের উদ্ধত ভয়ংকর ফণাটা বিঁড়ে থাকিয়ে থাকিয়ে কেমন ক'রে যেন শান্ত হ'য়ে গেছে, ছোবল আর মারলোনা দুশমনটাকে।

ঘর থেকে বার হবার মুখে, ঘরের কোণায় প'ড়ে থাকা ছোরাটার দিকে পর্দার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো ফুলমু, "ওটা নেবেনা পর্দা ?"

পর্দা নিচু হ'য়ে, ছোরাটা তুলতে গিয়ে, ওর তীক্ষ্ণ-ধারের দিকে তাকালো একটু, ওস্ সাধুর বাণী মনে পড়লো,

: বাপুজীর মন্ত্র ভুলোনা—।

আবার সোজা হ'য়ে পর্দা মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়ালো, ফুলমুর দিকে তাকিয়ে হাসলো, "ফুলমু! সর্দার পরমরাজের জীবনে ওর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।"

তারপর, বৃষ্টি-ধোয়া রাত্রিতে, বাঙ্গলার পথে—হাত ধরাধরি ক'রে মিলিয়ে গেলো সর্দার পর্দা আর চম্বিয়ালী ফুলমু।

He who would understand the real spirit of literature should not select authors of any one period alone, but rather go to the fountain head, and trace the little rill as it courses along down the ages broadening and deepening into the great ocean of thought which the men of the present are exploring.

—*Garfield.*

সাহিত্য ও সাহিত্যিক

লরেন্স ডুরেল

সুকুমার ঘোষ

যে-কালে 'অর্থের জন্য লেখা' গর্হিত কর্ম বলে বিবেচিত হয়ে থাকে, সাহিত্যের নন্দন কাননে পরমার্থের তাগিদে অনন্তকর্মা হয়ে শিল্পের সাধনাই শুধীশ্রেষ্ঠের লক্ষণলক্ষণ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে, সে-কালে যখন লরেন্স ডুরেলকে দেখি তখন বিস্মিত হতে হয়। গত দশকের ইউরোপীয় সাহিত্যের অন্যতম সফল কীর্তি, 'আলেকজান্দ্রিয়া কোয়ার্টেট' লেখা হয়েছিল অবিশ্বাস্য দ্রুততায়। এবং একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে আর্থিক প্রয়োজনের তাগিদ ছিল ডুরেলের প্রাথমিক প্রেরণা। সাত বছরের কম সময়ের মধ্যে ডুরেল 'আলেকজান্দ্রিয়া কোয়ার্টেট'-এর প্রথম খণ্ড 'জাসটিন' আর ভ্রমণ-কাহিনী 'বিটার-লেমনস'-এর পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ করেন। 'কোয়ার্টেট'-এর অবশিষ্ট তিন খণ্ডের 'ব্লু প্রিন্ট' তখন চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে। পরবর্তী বছরে ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে 'বালথাজার' 'মাউন্ট অলিভ' কোয়ার্টেট-এর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। 'ক্লি' প্রকাশিত হয় প্যারীতে। প্রায় দু বছর পর।

লরেন্স ডুরেল

এই লরেন্স ডুরেল। অবিশ্বাস্য দ্রুততা, অবিসম্বাদিত শিল্প কৃতিত্ব এবং ভাষার দক্ষ প্রয়োগে গত দশকের ইংরাজি সাহিত্যের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'ব্ল্যাক বুক'। এই উপন্যাস পাঠে টি, এস, এলিঅট ভবিষ্যৎ ইংরাজি সাহিত্যের প্রতি আস্থা প্রকাশ করেছিলেন।

লরেন্স ডুরেলের জন্ম হয়েছিল দার্জিলিং-এর এক আইরিশ পরিবারে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারী। শিক্ষা-দীক্ষা দার্জিলিংয়ের কলেজ অব সেন্ট জোসেপ এবং সেন্ট এডমণ্ডস্ স্কুল, ক্যানটারবেরি। লরেন্স ভবিষ্যতে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগদান করবেন পরিবারের এই ইচ্ছা সফল হয় নি।

জীবিকা নির্বাহের তাগিদে শুরুতে লণ্ডনে নানা রকমের বৃত্তি গ্রহণ করেছেন। প্রথমা স্ত্রী জ্যালীকে বিবাহ করেন ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ডুরেল ছিলেন কর্ফুতে। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে, পরের দু বছর লণ্ডন শহরে। ডুরেল এবং হেনরি মিলার-এর বন্ধুত্ব বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসের এক অত্যুজ্জ্বল অধ্যায়। হেনরি মিলার-এর সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় প্যারিসে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'দি ব্ল্যাক বুক' প্রকাশিত হল প্যারিসে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের যখন শুরু ডুরেল তখন এথেন্সে ইংরেজি ভাষার শিক্ষক হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করছেন। যুদ্ধ শুরুর পর জার্মানদের হাত থেকে কোনক্রমে পালিয়ে এলেন জেলেদের নৌকা করে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে। করেন সার্ভিসে যোগ দিয়ে তারপর কায়রো, বেলগ্রেড প্রভৃতি স্থানে তাঁর দিন অতিবাহিত হয়। যে বিপুল বিস্তৃত পটভূমি তাঁর সাহিত্যকে মহিমান্বিত করেছে, ডুরেলের কর্মজীবন হল তার উৎস। ডুরেলের কতটুকুই বা ইংরেজিয়ানা। তাঁর জন্ম হয়েছিল ভারতবর্ষের মুকুটমণি হিমালয়ে অবস্থানরত এক আইরিশ পরিবারে। তুষারশুভ্র সেই মহাশ্বেত আত্মাকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। কর্মজীবনে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছেন। নীলনদের নীল তাঁর সাহিত্যকে বর্ণবহুল করেছে। এথেন্সে থাকাকালীন মহান গ্রীসীয় সভ্যতার আকাশস্পর্শী দম্ভ এবং তাঁর মর্মস্পর্শী পরিণতি তাঁর সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। তাই ডুরেলের সাহিত্য কোন দেশের নয়, কোন জাতির নয়, এবং সম্ভবত কোন কালেরও নয়, নয় তা কালচিহ্নিত। এক অত্যুগ্র আবেগ তার আত্মাকে অস্থির করেছে, আর আত্ম-জিজ্ঞাসার অস্থিরতা নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন, লণ্ডন, প্যারিস, এথেন্স, বেলগ্রেড, কায়রোর পথে-প্রান্তরে।

'আলেকজান্দ্রিয়া কোয়ার্টেট' সম্পর্কে ডুরেল হেনরি মিলারকে লিখেছিলেন, 'আলেকজান্দ্রিয়া সম্পর্কে আমার বইটির কাজ এগিয়ে চলেছে। যথার্থ অর্থে একটির পর একটি লাইন তৈরি করে চলেছি। এক সপ্তাহে প্রায় ১৫০০টি শব্দের ফসল সংগ্রহ হয়েছে। নিজেকে মনে হয় পানীয় জল শোধনের যন্ত্রটির মতো। একের পর এক একটি বিন্দু জলের মতো শব্দের পর শব্দ চুঁইয়ে চুঁইয়ে বেরিয়ে আসছে।...

১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দ—'জাসটিন' বেরিয়েছে। প্রচণ্ড অর্থকষ্টের মধ্যে লরেন্স ডুরেলের সময় কাটছে; মিলার ডুরেলের চিঠিতে এই সময় ডুরেলের অর্থনৈতিক অবস্থার খবর চোখে পড়ে। 'বাসবাজার' প্রকাশিত হবার পর হেনরি মিলার লিখলেন, 'তুমি সিদ্ধী জীবনের চূড়ান্ত দক্ষতায় পৌঁছেছ।'

'আলেকজান্দ্রিয়া কোয়ার্টেট'-এর জন্মমুহূর্তের পটভূমিকা ছিল নিরবচ্ছিন্ন যন্ত্রণায় বিপুল বিস্তৃত। লণ্ডনের 'ফেবার এণ্ড ফেবার' প্রকাশ করলেন জাসটিন। ডুরেলের ভাগ্য তখন সুপ্রসন্ন। আমেরিকান প্রকাশক ডাটন 'জাসটিন'-এর আমেরিকান সংস্করণ প্রকাশ করলেন। হেনরিকে চিঠিতে সে কথা জানিয়ে লিখলেন, '...its a ray of light under the door.....'।

১৯৫৭-র ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় 'আলেকজান্দ্রিয়া কোয়ার্টেট'-এর প্রথম খণ্ড 'জাসটিন' এবং তারপর ঐ একই মাসে প্রকাশিত হয় 'বিটার লেমনস'। বহুজন আকাঙ্ক্ষিত 'ডাক কুপার প্রাইজ' পায় এই গ্রন্থটি। বস্তুত এই সময় থেকেই ডুরেল সাফল্যের রাজপথে এসে দাঁড়ালেন। 'জাসটিন' পাঠান্তে হেনরি মিলার লিখলেন, 'I'll say this, there is nothing like this *Justine* in all English literature—what I know of it, at any rate'।

কর্মব্যপদেশে ডুরেল ইজিপ্ট, রোডস, জেরুসালেম, গ্রীস, যুগোস্লাভিয়া, আর্মেনিয়া, তুর্কিস্তান, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি জায়গায় পরিভ্রমণ করেছেন। দেশে দেশে শুধুমাত্র পর্যটকের মামুলি পর্যবেক্ষণ অথবা শুধু মাত্র আবিষ্কারকের কৌতূহল নিয়ে তিনি ঘোরেন নি। তিনি এদের অন্তরঙ্গ মমতায় দেখেছেন। বুঝেছেন। তাই তাঁর সাহিত্যে এদের প্রকাশ এত জীবন্ত, এত বর্ণবৈচিত্র্যে উজ্জ্বল।

ডুরেলের শ্রেষ্ঠ রচনা 'আলেকজান্দ্রিয়া কোয়ার্টেট'। কোয়ার্টেট-এর পটভূমিকা যেমন বিস্তৃত

তেমনি বর্ণবহুল। একমাত্র 'মাউন্ট অলিভে'র বিস্তৃত পটভূমিকা ছড়িয়ে রয়েছে ইজিপ্ট, রোডস, জেরুসালেম, গ্রীস, ডুরোস্লাভিয়া, আর্জেন্টিনার জনপদে-জনপদে। আর মনে হয় না লেখক দীর্ঘকাল ডুরেল বিদেশী নিবাসক। মমতায়, সাদৃশ্যাতীত আত্মীয়তার গ্রাম, নগর, জনপদ, আঙুরক্ষেত, জলপাইকুঞ্জে-শোভিত বনপথ পাঠকের সঙ্গে অন্তরঙ্গতায় মিশে যায়। ডুরেলের চল্লিশ বছর বয়সে প্রকাশিত হয় 'মাউন্ট অলিভ'। এর আগে পর্যন্ত তাঁর জীবনের পর্বে পর্বে এসেছে ব্যর্থতা, বিপর্যয় আর হতাশা।

'আলেকজান্দ্রিয়া কোয়ার্টেট' প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকান, ফরাসী এবং জার্মান প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করে। 'বিটার লেমনস' সাইপ্রাসের উপর প্রথা রচনাধর্মী ভ্রমণ কাহিনী। শুধুমাত্র ভ্রমণ কাহিনী বললেই এর সম্পর্কে যথেষ্ট বলা হবে না। তৎকালীন সাইপ্রাসের রাজনৈতিক পটভূমিকা বর্তমানে পরিবর্তিত হলেও ডুরেলের 'বিটার-লেমনস' বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে অন্যতম সকল কীর্তি রূপে চিহ্নিত হয়েছে। ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী সাইপ্রাস তার ভৌগোলিকতার গণ্ডী ছাড়িয়ে অমরত্ব প্রাপ্ত হয়েছে সাহিত্যের স্বর্গলোকে।

'আলেকজান্দ্রিয়া কোয়ার্টেট'-এর প্রধান চরিত্র রক্ত মাংসের মানুষ নয়, সে নগরটী ডুরেলের 'শহর আলেকজান্দ্রিয়া'। অর্কেস্ট্রার সুরসংগতিতে, চরিত্রের মিছিলে, জীবনের বর্ণোজ্জ্বল চিত্রময় প্রকাশে শহর আলেকজান্দ্রিয়া রূপময় অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে অমরত্ব লাভ করেছে।

কবির সৃষ্টি যদি সত্য হ'য়ে থাকে, সেই সত্যের গৌরব সৃষ্টির নিজেরই মধ্যে, দশজনের সম্মতির মধ্যে নয়। দশজনে তাকে স্বীকার করেনি, এমন প্রায়ই ঘটে থাকে। তাতে বাজার দরের ক্ষতি হয় কিন্তু সত্যমূল্যের ক্ষতি হয় না।

ফুল ফুটেছে এইটেই ফুলের চরম কথা। যার ভালো লাগল সেই জিৎল, ফুলের জিৎ তার আপন আবির্ভাবেই। ফুলের অন্তরে আছে একটি রসময় রহস্যময় আনন্দের অতীত সত্য, আমাদের অন্তরেরই সঙ্গে তার অনির্বচনীয় সম্পর্ক। তার সম্পর্কে আমাদের আত্মচেতনা হয় মধুর, গভীর, উজ্জ্বল। আমাদের ভিতরের মানুষ বেড়ে ওঠে, রাঙিয়ে ওঠে, রসিয়ে ওঠে। আমাদের সত্তা যেন তার সঙ্গে রঙে রসে মিশে যায়—একেই বলে অনুরাগ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাহিত্য-সংবাদ

সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠপোষকতা ঃ

পবিত্র পাল

সাহিত্য একাডেমী থেকে কৃষ্ণ কৃপালনী সাময়িক পত্রগুলোর কাছে আবেদন জানিয়েছেন, আপৎকালীন অবস্থার জন্য একাডেমীর খরচা কমাতে হয়েছে। সুতরাং পত্র পত্রিকার পরিচালকবর্গ যদি দয়া করে বিনামূল্যে একাডেমীতে কাগজ পাঠান তবে তিনি বাধিত হবেন। কথাটা ভাববার কথা।

কৃষ্ণ কৃপালনীরা ফতোয়া জারী করেই খালাস। এখন আবার ফতোয়া সহজে জারী করার একটি সহজ কারণ তৈরী হয়েছে, তা হ'ল এমার্জেন্সী। কিন্তু এ সমস্ত পত্র পত্রিকার পরিচালকবর্গের ফরিয়াদ কে শুনবে? ফরিয়াদ কি কম? একটা দুটো? অনেক।

বাংলাদেশের কথাই ধরা যাক। এখানে পাঁচমিশেলি জনপ্রিয় কাগজগুলোর পাশাপাশি বেশ কিছু কাগজ আছে যারা জনপ্রিয়তার সস্তা রাস্তা এড়িয়ে বিক্রীর কথা বিশেষ না ভেবে নূতন নূতন পরীক্ষা চালিয়ে যেতে চান। কেউ বা শুধু প্রবন্ধের কাগজ চালিয়ে যান, কেউ বা শুধু রাজনীতি বিষয় নিয়ে, কেউ বা শুধু চলচ্চিত্রের, কেউ চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজ বের করেন। এগুলোর মধ্যে মননশীলতার ছাপ স্পষ্ট। শুনেছি, এখনো অনেকেই গর্ব করে বেড়ান, বাংলাদেশ মননশীলতার জন্য বিখ্যাত।

কিন্তু মননশীলতা নিয়ে গর্ব করে বেড়ানোর মধ্যে বাইরের রঙটা যত বেশি প্রকট, অন্তরের ঐশ্বর্য সে পরিমাণ অটুট বা অপরিহার্য। কেননা, মননশীলতা যেহেতু আকাশ থেকে পড়ে না এবং যেহেতু উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত ব্যক্তিদের মননশীলতা আছে বলে আমরা কেতাবী কায়দায় ধরে নিই, সেহেতু আমরা নিশ্চয়ই ভাবতে পারি, প্রবন্ধ বিষয়ক পত্রিকাগুলোর বা কবিতাবিষয়ক পত্রিকাগুলোর বা পাঁচমিশেলি নয় এমন ধরণের কাগজগুলোর বাংলাদেশের সব কটা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলো কিনবেন বাধ্যতামূলকভাবে বা নীতিগতভাবে। তারপর ধরুন অধ্যাপকরা যদি সবাই নাও কিনেন অন্ততঃ শতকরা দশজন কিনবেন, এটা আমরা আশা করতে পারি। তারপর বিভিন্ন বিষয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট ছাত্রছাত্রীরাও কিছু কিনবেন ধরতে পারি। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অন্ততঃ পাঁচজন কিনবেন এটাও নিশ্চয়ই অন্যায় আশা নয়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় দেখা যায়, এগুলোর কোনটাই বাস্তবে দেখা যায় না। মেক বিজ্ঞাপনের সাহায্যে কাগজ কোন রকমে চলে যায়। যেন সম্পাদকেরই দায় পড়েছে দেশহিতসাধনের কাজ করা। অথচ কৃষ্ণ কৃপালনীরা বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণে এত পেছিয়ে থাকেন কেন বুঝতে পারছি নে।

আপৎকালীন অবস্থা থেকে সৃষ্ট ও কতকগুলি অবস্থার চাপে পত্রিকাগুলোর কী দশা হতে পারে বা হয়েছে, সে খোঁজ তাঁরা রাখেন না। যদি নাই রাখেন, তবে সাহিত্য একাডেমীকে দৌহিত্র ভাবে বাঁচিয়ে রাখার অর্থই বা কি?

কৃষ্ণ কৃপালনী কি জানেন না, সরকারী বিজ্ঞাপন কী পরিমাণ কমে গিয়েছে? শুধু তাই না প্রতিরক্ষা তহবিলে টাকা দানের ফলে বেসরকারী বিজ্ঞাপন-ও কি পরিমাণ কমে গিয়েছে।

ফলে বাংলাদেশের কোন কোন দৈনিক পরিচালকের হাতে থেকেও কোন কোন কাগজের দুসংখ্যা এক সঙ্গে বেরুচ্ছে। এটাও কি আপৎকালীন অবস্থার সঙ্গে তুলনীয় নয়? সাহিত্য সংস্কৃতির আপৎকালীন অবস্থা সাহিত্য একাডেমী রোধ না করলে কে করবে? কিন্তু দেখছি ব্যাপারটা উল্টো রয়েছে। তাহলে কি ধরে নোব, প্রতিরোধ ব্যবস্থার খাতিরে আর সবই অপাংক্তেয় হোক এটাই তাঁরা চান? কৃষ্ণ কৃপালনীকে এ সংকট সম্পর্কে ভাবতে বলছি। বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করে সাময়িক পত্রের সংকট রোধ করবেন সাহিত্য একাডেমী, এটাই বর্তমান মুহূর্তে একাডেমীর বড় কাজ।

সবশেষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে বিনীত নিবেদন, তাঁরাও যেন নবসৃষ্ট এ অবস্থার প্রতি নজর দেন। এ সমস্ত পত্রিকাগুলো থেকে ছাত্রছাত্রীরা, অধ্যাপকেরা, শিক্ষকরা অনেক বেশি উপকৃত হন। পাঁচমিশেলি রাখুন ক্ষতি নেই। কিন্তু নীতিগতভাবে এগুলোকেও বিচুন তাঁরা। এগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যাপারে তাঁদের অনেক দায়িত্ব আছে। পাঁচমিশেলির পৃষ্ঠপোষকতা করবেন এবং করেন, এমন গ্রাহক বহু আছেন। কিন্তু এঁদের পৃষ্ঠপোষক বড় একটা মেলে না।

এ জিনিষগুলোর দিকে অক্লান্ত পরিশ্রমে অনগ্রিসরতার সঙ্গে রাস্তা এড়িয়ে নিঃশব্দে যাঁরা তিল তিল করে ক্ষয়ে গিয়ে এ সমস্ত বিশিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত সাময়িকপত্র সম্পাদনা করে যাচ্ছেন, তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা যেদিন বাংলাদেশ ব্যাপকভাবে করতে পারবেন, সেদিন ধরে নোব বাংলাদেশ মননশীলতায় জন্য বিখ্যাত। মননশীলতা কথায় প্রকাশ পায় না শুধু, কর্মে ও কথায় আত্মীয়তা অর্জন করলেই সেটা প্রকাশ পায়। সাময়িক পত্রের এ আর্ত চীৎকার সে সমস্ত 'মননশীল' ভদ্রলোকদের হৃদয়ে কোন ঢেউ তুলবে কি? এদের ফরিয়াদ টেনাশিকতার ধ্বজাধারীরা শুনবে না, আপনারা 'মননশীলরাই' যদি শুনেন তবে এঁরা সম্পাদকেরা সান্ত্বনা পাবেন।

"অনেকদিন থেকেই লিখে আসছি-জীবনের নানা পর্বে, নানা অবস্থায়। সুরু করেছি কাঁচা বয়সে—তখনো নিজেকে বুঝিনি তাই আমার লেখার মধ্যে বাহুল্য এবং বর্জনীয় জিনিষ ভূরি ভূরি আছে তাতে সন্দেহ নেই। এ সমস্ত বাদ দিয়ে যা থাকে আশাকরি তার মধ্যে এই ঘোষণাটি স্পষ্ট যে, আমি ভালোবেসেছি এই জগৎকে, প্রণাম করেছি মহৎকে, আমি কামনা করেছি মুক্তিকে, যে মুক্তি পরম পুরুষের কাছে আত্মনিবেদনে, আমি বিশ্বাস করেছি যে মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে, যিনি সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই প্রথম

বিপ্রলব্ধ

শঙ্করী গঙ্গোপাধ্যায়

চণ্ডীমণ্ডপের দাবার আসর যখন সরগরম হয়ে উঠেছে, ঠিক সেই সময়ে গ্রামের বনমালী পিওন এসে ব্রজবিহারীবাবুকে একখানি চিঠি দিল।

খেলার ছক থেকে মুখটা তুলে ব্রজবিহারী হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিলেন, পকেট হাতড়ে বার করলেন নিকেল ফ্রেমের চশমাটা।

মুকুন্দ বললে, কার চিঠি, খুড়ো?

চিঠিটা খুলে ততক্ষণে পড়তে শুরু করেছেন ব্রজবিহারী, মুখখানি খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ঠোঁটের কোণায় দেখা দিল প্রশান্ত হাসি: প্রবীরের চিঠি মুকুন্দ।

যারা বসে খেলছিল, অর্থাৎ মুকুন্দ, অবিনাশ, বিজপদ একসঙ্গে সমস্বরে বলে উঠলো, তাই নাকি—তাই নাকি, কি লিখেছে খুড়ো পড়ে শোনাও তো?

ব্রজবিহারী বললেন, বেশী কিছু লেখেনি, শুধু লিখেছে সে দিল্লী থেকে বদলী হয়ে কলকাতায় এসেছে এবং আসবার আগে সে বিয়েটাও ওখানে সেরে এসেছে সিভিল-ম্যারেজে। হঠাৎ বিয়েটা হয়ে যাওয়ায় আমাকে জানাতে পারেনি বলে দুঃখ প্রকাশ করেছে।

অবিনাশ চোখ দু'টো বড় বড় করে বললে, এ কেমন কথা খুড়ো, আমাদের গাঁয়ের ভট্টাচার্য বামুনের ছেলে হয়ে প্রবীর সিভিল-ম্যারেজে বিয়ে করলো—অত করে লেখাপড়া শেখার এই কি ফল! প্রবীর আমাদের গাঁয়ের একটি রত্ন, ওর জন্যে আমরা সবাই গর্ব বোধ করি। আর সেই কিনা—

মুকুন্দ বাধা দিল: তোমার যত গোঁড়ামি অবিনাশ, সে গাঁয়ের ছেলে বলে চিরকাল কি গেঁয়ো হয়ে থাকবে—সহরের শিক্ষা-দীক্ষা পেয়েছে, কাজেই সহরে তো সে হবেই। সহরের হাওয়াই হয়েছে আজকাল নিজের পছন্দমত মেয়েকে শাস্ত্রীয় বিধানে বিয়ে না করে আইনের মাধ্যমে বিয়ে করা। তা এতে অন্যায়টা কি দেখলে—তোমাদের পুরুতগিরিটা দেশ থেকে উঠে যাচ্ছে বলে হয়তো আফশোষ একটু হতে পারে। সরকার যেখানে আইন করেছেন—সেখানে তোমাদের টিকি নাড়াটি আর চলবে না। তারপর ব্রজবিহারীর পানে তাকিয়ে মুকুন্দ বললে, কোন আফশোষ কোর না খুড়ো, প্রবীর তোমার ছেলে, সে যদি সুখী হয়ে থাকে তাতে তোমারও আনন্দিত হওয়া উচিত। সে আজ কত বড় হয়েছে, কত গণ্যমান্য হয়েছে, তার চিন্তাধারার সঙ্গে আমাদের সংকীর্ণ চিন্তাধারা হয়তো নাও মিলতে পারে।

তাকে টান দিতে দিতে বিজপদ বললে, একশোবার, একশোবার—আমাদের কাল তো

শেষ হয়ে এলো খুড়ো, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন নিয়ম-নীতিগুলোরও শেষ হবে। দেশে নতুন হাওয়া বইতে শুরু হয়েছে, আমাদের গাঁও আর এমনটি থাকবে না—নতুন হাওয়ার ঝাপ্‌টা এসে এখানেও লাগবে। হাঁ প্রবীর আর কিছু লেখেনি, খুড়ো ?

চিঠিখানা হাতে ধরে একটু অন্যমনস্ক হয়ে বসেছিলেন ব্রজবিহারী। দিনকাল বদলে যাচ্ছে। সহরে হাওয়ার ঝাপ্‌টা এসে একদিন গাঁয়েও লাগবে। সে হাওয়ার প্রথম ঝলক বোধহয় এই প্রবীর। ভট্টাচার্য পরিবারের নিয়ম-নীতির সেই আজ প্রথম ব্যতিক্রম ঘটালো। এমনি করে বদলে গেল প্রবীর ? তবে তাকে উচ্চশিক্ষা দিয়ে কি ভুল করলেন ব্রজবিহারী ?

দ্বিজপদ আবার বললে, আর কিছু লেখেনি খুড়ো ?

চমক ভাঙলো ব্রজবিহারীর, চিঠিটা আবার দেখলেন, তারপর চোখ দুটি তুলে উদাস ভঙ্গিতে বললেন, আমায় ওর কলকাতায় বাসায় গিয়ে থাকবার জন্য অনুরোধ করেছে। সেখানে আমার কোন অসুবিধা হবে না।

যাও খুড়ো, যাও। বুড়ো বয়সে একলাটি আর মাটির কুঁড়ে আঁকড়ে পড়ে থাকবে কেন ? ছেলেকে মানুষের মত মানুষ করেছো—এ বয়সে একটু সুখ ভোগ করে নাও। ও কপাল তো আর আমরা করিনি, অতগুলো অপগণ্ড সন্তানের বাপ হয়েছি—দুঃখ আমাদের চিরসাথী হয়েই থাকবে। —দ্বিজপদ করুণ চোখে তাকিয়ে বললে।

যাবো বলছো ?

হ্যাঁ, নিশ্চয় যাবে—প্রবীর তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছে।

সারারাত্রি একলাটি শুয়ে ব্রজবিহারী অনেক কিছুই আপন মনে ভাবলেন। দ্বিজপদ ঠিকই বলেছে, কিসের মায়ায় আর এই কুটির আঁকড়ে পড়ে থাকবেন। সকলেই তো গেছে, আছে শুধু সংবেদন নীলমণি প্রবীর। বাকী জীবনটা তার কাছেই কাটিয়ে দেবেন।

ভোরের গাড়ীতেই তিনি কলকাতা যাত্রা করলেন।

কতদিন পরে তিনি কলকাতায় চলেছেন ? হ্যাঁ, তা বছর পাঁচেক পরে তো বটেই। এই পাঁচটি বছর তিনি প্রবীরের কাছ থেকে ছাড়াছাড়ি হয়ে আছেন।

কিন্তু তার আগে ?

গাড়ির দ্রুত গতির সঙ্গে সঙ্গে মনের চিন্তার গতিও বেড়ে চলেছে। ভাবছেন ব্রজবিহারী, অনেক কথাই ভাবছেন। মনে পড়ছে সেই মাতৃহারা পাঁচ বছরের শিশু প্রবীরকে। তার মা যখন হঠাৎ কয়েকদিনের অসুখে মারা গেলেন, সেই থেকে তিনি প্রবীরকে নিজের অন্তরের সমস্ত স্নেহ মমতা উজাড় করে ঢেলে দিয়ে লালন পালন করেছিলেন। আত্মীয় স্বজনেরা পুনরায় বিবাহের প্রস্তাব করেছিল, কিন্তু ব্রজবিহারী রাজী হননি। তখন তাঁর দেশের সঙ্গে বিশেষ সংযোগ ছিল না, থাকতেন কলকাতায়। কলকাতায় নিমতলাঘাটের এক কাঠের গোলায় চাকরী করতেন ; সেইখানেই প্রবীরকে নিয়ে এসেছিলেন। তারপর ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে অল্পে অল্পে প্রবীর বড় হোল, একে একে স্কুল কলেজের বাধা পেরিয়ে এম-এ-টাও পাশ করলো। আনন্দে গর্বে বুকখানা দশহাত হয়ে ফুলে উঠেছিল ব্রজবিহারীর—যে বংশে এন্ট্রান্সের বিদ্যে কারো ছিল না, সেই বংশের ছেলেকে তিনি এম-এ পাশ করিয়েছেন। জীবনে একটা অসাধ্য সাধন করলেন বৈকি।

আর প্রবীরও ছিল বাপের অনুগত সন্তান। কলকাতার সহরে বাস করে উচ্চশিক্ষা পেয়েও সে অতিরিক্ত মাত্রায় আধুনিক সহরে ছেলে হয়ে ওঠেনি। ভট্টাচার্য পরিবারের নিয়ম নিষ্ঠা ধর্মপ্রবণতা তার মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বজায় ছিল। মনে মনে ভীষণ খুশী ছিলেন ব্রজবিহারী—এমন পুত্র-রত্ন পাওয়া ভাগ্যের কথা।

তারপরেই হোল দু'জনার ছাড়াছাড়ি। অর্থাৎ প্রবীর নতুন চাকরী পেয়ে চলে গেল দিল্লী, আর ব্রজবিহারী কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে গেলেন দেশে। আর তার কাজের প্রয়োজন কি, ছেলেকে মানুষ করে দিয়েছেন, এবার থেকে বাপের ভার ছেলের। বাকী জীবনটা তিনি দেশের পৈতৃক ভিটায় বসে সাধন ভজন করে কাটাবেন।

এরপর দীর্ঘ পাঁচটা বছর কেটে গেছে।

দিল্লীতে গিয়ে প্রথম দিকে প্রবীর পুত্রের কর্তব্য ঠিকই পালন করেছিল, নিয়মিত চিঠিপত্র দিয়ে খোঁজ নেওয়া, সামান্য কিছু করে টাকা পাঠানো। তারপর বছরের শেষের দিকে একবার ছুটিতে এসে দেশে ঘুরেও গিয়েছিল। গ্রামের সমস্ত লোক প্রবীরের কর্তব্যপরায়ণতা দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। ব্রজবিহারীর ভাগ্যকে একটু ঈর্ষাও করেছিল মনে মনে।

কিন্তু ঠিক তার পরের বছর থেকে প্রবীরের আশ্চর্য রকম পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন ব্রজবিহারীবাবু। পিতার প্রতি সে যেন ভীষণ রকম উদাসীন হয়ে পড়েছে। কোনরকম চিঠিপত্র আর দেয় না, টাকাও না। মনে মনে তিনি ভেবেছিলেন, দিল্লীতে খরচপত্র বেশী, হয়তো কুলাতে পারে না—তাই টাকা দেওয়া বন্ধ করেছে। তাতে অবশ্য কিছু এসে যায় না, একা মানুষ, হাতে কিছু টাকাও সঞ্চয় করেছেন, জমিও কিছু আছে। কিন্তু চিঠিপত্র বন্ধ করার কারণটা কি থাকতে পারে? কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি খানকয়েক চিঠি দিয়েছিলেন, অভিমান করে তাতে অনেক কথাই লিখেছিলেন—তা সব অরণ্যে রোদন হয়েছিল। উত্তর আসেনি।

পুত্রের উদাসীনতায় মনে ভীষণ রকম আঘাত পেয়েছিলেন। প্রবীরের এই আচরণে অনেক কটুক্তিও শুনতে হয়েছে প্রতিবেশীদের কাছে। সব মুখ বুজে সহ্য করে তিনি ধীরে ধীরে পাষাণ হয়ে গেছেন। আর তিনি পুত্রের কথা চিন্তা করেন না।

সেই প্রবীরের চিঠি তিনি হাতে পেলেন দীর্ঘ পাঁচটি বছর পরে।

অনেক অভিমানের মেঘ মনে জমেছিল, কিন্তু পুত্রের ঐ একটি চিঠিতে সে মেঘ যে কোথায় অন্তর্হিত হোল তা ব্রজবিহারীবাবু আর ভেবে পেলেন না। পিতার যে চিরন্তন ক্ষমাশীল মন—প্রবীরের সকল ত্রুটিই ক্ষমা করে নিল।

বাড়ীর দরজাতেই দেখা হোল প্রবীরের সঙ্গে ব্রজবিহারীবাবুর। প্রবীর তখন অফিসে বেরুচ্ছিল। ছেলের পানে তাকিয়ে তাঁর অন্তর খুশীতে ভরে উঠলো, কতদিন পরে কি দেখলেন—পাঁচ পাঁচটা বছর পরে। সুন্দর, সুঠাম দেহ, ঝকঝকে স্যুট পরনে, প্রবীর এগিয়ে এলো ব্রজবিহারীবাবুর সামনে।

হ্যালো ড্যাডি, কেমন আছো, ভালো তো? চলো চলো, ওপরে চলো।—বলে, ব্রজবিহারীবাবুর একখানি হাত ধরে টান দিল।

স্তম্ভিত হয়ে গেছেন ব্রজবিহারীবাবু, তিনি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছেন প্রবীরের পানে—একি আমার সেই প্রবীর? না অন্য কেউ? যে প্রবীর দেখা হলে নত হয়ে পায়ের ধুলো মাথায়

ভুলে নিত, যে প্রবীর অল্পভাষী বিনয় নম্র ছিল—সে এই পাঁচ বছরে এতখানি বদলে গেল কি করে?

হাতটা আবার ঝাঁকানি দিয়ে প্রবীর বললে, চলো ড্যাডি, অফিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে। তোমায় উপরে পৌঁছে দিয়ে আসি লিলির কাছে।

আবার একটা চমক্ খেলেন ব্রজবিহারীবাবু, বাপের সামনে পুত্রবধূর নাম ধরে ডাকা! এতখানি স্পর্দ্ধা তাঁর বা তাঁর পূর্বপুরুষদের তো কারো ছিল না। অথচ প্রবীর অসঙ্কোচেই—

এতক্ষণে একটি সুন্দরী তরুণী সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে দরজার সামনে ব্রজবিহারীর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। সাজ পোষাকে অতি আধুনিকা। ব্রজবিহারীবাবুর পানে একবার কটাক্ষে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে তাকিয়ে প্রবীরকে জিজ্ঞাসা করলো, প্রবীর, লোকটি কে?

একটু হেসে প্রবীর বললে, আমার বাবা, লিলি। উপরে নিয়ে যাও।

ব্রজবিহারীবাবুর আপাদমস্তক আর একবার নিরীক্ষণ করে দেখে লিলি বললে, ওঃ, তবি প্রবীর, কিন্তু আমি তো এখন উপরে যাবো না, একবার নিউ মার্কেটে যাবো, মোটরে অফিস যাবার পথে আমায় নামিয়ে দিয়ে যেও।—বলে, সিঁড়ির দিকে মুখ করে: বেয়ারা—বেয়ারা—বলে, ডাকলো সে।

মাথা ঘুরছে ব্রজবিহারীবাবুর এসব দেখে আর শুনে—এই তার ছেলে, এই তাঁর পুত্রবধূ! এদের কাছে তিনি এসেছেন শান্তিতে থাকতে। যা এক মুহূর্ত সহ্য করতে পারছেন না—তা সারাজীবন সহ্য করতে হবে। অসম্ভব! না—না, আর এক মুহূর্ত এখানে নয়—এর চেয়ে তাঁর দেশের বাড়ির কুটিরে অশিক্ষিত প্রতিবেশী নিয়ে বাস করা অনেক শান্তির, অনেক আনন্দের। তাঁর ছেলে প্রবীর আজ পর হয়ে গেছে—যে প্রবীরকে তিনি জানেন তাকে আর কোনদিন ফিরে পাবেন না। বাস করে ছেলের কাছে তিনি আজ বঞ্চিত হয়েছেন।

বেয়ারা এসে দাঁড়িয়েছে। লিলি বললে, বাবুকে উপরে নিয়ে যাও।

মুহূর্তে শক্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে ব্রজবিহারীবাবু প্রবীরের পানে তাকিয়ে বললেন, আমার যে একটু কাজের তাড়া আছে প্রবীর, এখুনি যেতে হবে। উপরে যাওয়া সম্ভব হোল না। তোমরা যাও যে যার কাজে। খুব খুশী হলাম তোমাদের দেখে।

চল্‌তি একটা রিক্সা থামিয়ে তাইতে উঠে বসলেন ব্রজবিহারীবাবু। বললেন, বাবা একটু তাড়াতাড়ি শেয়ালদহ ষ্টেশনে পৌঁছে দে, গাড়ীর বেশী সময় নেই।—চোখ দুটির কোল ছাপিয়ে যে অশ্রু নাম নেমেছিল তা নিঃশব্দে কাঁধের চাদরে মুছে নিলেন।

———

রবীন্দ্রনাথ

• • • আত্মার নিগূঢ় রস ও শোভা, কল্যাণ ও ঐশ্বর্য তোমার সাহিত্যে পূর্ণ বিকশিত হইয়া বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়াছে। তোমার সৃষ্টির সেই বিচিত্র ও অপরূপ আলোকে স্বকীয় চিত্তের গভীর ও সত্য পরিচয়ে কৃতকৃতার্থ হইয়াছি।

হাত পাতিয়া জগতের কাছে আমরা নিয়েছি অনেক, কিন্তু তোমার হাত দিয়া দিয়াছিও অনেক। • • • •

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

রবীন্দ্র জয়ন্তী পরিষদ
কলিকাতা, রবিবার, ১১ই পৌষ, ১৩৩৮ সাল।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রচর্চা

অবনীন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী প্রতিভার এক নূতন প্রকাশ হয় তাঁর বৃদ্ধবয়সে। সারা জীবন সাহিত্যের নানা প্রদেশ উজ্জ্বল ও মহিমান্বিত করে কবির লেখনী কথা সাহিত্যের সীমা অতিক্রম করে আর এক নূতন জগতে চঞ্চল হয়ে উঠল শেষ বয়সে। এই নূতন জগত হ'ল রূপের জগত, রেখাবর্ণের জগত, নিরক্ষরের জগত।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রসৃষ্টির পরিচয় নিতে হলে, পূর্বে রূপশিল্পের গতি প্রকৃতি কি ছিল তার কিছু ধারণা করা আবশ্যক।

মানুষ মানুষের কাছে তার মনের কথা, হৃদয়ের ভাব ও ভাবনা, তার আনন্দ ও বেদনা, নানা চিন্তা ও ভাবনার প্রকাশ করে নানা পথে, নানা বিভিন্ন ভাষার মাধ্যমে। এই প্রকাশ করবার ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও উদ্বেগ সমস্ত জীবের প্রাকৃতিক প্রবৃত্তি ও ধর্ম। কোন কোন বৈজ্ঞানিকের মতে উদ্ভিদের রাজ্যেও এই কথা-বলবার ও সাড়া দেবার একটা শক্তি ও প্রকৃতি আছে। পদ্ম ও সূর্যমুখী ফুল সূর্যের সঙ্গে কথা কয়, কুমুদিনী চন্দ্রের সহিত বাক্যালাপ করে। এইসব কবি-কল্পনার মধ্যেও হয়ত অনেক বৈজ্ঞানিক সত্য আছে নিহিত। নিখিল বিশ্বের সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে একটা চিন্তা-বিনিময়, একটা কথোপকথনের, একটা দেয়া-নেয়ার সম্পর্ক আছে। সৃষ্টিকর্তা জীবের কণ্ঠে দিয়েছেন নানা ধরণের ধ্বনি ও শব্দ, মানুষের কণ্ঠে দিয়েছেন কথার ভাষা। পশু পাখীরা যে ভাব ভাষার শব্দে প্রকাশ করতে পারে না, সে কথা অঙ্গ ভঙ্গীতে, অভিনয় দ্বারা প্রকাশ করে।

সাধারণতঃ, মানুষের সমাজে এই ভাব প্রকাশ ও চিন্তা বিনিময়ের পথ বা ভাষা চার প্রকারের। (১) সাহিত্যের ভাষা, (২) সঙ্গীতের বা সুরের ভাষা, (৩) রূপের ভাষা, (৪) অঙ্গভঙ্গী বা অভিনয়ের ভাষা। প্রথম দুটির পথ, কানে শোনার পথ, স্বরের ও সুরের পথ। তৃতীয় ও চতুর্থটির পথ চোখের পথ, দৃষ্টির পথ। প্রথম দুটি শব্দের ভাষা, শেষের দুটি নিস্তব্ধের ভাষা। এই চারিটি বিভিন্ন ভাষার মধ্যে কিছু কিছু মিলও আছে, আবার অনেক বিষয়ে ভিত্তিগত প্রভেদ ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যও আছে। এই বিশিষ্ট লক্ষণে প্রত্যেক ভাষার একটা নিজস্ব স্বাধীনতা ও স্বারাজ্য আছে। চিন্তা জগতের কথা প্রকাশ করবার সাহিত্যের ভাষার যে একটা প্রকৃতিগত বিশিষ্ট শক্তি আছে, সুরের ভাষার তার অনুরূপ শক্তি নেই। এই হিসেবে সুর, 'বেসুরো' কথার কাছে, সাহিত্যের কাছে এখনও হার মানছে। পক্ষান্তরে মানুষের মনে এমন অনেক ভাবের উদয় হয়, যা সাহিত্যের সাহায্যে, কথার ভাষায় সম্পূর্ণ প্রকাশ করা যায় না। অবশ্য কবিতার ছন্দে, রসাত্মক ও রসাল শব্দের ফাঁদ পেতে ভাবুক ও প্রতিভাশালী কবি মানুষের মনের অনেক সূক্ষ্ম ও সুন্দর ভাব ও রস আবদ্ধ করে বন্দী করতে পারেন। কিন্তু এমন আরও সব বিচিত্র শ্রেণীর ভাব ও রস মানুষের মনের অতলের রহস্যশালা হতে উদ্ভূত হয়, যা অতি বড় কবির ভাষাতেও ধরা দিতে চায় না। এইসব ভাব প্রকাশ করতেই মানুষকে সুরের বা রূপের আশ্রয় নিতে হয়।

সারা জীবন সাহিত্যের ভাষা, কবিতার ভাষা প্রয়োগ করে রবীন্দ্রনাথ যে সব শব্দের অতীত, অনির্বচনীয় নানা নতুন নতুন ভাব প্রকাশ করতে পারেননি, তার প্রকাশের জন্য কবিকে বৃদ্ধ বয়সে

আশ্রয় নিতে হয়েছিলো রূপের ভাষার অনির্বচনীয় এক নতুন ভাষার। সুতরাং তাঁর চিত্র চর্চার প্রধান কারণ হল—সাহিত্যের ভাষার প্রকাশ করবার সীমিত শক্তি। এই স্বীকৃতি রূপের ভাষার অধিকতর প্রকাশ করবার শক্তির স্বীকৃতি। 'কবিতা' যা প্রকাশ করতে পারেনা, 'ছবি তা' তা প্রকাশ করতে পারে। রূপের ভাষার সঙ্গে সুরের ভাষার একটা আপেক্ষিক মিল আছে।

সাতটি স্বর (note) এবং তার অন্তর্গত ১২৮টি শ্রুতি হল সুরশিল্পের অক্ষর। এই অক্ষরের নানা সমষ্টি নিয়ে সুরের শব্দকোষ অভিধান। চিত্রশিল্পের ভাষাতেও সাতটি সুরের অনুরূপ সাতটি মূল বর্ণ আছে। যথা—বেগুনী, হুঁতে, নীল, সবুজ, হরিদ্রা, কমলা এবং লালবর্ণ। এই সাত রঙের যে-কোনও দুটি রঙের মধ্যে সুরের শ্রুতির মতন আরও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নানা রঙের বিভিন্ন ওজনের 'রেশ' বা বর্ণাভাস আছে। এইসব বিভিন্ন বর্ণের আবার অসংখ্য বর্ণমালা আছে। এবং তাদের সাহায্যে চিত্র-শিল্পী তাঁর বক্তব্য চিত্রপটে লিখে প্রকাশ করেন। এই বর্ণমালাকে চিত্র-শিল্পের 'স্বরবর্ণ' বলা যেতে পারে। কারণ, বর্ণ বা রঙ্ কোনও একটা রূপ বা আকৃতিকে অবলম্বন করে পরিচিত হয় ও আত্ম-প্রকাশ করে। এই 'রূপ' বা 'আকৃতি,' প্রকাশ করবার অক্ষর হল রেখা (line)। এই রেখা রূপ-শিল্পের সাধারণ বর্ণমালা। স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রশিল্প—এই তিন শ্রেণীর রূপবিদ্যার আত্মপ্রকাশের অক্ষর হলো 'রেখা'। সাধারণতঃ, আমাদের চোখে দেখের জগতে যে সব আকৃতি, অবয়ব ও রূপ আমরা দেখতে পাই—রেখার অক্ষর যে অসংখ্য রীতির রূপ রচনা করতে পারে, প্রকৃতির পরিচিত নানা রূপে তার নিঃশেষ হয় না, অর্থাৎ রেখার শব্দমালা অফুরন্ত, অপর্যাপ্ত ; প্রকৃতির রূপে তার কয়েকটি মাত্র প্রকাশিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিত্রাবলীতে এমন সব অদ্ভুত, অপরিচিত, অতি প্রাকৃত রূপের সৃষ্টি করলেন, যার আদর্শ প্রকৃতির রূপের অভিধানে নেই। সুতরাং কবির চিত্রপন্থা প্রাকৃতিক বস্তুবাদী রিয়ালিষ্টিক্ পন্থা নয়, অতি কল্পনার পন্থা, নতুন সৃষ্টির পন্থা। তাঁর পশু-পাখীর চিত্রাবলীতে এই কথা খুব স্পষ্টভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর নূতন নূতন আজগুবি নানা উদ্ভট রসের পাখীর কল্পনা প্রকৃতির পক্ষীশালায় পাওয়া যায় না। ভারতের প্রাচীন রীতির শিল্পসৃষ্টিতে এই নূতন পদ্ধতির সৃষ্টির পরিচয় আমরা পাই। ভারতীয় রূপতত্ত্বের মতে রূপকার নূতন নূতন রূপের করবেন সৃষ্টি, প্রকৃতির কলিবুক হুবহু নকল করবেন না। কারণ ভারতের রূপতত্ত্বের মতে ব্রহ্মার বরপুত্র হলেন বিশ্বকর্ম্মা আর ভারতের শিল্পীকুল হলেন বিশ্বকর্ম্মার শিল্প খোজী। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পতত্ত্বে রূপসাধক মাত্রই বিশ্বকর্ম্মার বরপুত্র। এই সৃষ্টি-কর্ত্তার বংশধর ভারতের শিল্পীরা দাবী করেন যে নতুন রূপ, পরিচিত জগতের অতীত রূপ ও অবয়ব আবিষ্কার করবার ও সৃষ্টি করবার অধিকার শিল্পীর জন্মগত।

শিল্পধর্ম্মের এই স্বাধীন সৃষ্টিবাদ অবলম্বন করে ভারতের প্রাচীন শিল্পীরা অনেক অভিনব রীতির পশু, মানুষ ও দেবদেবীর মূর্ত্তি রচনা করেছেন, যার আদর্শ আমাদের পরিচিত জগতের কোন রূপের সঙ্গে মেলে না। তার কয়েকটি উদাহরণ হল :—(১) নরসিংহ, (২) গণেশ, (৩) গরুড়, (৪) কাম-দেনু, (৫) কিন্নর, (৬) মকর, (৭) বাণী বা গজসিংহ।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় শিল্পীদের অনুকরণে পুরাণ শাস্ত্রে ও প্রাচীন শিল্পে নির্দ্ধারিত এই সাত রকমের অভিনব রূপাবলীর পুনরুক্তি করেন নি। সৃষ্টিবাদের মূল তত্ত্ব ও আদর্শ মেনে নিয়ে অন্য পরিকল্পনায়, ভিন্ন ছন্দের নতুন সব রূপাকৃতি করলেন রচনা। তাঁর এই সব রূপসৃষ্টির সহিত

প্রাচীন ভারতীয় অতি প্রাকৃত রূপরাজির বিশেষ কোন মিল নেই। কবির রূপ-কৃতির বিশেষত্ব হল উহার মৌলিকতা ও অভিনবত্ব। রবীন্দ্রনাথ বহু পূর্বে বলেছিলেন—"রূপসাগরে ডুব দিয়েছি, অরূপ রতন পাবো বলে।" শেষ বয়সে তিনি চাক্ষুষ ভাবে দেখালেন যে, তিনি রূপসাগরে অবগাহন করে নানা বিচিত্র ছন্দের, নতুন রসের, নতুন কৌশলের এমন সব রূপসৃষ্টি করলেন যার তুলনা কেবল প্রকৃতির রূপরাজ্যেই বিরল নয়, প্রাচীন ভারতের শিল্পের অভিধানেও তার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

কিন্তু তাঁর রচিত পশু পাখীর রূপের তুলনায় মনুষ্যাকৃতির রূপসৃষ্টির সমস্যা কিছু ভিন্ন প্রকৃতির। এই দ্বিতীয় পর্য্যায়ের রূপ রচনায় কবি প্রকৃতির আদর্শকে সম্পূর্ণ বর্জন করতে পারেন নি। তাঁর রচনা-সম্ভারে অনেক মানুষের মূর্ত্তি প্রতিমূর্ত্তি উজ্জ্বল হয়ে আছে। তাঁর মনুষ্য সৃষ্টি বিশেষ বিশেষ পরিচিত আদর্শে গঠিত। সাধারণ ভাবাবেগ বর্জিত নয়। তাঁর রচিত মানুষের রূপ তাতাতে দেখা যায় দুঃখ বেদনা ও বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি, গভীর ভাবনার প্রতিবিম্ব, চরম রসের অবতারণা, মৃত্যুর কালো ছায়া, হিংসা দ্বেষের প্রতিচ্ছবি ও প্রতিরূপ।

কিন্তু কবি সার্বভৌমের এইরূপ অগত পরিক্রমার ফল তাঁর এক শ্রেণীর ভক্তগণকে বড়ই বিপদগ্রস্ত করেছিল। কারণ তাঁরা কবির এই অভিনব রূপসৃষ্টির রস আস্বাদন ও মূল্য নির্দ্ধারণ করে উঠতে পারেন নি। যাঁরা তাঁর অলৌকিক কাব্যকৃতি, নানা রসে পরিপূর্ণ রচনা সম্ভারের আলোচনা সমালোচনায় ব্যাপৃত ও ব্যস্ত, তাঁরা কবির এই রূপরচনা দেখে স্তম্ভিত, বিমূঢ়িত ও বিপর্য্যস্ত। এই সব রূপের রহস্য উদ্ঘাটন করা যায় এমন চাবিকাটি তাঁদের হাতে নেই। কারণ আমাদের দেশে রূপ-বিদ্যার ও রূপতত্ত্বের আলোচনা ও অনুশীলন এখনও পশ্চাদ্‌গামী। আমাদের দেশের সমালোচক সাহিত্যিকগণ রূপতত্ত্বের পরিচয় লাভে আজও বিমুখ। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের ছবির পাতা প্রায় অপঠিত হয়েই আছে সীলমারা বিধিষ্ট পুস্তকের ন্যায়। ইহার প্রকৃত রহস্যের সন্ধানী মানুষের জন্য এই চিত্রাবলী আজও অপেক্ষমান। সুতরাং রবীন্দ্র প্রতিভার এই বিচিত্র ধারাটিকে বিশ্লেষণ ও উপযুক্ত মূল্য না দিতে পারলে রবীন্দ্র পূজা সুন্দর ও সার্থক হয়ে উঠবে না।

> লেখার আবেগ প্রথমে দেখা দেয় কলমের মুখে, তারপরে যতই আকার ধারণ করে ততই সেটা পৌঁছতে থাকে মাথায়। এইরূপ সৃষ্টির বিস্ময়ে মন মেতে ওঠে।
>
> রবীন্দ্রনাথ

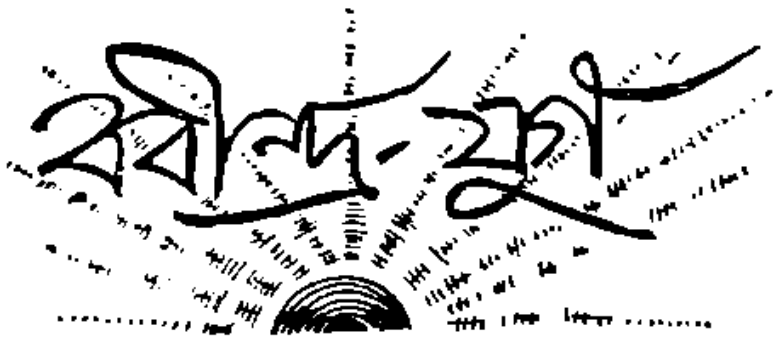

ডঃ কালিদাস নাগ

রবীন্দ্র যুগের কথা লিখতে বসেই মনে পড়ে গেল—"রক্তকরবীর যুগ" ; ৬০ বছরের রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভেসেছি আমরা—পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন, শিল্পাচার্য্য নন্দলাল বসু ও আমি। সেটা ১৯২৪ সালের কথা—ভারত মহাসাগর পার হয়ে চীনের দিকে ব্রহ্ম, মালয় পরিদর্শন করে, ইন্দোনেশিয়া ও ইন্দোচীনকে পাশ কাটিয়ে, তিন সপ্তাহ জাহাজে ভেসে তবে চীনে নামা। ভাগ্যিস আজকালকার হাওয়াই জাহাজে তিন দিনেই চীন দেখে ফিরে আসিনি আমরা। আমাদের সেদিনের চীন আর আজকের চীনের মধ্যে যেন সকলের অলক্ষ্যে একটা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর গড়ে উঠেছে। চীনের নতুন রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের কি ইচ্ছা ভগবানই জানেন। আমাদের সেই সমুদ্র যাত্রার সঙ্গী ছিল ব্যাপারী, শিক্ষক, সৈনিক, কুলী, কত বিচিত্র রকমের মানুষ। সবার কাছ থেকেই কিছু কিছু সংগ্রহ চলছে ; খোলা আকাশের নীচে, —ডেকে বসে—"গালগল্প"—জীবন্ত করে তুলেছে চীনের বাস্তব ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথ সারাদিন সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে যেন পাল্লা দিয়েই কত কিছু রচনা করে যাচ্ছেন—সন্ধ্যা হলেই ডেকের উপর আমাদের কাছ ঘেঁসে বসেন—আর নানা হাস্য পরিহাসের মধ্যে আমাদের কাছ থেকে অতি ক্ষুদ্র মানুষদের কত ছোট খাটো গল্প কাহিনী সংগ্রহ করেন।

নন্দলাল রেখা-মহাকাব্যের বিরাট স্রষ্টা। তবে তুলি ছাড়লেই তিনি প্রায় নীরব কবি। তাঁর সেই গভীর নীরবতার মর্য্যাদা দিয়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর অপূর্ব আলাপ-নৈপুণ্যে নন্দলালের কাছ থেকেও অনেক শিল্প রহস্য টেনে আনতেন। সে যুগে কবি রবীন্দ্রনাথ যে শিল্পী রবীন্দ্রে রূপান্তরিত হচ্ছেন—সেই মৌন গভীর ইতিহাস আজ মনের মধ্যে সরব হয়ে উঠেছে—"গুরুদেব! আপনার লেখার খাতার উপরে কাটাকুটিগুলো রেখার রূপ নিয়েছে যে—একি ব্যাপার?"

"পদাবলীর ছন্দের মতন রেখার টানেও যে একটা ছন্দ আছে। তোমরা মনে কর আমি বুঝি কেবল ভাষার রচনা নিয়েই ব্যস্ত? রেখার কাটাকুটি খেলাতে আমার খুব আনন্দ—তাইত তোমরা দেখছ এই খাতাটার পর পর নানা ছাঁদের লেখার উপর কাটাকুটি করতে গিয়ে অজান্তে এঁকেছি—কি একটা অসম্ভব গোছের প্রাগৈতিহাসিক জীব।" কিন্তু সে ৮।১০ বছর পরে। তখন তাঁর সপ্তর বৎসর পূর্ণ হওয়ার আয়োজন চলছে ; ১৯৩০—৩১ সালে আবার তাঁর সঙ্গে ইউরোপ ও আমেরিকার কিছু দিন কাটিয়ে দেখেছি সে দেশের শিল্পী মহলে শিল্পী রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কি বিরাট চাঞ্চল্য।

কিন্তু ১৯২৪ সালের আগে আমাদের হুঁসই ছিলনা যে রবীন্দ্রনাথ শুধু ছবি আঁকেন ও ভালবাসেনই না,—তিনি শেষজীবনে ছবির বন্যা বইয়ে দেবেন—অন্ত রবির বর্ণছটায় শিল্প জগতটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। প্রাচ্য শিল্পের আড়ম্বরে সেদিনের যে চীন, সেই দেশের নিমন্ত্রণ পেয়ে যাবার

পথেই কি সাড়া জেগেছিল কবি-শিল্পীর মনচৈতন্য লোকে? তাইকি মুক্তার মত লেখাগুলি কেটে অপরেখার জাল বুনেছিলেন,—অজান্তে এই চীন যাত্রী জাহাজে?

কিছুই জানিনা। জানতে চেষ্টাও করিনি; শুধু গল্প প্রসঙ্গে কবি নিজেই একদিন বলে বসলেন, "পিতৃদেব (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ) আমার অনেক আগে চীন-যাত্রা করেছিলেন,—তোমরা জান কি? আমি তখন খুব ছোট—দেখে কিরে এ বিষয়ে খোঁজ করেছিলাম; রবীন্দ্রনাথ তখন ১৬ বছরের কিশোর - ১৮৭৭ সালে—অর্থাৎ আজ থেকে ৭০ বছর আগে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠিক আমাদের এই পথ ধরেই ব্রহ্মদেশ ও মালয়ের ভ্রমণ শেষ করে—হংকং হয়ে ক্যানটন আসেন। তার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ অজিতকুমার চক্রবর্তী মহর্ষির জীবন বৃত্তান্তে দিয়েছেন। কিন্তু এ বিষয়ে আরো ভাল তথ্য দলিলপত্র খুঁজে বিশ্বভারতী থেকে এ বিষয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রকাশের অবকাশ আছে। ১৮৭৭ সালের আগে বহু ভারতবাসী বিলাত গিয়েছেন, কারণ সেকালে বিশ্বভ্রমণ মানেই ছিল বিলাত-ভ্রমণ অর্থাৎ প্রধানত "ধনিবদের দেশ" ইংলণ্ড ভ্রমণ।

এর পর দেখি ১৯ শতকের শেষ দশকে আর একজন বিশ্বযাত্রাকারী বিবেকানন্দ ভেসে চলেছেন প্রশান্ত মহাসাগর বেয়ে শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনের দিকে। ১৮৯৩ সালের সে ঘটনা অনেকেরই হয়ত আজ আবার স্মরণ হচ্ছে। বিবেকানন্দ শতবার্ষিকীর প্রাক্কালে কিন্তু অনেকেরই স্মরণ নেই—স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর পত্রাবলীতে ও ভাষণে প্রাচ্যের চিত্রকলায় ভারতের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে গেছেন; তিনি ভগ্নী নিবেদিতাকে এনে ভারতের তথা প্রাচ্য শিল্পের ধর্মোধ্বাটনে নামিয়ে ছিলেন; তখন না ছিল ভারতের শিল্প পরিষদ না ছিল কোন শিল্প পত্রিকা। এই অজানা ইতিহাসের সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বে উদ্বোধন পত্রিকার সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যায় (ভারতের শিল্পে বিবেকানন্দ নিবেদিতা অধ্যায়) লিখেছি।

সেই যুগেই (১৮৯৬—১৯০৫) মনীষী E. B. Havel কলকাতা আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ হয়ে আছেন এবং আধুনিক জগতের প্রথম সাধক শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তিনি টেনে আনছেন আমাদের নবশিল্প আন্দোলন রচনায়। পাশ্চাত্য শিল্পরীতি বর্জন করে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর বড় বড় ক্যানভাসের ছবি বিসর্জন দিলেন ম্যাকেঞ্জী সায়েবের নীলামে। নতুন তুলি দিয়ে নতুন প্রেরণায় ছবি লিখতে সুরু করলেন, "কৃষ্ণলীলা", "অভিসারিকা", "বেতাল পঞ্চবিংশতি", "বুদ্ধ সংহার", "মেঘ-দূত", "বুদ্ধ সুজাতা" ও "ভারত মাতা" (১৯০৫)।

এই দশ বছরের মধ্যে ১৮৯৫—১৯০৫ সৃষ্টি শুধু ছবিতে নয়—জীবনেও এক বিরাট বিপ্লব-যুগেরই সূচনা করছে। এই সময়েই দেখি জাপানী মনীষী ওকাকুরা কাকুজো (Okakura) বাঙলায় এসেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের সন্ধানে। ১৯০২ সালে দীপ নির্বাণের কয়েকমাস পূর্বে দেখি স্বামী বিবেকানন্দ জীর্ণ শরীরে নিজেই ওকাকুরাকে সঙ্গে নিয়ে চলেছেন বৌদ্ধ এসিয়ার প্রাণ-কেন্দ্র বুদ্ধগয়ার ব্রহ্ম-বোধী তীর্থে। সেই প্রেরণায় ওকাকুরা লিখলেন, "Asia is one" তাঁর "Ideals of the East" গ্রন্থে দেখি রুশ জাপানের যুদ্ধ শেষ হবার আগেই ওকাকুরা দুজন প্রসিদ্ধ জাপানী শিল্পী টাইকোয়ান ও হিসিদাকে পাঠালেন জোড়াসাঁকোর অবনীন্দ্রনাথের দরবারে। তাঁর অনেক রচনায় সেই সময়ের কাহিনী অবনীন্দ্রনাথ লিপিবদ্ধ করে গেছেন; কিন্তু আরও অনেক কিছু আবিষ্কার করার আছে। এই সম্পর্কে অনেক নতুন কথা শুনেছিলাম সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ করে।

রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা চিত্রধর্মী লেখন

কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

মনের ভাব প্রকাশের অন্যতম প্রধান বাহন কথা ; কিন্তু যাকে কথা শোনাতে চাই তাকে সব সময় সোজাসুজি কিছু শোনান হয়ত সম্ভবপর হয়না ; কানের সাহায্যে যেখানে পৌছান যায় অন্য এক ইন্দ্রিয় অর্থাৎ চোখের সাহায্যে সেখানে সেই ভাবটি পৌছাবার কৌশল আবিষ্কার করতে মানুষের কতদিন লেগেছিল তা ঠিক ঠিক বলা সম্ভব নয়। তবে আজ থেকে অনেক হাজার বছর আগেই যে মানুষ নানা চিহ্নের সাহায্যে মুখের কথাকে ধরে রাখবার উপায় বার করেছিল তার প্রমাণ রয়েছে। এই চিহ্নের কিছু ছিল ছবি আর কতক ছিল শুধু জ্যামিতিক আঁচর বা রেখা। এই দুরকমের চিহ্ন থেকেই লিপি এবং শেষ পর্যন্ত অক্ষর ও বর্ণমালার সৃষ্টি হয়েছিল। আজ প্রায় সব অগ্রসর মানুষের সমাজেই বর্ণমালার ব্যবহার প্রচলন হয়েছে ; তবে এখনও চীনের মত কোন কোন অঞ্চলের মানুষ চিত্রলিপির যুগেই রয়ে গিয়েছে।

চিত্রলিপির একটা বৈশিষ্ট্য তার স্বাভাবিক সৌন্দর্য ; চিত্রলিপির ব্যবহারকারীদের মধ্যে এই সৌন্দর্যবোধের একটা সহজ প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু প্রগতিশীল সমাজে সহজ সৌন্দর্যের সম্ভাবনা সত্ত্বেও অন্যান্য নানা কারণে চিত্রলিপির ব্যবহার কায়েমি হতে পারেনি। বর্ণমালাই সমাজকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অনেকে মনে করেন বর্ণমালা আবিষ্কারের ক্ষেত্রে ভূমধ্যসীয় পশ্চিম এশিয়ার ফিনিশিয় জাতিই ছিল পুরোগামী। অবশ্য সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কারের পর ভারতীয় বর্ণমালাকে ফিনিশিয় বর্ণমালার অনুসরণকারী বলে আর তেমন প্রচার করা হয় না : আবার ধ্বনিতত্ত্বের দিক থেকে ভারতীয় বর্ণমালা যে সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞানভিত্তিক একথা নিতান্ত ভারত বিদ্বেষী ছাড়া আর সকলেই স্বীকার করে থাকে। অবশ্য সম্রাট অশোকের আমলের পূর্বেকার কোন ঐতিহাসিক উপকরণে এই বর্ণমালার ব্যবহার দেখা যায় না। কিন্তু ঐ সময়েই এই বর্ণমালা যে অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট রূপ নিয়েছিল অশোকের অনুশাসনগুলিই তার সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। ছাপাখানার দৌলতে হাতের লেখার মর্যাদা আজ খুবই কমে গিয়েছে ; স্বয়ং-লেখ (Type writer) যন্ত্রের ব্যবহারের বিস্তৃতিতে হাতের লেখার মর্যাদা এক সময় হয়ত নিঃশেষিত হয়ে যাবে। কিন্তু লিপিকুশলতা এবং লেখনের মধ্যে অবস্থা, কাল ও পাত্র বিশেষে যে সৌন্দর্যের প্রকাশ বিবর্তনের ভেতর দিয়ে আজ পর্যন্তও দেখা গিয়েছে তার ইতিহাস কম বিস্ময়জনক নয়।

লেখন শিল্পকে ইংরাজিতে বলা হয় Calligraphy. গ্রীক এবং রোমক লিপির ব্যবহার থেকেই লেখন শিল্পের সন্ধান পাওয়া গেলেও রেঁনেসাসের যুগে সামাজিক নানা বিবর্তনের মধ্যে শিল্পকলার সঙ্গে সঙ্গে লেখন শিল্পের চর্চারও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল বলে জানা যায়। এই সময় প্রগতিবাদী শিল্পী, বুদ্ধিজীবী ও গীর্জার প্রধানেরা যে লেখন রীতি ব্যবহার করতেন সাধারণ ব্যবসায়ী হিসাব-নবীশদের মধ্যে তা থেকে স্বতন্ত্র ধরণের লেখার প্রচলন ছিল।

রেঁনেসাসের যুগে পূর্বতন ক্যারোলাইন এবং গথিক আমলের বর্ণমালাই কোন কোন লেখকের হাতে জ্যামিতিক রূপ ধারণ করে, আবার অন্যেরা জড়ানো অক্ষরের (cursive) পরিপোষক হয়ে ওঠেন। শেষ পর্যন্ত ফরাসীদেশে নূতন ছাঁদের লেখার প্রচলন হয় এবং এই আদর্শ ইংলণ্ডেও প্রসার লাভ করে।

কিন্তু জার্মানী ও ইউরোপ খণ্ডের অন্যান্য কোন কোন অঞ্চলে প্রাচীন গথিক ধরণের লেখায়ই প্রচলন থেকে গেল।

ইউরোপে লেখনশিল্প যতটা কুশলতা লাভ করেছিল প্রাচ্যে বিশেষ করে যে সব অঞ্চলে আরবলিপির ব্যবহার প্রচলিত সে সব অঞ্চলে লেখনশিল্পের অনুশীলন ও চর্চা যেন তার চেয়েও বেশী হয়েছিল বলে মনে হয়। পারস্য দেশে অনেক খ্যাতনামা শিল্পী লেখন কুশলী বলেও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং সমাজে লেখনশিল্পীর মর্যাদা উচ্চস্তরের চিত্রশিল্পী অপেক্ষা ন্যূন ছিল না।

ভারতবর্ষেও লেখনশিল্পের চর্চার অভাব ছিল না এবং ভিন্নভিন্ন অঞ্চলে ভিন্নভিন্ন লেখনরীতির প্রচলন হওয়ার মূলে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর প্রতিভার বৈশিষ্ট্যই ক্রিয়াশীল ছিল। অশোকের অনুশাসনগুলিতে অভ্যন্তর ভারতে একই ধাঁচের বর্ণমালার ব্যবহার দেখা যায়; কিন্তু এই বর্ণমালা অশোক ব্যবহৃত ভাষার মতই মগধ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে খরোষ্ঠী-লিপি আকৃতিতে পৃথক লেখন বিন্যাসে সেমিটিক লেখনের মত দক্ষিণ থেকে বাম দিকে প্রসারিত ছিল। এর কিছু কাল পরের সাহিত্যে গৌড়ী, মাগধী, সৌরসেনী ইত্যাদি ভাষার উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে অনুরূপ নামের লেখন বা লিপিরও উল্লেখ দেখা যায়। পরে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক লিপি সেই সেই অঞ্চলের প্রস্তর ও তাম্রলিপিতে আত্মপ্রকাশ করে এবং লিপিকার তেদে এক বিশিষ্ট অঞ্চলের লিপিকেও সুদর্শন ও অলঙ্কৃত করবার চেষ্টা দেখা যায়। লেখনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার ব্যক্তিগত প্রয়াসের সর্বোৎকৃষ্ট পরিচয় সপ্তম শতাব্দীর একটি লিপিতে মহারাজ হর্ষবর্ধনের স্বাক্ষর।

লেখনের যাদু মানুষকে কতটা আকর্ষণ করতে পারে আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর তার অন্যতম প্রমাণ। শিল্পধর্মী কবির ব্যক্তিত্ব সর্বদাই রূপের সৃষ্টিতে প্রবণতা বোধ করত এবং এই রূপসৃষ্টির ক্ষেত্রে কিছু তাঁর কাব্য এবং সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেই সীমিত ছিল না। কবির ব্যক্তিগত জীবন ও পরিবেশ তার এই শিল্পধর্মের প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। কবি তাঁর কেশতুরা, নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যসম্ভার, আসবাবপত্র, বাসগৃহ এবং আবাসস্থানের পরিপ্রেক্ষিতকেও কাব্য ও সাহিত্য রচনার মত অনুরূপ যত্নে এবং শিল্পধর্মের প্রেরণায় সুন্দর ও তুলনাহীন করে তুলতে চাইতেন। এই ধর্মই তাকে লেখার খাতার আঁকা রেখাগুলিকে সংযুক্ত করে ছন্দোময় এবং চিত্রধর্মী করে তুলতে প্রবুদ্ধ করেছিল যার থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর নিজস্বধারার চিত্রশিল্পের আবির্ভাব ঘটে। তাঁর জীবনধর্মের নানা বিচিত্র অঙ্গ সম্পর্কে আলোচনা হয়ে থাকলেও তাঁর লেখনশিল্পের পর্যালোচনা এখনও হয় নাই।

এই লেখনশিল্পের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রবণতা মনে হয় তাঁর সহজাত। বস্তু সেই শিক্ষাগুরু যাঁর হাতে কবির হাতে খড়ি হয়েছিল, শ্লেটের উপর খড়ি বুলিয়ে তিনি যেদিন প্রথম বর্ণ রচনা করেছিলেন সেই দিনটি থেকেই হয়ত তিনি লেখনশিল্পের পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। সাধারণ মানুষ অনেক হাতের লেখা লিখেও শেষ পর্যন্ত সাধারণ লেখাই লিখে থাকে। বাংলা যারা লেখে বা বর্তমানে ইংরাজী লেখাতেও হাতের লেখাকে Calligraphic বা শিল্পধর্মী করে তোলার প্রবণতা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। যত্ন ও অধ্যবসায় না থাকলে লেখা শিল্পধর্মী হয় না; আর সহজাত শিল্প প্রবণতা না থাকলে লেখা Calligraphy হয়ে ওঠে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের হাতে তাঁর লিপি সত্যই Calligraphy হয়ে উঠেছিল; তিনিই প্রথম হাতের লেখার নাম দিয়েছিলেন লেখন।

রবীন্দ্রনাথের এই লেখন বা লিপিশিল্পের আশ্চর্য ক্রমবিবর্তন তাঁর সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি ও চিঠিপত্রগুলিতে অতি সুন্দর ভাবে অনুসরণ করা যায়। কবির খুব অল্পবয়সের হস্তাক্ষরের যে নমুনা পাওয়া যায় তার লক্ষণ অনেকটা জ্যামিতিক ও কোনাল। অথচ বাংলা বর্ণমালার বর্ণ স্বভাবতই জ্যামিতিক যার মধ্যে সোজা রেখা আর তীক্ষ্ণ কোণের সম্ভাবনাই বেশী; বাংলা বর্ণমালাকে বিশ্লেষণ করলে প্রধানত দুইটি বিশিষ্ট মৌলিক আকৃতি দেখতে পাওয়া যায়; এই মৌলিক আকৃতি দু'টির

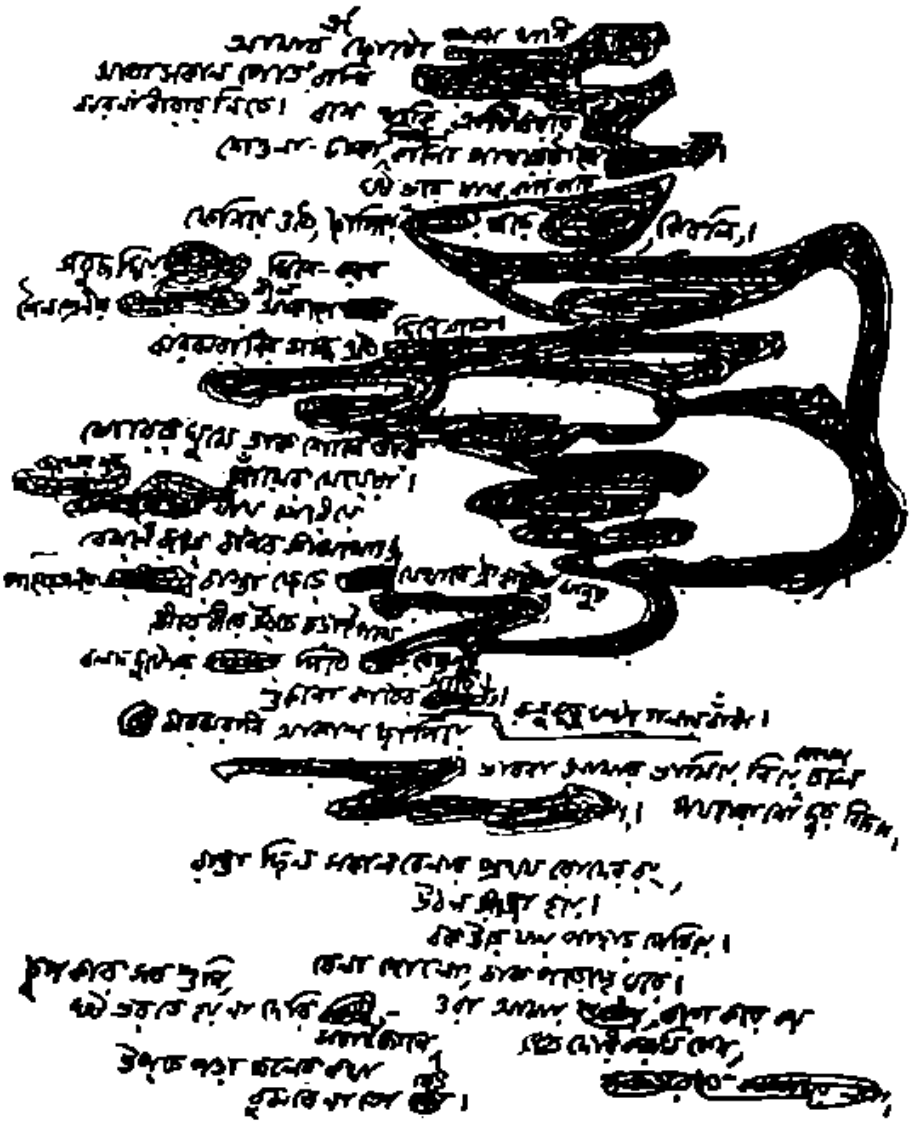

প্রথমটি বাঁকান রেখা ভিত্তিক "ত" অন্যটি সোজা রেখা ভিত্তিক ও কোন-নির্ভর "ব"। এই দু'টি মৌলিক বর্ণকে ভেঙেচুরে আর মিলিয়েই অন্য বর্ণগুলির সৃষ্টি করা হয়েছে লক্ষ্য করা যায়। বাংলা বর্ণমালার জন্মের সূত্র খুঁজতে হলে ভারতের ও বৃহত্তর ভারতের অন্যান্য বহু বর্ণমালার মতই প্রাচীন ভারতে ব্যবহৃত ব্রাহ্মী লিপিতে যেতে হয়। এই ব্রাহ্মীলিপির উৎপত্তি সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্ত এখনও গৃহীত হয় নাই; তবে সিন্ধু-গুর্মরে আবিষ্কৃত তাম্র-প্রস্তর যুগের চিত্রলিপির সঙ্গে ব্রাহ্মী লিপির নিকট সাদৃশ্য থেকে এই অনুমানই প্রবল হয় যে প্রাচীন সিন্ধুগুর্জরী ধরণের চিত্রলিপি থেকেই শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মীলিপির বিবর্তন হয়েছিল। তবে অশোকের অনুশাসনগুলিতে ব্যবহৃত বর্ণমালাতে সিন্ধুগুর্জরী লিপির চিত্রধর্ম প্রায় নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে দেখতে পাওয়া যায়। অশোকের ব্রাহ্মী-লিপিতে তীক্ষ্ণ রেখা নির্ভর [+] ক, কোন ভূমিষ্ঠ [□] ব এবং বক্ররেখা নির্ভর [⊙] ত এর মৌলিকতাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চিত্রলিপির জটিলতাকে অতিক্রম করে এই বর্ণমালা সুনির্দিষ্ট ও সরল এবং পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে দেখা যায়। অনেকে অনুমান করেন যে কঠিন পাথরের গায় তীক্ষ্ণ অস্ত্রের সাহায্যে খোদাই

করা হত বলে অশোকের অনুশাসনের বর্ণমালা এত সুস্পষ্ট, তীক্ষ্ণ এবং সরল হয়ে উঠেছিল। তবে হস্তাক্ষরে যে বর্ণমালা ভূর্জপত্র বা অনুরূপ উপকরণে বিন্যস্ত হত তার রূপ অতটা তীক্ষ্ণ আর সরল ছিল না। এই যুগের কিছুদিন পরে সোনা রূপা এবং তামার তৈরী মুদ্রায় যে অক্ষর সংযোজিত দেখা যায় তার রূপ পাথরে উৎকীর্ণ বর্ণমালার রূপ থেকে স্বতন্ত্র। গুপ্ত আমলের মুদ্রা এবং অনুশাসনে প্রাচীন ব্রাহ্মী তার তীক্ষ্ণতা হারিয়ে খানিকটা বাঁকান এবং জড়ান (cursive) রূপ নিয়েছিল। স্বভাবতই হস্তাক্ষরের প্রভাবেই যে লিপিতে এই পরিবর্তন ঘটেছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মহারাজ হর্ষের আমলে অনুশীলিত হস্তাক্ষর যে লেখন শিল্পের রূপ নিয়েছিল শ্রীহর্ষের অক্ষরই তার প্রমাণ। পরবর্তী যুগে আঞ্চলিক লিপিগুলির বিবর্তনে অক্ষর বিন্যাসের ক্ষেত্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পূর্ব ভারতে তালের পাতে খোদাই করে লিপি রচনা করার রেওয়াজ থেকে কোনাল লেখার উদ্ভব হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। যেমন ওড়িষ্যা ও দক্ষিণ অঞ্চলে তালপাতার উপরে লোহার সূক্ষ্মাগ্র কলম দিয়ে রচিত লিপি থেকে অক্ষরগুলি তাদের বিচিত্র লতানো রূপ নিয়েছিল। কিন্তু সমস্ত অঞ্চলেই গ্রন্থলিপি বা পুঁথিতে লেখা হস্তাক্ষরের প্রচলন ছিল এবং সেই হস্তাক্ষরে শিল্প ও সৌন্দর্য বিন্যাসের যথেষ্ট সুযোগও ছিল। বাংলাদেশে পাল আমলে তালপাতার উপরে লেখা কয়েকটি পুঁথিতে লিপির এই চিত্রধর্মের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ সংগ্রহশালায় রাখা নেপালে আবিষ্কৃত ৯ম শতাব্দে কাগজে লেখা একখানি অমূল্য বৌদ্ধ গ্রন্থে সে যুগের চিত্রধর্মী লিপির এক উজ্জ্বল পরিচয় পাওয়া যায়। গুজরাটের জৈনধর্মগ্রন্থগুলিও চিত্রধর্মী লিপির অক্ষরে পরিপূর্ণ। বাংলাদেশেও প্রাচীন পুঁথি, দলিল এবং চিঠিপত্রে চিত্রধর্মী লিপির ব্যবহার ছিল।

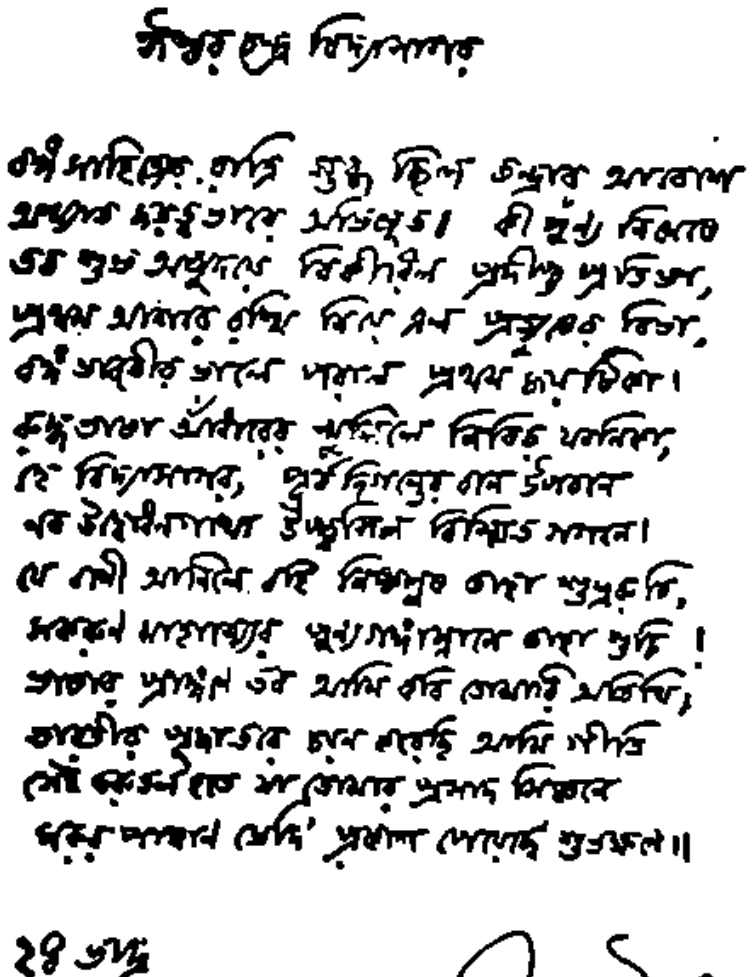

বাঙালীর ঘরে সাধারণত যেভাবে হস্তাক্ষরের চর্চা হত রবীন্দ্রনাথও সেই ভাবেই হস্তাক্ষরের চর্চা শুরু করেছিলেন; কিন্তু ক্রমেই কবির হস্তাক্ষর পরিশীলিত চিত্রধর্মী লিপিকারদের মত হয়ে উঠতে থাকে এবং যৌবন প্রাপ্তির আগেই তাঁর লেখায় চিত্রধর্মের বৈশিষ্ট্য পূর্ণতা লাভ করে। লেখায় এই

চিত্রধর্মের প্রবণতা কি কবির সহজাত বা কোন বিশেষ প্রভাব থেকে এই ধর্ম তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল তা বলা খুব সহজ নয়। বাংলা লেখার চিত্রধর্মের অনুশীলনের খুব পরিচয় পাওয়া যায় না।

বাংলা দলিলে, চিঠিপত্রে বা পুরানো পুঁথিতে যে হস্তাক্ষরের সঙ্গে পরিচয় হয় তাতে তীক্ষ্ণ রেখা বহুল অক্ষরেরই প্রাধান্য, অক্ষর সীমার প্রান্তে প্রসারিত অনতিদীর্ঘ রেখা দ্বারা সামান্য বৈচিত্র্য সম্পাদন করা ছাড়া এই সব লেখাতে চিত্রধর্মের কোনই পরিচয় নাই। রেনেসাঁস আমলে রোমে এবং সেই ধারার অনুসরণে পরে ইউরোপে বণিক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে চিত্রধর্মবর্জিত লেখারই প্রাধান্য ছিল। আমাদের দেশেও রাজস্থান ইত্যাদি অঞ্চলে যখন চিত্রধর্মী লেখন রাজদরবারে এবং ধর্মগ্রন্থে প্রচলিত সেই সময়েই বণিক ও ব্যবসায়ী মহলে অত্যন্ত কদাকার শ্রীছাঁদহীন হাতের লেখার প্রচলন দেখা যায়। সরকারী দলিলপত্র লেখায় বা ব্যবসায় সংক্রান্ত চিঠিপত্রাদিতে লেখাদার দলিল লেখকেরা যে লিপির ব্যবহার করত সংক্ষেপনধর্মী সেই লিপির সৌন্দর্যহীনতাই শুধু বিশিষ্ট হয় নাই, অনেক সময় সে লিপি দুর্বোধ্য বলেও বিবেচিত হয়েছে। বাংলা দলিল ও চিঠিপত্রের লিপি অনুরূপ দুর্বোধ্য না হলেও এই লিপির ধারায় রূপধর্মের কোন প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় না। পণ্ডিতের ঘরে নকল করা পুঁথি সাধারণতঃ সরল ও পরিচ্ছন্ন হলেও তাতে চিত্রধর্মের কোন সাহিত্য ছিল না। এই পরিবেশে অকস্মাৎ কবির হস্তাক্ষর কি করে চিত্রধর্মী এবং রূপগর্ভ হয়ে উঠেছিল তার কারণানুসন্ধানে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। কবির সময়ে ভারতীয় লিপির চিত্রধর্ম সম্পর্কে কোন আলোচনা হয় নাই—বলতে কি ভারতীয় রীতির লিপিতে চিত্রধর্মের সমাবেশ সম্পর্কে এখন পর্যন্তও কোন আলোচনাই হয় নাই। কবির সময়ে ইউরোপীয় Calligraphy সম্পর্কেও আমাদের দেশে খুব আলোচনা কোথাও হয়েছিল তা মনে হয় না। তবে East India Company-র আমল থেকে Type writer আবিষ্কার হওয়ার পূর্বে পর্যন্ত সরকারী দলিলপত্রে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপত্রে এবং অনুরূপ উপলক্ষ্যে Calligraphy সমৃদ্ধ হস্তলিপি ও ছাপা হরফের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। কবির চোখে তাঁর লিপি বিশিষ্ট রূপ নেওয়ার আগে হয়ত এই ধরণের Calligraphy-র দিকে কবির দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। কিন্তু আমার মনে হয় প্রকৃত চিত্রধর্মী লিপির দিকে কবির দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল ঠাকুর পরিবারে প্রচলিত ফার্সী পুঁথি পুস্তক থেকে।

ফার্সী লিপি আরবী লিপি থেকে সমুদ্ভূত হলেও পারস্যদেশে এই লিপির প্রভূত পরিমার্জন ঘটে। মূল আরবী লিপির উদ্ভাবকদের মধ্যে চিত্রধর্ম সম্বন্ধে যে কোন অনুভূতি ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় না। অলঙ্করণের জন্য তারা জ্যামিতিক নক্সার উপরেই ছিল অধিকতর নির্ভরশীল। তাদের লিপিও যেখানে আলঙ্কারিক সেখানেও এই জ্যামিতিরই প্রভাব দেখা যায়। আরবী লিপিতে তুর্কীদের প্রভাবে আরও দৃঢ়তা এবং বজ্রতার সমাবেশ হয়। এদিকে পারস্যে মুসলমানধর্ম প্রচারিত হলে পারস্য-বাসীরা আরবী লিপি গ্রহণ করলেও মরুভূমিসুলভ চিত্রসংস্রবহীন লিপিবৈশিষ্ট্যকে তারা নিজেদের আদর্শে সীমায়িত এবং রূপগর্ভ করে তোলে। এইখানেই ফার্সী লিপি চিত্ররূপে সমৃদ্ধ এবং অপূর্ব শিল্পধর্মী হয়ে ওঠে। পারস্যের বিভিন্ন অঞ্চল লিপিকে নিজেদের আদর্শে সীমায়িত এবং রূপগর্ভ করে তোলে। এইখানেই ফার্সী লিপি চিত্ররূপে সমৃদ্ধ এবং অপূর্ব শিল্পধর্মী হয়ে ওঠে। পারস্যের বিভিন্ন অঞ্চলে লিপিকে রূপায়িত করবার নানা পদ্ধতি প্রবর্তিত হয় এবং শিল্পধর্মী লিপি নানা বৈচিত্র্যে মণ্ডিত হয়ে

ওঠে। পারস্যের সাফাবিদ্ সম্রাটদের আমলে এই শিল্পধর্মী লিপি কৌশল উচ্চকোটীর চিত্রকলার সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়; Calligraphic লেখন, বর্ণমালা নির্ভর লিপিতে পারস্যদেশের মত মর্যাদা বোধহয় আর কোথাও পায় নাই। এই লিপিকলার প্রভাব ভারতেও অনুভূত হয়েছিল এবং সম্রাট আকবরের আমল থেকেই ফার্সী লিপি ভারতে তার রূপসম্পদ নিয়ে প্রতিষ্ঠালাভ করে। পারস্যের বিখ্যাত লিপিকারদের মত প্রতিপত্তি ভারতীয় লিপিকারেরা কখনও লাভ করে না থাকলেও ভারতে ফার্সী লিপি তার চিত্রধর্ম থেকে কখনও বিচ্যুত হয় নাই।

East India Company'র আদেশনামা বলে ফার্সী ভাষাকে রাজমর্যাদা থেকে অপসারিত করলেও অভিজাত হিন্দু সমাজেও দীর্ঘকাল ফার্সী ভাষা তার মর্যাদা হারায় নাই এবং অভিজাত ঠাকুর পরিবারে ফার্সীর যে প্রভূত মর্যাদা ছিল এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দ্বারকানাথের আমলের চালচলন কিছুটা মহর্ষির আমলে বদলে গিয়েছিল; মুসলমানী কায়দা কানুনের পরিবর্তে কিছুটা বিলাতি আর কিছুটা উপনিষদীয় সংস্কৃতির প্রবর্তন হয়েছিল। কিন্তু তা হলেও ঠাকুর পরিবারের অনেকেই তখনও ফার্সীর চর্চা রেখেছিলেন। কবি যে বাল্যে ছবি আঁকা ফার্সী বই দেখেছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এবং কবির লিপিসংগঠনে যে কিছুটা ফার্সী লিপির রচনাশৈলীর প্রভাব পড়েছিল এবিষয়েও আমি নিঃসন্দেহ। পরে কবি ভারতীয় লেখনরীতির (Calligraphic Style) সঙ্গে পরিচয় লাভ করেছিলেন নানা সংগ্রহশালায়; কিন্তু ততদিন তার লিপি বিন্যাসের ধারা সম্পূর্ণরূপে সংগঠিত হয়ে গিয়েছিল। ব্রাহ্মীলিপির উত্তরকল্পা বাংলা হরফে ফার্সীরীতির চিত্রপ্রবণতা যে প্রভূত সম্ভাবনার সূত্রপাত করেছিল রবীন্দ্রনাথেই তার চরম অভিব্যক্তি দেখা যায়। কবির সীমাহীন প্রতিভা এই সম্ভাবনাটুকুকে অবলম্বন করেই এক অপূর্ব লেখনপদ্ধতির প্রবর্তন করেছিলেন। Calligraphic লেখনের যুগ আর হয়ত ফিরবে না। বর্তমানের গতিধর্মে বিন্যস্তিত সমাজে অচিরকালেই যন্ত্রনির্ভর লিপি-ব্যবহারের প্রবর্তন হবে। কিন্তু হাতের লেখা কি পরিমাণে চিত্রধর্মী এবং রসপ্রাণ হতে পারে কবির লেখন তার প্রমাণ স্বরূপে চিরকাল কীর্তিত হবে। লেখনের সৌন্দর্য ও রস, বিচার ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপভোগের সামগ্রী। রবীন্দ্রনাথের চিত্রধর্মী লেখনের অনুসরণ অনেকে করেছেন। কিন্তু ব্যক্তিগত প্রতিভার ছাপ অন্য কোন বাংলা লিপিকারের লেখায় আজ পর্যন্তও আমি দেখি নাই। সাধারণ হস্তাক্ষরকে সর্বদা Calligraphy'র পর্যায়ে চিত্রধর্মী করে লিখে যাওয়া যে অগ্রগের প্রতিভার পরিচায়ক সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা এখনও হয় নাই। এই প্রসঙ্গে যাদবপুরে অবস্থিত School of Printing Technology'র প্রয়াসের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের লেখনের এই Calligraphic বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে তাঁরা মুদ্রণশিল্পের মাধ্যমে জনসাধারণকে রবীন্দ্রনাথের শিল্পধর্মী লিপির সঙ্গে পরিচয়লাভের সুযোগ করে দিয়েছেন। এই ধরণের প্রয়াস আরও বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন কারণ রবীন্দ্রনাথের লেখনের এই শিল্পবৈশিষ্ট্য এখনও সাধারণের জ্ঞানগোচর হয় নাই। কবির এই চিত্রধর্মী লেখনও যে তার অন্যান্য শিল্পকর্মের মতই প্রভূত রসসমৃদ্ধ তার আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আর অস্বীকার করা যায় না।

আশ্রমের কোণে

শ্রীশান্তা দেবী

বছর পঁয়তাল্লিশ আগে আমরা কিছুদিনের মত শান্তিনিকেতনের বাসিন্দা ছিলাম। তখন শান্তিনিকেতন ছোটখাট ছিল, এত বড় বিরাট ব্যাপার হয়নি। আমার ছোট ভাই মুনুকে বাবা শান্তিনিকেতনে পড়াবেন ঠিক করেছিলেন। কিন্তু তার শরীর খুব শক্ত ছিল না। তাই ঠিক হল তাকে ছাত্রাবাসে না দিয়ে আমরা ওখানে একটা ছোট বাড়ী করে কয়েকজন মিলে থাকব। ছোট একটা মাটির বাড়ী খালিই ছিল, রবীন্দ্রনাথের কাছে বাবা সেই বাড়ীটি কিনলেন। তিনখানি ঘর, খড়ে ছাওয়া চাল। উই আর ইঁদুরের উৎপাত নিবারণ করবার জন্য ঘরগুলির দুপিঠে চুণবালির পলস্তারা দেওয়া হল। বারান্দার কাঠের খুঁটিগুলি বদলে ইঁটের থাম উঠল। দেখতে ভাল লাগবে বলে বারান্দার চারপাশ ঘিরে সুরকি ঢালালেন বাবা। তার পাশে একটি ছোট পেয়ারাগাছ। গাছটি দিনে দিনে দ্রুত বাড়ত বলে রবীন্দ্রনাথের তার প্রতি বিশেষ মমতা ছিল। একদিন বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। প্রচণ্ড গরম, রাত্রে দরজা বন্ধ করে শোওয়া যায় না। কাজেই হাওয়া চলাচলের জন্য জালের ব্যবস্থা তৈরী হল। চোরও ঢুকতে পারে না, গরমও কম হবে। বাড়ীতে কল নেই, কুয়া নেই, কাছাকাছি দোকান বাজার নেই। খাদ্যের মধ্যে ভাত ডাল আলু আর দুধ ছাড়া অন্য জিনিষ প্রায়ই জোটানো যায় না।

এই রকম সাদাসিধা জীবনের মধ্যে শুধু যে আমাদের দিন কাটত তাই নয়। সকলেরই প্রায় এই রকমই অবস্থা। ঠাকুর পরিবারের দুই তিনটি যা পাকা বাড়ী ছিল তাতে জলের কুয়া ইত্যাদি মিলত। বাকিদের তাও ছিল না। গরম পড়লেই জলকষ্ট সুরু হত। কিন্তু এরই মধ্যে শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকদের ঘর-গৃহস্থালী বেশ আনন্দেরই দেখতাম। তখনও মেয়েদের ছাত্রীনিবাস বা শ্রীভবন হয়নি। কলাভবন সঙ্গীতভবনও গড়ে ওঠেনি। কিন্তু অধ্যাপকদের বাড়ীর ছোট মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে কয়েকজন গাছতলায় ক্লাশে পড়াশুনা করত। সন্ধ্যায় দিনেন্দ্রনাথের বারাণ্ডায় প্রায়ই হত গানের ক্লাশ, নয়ত অভিনয়ের মহড়া। ছোট মেয়েরা গানের ক্লাশে যোগ দিলেও বড়রা দিতেন না। তাঁরা ছিলেন অন্তরালবর্তিনী। বেড়ালের একটু ঘোরাঘুরি তাঁরা বলতেন। তাতে পর্দা কিছুই হত না, শুধু একটু দূরত্ব রক্ষা হত। আমরা স্কুলের মেয়ে ছিলাম না অথচ গৃহিণীত্বও তখন লাভ হয়নি, সুতরাং না বড় না ছোট। কাজেই দিনুবাবু অনেক সময় আমাদের গানের ক্লাশে যোগ দিতে বলতেন। আমরা ঠিক ক্লাশে যোগ দিতাম না, কিন্তু ঐখানে বসে প্রত্যহ শুনে শুনে গানগুলি শেখা হয়ে যেত।

সেযুগে বিশ্বভারতী হয়নি, শুধু ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমই ছিল। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল শিক্ষায় যারা কিছুদূর অগ্রসর হয়েছে তারা ঐখানেই ছেদ না টেনে দিয়ে বিদ্যার চর্চ্চাটা আরও অগ্রসর করে রাখে। সে হিসাবেও আমরা ছিলাম না বড় না ছোটর দলে। সবে তখন বি, এ, পাশ করেছি। সুতরাং আমাদের তিনি প্রায়ই বলতেন "তোমরা বিধুশেখর শাস্ত্রী মশায়ের কাছে সংস্কৃত আর পালির চর্চ্চা করলে খুব ভাল হয়।" কথাটা শুনতাম কিন্তু নিজে থেকে এগিয়ে গিয়ে শাস্ত্রী মশায়কে ধরতে সঙ্কোচ হত।

রবীন্দ্রনাথ তখন "দেহলি"র ক্ষুদ্র বাড়ীটিতে থাকতেন। যেদিন সন্ধ্যায় গান কি অভিনয়ের কোনো মহড়া থাকত না, সেদিন তিনি তাঁর ছোট ছাদটিতে একটি আরাম কেদারা নিয়ে হাওয়ায়

বসতেন। তাঁর কথা শুনবার লোভে অনেকেই এসে সেখানে আশে-পাশে বসে পড়তেন। বক্তা প্রধানত তিনিই ছিলেন, আর সবাই প্রায় শ্রোতা। আমার বাবা মাঝে মাঝে নূতন নূতন প্রসঙ্গ তুলতেন। তখন আবার নূতন দিকে কথার মোড় ফিরত। এইখানেই মাঝে রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা হল পাশ্চাত্য কবিদের বিষয় আমাদের কিছু বলেন। তখনকার ছেলেমেয়েরা শেলি প্রভৃতির কাব্যচর্চা বিশেষ করত না বলে তিনি দুঃখ পেতেন। শুধু খবরের কাগজ পড়ে দিন কাটানোর প্রতি তাঁর গভীর অবজ্ঞা ছিল। যা চিরন্তন সাহিত্য তার দ্বারা মানুষের মনকে স্নাত ও সরস করে রাখায় তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল। আমাদের তিনি দিন কয়েক শেলির বিষয় বললেন। তারপর বললেন, "যা বুঝলে তা নিজের মত করে লিখে আন।" লিখেছিলাম, কিন্তু তাঁর পছন্দ হল না।

তখনকার দিনে আশ্রমে যে সব অভিনয় হত তাতে মেয়েরা যোগ দিতেন না। মেয়েদের পার্ট ছেলেরাই করতেন। অথচ মেয়েরাও কিছু করে এটা কবির ইচ্ছা ছিল। সুতরাং "লক্ষ্মীর পরীক্ষা"র মত যে সব নাটকে শুধু মেয়েই আছে সেইগুলি তিনি মেয়েদের শেখাতেন। আমরা যাবার আগে একবার এই রকম অভিনয় ওখানে করেছিলাম। আমরা থাকতেও একবার মহড়া চলল। আমরা রথীন্দ্রনাথের পত্নী প্রতিমা দেবী ও দ্বিজেন্দ্রনাথের পত্নী কমলা দেবীর সঙ্গে পার্ট বুঝতাম। ক্ষিতিমোহনবাবুর স্ত্রী সংসারের অত কাজের মধ্যেও এসে তাতে যোগ দিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হঠাৎ কলকাতায় চলে আসায় জিনিষটা সফল আর হল না। অবশ্য তার পরে অনেক জায়গায় অনেক বারই অন্য মেয়েরা এটি করেছে।

যখন আমরা আমাদের ঐ ছোট বাড়ীটিতে বাস করতাম, তখন একবার বেনারস থেকে ছুটিতে আশ্রমে এলেন সপরিবারে অধ্যাপক ক্ষিতিভূষণ অধিকারী। তাঁর চারটি কন্যা, বড়টি—আশা, তৃতীয়া—রাণু। এই আশা পরে হন আশা আর্যনায়কম্। ইনি গান্ধীজির সেবাগ্রামের একজন সুবিখ্যাত কর্মী। তৃতীয়া রাণু পরে হয়েছেন লেডি রাণু মুখার্জী। এঁরই নামে লিখিত "ভানু সিংহের পত্র"। অধিকারীরা বেশ কিছুদিন ওখানে বাস করার পর ফিরে যান। কয়েক বৎসর পরে যখন বিশ্বভারতীর নানা শাখা অল্পে অল্পে বিকশিত হচ্ছে সেই সময় চিত্রাঙ্কন শেখবার জন্য আমি আবার কিছু দিনের মত আশ্রমে বাস করেছিলাম। আশা তখন কলেজের পালা শেষ করেছেন। তিনিও সেই সময় আশ্রমের কাজে যোগ দিলেন। তখন কলাভবন সঙ্গীতভবন শ্রীভবন সবেরই সূত্রপাত হয়েছে। মেয়েরা গান বাজনা, সেলাই, চিত্রাঙ্কন, বুকবাইণ্ডিং, কাঠখোদাই সব কাজেই কিছু কিছু করে ঢুকছেন। অধ্যাপক লেভ্‌নি এবং উইণ্টারনিজ ইউরোপ থেকে এসেছেন। বেথুন কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষা তটিনী দাস তাঁদের কাছে পড়াশুনা করবেন বলে আশ্রমে বাস করতে লাগলেন। কলকাতার কয়েকজন অধ্যাপক আশ্রমের নূতন কলেজে সাহায্য করবেন বলে প্রতি সপ্তাহে আশ্রমে আসতেন। ধীরে ধীরে আশ্রম বিস্তৃততর হতে থাকল। কালো মানুষদের মধ্যে অনেক সাদা মানুষকে বিচরণ করতে দেখা যেতে লাগল। ফ্রান্স, ফ্রান্স, হাঙ্গেরী, ইতালি, রাশিয়া কত দেশের লোক। শুধু পুরুষ নয় মহিলারাও দেখা দিলেন। লিলভাঁ। লেভির মত কেউ কেউ সস্ত্রীক এসেছিলেন। আবার কোনো মহিলা অবিবাহিতা বা স্বামীহীনা অবস্থায় একাই তীর্থ পরিক্রমা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে এলিজাবেথ ক্রনার প্রভৃতি প্রায় চিরজীবনই এদেশে কাটিয়ে দিলেন। কত অসংখ্য ছবি যে ক্রনারা রবীন্দ্রনাথের এঁকেছিলেন বলা শক্ত। সেগুলি শুধু পোর্ট্রেট নয়। রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে তুলিতে আঁকা কবিতার মত নানা রকমের

নানা বিষয়ের ছবি। আঁদ্রে কাপিলেস ছিলেন আর একজন চিত্রশিল্পী। আঁদ্রে রীতিমত ক্লাশ নিতেন। আমরা তাঁর কাছে তৈলচিত্র আর কাঠ খোদাই ব্লক তৈরী শিখতে যেতাম। আঁদ্রের কাছে শেখা ছবি গগনেন্দ্রনাথকে দেখিয়েছিলাম। তিনি খুসী হয়ে ইউরোপে একটা একজিবিশনে অন্য ছবির সঙ্গে সে ছবি দুটিও পাঠালেন। কিন্তু কপালক্রমে সেই জাহাজটাই ডুবে গেল। বড় বড় শিল্পীদের অনেক ছবি সমুদ্রের গর্ভে তলিয়ে গেল। আমার মত নূতন ছাত্রীদের হয়ত দুঃখটা বেশী হয়েছিল।

টুকরা টুকরা কত গল্প মনে পড়ে। সেগুলি সব একত্রে গেঁথে তুলতে হলে সময় দরকার। একটা কথা একবার মনে হয় ত আর একটা হয় না। তাই সুসংবদ্ধ কিছু দিতে পারলাম না।

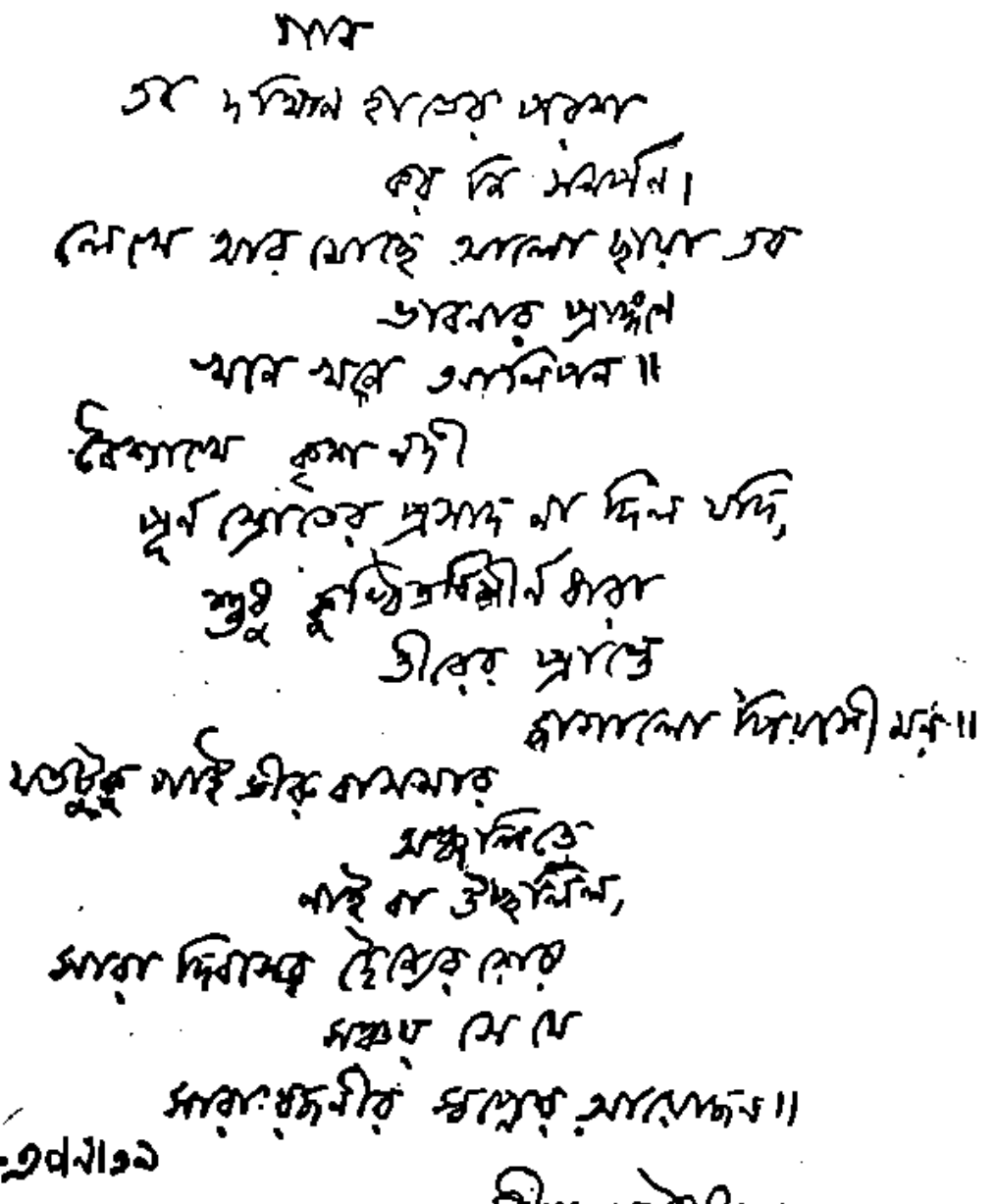

রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য

রথীন্দ্রনাথ রায়

রবীন্দ্রনাথের দাক্ষিণ্যে 'গীতিনাট্য' কথাটি এখন সর্বজনপরিচিত। কিন্তু অনেক আগে এক শ্রেণীর গীতাভিনয় আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল।—বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে সংগীতসনাথ নাট্যরসের আস্বাদন পাওয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাংলা সাহিত্যে বহু গীতাভিনয় রচিত হয়। মনোমোহন বসুর নাম সে যুগের গীতাভিনয় রচয়িতাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। কিন্তু তাঁর গীতাভিনয়ের ঘুন কাঠামো ছিল যাত্রা অথচ যাত্রার প্রাচীনতম আদর্শ জনসাধারণের মধ্যে কোনো নূতন উদ্দীপনার সৃষ্টি করতে পারে নি। তাই মনোমোহন যাত্রা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ইঙ্গমক অনুসরণ করে যাত্রার যে রূপান্তর হয়েছিল, তা সাধারণত অপেরা বা গীতাভিনয় নামে প্রসিদ্ধ। মনোমোহনের এই নূতন ধরণের গীতাভিনয় পরবর্তীকালের বাঙালী নাট্যকারদের অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু সে যুগের গীতিনাট্য রচনার ইতিহাসে মনোমোহনের পথই একমাত্র পথ ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই ইতালিয়ান অপেরার সঙ্গে কলকাতাবাসীদের পরিচয় ঘটে। সাহেবরা বহু টাকা চাঁদা তুলে ইতালিয়ান অপেরা সম্প্রদায়কে কলকাতায় আনাতেন। লিওসে স্ট্রীটের অপেরা হাউসে এর অভিনয় হত।

সকল-কলা-বিদগ্ধ জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারেও বিলেতী থিয়েটার ও বিলেতী সুরের ঢেউ সাদর তুলেছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথই ছিলেন এবিষয়ে সবচেয়ে উদ্যোগী। তাঁর 'সরোজিনী' নাটকের (১৮৭৪) বুধাবি গানের সুর ছিল বিলেতী। তার একটির নাম দিয়েছিলেন ইতালিয়ান বি'ক্কিট। দেশী ও বিলেতী সুরের বিচিত্র পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই নূতন ধরণের গীতিনাট্য জন্মগ্রহণ করে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু কবি অক্ষয় চৌধুরী ছিলেন এই নূতন ধরণের সঙ্গীত আন্দোলনের পুরোধা। বিলেত থেকে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন: "সচরাচর গান বাঁধিয়া তাহাতে সুরসংযোগ করাই প্রচলিত রীতি, কিন্তু আমাদের পদ্ধতি ছিল উল্টো। সুরের অনুরূপ গান তৈরী হত। এই দেশী-বিদেশী সঙ্গীত চর্চার যুগেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম গীতিনাট্য 'মানময়ী' (১৮৮০) রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ বিলেত থেকে ফেরার পর এই নাটক অভিনীত হয়, তিনি তাতে একটি সঙ্গীতও সংযোজন করেন। 'মানময়ী' গীতিনাট্যে কিছু গদ্য-সংলাপও ছিল। সরলাদেবী তাঁর 'শক্তিকাহিনী'তে এই অভিনয় সম্পর্কে বলেছেন: "রবীন্দ্রনাথের জন্য বাড়ীতে ভূমি তৈরী। তিনি এসে তাতে নূতন নূতন বীজক্ষেপ করতে থাকলেন। তিনি আসার পর প্রথম-যে একটি ছোট্ট গীতিনাট্যের অভিনয় হল—যাতে ইন্দ্র ও শচী সাজেন নতুন মামা নতুন মামী এবং বসন্ত সাজেন রবিমামা, তার নাম 'মানময়ী', নতুন মামাই তার রচয়িতা।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'মানময়ী' রচনার এক বছর আগে (১৮৭৯) রবীন্দ্রনাথের বিলাত প্রবাস কালেই স্বর্ণকুমারী দেবীর 'বসন্ত-উৎসব' নামে একখানি গীতিনাট্য প্রকাশিত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎসাহে ও আনুকূল্যেই যে এই গীতিনাট্য রচিত হয়, এ বিষয় কোন সন্দেহ নেই।

'বসন্ত-উৎসব' অধুনা বিস্মৃত, কিন্তু এই গীতিনাট্যখানির একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে। দু'বছর পরে রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি প্রতিভা' গীতিনাট্যের ইতিহাসে যে যুগ সৃষ্টি করেছিল, 'বসন্ত-

উৎসব' তারই শুভ সূচনা। মনোমোহন, গিরিশ চন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রমুখ নাট্যকারের গীতাভিনয় বা-গীতি-নাট্যের সঙ্গে স্বর্ণকুমারীর গীতিনাট্যের পার্থক্য আছে। শেষোক্ত গীতিনাট্য অপেরাধর্মী রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিরুদ্ধ সমালোচক যথার্থই বলেছেন: 'এই নাটকটি অপেরা জাতীয় গীতিনাট্যের ছাঁদে লেখা'। অপেরায় গানের মাধ্যমে অভিনয় হয়, স্বতন্ত্র গান ছাড়াও উক্তি প্রত্যুক্তির ভাষাও গান। এই বৈশিষ্ট্য 'বসন্ত-উৎসব' গীতিনাট্যে লক্ষ্য করা যায়। এর কাহিনী অংশ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, কবিতা সঙ্গীত মূর্তি যখন বসন্ত এখানে চরিত্র হিসাবে এসেছে লেখিকা সামান্য আখ্যায়িকা সূত্র দিয়ে যেন গানেরই মালা গেঁথেছেন। বাংলা গীতিনাট্যের ইতিহাসে সঙ্গীতের সার্বভৌম প্রাধান্য সর্বপ্রথম এখানেই স্বীকৃত হয়েছে। গিরিশচন্দ্র ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রমুখ গীতিনাট্য রচয়িতাদের দৃষ্টি ছিল প্রধানতঃ অভিনয়ের দিকে, তাই তাঁদের গীতিনাট্য নাটকেরই এক বিশেষ প্রকরণ। কিন্তু স্বর্ণকুমারীর গীতিনাট্য সঙ্গীতেরই নাটকীয় বিন্যাস। 'বসন্ত-উৎসব' ছাড়া স্বর্ণকুমারী আরও কয়েকখানি গীতিনাট্য রচনা করেন। 'যমুনা' ছাড়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তিনখানি গীতিনাট্য রচনা করেন—'পুনর্বসন্ত' (১৮৯৯), 'বসন্ত লীলা' (১৯০০) ও 'য়্যালবম' (১৯০০)। কিন্তু তখন রবীন্দ্র প্রতিভার পূর্ণোদয়ের উৎসব-মুখর লগ্ন।

রবীন্দ্রনাথ যখন বিলেত থেকে ফিরে এলেন তখন জোড়াসাঁকোর বাড়ি সাঙ্গীতিক আবহাওয়ায় পূর্ণ। বিলেতে থাকতেই তিনি বিলেতী গানের চর্চা করেছিলেন। দেশে ফিরে এসে সেই সব গান গেয়ে স্বজন সমাজে শুনিয়েছিলেন। 'বাল্মীকি প্রতিভা' সম্পর্কে কবি নিজে বলেছেন।

'এই দেশী ও বিলাতি সুরের চর্চার মধ্যে বাল্মীকি প্রতিভার জন্ম হইল। ইহার সুরগুলি অধিকাংশই দিশি, কিন্তু এই গীতিনাট্য তাহাকে তাহার বৈঠকি মর্যাদা হইতে অঙ্গক্ষেত্রে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে; উড়িয়া চলা যাহার ব্যবসায় তাহাকে মাটিতে হাঁটু করাইবার কাজে লাগানো গিয়াছে।...য়ুরোপীয় ভাষায় যাহাকে অপেরা বলে, বাল্মীকি প্রতিভা তাহা নহে—ইহা সুরে নাটিকা অর্থাৎ সংগীতই তাহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই, ইহার নাট্য বিষয়টাকে সুর করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র। স্বতন্ত্র সংগীতের মাধুর্য ইহার অতি অল্প-স্থানেই আছে।'

'বাল্মীকি-প্রতিভা'র এই স্বকৃত ভাষ্যটি প্রণিধানযোগ্য। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'কে কবি অপেরা না বলে 'সুরে নাটিকা' বলেছেন। এই একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্যেই কবি গীতিনাট্যখানির স্বরূপধর্মকে প্রকাশ করেছেন। য়ুরোপীয় অপেরার সঙ্গে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র পার্থক্য কোথায়, তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন। অপেরাও সুরপ্রধান নাটিকা। কিন্তু এখানে সুরই সব, নাটকীয় আখ্যায়িকা বা কথাবস্তু এখানে নিতান্ত গৌণ। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে নেপল্‌সের অপেরা সমগ্র য়ুরোপকে প্লাবিত করেছিল। নানাবৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে অপেরাকে লঘুধর্মী চিত্ত বিনোদনের মাধ্যম করা হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকেই এই অপেরা তার বিশেষত্ববর্জিত ও প্রাণহীন হয়ে ওঠে। তাই বাস্তবতা ও গভীরতার দিকে ঝোঁক পড়ে। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় অপেরার বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের মধ্যে গভীর পরিবর্তন দেখা দিল। এই পরিবর্তনের পথিকৃৎ হলেন সুবিখ্যাত জার্মান সুরকার ভাগ্‌নার (Wagner)। নাট্যবিষয়কেই সুর ব্যাখ্যা করবে, এই ছিল ভাগ্‌নারের অভিমত। এই শ্রেণীর গীতিনাটিকার নাম দেওয়া হয়েছে 'মিউজিক ড্রামা', 'বাল্মীকি-প্রতিভা' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তার সঙ্গে ভাগ্‌নার বর্ণিত 'মিউজিক ড্রামা'র স্বরূপগত মিল আছে।

'বাল্মীকি প্রতিভা'র অসাধারণ সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে কবি 'কালমৃগয়া' নামে আর একখানি গীতিনাট্য রচনা করেন। 'কালমৃগয়া'তেও 'বাল্মীকি প্রতিভা'র মত গানের সূত্রে অভিনয়রস পরিবেশন করা হয়েছে। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় এই গীতিনাট্যের অনেকটা অংশ 'বাল্মীকি প্রতিভা'র সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ায় ফলে বর্তমানে 'কালমৃগয়া'র আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। 'বাল্মীকি প্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া' বাংলা গীতিনাট্যের ইতিহাসে এক নূতন আদর্শের সৃষ্টি করছে। 'বাল্মীকি প্রতিভা'র প্রায় সাত বছর পর (১৮৮৮) শ্রীমতী সরলা রায়ের অনুরোধে 'মায়ার খেলা' রচিত হয়। সঙ্গীতসমিতির উদ্যোগে এই গীতিনাটিকাটি অভিনীত হয়। এখানে গানের রসই ছিল প্রধান, অভিনয়টা ছিল। গৌণ কবি নিজেই বলেছেন :

'ইহার অনেককাল পরে 'মায়ার খেলা' বলিয়া আর একটি গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম কিন্তু সেটা ভিন্ন জাতের জিনিস! তাহাতে নাট্য মুখ্য নহে, গীতই মুখ্য। 'বাল্মীকি প্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া' যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, 'মায়ার খেলা' তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনাস্রোতের পরে তাহার নির্ভর নহে, ভাবাবেশই তাহার প্রধান উপকরণ। বস্তুত, 'মায়ার খেলা' যখন লিখিয়াছিলাম তখন গানের রসেই সমস্ত মন অভিষিক্ত হইয়াছিল।

'বাল্মীকি প্রতিভা'র সংলাপগুলি সঙ্গীত, কিন্তু 'মায়ার খেলা'র সঙ্গীতগুলি সংলাপাত্মক নয়, তাকে বিশুদ্ধ সঙ্গীতই বলা যায়। 'মায়ার খেলা'র কবি অনেকটা ইতালীয় অপেরা পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন।

শেষজীবনে রবীন্দ্রনাথ নূতন এক নাট্যপদ্ধতি প্রবর্তন করেন। 'চিত্রাঙ্গদা' 'শ্যামা' 'চণ্ডালিকা' এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। 'বাল্মীকি প্রতিভা' বা 'মায়ার খেলা'র সঙ্গে এদের মিল নেই। কারণ এগুলিতে কবি প্রধানত নাচের দিকটিই নজর দিয়েছেন। নৃত্যের মাধ্যমে সূক্ষ্মতর ভাবের মুক্তি ঘটেছে। পরিণত জীবনে কবির ভাব ক্রমশই সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়েছে। কথা দিয়ে যেন সবটুকুকে প্রকাশ করা যায় না। তাই সঙ্গীত ও নৃত্যের যৌথলীলায় নৃত্যনাট্য রচিত হয়েছে। নৃত্যনাট্যের নৃত্য মূলভাববস্তু কোটানোর সাহায্য করেছে। গীতিনাট্যের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী, একথা কবি ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। গানকে যে অভিনয়ের রূপদান করা সম্ভব, একথা তিনি 'বাল্মীকি প্রতিভা' রচনার যুগেই উপলব্ধি করেছিলেন। নৃত্যের সাহায্যেও যে অভিনয় পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে এ ধারণাও তাঁর মনে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। 'চিত্রাঙ্গদা'র মধ্যেও সম্ভাবনার আভাস আছে, 'শ্যামা' ও 'চণ্ডালিকায়' তাও বর্জিত হয়েছে। মোট কথা, এ কথা অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে-রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য এক হিসেবে গীতিনাট্যেরই একটি বিশিষ্ট রূপ।

কবি শেষ জীবনে আর এক শ্রেণীর নাটক রচনা করেন। 'শেষ বর্ষণ' 'বসন্ত' 'নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা' 'নবীন' ও 'প্রাবণ-গাথা'কে ঋতুনাট্য বলা হয়েছে। প্রকৃতিই এখানে প্রধান অভিনেতা গানগুলিকে যেন একটি ভাবসূত্রে গাঁথা হয়েছে—ভাবটি হল ঋতুরূপের মর্ম। মানুষ থাকলেও এখানে তার ভূমিকা গৌণ, কখনও দর্শক আবার কখনও ব্যাখ্যাতা। সামান্য কিছু গল্পও আছে বটে, কিন্তু সে গল্প শুধু সঙ্গীত ও ঘটনাকে সূত্রান্বিত করার জন্য উপস্থিত হয়েছে। এই শ্রেণীর ঋতু-নাট্যগুলিকেও যথার্থ অর্থে নৃত্যসনাথ গীতিনাট্য বলা যায়। শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথ নৃত্যগীত ও অভিনয়ের মধ্যে একটি সমন্বয় স্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ গীতিনাট্যের সম্ভাবনাকে নূতন নূতন রূপ সৃষ্টির পথে এগিয়ে দিয়েছেন।

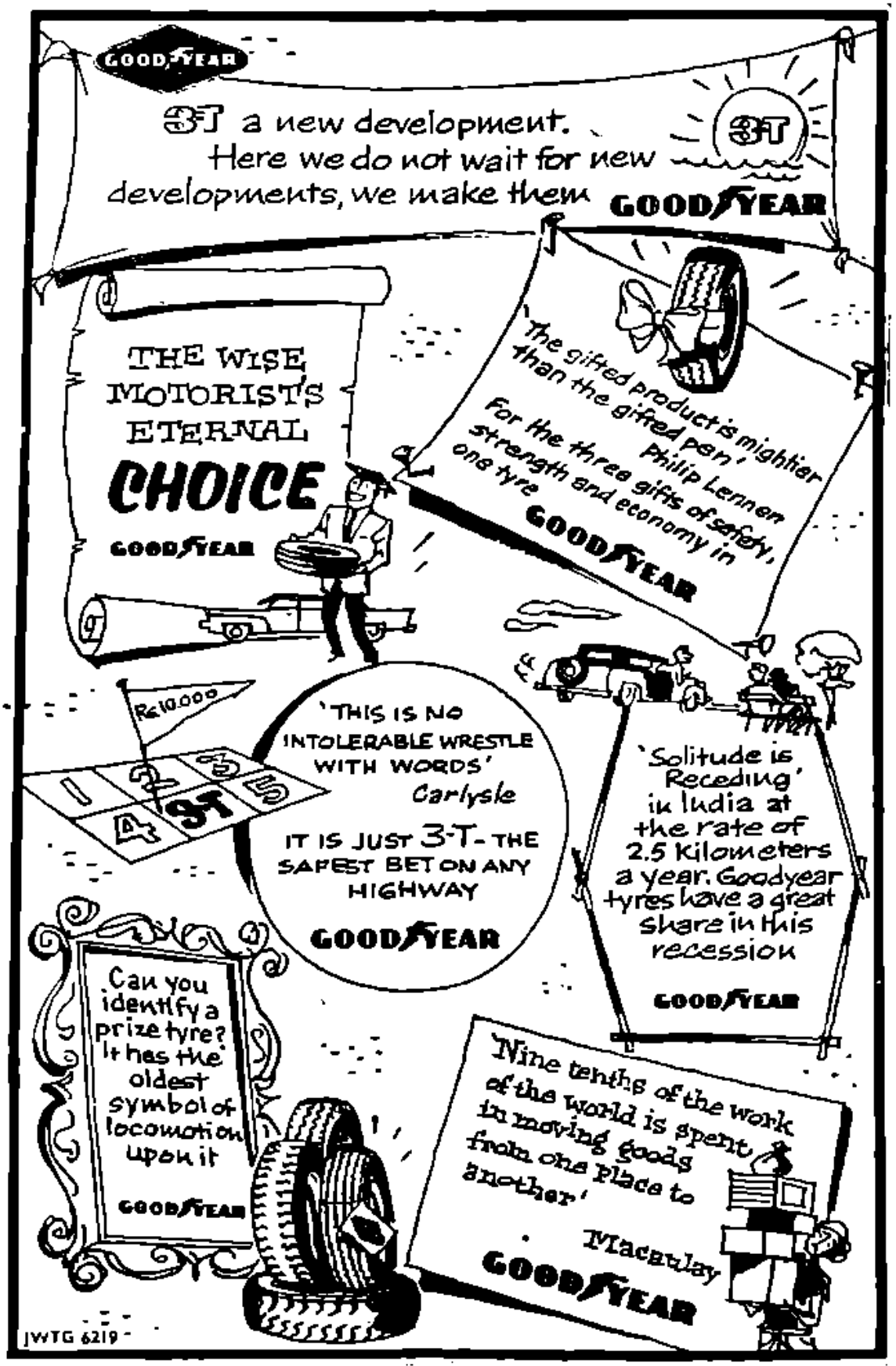
GOODYEAR
3T a new development.
Here we do not wait for new developments, we make them
GOODYEAR
3T
THE WISE MOTORIST'S ETERNAL CHOICE
GOODYEAR
'The gifted product is mightier than the gifted pen'
Philip Lennen
For the three gifts of safety, strength and economy in one tyre
GOODYEAR
Rs10000
1 2 3 4 3T 5
'THIS IS NO INTOLERABLE WRESTLE WITH WORDS'
Carlysle
IT IS JUST 3-T- THE SAFEST BET ON ANY HIGHWAY
GOODYEAR
'Solitude is Receding' in India at the rate of 2.5 kilometers a year. Goodyear tyres have a great share in this recession
GOODYEAR
Can you identify a prize tyre? It has the oldest symbol of locomotion upon it
GOODYEAR
'Nine tenths of the work of the world is spent in moving goods from one place to another'
Macaulay
GOODYEAR
JWTG 6219

রেখাচিত্র
রবীন্দ্রনাথ

বঙ্কিমচন্দ্র

যাত্রীর প্রবাসে চাই রাত্রির তিমির হরিবারে,
সুপ্তিশয্যাপার্শ্বে দীপ এতকাল নিভৃতে বারে বারে।
কালের বিধির স্রোত সৃষ্টির কীর্তির চলে নাশি',
নিশ্চলের আবর্জনা নিশ্চিহ্ন কোথায় যায় ভাসি'।
যাহার শকতি আছে অনাগত যুগের পাথেয়
সৃষ্টির যাত্রায় সেই দিতে পারে আপনার দেয়।
তাই স্বদেশের তরে তারি লাগি উঠিছে প্রার্থনা
ভাগ্যের যা মুষ্টিভিক্ষা নহে, নহে ক্ষীণকণ্যকণা
অঞ্জুর ওবৈনা যার, দিনান্তের অবজ্ঞার দান
আরম্ভেই যার অবসান।

সে প্রার্থনা খুঁজিতেছে, হে বঙ্কিম, কালের যে বর
এনেছ আপন হাতে নহে তাহা নির্জীব সুন্দর।
নবযুগসাহিত্যের উৎস উঠি' মনুস্পর্শে তব
চিরচলমান স্রোতে জাগাইছে প্রাণ অভিনব
এ বঙ্গের চিত্তক্ষেত্রে, চলিতেছে সম্মুখের টানে
নিত্য নব প্রত্যাশায় ফলবান ভবিষ্যৎ পানে।
তাই তুমি আজি সে বাণীর তরঙ্গ কল্লোলে,
বঙ্কিম, তোমার নাম, তব কীর্তি সেই স্রোতে দোলে।
বঙ্গ ভারতীর সাথে মিলায়ে তোমার আয়ু সনি,
তাই তব করি জয়ধ্বনি।

রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাখীসঙ্গীত

"বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার হাওয়া বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান—

বাংলার ঘর বাংলার হাট
বাংলার বন বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক
পূর্ণ হউক হে ভগবান—

বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা
বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা
সত্য হউক সত্য হউক
সত্য হউক হে ভগবান—

বাঙালীর মন বাঙালীর প্রাণ
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক এক হউক
এক হউক হে ভগবান।"

স্বদেশীযুগে রবীন্দ্রনাথ (১৯০৪)

১৮৯৯ সালে প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ-
কালে রবীন্দ্রনাথ

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতি রবীন্দ্রনাথ (১৯০৭)

"সাধনা" সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ (১৮৯৪)

"প্রবলতার মধ্যে সম্পূর্ণতার আদর্শ নেই। সমগ্রের সামঞ্জস্য নষ্ট করে প্রবলতা নিজেকে স্বতন্ত্র করে দেখায় বলেই তাকে বড়ো মনে হয়, কিন্তু আসলে সে ক্ষুদ্র। ভারতবর্ষ এই প্রবলতাকে চায়নি, সে পরিপূর্ণতাকেই চেয়েছিল। এই পরিপূর্ণতা নিখিলের সঙ্গে যোগে—"

—সাধনা

"বিপদে মোরে রক্ষা করো
এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখতাপে ব্যথিত চিতে
নাই-বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।
সহায় মোর না যদি জুটে
নিজের বল না যেন টুটে,
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি
লভিলে শুধু বঞ্চনা
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।"

—গীতাঞ্জলি

গীতাঞ্জলি রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ
(১৯১০)

গোরা রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ (১৯০৮)

"আপনি যাদের অশিক্ষিত বলেন, আমি তাদেরই দলে। যতক্ষণ না আপনি দেশকে ভালবাসেন, দেশের লোকের সঙ্গে একজায়গায় এসে দাঁড়াবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার মুখ থেকে দেশের নিন্দা আমি এক বর্ণও সহ্য করব না। দেশের সংশোধন ঢের পরের কথা। সংশোধনের চেয়েও অনেক বড় কথা ভালোবাসা শ্রদ্ধা। আগে দেশকে ভালোবাসতে শিখুন, সংশোধন ভেতর থেকে আপনিই হবে। আগে দেশের আত্মীয় হন, তারপর দেশের সংশোধক হবেন।" —গোরা

ঘরে বাইরে রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ (১৯১৫)

"আমি বেশি সুখে যেতে চাইনে, আমি মোটা কথাই বলব। আমি মানুষ। আমার লোভ আছে, আমি দেশের জন্য লোভ করব; আমি কিছু চাই না আমি কাড়ব-কুড়ব। আমার রাগ আছে। আমি দেশের জন্য রাগ করব; আমি কাউকে চাই যাকে কাটব-কুটব; যার উপরে আমি আমার অস্ত্রের শোধ তুলব। আমার মোহ আছে, আমি দেশকে নিয়ে মুগ্ধ হব; আমি দেশের এমন একটি প্রত্যক্ষ রূপ চাই, যাকে আমি মা বলব, দেবী বলব, দুর্গা বলব।"

—ঘরে বাইরে

বিলাতে রবীন্দ্রনাথ (১৮৯০)

আমাদের দেশে তীর্থযাত্রা ধর্মসাধনার একটি প্রধান অঙ্গ। দেবতাকে যখন অভ্যাসের পর্দায় ঘিরে রাখে তখন আমরা সেই পর্দাকেই পূজা করি। যাদের মন স্বভাবতই বিষয়ী, ধর্মচর্চাতেও যারা বস্তুকে বেশি হাত দেয়, তারা দেবতার চেয়ে পর্দাকেই বেশী শ্রদ্ধা করে।"

—পশ্চিম যাত্রার ডায়েরী

পঞ্চাশ বর্ষে রবীন্দ্রনাথ (১৯১১)

চার অধ্যায় রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ (১৯৩৪)

"তোমরা যাকে পেট্রিয়ট বলো—আমি সেই পেট্রিয়ট নই। পেট্রিয়টিজমের চেয়ে যা বড়ো তাকে যারা সর্বোচ্চে না মানে তাদের পেট্রিয়টিজম কুমিরের পিঠে চড়ে পার হবার খেয়া নৌকা। মিথ্যাচরণ, নীচতা, পরস্পরকে অবিশ্বাস, ক্ষমতা লাভের চক্রান্ত, গুপ্তচরবৃত্তি একদিন তাকে টেনে নিয়ে যাবে পাঁকের তলায়। এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এই গর্তর ভেতরকার কুশ্রী অপঘাতের মধ্যে দিনরাত মিথ্যের বিষাক্ত হাওয়ায় কখনোই নিজের স্বভাবে সেই পৌরুষকে রক্ষা করতে পারব না, যাতে পৃথিবীতে কোন বড় কাজ করতে পারা যায়।"

—চার অধ্যায়

গল্প-ভারতী

জ্যৈষ্ঠ—১৩৭০

সম্পাদক :

সহঃ সম্পাদক : শ্রীকল্যাণ রায়

মূল্য. এক টাকা

শ্রীসুধাংশু কুমার রায় চৌধুরী কর্তৃক ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেড ২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত এবং কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

সংক্রমণ প্রতিরোধে নির্ভরযোগ্য

কাটা-ছেঁড়ায়, পোকার কামড়ে আশুফলপ্রদ, কুলকুচি ও মুখ ধোয়ায় কার্যকরী। ঘর, মেঝে ইত্যাদি জীবাণুমুক্ত রাখতে অত্যাবশ্যক।

এ্যানটল

১০, ১১০, ৩৪০ মিলি বোতলে ও ৮-৫ লিটার টিনে পাওয়া যায়।

ফেদেল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ তৈরী।

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়—	৯০৭
উদাত্ত আহ্বান—	৯০৯
সঙ্গীত আসর—নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষের গান—রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৯১২
রবীন্দ্রযুগ—শ্রীকালিদাস নাগ	৯১৩
অন্তরীক্ষে—(ব্যঙ্গচিত্র)	৯১৫
বিজ্ঞান-বার্তা—মহা আকাশ অভিযানে নব অধ্যায়—সত্যজিৎ	৯১৯
জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৯২৩
চিঠি শুধু চিঠি নয়—	৯৩০
ভালবাসা—মণিকুন্তলা মুখোপাধ্যায় (কাজল)	৯৩১
আমার স্মৃতি (বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ)—শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৯৪৫
অমৃত কথা ও কাহিনী—	৯৫৯
লেখিকাদের কথা—শ্রীশান্তা দেবী	৯৫৫
বীরবলের কৌতুক—বরকচি	৯৫৮
জীবনের যজ্ঞশালায় (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	৯৬৩
একজন আর কয়েকজন—অনিলকুমার ভট্টাচার্য	৯৬৮

ওপরায় নাম ওনলেই ছোটদের মাতোয়ারা,—কে. সি. দাসের চকোলা হলে তো কথাই নেই! কে. সি. দাসের টিনের চকোলা যেমনি সুস্বাদু তেমনি বিশুদ্ধ, পুষ্টিও ষোল আনা। একটা টিন আজই কিনুন—নিজেরাও খান ছেলেমেয়েদেরও খাওয়ান।

দাম ঃ

ছোট টিন টাঃ ১.২৫
মাঝারি টিন টাঃ ২.৫০
বড় টিন টাঃ ৫

কে. সি. দাস প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা • বোম্বাই

এই সংখ্যায়

বিশ্ব-সাহিত্য—

সাহিত্য ও সাহিত্যিক—এডওয়ার্ড লিয়রের "ভারত জার্নাল"—সুবীর রায়চৌধুরী ৯৭৪

ম্যাক্সিম গোর্কি— ৯৭৭

সাহিত্য সংবাদ—যে নায়ক অনুপস্থিত—পবিত্র পাল ৯৭৯

এই প্রথম—অবশেষে—রেণুকা চক্রবর্তী ৯৮২

রঞ্জন-রশ্মি—শ্রীরঞ্জনীরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় ৯৮৭

দেশ-বিদেশ— ৯৯৩

খেলাধূলা— ১০০০

বৃটেন (সচিত্র সংযোজন)

গ্রেটবৃটেন— ১০০২

ইংরাজী সাহিত্য—অরবিন্দ পোদ্দার ১০০৭

স্নানের আনন্দ...

স্নানের পর এই
সাবানের মধুর চন্দন-গন্ধ
আপনাকে সারাদিন
সজীব ও প্রফুল্ল রাখবে।

বেঙ্গল
কেমিক্যালের
গোল্ডেন

স্যাণ্ডালউড
সোপ

বেঙ্গল
কেমিক্যাল
কলিকাতা বোম্বাই কানপুর

অধিকতর
ভেষজগুণসম্পন্ন
নবরূপে রূপায়িত

কিংকো'র

আর্ণিকা

হেয়ার অয়েল

প্রস্তুতকারক
কিং এণ্ড কোং
কলিকাতা-৭

একমাত্র পরিবেশক—আর. ডি. এস. এণ্ড কোং ১৯৭, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

শাশ্বত ঐতিহ্য

৭৫ বছরেরও উপর বস্ত্রবন্ধীর জনপ্রিয়তা বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্প জগতে এক বিরাট গৌরবময় ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছে। দেশের ক্রমবর্দ্ধন চাহিদা মেটাবার জন্য সম্প্রতি উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতী আমদানী করে মিলের উৎপাদন বাড়ানো হয়েছে।

উজ্জলশ্রী

কটন মিলস্ লিমিটেড

৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

KALPANA.BL.6 B

গ্রন্থশ্রী সংবাদ — এইমাত্র বের হলো

আনন্দবাজারে প্রকাশিত অংশুমান মিত্র প্রণীত

ইতিহাসের নায়িকা ২·৫০

ইতিহাসের কয়েকটি ছেঁড়া পাতার জোড়া কাহিনী ইতিহাসের চেয়েও চমকপ্রদ ভঙ্গিতে লেখা। পাতায় পাতায় চণ্ডী লাহিড়ীর প্রতিকৃতি অঙ্কনে সজীব কয়েকটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ নারীর জীবন-কাহিনী।

॥ আরো কয়েকখানি বই ॥

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস

চোখের বাহিরে ··· ২·৫০

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস

যদি জানতেম ··· ৪·০০

কন্যা মৃগয়া ··· ৩·০০

সাতদিন (ছোট গল্প) ··· ২·৫০

সুবোধ ঘোষের উপন্যাস

মুক্তিপ্রিয়া ··· ২·৫০

চিত্তরঞ্জন মাইতির উপন্যাস

ডাক্তার জনসনের ডায়েরী ৩·০০

বারীন্দ্রনাথ দাশের উপন্যাস

অনেক সন্ধ্যা একটি সন্ধ্যাতারা ৪·০০

প্রভাত দেব সরকারের উপন্যাস

মধুর এমন ··· ৩·০০

গ্রন্থশ্রী প্রাইভেট লিঃ

১৭০।১৩, প্রিন্স আনোয়ার সা রোড,

কলিকাতা-৩৩

ভয়েস অব আমেরিকার

বাংলা অনুষ্ঠান শুনুন—

প্রত্যহ ঃ

সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৭-৩০ মিঃ

১৯'৭৬, ২৫'৫৮ ও ৪২'১৯ মিটারে

রামায়ণ

কৃত্তিবাস বিরচিত

পূর্ণাঙ্গ রামায়ণটির বহুবর্ণ চিত্র সমন্বিত যুগরুচিসম্মত অনিন্দ্য প্রকাশন। ড: সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত। [২৲]

বঙ্কিম রচনাবলী

প্রথম খণ্ড : সমগ্র উপন্যাস (মোট ১৪খানি একত্রে) ১২৲

দ্বিতীয় খণ্ড সমগ্র সাহিত্য-অংশ একত্রে। [১৫৲]

রমেশ রচনাবলী

রমেশচন্দ্র দত্তের সমগ্র উপন্যাস (মোট ৬খানি) একত্রে ৯৲

উভয় রচনাবলীই শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত ও লেখকদ্বিদের সাহিত্যকীর্তি আলোচিত।

সংসদ্ বাংলা অভিধান

পরিবর্ধিত ও সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। [৮৫০]

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত-সাহিত্য

গ্রন্থটি রচনার জন্য লেখক ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত সাহিত্য আকাদমী পুরস্কারে ভূষিত। [১৫৲]

বৈষ্ণব পদাবলী

সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রায় চার হাজার পদের সঙ্কলন, টীকা, শব্দার্থ ও বর্ণানুক্রমিক সূচী সম্বলিত পদাবলী সাহিত্যের আধুনিকতম আকর-গ্রন্থ। [১৫৲]

রবীন্দ্র-দর্শন

রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক রবীন্দ্র জীবনবেদের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা। [২৫০]

জীবনের ঝরাপাতা

সরলা দেবীচৌধুরাণীর আত্মচরিত ঠাকুরবাড়ীর আলেখ্য ও নবজাগরণ যুগচিত্র। [৪৲]

পুস্তক তালিকার জন্য লিখুন :

সাহিত্য সংসদ ৩২-এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

— আমাদের বই সর্বত্র পাওয়া যায় —

শ্রীআয়ুর্ব্বেদমের—

মহাভৃঙ্গরাজ তৈল

•

কেশ ও মস্তিষ্কের
পক্ষে অতুলনীয়

•

বহু পরীক্ষিত ও
দেশবরেণ্যগণ কর্তৃক
উচ্চ প্রশংসিত

•

শ্রীআয়ুর্ব্বেদম্

২৭৯এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬

ফোন : ৫৫-৩২৯৪

বড় বড় ষ্টেশনারী দোকানে পাওয়া যায়।

মডার্ণ ডেকরেটরস

৬৫ এ, ডব্লু, সি, বানার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ ফোন ৫৫-২০৪০

গল্প-ভারতী

জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০

সম্পাদকীয়

সাধক রামমোহন :

ভারতের প্রাণ-পুরুষ রাজর্ষি রামমোহন ১৯২ বছর আগে (৮ই জ্যৈষ্ঠ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আট বছর পরে রাজা রামমোহনের দ্বিশতবার্ষিকী জন্মোৎসব পালিত হবে। রাজা রামমোহনের প্রথম মৃত্যুশতাব্দীতে সভাপতির ভাষণে রবীন্দ্রনাথ 'ভারত পথিক রামমোহনের' প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। (কবির "ভারত পথিক" প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।) ১৯৪৯ সালে আজাদ বক্তৃতামালার উদ্বোধনের সময় পণ্ডিত নেহেরুও রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ ও গান্ধিজী তাঁর জীবনের উপর এই চারজনের স্থায়ী প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। ৬০ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে রামমোহন যে অতুলনীয় কর্মপ্রতিভা ও অনন্যসাধারণ কর্মশক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা ভারতের ও ভারতবাসীর অক্ষয় সম্পদ—চরম গৌরবের বিষয়। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় গল্প-ভারতীতে তাই ভারত-আত্মা রামমোহনের কথা দেশবাসীকে স্মরণ করাই। বর্তমান ভারতবর্ষের নবচেতনার উন্মেষ-যুগে আমরা ভারত সাধক রামমোহনের কাছ থেকে নবজাগরণের দীক্ষা পাই। রাজা রামমোহন ভারত ইতিহাসের সেই অবিনশ্বর ভারত-পথিকদেরই একজন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের আভ্যন্তরিক প্রয়োজন থেকেই তাঁর জন্ম হয়। রাজা রামমোহন জন্মেছিলেন ভারতবর্ষের ইতিহাসে সবচেয়ে বিচিত্র যুগ-সন্ধিক্ষণে। রামমোহনের প্রচেষ্টায়ই ভারতবর্ষের স্বতন্ত্র ইতিহাসে বিশ্বের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হল। বিশ্বের সঙ্গে ভারতের আত্মিক যোগসূত্র স্থাপনের জন্য রামমোহনই একান্তভাবে পৌরোহিত্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৩২ সালে ফ্রান্সে যাবার পরিকল্পনার সময় তিনি ফরাসী রাষ্ট্রদূতকে লিখেছিলেন "সমগ্র মানবজাতি একই পরিবার। পরস্পরের মিলন ও যোগাযোগে বিশ্বমানবের মিলন বর্দ্ধিত হয়।" একান্ত দুঃখের বিষয় ভারত-সাধক রামমোহনের অমূল্য রচনা সম্ভার আজও সাধারণ্যে দুষ্প্রাপ্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাঁর বাংলা তথা সংস্কৃত রচনাদি পুনর্মুদ্রিত করে আমাদের ধন্যবাদ অর্জন করেছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজও রাজার English work (প্রায় ৯০০ পৃষ্ঠার গ্রন্থ) ছেপেছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে শেষ কর্মা অগ্নিদাহে নষ্ট হয়েছে। আমি ইতিপূর্বেও গল্প-ভারতীতে এবিষয়ে একবার উল্লেখ করেছি। দেশবাসী ও জাতীয় সরকারের এদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বহু আয়াসলব্ধ

রামমোহনের জীবনী প্রকাশ করেন শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—সেটিও আজ দুষ্প্রাপ্য। দুইজন বিদুষী ইংরাজ মহিলা Miss Colettee (London) ও Miss Carpenter (Bristol) রামমোহন সম্পর্কে যে দুখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে গেছেন তারও পুনর্মুদ্রণ আশু প্রয়োজন। এ বিষয়ে আমরা যত শীঘ্র অবহিত হতে পারি দেশের ও দশের পক্ষে ততই মঙ্গল। আমাদের সরকারের পুস্তক প্রকাশনা বিভাগ (Publications Division) সম্প্রতি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতাবলীর একটি সুমুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ করে বহুকালের একটি প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করেছেন। আশাকরি রামমোহন রচনাবলীর প্রকাশনার বিষয়েও তাঁরা অবিলম্বে যত্নবান হবেন।

রামমোহন গ্রন্থপঞ্জী

১৮১৫ বেদান্ত গ্রন্থ ও বেদান্তসার

১৮১৬—২০ কেন ঈশ কঠ মাণ্ডক্য ও মুণ্ডক উপনিষদ (১৮১৮)

১৮১৭ ভট্টাচার্য ও উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার ; গোস্বামী ও কবিতাকারের সহিত বিচার (১৮২০)

১৮১৮-১৯ সহমরণ বিষয়ে—প্রবর্তক ও নিবর্তকের সংবাদ

১৮১৯ আত্মানাত্ম বিবেক ১৮২১ ব্রাহ্মণ সেবধি ও মিসিনরি সম্বাদ

১৮২৩ প্রার্থনা পত্র ১৮২২ চারি প্রশ্নের উত্তর

১৮২৭ বজ্রসূচী ১৮২৩ পাদ্রিশিষ্যসংবাদ ও পথ্য প্রদান ; পাদরি ও শিষ্য সম্বাদ

১৮৩৩ গৌড়ীয় ব্যাকরণ (প্রথম ইংরাজীতে ১৮২৬) ইউরোপীয়দের বাংলা শিখবার জন্য।

১৮২৮—৩৩ ব্রহ্ম সঙ্গীত ও অধুনাপুপ্ত ভগবদ্গীতার পদ্যানুবাদ—১৮৪৮ সালের উল্লেখ আছে কিন্তু গ্রন্থ মেলে নাই।

কুলার্ণব গ্রন্থ, পারীরক মীমাংসা ও মূল উপনিষদ (ভাষ্য সমেত) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ছাপান নাই।

হিন্দী (ও হয়ত উর্দু) রচনাও তাঁর ছিল কিন্তু এখন মেলেনা।

বাইবেলের সংক্ষেপানুবাদ তিনি নিজে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু আজও কেউ দেখেন নাই।

ফার্সী "তুহফৎ" ঢাকা থেকে আমরা অনুবাদ প্রকাশ করেছি, কিন্তু তাঁর আরবী রচনা "মনাজারাৎ" লুপ্ত হয়েছে।

মাইকেলের সহপাঠী রাজনারায়ণ বসুর প্রচেষ্টায় রামমোহন রচনাদি বিস্মৃতির গ্রাস থেকে রক্ষা পেয়েছে।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

উদাত্ত আহ্বান

"বর্তমান ভারত স্বামিজীরই সৃষ্টি" — নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বাণী

দেশের দীন-দুঃখী গরীবদের ওপর স্বামিজীর ভালোবাসা ছিল কত বিশাল ও গভীর। সে ভালবাসা ছিল যেন সমুদ্রেরই মতন, যেমন বিশাল তেমন গভীর। আপনারা কি তাঁর "স্বদেশ-মন্ত্র" পড়েছেন? সেই শক্তি-প্রদত্ত মন্ত্র, সেই বজ্রকণ্ঠের বীরবাণী—যে বীর সাহস অবলম্বন করো। সদর্পে বল—"আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বলো ভাই ভারতের দেবদেবী আমার ইষ্ট, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, ভারতের কল্যাণে আমার কল্যাণ"। আর দিবা-রাত্রি প্রার্থনা করো: 'হে গৌরীনাথ! হে জগদম্বে! আমার দুর্বলতা দূর করো, আমার কাপুরুষতা ঘুচাও—আমায় মানুষ করো।'

স্বামিজীর ব্যক্তিত্ব ছিল প্রচণ্ড পৌরুষের শক্তিতে (masculine strength)। তিনি ছিলেন শক্তিসাধনার সিদ্ধসাধক আর তাঁর বেলায় ধর্ম্মব্যাখ্যা কর্মজীবনে পরিণত হয়ে এই দেশ ও জাতির উত্থানের সূচনা করেছে। স্বামিজীর বাণী—"শক্তি—শক্তি শুধু শক্তি," উপনিষদের এই মন্ত্র আর এই বাণীই তাঁর কণ্ঠ থেকে বজ্রগম্ভীর স্বরে সবসময়ে শোনা যেতো। দেশের যুবকদের চরিত্র যাতে গড়ে ওঠে সেইদিকেই তিনি সবচেয়ে বেশী জোর দিতেন।

আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্বামিজীর সম্বন্ধে বলে যেতে পারি, আর তা ব'লে গেলেও তবুও এই মহাপুরুষের সকল দিক ঠিকভাবে বলা হয়ে উঠবে না। সত্যই স্বামিজী ছিলেন যেমন মহান, তেমনি গভীর—তেমনি বৈচিত্র্যশীল ও দুর্বোধ্য। সত্যকে সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করেছেন—এমন একজন শ্রেষ্ঠ যোগী

তাঁর স্বদেশবাসীদের ও সমস্ত মানবজাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সর্বতোভাবে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন এর চেয়ে আর সংক্ষেপে স্বামিজীর সম্বন্ধে বলা যায় না। যদি স্বামিজী আজ থাকতেন তাহলে আমি শিষ্যরূপে তাঁর পায়ের তলায় বসতুম।

বর্তমান ভারত স্বামিজীরই সৃষ্টি।

চাই মানুষ—প্রাণবন্ত যৌবন :

কাব্য, সাহিত্য, শিল্পকলা, দর্শন-বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যায়াম ক্রীড়া, সমাজ ও রাষ্ট্র—এসবের মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনের বিকাশ হয়ে থাকে। সুতরাং এইসবের ভিতর দিয়ে তরুণের আত্মপ্রকাশ ঘটে থাকে। অন্তরে প্রাণ যখন জাগে তখন সুপ্তোত্থিতের প্রাণধারা শতমুখী হয়ে নিজেকে প্রকট করে। কোন মন্ত্রবলে সুপ্তশক্তির বোধন হতে পারে তাহাই অনুসন্ধানের বিষয়।

অনেকের ধারণা যে, জনসাধারণকে বা তরুণ সমাজকে জাগাতে হলে রাষ্ট্র বা সমাজ সম্পর্কীয় মতবাদ প্রচার করতেই হবে। সমাজ ও রাষ্ট্রের আদর্শ কি হওয়া উচিত এ বিষয়ে আজকাল অনেক প্রকার মতবাদ বা 'ইজম' প্রচলিত আছে।

এক একটি 'ইজম'-এর গোঁড়া ভক্তেরা মনে করেন যে, ঐ মতের প্রতিষ্ঠা হলে পৃথিবীর সকল দুঃখ দূর হবে। আজকাল তাই কোন কোন দেশে 'ইজম'-এর লড়াই খুব। আমার নিজের কিন্তু মনে হয় যে, কোনও 'ইজম'-এর বা মতবাদের দ্বারা মানবজাতি উদ্ধার হতে পারে না, যদি সর্বাগ্রে মানুষোচিত চরিত্রবল লাভ না করতে পারি। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলতেন Man-making is my mission—মানুষ তৈরী করা আমার জীবনের উদ্দেশ্য। জাতি গঠনের এবং 'ইজম' প্রতিষ্ঠার ভিত্তি—খাঁটি মানুষ। খাঁটি মানুষ সৃষ্টি করা যুব আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য। খাঁটি মানুষ সৃষ্টি করতে হলে সব দিক দিয়ে তার বিকাশ হওয়া চাই।

চাই খাঁটি মানুষ!

যে মতবাদ বা 'ism'গ্রহণ করা হোক না কেন, তা যদি সার্থক করে তুলতে হয় তা' হলে অতীত ইতিহাসের ধারা আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও চারিদিকের পরিবেশের কথা স্মরণ করে কাজ করতে হবে। ভারতের আজ হীন অবস্থা কেন? আছে তো সবই—প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, শারীরিক বল, শিক্ষা-দীক্ষা, শৌর্য-বীর্য, বিদ্যা-বুদ্ধি-এর কোনটিরই অভাব নেই। এসব উপাদান দিয়ে আমরা জাতীয় জীবনের একটি নিখুঁত মূর্তি রচনা করতে পারি। কিন্তু প্রাণ প্রতিষ্ঠার আয়োজন কোথায়? আছে আমাদের সবই। নাই শুধু একটি বস্তু—নিশ্চেষে আত্মবলিদান, সকল বাধা অতিক্রম করে, যাবতীয় বিঘ্ন তুচ্ছ করে একটি আদর্শের পিছনে সারা জীবনভোর অনুধাবনের ক্ষমতা। এই ক্ষমতা, এই tenacity of purpose আমাদের নেই। এই tenacity of purpose বা moral stamina বলে-বলে যুগ-যুগান্তর তপস্যা করেও পাব না, পাব নিত্য কাজের মধ্যে জীবন ঢেলে দিয়ে, অবিরাম সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে।

———•

"Our motherland is seeking liberty. She can no more live without liberty. But liberty demands sacrifice at its altar. Liberty demands the unstinted sacrifice of your strength, your wealth, all that you value, all that you possess. Like the revolutionaries of the past you must sacrifice your ease, your comfort, your pleasure, your cash, your property."

• • •

"Comrades! You are today the custodians of India's national honour and the embodiment of India's hopes and aspirations. So conduct yourselves that your countrymen may bless you and posterity may be proud of you. I assure you that I shall be with you in darkness and in sunshine, in sorrow and in joy, in suffering and in victory. For the present, I can offer you nothing except hunger, thirst, suffering, forced marches and death. It does not matter who among us will live to see India free. It is enough that India shall be free and that we shall give our all to make her free. May God now bless our country and grant us victory in the coming fight!"

• • • •

"I regard myself as the servant of the 38 crores of my countrymen who profess different religious faiths. I am determined to discharge my duties in such a manner that the interest of these 38 crores may be safe in my hands and that every single Indian will have reason to put complete trust on me. It is only on the basis of undiluted nationalism and of perfect justice and impartiality that India's army of liberation can be built up. • • The Azad Hind Fauz has a vital role to play. To fulfil this role we must wield ourselves into an army that will have only one goal namely—the freedom of India—and only one will—"to do or die" in the cause of India's Freedom. When we stand the Azad Hind Fauz has to be like a wall of granite; when we march, the Azad Hind Fauz has to be like a steam roller."

———

নাট্যসম্রাট গিরীশচন্দ্র ঘোষের গান

কাফী—ত্রিতাল

নীল যমুনা ধাইছে সাগরে মিলিতে সাধে
মৃদু মৃদু কলনাদে।
ধায় মম হৃদয়-প্রবাহ কোথা পাব শ্যামচাঁদে॥

আশা কেন করে লো রঙ্গ
হৃদি মাঝে কত নাচে তরঙ্গ
নেচে প্রাণ পাবে ত্রিভঙ্গ
ডোবে সখি বিষাদে॥

০	১	২	৩
পা মা ধা ।	মা জ্ঞা রসা রা I	মা -া মপা মা	পা -া -া -া
নী ০ ০ ল	য মু না ০ ০	ধা া ০০ ই	ছে ০ ০ ০
০	১	২	৩
মা ধপা মজ্ঞা রা	জ্ঞা রা সা -া I	রা সা ণ্‌ধ্‌া ণ্‌া	জ্ঞা রা রা রজ্ঞা
সা ০ ঁ ০ গ ০ রে	মি লি তে ০	সা ধে মু ০ দু	মৃ দু ক লৈ ০
০	১	২	৩
সা রা রমা -া	মা পা ধা ধপা I	পা ধা পা র্সা	র্সা -া র্সা র্রা
না হে ধা০ য়	ম ম দ ন ০	য় প্র বা ০	হ ০ কো ০
০	১	২	৩
র্সপা -া ণ্‌ধা পা	মা পা মপা ধপা	ণধ্‌া পা মা ধপা	মজ্ঞা রা -া -া II
ধা ০ ০ পা ব	জ্ঞা ০ ০০ ০০	০০ ব ধা ০০	ছে ০ ০ ০
০	১	২	৩
পা নধা পা ধা	না না র্সা র্রা I	র্সা না র্সা -া	-া -া -া -া
আ শা০ কে ন	ক রে লো ০ র ০ ঙ ০		০ ০ ০ ০
০	১	২	৩
ধা পা র্রা র্রা	র্রা র্মজ্ঞা রা র্সা I	র্রা র্সপা ধা র্সপা	ধা -া -া -া
হৃ দি মা ঝে	ক ত ০ না চে ত র ০ ০ ০০		ঙ ০ ০ ০
০	১	২	৩
পা মা ধা ধা	ধা ধা পা র্সা I	র্সা পা ধর্সা ণধা	পা -া -া -া
নে চে ও ঠে	প্রা ণ পা বে ত্রি ভ ০০ ০০		ঙ ০ ০ ০
০	১	২	৩
পা মপা পা মা	মা -া -া -পা I	মা া রমা জ্ঞরা	সা রা া -া II II
ডো বে০ ০ স	খি ০ ০ ০	খি ০ ০ ০ ০	বা ০ ০ দে ০

শ্রীকালিদাস নাগ

যুদ্ধের মধ্যে বাইরের পৃথিবীর খবর জানবার জন্য বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যেন অধীর হয়ে উঠেছিলেন। 'বিচিত্রা' প্রতিষ্ঠার সময় থেকে নিয়মিত তাঁর কাছে আসা ও আলোচনার ভিতর দিয়ে বুঝেছিলাম যে তিনি শুধু নামে 'বিশ্বকবি' নন। বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের ভবিষ্যৎ দেখার চেষ্টা তাঁর চিরকালের। এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সন (আগস্ট ১৯১৪) কিছুকাল বাহিরে গিয়েছিলেন—২৭শে সেপ্টেম্বর কবি রামমোহনের মৃত্যুবার্ষিকীতে এক অপূর্ব ভাষণ দিলেন। সেটি আমরা পরবর্তীকালে দেখতে পাই "ভারতপথিক রামমোহন" বইটিতে। সেই সেপ্টেম্বরের ২০শে কবি লিখছেন, "you (Andrews and Pearson) have left your nest for the passage across the sea and I can hardly control my wings." (মোর জানা নাই, আছি এক ঠাঁই সে কথা যে যাই পাশরি) নানাকারণে (রাজনৈতিক কারণেও বটে) কবির বিদেশ যাত্রা সম্ভব হলনা—তিনি বেরিয়ে পড়লেন কাশ্মীর ভ্রমণে। তখন কাশ্মীরে ছিলেন পণ্ডিত জগদীশ চট্টোপাধ্যায়। তিনি ব্যবস্থা করেছিলেন কবি "রাজ অতিথি হবেন"—তাই সঙ্গে নিলেন—প্রতিমা দেবীকে, রথীন্দ্রনাথ ও কবি সন্তোষ মজুমদারকে। কবি বেশীর ভাগ Houseboat-এই ছিলেন শ্রীনগরের কাছাকাছি। একবার মাত্র "মার্তণ্ডের মন্দির" তাঁকে দেখিয়ে আনা হয়। ২১শে চৈত্র ১৩২১ এর সময় 'বলাকার' বেশীর ভাগ কবিতাই লেখা শেষ হয়ে গিয়েছে। তার সাতমাস পরে কাশ্মীর থেকে ফিরে নতুন কবিতা জুড়লেন। যার গভীর তাৎপর্য পরে পেয়েছি। "সন্ধ্যারাগে' ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা' (কার্তিক ১৩২২)। তার সঙ্গে বিশ্বযুদ্ধের তূর্য নিনাদ "দূর হতে কি শুনিস মৃত্যুর গর্জন।" মৃত্যুর বিভীষিকা, আর্তনাদ ও নির্দয়তা একদিকে কবিকে যেমন আকুল করেছে ; তেমনি তাঁর অজ্ঞাতসারে রঁমারঁল্যা নিজেদের জাতীয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন "Above the battle" লিখে। তার ফলে গৃহছাড়া হয়ে রঁল্যাকে বিদেশে (সুইসদেশে) আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল। ট্রেঞ্চের মধ্যে বেআইনীভাবে যেমন রঁল্যার সেই পুস্তিকা সৈনিকদের কাছে পৌঁছেছে তেমনি রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ ক্রমশঃ আকার পরিগ্রহ করল "Nationalism" গ্রন্থে ; যেগুলি পরে শোনাবার জন্য তিনি আকুল হয়ে উঠেছিলেন পূর্ব-পশ্চিমের সাধারণ মানুষের কাছে। কিন্তু পশ্চিমের দ্বার ত রুদ্ধ। তাই হয়ত প্রায় একবছর প্রতীক্ষার পর জাপানে এসে সেই প্রবন্ধগুলিই পড়লেন। "নিন্দা দিবে জয় শঙ্খনাদ, এই তোর কণ্ঠের প্রসাদ।" অনেক আগেই কবি একথা লিখেছিলেন এবং তাঁর জীবনে ফলেও ছিল। অনেকে আজও ভাবতে পারেন না যে ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের ফলে যে পৃথিবীব্যাপী উলট পালট ঘটবে, ভারতবর্ষের কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্বাভাষ তাঁর নানা ভাষণে দিয়ে গিয়েছেন। বলাকার যুদ্ধের কবিতাগুলি যখন ফরাসীতে অনুবাদ করি, তখন আমার সহকর্মী Jouve-এর সঙ্গে আরো অনেকে পড়ে অবাক

হয়েছিলেন "পুরান সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচাকেনা আর চলিবে না।" কাশ্মীর থেকে ফিরে আসার পর আমরা যেন কবিকে সত্যই Prophet-রূপে চিনলাম। ১ম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগে (১৯১১) চীন বিপ্লব দেখে কবি বিশ্বভ্রমণে বেরিয়েছেন। আবার যুদ্ধের মধ্যে "বলাকা" ও "ঘরে বাইরে" শেষ করে ১৯১৬ সালে যখন জাপান, আমেরিকা ঘুরে আসবার সুযোগ পেলেন তখন আবার আয়র্ল্যাণ্ড ও মেক্সিকোতে বিরাট বিপ্লব দেখা দিয়েছে। সেই যুগেও রবীন্দ্রনাথ তবু কবি নন —Prophet Seer.

সেই সময়কার জাপান ও আমেরিকার কাগজে কবির ভাষণাদির কিছুটা সংগৃহীত হয়েছে— এ বিষয়ে আরও তথ্যানুসন্ধানের দরকার। মুকুল দে একমাত্র সে যুগের সাক্ষী হয়ে আছেন। তাই তিনি রেখাচিত্র কিছু রেখেছেন। আর যদি ডায়েরীতে কিছু টুকে থাকেন, তাও তুলে নেওয়া উচিত। আমাদের আর্টেরও কিন্তু ছোটখাট বিপ্লব এখন থেকেই শুরু হয়ে গেল। চীন-জাপানের আর্টিস্ট জোড়াসাঁকোর স্টুডিওতে ঢুকে পড়ল জাপানী চিত্রকর কায়সো আবার আবির্ভাবের সঙ্গে। অবনীন্দ্রনাথ নতুন ভাবে ছবি আঁকলেন হুয়েনসাঙের। আর নন্দলালের রঙ রেখায় ছন্দ নতুন যুগের ইঙ্গিত দিল। তার মধ্যে মুকুল দে প্রথম Etching (এচিং-এর) আমদানী করে বসলেন। তাই সৌভাগ্যক্রমে গুরুদেবের জীবন্ত প্রতিকৃতির সঙ্গে গান্ধীজী ও শ্রীঅরবিন্দের ছবিও রয়ে গেল।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু অবসর গ্রহণ করে বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার আয়োজনে ব্যস্ত। তাঁর বন্ধু স্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্যাট্রিক গেডিস ভারতের প্রতি আকৃষ্ট হন ও সস্ত্রীক বাংলা দেশে এসে জগদীশ-জীবনী ইংরাজীতে রচনা শুরু করলেন। ১৯০০ সালে প্যারিস আন্তর্জাতিক সভায় ডাঃ জগদীশ বসু ও স্বামী বিবেকানন্দ পরস্পরকে গভীরভাবে চিনেছিলেন, স্বামিজীর রচনা আজও তাঁর সাক্ষ্য দিচ্ছে।

বিবেকানন্দ-শিষ্যা নিবেদিতা লেডী অবলা বসুর কোলেই দেহত্যাগ করেন তাঁদের দার্জিলিং-এর বাড়ীতে ১৯১১ সালে।

নিবেদিতার সঙ্গে মিস ম্যাকলিয়ড ও সিস্টার ক্রীস্টীন এঁরাও বসু পরিবারে প্রায়ই আসতেন। সেখানে তাঁদের দেখেছি ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে যে সব মূল্যবান কাহিনী শুনেছিলাম সেগুলি কাজে লাগিয়েছিলাম রঁলাঁর বিবেকানন্দ রচনার সময়। বেলুড়ে নিয়ে গিয়ে ম্যাকলিয়ড স্বামী বিবেকানন্দের অনেক স্মৃতিকথা আমাদের দেখিয়েছিলেন। সস্ত্রীক গেডিসও তাই বসু পরিবারে আপনার মত মিশে গেলেন। টাউন প্ল্যানিং সম্পর্কে চন্দনগরে তাঁর বক্তৃতা ও প্রদর্শনী। কিন্তু তার ভিতর দিয়ে যেন World Planningএরই নতুন পরিকল্পনা। এই মনীষীর পথপ্রদর্শক হয়ে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের কাছে গেডিসকে নিয়ে গিয়েছে। তাঁর বায়োলজীর লিসেবাস ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল অতি সযত্নে পড়েছিলেন এবং স্পেন্সেস্ হোটেলে গেডিসের ঘরে ডাঃ শীলকে নিয়ে কত আলাপ হয়েছে।

তাঁরা বিশ্বসঙ্কটের কত গভীর সমস্যা ও তার সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করতেন।

বন্ধুবর প্রশান্ত মহালানবীশ এই সময় কেম্ব্রিজ থেকে ফিরে এসে প্রেসিডেন্সী কলেজে যোগদান করলেন। প্রশান্ত এ সময়ে ডাঃ শীল ও গেডিসের কাছে যাতায়াত করতে লাগল। আর কার্ল পিয়ার্সনের Biometrica ইত্যাদি অবলম্বনে ভারতের প্রথম Statistical Society স্থাপনেরও স্বপ্ন দেখছিলেন।

অন্তরীক্ষে

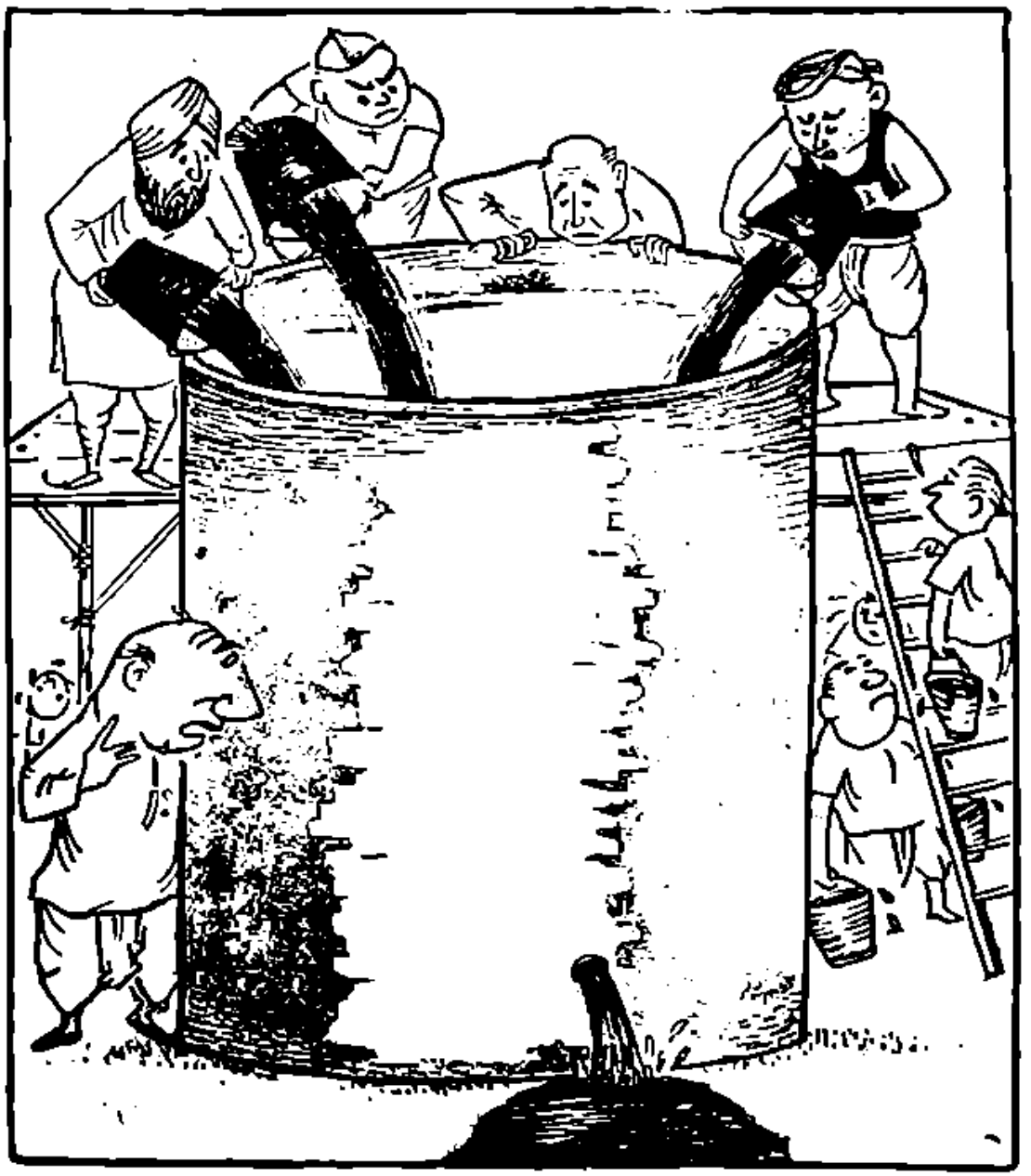

• • • যাচ্ছে কোথায় ?

অশ্লীল সাহিত্য

BUS STOP

দুর্নীতি

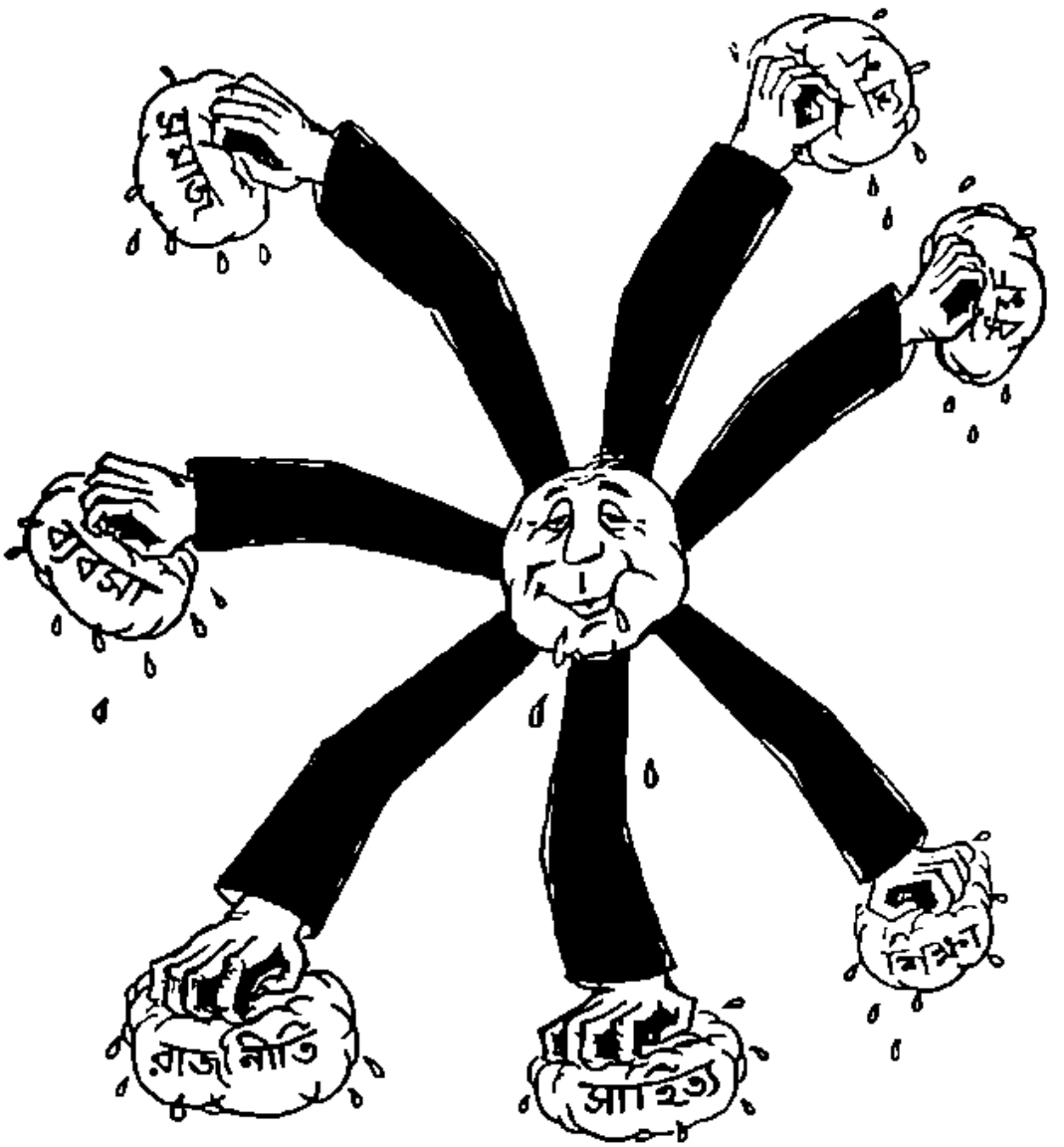

কোথায় নেই !

এখানে মহাশূন্যাভিযানের ক্ষেত্রে দুই দেশের অগ্রগতির এক তুলনামূলক তথ্য দেওয়া গেল—

মহাকাশচারীর নাম	মহাব্যোমযানের নাম	তারিখ	পৃথিবী প্রদক্ষিণের সংখ্যা	উড্ডয়নের সময়	উড্ডয়ন-দূরত্ব (হাজার কি:)
ইউরি গাগারিন	ভোস্তোক—১	১২.৪.৬১	১	১ঘ: ৪৮মি:	৪০
গেরম্যান তিতোফ	ভোস্তোক—২	৬-৭.৮.৬১	১৭	২৫ঘ: ১৮মি:	৭০০
জন গ্লেন	ফ্রেণ্ডশিপ—৭	২০.২.৬২	৩	৪ঘ: ৫৬মি:	১২৯
স্কট কার্পেন্টার	অরোরা—৭	২৪.৫.৬২	৩	৪ঘ: ৫৬মি:	১২৯
আন্দ্রিয়ান নিকোলায়েফ	ভোস্তোক—৩	১১—১৫.৮.৬২	৬৪	৯৫ঘ:	২, ৬৪০
পাভেল পোপোভিচ	ভোস্তোক—৪	১২—১৫.৮.৬২	৪৮	৭১ঘ:	১,৯৮০
ওয়াল্টার শিরা	সিগ্‌মা—৭	৩.১০.৬২	৬	৯ঘ: ১৩মি:	২৭৯
গর্ডন কুপার	ফেথ—৭	১৫—১৭.৫.৬৩	২২	৩৪ঘ:	৯২০
ভালেরী বীকোভস্কি	ভোস্তোক—৫	১৪.৬.৬৩	৮২	১১৩ঘ: ৫৪ মি:	৩,২৯৩
ভালেন্তিনা তেরেশকোভা	ভোস্তোক—৬	১৬.৬.৬৩	৪৯	৭০ ঘ: ৫০ মি:	২,০০০

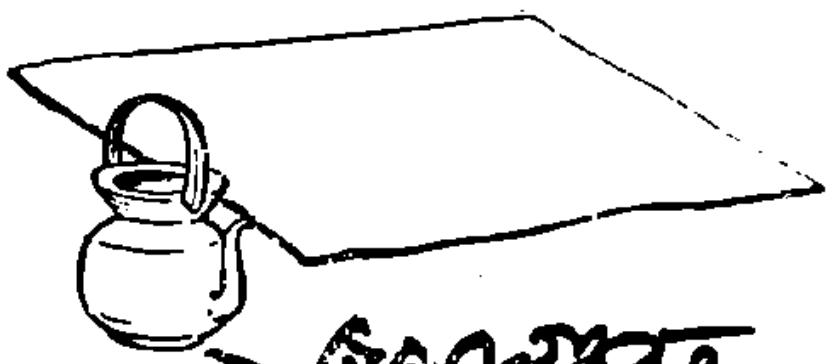

জগদ্গুরু শ্রীশ্রী বিজয়কৃষ্ণ

জীবন কাহিনী ॥

শ্রীচিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত

১২

মানব শরীর স্বর্গবাসী দেবতাদেরও লোভনীয়। জ্ঞান আর ভক্তি শুধু মানবদেহেই সম্ভব। এ মানবদেহই ভবার্ণব পার হবার তরণী। কিন্তু কর্ণধার কে? কর্ণধার গুরু। আর বাতাস? ঈশ্বরের কৃপাই বাতাস, বাতাসের আনুকূল্য।

যে মানুষ গুরুহীন এবং সেই কারণে উত্তরণে অসমর্থ সে আত্মঘাতী।

ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শশিভূষণ বসুকে সঙ্গে নিয়ে বিজয় এসেছে মধুপুর। প্রত্যহ চলছে উপাসনা, বক্তৃতা, কীর্তন। কিন্তু সব সময়েই লোকসংঘট্ট ভালো নয়। তাই বিজয় মাঝে মাঝে চলে যাচ্ছে জঙ্গলে, আত্মীয়তম শুদ্ধতায়, নিবিড়তম নিঃসঙ্গে। রাত হয়ে গেলেও বাড়ি ফিরতে মন চায় না। মনে হয় বাড়িতে যিনি আছেন তিনি যেন বনে-নির্জনে বেশি করে আছেন।

মধুপুর থেকে গিরিডি হয়ে চলে এল পচম্বায়। তিনকড়ি বসুর অতিথি হল। সেখানে পাঠ আর ব্যাখ্যা করে চলল তুলসীদাসী রামায়ণের আর গ্রন্থসাহেবের। যে একবার শোনে সেই লেগে থাকে, আর উঠতে চায় না। কালাকাল ভুলে যায়। হাতের কাজ উড়ে পালায় হাত থেকে।

সেখান থেকেই গয়া। নামজাদা উকিল গোবিন্দ রক্ষিত তত্ত্বাবধানের ভার নেয়। ব্রাহ্মসমাজের কাজ ভালো ভাবে চলবে তাঁরই জন্যে বাড়ি নেওয়া হয় আলাদা। কিন্তু সমাজের কাজ আর হচ্ছে কই? বাড়ির ছাদে সারা সন্ধ্যা ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকলে প্রচার হবে কোত্থেকে? আর আলোচনা যা করে তা আর যাই হোক, ব্রাহ্ম আদর্শের সহযোগী নয়।

আর, বাদু উকিল গোবিন্দ, সে পর্যন্ত ওকালতিতে ইস্তফা দিতে বসেছে। আদালত থেকে মন কেড়ে নেয় এ কী ভীষণ মাদকতা।

বিজয়ের থেকে প্রচারের আশা করা নিষ্ফল।

'আকাশগঙ্গায় যাবেন?' গোবিন্দই একদিন বললে।

'আকাশগঙ্গা?' নাম শুনে চমকাল বুঝি বিজয়।

'হ্যাঁ, পাহাড় আকাশগঙ্গা। বেশী দূরে নয়। যাবেন একদিন সেখানে?'

'সেখানে কী?'

সেখানে এক সাধু থাকেন। রামায়েত বৈষ্ণব, নাম রঘুবর দাস। ভক্তিতে টইটম্বুর। একবার যাবেন দেখতে?'

'যাব।' ভক্তির নাম শুনেছে, বিজয় লাফিয়ে উঠল।

পরদিন সূর্যোদয়ে আকাশগঙ্গায় উপস্থিত হল বিজয়।

আকাশগঙ্গা নাম কেন? পাহাড়ে একটি প্রস্রবণ আছে, তারই নাম আকাশগঙ্গা, আর সেই নামেই পাহাড়ের নাম। পাথরের মধ্যে গাছের শেকড়ের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম শিরা আছে, তা দিয়েই জল টেনে এনেছে মাটির গহন থেকে। নইলে জল কখনো পাহাড়ের উঁচুতে উঠতে পারে? আকাশ থেকে গঙ্গা নেমে এসেছে এ জনশ্রুতি ঠিক নয়। তবে গঙ্গার মত এও যে বিষ্ণুর চরণ থেকেই উদ্ভূত তাতে সন্দেহ কী। পাহাড়ের উপরে মানুষের বসতি, সেখানে জল না থাকলে তারা বাঁচবে কি করে? তাই ভগবান দয়া করে পাথরের শিরা উপশিরা দিয়ে জল টেনে নিয়ে লোকালয়ের তৃষ্ণা নিবারণের ব্যবস্থা করেছেন। সর্বত্র ভগবানের দয়া, ভগবানের ব্যবস্থা। আর ভগবানের চরণস্পর্শই সমস্ত শীতলতা সমস্ত পবিত্রতার উৎস।

আশ্রমের দুয়ারে বাবাজী এগিয়ে এল।

বিজয় ছুটে গিয়ে বাবাজীর পায়ে পড়ল। কাঁদতে-কাঁদতে বললে, 'বাবাজী, বলে দিন কেমন করে উদ্ধার হব?'

রঘুবর বিজয়কে দু'হাতে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরল। বললে, 'এইছে সাধু হাম কভি নেহি দেখা। দয়াল রামজী তোমকো আলবৎ কৃপা করেগা।'

বিজয়ের সঙ্গে শশী আর গোবিন্দও এসেছে, আর গোবিন্দ নিয়ে এসেছে চাল-ডাল। নিজের হাতে রান্না করল রঘুবর। সবাইকে খাইয়ে সর্বশেষে নিজে খেল।

অপরাহ্ণে রঘুবর বললে, 'ঝুকযোনীতে চলুন। সেখানে চমৎকার এক সাধু আছেন।'

'চলুন।'

পাহাড়ে দূর থেকেই সাধু দেখতে পেয়েছে আগন্তুকদের। দেখতে পেয়েই ওদের উদ্দেশে ছুটেছে। ছুটে এসেই জড়িয়ে ধরেছে বিজয়কে। আর বলতে সুরু করেছে, আনন্দে রহো আনন্দে রহো।

অনেক সিঁড়ি ভেঙে পাহাড়ের উপর উঠল সকলে। নেমে এসে পথ দিয়ে চলতে-চলতে হঠাৎ এক জায়গায় থামল বিজয়। শশীকে বললে, 'জানো শশী, এইখানে, ঠিক এইখানেই মহাপ্রভুর কৃষ্ণস্ফূর্তি হয়েছিল। এইখানেই তিনি কৃষ্ণবিরহে উন্মাদ হয়ে কেঁদেছিলেন—'

বলেই ডুকরে কেঁদে উঠল: 'কৃষ্ণরে বাপরে, তুমি কোথায়? কোনদিকে পালালে?'

শশী স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে রইল। এ কে কাঁদছে? আরেকজনের কান্না দেখাতে গিয়ে নিজেই সেই আরেকজনের মত কাঁদছে? তবে এই একজন ও সেই আরেকজন কি এক—তাদের একই কাতরতা?

'কৃষ্ণ, বাপ আমার, জীবন-শ্রীহরি, তুমি আমার প্রাণ চুরি করে কোথায় অন্তর্হিত হলে?'

সেই থেকে রোজ আকাশগঙ্গার আসে বিজয়। শশিভূষণও সঙ্গ নেয়।

একদিন শশীকে বললে, 'শশী, আমি আজ সমস্ত রাত ভজন করব, তুমি আমার পাশে চুপটি করে ঘুমোও।'

গায়ের চাদর পাকিয়ে শশীর জন্যে বালিশ করে দিল বিজয়।

'কী, ভয় করবে নাকি?'

শশী হাসল। বললে, 'তুমি পাশে থাকলে ভয় নেই।'

অরণ্যে পর্বতে কোথায় কে হিংস্র জন্তু গর্জন করছে, মাতৃপার্শ্বে পরিতৃপ্ত শিশুর মত নির্ভয়ে ঘুমোল শশী। আর খাড়া হয়ে বসে ব্রহ্মধ্যানে বিজয় মগ্ন হয়ে রইল। ব্রাহ্মমুহূর্তে তুলল শশীকে। চলো, নির্ঝরের জলে স্নান করি। পরে গুহামুখে বসি উপাসনায়। করতাল বাজিয়ে ললিতকণ্ঠে গান ধরল বিজয়:

প্রভু হৃদিরঞ্জন মনোমোহনকারী।
ভক্তজন-প্রাণ-প্রাণ হৃদয়বিহারী॥
তুমি প্রাণ-রমণ হৃদি-ভূষণ পাপহরণকারী।
আমার সাধ সতত হয় যে মনে ওরূপ নেহারি।
দরশন করি মোহ আঁধার নিবারি॥
(সেদিন কবে বা হবে!)

দেখতে পেল একটা প্রকাণ্ড সাপ বিজয়ের উরু বেয়ে উঠছে উপরে। উঠুক। চঞ্চল হয়ো না। নির্বিচল থাকো। মনে যখন হিংসা নেই, যখন তুমি ভক্তিতে বিগলিত তখন বিষধরও নির্বিষ হয়ে যাবে।

আস্তে-আস্তে সাপ নেমে গেল গা থেকে।

'শশী, আমি আর কলকাতায় ফিরব না।' বললে বিজয়, 'তুমি একলাই ফিরে যাও।'

এমনি ধারা কথা বুঝি গৌরহরিও বলেছিল তার সঙ্গীদের। বলেছিল, 'তোমরা ঘরে ফিরে যাও। আমি আর ফিরব না। আমি আমার প্রাণেশ্বরকে দেখতে চললাম ব্রজধামে।'

ঠিক সেই কান্না সেই সুর। সেই উন্মাদনা।

একদিন শশীকে সঙ্গে করে বুদ্ধগয়ায় গেল। নিরঞ্জনার তীরে বুদ্ধচিন্তায় নিমগ্ন হলেন। সারাদিনে আর গৃহে ফেরার নাম নেই। আহার্য প্রস্তুত করে বসে আছে শশী, কিন্তু কী আহার্য পেয়েছে বিজয় যে জৈব ক্ষুধা বিরত হয়েছে।

রঘুবরকে যত দেখে ততই অবাক মানে বিজয়। ইষ্টে, রামচন্দ্রে, তার কী ঐকান্তিকতা। সাধনার বলে অনেক কর্তৃত্ব আয়ত্ত করেছে। ডালে ঝাঁক বেঁধে পাখিরা উড়ে আসে, কাঁধে বসে, ঠুকরে ঠুকরে জটা পরিষ্কার করে দিয়ে যায়। সাপ গা বেয়ে উঠে আবার নেমে যায়, বাঘ ঘুরে মাথা ছুইয়ে চুপ করে বসে থাকে।

মন্ত্রটা, এঁর থেকেই নাকি।

'গুরু না পেলে কি ধর্মলাভ করা যায় না?' গোস্বামী-প্রভুপাদ 'আশাবরীর উপাখ্যানে'-এর আশাবরী জিগ্‌গেস করল যোগীকে।

যোগী বললে, "না মা, গুরু না পেলে ধর্মলাভ হয় না। ক-খ শিখতে গুরুর দরকার, অঙ্ক ভূগোল জ্যোতিষ শিখতে গুরুর দরকার, কৃষি বা বাণিজ্য শিখতেও গুরুর দরকার। গুরু ছাড়া রান্না বা গৃহকর্মও শেখা যায় না। শুধু ধর্মের বেলাই গুরুর দরকার হবে না এ বড় আশ্চর্যের কথা। যদি বলো ধর্ম আমার মধ্যেই আছে তা আবার কার কাছে শিখব? তেমনি ক-খও তো বইয়ের মধ্যে আছে, শিখে নিলেই হয়। অন্যকে তবে খোশামোদ করা কেন? বনে-জঙ্গলে পাহাড়ে-খনিতে তো রোগের ওষুধ পড়ে আছে, তা খোঁজবার জন্যে কবিরাজের দ্বারস্থ হও কেন? যদি পিপাসা পায়, পিপাসার্ত খন্তা-কোদাল নিয়ে কুয়ো খুঁড়তে বসে না, যেখানে জলাশয় আছে সেখানে পাত্র নিয়ে গিয়ে জল আহরণ করে। তেমনি জ্ঞানস্বরূপ ভগবান স্বয়ং গুরুশক্তি রূপে সর্বভূতে বিরাজ করছেন। যেখানে যেমনি প্রকাশ পাচ্ছেন সেখান থেকে তেমনি শিক্ষালাভ করতে হয়। যেখানে প্রেম ভক্তি বিশ্বাস রূপে প্রকাশমান সেখান থেকে প্রেম ভক্তি ও বিশ্বাস গ্রহণ করো। ধর্ম বাক্য নয়, মত নয়, দল নয়—ধর্ম স্বয়ং ভগবান, ভগবানের পরাশক্তি। যিনি এই পরাশক্তিকে দেখিয়ে দেন তিনিই গুরু। সকলের পদধূলি নিতে-নিতে অহঙ্কার নষ্ট হলে, হৃদয় বিনীত হলেই গুরুদর্শন সম্ভব।'

ব্রহ্মযোনী পাহাড়ের নিচেই গোড়ঘোরা। দ্বাপরে কৃষ্ণ এইখানে এক ক্ষুদ্র জলাশয়ে পা ধুয়েছিলেন বলে এই নাম। এইখানে প্রতি বৎসর স্থানীয় ব্রাহ্মরা চৈতন্যোৎসব করে। এবার বিজয় আছে আকাশগঙ্গায়, তার চেয়ে যোগ্যতর উপাসক আর কে আছে, তার ডাক পড়ল।

উপাসনায় বসল বিজয়। কিন্তু কয়েকটি কথা বলতে না বলতেই তার কণ্ঠ ভাবাবিষ্কারে রুদ্ধ হয়ে গেল।

সকলে বিমূঢ় হয়ে গেল। ও কে বসেছে উপাসনায়? উপাসক, না স্বয়ং উপাস্য?

বিজয় উঠে পড়ল। বললে, "আপনারা কেউ বসে উপাসনা করুন। আমার পক্ষে অসাধ্য হয়ে উঠছে।"

কিন্তু রঘুবর দাস তার গুরু নয়। প্রাণ বলছে এখানেই কাছাকাছি কোথাও তিনি আছেন। স্মরণে স্পষ্ট হচ্ছে, এ পাহাড় এ আশ্রম এ মন্দির সে স্বপ্নে দেখেছিল। হ্যাঁ, মন্দিরে ঐ মহাবীরের মূর্তি। মহাবীর তাকে হাত দিয়ে ইশারা করে জানিয়েছিল, আরো উপরে যাও, আরো উপরে।

আশ্রমে একজন ব্রহ্মচারী আছেন, তার সঙ্গে ভদ্রতা অন্তাতে দেরি হয়নি বিজয়ের। রঘুবর আছেন, একদিন ধর্মপ্রসঙ্গ আলোচনা হচ্ছে, কটা রাখাল ছেলে এসে সংবাদ দিল, পাহাড়ের চূড়ায় এক সাধু বসে আছেন।

কে সাধু, ব্রহ্মচারীকে নিয়ে বিজয় চলল উপরে।

সত্যিই তো মহিমময় মূর্তিতে আলো করে বসে আছেন। এমন দিব্যদীপ্তকান্তি আর কোনোদিন দেখিনি, তন্ময়ের মত তাকিয়ে রইল বিজয়। ইচ্ছে হল প্রাণ ঢেলে দিয়ে প্রণাম করি।

হাতের ইশারা করে সাধু বললেন তাদের চলে যেতে।

সাধুবাক্য লঙ্ঘন করা ঠিক নয়, ফিরে গেল দুজনে। কিন্তু বিজয়ের সাধ হল আরেকবার যাই। মনে হল, চলে এসেছে বটে কিন্তু মন সেই সাধুর কাছে ফেলে এসেছে।

পরদিন, রঘুবর আশ্রমে নেই, ব্রহ্মচারীও কোথাও বেরিয়ে গেছে, বিজয় সাধুর উদ্দেশে একা-একা যাত্রা করল। নিয়ত কড়বৃষ্টি শীতভূষারের সঙ্গে সংগ্রাম করেন। কত দেশের কত রকম জল তাঁকে খেতে হয়, সাধুজী নিশ্চয়ই খুশি হবেন, কিছু গাঁজা নিয়ে গেল বিজয়।

হিমালয়ের উপরে যে সকল যোগী মহাত্মা আছেন, নিয়তই তাঁদের ধুনিতে চায়ের জল চড়ানো থাকে। বলছেন গোস্বামী-প্রভু, "হয় কি পনেরো মিনিট অন্তর তাঁরা একটু-একটু চা খেয়ে থাকেন। সেই চা আমাদের চায়ের মত নয়। ঐ চায়ের গাছ খুব বড় হয়। সাধুরা পাতা এনে শুকিয়ে রাখেন। পাতাগুলোও খুব বড়-বড়।'

জিগগেস করা হল : 'চায়ে কি সাধুরা দুধ দেন না।'

'খুব ভালো দুধ দেন।'

'ঐ পাহাড়ের উপরে বরফের মধ্যে দুধ পান কী করে?'

'পালানে দুধ তার হলেই পাহাড়ী গরুরা এক-একটা নির্দিষ্ট জায়গায় দুধ ছেড়ে যায়। ঐ দুধ বরফময় প্রান্তরে পড়া মাত্রই জমাট হয়ে যায়। সাধুরা ঐ দুধ চিনটে দিয়ে খুঁড়ে নিয়ে আসেন। গরম জলে ফেললেই ভালো দুধ হয়। চায়েতে তাঁরা মিষ্টি দেন না যদিও, প্রয়োজন হলে, তাও যোগাড় করতে পারেন অনায়াসে। আখের মত মিষ্টি রসের লতা-পাতা পাহাড়ে বিস্তর জন্মায়, সাধুরা তার সন্ধান রাখেন।'

বিজয় সাধুর সামনে এসে দাঁড়াল।

স্থির যোগাসনে বসে আছে সাধু। সারা গা থেকে জ্যোতি বেরুচ্ছে। মাথার চারদিকে জ্যোতির্গোলক।

তাকিয়ে থাকতে-থাকতে, কেন কে জানে, বিজয়ের দুচোখ বেয়ে নিরর্গল অশ্রু নেমে এল।

'আও বেটা আও।' সাধু বিজয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

বাঘা যেমন সন্তানকে টেনে নেয় তেমনি সাধু বুকের মধ্যে টেনে নিল বিজয়কে। স্পর্শে শক্তি সঞ্চার করে দিয়ে দিল দীক্ষামন্ত্র।

সর্বস্ব নিঃশেষে ঢেলে দিয়ে বিজয় সাধুকে প্রণাম করল। আর প্রণাম করার সঙ্গে সঙ্গেই মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে বাহ্যজ্ঞান ফিরে এসে বিজয় চোখ মেলে দেখল, সাধু কোথাও নেই। কোথায় তুমি? সাড়া নেই শব্দ নেই পায়ের চিহ্নটুকু পর্যন্ত নেই।

স্থান শূন্য কিন্তু প্রাণ পূর্ণ, টলতে-টলতে নামতে লাগল বিজয়। আশ্রমে মহাবীরজীর মূর্তির সামনে বাঁধানো আঙিনা। আঙিনার পুবে একটা বেলগাছ। তার নিচে আঙিনা থেকে কিছুটা উঁচুতে পরিষ্কার একখানি পাথর পাতা। ভাবোন্মত্ত অবস্থায় দুলতে-দুলতে এই পাথরের চটানের উপর এসে বসল বিজয়।

ব্রহ্মচারী জিগগেস করল, 'কী হল?'

বলতে কী আর পারে, তবু তারপর যাতোয়াত বললে তার গুরু-প্রাপ্তির কথা।

'এতদিনে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল।' বললে ব্রহ্মচারী, 'তুমি যোগেশ্বরের কৃপা লাভ করেছ।'

কিন্তু এ কী হল, বিজয়ের সমাধি ভাঙে না। পাথরের চটানের নিচে সুন্দর একটি গোফা, সেখানে সযত্নে রাখা হল বিজয়কে। রঘুবর নিজে নিয়ত কাছে থেকে বিজয়ের দেহরক্ষা করতে লাগল। এগারো দিন এগারো রাত্রি কাটল এই অবিচ্ছেদ সমাধিতে।

সমাধিভঙ্গের পর বিজয়ের সুরু হল চৈতন্যভাব। ঈশ্বরপুরীর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে মহাপ্রভুর যে ভাবোন্মাদ হয়েছিল এও সেই বিহ্বলতা। কোথায়, কোথায় আমার সেই আনন্দের আকর, আমার অতীষ্টপ্রদ? হে অনাথবন্ধো, কবলৈক সিন্ধো, হা হন্ত, হা হন্ত, কথং নয়াসি? কী করে কাটবে আমার দিনরাত্রি? বলো কী করে?

'কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঞি! কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥'

পাহাড়ে-পাহাড়ে সেই সাধুকে খুঁজে বেড়াতে লাগল বিজয়। অদর্শনে চিত্ত আর ধৈর্য মানতে চাইছে না। বিজয় ঠিক করল, এ প্রাণ ছেড়ে দেব। ঠিক করল, পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে পড়ব মাটিতে। এ অবশ্য জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ গুরুদেব, সেই জ্যোতির্ময় সাধু উপস্থিত হল। বিজয়ের হাত ধরে ফেলল। বললে, 'ধারণাও মৎ। ভজন কর, ব্রহ্মতমে সব মিল যায়গা!'

'কিন্তু আপনি কে? আপনার পরিচয় দিন।'

সাধু হাসল। 'আমার পরিচয়? শোনো।'

নাম ব্রহ্মানন্দ স্বামী। সকলে ডাকে পরমহংসজি বলে। পাঞ্জাবি ব্রাহ্মণ। সিপাই বিদ্রোহের সময় সন্ন্যাসী হয়। প্রথমে নানকপন্থী ছিল, পরে বৈদিক পন্থায় প্রবেশ করে সিদ্ধ লাভ করে। বাস করত মানস সরোবরে। বিজয়ের জন্যে চলে এসেছে আকাশগঙ্গায়।

'আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন।'

'না, আমার সঙ্গে তোমার থাকা চলবে না। তোমাকে যে আনন্দ দিলুম তা তোমাকে ঘরে-ঘরে জনে-জনে বিতরণ করতে হবে।' বললে পরমহংস, 'তুমি অদ্বৈত সন্তান, আচার্যের ধারা তোমার রক্তে, তোমাকে দিয়েই এই কাজ ভালো হবে। হাত সামলে করো, ঠিক মিলে যাবে সিদ্ধি। আমার জন্যে কাতর হয়ো না। যখনই চাইবে তখনই আমার দেখা পাবে। আমি সব সময়ে আছি তোমার কাছে-কাছে।'

সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষা, এ সম্পূর্ণ কৃপাসাপেক্ষ। বলছেন গোস্বামী-প্রভু। এ দীক্ষা যে কোনো অবস্থায় যে কোনো জায়গায় যে কোনো সময়ে একমাত্র ভগবানের কৃপাতেই হয়ে থাকে। ভগবানই সদ্‌গুরু। ভগবানের পদাশ্রিত ভগবদ্‌জন মহাপুরুষেরাই সদ্‌গুরু। সদ্‌গুরু কি শিষ্য করেন?' না। তিনি গুরু করেন। শিষ্যের মধ্যে নিজের ইষ্টকে প্রতিষ্ঠিত করে তাঁরই সেবা-পূজা করেন। শিষ্যের দেহ তাঁর দেবমন্দির। দেবমন্দিরে কোনো রকম অপচার বা অনাচার দেখলে সেবক যেমন লজ্জিত হয়, সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতির জন্যে নিজেকেই অপরাধী মনে করে, তেমনি শিষ্যের কোনো দুর্ঘটনা দেখলে গুরুও মলিন হয়ে যান, নিজেরই সেবাপূজায় ত্রুটিপ্রাপ্তি হয়েছে ভেবে নিজেকেই দোষী করেন। সেবক যেমন মন্দির সংস্কারে প্রবৃত্ত হয় তেমনি গুরুও ছোটেন শিষ্যের উদ্ধারণে। সদ্‌গুরুদত্ত নাম শুধু নাম নয়, শব্দ নয়, অক্ষর নয়, ধ্বনি নয়। এ নামে ভগবানের অনন্ত শক্তি। শিষ্যের মধ্যে এই শক্তিসঞ্চারই সদ্‌গুরুর

দীক্ষা। এই দীক্ষা, ভগবানের কৃপায়, যদি একবারও কারু লাভ হয়। তা হলে তার আর নিজের কিছুই করবার থাকে না। তার জীবনের সমস্ত কাজ—প্রত্যেকটি শ্বাস-প্রশ্বাস পর্যন্ত সেই একজনেরই ইচ্ছাধীন হয়ে পড়ে। কুমুরে পোকায় আরশুলা ধরার মত সদ্‌গুরু শক্তি সঞ্চার করে; দীক্ষা দিয়ে, শিষ্যকে ক্রমে-ক্রমে আত্মসাৎ করে নেন।

কী বলেছে শাস্ত্র? বলেছে, দীক্ষাগ্রহণমাত্রেণ নরোনারায়ণো ভবেৎ।

সাধন করো। সাধন ছাড়া সাধ্যবস্তু পাবার নয়।

'সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে।
সাধ্য-সাধন তত্ত্ব জানিবে সে তবে॥'

(ক্রমশঃ)

সঙ্গীত একটি প্রাণধর্মী জিনিস এবং প্রাণের প্রকাশ তার মধ্যে আছে, একথা বলাই বাহুল্য। প্রাণের যে ধর্ম, সঙ্গীতের রঙ হবে সেই ধর্ম। বৈদিক যুগে এক রকম সঙ্গীত ছিল—সামগান। সেই সামগান নিঃসন্দেহে তখনকার যাঁরা সাধক ছিলেন তাঁদের হৃদয় থেকে উচ্ছ্বসিত হয়েছিল—বিশেষ রূপ নিয়ে তখনকার ক্রিয়া-কর্মে, যজ্ঞে তা রস রূপ পেয়েছে ও পূর্ণতা লাভ করেছে। পরবর্তীকালে তা এত ঘুরে গিয়ে পড়েছে যে, তখনকার সেই সামগান কি রকম ছিল তা আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি না। তারপর এল কালিদাস, বিক্রমাদিত্যের যুগ। তখনকার সঙ্গীত, নৃত্য, গীত বিশেষত্ব লাভ করেছিল সেই সময়কার গভীর সাম্রাজ্য, গৌরব এবং আস্বাদনীয় মধ্য দিয়ে। আনন্দ যখন হয়ে উঠেছিল অব্রভেদী—তখন তারই অনুরূপ সঙ্গীত যে জন্মেছিল তাতে সন্দেহ নাই।

রবিশঙ্কর

চিঠি শুধু চিঠি নয়!

স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত

আলমোড়া।
৩০শে জুলাই, ১৮৯৭

কল্যাণবরেষু,

তোমার কথামত ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সেভিজ্ সাহেবকে এক পত্র লিখিলাম। অপিচ তুমি তাঁহার বিশেষ বিশেষ কার্য্যকলাপ বিবৃত করিয়া শশী ডাক্তারকে দিয়া দেখাইয়া 'ইণ্ডিয়ান মিরর'-এ একটি লম্বা চওড়া পত্র লিখিবে ও তাহার এক কপি উক্ত মহোদয়কে পাঠাইবে। আমাদের মূর্খগুলো খালি দোষ অনুসন্ধান করে, গুণও কিঞ্চিৎ দেখুক।

আমি আগামী সোমবার এস্থান হইতে প্রস্থান করিতেছি।.....

Orphan (অনাথ বালক) যোগাড়ের কি করছ? ষঠ হতে চারি-পাঁচজনকে না হয় ডাকিয়ে লও, গাঁয়ে গাঁয়ে খুঁজিলে দুদিনেই মিলিবার সম্ভাবনা।

Permanent Centre (স্থায়ী আড্ডা) করিতে হইবে বৈকি। আর—দেবকৃপা না হলে এদেশে কি কাজ হয়? রাজনীতি—ইত্যাদিতে কোনও যোগ দিবে না অথবা সংস্রব রাখিবে না। অথচ তাহাদের সহিত কোনও বিবাদাদিতেও কাজ নাই। একটা কার্য্যে তন্ মন্ ধন্। এখানে একটি সাহেবমহলে ইংরেজী বক্তৃতা হইয়াছিল ও একটি দেশী লোকদিগকে হিন্দীতে। হিন্দীতে আমার এই প্রথম—কিন্তু সকলের ত খুব ভাল লাগল। সাহেবেরা অবশ্যই যেমন আছে, নাক সিঁটকে গেল, "কালা মানুষ"! "তাই ত কি আশ্চর্য্য" ইত্যাদি। আগামী শনিবার আর একটি বক্তৃতা ইংরেজীতে, দেশী লোকের জন্য। এখানে একটি বৃহৎ সভা স্থাপন করা গেল—ভবিষ্যতে কতদূর কার্য্য হয় দেখা যাক্। সভার উদ্দেশ্য বিদ্যা ও ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া।

সোমবার বেরেলি যাত্রা, তারপর সাহারাণপুর, তারপর আম্বালা, সেখান হইতে কাপ্তেন সেভিয়ারের সঙ্গে বোধ হয় মসৌরী, আর একটু ঠাণ্ডা পড়লেই দেশে পুনরাগমন ও রাজপুতানায় গমন ইত্যাদি।

তুমি খুব চুটিয়ে কাজ করে যাও, ভয় কি? আমিও "ফের দেগে যা" আরম্ভ করেছি। শরীর ত যাবেই, কুড়েমিতে কেন যায়। "It is better to wear out than rust out." (মরচে পড়ে পড়ে মরার চেয়ে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরা ভাল)। মরে গেলেও হাড়ে হাড়ে ভেল্কি খেলবে তার ভাবনা কি? দশ বৎসরের ভেতর ভারতবর্ষটাকে ছেয়ে ফেলতে হবে—"এর কমে হবেই না।" ভাল ঠুকে লেগে যাও—"ওরা শুরুকী ফতে!" টাকা-কাকা সব আপনা-আপনি আসবে। মানুষ চাই, টাকা চাই না। মানুষ সব করে, টাকায় কি করতে পারে?—মানুষ চাই—যত পাবে ততই ভাল।... এই ম—ভা ত ঢের টাকা যোগাড় করেছিল, কিন্তু মানুষ নাই—কি কাজ করলে বল? কিমধিকমিতি—

বিবেকানন্দ

ভালবাসা

মণিকুন্তলা মুখোপাধ্যায় (কাজল)

এক মা'র পেটের দু'টি ভাই-বোন।

কিন্তু ঝগড়া-ঝাঁটি তাদের যেন লেগেই আছে।

কেন যে তাদের ঝগড়া হয়, কি নিয়ে হয়—তার হেতু খুঁজতে যাওয়া বৃথা। দাদা নিধিরামের মাথাটা একটু খারাপ, রাগ হতে তার বেশি দেরি হয় না, এবং দাদা বলে যেটুকু সমীহ-সম্মান তাকে করা উচিত, ছোট বোন টগরের ব্যবহারে তার একান্ত অভাব।

নিধিরাম রোজ ছিপ্ হাতে নিয়ে পুকুরে মাছ ধরতে যায়। সেদিনও গিয়েছিল। কিন্তু যখন্ শুঁড়ির পুকুরের মাছগুলো এই সবে আঙুলের মত কি তার চেয়ে সামান্য বড়ই হয়েছে ; এ সময় তাদের ঝুলে ঝুলে খাবার লোভ সম্বরণ করতে না পারলে এবং চুরি বন্ধ না করলে মাছগুলোর বড় হবার আশা-ভরসা খুব কম। তাই যখন্ শুঁড়ি কাল থেকে পুকুরে তার রীতিমত পাহারা দিতে আরম্ভ করেছে।

নিধিরাম হাবাগোবা মানুষ, কে কোথায় পাহারা দিচ্ছে সে-সংবাদ রাখবার মত অবসর তার নেই। কোনোদিকে না তাকিয়েই পুকুরের যে-ঘাটে যেমনি তার ছিপটি সে ফেলেছে পেছন থেকে কে যেন ডাকলে, 'ঠাকুর!'

নিধিরাম চমকে পেছন ফিরতেই দেখে, যখন্।

'কি?'

'অন্য পুকুরে যাও দাদা, এখানে না।'

নিধিরাম ধীরে-ধীরে উঠে অন্য পুকুরেই গেল।

যখন্ শুঁড়ি ছোটজাত,—মদ বেচে খায়। আর তারা ব্রাহ্মণ। বর্ণশ্রেষ্ঠ।

অন্য পুকুরে গিয়ে মাছও সে ধরলো, বাড়ীও ফিরলো মাছ নিয়ে, কিন্তু তার মনের মধ্যে অপমানের কেমন যেন একটা সূক্ষ্ম রেশ ঝিন্ ঝিন্ করে বাজতে লাগলো।

বাড়ী ফিরে সে রান্নাঘরের দরজার কাছে গিয়ে বললে, 'নে টগরী, মাছগুলো তুলে রাখ্।'

'উনোনে ভাত চড়িয়ে টগরী তখন ঘরের দাওয়ার ওপর ছেঁড়া একটা কাপড় সেলাই করতে বসেছে। মুখ না তুলেই জিজ্ঞেস করলে, 'কি মাছ দাদা?'

নিধিরাম বললে, 'পুঁটিমাছ। নে, আর শীগগির।'

টগরী খুব তাড়াতাড়ি ছুঁচ চালাতে চালাতে বললে, 'এই যে, হয়ে গেছে। দাঁড়া না ভাই একটু মাছগুলো আগলে, আমি যাচ্ছি।'

নিধিরামকে অগত্যা সেইখানে ছিপ হাতে নিয়েই মাছ আগলে দাঁড়িয়ে থাকতে হলো।

একাকী চুপ করে কতক্ষণই-বা দাঁড়ায়!

জিজ্ঞেস্ করলে, 'আচ্ছা বল্ দেখি টগরী, তেঁতুল গাছের ফুল হয় কি না?'

টগরী বললে, 'যেৎ! তাই আবার হয় নাকি?'

মুখ ভেংচে নিধিরাম বললে, 'তুই কিছু জানিস না। তুই একটি গাধা। ফুল হয়। ফুল হয়।'

টগরী বিশ্বাস করলো না। বললে, 'হ্যাঁ হয়! তোর কথাতেই হয়!'

নিধিরামের রাগ হয়েই ছিল। বললে, 'হয় না - বলছিস? দেখবি মজা?'

বলে উঠোন থেকে একটা ঢিল্ কুড়িয়ে নিয়ে নিধিরাম তার দিকে সেটা ছোঁড়বার উদ্যোগ করতেই টগরী চেঁচিয়ে উঠল,—'খবরদার দাদা, ঢিল ছুঁড়িসনে বলছি। গায়ে যদি আমার লাগে তো কিছু বাকি রাখব না বলে দিচ্ছি। বেরো বলছি ক্যাপা কোথাকার!'

'ক্যাপা বলনি, তবে তো মারবই।' বলে নিধিরাম সত্যি সত্যি ঢিলটা তার গায়ের দিকে ছুঁড়ে দিলে।

তাগ্যিস টগরী একটু সরে দাঁড়িয়েছিল। ঢিলটা তার গায়ে লাগলে না।

কিন্তু বিশ্বাস নেই তার এই পাগল দাদাটিকে।

এখুনি হয়তো সত্যি-সত্যিই মেরে বসবে, টগরী তাই ছুটে ঘরে ঢুকে খিলটা দিলে বন্ধ করে। তারপর ঘরের ভেতর থেকেই নিবিরামকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল :

'তাত যদি আমার পুড়ে যায় তো পিত্তি ধাবি যেন জল করে। এ খিল আমি আর খুলছি না। আমার কি, আমি উপোস দিয়ে রইলাম।'

নিবিরামও চীৎকার করে তাকে শুনিয়ে দিলে,—'আমার বয়ে গেল তবে, এই রইলো তোর মাছ, বেড়ালে এসে খেয়ে দিক।'

টগরী ঘরের মধ্যে অন্যমনস্কভাবে কাপড়ের ওপর ছুঁচ চালাতে চালাতে ভাবছিল, দরজাটা সে খুলবে কি না। কিন্তু তার দাদাটি যদি বাইরে ওৎ পেতে দাঁড়িয়ে থাকে, খোলা তাহলে নিরাপদ নয়।

এমন সময় পাশের বাড়ীর কদম-পিসির গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। পিসি তাদের উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে।

—'কই গো টগর, কোথায় গেলে? বেলা থাকতে থাকতে কলার কাঁদিটা কাটলাম ত' ভাবি আহা, টগরকে কাঁচকলা দু'টো দিয়ে আসি।—ওমা, এরা সব মাছ ফেলে গেল কোথায়? মাছ যে কাকে খাচ্ছে। হেই, হেই, যা-আ!' বলে মুখে একটা শব্দ করে কাকটাকে তাড়িয়ে দিয়ে পিসি আবার ডাকলে, 'টগর!'

টগর তখন চুপি চুপি অত্যন্ত সন্তর্পণে ঘরের খিলটা খুলে পা টিপে টিপে বাইরে এসেই এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললে, 'গেছে?'

পিসি অবাক হয়ে তার মুখের পানে তাকিয়ে বললে, 'কে গেছে টগর? কই, কেউ তো ছিল না এখানে।'

'আর বল কেন পিসি, দাদাকে নিয়ে আমি গেলাম!' বলে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে ঢুকে টগর প্রথমে উনোনের কাছে গিয়ে দেখলো, তাতে জল আছে কিনা। তারপর বললে, 'বোসো পিসি বোসো, আমি ততক্ষণ মাছ ক'টা বেছে নিই।'

পিসি বললে, 'এই কাঁচকলা দুটো দিতে এসেছিলাম টগর। বসবার কি আর অবসর আছে মা!' বলে রান্নাঘরের চৌকাঠের পাশেই পিসি জাঁকিয়ে বসে পড়ে বসলো। বসে বললে, 'মাছ ক'টি নিবিরাম ঘরে আনলে বুঝি?'

মাছ বাছতে বাছতে ঘাড় নেড়ে টগর বললে, 'হ্যাঁ পিসি, মাছ না হলে ভাতের থালা সুদ্ধু উল্টে ফেলে দেয়। নিজেই চারটি ধরে আনে ছিপ দিয়ে, তাই কোনো রকমে দিই রান্না করে। আবার ঘুড়ি নিয়ে যেদিন মেতে ওঠে, সেদিন আর পুকুরের দিকে যায় না, অথচ খাবার সময় এসে চেঁচাতে থাকে। বলে, 'মাছ তুই কোথাও জোগাড় করে আনলি না কেন বল্! আমি কোত্থেকে আনবো—আচ্ছা তুমিই বল না পিসি।' বলে টগর তার ঠোঁটের ফাঁকে ম্লান একটুখানি হেসে বললে, 'ওর মাথার ঠিক আর হোলো না পিসি। বয়েসও তো কম নয়। আমার যদি হয় ষোলো, ত' ওর হোলো কুড়ি। আমার চেয়ে চার বছরের বড়।'

পিসি বললে, 'ঘরে খিল দিয়ে ছিলি, ভাই-বোনে ঝগড়া হচ্ছিল বুঝি?'

'হ্যাঁ।' বলে ঘাড় নেড়ে টগর বললে, 'ঝগড়া তো আমাদের চব্বিশ ঘণ্টাই লেগে আছে পিসি। আজ কিছুই না, কথায়-কথায় কি যে বললাম,—উঠোন থেকে অমনি বড় একটা ঢিল নিয়ে আমায় মারতে এলো।'

কদমপিসি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'কি আর করবি বাছা, যেমন পোড়া অদৃষ্ট। বাপটি যদিই-বা ছিল, তাও ত' গেল। ওই দাদাটিকেই আগ্‌লে আগ্‌লে থাকতে হবে চিরটা কাল।'

টগর কদমপিসির মুখের দিকে একবার তাকালো। সে চাউনির অর্থ পুরুষ হলে বুঝতো কিনা সন্দেহ, কিন্তু কদমপিসির বুঝতে দেরি হলো না। বললে,

'তাও তো সত্যি বাছা, বাপ ছেলে-বউমে বিয়ে দিয়ে গেল, আজ এত-বড়টি হয়েছিস্ তা একবার শ্বশুরবাড়ীর মুখ দেখতে পেলি না। ওদের তো আর দোষ দেওয়া যায় না টগর, ওরাও তো দু' তিনবার তোকে নিতে এসেছিল, ওই নিধিরামের জন্যেই তোর যাওয়া হোলো না। জামাইটি তো মাঝে মাঝে নিজে এলেই পারে! চিঠিপত্র দেয়? হাঁরে?'

'না।' বলে ঘাড় নেড়ে টগর উঠে দাঁড়াল। বললে, 'মাছগুলো ধুয়ে আনি পিসি।'

খিড়কির ঘাট থেকে টগর ফিরে যখন এলো তখন সূর্যাস্ত হচ্ছে। পিসি জিজ্ঞেস করলে, 'বলি বলি করেও তোকে একটা কথা আমার জিজ্ঞেস করা হয়না টগর, সেই যে পদ্মাপারে তোদের দেশ আছে, সেখানে আপনার-জন তোদের কি কেউ নেই?'

টগর বললে, 'জানিনা পিসি, সে খবর কেমন করে জানবো বল। আর জেনেই-বা কি হবে!'

কিন্তু পদ্মাপারে তাদের কথা যখন উঠলো, গল্পটিকে তখন একবার পিছিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

টগর ও নিধিরামের বাপ ছিলেন একজন ছোটো-খাটো ডাক্তার। কেমন করে জানিনা, পূর্ববঙ্গ থেকে তিনি আসেন রাণীগঞ্জের কোন-একটা কয়লা-কুঠিতে ডাক্তারী করতে। আসেন একেবারে সপরিবারে। সেইখানেই একটি বাসা তাঁকে দেওয়া হয় এবং স্ত্রী-পুত্র নিয়ে তাতেই তিনি বাস করতে থাকেন। বাসার পাশেই ছিল একটি গোলদারী দোকান। দোকানটি গৌরহরি সরকারের। এই গৌরহরির সঙ্গে ডাক্তারবাবুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা হয়। শেষে গৌরহরিই তাঁকে এই গ্রামে নিয়ে আসে। ডাক্তারবাবুকে এ্যালোপ্যাথী ছেড়ে হোমিওপ্যাথী ধরতে হয়; তার কারণ, গ্রামবাসী গরীব এবং হোমিওপ্যাথী সস্তা। মাস-ডাক তাঁর বন্ধ হয় না, তাতেই কোনো রকমে তিনি একতলা এই ছোট্ট ইঁটের বাড়ীখানি তৈরি করেন, বৎসামান্য কিছু জমি-জায়গা কেনেন এবং সব চেয়ে বড় কাজ—বারো বছর বয়েসে বাঁকুড়া জেলার কোন্ একটি গ্রামে টগরীর বিয়ে দেন।

স্ত্রী মারা গেলেন—ছেলে মেয়ে তখন দুজনেই ছোট। কাজেই তাঁর নিজের মৃত্যুর পর নিধিরাম আর টগরকে দেখাশোনা করবার কেউই অবশিষ্ট রইল না।

টগর কাপড় কেচে তুলসী তলায় প্রদীপ দিয়ে ঘরে সন্ধ্যা জ্বাললো। একা ঘরে ব'সে কি আর করবে, নিজের কাপড়খানা সেলাই করা তার শেষ হয়েছে, এবার সে তার দাদার একখানা কাপড় নিয়ে বসবে।

দরজার কাছে হেঁটমুখে বসে বসে টগর কাপড় সেলাই করছে, বাইরের হঠাৎ হাসির শব্দে তাকিয়ে দেখে, নিধিরাম।

'কেমন? খিল দিতে ভুলেছিল কি না! কেমন মজা!'

টগর বললে, 'মজা খুব। বেশ হয়েছে, দিয়েছে তোর মাছ ক'টা বেড়ালে খেয়ে। এবার কি দিয়ে ভাত খাবি খা।'

নিধিরাম বললে, 'ওসব আমি জানিনা, মাছ তুই আমায় নিয়ে আয় যেখান থেকে পাস্। কেন? ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে পারলি না? মরে তো যাসনি!'

টগর বললে, 'আমাকে মারবি ব'লে তুই খিল নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলি বাইরে, আমি বেরুবো কেমন করে? ভাত পুড়ে গেছে, মাছ খেয়ে দিয়েছে, বেশ হয়েছে, তোর আচ্ছা শাস্তি হয়েছে আজ। আর মারবি?'

নিধিরাম বললে, 'না মারব না? আখ্না আজ তোকে কি করি! দে ভাত দে। আমার ক্ষিদে পেয়েছে।'

টগর কোনও কথা না বলে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলো।

নিধিরাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ দেওয়ালের গায়ে একটা টিকটিকির দিকে তাকিয়ে রইল তারপর পাথরের নোড়াটা তুলে এনে বললে, 'মারব শালাকে।'

টগর জিজ্ঞেস করলে, 'কাকে মারবি ?'

'টিকটিকিটাকে।'

'ছি, টিকটিকি মারতে আছে ?'

নিধিরাম বললে, 'ভাখ্‌না, আরশোলাটাকে কেমন ক'রে ধরেছে ভাখ্‌না।'

টগর নিষেধ করলে, 'নারে না, মারিসনি দাদা, ছি! আচ্ছা দাদা, তোর কি বুদ্ধি-সুদ্ধি কখনও হবে না? লোকে যে তোর বিয়ে দেবে না রে!'

বিয়ের কথায় নিধিরাম লাফিয়ে উঠল,—'খবরদার বলছি টগরী, এই নোড়া দিয়ে মাথাটা তোর ছেঁচে আমি ভেঙে ফেলব—বিয়ের কথা যদি বলবি।'

টগর বললে, 'বিয়ের কথায় মাথা ছেঁচতে হয় বুঝি? বেশ ত' আমার কি, কালকেই আমি শ্বশুরবাড়ী চলে যাব। তুই থাকবি একা একা, নিজেই চারটি রাঁধবি, খাবি, যা খুশী তাই করবি। আমি আর তোর মার খেতে পারব না।'

নিধিরামের গলার সুর হঠাৎ একটুখানি নরম হ'য়ে এলো। বললে, 'হ্যাঁ, যাবি শ্বশুরবাড়ী! যেতে না দিলেই নয়! কই আসুক দেখি শালায় তোকে একবার নিতে! ঠেঙিয়ে পা খোঁড়া ক'রে দেবো।'

টগর বললে, 'বা-রে! তাই ব'লে এইখানে প'ড়ে প'ড়ে তোর মার খাব?'

নিধিরাম আর কোনও কথা না ব'লে হাত থেকে নোড়াটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অন্ধকারেই ঘরের বাইরে চ'লে যাচ্ছিল।

টগর বললে, 'যাচ্ছিস কোথায়?'

'তোর কি, তুই চুপ কর্।' ব'লে নিধিরাম বাইরে গিয়ে রান্নাঘরের দেওয়ালে-টাঙানো তার ছিপটা পেড়ে এনে ঘরে ঢুকলো।

টগর জিজ্ঞেস করলে, 'রাত্রে ছিপ নিয়ে কি হবে?'

'তোর মাথা হবে।' ব'লে আলোর কাছে ছিপটা এনে হেঁট হয়ে খুব মন দিয়ে নিধিরাম তার বঁড়শিটা পরীক্ষা করতে লাগল। বললে, 'কাল চারটে পয়সা দিবি টগরী?'

'কেন?'

ভাল একটা বঁড়শি কিন্‌বো। কাল তোকে তাহলে বড় মাছ খাইয়ে দিই। সত্যি বলছি।

টগর দেখলে দাদার মেজাজটা এই সময় একটুখানি ভাল আছে। বললে, 'ভাখ্, দাদা, তুই যদি অমনি কথায় কথায় আমাকে মারতে না উঠিস তাহ'লে চারটে কেন, আরও বেশি পয়সা তোকে আমি দিতে পারি।'

নিধিরাম বললে, 'আচ্ছা, বেশ আর মারব না। দে পয়সা।' বলে সে হাত পেতে বললো।

টগর বললে, 'কাল দেবো। আজ দিলে তুই হারিয়ে ফেলবি।—আচ্ছা দাদা, একটা কথা বলব, রাগ করবি না ত?'

'রাগ করবো না। তুই বল্।'

নিধিরাম তার মুখের পানে তাকালো।

টগর বললে, 'ও-পাড়ার নেবীকে দেখেছিস দাদা? সেই যে ভৈরব মুখুজ্যের মেয়ে—বেশ ডাগর-ডোগর মেয়েটি দেখতে রংটাই যা একটু কালো। বাপ গরীব, মেয়েটার বিয়ে দিতে পারছে না, ওকেই আমরা আমাদের বৌ ক'রে আনিনা?'

কথাটা নিধিরাম ভালো ক'রে তলিয়ে বোঝেনি। বললে, 'কি? কেন? নেবীকে আমি জানি ত'। হ্যাঁ, জানি।'

টগর হাসলো। বললে, 'বুঝতে পারলি না দাদা? ওর সঙ্গে তোর বিয়ে দিয়ে নেবীকে আমরা আমাদের—'

কথাটা তাকে আর শেষ করতে হ'লো না। হাতের কাছে ছিপটা প'ড়ে ছিল। তাই না তুলে নিয়ে সপাং ক'রে টগরের পিঠের ওপর এক বাড়ি মেরে নিধিরাম বললে, 'তুই বিয়ে করগে যা।'

ব'লেই আবার আর-একবার ছিপটা সে তুলতে যাচ্ছিল, টগরের হঠাৎ সেদিন কি যে হ'লো কে জানে, সেও আর কোনও কথা না ব'লে ছিপটা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে দু'হাত দিয়ে তার চোখের সুমুখে মটমট ক'রে ভেঙে টুকরো টুকরো ক'রে দিয়ে বললে,

'নে মাদু কি দিয়ে যাস্‌নি। কেন, কী এমন কথাটা বললাম আমি যে তুই আমাকে মারলি ?

বলতে বলতে সে ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে কেঁদে ফেললে।

না কাঁদলে নিধিরাম কি করতো বলা যায় না। তার অত সাধের ছিপখানা ভেঙ্গে দেওয়ার অপরাধ বড় সোজা অপরাধ নয়। নিধিরাম একেবারে হতভম্ব হয়ে হাঁ ক'রে টগরের মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পরে চোখ মুছে টগর বললে, 'আর পিত্তি খেয়ে নিতে আয়! আমাকে ছুটি দে। এইবার একদিন আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব দেখে নিস।'

এই বলে একটা লণ্ঠন জেলে নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে টগর ভাত বাড়তে লাগলো।

নিধিরাম ধীরে ধীরে রান্নাঘরে গিয়ে চুপ ক'রে বসলো। দেখলে, ভাতও পোড়েনি, মাছও বেড়ালে খায়নি। টগরী তাকে মিছে কথা বলেছে।

খেতে খেতে খুশী হয়ে নিধিরাম হাসতে লাগল। বললে, 'তবে যে তখন মিছে কথা বললি টগরী ?'

টগরীর মুখখানা তখনও গম্ভীর। বললে, 'হাসিস্‌নে দাদা, ভাল লাগে না। চুপটি ক'রে খেয়ে নে। নিয়ে হাত ধুয়ে শোগে যা।'

শ্বশুরবাড়ী থেকে কদমপিসির মেয়ে অভয়া এসেছে। অভয়া টগরের সমবয়সী। ছেলেবেলায় দু'জনে একসঙ্গে খেলা করেছে, একসঙ্গে এক ইস্কুলে একই ক্লাসে পড়েছে। এমন-কি সেদিন পর্য্যন্ত অভয়া তার শ্বশুরবাড়ী থেকে টগরকে চিঠি লিখেছে।

টগর দেখলে, অভয়ার ছেলে হয়েছে একটি। সুন্দর ছোট্ট ছেলে। রং খুব ফর্সা। ছেলের নাম রেখেছে—ফটিক।

ফটিককে কোলে নিয়েই অভয়া টগরের সঙ্গে দেখা করতে এলো। বাপের বাড়ী অনেকদিন আসেনি, স্বামী তার কোন্ সুদূরদেশে চাকরি করে, অভয়াকে সে সেইখানেই নিয়ে গিয়েছিল।

অনেকদিন পরে বাল্যবন্ধুর সঙ্গে দেখা। কথা যেন তাদের আর ফুরোতেই চায় না।

কদমপিসি সেদিন রাত্রিতে দুধ খাওয়াবার জন্যে দুধের বাটি হাতে নিয়ে টগরের উঠোনে এসে দাঁড়ালো। দেখলে, ফটিক হামাগুড়ি দিয়ে খেলা করছে। দোরের কাছে দুই বন্ধু গল্পে মেতেছে।

'এত কী কথা যে তোদের যে শেষই হয় না!'

কদমপিসি বললে 'আহা, এতদিন যে তোরও অমনি একটি হোতো মা, তা কি আর কবধি বল্! অদৃষ্ট।'

অভয়া তার মা'র কথার প্রতিবাদ করে বললো। বললে, 'অদৃষ্ট কেন বলছো মা, অদৃষ্ট কেন হবে? পাগল ওই ভাইটাকেই যে চিরটা কাল আগলে থাকতে হবে তার কি মানে? মানুষের নিজেরও ত' সুখশান্তি ব'লে একটা জিনিষ আছে।'

পিসি বললে, 'তা ত' আছেই মা, কিন্তু কি করবে বল্। ভাইটিকেও ত' একা ঘরে ছেড়ে দিয়ে যেতে পারে না।'

অভয়া টগরের মুখের দিকে তাকালে। দেখলে, সে তখন ছেলেটাকে তার কোলে তুলে নিয়ে চুমো খেয়ে আদর করছে, আর ছেলেটি হাসছে খিল খিল করে।

অভয়া কিছুক্ষণ সেইদিক পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো। তারপর বললে, 'অমন সুন্দরী মেয়ে টগরীর ভাগ্যে যে এই ছিল তা কে জানতো! আচ্ছা মা, নিধিরামদার বিয়ে দিয়ে টগরী ওর শ্বশুরবাড়ী চলে যাক না!'

মা খানিক চুপ করে রইলো। মেয়েকে কি যেন সে বলতেও যাচ্ছিল, কিন্তু টগরীর সামনে কথাটা সে আর বলতে পারলে না।

টগরী শেষে নিজেই সে অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ উত্থাপন করলো। ম্লান একটুখানি হেসে সে বললে, 'বিয়ে ওর দেবে কে পিসি? মেয়ে ত' কারও সস্তা হয়নি যে মার খাবার জন্যে ওর সঙ্গে বিয়ে দেবে!'

কণ্ঠস্বরটি ঠোঁটের কাছে একটুখানি নামালো। অভয়া বললে, 'হ্যাংলো হাঁ, মারে সবাই! বোনকে মারছে বলে কি বৌকে মারবে মনে করেছিস?' ঘাড় নেড়ে বললে, 'কথ্খনো না। আমার মনে হয়, বেশ বড় সড় দেখে একটি বৌ যদি ঘরে আনিস টগর, তাহলে হয়ত ও শুধরে যেতে পারে।'

কথাটা মনে ধরলো সবারই। কিন্তু বিয়ে করবে কে? বিয়ের নামে নিবিরাম রেগে আগুন হয়ে ওঠে। টগরী বললে, 'দেখবে পিসীমা?' বলেই সে তার ডান হাতটা খুলে দেখালে। মস্ত একটা কাটা দাগ। দাগের মুখে রক্ত জমে রয়েছে তখনও। বললে, 'বিয়ের কথা বলেছিলাম। তাই মেরেছে আমাকে। আমি তো প্রতিজ্ঞা করেছি পিসি, ওর বিয়ের কথা আমি আর মুখে আনবো না।'

ব'লে একটুখানি থেমে সে আবার বললে, 'তাছাড়া কথা কইতে জানে না, কাপড় পরতে জানে না, ভাত খেয়ে বাঁচায় ত' হাতে-মুখে এঁটো লেগে থাকে। এত করে যে বলি—দাদা, ভাল করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে মানুষের মত থাক্। জানোয়ার হয়ে তো জন্মাসনি!—তা সে কে কার কথা শোনে! দেখেশুনে জামাই ওকে করবে কে পিসি? মেয়ে ওর হাতে দেবে কে?'

কথাটা সত্যি। কাজেই পিসিকে চুপ ক'রে থাকতে হয়।

সেইদিনই বিকেলে পুকুরে কাপড় কাচতে গিয়ে টগর বললে, 'হ্যাঁ, অভয়া, একটি মেয়ের কথা আমি প্রায়ই ভাবি। ও পাড়ার নেবীকে জানিস তো? ভৈরব মুখুজ্যের মেয়ে।'

আর কিছু বলবার প্রয়োজন হ'লো না। অভয়া বুঝলো। বললে, 'ওমা, বলিস্ কি লা, নেবীর এখনও বিয়ে হয়নি?'

টগর বললে, 'কি ক'রে হবে বল্। ভৈরব মুখুজ্যের অবস্থা তো ভাল নয়। তার ওপর মেয়েটা কালো। দাদাটিও তো আমার রাজপুত্তুর নয়। ওর সঙ্গে একবার চেষ্টা করে দেখলে হয়!'

অভয়া বুঝলো তাকেই ঘটকালি করতে হবে। বললে, 'কাল আমি আমাদের বাড়ী ডেকে পাঠাচ্ছি—ভৈরব মুখুজ্যেকে।'

টগরের মুখে হাসি ফুটলো। বললে, ভাগ্যিস্ তুই এসেছিলি অভয়া।

অভয়া এবার কিন্তু অন্য কথা পেড়ে বসলো। পেড়ে বসলো টগরের স্বামীর কথা। জিজ্ঞাসা করলে, 'বিনোদ চিঠিপত্র দেয় না?'

টগর চুপ করে রইলো।

'চুপ করে রয়েছিস কেন? কসড়াকসি হয়েছে নাকি?'

কোনও কথা না বলে টগর তাড়াতাড়ি পুকুরের জলে গিয়ে নামলো।

অভয়াও তার পিছু পিছু পুকুরে নেমে গিয়ে এক গলা জলে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে ফিস ফিস করে টগরের সঙ্গে অনেক কথা কইলে। কিন্তু সেসব কথা লিখবার উপায় নেই।

ছিপ-বঁড়শি তার পরের দিনই টগরকে কিনে দিতে হয়েছে। নিবিরামের মাছ ধরা ঠিক আগের মতোই চলেছে। জীবনে যেন তার ওই একটিমাত্র কাজ। ওই একটিমাত্র আনন্দ। খেয়েদেয়ে ছিপ নিয়ে পুকুরে গিয়ে বসা।

সেদিন বিকেলে কোথায় কোন্ পুকুর থেকে বেশ বড় একটি মাছ ধ'রে কাপড়ের তলায় লুকিয়ে নিবিরাম বাড়ীতে এসে ঢুকলো। আহ্লাদে একেবারে আটখানা হয়ে হাসতে হাসতে ডাকলে,—'টগরী! নে ঝপ ক'রে বঁটি নিয়ে মাছটা কুটে ফ্যাল্। বলেছিলাম না—বড় মাছ একদিন তোকে খাওয়াব।'

ঘরের দাওয়ায় টগর ও অভয়া ব'সে ব'সে গল্প করছিল। কটিক একটু দূরে হামাগুড়ি দিয়ে খেলা করছে।

মাছ দেখে অভয়া বললে, 'নিধিরামদাদা তা'হলে আজ আমাকে নেমন্তন্ন করবে। কি বল্ টগরী ?'

নিধিরাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগলো।

অভয়া বললে, 'হাসছিস যে ? নেমন্তন্ন করবার ইচ্ছে নেই বুঝি ?'

নিধিরাম তবু সে কথার জবাব দিলে না। মাছটার কানকো ধ'রে চোখের সুমুখে তুলে তখনও সে মাছটা দেখছে আর হাসছে।

অভয়া বললে, 'দেখছিস্ টগরী, নেমন্তন্ন করবার ইচ্ছে নেই। না থাক, আমি তবু যাব। যাই—মাকে বলে আসি।'

এতক্ষণ পরে নিধিরাম হেসে বললে, 'বেশ ত' খাবি ত' খাবি, আমি বারণ করছি নাকি ?'

অভয়া বললে, 'দেখেছিস টগরী, কথা বলবার ঢং দেখছিস তোর দাদার ? ছি ! আমি তোমার বিয়ের জন্যে এত করছি নিধিরামদা, আমার কোথায় বাড়ী থেকে ডেকে এনে খাওয়াবে, তা না নিজে যেচে নেমন্তন্ন নিচ্ছি তাও তোমার মুখ ভারী ?'

নিধিরাম বললে, 'ঘাঃ !'

অভয়া বললে, 'ঘা' নয়, সত্যি কথা। বিয়ের ত' সব এক্ষরকম ঠিকই হয়ে গেল, এইবার মাছ ধরাটা তোমাকে দিন-কতক ছাড়তে হবে।'

নিধিরাম চীৎকার করে উঠল, 'খবরদার বলছি অভয়া, মেরে দেব এক্ষুনি।'

কথাটা টগরের ভাল লাগলো না। দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে বিরক্ত হয়ে বললে, 'কথা বলবার ছিরি ছাখো ! ওর বিয়ে দিয়ে কি হবে বল্ তো অভয়া ?'

নিধিরামের রাগ চড়ে গেল। বললে 'তুই চুপ কর্ হারামজাদী।'

ব'লে একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে হাতের কাছে কিছু না পেয়ে শেষে ওই মাছটাই সে টগরীর দিকে সজোরে ছুঁড়ে মারলে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য এমনি, মাছটা টগরীর গায়ে লাগলো না, কটিক খেলা করছিল, লাগলো গিয়ে সেই ছোট ছেলেটার গায়ে। ছেলেটা উলটে পড়ে গিয়ে চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠলো।

হা হা ক'রে টগরী ছুটে গেল, অভয়া ছুটে গেল, এবং তক্ষুনি কটিককে কোলে তুলে মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে টগরী চেঁচিয়ে বললে, 'তোর পায়ে পড়ি, তোর হাতে ধরি অভয়া, আর যদি কোনদিন তুই ওর বিয়ের কথা তুলিস ত' আমার মাথা খাস !'

বলেই এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলে, নিধিরাম তখন পালিয়েছে।

টগরীর রাগ তখনও কমেনি। বললে, 'ভৈরব মুখুজ্যে রাজি হয়েছে। কাল তাকে বলে দিলেই হবে বিয়েটা হ'লো বা।'

খোকার কান্না থেমেছিল। অভয়া বললে, 'যে আমার কোলে। দিয়ে মাছটা কুটে নিগে যা। কার ওপর রাগ করছিস্ তুই ?'

ছেলেটাকে অভয়ার কোলে দিয়ে টগরী মাছ কুটতে গেল।

মাছ কুটতে কুটতে আপন মনেই বলতে লাগলো, 'ওর বিয়ে দিয়ে শুধু পাপের ভাগী হওয়া ! নিজের সর্বনাশ হয়েছে সেই ভালো। আবার আর-একটা মেয়ের সর্বনাশ করি কেন ? তুই কিন্তু আমার কথা আর তুলিস নে অভয়া।' বলতে বলতে তার দুচোখ বেয়ে ঝর ঝর ক'রে জল গড়িয়ে এলো।

এ কদিন টগর ইচ্ছে ক'রেই নিধিরামের সঙ্গে কথা বলেনি। চুপচাপ ভাত বেড়ে দিয়ে বলছে—'কারও যদি খাবার ইচ্ছে থাকে ত' খাক !'

নিধিরামও কথা বলেনি। সেও তেমনি চুপচাপ মাথা হেঁট করে খেয়েদেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

প্রতিদিনের মত সন্ধ্যায় সেদিন অভয়া ও টগর কটিককে নিয়ে ব'সে ব'সে কথা কইছে, হাসছে, গল্প করছে, এমন সময় ছিপ হাতে নিয়ে নিধিরাম গম্ভীর

মুখে বাড়ী ঢুকলো। মাছ সেদিন সে একটিও ধরতে পারেনি।

টগর কথা বললে না, কিন্তু অভয়ার কেমন যেন ধন্দা হলো। বললে, 'কি নিধিরামদা, আজ মাছ নেই যে?'

'পেলাম না' বলে ছিপটা রেখে দিয়ে সে তাদের কাছে এসে দাঁড়ালো। বললে, 'মাছ এবেলায় আছে বাড়ীতে। না রে?'

কথাটা বললে সে টগরীকে, কিন্তু টগরী সে-কথায় কানই দিলে না। নিধিরাম তখন ধীরে ধীরে সেই-খানেই বসলো। বসে, ফটিকের দিকে হাত বাড়িয়ে বললে, 'এই ফটকে! আয়!'

বলেই সে ফটিকের হাত ধরে চড়্‌চড়্‌ করে তাকে নিজের দিকে টেনে আনলে।

টগর আর কথা না বলে থাকতে পারলে না। বললে 'ছেলেটাকে অমন ক'রে টানছিস্ কেন? নিস্‌নে বলছি, ধরবরদার বলা, ছেলে তুই ছুঁতে পাবি না। এক্ষুনি ওরত ছেলেকে আদর করতে দিয়ে দিবি ওর মাথাটা কাটিয়ে!'

কিন্তু নিধিরাম সেকথা শুনলে না। বললে, 'তুই চুপ কর্! তোর ছেলে নিতে যাইনি! তোর ছেলে নয়!'

টগর চুপ ক'রে রইল। অভয়ার বুক দুরদুর করতে লাগলো।

ছেলেটাকে কাছে পেয়ে নিধিরাম তাকে আদর করতে করতে বললে, 'কেমন? সেদিন কেমন মাছ খেয়েছিলি? আচ্ছা হয়েছিল! মাথাটা কেটে খেতো ত' তারি মজা হতো। আজ তেমনি ক'রে দেব আর একবার?'

কিন্তু হাবা ছেলে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকে।

নিধিরামের কিন্তু তা সহ্য হয় না। ছেলেটার কান ম'লে দিয়ে মাথায় এক চড় মেরে বলে, 'চুপ ক'রে রইলি যে! আবে, এই! কথা বল্ না!'

এত আদর ছেলেটারও বুঝি সহ্য হলো না। ছেলেটা কেঁদে উঠলো। নিধিরাম তখন তাকে তার বুকের ওপর তুলে নিয়ে আদর করতে লাগলো, 'বিয়ে দেখতে যাবি? আরে এই ফটকে! চল্ তোকে ওদের বউ দেখিয়ে নিয়ে আসি। পালকিতে চড়ে চাটুজ্যেদের বৌ এলো—নতুন বৌ, দেখবি কেমন রাঙা টুকটুকে বৌ! তোরও এমনি একটি বৌ আসবে। কেমন?'

এই বলে বোধ করি সত্যিই তাকে বৌ দেখাবার জন্যে নিধিরাম উঠে দাঁড়ালো।

কেন যে নিধিরাম এই সব কথা বলছে অভয়া তা বুঝতে পারলে। নিধিরামের বিয়ের কথা ক'দিন ধ'রে বন্ধ আছে বলেই বোধকরি তার এই নতুন বৌ দেখতে যাবার আগ্রহ। অভয়া আড়-চোখে তাকালে টগরের দিকে। টগরও তখন মুখ টিপে টিপে হাসছে।

ভৈরব মুখুজ্যের তখন এমন অবস্থা যে, মেয়ের বিয়ের জন্যে হাত-পা'ওলা একটা মানুষ হলেই হয়। নিধিরাম ত' অনেক ভাল।

বিয়ে শেষ পর্য্যন্ত এইখানেই ঠিক হয়ে গেল এবং দেখা গেল, বিয়ের আগেরদিন পর্য্যন্ত নিধিরামের খুব আপত্তি। মুখে বললে, বিয়ে সে করবে না। কপালে চন্দনের ফোঁটা দেবে না। ভাল কাপড়-জামা পরবে না। অথচ বিয়ের দিন না না করেও সবই করলে। ভাল কাপড় পরলে, জামা পরলে, কপালে চন্দনের ফোঁটা কেটে টোপর মাথায় দিয়ে বিয়ে করতে গেল। তার পর করে নিয়ে বাড়ী ফিরে এলো।

ভৈরব মুখুজ্যে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। যতই হোক, ভাই-এর বিয়ে। টগরের আনন্দের আর সীমা রইলো না। বৌকে নানারকম ভাবে সাজিয়ে, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে লোককে দেখিয়ে তার তৃপ্তি যেন আর মেটে না কিছুতেই! মুখুজ্যেকে সে আগে থেকেই বলে' রেখেছিল—বিয়ের পর বৌকে সে তাদের বাড়ীতেই রাখবে। নিতান্ত প্রয়োজন হলে এক-আধ বারের জন্যে বাপের বাড়ী যেতে পারে, এই পর্য্যন্ত।

তাই-ই বলো।

বিভাবনী ওরফে নেবী টগরের কাছেই রয়ে গেল।

অভয়া চুপি চুপি বললে, 'এইবার আমি একটা চিঠি লিখে দিই তোর বরকে। ওরা এসে তোকে নিয়ে যাক।'

টগর তার মুখের পানে তাকিয়ে একটু হাসলে, বললে, 'এখন না। চিঠি দিনকতক পরে দিস। ঘর-সংসার গুছিয়ে বৌ-এর হাতে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিই আগে।'

নেবীর বয়স হয়েছে। তার ওপর ভৈরব বিপত্নীক। নেবীর মা নেই। মাতৃহীনা এই মেয়েটাকেই সংসারের যাবতীয় কাজ এতদিন করতে হয়েছে। ঘর-সংসার চালাতে সে জানে। টগরকে বিশেষ বেগ পেতে হ'লো না।

অভয়া চিঠি লিখেছে। টগর তার কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করে বাক্সে তুলেছে।

এখন সে তার যমজা ছেঁড়া কাপড়গুলো পরে পরে বেড়ায়। কাচা কাপড়গুলো আর নষ্ট করে না। চিঠি যখন পেয়েছে, শ্বশুর বাড়ী থেকে লোক হয় ত' আজও আসতে পারে, কালও আসতে পারে।

টগর ব'সে ব'সে দিন গুনতে থাকে। আভাসে-ইঙ্গিতে নিধিরামও বৌকে বুঝিয়ে দেয় যে, টগর আর বেশিদিন নয়। শ্বশুর বাড়ী থেকে শুধু লোক আসবার অপেক্ষা। কিন্তু এরই মাঝখানে সেদিন এক অঘটন ঘটে গেল।

নিধিরাম মাছ ধরতে গিয়েছিল। ফেরার পথে পুকুরের পাড়ে দু'জন লোকের সঙ্গে দেখা।

—'কি হে তুমি নিধিরাম না?'

নিধিরাম এই আগন্তুক দু'জনের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। একজন বললে, 'চিনতে পারছে না বোধহয়। আমরা তোমার কুটুম যে। এই—ইনি তোমাদের জামাইয়ের ভাই, আর আমি ওর সম্পর্কে খুড়ো হই।'

নিধিরাম জিজ্ঞেস করলে, 'কি জন্যে এসেছো তোমরা?'

জামাইয়ের দাদা বললে, 'বৌমাকে নিতে এসেছি। তোমার বোনকে।'

নিধিরামের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়ে গেল। ফট্ করে সে বলে বসলো, 'সে তো এখানে নেই!'

জামাইয়ের খুড়োমশাই বুড়ো মানুষ। এতখানা পথ পরিশ্রম করে হেঁটে আসা তবে-কি তাঁর বৃথাই হ'লো? সেইখানেই একটা গাছের তলায় তিনি ব'সে পড়লেন। বললেন, এটা কিরকম কথা হলো? বৌমা এই সেদিন আমাদের চিঠি দিলেন। লিখলেন, এসে তোমরা আমাকে নিয়ে যাও। তারপর চলে গেলেন কি রকম?'

নিধিরাম বললে, 'পরশাপারে আমাদের জমি-জায়গা সব বিক্রি করতে হবে কিনা। তোমরা মিছেই এলে।'

জামাইয়ের ভাই বোধকরি রাগ করলে। বললে, 'এই নিয়ে পাঁচবার হলো খুড়ো। তাহ'লে আর বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়ে কি হবে? এই পথেই ফেরা যাক।'

এতখানি পথ হেঁটে এসে খুড়োর বোধ হয় ফেরবার ইচ্ছা ছিল না। বললেন, 'খাওয়া-দাওয়া কোথায় হচ্ছে তোমার?'

নিধিরাম বললে, 'আমার? আমি শ্বশুর-বাড়ীতে খাই।'

—'তবে আর কি। তাহলে চল!' ব'লে খুড়ো উঠলেন।

যাবার সময় একবার মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে বলে গেলেন, 'ওহে ও নিধিরাম, তোমার বিয়ের নেমন্তন্নের চিঠি আমরা পেয়েছিলাম যাবাজি, কিন্তু কুটুম্বজনকে চিঠি পত্র দিতে হ'লে দু'চারদিন হাতে রেখে দিতে হয়। আমরা চিঠি যেদিন পেলাম তোমার বিয়ে-থা তখন চুকে গেছে।'

আরও কি যেন তিনি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু

জামাইয়ের ভাই তাঁর হাতে ধরে বললে, 'আঃ, কি করছ খুড়ো, কাকে বলছ ওসব? ওর কি মাথার ঠিক আছে?'

এই বলে আরও কি যেন সব বলতে বলতে খুড়োকে সে এক রকম টেনেই নিয়ে চলল।

বাড়ী ফিরে গিয়ে নিধিরামের সেদিন সে কি উল্লাস!

হাসতে হাসতে টগরীকে এসে সংবাদ দিলে যে, সে আজ একটা ভারি মজার কাণ্ড করে এসেছে।

এমন কাণ্ড সে কত করে, কাজেই তাতে কান দেওয়া প্রথমে কেউই প্রয়োজন মনে করলে না।

হাসবার খোরাক জুটবে ভেবে অভয়া জিজ্ঞেস করলে, 'কি কাণ্ড নিধিরামদা?'

টগরীকে শুনিয়ে শুনিয়ে নিধিরাম বললে, 'যাবি শ্বশুর বাড়ী? যা কেমন ক'রে যাবি। আজ তার ব্যবস্থা করে দিয়েছি।'

টগরীর বুকের ভেতরটা ছ্যাৎ করে' উঠল। —ভাখো আবার হতভাগা কি কাণ্ড করে এসেছে!

নিধিরাম বললে, 'তোর শ্বশুরবাড়ী থেকে দুটো লোক এসেছিল তোকে নিতে। সেই যে দাড়িওলা লোকটা—সেই যে-ব্যাটা এসেছিল আর-একবার—'

টগরী তার কাছে এসে দাঁড়াল। বললে, 'তারপর?'

নিধিরাম হাসতে হাসতে বললে, 'দিলাম তাড়িয়ে। বললাম টগরী বাড়ী নেই। পল্লাপার চলে গেছে।'

টগরীর তখন কাঁদবার মত অবস্থা। কোনো রকমে চোখের জলটাকে চেপে রেখে জিজ্ঞেস করলে, 'কোথায় তারা? চলে গেছে?'

নিধিরাম বললে, 'যাবে না? টিল মেরে পা খোঁড়া করে দিইনি এই ব্যাটাদের বাবার ভাগ্যি।'

অভয়া তাকে কাছে ডেকে আদ্যোপান্ত সমস্ত ব্যাপারটা ভাল ক'রে শুনতে চাইলে। কি যে তারা জিজ্ঞেস করেছে, এবং তার জবাবে নিধিরামই-বা কি বলেছে, সব কথা হুবহু বলবার মাথা তার ছিল না, তবু সে যেটুকু বললে, তাই-ই যথেষ্ট।

টগরের চোখ দু'টো ছল্ ছল্ করতে লাগল। অভয়া কাঁদবে কি হাসবে কিছুই বুঝতে পারলে না। হতভম্ব নির্বাক হয়ে গালে হাত দিয়ে ব'সে রইল।

শ্বশুর বাড়ী যাবার জন্যে যে কাপড়গুলো টগর ধুয়ে পরিষ্কার ক'রে রেখেছিল, আবার সেগুলো সে বের করে পরতে আরম্ভ করেছে।

অভয়াকে বলে, 'আর একটা চিঠি লিখে দিন তাই।' বলে, 'যারা এসেছিল, তারাই-বা কিরকম? দাদাটা আবার বদ্ধ পাগল, ওর মাথার ঠিক নেই, এ ত' বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের লোক জানে। ওর কথা শুনে রাস্তা থেকে ফিরে যেতে হয় কখনও!'

অভয়া সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে। বলে, 'না গো না ভাবিসনে, আমি আবার চিঠি লিখে দিচ্ছি, আবার আসবে। তোর মতন বৌ ছেড়ে সে-দিন্‌বেই-বা আছে কেমন করে তাই ভাবি। যত্তি পুরুষ যা হোক্!

টগরের চোখ দুটো জলে ভিজে আসে। বলে, 'যার জন্যে এত করলাম, সেই দাদাই আজ আমার শত্রুতা করলে।'

অভয়া বলে, 'পাগল! ওকি আর অত-সব বুঝে করেছে? ও ভেবেছে বুঝি ওর ওপর রাগ করে তুই শ্বশুরবাড়ী চলে যেতে চাস। তাই তোকে জব্দ-বেলেই তোর যাওয়াটা ও বন্ধ করেছে।'

মন তবু মানে না কিছুতেই। নির্বোধ দাদাটি যে তার কিছু না বুঝেই এই কাণ্ড করে বসেছে তা সে জানে। তবু এই নিধিরামকে দেখবামাত্র আজ কাল তার শুধু সেই কথাটাই বেশী করে মনে হয়, জীবনে, যদি-বা সে কোনোদিন সুখের মুখ দেখতে পেতো, তা শুধু তার এই দাদাটিই হতে দিলে না। এই দাদাটিই তার শত্রু।

ক্রমে ব্যাপারটা এমন হয়ে দাঁড়াল যে নিধিরামকে

দেখলেই টগরের রাগ ধরে। হেসে হেসে বোকার মত কথা কইলেই তার আপাদ-মস্তক জ্বলে যায়।

বৌ আসবার পর থেকে মায়ের হাতটা তার কিছু কমেছে। আজকাল আর সে আগের মত কথায় কথায় টগরীকে মারতে ওঠে না। তবে বেচারা বৌ তার প্রায়ই মার খেয়ে মরে। কেন সে মারে তা সে-ই জানে। এক-একদিন রাত্রে এমন হয় যে, বৌ-এর কান্না শুনে টগরীকে তাদের ঘর দরজায় গিয়ে দাঁড়াতে হয়।

বৌ যে একেবারে নির্দোষ তা নয়, মুখে তার আজকাল বেশ কথা ফুটেছে। টগরীকেও জবাব দিতে সে কসুর করে না। টগরীর মন ত' একে নিজের দুর্ভাগ্যের ভাবনা ভেবে দিনরাত তিক্ত-বিরক্ত হয়েই থাকে, তার ওপর বৌ যদি অপ্রীতিকর কিছু বলে ত' সেও তাকে দু' কথা শুনিয়ে দেয়।

সেদিন অমনি বেলা তখন দুপুর। কি যেন একটা কথা উঠতেই কথায়-কথায় বৌ বলে বসল, 'তারি ত' সব আমার হিতৈষীরা,—চুপ করুন! এর চেয়ে বাবা যদি আমাকে জলে ভাসিয়ে দিত ত' ভাল হ'তো।'

কথাটা টগরের বুকে গিয়ে লাগল। বললে, 'রূপবতী রাজকন্যাকে সাত রাজার ধন মাণিক দিয়ে রাজার ছেলে এসে বিয়ে ক'রে নিয়ে যেতো, না গো রূপসী? চুপ কর। কপালে যা জুটেছে একেই তোমার ভাগ্যি বলে মানা উচিত।'

বৌ বললে, 'আমার না-হয় রূপ নেই, ভগবান আমায় কালো করে গড়েছেন, কিন্তু রূপের বেসাতে পা যাদের মাটিতে পড়ে না, তাদেরই-বা বর এসে কোন্ চৌদ্দলে বসিয়ে নিয়ে গেল? সেই ত' ভাইয়ের ভাত ছাড়া উপায় নেই।'

টগর এবার আর ছুঁড়ে ছুঁড়ে কথা বলতে পারলে না। বৌ-এর কাছে এগিয়ে গিয়ে বললে, 'বলি—শুনছো ও নেবী, তোর যে তারি বড় বড় কথা হয়েছে দেখছি। এরই মধ্যে এত জোর তুই পেলি কোথায়?'

গ্রামের মেয়ে ব'লে নেবী তার মাথার ঘোমটা এক রকম রাখতো না বললেই হয়, এবার সে কাপড়টাকে কোমরে জড়িয়ে ব'লে উঠল, 'কেন, মারবে নাকি?'

টগরী বললে, 'ইচ্ছে করলে তাও পারি—সেই কথাটাই জেনে রাখ্।' বলে টগর তার গালে একটা ঠোনা মেরে বুঝিয়ে দিলে। বললে, 'আমিই এনেছি, ইচ্ছে করলে আমি তোকে তাড়িয়েও দিতে পারি।'

নেবী বললে, 'পারিস তা গাঁ-সুদ্ধ লোকে জানে। ভাই-বোনে দিব্যি ঘর করছিলি, কেলেঙ্কারী ঢাকবার জন্যে আবার আমাকে আনলি কেন?'

এই অতর্কিত ইঙ্গিত টগরী সহ্য করতে পারলে না। নেবীর ছিল পিঠের চুল খোলা তারই মুঠি ধরে সে জিজ্ঞেস করে বলল, 'কি বলছি? কই বল্ দেখি আর একবার!'

নেবী বললে, 'একশোবার বলব, বেশ করব।' বলে সে তার চুলগুলো ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলো।

টগরীর তখন রাগ চ'ড়ে গেছে, পিঠে তার গুম গুম করে কয়েকটা কিল বসিয়ে দিয়ে চুলগুলো ছেড়ে দিলে। বললে, 'খবরদার বলছি, যা-তা অমন ছোট-লোকের মত কেউ যদি বলেছিস তো তোর আর কিছু বাকি রাখব না বলে দিচ্ছি।'

'তবে এই আমি চললাম।' বলে নেবী ছুটে পালিয়ে যাচ্ছিল, টগরী আবার তার চুলের মুঠি ধরেই ফিরিয়ে আনলে।

—'যাবি কি রকম? গাঁয়ে বাপের বাড়ী বলেই কি তোকে এমনি করে পালাতে দেবো নাকি? আমাদের একটা মান-সম্মান নেই!'

এই পর্যন্ত হয়েই চুপ হয়েছিল।

নিধিরাম মাছ ধরে ফিরে এলো বিকেলে। এতদিনের অভ্যেসমত ডাকলে, 'টগরী, মাছ নিবি আয়।'

টগরী বললে, 'পারব না আমি। তোর বৌকে বলগে যা।'

ব্যাপার কি কিছুই বুঝতে না পেরে নিধিরাম কিছুক্ষণ সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বৌ-এর সন্ধানে ঘরে ঢুকেই দেখে, মেঝের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে বৌ তার ফুলে ফুলে কাঁদছে।

কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'কি হলো কি ?'

বৌ কথা বললে না। যেমন কাঁদছিল তেমনি কাঁদতেই লাগল।

নিধিরাম এবার তার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে গায়ে হাত দিয়ে বললে, 'এই ! কি হয়েছে বল্ না !'

বৌ বললে, 'যেন তোমার আজ আমাকে মেরে খুন করেছে। অপমানের কিছু বাকি রাখেনি। আমাকে পাঠিয়ে দাও। আমি বাপের বাড়ী চলে যাব।'

নিধিরাম ডাকলে, 'টগরী।'

টগরী কাছে এসে দাঁড়াল। বললে, 'কি ?'

'বৌকে মেরেছিস্ ?'

টগরী বললে, 'হ্যাঁ, মেরেছি।'

নিধিরাম বললে, 'কেন মারলি ?'

টগরী বললে, 'সেকথা ও-ই বলুক না, কেন মারলাম।'

বৌটী উঠে বসল। বললে, 'তাহলে কি বলতে চাও তুমি মারোনি ?'

টগরী বললে, 'না, তা কেন বলব ? মেরেছিই ত'। সে ত' বলছি আমি।'

নিধিরাম আবার জিজ্ঞেস করলে, 'কেন মারলি অমনি শুধু-শুধু ?'

প্রশ্ন শুনে টগরীর সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল। বললে, 'তুই আর কথা বলিস নে দাদা। মেরেছি বেশ করেছি। দোষ করেছিল—মেরেছি।'

বলেই সে সেখান থেকে চ'লে যাচ্ছিল।

নিধিরাম তার কাপড় ধরে টেনে বললে, 'বলে' যা বলছি টগরী, কেন ওকে মেরেছিস্ বলে' যা।'

কাপড়টা হাত থেকে টেনে ছাড়িয়ে নিয়ে টগরী বললে, 'অত সব কৈফিয়ৎ দিতে পারব না তোর কাছে দাদা, তুই কিছু বুঝতে পারবিনি। চুপ করে তুই বসে থাক্। ও কাঁদুক, ওর কাঁদাই উচিত।'

"উ। বটে! ও কাঁদবে ? আর তুই ওকে মারবি ? তুই মারতে জানিস্, আর আমি মারতে জানিনা ? এই ভাখ্, তবে কেমন মারে।' বলেই উঠোন থেকে একটা চ্যালা কাঠ কুড়িয়ে নিয়ে তাই দিয়ে নিধিরাম টগরীর পিঠের ওপর সজোরে এক বাড়ি মেরে দিয়ে বললে, 'হলো ত' এবার। যা তবে তুইও কাঁদ্ ব'সে ব'সে।'

বলেই সে চ্যালা কাঠটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সেই যে বেরিয়ে গেল, ফিরল রাত্রে।

ফিরে দেখলে, বৌ তার উঠে ব'সে রান্না করছে। আর শুনলে টগরী নাকি রাগ করে বাড়ী ছেড়ে অভয়ার বাড়ী চলে গেছে।

নিধিরাম বললে, 'থাক্।'

পরের দিনও টগরী বাড়ী ফিরল না।

শোনা গেল, সে নাকি অভয়ার ছোট ভাইটিকে সঙ্গে নিয়ে নিজেই তার শ্বশুরবাড়ী চলে গেছে।

নিধিরাম বললে, 'যাক্ না! আবার ফিরে আসবে দেখিস।'

বৌটী বললে, 'বাই-বা এলো! আমি কি তোমার সংসার চালাতে পারিনা ভেবেছ ?'

নিধিরাম বললে, 'হ্যাঁ, বাই-বা এলো।'

টগরীকে শ্বশুরবাড়ীতে রেখে অভয়ার ভাইটি ফিরে এলো। দু'টি নদী পার হয়ে যেতে হয়। অনেক দূরের পথ।

অভয়া জিজ্ঞেস করলে, 'হ্যাঁরে, কোনও কষ্ট হয়নি ত' ?'

ভাইটি বললে, 'না।'

'টগরীর বরকে দেখলি ? কি বললে সে ?'

ছেলেটি বললে, 'না, কাউকে দেখিনি। টগর, দিদি ঘরে ঢুকলো, আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলাম।

তারপরেই টগরমিসি কাঁদতে কাঁদতে আবার কাছে এসে বললে, 'যাও ভাইটি, তুমি বাড়ী যাও, তোমায় বড় কষ্ট দিলাম। অভয়াকে বোলো—আমি ভাল আছি। সে যেন কিছু ভাবে না। ব্যস, সেও ঘরে ঢুকলো, আমিও চলে এলাম।'

দাঁতে ঠোঁট চেপে অভয়া কি যেন ভাবতে লাগল।

কয়েকদিন পরে একদিন সন্ধ্যেবেলা নিধিরাম বাড়ী ঘরে ফিরছে, পথে অভয়ার সেই ভাইটির সঙ্গে দেখা। জিজ্ঞেস করলে, 'হ্যাঁরে সুবোধ, টগরীর সঙ্গে তুই গিয়েছিলি ?'

ঘাড় নেড়ে সুবোধ বললে, 'হ্যাঁ।'

নিধিরাম আবার জিজ্ঞেস করলে, 'টগরীর শ্বশুর-বাড়ী যেতে হ'লে কোন্‌দিক দিয়ে যেতে হয় রে ?'

সুবোধ বললে, 'আমাদের ষ্টেশনে ট্রেনে চ'ড়তে হয়, বুরুড়ি ষ্টেশনে নামতে হয়—আট আনা ভাড়া। তারপর দক্ষিণ-মুখো সোজা, দু'টো নদী পেরোতে হয়। একটি ছোট, একটি বড়। ছোট নদীটা পায়ে হেঁটেই পেরোনো যায়, আর বড়টা পেরোতে হয় নৌকোয়। তারপর সোজা রাস্তা ; খানিকদূর গিয়ে পাশের একটা জঙ্গল,—ব্যস জঙ্গলের ওপারেই গ্রাম। গ্রামের নাম জানো ত' ? খালিসপুর। কেন ? যাবে নাকি নিধিরামদা ?'

নিধিরাম বললে, 'না।'

বলেই সে চলে গেল।

তার পরের দিন, কাউকেও কিছু না বলে পায়ে একটা সেন্ডি পরে, পরণের জামাটা বগল-দাবা করে খালি পায়েই নিধিরাম খুব ভোরে কোথায় যে চলে গেল কেউ কিছুই জানলে না। বিয়ের সময় জুতো এক জোড়া তার কেনা হ'য়েছিল, কিন্তু অভ্যাসের অভাব জুতো পায়ে দিলেই সে আর হাঁটতে পারে না। কাজেই জুতো প'রে চলার চেয়ে খালি পায়ে হাঁটা তার পক্ষে নিরাপদ।

সবাই জানলো সে টগরীর কাছে গেছে। কিন্তু ছেলেবেলা থেকে একা যে-মানুষ কখনও বাড়ীর বের হয়নি সে যে অপরিচিত অজানা পথ কেমন ক'রে অতিক্রম করবে কে জানে।

তবে সান্ত্বনার কথা এই যে, সেকথা ভাববার লোক কেউ নেই।

সুবোধ যে পথের সন্ধান তাকে দিয়েছিল, গ্রামের বাইরে এসেই নিধিরাম তা ভুলে গেল। ট্রেণে চড়ে বুরুড়ি ষ্টেশনে তার নামবার কথা। কিন্তু নামলো গিয়ে আরও পাঁচ-ছটা ষ্টেশনের পর। তাও আবার নিজে থেকে নামেনি। যে-ভদ্রলোকটি টিকিট চেক করতে এসেছিলেন, তিনিই তাকে জোর ক'রে ঠেলে নামিয়ে দিলেন।

আবার বুরুড়ি ষ্টেশনে যে কেমন ক'রে কোন্ গাড়ীতে চড়ে যেতে হয় তাও সে জানে না। একেবারে সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে একাকী নিঃসহায় নিঃসম্বল নিধিরাম তার হলুদ রং-এর খাটো ঝোতামহীন জামাটা গায়ে দিয়ে এর ওর মুখের পানে ক্যাল-ক্যাল ক'রে তাকিয়ে পায়ে হেঁটেই বুরুড়ির দিকে চলতে লাগলো।

কোথায় কোন্‌দিক দিয়ে চলছে তার কোনও স্থিরতা নেই। তবু সে মাঠের ওপর দিয়ে ক্রমাগত চলছে। চলা যেন তার আর শেষই হয় না। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ক্লান্ত নিধিরাম গাছের তলায় একবারটি বসে, এদিক-ওদিক বার-কতক তাকায়, তারপর আবার চলতে আরম্ভ করে। এমনি ক'রে চলতে চলতে কতবার পথ ভুলে কখনও দক্ষিণে কখনও উত্তরে গিয়ে, কত লোককে খালিসপুরের কথা জিজ্ঞেস করে, তিনদিন পরে অনাহারে অনিদ্রায় একেবারে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে গিয়ে সেদিন দুপুর বেলা দেখা গেল, নিধিরাম একাকী সেই ছোট নদীটি পার হচ্ছে। নদীতে মাত্র হাঁটু জল। জল বেশ স্বচ্ছ পরিষ্কার। দু'হাত ভ'রে সেই জল খানিকটা খেয়ে নিয়ে নদী পার হ'য়ে সে আবার চলতে লাগল। কোন্‌টা উত্তর, কোন্‌টা দক্ষিণ,

তাও সে জানে না। পথের ধুলোয় যেখানে-সেখানে হয়তো রাত কাটিয়েছে, পরণের কাপড়-জামা অত্যন্ত ময়লা হ'য়ে গেছে, মুখখানা বিবর্ণ ম্লান, নিতান্ত অসহায় তার সে দুটি চোখের পানে তাকালে কান্না পায়।

পথে আরও একদিন কাটিয়ে দিয়ে নিধিরাম খালিসপুরের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছল। যতই সে গ্রামের নিকটবর্ত্তী হ'তে লাগলো, ততই তার চিন্তার আর অন্ত রইল না। টগরীর কাছে সে কি বলে গিয়ে দাঁড়াবে? টগরী যদি তাকে বকে! যদি সে তাকে ফিরিয়ে দেয়···

একবার তার মনে হলো, তবে কাজ নেই টগরীর কাছে গিয়ে। মনে হ'তেই সে ফিরে দাঁড়ালো। উন্মুক্ত প্রান্তরের মাঝখানে একবার চুপ ক'রে বস্‌লো, সোটা-কতক ঢিল নিয়ে বার-কতক এদিক-ওদিক ছুঁড়লো, তারপর আবার কি ভাবলো কে জানে, বিষণ্ণ মুখে খালিসপুর গ্রামের দিকেই চলতে লাগলো।

এতক্ষণে মনে হলো, তার পায়ে সোটা-কতক কাঁটা ফুটেছে। তাড়াতাড়ি চলতে গেলে একটুখানি খুঁড়িয়ে চলতে হয়। তা হোক্, তবু সে চল্‌তে লাগল।

অবশেষে খালিসপুর গ্রামে ঢুকে টগরীর শ্বশুর বাড়ীর দরজায় যখন সে পৌঁছল, তখন সূর্য্যাস্ত হচ্ছে।

দরজায় গিয়ে কাউকেও ডাকাডাকি করতে হলো না। প্রকাণ্ড একটা জল-ভর্ত্তি কলসী কাঁখে নিয়ে টগরী তখন পুকুর থেকে বাড়ী ফিরছিল। একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে দাদাকে তার দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিস্মিত হ'য়ে সেইখানেই সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ডাকলে, 'দাদা!'

নিধিরামের পেছন ফিরতেই দেখে টগরী। কি যে বলবে কিছুই সে বুঝতে পারলে না, কেন এসেছে তারও কোন মানে নেই, শুধু সে নিতান্ত অসহায়ের মতো জীর্ণ মলিন-বেশে ম্লান-চোখে টগরীর মুখের পানে তাকাতে গিয়ে ঝর্-ঝর্ ক'রে কেঁদে ফেললে।

পরদিন দেখা গেল, নিধিরাম তাদের গ্রামে ফিরছে। পেছনে কাপড়ের একটি পুটুলি হাতে নিয়ে টগরী।

বৃদ্ধ ভটচাজমশাই-এর সঙ্গে পথে দেখা। ভটচাজ-মশাই বললেন, 'তাই ত' বলি, বাহারে নিধিরাম, বোকা তোকে কে বলে রে! আমরাও ঠিক ওই কথাই ভাবছিলাম যে ও ঠিক টগরকে আনতে গেছে।'

বলেই বৃদ্ধ টগরের দিকে ফিরে বললেন, 'কি মা, দাদার ওপর রাগ ক'রে কি যেতে আছে?'

খবরটা অভয়ার কাছে এরই মধ্যে এসে পৌঁছেছিল। ফটিককে কোলে নিয়ে সে দরজায় দাঁড়িয়ে তখন তাদেরই অপেক্ষা করছে।

অভয়াকে দেখবামাত্র নিধিরাম একগাল হেসে বলে উঠল, 'দেখলি ভাবী, নিয়ে এসেছি টগরীকে।'

'বেশ করেছ।' ব'লে ম্লান একটুখানি হেসে অভয়া টগরীর হাতখানা চেপে ধ'রে বললে, 'আয় আগে আমাদের ঘরে, তারপর যাবি।'

নিধিরামকে বললে, 'তুমি যাও দাদা, টগরী যাচ্ছে।'

টগরীর হাতের পোটলাটা কেড়ে নিয়ে অভয়া ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

অভয়া চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলে, 'হ্যাঁলো, চলে এলি যে?'

'হ্যাঁ, এলাম।' বলে সজলচোখে টগরী তার পিছু পিছু ঘরে ঢুকে বললে, 'আয় বলি।'

শোনবার জন্যে অভয়া উদ্‌গ্রীব হয়েই ছিল। কিন্তু কিছু বলবার আগেই টগরী তার কোলে মাথা রেখে ফুলে ফুলে কেঁদে উঠলো।

অভয়া যত জিজ্ঞাসা করে, 'বল্। কি হয়েছে বল্।' টগরী তত কাঁদে। তার কান্না যেন শেষই হয় না।

কথাটা টগরীর বুকের ভেতর যেন কান্নার বেগে আটকে গেছে। কিছুতেই বলতে পারছে না।

পরে একটা ঢোঁক্ গিলে অনেক কষ্টে অনেক দুঃখে বললে, 'আমাকে তাড়িয়ে দিলে।'

অভয়া শুদ্ধ হয়ে বসে রইল।

ফটিক তখন টগরের কোলে আসবার জন্যে তার কচি-কচি দুটি হাত বাড়িয়ে টগরের কাপড় ধরে টানাটানি করছিল।

আর, বলে ছেলেটাকে টগর তার বুকের ওপর চেপে ধরে থর্ থর্ করে কাঁপতে কাঁপতে গালে তার একটি চুমু খেয়ে বললে, 'একথা তুই আর কাউকে বলিসনি অভয়া।'

অভয়া ঘাড় নেড়ে বললে, 'বলব না।'

দেখা গেল অভয়ারও চোখ দুটি জলে ভ'রে এসেছে।

আমার স্মৃতি

(বিবেকানন্দ—রবীন্দ্রনাথ)

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বহুযুগের ওপার হতে হাতছানি দিচ্ছে একটি মেঘদূতুর সন্ধ্যার সজল ছবি, শতলক্ষ ঘটনার সমুদ্রবেলায় চিত্তচুর্লভের একটি রত্নকণা। মনে হচ্ছে কবির সঙ্গে বলি—

ছবি, তুমি কি কেবলি ছবি, শুধু পটে লিখা

বহু বৃহস্পতির, বাক্‌পতির, প্রিয়পতির, বিধিপতির স্মৃতিতে ভরা মনের রাজ্যপাটে সোনার জলে আঁকা সে চিত্র।

আমার বয়সটা তখন সবে ষষ্ঠাব্দীতি প্রথম কৈশোরের যৌবনের বয়ঃসন্ধির রঙীন সীমানা ছুঁই ছুঁই করছে। চোখ মেলে দেখছি, কান পেতে শুনছি, মন দিয়ে বুঝছি যে একটা অদ্ভুত বিচিত্র জগতে জন্মগ্রহণ করেছি। আরম্ভে প্রাণলীলার শেষ পর্বতকে পৌঁছে শেষ পারাণির কড়ি—বাগ্‌বৈখরী—কণ্ঠে নিয়ে—ভাবি স্বার্থসংক্ষুব্ধ সংসারের সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত, বিদ্বেষে কামনায় রাগে অনুরাগে আন্দোড়িত তপ্ত বাষ্প নিঃশ্বাসের মধ্যে সেদিনকার অমলকমল ধবল পালে যে মন্থ মধুর হাওয়া লেগেছিল, তারই এক টুকরো স্মৃতি যদি প্রথম কমলকুল হিসাবে পূজার উপচারে অর্ঘ্য দিই, তাহলে সেটা কী বার্ধক্যেরই পরিচয় হবে না অতীতের রোমন্থন। কিন্তু সেদিন ছিল এমনদিন যেদিন প্রতিটি রসই আমায় আকৃষ্ট করে দিতো, প্রতিটি রসই মনোহারী বেশে আসতো। বর্ষার দিনে ভরভর বারি-পাতের সঙ্গে যখন ভেককুল সরব হতো, শরৎকালের প্রথম সোনালী আলোয় শিউলিফুলের গন্ধে যখন ঘুম ভাঙতো তখন যেন কোন অজানা দিনের বেদনায় মন পূর্ণ হয়ে উঠতো। এমনি একটা ষোলোআনা বয়স যখন ভাবের আবেগ, ভক্তির নিবিড়ত্ব, কল্পনার প্রলাপ, বহুত্বের অভীপ্সা মনকে নাড়া দিতে সুরু করেছে, ভিতর থেকে অন্তর সত্তা যেন সাড়া দিচ্ছে। ছোট গণ্ডীর বাইরে যে একটা বিশাল জগত আছে তার শব্দ স্পর্শ রস আভাস বিভাস অল্পবিস্তর পৌঁছচ্ছে, নতুন কোটা কাঁটালি চাপার গন্ধের মত কড়া অথচ মিঠে। মধ্যবিত্ত বাঙালী ঘরের ষোল সংসারে অভাব অনটন অভিযোগের মধ্যে মানুষ হওয়া মন দুঃখ কষ্ট রিক্ততার মাঝেও স্বপ্ন দেখতে সুরু করেছে। মনে পড়ছে পূজোর ষষ্ঠীর দিন শুনছি ভোরাইএর গান, সানাইএর সুর—উমা আমার ঘরে এলো। এক যে ছিল রাজার মেয়ে—গিরিরাজনন্দিনী তিনি। দশমীর দিন তাঁকেই সপুত্র সকন্যা ভরা নদীর খরস্রোতে নয়নজলে বিদায় দিয়ে আসতাম—সে যে ছিল মায়ের মেয়ে, ভায়ের বোন, পাসলা ভোলার ঘরণী, কার্তিক গণেশ লক্ষ্মী সরস্বতীর মা। শীতের দিন ছেঁড়া লেপের উষ্ণ নিভৃতিতে আজ ত কার কেউ গল্প বলবে না ধ্রুব প্রহ্লাদের, কর্ণের মহাদান পৌরবের, রামসীতার, কৃষ্ণ বলরামের, ব্যাসদেব-ব্যাসদেবীর, সাতহাত কাঁকুড়ের তেরহাত বিচির।

এমনি একদিনে, গ্রীষ্মের ছুটি তখন, ক্লাস এট—খর বৈশাখের প্রথম অপরাহ্ণ—বাইরের তাপমাত্রা একশো চার পাঁচ ছাড়িয়েছে, অগ্নিবানে শুচি হচ্ছে ধরা—বৃষ্টিবিহীন বৈরাগীদিন। সবে 'অ্যাবস্ ট্রেলস' ধরেছি—ডিউক প্রোলাগে শাইলকের বিচার শেষ হয়েছে, হঠাৎ মনে হলো ক্যাসাবিয়াঙ্কার

কথা—the boy stood on the burning deck, whence all but he had fled—হ্যাঁ, ঘরের ভিতর আর টেঁকা যায়না, যেন সারাশরীর সেদ্ধ করে যাচ্ছে—বাইরেও আগুনের হল্কা। বাপখুড়োরা চলে গেছেন অফিসে আদালতে, মা ঠাকুমার দল দরজা জানালা বন্ধ করে তালপাখা হাতে দিবানিদ্রায় মগ্ন। আমাদের উপর জোর নির্দেশ—এই দারুণ দিনে বাইরে হৈ হৈ করে না বেড়াই—আম জাম জামরুল কলসা গাছের কাছে না ঘেঁসি, আর পড়াশুনো যেন এগিয়ে রাখি, ইতিহাসের সূত্রগুলি মুখস্থ করি—ইউক্লিড আর ত্রিভুজ, অশোক আর হায়দার আলী যেন শুধু উঁকি মেরেই না চলে যান্। কর্তারা এসে হিসেব নেবেন রাত্রে, কড়ায়গণ্ডায় শতকীয়া শুভংকরীর সঙ্গে—হাকিম নড়বে, হুকুম নড়বে না। আমার কিন্তু ভালো লাগতো না ঔরঙ্গ করতে, ভালো লাগতো না আওরংজেবের কটা হাতি বা সমুদ্রগুপ্তের কটা নাতি ছিল গুণতে, মন চলে যেতো রবীন্দ্রনাথের কবিতাতে—আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে, হের ঐ ধনীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে,—বর্ষ তখনও হয় নাই শেষ এসেছে চৈত্র সন্ধ্যা, বাতাস হয়েছে উতলা আকুল, পথ তরু শাখে ধরেছে মুকুল, রাঙ্গার কাননে ফুটেছে বকুল পারুল রজনীগন্ধা। এঁচোড়ে পাকা হলেও তখনও 'অভিসার' বোঝবার শিক্ষা হয়নি কিন্তু কবির চোখেই দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ। তাঁর 'কথা ও কাহিনী' তখন সবে হাতে পড়েছে—যেন এক অপরূপ ঐশ্বর্যে ভরা সোনার ঝাঁপি হাতে পেয়েছি। বালক মন শুধু সুয়োরাণী দুয়োরাণীর কথায়, অভিমানিনী কঙ্কাবতীর ব্যথায় কল্পনায় উদ্ভ্রান্ত হতো না, যখন দুপুর বেলায় বৃষ্টি পড়তো টাপুর-টুপুর, তখন কবিকে ডেকে বলতো—শিবঠাকুরের বিয়ের গান শোনাও, রঙিয়ে দাও, রসিয়ে দাও, কথা কও, কথা কও। সে মনে করতো সে বুঝি মস্তো বীর, যাকে নিয়ে চলেছে দেশান্তরের ঘুটঘুটে পেরিয়ে। বাড়ীর বৈঠকখানায় গানের বৈঠক বসলো, বয়োজ্যেষ্ঠদের সে আসরে কনিষ্ঠদের যাবার হুকুম ছিল না। দূর থেকেই সা রে গা মা-র সুরলহরী ভেসে আসতো—অয়ি ভুবন মনমোহিনী—অবোধ বালক মনে প্রশ্ন জেগেছিল—কে সেই জগত্‌জননী। তাই কথা ও কাহিনী যেদিন হাতে পড়লো, সে এক ভূরিভোজের ব্যবস্থা! কাশীর মহিষী কল্পনা যানে চলেছেন স্বচ্ছসলিলা বরুণায়—কী কৌতুকই কৌতুকময়ী করলেন, কতটুকু ক্ষতি হোল প্রজাদের। অনাথপিণ্ডদ প্রভু বুদ্ধ লাগি ভিক্ষা মাগছেন, মহাভিক্ষুকের সাধ পুরাইবে কে। মৈত্রমশাই সাগর সংগমে তীর্থস্নানে যাবেন, মোক্ষলাভের আশায় মোক্ষদা হল সঙ্গী আর তারই সঙ্গ নিলো বালীর আসরে মানুষ হয়ত রাখাল—দেবতার গ্রাস থেকে 'ফিরায়ে আনিব তোরে' বলে মৈত্র মশায়ের জলে ঝাঁপ, বালকের স্বপ্নে যানের চিরকালের জন্য আঁকা রইলো। আবার ওদিকে হোরী খেলছে হাজার রাজপুতানী, পদ্মনদীর তীরে বেণী পাকাইয়া শিরে জেগে উঠেছে শিখ, বান্দা বন্দী হচ্ছে মুঘলসেনার করে, জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্তভাবনাহীন। মনে হচ্ছিল খুশীর আমেজে খোস মেজাজে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কবিতাগুলো হেঁকে ডেকে লোকদের শোনাই।

বইখানা হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়লুম। নদীর ধারে হালদার ঘাটটা আমাদের মত ছিপধারা পলাতক বালকদের একটা বিশেষ আশ্রয় স্থান ছিল—নদীর ধার, স্নিগ্ধ বটচ্ছায়া, প্রশস্ত চাতাল, ঝাউগাছের সারি, তাদের মর্মর ধ্বনি, সব কিছু মিলিয়ে কেমন একটা উদাসভরা আবেশ আনতো। তা ছাড়া জায়গাটি বেশ ঠাণ্ডা, সামনে ভরা নদীর কলোচ্ছ্বাস, শুভ্র চিকন জলের উপর নানা বর্ণের দীপ্তি, দূরে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের আভাস। পালের ভরে তরতর করে নৌকা ছুটেছে,

খেলেভিত্তির মাঝিরা বৈঠা তুলেছে। বিরাট পাখাবোটগুলোকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে, ছোট স্টিমলঞ্চগুলো। "মোহিনী" সেলো ছেড়ে তুলে তরঙ্গভঙ্গে রঙ্গ করে, তরঙ্গী "ললিতা" এলো হেলে দুলে। এরা নিপুণিকা চতুরিকার দল নয়, পোর্ট কমিশনরদের জাহাজের নাম। রসিক কর্তৃপক্ষ নামকরণ করেছিলেন মন্দ নয়। গুপ্তাচে যেমনা গুপ্তা উদীয়মান মত সামান্তা এঁরা, কিন্তু বালকচক্ষে অসামান্তা। তখন বড়বাজার থেকে এঁড়িয়াদহ পর্যন্ত স্টিমার চলতো, কলকাতার বাবুরা সকালে বিকালে পবিত্র গঙ্গাবক্ষে হাওয়া খেতেন, চ্যাঙারী ভর্তি সন্দেশ, সোনাপজল কেওড়া কুঁজো ভেওয়া ভর্তি ঘুগের জল আর মিঠে পানের খিলি ঘুরতো হাতে হাতে যাত্র ব্লাড প্রেসার ডায়েবেটিসের প্রতিষেধক রূপে।

অবশ্য উপরতলার অহেতুকী ভাগ্যবানরা ছাড়াও হাটুরেরা এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা করতো, উকীল মোক্তার কেরাণী ছাত্ররাও কলকাতায় যেতো আসতো।

আজ্ঞায় গিয়ে দেখি গোল হয়ে বসেছেন কয়েকজন, মুড়ি কাঁচালঙ্কা খেলেতাজা খাওয়া হচ্ছে খবরের কাগজ পেতে, আর ছাত্রের দাদাদের একজন (আমিই ছিলাম তাদের মধ্যে সবচেয়ে কৈশোরক) রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়ছেন।

"ভারতবর্ষ কর্মের ক্রীতদাস নহে···দারিদ্র্যের যে কঠিন বল, যৌবনের যে স্তম্ভিত আবেগ, নিষ্ঠার যে কঠোর শান্তি এবং বৈরাগ্যের যে উদার গাম্ভীর্য তাহা আমরা কয়েকজন শিক্ষাচঞ্চল যুবক বিলাসে, অবিশ্বাসে, অনাচারে, অনুকরণে এখনো ভারতবর্ষ হইতে দূর করিয়া দিতে পারি নাই। সনাতন বৃহৎ ভারতবর্ষ তাহা আমাদের নবীনতারে রুদ্ররৌদ্র বিকীর্ণ ধূসর প্রান্তরের মধ্যে কৌপীন বস্ত্র পরিয়া তৃণাসনে একাকী মৌন বসিয়া আছে। তাহা বলিষ্ঠ ভীষণ, তাহা দারুণ সহিষ্ণু,— উপবাস ব্রতধারী—তাহার কৃশপঞ্জরের অভ্যন্তরে প্রাচীন 'তপোবনের অমৃত অশোক অভয় হোমাগ্নি এখনো জ্বলিতেছে। আর আজিকার দিনে যত আড়ম্বর, আস্ফালন, করতালি মিথ্যাবাক্য যাহা আমাদের পরিচিত, যাহাকে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা একমাত্র সত্য, একমাত্র বৃহৎ বলিয়া মনে করিতেছি, যাহা বুদ্বুদ, যাহা চঞ্চল, যাহা উদ্বেলিত পশ্চিম সমুদ্রের ঊর্ধ্বশীর্ণ ফেনরাশি—তাহা যদি কখনো ঝড় আসে, দশদিকে উড়িয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবে। তখন দেখিব ঐ অবিচলিত শক্তি সন্ন্যাসীর দীপ্ত চক্ষু সূর্যালোকের মধ্যে জ্বলিতেছে·····জয় হইবে, ভারতবর্ষেরই জয় হইবে। যে ভারত প্রাচীন, যাহা প্রচ্ছন্ন যাহা বৃহৎ উদার, যাহা নির্বাক্ তাহারই জয় হইবে। আমরা যাহারা অবিশ্বাস করিতেছি, মিথ্যা কহিতেছি, আস্ফালন করিতেছি, আমরা বর্ষে বর্ষে

মিলি মিলি যাওব সাগর লহরী সমানা।

তাহাতে নিস্তব্ধ সনাতন ভারতের ক্ষতি হইবে না। জন্মান্তর মৌনী ভারত চতুষ্পথে মৃগচর্ম পাতিয়া বসিয়া আছে—আমরা যখন আমাদের সমস্ত চটুলতা সমাধা করিয়া বিদায় লইব, তখন সে শান্তচিত্তে আমাদের পৌত্রদের জন্ম প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে। সে প্রতীক্ষা ব্যর্থ হইবে না। তাহারা এই সন্ন্যাসীর সম্মুখে করজোড়ে আসিয়া কহিবে—

পিতামহ আমাদিগকে মন্ত্র দাও·····

তিনি কহিবেন·····

ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি

কথাগুলো তখন সম্পূর্ণ বোঝবার ক্ষমতা আমার হয়নি, কিন্তু মন চন্‌মন্ করে উঠলো, কোন

সপ্তস্বরা বীণার কোন তারের কোন মীড়ে গিয়ে যেন আমিয়ে দিলে আমার শিরার রক্তে ধমনীতে বয়ে যাওয়া এক ঐতিহ্যের গতিকে। এতো শুধু অতীতকে আঁকড়ে কপাল নিয়ে বসী হয়ে থাকা নয়, ভবিষ্যতের অনাগত দিনকে নবভাবে রূপায়িত করে নিয়ে উজ্জ্বলকে উজ্জ্বলতর করা। এতো সেই কবিরই কথা যাঁর সুধাবাক্য আমি সেদিন সারা দুপুরবেলা আগে আগে শুন দেওয়া কাঁচা আমের মত পরম পরিতৃপ্তিতে লেহন করেছি। হঠাৎ সুর কেটে গেলো, থেমে গেলেন সেই সৌম্য সহাস মানুষটি—আদর্শবাদী তরুণ মাষ্টার মশাই। বললেন—চলো তোমরা এক অবিচলিত শক্তি সন্ধানীর কীর্তি দেখিয়ে নিয়ে আনি—তাঁর কীর্তির চেয়ে তিনি মহৎ—(রবীন্দ্রনাথ সবে তাজমহল লিখেছেন, বলাকার দল উড়ছে)—ছেলেদের বাচের নৌকো রয়েছে, হালিও যাঝির, হাড় টানতে পারবে না। দক্ষিণেশ্বর আর বেলুড় কতক্ষণেরই বা পথ, সন্ধের আগেই ফিরে আসবো। প্রচণ্ড লোভ হোল—বাড়ীর পাশে বেলুড় তখনও পর্যন্ত আমার কাছে দুর্গম স্থান ছিল। দক্ষিণেশ্বরে অবশ্য দু একবার গেছি, ঠাকুমা পিসীমার আঁচল ধরে, দেবী ভবতারিণীর দর্শনে। দেখে এসেছি এক পরম পুরুষের ব্যবহৃত খাট বিছানা, খড়ম, কাঁথা, দেখেছি তাঁর নহবৎখানা, দেখেছি পঞ্চবটী, শুনেছি যে তখানে ভূত আছে, অমাবস্যার মহানিশায় নিঝুম রাতে ভৈরব ভৈরবীর নৃত্যাবাসর বসে পঞ্চমুণ্ডীর শবাসনে, প্রকৃতি উন্মাদ হয়ে ওঠেন। তিনি শুধু একটি কথা যে ভূতভাবনও এখানে আছেন, যিনি কাতরকণ্ঠে ডেকেছিলেন—ওরে, তোরা কে কোথায় আছিস্, আয়—

যিনি অগ্নিচন্দ্র হার পরেছেন গলায়
অশ্রুজলে সিক্ত করা প্রেমরসে ভাবন দেওয়া

বাড়ীতে নিষেধ ছিল—বিনা অনুমতিতে কোথাও যাবার—তায় আবার কাল বৈশাখীর দিনে ভরা গাঙে নৌকোয় করে। তবু লোভ হোল—জয়ী। জয় মা কালী বলে এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর বাঁধে রেখে এক ঝাঁক কিশোর ছেলের দল আর তাদের পূজনীয় মাষ্টারমশাই এক নিমেষে নৌকোকে মাঝ দরিয়ায় এনে ফেললে—বদর, বদর, শুধু নয়—গান উঠলো সম্মিলিত কণ্ঠে—আমাদের যাত্রা হলো সুরু। পাঁচ মিনিটে আমরা পৌঁছে গেলুম রাণী রাসমণির মন্দির ঘাটে।

ওগো, আমার প্রাণের কর্ণধার
দিকে দিকে ঢেউ জাগল লীলার পারাবার
আলোক ছায়া চমকিছে
ক্ষণেক আসে ক্ষণেক পিছে
আমার আঁধার ঘাটে ভাসায় নৌকা পূর্ণিমার
ওগো কর্ণধার
ডাইনে বামে মন্দ লাগে সত্যের বিথার

গঙ্গার বক্ষে বসে সুরধুনীর অন্য ইতিহাস মনে পড়ে যায়। পুরাকালে নারদের নাকি অভিমান ছিল যে তাঁর মত সুরজ্ঞ সরজ আর কেউ নেই, বীণাহাতে হরিগুণ গানে তাঁর মত ভক্ত কেউ নেই। একদিন পথে যেতে যেতে দেখা হলো কতকগুলি বিকলাঙ্গ লোকদের সঙ্গে। করুণায় বিগলিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ঋষিপ্রবর—কে তোমরা! উত্তর হলো—আমরা 'রাগ-রাগিণীর' ভাবদেহ, নারদ বলে এক ঋষি আমাদের বিকৃতসুরে গাইছেন তাই আমাদের এতো অবস্থানি। ব্যাপার বুঝে নারদের চিত্ত

চড়কগাছে ওঠে আর কি। বৈকুণ্ঠে গিয়ে নারায়ণকে বললেন—প্রভু, সত্যিই কি আমি তোমার নাম বেতালা বেসুরো গাই—কে আমাকে শেখাবে শুদ্ধ তাল যতি মাত্রাবোধ। নারায়ণ হেসে বললেন—কেন দেবাদিদেব মহাদেবের কাছে যাও, শিখে এসো সুর ও স্বরের সংগত, বিস্তার বন্দেশের বিচিত্র রূপায়ণ। মহাদেব রাজী হলেন, বললেন—যদি গণেশ সঙ্গে বাজান আর বিষ্ণু হন সমঝদার শ্রোতা। আসর বসলো, মহাদেব প্রথমে তান ধরলেন, গণপতি তবলায় তন্ময় হলেন, স্বয়ং বিষ্ণু সমঝদার, নারদাদি ঋষি, ব্রহ্মাদি দেবতা সেই অনাহত সুর শোনবার জন্ত বেশখো শ্রোতার দল। আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠলেন মহাবিষ্ণু, ওঁর পদযুগল রসে দ্রবিতা হলো—ব্রহ্মা কমণ্ডলু ভরে ধরে নিলেন সেই পুণ্য উদক—জন্ম হলো সুরের সুরধুনীর, মন্দাকিনীর, গঙ্গার। হিমালয়ের কোল থেকে জহ্নু মুনির কুক্ষি ভেদ করে জাহ্নবী ঝাঁপিয়ে পড়লেন। গৌরীব্রহ্ম ভ্রূকুটি সত্ত্বেও জটিল জটাজাল পেতে তাঁকে শিরে ধারণ করলেন শংকর, নাম হলো গঙ্গাধর। ধরজটাস্থ ভাগীরথী 'শম্ভোঃ কেশগ্রথনেষ্বাপি লম্বোমিহস্তা' হয়ে 'আগে যায় ভগীরথ শঙ্খ বাজায়ে, পিছে চলেন তিনি কপিলাশ্রমে ভস্ম সগর পুত্রদের উদ্ধার করতে। এরই অঙ্গে অঙ্গ দিয়ে মিশে গেছে আর এক রঙ্গিনী কলস্বনা, কালো মেয়ে কালিন্দী। যম-যমী সংবাদ যাঁরা পড়েছেন তাঁরাই জানেন যে এই উচ্ছলা যমুনাও গঙ্গার সপত্নীত্ব কামনা করে চলে পড়েছিল স্নানরত-শংকরের গায়ে, অভিশপ্ত হয়েছিল, তিরস্কৃত হয়েছিল, কিন্তু আশুতোষ তপস্যায় তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন—গঙ্গার মধ্য দিয়েই পাবে আমাকে।

সেদিন মন্দিরে ঢুকে কি মনে হয়েছিল আজ তার বিশেষ বিবরণ মনে নেই তবু ক্ষীণ স্মৃতিতে এইটুকু জাগে যে একটা মন অনুভূতি নিয়ে ফিরেছিলাম, হয়তো ভেবেছিলাম—এই পুণ্যভূমিতেই একটা অপূর্ব মিলন ঘটেছিল—আবির্ভূত হয়েছিলেন, আবিষ্কৃত হয়েছিলেন, স্বীকৃত হয়েছিলেন পরম-পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেব। এইখানেই নরেন্দ্রনাথ নামে একটা দামাল ছেলে জিজ্ঞাসা করেছিল—দেখাতে পারো—পারি—জানো—জানি। এইখানেই উত্তর হয়েছিল এক নবভাব গঙ্গোত্রীর, এক রসসঞ্জীবনী প্রাণবন্যার। এই পুণ্যপ্রয়াগে তিনটি ধারাকে আমরা পেয়েছি—প্রাচীন ভারতের শাশ্বত চেতনার সংহতি ও সংযম, পশ্চিমের দুর্বার স্রোতে ধাক্কা খাওয়া মনের সংশয় ও সন্দেহ আর ভবিষ্যত শতাব্দীদের মিলিত সাধনা, সমন্বয় ও সিদ্ধির আভাস। এখানে যে চিন্তাধারা, যে সাধনপদ্ধতি, যে স্বদেশহিতৈষিণা, যে উদার সার্বভৌম মন গড়ে উঠলো, সেটা শুধু যুগ শ্রীচৈতন্য শংকরের সমাবেশ নয়, নতুন এক শক্তি, নতুন এক ভক্তি, নতুন এক সৌর্যবীর্যে মুক্তির নিবেদনও। ভারত চেতনার প্রথম স্ফুরণই যে একটি তেজোময়ী বাক্—অগ্নিমীলে, যে অগ্নি কবিক্রতু, সত্যচিত্র, দেবমান, যে অগ্নি সব কালিমাকে মুছে দেয়, সব অশুদ্ধকে পাবক পাবনে বিশুদ্ধ করে। মহাসমুদ্রের অতল থেকে একটি বিরাট ইঙ্গিত মহিয়সী উষার মত পূর্বভান করে অপরিসীম ব্যাপ্তরূপে ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর এক অগজয়ী সাধনায় জেগে উঠলো—রামমোহন তার পূর্বসূরী, রামকৃষ্ণ তার প্রতীক (legend and symbol), বিবেকানন্দ-অরবিন্দ তার ঘোতা, রবীন্দ্রনাথ তার কবি, বঙ্কিম বিদ্যাসাগর মধুসূদন জগদীশ প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি তার সাধক।

প্রণাম জানিয়ে উঠলাম গিয়ে নৌকোয় ফিরতি পথে। আকাশের কোণে কোণে কালো মেঘের দু একটুকরো জমায়েত দেখা দেলো। নদীও যেন হঠাৎ প্রসন্নতা ছেড়ে স্থির হয়ে গেছে—নতুন করে যাত্রাপথী করবার আগে। কালবৈশাখীর দেবতা দেবের সিংহ বাহনে বহ্নিশিখার দাহনে এসে পড়লেন নাকি—

ভালোই হয়েছে বন্যার বারে
প্রলয়ের ভটা পড়েছে ছড়ায়ে

তাড়াতাড়ি তরী ভাসিয়ে দেওয়া হলো নদীর জলেতে। পূর্ণযাত্রা হলো সুরু। কর্ণধার এবার আমাদের নিয়ে যাবেন বেলুড়ে—কিন্তু সারা বিশ্বের কর্ম যিনি মর্দন করেন দোর্দণ্ডপ্রতাপে তাঁর মনের কথা আমরা জানতাম না। গুরু গুরু দেওয়া ডাকে বিষাণ বেজে উঠলো ঈশান কোণের নৈঋতে। সেই সদ্যোজাত মহাবীর বজ্রমন্ত্রে কি ঘোষিলেন তা বুঝিনি, কিন্তু সম্মিলিত গান ও কবিতা মনে আছে—

হে কিশোর, তুলে লও তোমার উদার জয় ভেরি
করহ আহ্বান—
আমরা দাঁড়াব উঠি, আমরা ছুটিয়া বাহিরিব
অর্পিব পরাণ
চাবনা পশ্চাতে মোরা মানিবনা বন্ধন ক্রন্দন
হেরিব না দিক্—
গণিবনা দিনক্ষণ করিবনা বিতর্ক বিচার
উদ্দাম পথিক
মুহূর্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উষ্ণতা
উপকণ্ঠ ভরি—
ছিন্ন নীর্ণ জীবনের শতলক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা
উৎসর্জন করি
সহেনা সহেনা আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়

* * *

মহান মৃত্যুর সাথে মুখোমুখী করে দাও মোরে
বজ্রের আলোতে

দেখতে দেখতে গঙ্গার জলে কালো ছায়া পড়লো। কেশর ফোলা এক ক্রুদ্ধ পশুরাজ আকাশে বাতাসে লাফালাফি সুরু করে দিলে—পর্জন্যদেবও ক্ষান্তি দিলেন না—সোনার তৃষ্ণার ভরে তপ্ত পৃথিবীর বুকে জল বর্ষিত হলো প্রচুর। সামাল-সামাল, না আর ভয় নেই পৌঁছে গেছি আমরা বেলুড় মঠের ঘাটের সামনে। তবে কিনা আমারই নিজের বেমক্কা দাঁড়ের একটি ঠেঁচকাতে একেবারে ছিটকে গেলাম জলে। আকাশ অন্ধকার করে দিগ্বিদিক কাঁপিয়ে প্রলয় ঝড় এসেছে, নদীও তালে তালে তুফাননৃত্য সুরু করেছে। নেহাৎ ঘাটের অতিকাছে, সামান্য সাঁতারও শিখেছি, আর ঘড়ের একজন তৎক্ষণাৎ একটা ঘড়ি ছুড়ে দিলেন তাই সে যাত্রায় সলিল সমাধি যোগে বিয়োগফল লাভ হলোনা। হয়তো প্রাক্তনের বিরূপাক্ষ ইঙ্গিত। স্বয়ং তুণ্ড কিন্তু আমার কোষ্ঠী দেখে মহাশঙ্কাতেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন —এই জাতকের আছে জলে অপঘাত—আর্দ্রমধ্যে বাধা। মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র পাঠে তার প্রতিকার। এক মৃত্যুঞ্জয়ী নরদেবতাকে এই যাত্রা প্রণাম জানিয়ে এলাম। তারি ফলে কি বেঁচে গেলাম। গঙ্গায় ডুবার, যমুনায় একবার (মথুরার বিশ্রামঘাটে) ডুবতে ডুবতে বেঁচেছি, একথা কাকতালীয় সত্য। কালিন্দীর

তীরে—ডুবিব ডুবিব সখী নিশ্চয়ই ডুবিব বলে আমি ডুবিনি—রামানুচর পরমপূজ্য এক বানরই এই অধম নরকে যমুনা জলে গলাধাক্কা দিয়েছিলেন আবার বাঁচিয়েছিলেন কূর্মাবতারের এক অবতংসে। যমের ভগিনী যমুনা সেদিন দুগ্ধাহুতি পেয়েছিলেন প্রচুর, আত্মীয় স্বজনের কাছে।

যমযমী সংবাদ মূলতুবী থাক্—ততক্ষণে মঠের সন্ন্যাসীরাও এসে পড়েছেন—ওঁরা দেখছিলেন ওপরের বারান্দা থেকে যে একটি ছেলে জলে পড়ে গেছে। প্রকৃতির তাণ্ডব প্রচণ্ডতা ততক্ষণে কমে এসেছে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ঘোর মেঘের আড়ালে, অবসাদ-গোধূলির ধূলিজালে অস্তগগনকে আবার দেখা গেলো, করুণ রবি মলিন হেসে চলে যাচ্ছেন শেষ বিদায়ের রশ্মি ফেলে। সিক্ত বসন আমাকে সাময়িকভাবে পরবার জন্ত একটা সাদা চাদর আর গৈরিক গামছা এনে দেওয়া হলো। আজ ভাবি—সেদিন সন্ন্যাসীদের গৈরিকের স্পর্শ ত লেগেছিল অনেকের তরে। অবশ্ত তখন আমি লব্ধউপনীত ব্রাহ্মণ সন্তান—সযত্নে ত্রিসন্ধ্যা সেই গায়ত্রীর্ছন্দসাং মাতঃ ব্রহ্মযোনিকে প্রণাম জানাই, অর্বাচীনের কল্পনায় বুঝতে চেষ্টা করি কোন সবিতাকে যানে জানে মননে পাওয়া যায়:

তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্ত ধীমহি ধীয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ। বেশী বয়সেই আমার পৈতা হয়েছিল আর আমার এক পিতৃব্য মন্ত্রগুলির অর্থ বোঝাবার জন্ত প্রাণপাত পরিশ্রম করেছিলেন সে কথা মনে আছে। তবু বুঝিনি বেশীকিছু। আকাশে জলজল করছে এক জলন্ত অগ্নিপিণ্ড—তাপ দিচ্ছে, তারই প্রতিফলিত ছায়ায় চন্দ্র হচ্ছে স্নিগ্ধ, পৃথিবী হচ্ছে শস্তশালিনী, ধাত্রী ও জননী। এই রূপক ও প্রতীক নিয়েই কি এক জবাকুসুম সংকাশ দেবতাকে আমরা বিশ্বের প্রসবিতা বলে কল্পনা করেছি। মহাতামসীর গর্ভ থেকেই ত তিনি আসেন। মেঘহীন নীল নিভৃতিতে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর হিরণ্ময় গাত্রখানি

চিত্রং দেবানামুদগাদনীকম্ চক্ষুর্মিত্রস্ত বরুণস্তাগ্নেঃ

এই সেদিন দেখে এলাম সেই চিত্র কন্যাকুমারীর গান্ধী-ভবনে বসে। ভোর হচ্ছে, আলোর দেবতা আসছেন সপ্তাশ্ব বাহিত রথে—

ওরে মন খুলে দে মন, যা আছে তোর খুলে দে
অন্তরে যা ডুবে আছে আলোর পানে তুলে দে।

মনে পড়লো এইখানেই তিন সমুদ্রের রুদ্র বাহু ঘিরে জেগে আছে কয়েকটি মন্ত্রশৈল, তারই একটির চূড়ায় বসে ছিলেন এক তরুণ তাপস, পরম শৈব। পিছনে ভারতের অখণ্ড ভূখণ্ডের আভাস। সেই ধ্যানের ভারতবর্ষ শুধু কবির দৃষ্টিতেই ফুটবে না, জ্ঞানীর বিচারেই সিদ্ধ হবে না, কবির কল্পনাতেই রঙীন হবে না, বেরবে ঝুনাওয়ালার চুপড়ি থেকে, মুটে মজুর মুদ্রকরাসের কুঠি থেকে, তাজীর ঘর থেকে। হে ভারত, ভুলিয়োনা তোমার উপাস্ত দেবতা উমানাথ গৌরীপতি শংকর—কোথায় সেই শিব, সেই মঙ্গল, সেই কল্যাণ, সেই মনোভব বরতর কোথায় তাঁর বজ্রঘোষ বাণী, রুদ্র শূলপাণি

মৃত্যু-লিপ্ত সত্তর

আজও তাঁর জন্ত প্রতীক্ষমানা কুমারী, মজ্জনস্নান করে বিশুদ্ধ গাত্রী হয়ে পট্টবস্ত্র পরিধানে অক্ষয়ান্ন হাতে যে কন্যা দাঁড়িয়ে মুসমুসান্ত ধরে, অথচ বিচ্ছিন্ন হয়ে—এলো না তার প্রিয়, প্রিয়তর, প্রিয়তম। সারা ভারতবর্ষের মানুষ অপেক্ষা করছে সেই পরিপূর্ণ পরম শিবের জন্ত, শুধু ঐ কুমারী কন্যাই নয়, অনন্ত উদাসিনী কপালিনীই নয়, গৌরী উমা অপর্ণা পার্বতীরা নয়।

স্বামীজীরা আমাদের নিয়ে গেলেন আরতি করে। দেখলাম ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সান্ধ্য আরতি—

ঠাড়ি রহো মেরে আঁখনকা আগে

সুরে সুরে ঘরে ঘরে ধূপধুনো আলোর মধ্যে দেখলাম "দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার সামের ওপারে আমার সুরগুলি পায় চরণ আমি পাইনা তোমারে"—হঠাৎ যেন আলোর মধ্যে সেই করুণাময় প্রজ্ঞাঘন দেবদেব মূর্তিটি মিলিয়ে গেলো। আজো বৈশাখের সেই অবর্ণনীয় চেতনার কথা মনে পড়ে। দেখলাম স্বামী বিবেকানন্দের ঘর। সঙ্গীরা বুঝিয়ে দিলেন যে এইখানে এমনি এক বর্ষণক্লান্তিমিত সন্ধ্যায় (জুলাই ১৯০২) শেষ ধ্যানে বসেছিলেন স্বামীজী দক্ষিণেশ্বরের দিকে মুখ করে। কণ্ঠে ছিল শুধু মৃদুস্বরে শিব শিব রব। সেই শিবই মহানমুক্তির বেশে এসে মহাবরবার হাত ধরে তাঁকে নিয়ে গেলো।

তব সিঙ্গল ছবি মহাজট
সে কি চূড়া করি বাঁধা হবে না?
তব বিজয়োদ্যত ধ্বজপট
সে কি আগে-পাছে কেউ রবে না
তব মশাল-আলোকে নদীতট
আঁধি মেলিবেনা রাঙাবরণ মহাপ্রয়াণের।

মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথ বরণ-মিলন নামে এই কবিতা লিখেছিলেন বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের অব্যবহিত পরে।

আর একটি পরম সৌভাগ্য হয়েছিল সেদিন, দেখেছিলাম ঈশ্বরকোটী স্বামী ব্রহ্মানন্দকে (রাখাল বা রাজা মহারাজ) পরমহংসদেবের পুত্রপ্রতিম এক জীবন্ত পরমভাগবতকে আর মহাপুরুষ মহারাজকে আর দেখা হলো একটি পুণ্যশ্লোকা মহিলার সঙ্গে—মিস জোসেফাইন ম্যাকলাউড—বিবেকানন্দের প্রিয় শিষ্যা 'জো'! বহুদিন পরে পড়েছিলাম সেই চমৎকার চিঠিখানি—জানো জো, দক্ষিণেশ্বরের বটতলাতে যখন অভিভূত হয়ে রামকৃষ্ণদেবের অপূর্ব কথাগুলো শুনতাম, তখন ত আমি বালক। সেই তো আমার সত্য লগ্ন—আর যা কিছু সবই এর বাহ্য। আজ আমার যৌবনী মন আবার সেই কথাই শুনছে—সেই পুরোণো দিনের মন মাতানো, প্রাণ-ভোলানো কথা—কি মধুর, কি অপূর্ব—সব বাঁধন ভাঙছে, প্রেম মরছে, কাজে আর স্বাদ আসছে না, জীবনের জ্যোতি যেন নিভে আসছে—

এ যেন রবীন্দ্রনাথের ভাষায়:

ডুবে যাবার সুখে আমায়
ঘটের মত যেন অম্ব ওরে ভরে

হাঁ, আমি আসছি—সামনে নির্বাণের মহাসমুদ্র, শান্তির পারাবার। সেই স্রোতস্বিনীর স্রোতে ভেসে চলেছি—

Behind my work was ambition, behind my love was personality, behind my purity was fear, behind my guidance the thirst for power. Now they are vanishing and I drift. I come, mother, a spectator, no more an actor.

সব মানুষের কাজের পিছনে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে থাকে উচ্চাভিলাষ, ভালবাসার পেছনে থাকে ব্যক্তিত্বের প্রেরণা, পবিত্রতার পিছনে থাকে ভীতি, নেতৃত্বের পিছনে থাকে ক্ষমতার লিপ্সা—কিন্তু মহামানবরা যখন মহত্ত্বের চূড়ীতীর্থে পৌঁছন তখন সব ভেসে যায়—মায়ের কাছে ছেলের আবার হয়—এখানে আর অভিনয় নয়, করে যাও শুধু স্রষ্টা।

সেদিন রাত করে বাড়ী ফিরে ভর্ৎসনা পেয়েছিলাম প্রচুর, সে কথা আজও মনে আছে। কিন্তু আরো যেটা লাভ হয়েছিল সেইটেই বড় লাভ—যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। আজ পরিণত বয়সে অভিভাবকদের আশংকা উদ্বেগ বুঝতে পারি। কিন্তু শত লাঞ্ছনা তিক্ততার মধ্যেও মনে ভরে উঠেছিল যে দেখে এসেছি সেই স্থান যেখানে এমন একজন মানুষ অধিষ্ঠিত ছিলেন যার মধ্যে শংকরের ও চৈতন্যের সমন্বয় হয়েছিল, দেখে এসেছি এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে বাঙ্ময় মহামানবের সন্ন্যাসীরা বেদান্তের সূত্রকে জীবনের ভাষ্য করে নিয়েছেন—সেবায় শ্রদ্ধায়, প্রণিপাতে, পরিপ্রশ্নে, জ্ঞানে ধ্যানে, সর্বগত শিবময় চেতনায়। সঙ্গে সঙ্গে শুনে এসেছি এমন একটি মানুষের কথা যিনি শুধু আমেরিকায় গিয়েই জয়মাল্য কুড়িয়ে আনেননি, অনেক বাধাবিঘ্ন বিপত্তি, অনেক দুর্দাম আঘাত বেদনার মধ্য দিয়েও যাত্রাপথ খুঁজে নিয়েছিলেন যার মূল মন্ত্র ছিল—মানুষ গড়ার সাধনা, যে মানুষ হবে অনবনমিত শির, বীর্যবান, মধুমান। সত্যিই, আমরা এই সব লোকোত্তর পুরুষদের জীবনকথাকে কেনাঙ্কিত করে অলৌকিক গল্পসল্প লীলা প্রসঙ্গে পরিণত করতে গিয়ে ভুলে না যাই যে তাঁদের গেরুয়া বা Ochre robe-এর পিছনে চাকচোল কাড়ানাকাড়া আরম্ভিক শুধু নয় আছে সম্যগের সাধনা—প্রবুদ্ধ ভারত চেতনার উদ্বুদ্ধতা—ওঠো, জাগো, শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করো—

I go forth to preach a religion of which Buddhism is nothing but a rebel child and Christianity but a distant echo.

কবি যদি ক্লান্ত মনে একথা মনে করে যে কবিত্বের চিরকালের বিষয়গুলি আধুনিককালে পুরোনো হয়ে গেছে তাহলে বুঝবো আধুনিক কালটাই হয়েছে রুক্ষ ও রসহীন। চিরপরিচিত জগতে তার সহজ অনুরাগের রস পৌঁছচ্ছে না, তাই জগৎটাকে আপনার মধ্যে নিতে পারল না। যে রচনা নিজের চারদিকে আর রস পায় না, সে যেকোন চেষ্টাকৃত রচনাকেই দীর্ঘকাল সরস রাখতে পারবে এমন আশা করা বিড়ম্বনা। রসনার আর রুচি মরচে চিরদিনের অন্নে সে তৃপ্তি পায়না, সেই একই কারণে কোন একটা আজগুবি অন্নেও সে চিরদিন রস পাবে এমন সম্ভাবনা নেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অমৃত কথা ও কাহিনী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা—

দুধকে দই পেতে মন্থন করলে তবে তো মাখন পাবে। এতো ভাল বাসাই হ'ল। ঈশ্বরকে দেখিয়ে দাও, আর উনি চুপ করে বসে থাকবেন। মাখন তুলে মুখের কাছে ধর। ভাল বাসাই—নছু ধরে হাতে দাও। একজন রাজাকে দেখতে চায়। রাজা আছেন সাত দেউড়ীর পরে। প্রথম দেউড়ী পার হতে না হতে বলে, রাজা কই? যেমন আছে এক একটা দেউড়ী তো পার হতে হবে। অন্তরে কি আছে জানবার জন্যে একটু সাধন চাই। সাধন বরাবর করতে হয় না। প্রথমটা একটু উঠেপড়ে লাগতে হয়। তারপর আর বেশী পরিশ্রম করতে হবে না। যতক্ষণ ঢেউ, ঝড়, তুফান আর বাঁকের কাছ দিয়ে যেতে হয়, ততক্ষণ মাঝির হাতিয়ার হাল ধরতে হয়—সেইটুকু পার হয়ে গেলে আর ভয় নাই। যদি বাঁক পার হ'ল আর অনুকূল হাওয়া বইল, তখন মাঝি আরাম করে বসে, হালে হাতটা ঠেকিয়ে রাখে—তারপর পান টানাবার বন্দোবস্ত করে তামাক সাজতে বসে। কামিনী কাঞ্চনে ঝড়তুফানগুলো কাটিয়ে গেলে তখন শান্তি!

• • • •

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের কথা—

রথযাত্রায় শ্রীজগন্নাথ যে মন্দিরে গিয়ে ন'দিন অবস্থান করেন, সেই মন্দিরের নাম গুণ্ডিচা মন্দির। চলতি কথায় লোকে বলে মাসীর বাড়ী। তাদের কথার আংশিক সত্যতা আছে। মাসীর বাড়ী বটে, তবে শুধু মাসী কথা নয়, পৌর্ণমাসীর বাড়ী। যোগমায়া পৌর্ণমাসী দেবী বৃন্দাবন লীলার প্রধান সহায়। তিনি বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন-লীলা বিধানের নিমিত্ত সেস্থানে থাকেন। সুতরাং পৌর্ণমাসীর বাড়ী বলতে শ্রীবৃন্দাবন বোঝায়। শ্রীজগন্নাথ রথযাত্রায় মাসীর বাড়ী যান, অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনে যান। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রতি বৎসর রথযাত্রার পূর্বদিনে গুণ্ডিচা মন্দির মার্জন করতেন। গুণ্ডিচা মার্জন লীলার অন্তরঙ্গ অভিপ্রায় অনেকে জানতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ কিশোরীর নিকুঞ্জসজ্জা গুণ্ডিচা মার্জন লীলার অন্তরঙ্গ কথা।

• • • •

শ্রীশ্রীবুদ্ধদেবের কথা—

যিনি মরণশতের হাত হতে এড়িয়েছেন, যিনি সংসার আবর্তন স্থির করেছেন; যিনি নির্বাণ-তত্ত্ব জানিয়েছেন; যিনি পরের কথায় সহজে বিশ্বাস করেন না; যাঁর সকল বাসনাই ফুরিয়েছে, তিনিই যথার্থ সাধুপুরুষ। কামনাকে একটু প্রশ্রয় দিলেই আতুরে ছেলের মত সে মাথায় চড়ে। পার্থিব শক্তি সম্পদের অধিকারী হলেই দুশ্চিন্তার ভারবাহী হইতে হয়। মহীপতিত্ব, স্বর্গবাস ও ত্রিলোকের আধিপত্য অপেক্ষা বোধিলাভই শ্রেষ্ঠতর, শ্রেয়স্কর। কথায় বলে—যে মাছ বঁড়শীতে একবার বিদ্ধ হয়েছিল সে কি আর বঁড়শীর দিকে তাকাবে? যে পাখী একবার ফাঁদে পড়েছিল সে কি আর ফাঁদের দিকে যাবে? যে ভেক সাপের মুখ থেকে একবার রক্ষা পেয়েছে সে কি আর কখনও সাপের মুখ দেখবে? যার হাত মশালের আগুনে একবার পুড়েছে সে কি আর কখনও মশাল হাতে নেবে? যে অন্ধ দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে সে কি আর চক্ষু খারাপ করতে চাইবে?

———

লেখিকাদের কথা

শ্রীশান্তা দেবী

অনুরূপা দেবী অনেকগুলি উপন্যাস লিখেছেন এবং সে উপন্যাসগুলি প্রাচীনপন্থী বলে বাংলা দেশে তাঁর খুব নামও হয়েছিল। তিনি ছিলেন "সামাজিক প্রবন্ধ" ও "পারিবারিক প্রবন্ধ" রচয়িতা ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী। পিতামহের গৌরবে তিনি সর্বদাই আপনাকে গৌরবান্বিতা মনে করতেন। তাঁর প্রবন্ধাদিতে সর্বদাই ভূদেববাবুর কথা থাকত।

এক সময় অনুরূপা দেবীরা আধুনিক স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে কোন কোন মাসিক পত্রের সাহায্যে অভিযান শুরু করেন। সে প্রায় ৩৯ কি ৪০ বৎসর আগের কথা। তাঁর প্রধান অভিযোগ ছিল স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা, যৌবন বিবাহ ও বিধবা বিবাহঘটিত সমস্যার বিরুদ্ধে। আত্মীয় স্বজনের নিকট থেকে কিম্বা যাত্রা কথকতার ভিতর দিয়ে যে মৌখিক শিক্ষা তাও শিক্ষা, তাতে লেখিকার আপত্তি ছিল না। কিন্তু অক্ষর পরিচয়ের পর স্কুল কলেজের শিক্ষাই যেন যত নষ্টের মূল। তাঁদের লেখা পড়ে মনে হত যে যতদিন পর্যন্ত হিন্দুনারীর অক্ষর পরিচয় বিশেষত ইংরাজী অক্ষর পরিচয় না হয় ততদিন পর্যন্ত তাঁরা প্রত্যেকে সতী, লক্ষ্মী, সীতা, সাবিত্রী, পদ্মিনী, লক্ষ্মীবাই ও অহল্যাবাই হয়ে ঘরে ঘরে বিরাজ করেন। কিন্তু যে মুহূর্তে এ, বি, সি, ডি'র সাক্ষাৎ পান অমনই সকল গুণ গঙ্গাজলে বিসর্জন দিয়ে "সখের মেমসাহেব" হয়ে ওঠেন। শিক্ষিতা বধূদের শাশুড়ীরা নাকি প্রাতঃকালে চায়ের পেয়ালা হাতে বৌমার শয্যাপার্শ্বে এসে দাঁড়িয়ে থাকেন এবং শিক্ষিতাদের কথায় কথায় হিষ্টিরিয়া হয়।

এতকাল পরে স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে সেই দুর্জয় যুদ্ধযাত্রার কথা বেশী লিখে লাভ নেই। শুধু কেন যে এতটুকু লিখেছি তা জানানোই দরকার। অনুরূপা দেবীর এই জাতীয় একটি লেখার প্রতিবাদ করে আমিও মাসিকপত্রে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। অনুরূপা দেবী বেথুন কলেজের "বুট ও বনেট পরিহিতা" ছাত্রীদের নিন্দা করেছিলেন। আমি "বুট ও বনেট" কখনও পরি নি কিন্তু বেথুন কলেজের ছাত্রীই ছিলাম। তখন আমার বয়স কম, তাই দুই দাঁত ধরে এই প্রবন্ধ ছাপিয়েছিলাম। মনে করেছিলাম নিশ্চয় অনুরূপা দেবী আবার কিছু লিখবেন। কিন্তু তা হল না। একদিন বাড়ীতে বোধ হয় ছাদে বেড়াচ্ছিলাম। অকস্মাৎ শুনলাম আমার সঙ্গে একজন ভদ্রমহিলা দেখা করতে এসেছেন। তাড়াতাড়ি ছুটে এসে দেখি উজ্জ্বল গৌরবর্ণা একজন চশমা পরিহিতা মহিলা এসেছেন। তিনি অনুরূপা দেবী। এই তাঁকে আমার প্রথম দেখা।

তিনি বললেন, "দেখ, নিজেদের মধ্যে কাগজে লিখে ঝগড়া ঝাঁটি করে আর কি লাভ? ভাল মন্দ শিক্ষিতা অশিক্ষিতা সকলের মধ্যেই আছে।....." আর কি তিনি বলেছিলেন এতদিন পরে আর কিছুই মনে নেই। তিনি আমার প্রতিবাদে যেন আর দীর্ঘ না হয় এই উদ্দেশ্যেই আমাকে ঠাণ্ডা করতে এসেছিলেন। আমিও আর তাঁর বিরুদ্ধে লিখিনি।

অনুরূপা দেবীর নামে পরে বালিকা বিদ্যালয় হয়েছিল। এবং তাঁর পুত্রবধূ বোধ হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্ এ পাশও করেছিলেন। সুতরাং তাঁর মত নিশ্চয় পরে অনেক পরিবর্তিত হয়েছিল। তিনি স্বয়ংও বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন এবং নানা জায়গায় সভাপতির কাজও করেছেন।

পরে তিনি আমার বাবার সঙ্গে একজন আত্মীয়ার মত ব্যবহার করতেন, বয়সে প্রবীণা হলেও বাবাকে 'কাকাবাবু' বলে ডাকতেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথমা কন্যার স্বামী শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী যখন বেলা দেবীকে বিবাহ করে মজঃফরপুরে নিয়ে যান তখন অনুরূপা দেবীর স্বামী সেখানে একজন উকিল ছিলেন। শরৎচন্দ্রও সেখানে ব্যারিষ্টার ছিলেন। এই সূত্রে বেলা দেবীর সঙ্গে অনুরূপা দেবীর পরিচয় হয়। উত্তর জীবনে অনুরূপা দেবী নিজেকে 'বেলার বন্ধু' বলে রবীন্দ্রনাথের কাছে পরিচয় দিতেন। বেলা দেবীর বিষয়ে তিনি মাসিক কাগজে কিছু কিছু লিখেওছিলেন।

অনুরূপা দেবীর প্রাচীনপন্থী উপন্যাসগুলির কয়েকটিই সিনেমাতে নামানো হয়েছিল। বহুমতী সাহিত্য মন্দির তাঁর গ্রন্থাবলীও প্রকাশ করেছেন। সুতরাং লেখিকা হিসাবে তাঁর ভাগ্য অন্য অনেকের চেয়ে সুপ্রসন্নই ছিল। তবে পারিবারিক জীবনে তিনি নানা শোক দুঃখ পেয়ে গিয়েছেন।

শ্রীযুক্তা হেমলতা সরকার ছিলেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের কন্যা। ইনি অনুরূপা দেবীর অপেক্ষা বয়সে অনেক বড়। তিনি সুলেখিকা ছিলেন। কিন্তু গল্প ও উপন্যাস লেখেননি বলে আজ কাল তাঁর নাম বিশেষ কেউ করে না।

বহু বৎসর আগে যখন মেয়েরা দেশ বিদেশে এত ঘোরাঘুরি করতেন না তখন হেমলতা দেবী তাঁর চিকিৎসক স্বামীর সঙ্গে নেপালে গিয়ে কিছুকাল বাস করেছিলেন। নেপাল সম্বন্ধে সাধারণ বাঙালীরা তখন অজ্ঞই ছিলেন। হেমলতা দেবী 'নেপালে বঙ্গনারী' নাম দিয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ মাসিক পত্রে প্রকাশ করেন। পরে তা ঐ নামেই বই হয়ে বেরোয়। ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্য তাঁর লিখিত 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' বাংলাদেশে স্কুলপাঠ্য হয়েছিল। বইটি এতই ভাল ছিল যে মিরিয়াম নাইট সেটি ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। এই মিরিয়াম নাইট বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের অনুবাদও করেছিলেন। তিনি ২০।২২ বৎসর বয়সে "চিরদিন কি দুঃখে" বলে একটি বই লিখেছিলেন। এছাড়া তিনি তাঁর ভক্তিভাজন পিতার জীবনীও লিখেছিলেন। অন্যান্য জীবনীও তাঁর লেখা কিছু কিছু আছে। জীবনীগুলি সুখপাঠ্য। তাঁর লিখিত ব্রজসুন্দর মিত্রের জীবনীতে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্ববঙ্গের শিক্ষাসমাজ ও ধর্মান্দোলনের আংশিক চিত্র আছে। পরে তিনি দার্জিলিংয়ে সপরিবারে বসবাস করেন। দার্জিলিংয়ের 'নর্থ ভিউ' নামক বাড়ীটি বাঙালীদের কাছে তাঁর বাড়ী বলেই পরিচিত। সেটি ভাড়া করা বাড়ী হলেও তিনি জীবনের শেষ কয়েক মাস ছাড়া তখানেই চিরকাল কাটিয়ে গিয়েছেন। তাঁরই চেষ্টায়, যত্নে ও সংগৃহীত অর্থে দার্জিলিঙে ব্রাহ্ম সমাজের মন্দিরটি গড়ে উঠেছিল। বিশেষ নামকরা কেউ না এসে পড়লে প্রতি রবিবারেই তিনি মন্দিরে উপাসনা করতেন এবং লিখিত উপদেশ দিতেন। সেই সুলিখিত উপদেশগুলি আজও আছে কিনা জানি না। আমরা বাল্যকালে যখন গ্রীষ্মকালে দার্জিলিং যেতাম, তখন এই মন্দিরে যাওয়া একটা আনন্দের ব্যাপার ছিল। যাঁরা ব্রাহ্ম সমাজের নন এমন অনেক মানুষই নিয়মিত আসতেন এবং উপাসনার পর বেশ একটি বন্ধু সম্মিলনও হয়ে দাঁড়াত।

হেমলতা দেবীর চেষ্টায় দার্জিলিঙে 'মহারাণী স্কুল' নামে বড় একটি বাংলা স্কুল গড়ে ওঠে। তিনি আজীবন এই স্কুলটিকে পালন করে গিয়েছেন। বহু বাঙালীর মেয়ে এখানে থেকে পড়াশুনা করেছেন। তাঁদের তিনি ছিলেন মাসিমা। ত্রিশ বৎসর এই স্কুলের অধ্যক্ষা তিনিই ছিলেন।

হেমলতা দেবীর আর একটা বড় গুণ ছিল তাঁর আতিথ্য। দার্জিলিঙে বেড়াতে গিয়ে তাঁর

আতিথ্য গ্রহণ করেননি তাঁর পরিচিত মোটাতে এমন বাঙালী বোধ হয় কেউ ছিল না। ট্রেনে গাড়ী থেকে নেমেই অনেকে প্রথম তাঁর সঙ্গে তাঁর বাড়ী গিয়ে হাজির হতেন। তারপর দাওয়া দাওয়া সেরে তাঁরই নির্বাচিত ভাড়া বাড়ীতে গিয়ে উঠতেন। কখনও বা দুই একদিন তাঁর বাড়ীতেই কেটে যেত। এই অতিথিদের চাকর ঠিক করে দেওয়া, বাজার ও দুধের যোগাড় করা সবই প্রথম দিকে তিনি করতেন। হাসিমুখেই পরের এত কাজ তিনি করে যেতেন এবং এর উপর রোজ বা দুই একদিন অন্তর তাদের খোঁজ খবর করতে আসতেন। আমরা ছেলেবেলা তাঁর আতিথ্য কত উপভোগ করেছি মনে করে আজও আনন্দ পাই। তাঁর ছেলেমেয়েরাও বাবার মতই অতিথি-বৎসল ছিলেন। মনে আছে, আমরা যখন বাল্যকালে প্রথম দার্জিলিং যাই তখন পথে বেড়াতে বেরোলে দেখতাম 'নর্থ ভিউ'-এর গেটে দুটি ছোট মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দেখবামাত্রই তারা ছোট ছোট হাত নেড়ে সজোরে ডাকাডাকি সুরু করত। নর্থ ভিউয়ে একবার না ঢুকে উপায় থাকত না। কিন্তু তাতেই কি রক্ষা ছিল? যতক্ষণ না তারা ছেড়ে দেবে ততক্ষণ যায় কার সাধ্য?

নেপালী ও ভুটিয়াদের সামাজিক আচার বিচার ও জীবনযাত্রার নানা কথা হেমলতা দেবীর জানা ছিল। তাছাড়া দার্জিলিঙে কবে কি সুঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটেছিল সবই ছিল তাঁর কণ্ঠস্থ। তাঁর সঙ্গে বেড়াতে বেরোলে তিনি সেই সব গল্প এমন জীবন্ত করে বলতেন যে আজও তা মনে পড়ে।

পঞ্চাশ বৎসর আগে দার্জিলিঙে তাঁর মুখে শুনেছিলাম "লি" পরিবারের কথা। ওখানের ক্যালক্যাটা রোডের পাশে মিশনারী 'লি' পরিবার বাস করতেন। একবার প্রচণ্ড দুর্যোগে পাহাড়ে ধস্ নামায় সেই পরিবার বাড়ীশুদ্ধ অতল গহ্বরে মিলিয়ে যান। পরে তাঁদেরই নামে কলকাতায় "লি মেমোরিয়াল গার্লস্ স্কুল" হয়। এঁদের গল্প এমন সুন্দর করে হেমলতা দেবী বলেছিলেন যে, আমাদের চোখে জল এসে গিয়েছিল। আমরা যেন দেখতে পাচ্ছিলাম প্রচণ্ড দুর্যোগে বাড়ী দুলতে শুরু করেছে, মাটি কেঁপে কেঁপে উঠছে, অসহায় বালক বালিকারা কোনো আশ্রয়ের আশা কল্পনাও করতে পারছে না, পাগলের মত এঘর ওঘর ছুটে বেড়াচ্ছে। তারপর তাদের সব দুশ্চিন্তা এক মুহূর্তে মুছে দিয়ে প্রলয় বন্যা তাদের অতল সমাধিতে চিরস্থির করে দিল।

হেমলতা দেবী ৭৪ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করেন বাংলা ১৩৫০ সালে। তাঁর স্বামী ডাঃ বিপিনবিহারী সরকার চিকিৎসক ছিলেন। বহু বাঙালী পরিবার তাঁর কাছে চিকিৎসার জন্য ঋণী। আজও আমার দার্জিলিং বলতে সবার আগে 'নর্থ ভিউ'-এর বাড়ী আর মহারাণী স্কুল মনে হয়। কুচবিহারের মহারাণীর নামেই স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কুচবিহার, বর্ধমান ও ময়ূরভঞ্জের মহারাণীদের অর্থে এই স্কুলের বাড়ীটি তৈরী হয়। অর্থ হেমলতা দেবীই সংগ্রহ করেন। বাঙালীর মেয়েদের ভাল হিন্দী স্কুল তখন দার্জিলিঙে আর ছিল না। এই স্কুল হওয়ায় বহু বাঙালী মেয়ের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়।

হেমলতা দেবীর পিতা শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ধর্ম প্রচারক ছিলেন। কিন্তু তিনি নানা গল্প-গাছা ও খেলায় পটু ছিলেন। একবার 'নর্থ ভিউ'-এর বাড়ীতে তাঁর প্ল্যানচেটে ভূত নামানো এবং হিপনোটাইজ করার খেলা দেখেছিলাম মনে আছে। আমাকেই চোখ বেঁধে হিপনোটাইজ করা হয়েছিল।

বীরবলের কৌতুক

বররুচি

গত সংখ্যায় আকবর-মহিষী যোধপুরী বেগমের একটি কাহিনী বলা হয়েছে।

তিনি আরও একবার বিপদে পড়ে বীরবলের শরণ নিয়েছিলেন। সেই ঘটনাটি এসংখ্যায় বলা হল।

বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ যোধপুরী বেগম দেখলেন, সম্রাট যেন তাঁর প্রতি বিমুখ হয়েছেন। তাঁর কাছে বড় আসেন না, যদিও বা দেখা হয়, সম্রাটের মুখে হাসি দেখা যায় না, বরং কেমন যেন তাঁর থমথমে গম্ভীর ভাব, দু'চোখে ভ্রূকুটি।

বেগম তো আকাশ পাতাল ভেবেও ঠিক করতে পারলেন না, কেন সহসা সম্রাটের এই ভাবান্তর, কী তাঁর অপরাধ যার জন্যে সম্রাট যেন আর তাঁর ছায়া মাড়াতেও চান না। অথচ এই সেদিনও তো তিনি বলেছিলেন, যোধপুরী-চন্দ্রিমার সুধা পান না করলে সম্রাটের একদিনও চলে না।

অনেক ভেবে কূলকিনারা না পেয়ে যোধপুরী বাঈ বীরবলকে স্মরণ করলেন।

মহামতি বীরবল কিছুদিন আগে এক অদ্ভুত উপায় বাৎলে তাঁকে সম্রাটের প্রীতি পুনরুদ্ধারে সহায়তা করেছিলেন। আজকের এ বিপদেও তাঁর বুদ্ধি ছাড়া চলবে না।

বীরবল যথাসময়ে সম্রাজ্ঞীর মহলে উপস্থিত হলেন।

—বান্দার সেলাম পৌঁছে হুজুরাইন। বেগম সাহেবার মেজাজ শরিফ তো? বললেন বীরবল।

ম্লানমুখে বেগম বললেন—বড় বিপদে পড়েছি শেঠজি। তাই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি।

বীরবল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বাকবৈদগ্ধ্যের পরিচয় দিয়ে বললেন—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি মহাপরাক্রান্ত ভুবনেশ্বর শাহানশা আকবরের প্রিয়তমা পত্নী সম্রাজ্ঞী যোধপুরী বেগমের বিপদ! এযে কল্পনাই করা যায় না।

—হাসি নয় শেঠজি। সত্যিই আমি বড় বিপন্ন।

তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে হাসি থামিয়ে বীরবল বললেন—শুনে চিন্তিত হলাম, বেগম সাহেবা। এখন বলুন, আমায় তলব করেছেন কেন?

—আপনার সাহায্য চাই শেঠজি! একবার আপনিই আমায় উদ্ধার করেছিলেন, সে কথা মনে আছে।

মাথা নুইয়ে বীরবল বললেন—আমি আপনাদের চিরকালের গোলাম। আপনার কোন কাজে লাগলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করব। এখন বলুন, কী আপনার বিপদ!

যোধপুরী বাঈ সহসা কোন কথা বলতে পারলেন না। কী ভাবে প্রসঙ্গটা উত্থাপন করবেন, ভাবতে লাগলেন। বীরবলও নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পরে সম্রাজ্ঞী বললেন—শেঠজি। সম্রাট আমার ওপর, কেন জানি না, আজকাল খুব বিরক্ত।

তাঁর কথা শুনে বীরবল কিছু হাসি পেলেন না। বললেন—সম্রাট বিরক্ত। কেন; আপনি এমন কি কাজ করেছেন যার জন্যে তিনি বিরক্ত হয়েছেন।

—কিছুই তো করিনি। তা সত্ত্বেও আজকাল তিনি যেন আর আমাকে সুনজরে দেখেন না। আমার কাছে আসেন না। যদিও বা আসেন, তাঁর মুখ গম্ভীর থাকে, আমার সঙ্গে ভাল করে কথা বলেন না।

—কেন যে তিনি বিরক্ত হয়েছেন তা কিছু বলেন না?

—না। কোন কথাই বলেন না। যদি বলতেন তাহলে তো বুঝতে পারতাম কোথায় আমার অপরাধ।

কিছুক্ষণ ভেবে বীরবল বললেন—আপনার প্রতি তিনি যে বিরক্ত হয়েছেন, তা বুঝলেন কিসে?

যোধপুরী বাঈ বললেন—বুঝলাম কিসে তা বলছি। আজকাল আমার শরীর ভাল নয়। আপনাকে বলতে লজ্জা নেই। আমি সন্তানসম্ভবা।

মাথা হেলিয়ে বীরবল বললেন—আপনাকে দেখেই তা কতকটা অনুমান করতে পেরেছি।

যোধপুরী বাঈ করুণ গলায় বলতে লাগলেন—কিছু খেতে পারি না। মুখে কিছু ভাল লাগে না। রাজবৈদ্য দুবেলা আমায় দেখতে আসেন। আমার জন্যে বিশেষ বিশেষ ওষুধ তৈরী করে পাঠান। আমি আজকাল সারাদিন শুয়ে বসে কাটাই। কোন কাজ করতে পারি না। চারজন নতুন বাঁদী নিযুক্ত করেছি। তারা আমার সেবা শুশ্রূষা করে, আমার জন্যে নানা রকম নতুন খানা তৈরী করে। আমার মনে হচ্ছে সম্রাট এসব পছন্দ করেন না। তিনি বলেন, শরীর আমার এমন কিছু খারাপ নয় যার জন্যে এত সব করা দরকার। আচ্ছা বলুন তো, পেঠজি! আমার শরীরের এই অবস্থায় যদি আমি কিছু আরাম পেতে চাই তা কি অন্যায়?

—না। অন্যায় কিসের! কিন্তু সম্রাট কি জানেন না যে আপনার শরীর ভাল নয়?

—জানেন বৈকি! প্রথম প্রথম তিনি নিজেই উদ্যোগী হয়ে হাকিমের ব্যবস্থা করেছেন, দুবেজি আমার খোঁজ নিয়েছেন, আমার জন্যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তারপর হঠাৎ কী যে হল, হাকিম এসেছে শুনলেই তিনি বিরক্ত হচ্ছেন, বাঁদীদের দেখে তাদের সামনে থেকে চলে যেতে বলছেন। শুধু তাই নয়, হুকুম দিয়েছেন, চারজন বাঁদী আসছে সপ্তাহ থেকে আর আমার সেবা শোনা করবে না, তারা বরখাস্ত হয়েছে। হাকিমের ওপর হুকুম হয়েছে, ওষুধ পাঠাবার দরকার নেই।

বলতে বলতে বেগমের চোখে জল এলো। বললেন—এমন ভাবে হঠাৎ সম্রাটের স্নেহ ভালবাসা হারিয়ে তাঁর চক্ষুশূল হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে আমার মরণ ভাল! পেঠজি! এ অবস্থার প্রতিকার করতে হবে আপনাকে!

বীরবল রীতিমত বিমূঢ় বোধ করলেন।

গর্ভবতী স্ত্রীর প্রতি স্বামী হয়েছেন বিরূপ। কোথায়, মনস্তত্ত্বের কোন্ নিগূঢ় গহ্বরে এর কারণ নিহিত আছে তার সন্ধান পাওয়া কি সম্ভব। দাম্পত্য জীবনের সূক্ষ্ম জটিল ভুল-বোঝাবুঝির রহস্যে বীরবলের বুদ্ধিও যেন প্রবেশের পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে বীরবল বললেন—আপনি অযথা মনোকষ্ট ভোগ করবেন না সম্রাজ্ঞী। সব ঠিক হয়ে যাবে। বাদশা আমাদের কিছু খেয়ালী। তা তো জানেনই। তাই আশা করছি, তাঁর মনের খেয়াল বেশিদিন থাকবে না, আবার তিনি আগেকার মতই ……

—না, না, আমি আর সইতে পারছি না। আপনি যা হয় একটা উপায় বার করুন।

বীরবল বললেন—আচ্ছা, আমি একটু ভেবে দেখি। আপনি একটু ধৈর্য ধরে থাকুন। সপ্তাহ খানেকের মধ্যে আমি আবার আপনার সঙ্গে দেখা করব।

• • • •

পরদিন বিকালবেলায় বীরবলকে সঙ্গে নিয়ে সম্রাট বেড়াতে বেরিয়েছেন।

ঘুরে একটি দীঘির ধারে এসে সম্রাট দাঁড়ালেন; দীঘির পাড়ে বনপ্রান্তে একটি বট বৃক্ষের দিকে আঙুল বাড়িয়ে সম্রাট বললেন—বীরবল, কয়েকদিন আগে এই গাছের তলায় একটা আশ্চর্য দৃশ্য দেখেছিলাম যা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত হত।

—কী সে দৃশ্য জাঁহাপনা?

আকবর বললেন—বেড়াতে বেড়াতে সেদিনও এই দিকেই এসেছিলাম। দেখলাম, ওই গাছের নীচে একটি নীচজাতের তরুণী-রমণী মাটিতে শুয়ে ছটফট করছে। দেখে কষ্ট হল। তার কাছে গিয়েই বুঝলাম তার প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়েছে। আর বললে বিশ্বাস করবে না, দেখতে দেখতে তার প্রসব হল, একটি সুন্দর শিশু ভূমিষ্ঠ হয়ে ককিয়ে উঠল।

—তারপর?

বাদশা বলতে লাগলেন—সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির ছটফটানি কমে গেল, সে উঠে বসল, শিশুটিকে কোলে নিয়ে, দীঘির পাড়ে নেমে গিয়ে তাকে পরিষ্কার করলে, নিজে পরিষ্কার হল, তারপর কোলে ছেলে আর মাথায় কুড়ি নিয়ে সে দিব্যি চলে গেল। যেন কিছুই হয় নি। এই দৃশ্যটি দেখে আমার শিক্ষা হল। বুঝলাম, আমাদের গর্ভবতী স্ত্রীদের প্রতি আমরা অনাবশ্যক মনোযোগ দি, তাদের সুখ-সুবিধার জন্যে মিছিমিছি আমরা আড়ম্বর করি, দাসদাসী নিযুক্ত করি, দুবেলা বদ্যি ডাকি। এত সব আদিখ্যেতার কোন দরকার করে না। আর আমাদের গর্ভবতী মেয়েরাও তেমনি নাড়াকাদুরে, ছেলে হবে তো হবে, তার জন্যে এত হাঙ্গামা কিসের?

বাদশার কথা শুনে বীরবল বুঝলেন, মনস্তত্ত্বের কোন্ উজানে সম্রাটের মনের তরণী ভেসে চলেছে, কেন সম্রাজ্ঞীর প্রতি তাঁর মনের গতির পরিবর্তন হয়েছে।

বীরবল মনের কথা চেপে মুখে শুধু বললেন—তাতো বটেই। এত হাঙ্গামা কিসের।

• • • •

পরদিন সকালে বীরবল বেগম সমীপে উপস্থিত হলেন।

তরুণীর প্রসবের ঘটনাটি উল্লেখ করে বললেন—বেগম সাহেবা বুদ্ধিমতী। আশা করি বুঝলেন?

মাথা নেড়ে বেগম বললেন—বুঝলাম তো; কিন্তু আমি কি করব। কেমন করে তাঁকে বোঝাব যে তরুণীর পক্ষে যা সম্ভব, আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়।

বীরবল বললেন—আমি একটি উপায় ভেবে ঠিক করেছি। যদি ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারা যায়, তাহলে সম্রাটের চৈতন্য ফিরবে এবং আপনার প্রতি তাঁর বিরূপতাও দূর হবে।

—বলুন কি সে উপায়?

—ব্যাপারটার মধ্যে কিন্তু ঝুঁকি আছে।

—তা থাক। বলুন, কি করতে হবে।

বীরবল তখন তাঁর উদ্ভাবিত কৌশলটি সম্বন্ধে বেগমের সঙ্গে আলোচনা করলেন।

• • • •

সেইদিনই বিকালে যোধপুরী বেগমের আদেশে প্রাসাদকাননের প্রধান রক্ষী তাঁর সামনে এসে কুর্নিশ করে দাঁড়ালো।

বেগম বললেন—তোমার অধীনে কতজন মালী গাছে জল দেয় বা গাছগুলোকে দেখা-শোনা করে?

—চল্লিশজন মালী আছে হুজুরাইন।

বেগম বললেন—কাল থেকে তাদের ছুটি। তারা আর কাজ করবে না, যতক্ষণ না পুনরায় আদেশ দেওয়া হয়, তারা যেন বাগানে না ঢোকে।

বেগমের বিচিত্র আদেশ শুনে উদ্যানরক্ষীর দুই চক্ষু যেন গাছে উঠল। বললে—তাহলে গাছে জল দেওয়া, তাদের তদারক…

—হবে না। গাছে জল দেওয়া বন্ধ থাকবে।

রক্ষী অধিকতর বিস্মিত হল, দু'হাত কচলে বললে—গাছে জল না দিলে, তারা যে সব শুকিয়ে যাবে হুজুরাইন।

—যাক শুকিয়ে। যা হুকুম দিচ্ছি, তা পালন করবে।

উদ্যানরক্ষী কাঁপতে লাগল। বললে—বাদশার সোন্তাকি মাফ করবেন, বেগমসাহেবা। কিন্তু আপনার এ আদেশ পালন করা কি করে সম্ভব! সম্রাট প্রায় প্রতিদিন বাগানে আসেন। গাছগুলিকে দেখেন। অনেকগুলি গাছ তাঁর খুব প্রিয়। তিনি যখন দেখবেন, তাদের সোড়ায় জল দেওয়া হচ্ছে না, তাদের তদারক হচ্ছে না, তখন আমার চাকরিই শুধু যাবে না, হুজুরাইন, সেই সঙ্গে গর্দানও যাবে। আমার অবস্থা বুঝুন।

বেগম বললেন—বুঝেছি। তোমার কোন ভয় নেই। বাদশা যখন জিগ্যেস করবেন তখন বলবে, আমার হুকুমে তুমি এই কাজ করেছো। যাও, যা বললাম, তাই করগে। আমার কথার যদি অন্যথা হও, তাহলে সেটা তোমার পক্ষে মঙ্গলের হবে না জেনো।

সম্রাজ্ঞীর দীপ্ত গম্ভীর মুখের পানে পলকের জন্যে তাকিয়ে বেচারি উদ্যানরক্ষীর অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। কাতর কণ্ঠে বললে—দেখবেন হুজুরাইন, গরীব প্রাণে যারা না পড়ে।

—কোন ভয় নেই। চলে যাও। যা বললাম, অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে।

• • • •

দিন তিন চার পরের কথা।

লম্বা লম্বা পা ফেলে সম্রাট আকবর যোধপুরী বেগমের মহলে উপস্থিত হলেন। তাঁর দুই চোখ রক্তবর্ণ। রাগে তিনি অগ্নিশর্মা।

বেগমকে সামনে দেখেই হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—তুমি বাগানের প্রধান কর্মচারীকে গাছে জল দিতে মানা করেছো, মালীদের ছুটি দিয়েছো?

মাথা হেলিয়ে বেগম বললেন—হ্যাঁ প্রভু, মানা করেছি, আর ছুটি দিয়েছি।

—হুঁ। তার সম্মান যেতো, কিন্তু সে যখন বললে, তোমার হুকুমে সে একাজ করেছে তখন বেঁচে গেল। এখন তোমার কৈফিয়ৎ চাই। কেন এমন অদ্ভুত আদেশ দিয়েছো?

—নিশ্চয় কারণ আছে, সম্রাট।

—কি সে কারণ জানতে চাই।

ধীরে ধীরে যোধপুরী বেগম বলতে লাগলেন—কিছুদিন আগে বেড়াতে বেড়াতে প্রাসাদের বাগান ছাড়িয়ে উত্তর দিকে যে বনভূমি আছে তার মধ্যে ঢুকেছিলাম। ঢুকে দেখলাম চারিদিকে ছোট বড় অনেক ফুল আর ফলের গাছ আর তাদের মাথায় ফুল আর ফলের কী সমারোহ। দেখে অবাক মানলাম। কাছাকাছি একজন গ্রামবাসী ছিল। তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, গাছগুলিতে যে এত ফুল ফুটেছে আর ফল ধরেছে, তা এদের দেখাশোনা করা, জল দেওয়া, এসব করে কে! তাতে সে বললে, কেউ কিছু করেনা। জলও দেয় না, তদারকও করে না, এরা আপনি-আপনিই বেড়ে উঠেছে আর এমন তাজা হয়ে আছে। তখন আমি ভাবলাম, এগাছগুলি যদি বিনা জল-দেওয়ায় এমন সজীব থাকতে পারে, ফুল ফল দিতে পারে, তাহলে আমাদের বাগানের গাছগুলিই বা পারবে না কেন। তাহলে শুধু শুধু তাদের জন্যে এতগুলো মালী, এত হাঙ্গামা, রোজ রোজ জল দেওয়া—এসব করার কি দরকার! তাই আমি সেই মতো হুকুম দিয়েছি জাঁহাপনা।

অসহিষ্ণু উত্তেজকণ্ঠে বাবর বললেন—কিন্তু ওগুলো হল বুনো গাছ, আর এরা হল আমার বাগানের সখের গাছ, সুখী গাছ। বুনো গাছের সঙ্গে বাগানের গাছের অনেক তফাৎ।

সম্রাটের মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টি স্থাপন করে যোধপুরী বেগম বললেন—তা যদি হয় সম্রাট, তাহলে, একজন ভীল-রমণীর সঙ্গে সম্রাট-মহিষীরও অনেক তফাৎ।

বেগমের কথা শুনে সম্রাট চমকে উঠলেন। কিছুক্ষণ তাঁর মুখ দিয়ে বাক্যস্ফূর্তি হল না। তাকিয়ে দেখলেন, আসন্ন মাতৃত্বের মহিমায় যোধপুরী বেগমের সুন্দর মুখ আরও যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বললেন—বুঝলাম। হাঁ, স্বীকার করলাম, তফাৎ আছে বৈকি! তা, এবারও কি বীরবল?

তাঁর কথার ধরনে বেগম হেসে ফেললেন, বললেন—এবারেও তিনি।

—ডেকে পাঠাও তাকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বীরবল এসে হাজির হলেন। দেখলেন, পালঙ্কের উপর সম্রাট এবং মহিষী পাশাপাশি বসে আছেন। দু'জনেরই মুখে হাসি আর আনন্দের ছায়া। বুঝলেন, তাঁর কৌশল ব্যর্থ হয় নি। যথারীতি কুর্নিশ করে দাঁড়ালেন।

আকবর বললেন—বীরবল, দাঁতে বড় বেদনা। বোধ হয় আক্কেল-দাঁত উঠ্‌ছে!

বীরবল জবাব দিলেন—সুখবর সম্রাট। আমাকে তাহলে আর এত ঘন ঘন মাথা ঘামাতে হবে না।

ঘরের মধ্যে হাসির রোল পড়ে গেল।

———

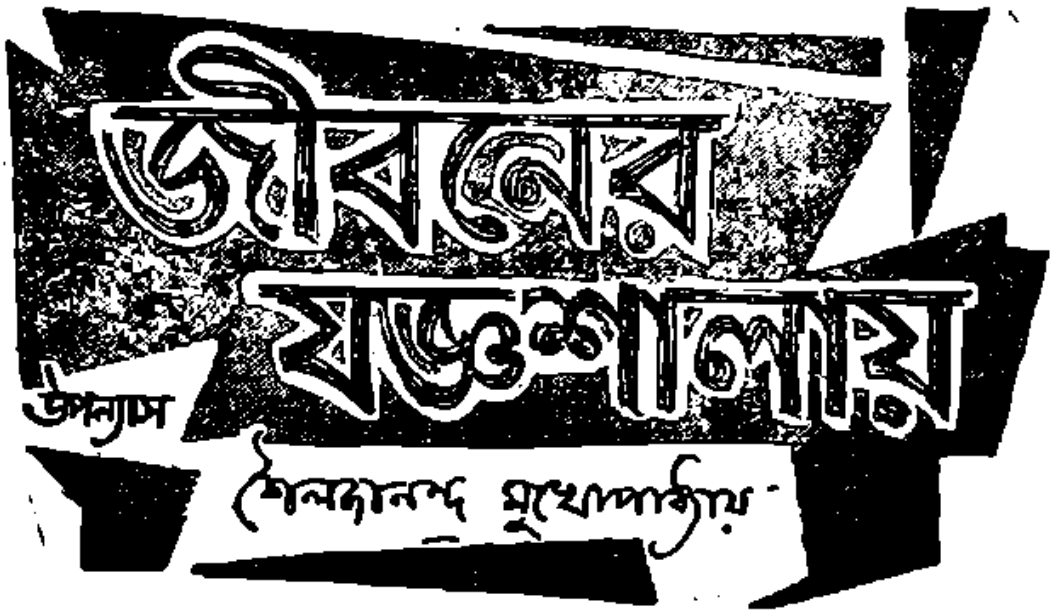

॥ বারো ॥

সরমার সাজপোষাক দেখেই জয়নারাণবাবু বুঝে নিয়েছিলেন—সে বোধকরি বাইরে বেরোবার জন্যে তৈরি হয়েছে। ভাবলেন, এ সময় আসা তাদের উচিত হয়নি। জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রকাশ কোথায়?'

সরমা জবাব দেবার আগেই প্রকাশ এসে মাথা হেঁট করে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে।

—ভাল আছ তো বাবা?

প্রকাশ বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, ভালই আছি।'

কিন্তু বাইরে বেরুনো তাদের আজ বোধহয় বন্ধ হয়ে গেল। শ্বশুরের সঙ্গে বসে বসে কী কথাই-বা সে বলবে? তার চেয়ে—

সরমার দিকে তাকিয়ে প্রকাশ বললে, 'তুমি থাকো। আমি আজ নিজেই ঘুরে আসি।'

কি বলবে সরমা?

বাপের সামনে প্রকাশের সঙ্গে কথা বলতে লজ্জাও করছে, অথচ প্রকাশ চটলো কিনা তাই-বা কে জানে! শুধু একবার চোখ ফিরিয়ে তার দিকে তাকিয়ে তার নীরব সম্মতি জানিয়ে চট্ করে মুখটা ফিরিয়ে নিলে।

প্রকাশ জয়নারাণবাবুকে বললে, 'আপনারা বসুন। আমি একটু বেরুচ্ছি।'

সৌজন্যের খাতিরে জয়নারাণবাবুর আজ ফিরে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু অত সৌজন্যবোধ জয়নারাণবাবুর নেই। তিনি বললেন, 'তা বেশ। আমরা এসেছি যখন, তখন একটু বসেই যাই।'

জয়নারাণবাবু বসলেন। উমেশ বসলো।

প্রকাশ যাবার আগে রাঁধুনী ঠাকুরকে কি যেন বলে বেরিয়ে গেল।

সরমার যাওয়া হলো না, ভালই হলো। কোথায় কোন্ মিস্ শর্মা—জার্মান-ফেরত মেয়ে ডাক্তার, তার সঙ্গে ভাল করে কথাই হয়ত সে বলতে পারতো না। কিন্তু এদিকেও যে লজ্জা করছে। ঘো ঘাউডার লিপ্‌ষ্টিক্ নিয়ে ভাল শাড়ী পরে বাপের সামনে সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না।

আর ঠিক সেই সময় উমেশ চিমনি কাটলে।—

'মেয়ের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন। দেখুন কিরকম মানিয়েছে। বিয়ে না হলে মেয়েদের ভাল দেখায় না—তা আপনি যাই বলুন।'

সরমা বললে, 'আমি আসছি।'

বলেই সে বোধকরি পালিয়ে যেতে চাচ্ছিল সেখান থেকে। এমন সময় ঠাকুর এসে দাঁড়ালো। বললে, 'আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম মা—'

সরমাকে ফিরে দাঁড়াতে হলো।—'কি বলছো?'

কথাটা চেঁচিয়ে বলবার কথা নয়। ঠাকুর এগিয়ে এলো সরমার কাছে। বললে, 'বাবু টাকা দিয়ে গেলেন। আপনার বাবার জন্যে কি কি খাবার আনবো বলুন।'

ঠাকুর যতই আস্তে বলুক, উমেশ ঠিক শুনতে পেয়েছে। বললে, 'আমাদের জন্যে তো? চমচম্ আনতে বল্। চমচম্ আর চা—ব্যস্, তাহলেই হবে।'

অরনারাণবাবু কটমট করে তাকালেন উমেশের দিকে। 'তুমি বড় পেটুক উমেশ।'

—'পেটুক কিসের? শ্বশুর নেই, শাশুড়ী নেই, দেওর নেই, ননদ নেই, সরমার একা বাড়ী, এখানে আমরা যা খুশী তাই বলবো।'

সরমা বললে, 'নিশ্চয়ই বলবেন।'

ঠাকুরকে বললে, 'চায়ের সঙ্গে শুধু মিষ্টি ভাল লাগবে না। চমচমের সঙ্গে কিছু নিমকি আনিয়ে যাও, নয়ত নিম্‌কি ভেজে যাও।'

অরনারাণবাবু কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সরমা সেদিকে কান দিলে না। পাশের ঘরে ঢুকে পড়লো।

ভালই হয়েছে—প্রকাশ বেরিয়ে গেছে বাড়ী থেকে। যে-খবরটা পাবার জন্যে মন তার ছটফট করছে, প্রকাশ থাকলে সরমা তার বাবাকে সেকথাটা জিজ্ঞাসা করতো কেমন করে?

সরমা ভাল শাড়ীটা বদলে ফেললে। জামা বদলালে। খুব করে ঘষে ঘষে ঠোঁটের রং তুললে। তারপর তাড়াতাড়ি তার বাবার কাছে এসেই জিজ্ঞাসা করলে, 'কলকাতা থেকে কোনও চিঠিপত্র এসেছে?'

অরনারাণবাবু তাঁর পকেট থেকে একখানি চিঠি বের করে বললেন, 'সেই খবরটা দিতেই এসেছি আমরা। অজয় বেশ ভাল আছে সেখানে। এই তাখ, সৌরমোহনবাবু কি লিখেছেন।'

সরমা পড়লে চিঠিখানি। সৌরমোহনের চিঠি।

লিখেছেন—

শ্রদ্ধাভাজনেষু—

আপনার নিকট জানাইতে লজ্জা নাই বলিয়াই জানাইতেছি। ঘাটশোলার সনাতনবাবুর এষ্টেট হইতে আমাদের আশ্রমের জন্য মোটা টাকার যে সাহায্যটি পাওয়া যাইত, অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যুর পর সেই সাহায্যটি আমাদের বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য সাময়িক ভাবে আমরা একটু বিপন্ন হইয়াছি। আপনার দৌহিত্র শ্রীমান অজয়ের সঙ্গে আপনি যে পরিচারিকাটি পাঠাইয়াছিলেন, তাহার থাকিবার কোনও প্রয়োজন বোধ করিতেছি না। অজয় বেশ আনন্দেই আছে। অন্যান্য ছেলেদের

সঙ্গে মিশিয়া মিশিয়া সে বেশ ফুর্ত্তিতে দিন কাটাইতেছে। সেই জন্য বিমুকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিলাম। আপনি যেন অসন্তুষ্ট হইবেন না। আপনার আদেশ অনুসারে আমি আপনার দৌহিত্রের সংবাদ নিয়মিত ভাবে আপনার নিকট পাঠাইব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। নিবেদন ইতি।

—বিনু ফিরে এসেছে? কবে এসেছে?

জয়নারায়ণবাবু বলিলেন, 'কাল সকালে।'

—আসবার সময় আজ কান্নাকাটি করেনি?

—না।

বাবা! ব'লে কি যেন বলিতে যাইতেছিল সরমা, এমন সময় দুটি খাবারের ডিস নিয়ে ঘরে ঢুকলো মতিয়া। সরমার মুখের কথা মুখেই আটকে রইলো।

উমেশ হাত বাড়িয়ে ডিস দুটো নিলে। বললে, 'যাও এবার দু'গ্লাস জল নিয়ে এসো। বাঃ, বেশ বড় বড় চমচম্ এনেছ তো?'

একটা ডিস জয়নারায়ণবাবুর হাতের কাছে নামিয়ে দিতে দিতে বললে, 'আপনি কি এতগুলো খাবার খাবেন?'

জয়নারায়ণবাবু বলিলেন, 'আমাকে শুধু একটা সিঙ্গাড়া দিয়ে বাকি সব তুমি তুলে নাও।'

অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সে-আদেশ পালন করলে উমেশ। তারপর নিজের জায়গায় গিয়ে খেতে খেতে বললে, 'ছেলের জন্যে তুই ভাবিসনে সরমা—ছেলে বেশ ভালই আছে।'

তাগিদ মতিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল জল আনবার জন্যে বইলে ছেলের কথা সে শুনতে পেতো। সরমা বিরক্ত হয়ে উমেশের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'আঃ—'

জয়নারায়ণবাবু বলিলেন, 'বুদ্ধিসুদ্ধি কি তোমার কখনও হবে না উমেশ?'

উমেশ তার ভুল বুঝতে পারলে। কিন্তু বুঝেও কি রক্ষা আছে? বললে, 'ও হ্যাঁ। ছেলে মানে কত ছেলে আছে।'

আরও কিছু সে বলতো হয়ত—যদি না মতিয়া ঘরে ঢুকতো জলের গ্লাস নিয়ে।

মুখ কিন্তু তার বন্ধ হলো না। বললে, 'চমচমগুলো বেশ। কাশীর চমচম্ এই জন্যে বলে বিখ্যাত।'

কাশীর চমচম্ বিখ্যাত কিনা সেকথা শোনবার মত মনের ধৈর্য্য সরমা তখন হারিয়ে ফেলেছে। মতিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে যাবামাত্র তাড়াতাড়ি গিয়ে সে দোরটা দিলে বন্ধ করে। বন্ধ করে দিয়েই বাবার কাছে এসে দাঁড়ালো। বললে, 'বাবা আমি কলকাতায় যাব।'

'কেন রে? কলকাতায় যাবি কি জন্যে?'

কলকাতায় যেন তার কোনও কাজই থাকতে পারে না!

উমেশ তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, 'তা বেশ তো। কলকাতা শহরটা সত্যিই একটা দেখবার মত শহর। আমি একবার গিয়েছিলুম অনেক কাল আগে—তখন টিকি বারোস্কোপ হয়নি। আমাকেও একবার যেতে হবে কলকাতায়। তা বেশ তো, একসঙ্গেই যাব—বা কি বলেন বড়বাবু?'

জয়নারায়ণবাবু বলিলেন, 'তুমি যাবো।'

বলেই তিনি সরমার মুখের দিকে তাকালেন। খাওয়া তখন তাঁর হয়ে গেছে।

বললেন, 'ওই তো পড়লি চিঠিখানা—অজয় তো বেশ ভালই আছে। আমার কলকাতা কি অতে যাবি?'

সরমা বললে, 'হ্যাঁ বাবা, আমি যাব।'

জয়নারায়ণবাবু বললেন, 'তার চেয়ে চল্ বরং ও-বাড়ীতে তোকে একবার নিয়ে যাই। বিনুর মুখ থেকে সব কথা শুনবি ভাল করে।'

কিন্তু মায়ের মন তাতেও বুঝি ঠাণ্ডা হলো না। সরমা স্নেহ ঘরে বললো, 'তুমি আমাকে নিয়ে যাবে কিনা বল।'

'প্রকাশ যদি যেতে চায় সঙ্গে? যদি জিজ্ঞাসা করে—কলকাতা কি অতে যাবে?'

উমেশ আবার কথা বললে। জলের গ্লাসটা চক্ চক্ করে খেয়ে নিয়ে বললে, 'সত্যিই, সেও একটা কঠিন সমস্যা।'

সমস্যার সমাধান হবার আগেই কিন্তু দোরে টোকা পড়লো।

সরমাই বিরক্ত হয়ে এগিয়ে গিয়ে দোর খুলে বললে, 'কেন বিরক্ত করছিস—'

কিন্তু কথাটা তার শেষ হলো না। দেখলে, দু'হাতে দু'পেয়ালা চা নিয়ে মতিয়া দাঁড়িয়ে। তার পাশে ঠাকুর। ঠাকুরের হাতে গরম এক ডিস্ নিম্‌কি।

দু'জনেই ঘরে ঢুকলো।

সরমা ঠাকুরকে একটু তিরস্কার করলে।—'তোমার বেশ আক্কেল যাহোক্! নিম্‌কি ভাজ্‌ছো সেকথা বলে যেতে হয়!'

উমেশ বললে, 'আহা ও-বেচারার দোষ কি? তুই যাও, কি আনলে দেখি।'

ঠাকুর তার ডিসের ওপর খান-চারেক নিম্‌কি দিয়েই জয়নারায়ণবাবুকে দিতে যাচ্ছিল। তিনি হাত আড়াল দিয়ে নিষেধ করলেন। বললেন, 'আমি খাব না। আমাকে দিও না।'

এই বলে তিনি চায়ের কাপটা তুলে নিলেন।

আবার দোরটা বন্ধ করে দিলে সরমা। মতিয়াকে বলে দিলে, 'দেখিস কেউ যেন না আসে। বাবু এলে কিন্তু আগেই আমাকে জানিয়ে দিস্।'

মতিয়া হেসে মাথাটি তার কাৎ করে বললে, 'বেশ।'

সরমা বললে, 'কবে আমাকে কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছ বল।'

জয়নারায়ণবাবু বললেন, 'প্রকাশকে কি বলবি?'

সরমা বললে, 'আমি কিছু বলবো না। তোমাদের মিথ্যে কথা বলা অভ্যেস আছে, যাহোক্ একটা কিছু তৈরি করে বল—'

এ-সব দিক দিয়ে উমেশের মাথাটা খোলতরি একটু পাকা। তার ওপর নিম্‌কিগুলো খেতেও ভালই হয়েছিল। নিম্‌কি খেতে খেতে উমেশ বললে, 'কলকাতা যাবার কথা বলা চলবে না জামাইকে। বলতে হবে দেশে যাচ্ছি।'

জয়নারায়ণবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'দেশে কেন? যদি বলে, সরমার হঠাৎ দেশে যাবার কী দরকার পড়লো?'

উমেশ বললে, 'সরমার নামে একটা বেনামী জমি নিয়ে মামলা বেধেছে। দিনকতকের জন্যে ওকে যেতেই হবে।'

মনে হলো জয়নারায়ণবাবু কি যেন ভাবছেন। এমন চিন্তাভারাক্রান্ত মুখ তাঁর বড় একটা দেখা যায় না। বললেন, 'প্রকাশ বলেছিল—কলিয়ারী সে কখনও দেখেনি। এই সঙ্গে সেও না বলে বসে—'

কথাটা তাঁকে শেষ করতে দিলে না উমেশ। মাড়ি এবং মাথা একসঙ্গে প্রবল বেগে নাড়তে নাড়তে বলে উঠলো—'উঁহু উঁহু—কোনোমতেই না। এখন এই সময়টায় কলিয়ারীতে নামে কখনও? সিলার ব্লাস্টিং হচ্ছে, চারদিকে ডিনমাইট্ ছুটছে, গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজ হচ্ছে তার ওপর প্রকাশ হচ্ছে গিয়ে নতুন মানুষ—কলিয়ারীতে নামেনি কখনও···'

জয়নারায়ণবাবুর মত মানুষও হেসে ফেললেন তার কথা শুনে। বললেন, 'বেশ তাহ'লে তাই হবে। সেই কথাই বলি প্রকাশকে।'

সরমা বললে, 'হ্যাঁ, আজই বল। এক্ষুনি বল।'

ফিরতে প্রকাশের খুব বেশি দেরি হয়নি।

কথাটা উমেশই উত্থাপন করলে। বললে, 'এই কথাটা বলবার জন্যেই এসেছি আমরা। তুমি তাড়াতাড়ি তখন চলে গেলে তাই বলা হলো না। সরমাকে আজই নিয়ে যাই তাহ'লে? কাজটা সমাধা হতে তা বড়জোর দিন-দশেক্ লাগবে, না কি বলেন?'

জয়নারায়ণবাবু নীরবে শুধু মাথা নাড়লেন।

যে-ভয় তিনি করেছিলেন, প্রকাশ সে পথ দিয়েই গেল না। শুধু বললে, 'দেশের সঙ্গে সব সম্পর্কই কি আপনি শেষ করে দিচ্ছেন?'

জয়নারায়ণবাবু শুধু বললেন, 'হ্যাঁ।'

'কলিয়ারীটা না বেচলেও পারতেন।'

কথাটার জবাব দিলে উমেশ। বললে, 'তোমার মত জামাই পাবেন তা কি উনি ভেবেছিলেন কোনোদিন? তাছাড়া কলিয়ারীতে আগুন লেগে গেল যে!'

সরমার দিকে তাকিয়ে প্রকাশ বললে, 'যাও। গ্রামটা আর একবার দেখে এসো।'

আনন্দের আতিশয্যে সরমা তার বাবার কাছেই প্রকাশের সঙ্গে কথা কয়ে বসলো। বললে, 'তোমাকেও আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে।'

বলেই ঝট্ করে কথাটা আবার পাল্টে নিলে। বললে, 'এবার থাক্। পরে নিয়ে যাব। বাড়ীটা তো রইলো।'

প্রকাশ বললে, 'অক্টোবর মাসে তোমাকে নিয়ে একবার কলকাতায় যাব। সেই সময় ঘুরে এলেই হবে।'

এই মানুষটির কাছে কোনও কিছু গোপন করতে সরমার ইচ্ছা করে না। অজয়ের কথা এতদিন নিশ্চয়ই সে তাকে বলে ফেলতো—যদি-না তার বাবা তাকে কঠোর প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিতেন!

[ক্রমশঃ

একজনে আর কয়েকজনে

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

স্রষ্টার ব্যক্তি-জীবন ও তাঁর সৃষ্টি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পৃথক হয়ে পড়ে। সাহিত্যের ধ্যান ও জীবনের-আচরণ খুব কম ক্ষেত্রেই এক হতে দেখা যায়। এই বিরল ক্ষেত্রে উপেন্দ্রনাথ এযুগে একক বললে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হয় না।

ব্যক্তি উপেন্দ্রনাথ ও স্রষ্টা উপেন্দ্রনাথকে পৃথক করে দেখবার উপায় নেই।

তাঁর জীবনবোধে গভীরতার অভাব নেই। এই গভীরতা গাম্ভীর্যময় নয়, অস্পষ্টতায় কুয়াশাচ্ছন্নও নয়। এই গভীরতা সহজ আনন্দরসে চেতনাময়।

এই গভীর জীবনবোধের অধিকারী উপেন্দ্রনাথ রসের ভিখারী।

শ্রীরামপুরে সাহিত্য সভায় উপেন্দ্রনাথকে সম্বর্ধনা দান কালে মাত্র কয়েকটি কবিতার চরণে কবি অধ্যাপক ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র যথার্থই ব্যক্ত করেছিলেন উপেন্দ্রনাথের মানসিকতাকে—

'নিত্যের অমৃত আর—
আমাদেরই কালের সকারী
দেখেছ প্রসন্ন চোখে
বারে-বারে রসের ভিখারী।'

প্রসন্ন চোখে জীবনকে দেখার মতন জীবনবোধ যাঁর, তিনি খণ্ডকালের মানুষ নন এবং খণ্ড-কালের স্রষ্টাও তিনি নন।

নিত্যকালের জীবনকে তিনি চেয়েছিলেন ; নিত্যকালই তাই সৃষ্টির সাহিত্য-কর্ম।

এই নিত্যকালের মন আজ বিরল, তাই আজকের সাহিত্য-কর্মের সুর ভিন্ন। আংশিক জীবনকে ঘিরে আজ যে জটিলতার গ্রন্থি—আজকের স্রষ্টার সৃষ্টি সেই গ্রন্থিতে জটপাকানো।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি কবিতার কয়েকটি পংক্তি—

'সৃষ্টি ত কত ভাবে মাপলাম!
হিসাবে ত আজো তারে পাই নাই।
হৃদয়ের রঙে যেই ছাপলাম
মনে হোলো বোঝা সেদো সবটাই!'

উপেন্দ্রনাথের আচরণে এবং সাহিত্য-কর্মে এই হৃদয়ের রঙ। এই হৃদয়ের রঙে তিনি রঞ্জিত।

উপেন্দ্রনাথ নিজেও প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই কবিতাটির ভারি অনুরাগী পাঠক ছিলেন।

একবার শেওড়াফুলিতে প্রেমেন্দ্র মিত্রের সম্বর্ধনায় উপেন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করতে গিয়েছিলেন। উপেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সহযাত্রী হয়ে আমরা দুজনে গিয়েছিলাম—আমি এবং বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশক ডি, এম, লাইব্রেরির সত্বাধিকারী গোপাল বসুমল্লিক।

কলকাতা থেকে মোটরে বৈদ্যবাটী সেওড়াফুলিতে যাত্রাকালে গোপালবাবু কল্লোল যুগের প্রতিভাশালী কয়েকজনের প্রাথমিক সাহিত্যিক জীবনের গল্প করছিলেন।

উপেন্দ্রনাথ বললেন, 'গোপালবাবু এগুলি লিখে ফেলুন। বই ব্যাপারীর হাটের এই পণ্য কিন্তু বিক্রোধে ভালো।'

গোপালবাবু বললেন, 'দাদা সে হাত কী ভগবান আমাদের দিয়েছেন?'

উপেন্দ্রনাথ বললেন, 'আরে, চোখ যদি দিয়ে থাকেন তাহলে কী আর হাতে আটকায়? হাত শুধু কাজ করে, চোখটাই তো আসল!'

'আর হৃদয়?'

আমার কথার উত্তরে উপেন্দ্রনাথ বললেন, 'চোখ দেখে, আর হৃদয় অনুভব করে। সে অনুভূতি চোখের দেখারই অনুভব। তাই চোখই হচ্ছে সব।'

এই চোখই যে সব—এই চোখই হৃদয়, মস্তিষ্ক এবং বিবেক তা উপেন্দ্রনাথের চোখ দুটি দেখলেই অনুভব করা যেতো।

সহানুভূতি, সহৃদয়তা, সমবেদনা অনেকের চোখেই দেখা যায়; কিন্তু সে চোখে অপরের বেদনায় সত্যিকারের জল ক'জনের মধ্যে ফুটে বার হয়? দেখে বন্যা—সে ধরায় দেশের সমস্ত মানুষের মন আর্দ্র কিন্তু উপেন্দ্রনাথের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া একটু ভিন্ন ধরণের।

যে চোখে তিনি বিগত ১৩৬৯ সনের বন্যা পীড়িত বাংলা দেশকে দেখেছিলেন—সেই চোখকেই তিনি তাঁর অনুরাগী বন্ধুদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন।

'সমস্ত দেশ জলে ভাসছে, আর আমি ভাসবো প্রমোদ তরণীতে! না তা হতে পারে না। তোমরা এ উৎসব কিছুতেই করতে পারবে না।' উপেন্দ্রনাথ দৃঢ় কণ্ঠে আপত্তি প্রকাশ করলেন। চোখদুটিতে তাঁর কেমন যেন ভিজে ভিজে কোমল ভাব, যা তাঁর প্রতিবাদের দৃঢ়কণ্ঠকে বেশি করে প্রকাশ করছিলো।

আমরাও বিস্মিত।

তরা আশ্বিনের মেঘলা সকাল। আসন্ন বর্ষণের মধ্যে তখনো সারা দেশ ভাসার কোনো দুঃসংবাদ আমাদের জানা নয়। আমরা কয়েকজন রবিবার সকালে এসেছি বালিগঞ্জ প্রেসে উপেন্দ্র-সদনে। ১৩৬৬ সনের আশ্বিনে উপেন্দ্রনাথের উনআশীতিতম জন্মতিথি। সেই জন্মতিথিকে সম্বর্ধনা জানাবার এক পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করতেই উপেন্দ্রনাথ প্রবল ভাবে আপত্তি প্রকাশ করলেন।

কবি রমেন মল্লিকের ৬৭ নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীটের এক বৈঠকে ইতিপূর্বে আমরা কয়েকজন সমবেত হয়েছিলাম। আমার প্রস্তাব ছিলো উপেনদার জন্মতিথি এবার খুব ঘটা করে করা হোক্!

শিল্পী সংস্থার যুগ্ম সম্পাদকদ্বয় কেশব মুখোপাধ্যায় এবং সুধীর ঘোষ এই প্রস্তাবকে সমর্থন করলেন। তাঁদেরই পরিকল্পনা সাহিত্যিকদের নিয়ে স্টীমার পার্টির প্রমোদ-ভ্রমণ। জলযানেই উপেন্দ্রনাথকে সম্বর্ধনা জানানো হবে।

কেশববাবু বললেন, 'আমি হোসেনের শানাই, উটুরের একটু খাওয়া-দাওয়া, গান-বাজনা, কবি এবং সাহিত্য সম্মিলন এবং ছোট একটি নাটিকা-অভিনয়! আর হাজার এক টাকা মজুরাণা।'

কবি রমেন মল্লিক উৎফুল্ল হলেন, 'উত্তম প্রস্তাব।'

সর্বসম্মতিক্রমে এ প্রস্তাব পাশ হয়ে গেলো। উপেন্দ্র জন্ম-জয়ন্তী কমিটিও গঠিত হলো।

'সভাপতিত্ব করবেন কে?'

উপেন্দ্রনাথ বয়সের বাধা মানেন না। আর মজলিশী লোক তিনি। তাঁর মেজাজের মধ্যে যে কবি-প্রকৃতি সেই প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য আছে এমন সভাপতিই কাম্য। সে সভাপতিরো তরুণ মন, মজলিশী হৃদয় এবং কবির মেজাজ থাকা দরকার। আর সব চেয়ে বড়ো চাহিদা—তিনি হবেন উপেন্দ্রনাথের মতন নিরহঙ্কারী। ছোটো বড়ো সবারই আপন জন। হৃদয়ের সম্পদ বুদ্ধির খোলসে যাঁর ঢাকা নয়। তিনিও উপেন্দ্রনাথের মতন সহৃদয়।

'উপেন্দ্র জন্ম-জয়ন্তী উৎসবে সভাপতিত্ব করবেন কে?'

উপেন্দ্র জন্ম-জয়ন্তী কমিটি সভাপতির নাম খুঁজে বার করছেন। ভাবছেন, কয়েকজনকেই দেখলাম এ-ব্যাপারে চিন্তামগ্ন।

আমি বললাম, 'প্রেমেন্দ্র মিত্র।'

সাহিত্যিক রাণাবন্ধু লাফিয়ে উঠলেন, 'এক্ষুনি টেলিফোন করি প্রেমেনদাকে।'

আমি বললাম, 'তার আগে আমাদের উপেনদার কাছে যাওয়া দরকার।'

সেদিন ছিলো শনিবার অপরাহ্ণ।

রবিবারের সকালেই আমরা কয়েকজন এসেছি উপেন্দ্র সদনে। আমাদের প্রস্তাব শুনেই উপেন্দ্রনাথ বললেন, 'বলো কী। সারা দেশ ভাসছে বন্যায়, আমি ভাসবো আনন্দ-বন্যায়?

'সারা দেশ বন্যায় ভাসছে। সে কী দাদা?'

আমাদের বিস্মিত প্রশ্নে উপেন্দ্রনাথ বললেন, 'কেন, তোমরা কী জানো না?'

'না, এখবর তো এখনো পাইনি আমরা!'

উপেন্দ্রনাথ সেদিনকার সংবাদপত্রখানি আমাদের চোখের সামনে মেলে ধরলেন। আমরা দেখলাম, সারা বাংলাদেশে ভয়াবহ বন্যার দুঃসংবাদ। গ্রামের পর গ্রাম ভেসে গেছে কয়েকদিনের অবিশ্রান্ত জলধারায় স্ফীত নদ-নদীর জলপ্লাবনে। সাইক্লোনের ঝড়ে সারা বাংলা দেশ বিধ্বস্ত।

বললাম, 'তাইতো দাদা, বড়ই দুঃসংবাদ। তাহলে উপায়?'

উপেন্দ্রনাথ বললেন, 'বন্ধ করো এখন সকল আনন্দানুষ্ঠান। তার চেয়ে ভাবো দেশের এই দুর্দিনে আমরা বাংলাদেশের সাহিত্যিকরা সক্রিয় ভাবে কী করতে পারি।'

উপেন্দ্রনাথের জন্মতিথি উৎসব প্রতিপালিত হবে না এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করতে হলো অতঃপর আমাদের।

দিনের পর দিন ভয়ঙ্কর বন্যার আর দুর্ভিক্ষের সংবাদ আরো প্রকাশিত হতে লাগলো। সমস্ত বাংলা দেশ নিষ্পীড়িত—আমাদের মনও ভারাক্রান্ত।

উপেন্দ্রনাথ একদিন আমাদের আবার ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'তোমরা বলেছিলে আলি হোসেনের শানাই, স্টীমার পার্টি, উদুরের একটু খানাপীনা আর হাজার একটাকা নজরাণা—আমার জন্মতিথির পর্ব।'

বললাম, 'হ্যাঁ, তাইতো ভেবেছিলাম আমরা।'

'কতোটাকা খরচ হতো তাতে ?'

উপেন্দ্রনাথের কথায় আমরা বললাম, 'শ্রীযুক্ত কে. ডি. রায়ের অনারেরি সীমারটি ওঁর আনুকূল্যে পাওয়া যেতো। আমি হোলেন আপনার জন্মতিথিতে নামমাত্র দক্ষিণায় আসতে রাজী। আর খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে টুকিটাকি খরচ এই ধরুন পাঁচশো। আর হাজার এক টাকা আপনার দক্ষিণা।'

'অর্থাৎ কমসেকে দেড় হাজার টাকা খরচ করতে তোমরা পারো।'

'তা পারি।'

'আচ্ছা, তাহলে এক কাজ করো। দুপয়সার খই, আর দুপয়সার বাতাসা—এই আমার নৈশ আহার। পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে এই আহার গ্রহণ করবো আমি আমার জন্মতিথিতে। আর একহাজা ফুলের মালা। হাজার একটাকার মধ্যে একটাকা খরচ করতে পারো তোমরা। বাকী টাকা ফুলে দাও আমার হাতে। বঙ্গাব্দ তহবিলে আমি তা দেবো।'

উপেন্দ্রনাথের এই প্রস্তাবে আমরা কোমর বেঁধে লেগে গেলাম। জন্মদিনের তারিখ পিছিয়ে দেওয়া হলো।

প্রেমেন্দ্র মিত্র তখন কলকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানে সাহিত্য-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক। বেতারের কাজে দিল্লী যাচ্ছেন তখন তিনি। উপেন্দ্রনাথের জন্ম-জয়ন্তী উৎসবে সভাপতিত্ব করার প্রস্তাবে অত্যন্ত উৎফুল্ল হলেন।

বললেন, 'তারিখ পিছিয়ে দাও তোমরা। উপেনদার জন্ম-উৎসবের সভাপতি আমিই হবো। দিল্লী থেকে ফিরে আসি আগে।'

আশ্বিনের জন্মদিন কার্তিকে পিছিয়ে দেওয়া হলো। স্টীমার পার্টির প্রীক জমকেও বাদ দিয়ে সাহিত্য-তীর্থের ঘরোয়া অধিবেশনে উপেন্দ্র জন্ম-জয়ন্তী উৎসব পালনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলো।

উপেন্দ্রনাথ খুশি হলেন। মাত্র একমাস কালের প্রস্তুতি। আমরা কয়েকজন কাজে নেমেছি। দিনে দিনে টাকা উঠছে। দেশে উপেন্দ্র অনুরাগীর সংখ্যা কম নয়। তাই চাঁদার টাকাও কম নয়। বাংলা দেশের সকল সাহিত্যিকই এই মহৎ পরিকল্পনায় আগ্রহশীল। আর উপেন্দ্রনাথ যে সকলেরই অগ্রজ। বাংলা সাহিত্যের বড়ো ছোটো সকল সাহিত্যিকেরই তিনি 'উপীনদা'। উপীনদার উন-অশীতিতম জন্ম-জয়ন্তী। আর সেই জন্ম-জয়ন্তীকে উপলক্ষ করে অনুজ সাহিত্যিকদের প্রণাম বঙ্গাব্দ-তহবিলে দান। মহৎ-হৃদয় উপেন্দ্রনাথ সেই দান ভিক্ষা চেয়েছেন নিজের হাতে।

হাজার এক টাকার নজরাণাকে ছাপিয়ে বঙ্গাব্দ তহবিল আরো অনেক স্ফীত হলো।

'উনঅশীতিতম জন্মদিন শতবর্ষের পরমায়ু লাভ করুক !'

উপেন্দ্রনাথ বাধা দিলেন, 'না, তা নয়।'

'প্রশ্নের কথা সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়'

উপেন্দ্রনাথ বাধা দিলেন, 'না, তাও নয়।'

'মানপত্রে সম্বোধন থাকবে না ?'

'না।'—দৃঢ়স্বরে উপেন্দ্রনাথ ব্যক্ত করলেন, 'ওসব আমি অনেক পেয়েছি।'

আমরা বললাম, 'দাদা, জন্মদিনে একটা মানপত্র তো দিতে হবে।'

উপেন্দ্রনাথ বললেন, 'না। যদি সত্যিই কিছু দিতে চাও—দাও তোমাদের ভালোবাসা আর সে ভালোবাসার কথাই শুধু তোমরা ব্যক্ত করো তোমাদের অনুরাগপত্রে। শুধু বলো, উপেন তুমি আমাদের আপনজন, আমাদের অন্তরতম, আমাদের অন্তরঙ্গ।'

উপেন্দ্র জন্ম-জয়ন্তী কমিটির সক্রিয় সদস্য এবং সদস্যা—বাংলাদেশের কয়েকজন সাহিত্যিক যাঁরা সম্বর্ধনা-পত্র রচনা করছিলেন, তাঁরা শেষে সবাই একবাক্যে নিজেদের অন্তর-নিষ্ঠ অনুরাগের ভাষাকেই প্রকাশ করলেন অনুরাগ-পত্রে। ভালো যিনি বাসতে পারেন তিনিই তো শুধু চাইতে পারেন ভালোবাসা। আর সেই ভালোবাসায় পরিপূর্ণ হৃদয় সহজয় উপেন্দ্রনাথ বাংলা-সাহিত্য এবং সাহিত্যিকদের অকৃপণ ভালোবাসাই বিতরণ করে গেছেন।

উপেন্দ্র অনুরাগিবৃন্দের ভাষায় সেই কথাই ব্যক্ত হয়েছিলো।

'প্রিয়, অন্তরের যোগ আমাদের জীবনের মধ্যে সব চেয়ে বড় যোগ। সেই যোগ তোমার সঙ্গে আমাদের। তাই তোমাকে আমরা শ্রদ্ধা করি বললে সবটুকু বলা হয় না। যে অদৃশ্য সেতুর বাঁধনে তোমার ও আমাদের মনের সংযোগ তার নাম ভালোবাসা। সেই ভালোবাসা আমরা পেয়েছি তোমার মুখে, তাই তোমার প্রতিভা ও সৃষ্টিতে আমাদের ভালোবাসার প্রতিচ্ছবিই আমরা দেখি।'

উপেন্দ্র-সাহিত্যেও যে ভালোবাসার মাধুর্য সেটি তাঁর হৃদয়-সাহিত্যের অকৃত্রিম প্রেম। মানুষের প্রতি অবিশ্বাস নয়, ঈর্ষা নয়, দ্বেষ বা বিদ্বেষ নয়; কিংবা হতাশার হতস্বাসও নয়। মানব-প্রেমিক উপেন্দ্রনাথের অন্তর স্নিগ্ধ এই ভালোবাসাই প্রতিদানে অপরের ভালোবাসা আদায় করতে পেরেছিলো।

সেই কবিকেই মানুষ বড় বলে যে এমন সকল বিষয়ে মানুষের চিন্তাকে আকৃষ্ট করেছে, তার মধ্যে নিত্যতা আছে, মহিমা আছে, মুক্তি আছে, যা ব্যাপক এবং গভীর। কলা ও সাহিত্যের ভাণ্ডারে দেশে দেশে কালে কালে মানুষের অনুরাগের সম্পদ রচিত ও সঞ্চিত হয়ে উঠছে। এই বিশাল ভুবনে বিশেষ দেশের মানুষ বিশেষ কালে ভালোবেসেছে, সে তার সাহিত্য দেখলেই বুঝতে পারি। এই ভালোবাসার দ্বারাই তো মানুষের বিচার করা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nothing lives in literature but that which has in it the vitality of creative art; and it would be safe advice to the young to read nothing but what is old.

—*E. P. Whipple.*

সাহিত্য ও সাহিত্যিক

এডোয়ার্ড লিয়রের "ভারত জার্নাল"

সুধীর রায়চৌধুরী

ইনিই কি সেই এডোয়ার্ড লিয়র?—সেই "A Book of Nonsense"-এর অবিস্মরণীয় স্রষ্টা? যাকে শুধু ছ'লে মেয়ে যোগীন্দ্রনাথ সরকার এবং সুকুমার রায় তাঁদের মন-মাতানো ছড়াগুলো লিখেছিলেন? লিয়র হতে চেয়েছিলেন নিসর্গচিত্রশিল্পী। নোজ্‌লের ছেলে-মেয়েদের খুশি করবার জন্যে তিনি খেয়ালখুশিতে কতগুলো ছড়া বানিয়েছিলেন। কিন্তু দেখতে না দেখতে সেগুলো দেশে-বিদেশের সব বয়েসের পাঠকদের হৃদয় লুঠ ক'রে নিলো। কোথায় তলিয়ে গেল লিয়রের শিল্পী হিসেবে খ্যাতি!—যদিও তাঁর ছড়াগুলির ছবি তিনি নিজেই এঁকেছেন, তবু তাঁর নিসর্গচিত্রের খোঁজ আজ বড়ো একটা কেউ রাখে না। একজন সমালোচক লিয়রকে হ্যামেলিনের বাঁশিওলার সঙ্গে তুলনা করেছেন। সত্যি আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাঁর ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে হ্যামেলিনের বাঁশিওলার মতো যেন তাঁর অনুসরণ করছে। তাঁর সাহিত্য-কীর্তির মতো ব্যক্তিজীবনেও তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন।

মানুষের জীবনে আকস্মিকতা যে কতখানি জায়গা জুড়ে আছে তা লিয়র প্রমুখের জীবনী পড়লেই বোঝা যায়। তিনি কোনোদিন কবি বা লেখক হবার কথা ভাবেননি, হতেও চাননি—তাঁর স্বপ্ন ছিল শিল্পী হবার। এবং এক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিলেও ক্রমে-ক্রমে তাঁর এ পরিচয় গৌণ হ'য়ে গেল। অথচ এই শিল্পী হবার অদম্য বাসনায় তিনি চিররুগ্ন হয়েও দুর্গম দেশে যাত্রা করেছেন, আরো কত কৃতি স্বীকার করেছেন। আজ কয়জনে খোঁজ রাখেন যে, "The Family of the Psittacidae (১৮৩১)"-তে তাঁর আঁকা রঙ-বেরঙের পাখি দেখে মুগ্ধ হয়ে ডাচির ত্রয়োদশ আর্ল তাঁকে একদিন নোজ্‌লেতে তাঁদের চিড়িয়াখানোর শিল্পী হবার জন্যে আমন্ত্রণ জানান? এবং এই নোজ্‌লেতেই তাঁর আবোল-তাবোল ছড়া লেখার সূত্রপাত হয়। আর্লের আমন্ত্রণে ১৮৩২ থেকে ১৮৩৬ খৃঃ এই চার বছর লিয়র নোজ্‌লেতে কাটান। এখানে তাঁর বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুতা হয়, যা পরবর্তীকালে খুব কাজে লেগেছিল। লর্ড কার্লিঙফোর্ড, লর্ড নর্থব্রুক, লর্ড ওয়ান্ডারগ্রেভ, লেডি ষ্ট্রেচি প্রমুখের সঙ্গে তাঁর এইখানেই আলাপ হয়। আগেই বলা হয়েছে এখানে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ঠাট্টা-তামাসা করতে করতে এই ছড়াগুলো তাঁর মাথায় আসে।

কিন্তু সেই "old man of Tobago"-র স্রষ্টা শুধু ছড়া তৈরিতেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি চেয়েছিলেন শিল্পী হতে। তাঁর সমাধি-প্রস্তরে খোদাইয়ের জন্য তিনি যে আত্মপরিচয় লিখে গেছেন, তাতে আছে: "A Landscape Painter in many lands." এই ছবি আঁকার নেশায় তত্ত্বাম্বা নিয়েও তিনি গ্রীস এবং ইতালী, রাশ্টা ও জিব্রাল্টার, মিশর এবং প্যালেস্টাইন, ভারত ও সিংহল পরিভ্রমণ করেছেন। গত শতকে দেশ-ভ্রমণ এখনকার মতো সহজ ও আরামদায়ক ছিল না। তার ওপর দেশভ্রমণের বাতিকে ব্যাধির চেয়ে বড়ো বালাই নেই। লিয়রের কী অসুখ ছিল না?

ইগানি, বারোমেলে প্রেমা এবং মৃত্যু। তার ওপর তাঁর কুকুরের ভয়, ঘোড়ায় চড়তেও খুব সাহস পেতেন না, আহাজ এবং সমুদ্র দু-চক্ষের বিষ। কিন্তু তবুও দেখা এতো তীব্র যে কখনো ঘোড়ার পিঠে, কখনো টট বা হাতিতে চেপে, কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো জাহাজে চড়ে হাজার-হাজার মাইল পাড়ি দিয়েছেন। লিয়র যখন ভারতবর্ষে এসেছিলেন, তখন তাঁর বাষট্টি বছর বয়েস। তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে প্রায়ই পাওয়া যায় স্বাস্থ্যের কারণে তিনি অসুস্থ—একেকবার দেশে ফিরে যাবার কথা ভাবছেন। ভারতের আবহাওয়া তাঁর পক্ষে সহ্য হবার কথাও নয়। এখানে এসে আবার তাঁর চোখ এবং হৃদরোগের উপদ্রব শুরু হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখতে পাই কোনো একটা মনের মতো নিসর্গচিত্র আঁকবার আনন্দে তিনি একেবারে বিভোর যে সমস্তক্ষণেই যাবতীয় শারীরিক এবং মানসিক অস্বস্তির কথা ভুলে আছেন। দুর্গম কোথাও যাবার সময় করছেন। নানা কারণে লিয়রের "ভারত জার্নাল" মূল্যবান। প্রথমত, লিয়রের চোখে ভারতবর্ষকে দেখার আগ্রহ আমাদের সবারই রয়েছে। দ্বিতীয়ত, বইটি তাঁর মৃত্যুর বহু পরে প্রকাশিত হয়। এই জার্নালে মুদ্রিত ছাড়া মোট ২১টি ছবি আছে। গ্রন্থটির বিশদ পরিচয় দেবার আগে লিয়রের জীবন-কাহিনী কিছুটা বলে নেওয়া দরকার।

এডোয়ার্ড লিয়র ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ১২ই মে লণ্ডনের হ্যাম্পস্টেডে জন্মগ্রহণ করেন। সব মিলিয়ে তাঁরা একুশ ভাই-বোন—শেষ পর্যন্ত অবশ্য বারোজন বেঁচে ছিলেন। লিয়র কনিষ্ঠতম। তিনি মানুষ হয়েছিলেন তাঁর এক বড়ো বোনের কাছে।

একসময়ে অবস্থা ভালো থাকলেও লিয়রের সময় থেকেই তাঁর পরিবারের অবস্থা প'ড়ে যায়। সুতরাং অতি অল্প বয়েস থেকে তাঁকে জীবিকার সন্ধানে বেরুতে হয়। সবেরো বছরের সময় তিনি হাসপাতাল এবং বিভিন্ন ডাক্তারের আঁকা-টাকার কাজ করতেন। এর পর এক বন্ধুর দৌলতে তিনি জুলজিক্যাল সোসাইটিতে প্রাক্‌টিসম্যানের কাজ পান। আগেই বলা হয়েছে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে তাঁর "The Family of Psittacidae" প্রকাশিত হয়। এই বইতে তাঁর আঁকা নানা রঙ-এর পাখি দেখে ডার্বির আর্ল তাঁকে নোজ্‌লেতে আমন্ত্রণ জানান। ১৮৩০ খৃঃ তিনি রীতিমত নিসর্গচিত্র আঁকা শুরু করেন এবং সাকোক গ্যালারীতে তাঁর একক প্রদর্শনীও হয়। এর কিছুদিন পর থেকে তাঁর স্বাস্থ্য ক্রমশ ভেঙে পড়ে। ইংলণ্ডের জল-হাওয়া তাঁর সহ্য হচ্ছিল না। বন্ধুদের পরামর্শে তিনি রোমে চ'লে যান এবং সেখানে বহু বছর কাটিয়েছিলেন। আঁকা শিখিয়ে তখন তাঁর জীবিকা নির্বাহ হতো। এখান থেকে তিনি দক্ষিণ ইউরোপ এবং প্যালেস্টাইন পরিভ্রমণ করেন। ১৮৪১ খৃঃ প্রকাশিত হয় "Views in Rome and its Environs."

প্রবাসী হলেও তিনি মাঝে মাঝে ইংলণ্ডে এসে থাকতেন। তিনি পূর্বোক্ত গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার কিছুদিন পরে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার চিত্রশিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাঁর তিনটে বই প্রকাশিত হয়, Gleanings from the Menagerie at Knowsley, Illustrated Excursions in Italy এবং A Book of Nonsense. শেষোক্ত গ্রন্থটি তাঁকে রাতারাতি বিখ্যাত ক'রে তোলে। ১৮৫০ খৃঃ ব্রয়েল আকাডেমিতে তাঁর আরেকটি প্রদর্শনী হয়। এর কিছুদিন পর থেকে আবার শুরু হয় ভবঘুরে জীবন। বহু দেশ-বিদেশ তিনি পরিভ্রমণ করেন।

লিয়র অবিবাহিত ছিলেন। অত্যন্ত হাসিখুশি স্বভাবের, বন্ধুবৎসল এই প্রতিভাবান কবি-শিল্পী ১৮৮৮ খৃঃ ৩০শে জানুয়ারি দেহত্যাগ করেন। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে তিনি আত্মপরিচয় দিয়ে গেছেন :

"He has many friends, laymen and clerical,
Old Foss is the name of his cat;
His body is perfectly spherical
He weareth a runcible hat."

লিয়র যে ভারত পরিভ্রমণে এসেছিলেন সেই তথ্যই অনেকের কাছে অজ্ঞাত। কেননা তাঁর "ভারত জার্নাল" সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ভারতের কম জায়গা ঘোরেন নি!—বোম্বাই থেকে বারাণসী, কাশিয়ং থেকে কার্শিকট বহু জায়গার বিবরণ এই জার্নালে পাওয়া যায়। দিনপঞ্জিগুলির বিষয়ও বিবিধ—নিসর্গশোভা, যেখানে-সেখানে বর্ষণিদের জন্ম তাঁতালিপনা, রাত্রে শৃগাল-সঙ্গীত, নগ্ন সন্ন্যাসী, মেয়েদের গোবর নেওয়া, কাশীর ঘাটস, ভারতীয় ইংরেজি, এখানকার হোটেল ইত্যাদি। সবচেয়ে উচ্ছ্বসিত তিনি বৃন্দাবন এবং বারাণসী সম্পর্কে। কাশীতে এসে প্রথম-প্রথম তাঁর ভালো লাগেনি, কেননা বাসস্থান থেকে শহরের দূরত্বের জন্ম তাঁর আঁকার কাজ মনের মতো হচ্ছিল না। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বরের দিনলিপিতে দেখতে পাই তিনি লিখছেন, "Owing to distance from hence to the city, it will evidently be impossible to do much at Benaras and I am half-wild when I think of my folly in coming to India at all." কিন্তু পরের দিন দেখতে পাই তিনি কাশীর শোভা সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখেছেন: "Nothing short of a moving opera scene, can give any idea of the intense and wonderful colour and detail of these Benaras river banks and nothing is more impossible than to represent them by the pencil."

বৃন্দাবন বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা হলো এটি হচ্ছে, "The most wholly Indian and completely picturesque place I have ever seen since Benaras."

লিয়র ভারত পরিভ্রমণকালেই "Cummerbund" কবিতাটি লেখা হয় আর এটি প্রকাশিতও হয়েছিল ভারতবর্ষের "দি টাইম্‌স্ অফ্ ইণ্ডিয়া" পত্রিকায়। "The Akond of Swat" নামক বিখ্যাত পদ্যটিও ঐ পত্রিকার জন্ম লেখা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লিয়র ঐ পত্রিকায় প্রকাশ করেননি। এখানে "The Akond of Swat" থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করার প্রলোভন সংবরণ করা গেল না:

Who, or why, or which, or what, is the Akond of Swat?
Is he tall or short, or dark or fair?
Does he sit on a stool or a sofa or chair or SQUAT
The Akond of Swat?

Is he wise or foolish, young or old?
Does he drink his soup and his coffee cold, or HOT
The Akond of Swat?

Does he sing or whistle, jabber or talk,
And when riding abroad does he gallop or walk or TROT
The Akond of Swat?

কিন্তু এ যাক্। লিয়রের "ভারত জার্নালের" আসল ঐশ্বর্য তাঁর ছবিগুলি। সেগুলির পরিচয় তো পদ্যের চোখ দিয়ে সম্ভব নয়। অতএব লিয়রের অনুরাগী মাত্রেরই কর্তব্য বইটির সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় করা।

ম্যাক্‌সিম গোর্কি ঃ নতুন মানুষের উদ্‌গাতা

"আমাদের আবির্ভাব হচ্ছে দুরাগামী এক জগতের
বিচারক রূপে আর যথার্থ মানবিকতার সৈনিক রূপে।"—ম্যাক্‌সিম গোর্কি

ম্যাক্‌সিম গোর্কির জীবনী সুপরিচিত। তাঁর জীবনকাহিনী—একজন মানুষের শুধু প্রতিভার জোরে আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের ও সাহিত্যচিন্তার শীর্ষশিখরে ওঠার কাহিনী।

বালক বয়সেই আলেক্‌সি পেশ্‌কভ একটি পুরনো রুশ মফঃস্বল শহরে জীবনের প্রথম তিক্ত পাঠ গ্রহণ করেন। তার পরে রাশিয়ার শহর-গ্রাম-প্রান্তরের সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছে কিশোর পেশ্‌কভ। সেন্ট পিটার্সবুর্গের কোলাহলমুখর পথে পথে কেটেছে তরুণ পেশকভের অনেকগুলি দিন, ১৯০৫-এর অগ্নিগর্ভ মস্কোর ব্যারিকেডের পাশে দাঁড়িয়েছে সে। এর পরে এসেছে লণ্ডনে পার্টির পঞ্চম কংগ্রেসের তুমুল বিতর্কের বিবরণ, লেনিনের বক্তৃতাগুলি গভীর দাগ কেটেছে তার মনে।

ইতিমধ্যে "ম্যাক্‌সিম গোর্কি" ছদ্মনামে সে লিখতে সুরু করেছে এই অল্প বয়সেই জীবন সম্বন্ধে তার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা, তার দেখা মানুষগুলির কথা।

আলেক্‌সি পেশ্‌কভ কি ক'রে রূপান্তরিত হল ম্যাক্‌সিম গোর্কিতে? গোর্কির রচনাবলী, তাঁর ব্যক্তিত্ব, জীবনদর্শনের প্রতি দুনিয়া জুড়ে কোটি কোটি মানুষ এমন ভাবে আকৃষ্ট হয় কেন?

গোর্কির ব্যক্তিগত প্রতিভা, তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্ব আর বিপ্লবী আন্দোলনের ব্যাপকতা—যা তাঁকে শক্তি জুগিয়েছিল এই সব তাঁর ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো কথা হল মতাদর্শ, সামাজিক পক্ষাবলম্বন—পার্টিসানশিপ—যা তাঁকে শিল্পী হিসেবে অস্ত্র জুগিয়েছিল ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান—যা তাঁকে মানবপ্রকৃতি অনুধাবনে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছিল।

সামাজিক অন্তর্দৃষ্টি

আপাতদৃষ্টিতে সমাজের যেসব দিকগুলি চোখে পড়ে, গোর্কি তার ভিতরে ঢুকতে পেরেছিলেন, সামাজিক বিবর্তনের কার্য-কারণগুলিকে ভবিষ্যৎদ্রষ্টার অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে বিশ্লেষণ করতে পেরেছিলেন। সমাজের গভীরতর বাস্তবতা তাঁর চোখে পড়েছিল। তাই তাঁর 'মাদার', 'এনিমিজ', 'ইয়েগর বুলিচেভ', 'দি বাই ট্যাণ্ডার' ইত্যাদি রচনায় আমরা দেখি শ্রেণীশক্তিগুলির তীব্র সংঘাতের মধ্যে দিয়ে প্রকাশমান সমকালীন সমাজের মূল প্রকৃতিকে—যে-সমাজে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয় প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। গোর্কির উপন্যাসগুলি তাই একই সঙ্গে নাটকীয় ও প্রেরণামূলক।

সংগ্রামী লেখক হিসাবে গোর্কির জীবনী ও রচনাবলীকে দেখতে হবে সামাজিক পক্ষাবলম্বন সম্পর্কে তাঁর ধ্যানধারণার পটভূমিকায়; সামাজিক আদর্শ প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামের ওপরে তিনি যে অপরিসীম গুরুত্ব আরোপ করতেন, তারই পটভূমিকায়। তিনি লিখেছেন, "মূলগতভাবে শিল্প হল পক্ষে অথবা বিপক্ষে এক সংগ্রাম। নিরপেক্ষ শিল্প বলে কিছু নেই এবং থাকতে পারে না।....." গোর্কির জীবনেও কিছু কিছু ভুলভ্রান্তি যে না ঘটেছে তা নয়। কিন্তু সবচেয়ে শিক্ষণীয় হল এই-যে,

নিজের ভুল উপলব্ধি করার মতো সাহস তাঁর ছিল এবং শুধু তাই নয়, সেই সব ভুলকে দৃঢ়তার সঙ্গে শুধরে নিয়ে তিনি—তাঁরই কথায়—"লেনিন কর্তৃক ব্যাখ্যাকৃত যুগের তাত্ত্বিক সত্যটিকে" প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে আরও একাগ্রতার সঙ্গে সংগ্রামে নেমেছিলেন।

নবীন লেখকদের প্রতি মনোযোগ

অক্টোবর-বিপ্লবের আগে থেকেই গোর্কি তাঁর অনেকখানি সময় ব্যয় করে এসেছেন নবীন লেখকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায়। তাদের লেখা উপন্যাস-গল্পের পাণ্ডুলিপি গোর্কি মনোযোগ দিয়ে পড়তেন, নিজের মতামত ও সমালোচনা দিয়ে তাদের সাহায্য করতেন। এর একটা খুব সুস্পষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। তিনি নিজেই বলেছেন, এর উদ্দেশ্য হল শ্রমিক শ্রেণীর বীশক্তি বিকাশের কাজে সহায়তা করা।

সোভিয়েত শক্তি প্রতিষ্ঠিত হবার পরেও ম্যাক্সিম গোর্কি নবীন লেখকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় দীর্ঘ সময় ব্যয় করতেন; সাহিত্য ও সমাজ সম্পর্কে তাদের মনে দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করতেন; সমস্ত সংঘাত ও পারস্পরিক বিরোধিতা সহ বাস্তবের গতি-প্রকৃতিকে আর তার প্রবাহ প্রবণতাগুলিকে সততার সঙ্গে তাদের বুঝতে সাহায্য করতেন।

তরুণ লেখকদের গোর্কি সব সময়ে বলতেন জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে, জনসাধারণের জীবনের সন্নিকট হতে, নতুন জগৎ যারা গড়ে তুলছে তাদের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে। তিনি বলেছেন, "লেখকদের শুধু দর্শক, শুধুই পর্যবেক্ষক হলে চলবে না। মানুষের মনকে স্পর্শ করতে হবে লেখার মধ্যে দিয়ে, আর এই মনকে স্পর্শ করার অর্থ হল পাঠককে প্রভাবিত করা, জনগণের প্রচণ্ড শক্তির উৎসকে অবারিত করা, তাদের শ্রমশক্তিতে এক তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চারিত করা।" তরুণ লেখকদের তিনি আহ্বান জানিয়েছেন এক নতুন মানুষের আবির্ভাবের দিকে তাদের সমস্ত আবেগগত ও বুদ্ধিগত শক্তিকে সংহত করতে।

বলা বাহুল্য, জীবনের নঞর্থক দিকগুলির প্রতি, মানব চরিত্রের কুৎসিত দিকগুলির প্রতি, গোর্কি যে চোখ বন্ধ করে থাকতেন, মোটেই তা নয়। কিন্তু সাহিত্যে শুধু সেইটেকেই বিবৃত করা সম্পর্কে তিনি নিরুৎসাহ ছিলেন, কারণ মানুষ তার সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সব সময়ে এক মহৎ লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে, সমগ্র ভাবে মানুষ সর্বদাই নতুন ও উচ্চতর মূল্যবোধ অর্জন করছে। সেই জন্যেই গোর্কির লেখায় বারবার "নতুন মানুষের অভ্যুদয়"-এর উল্লেখ এতো বেশি ক'রে লক্ষ্য করা যায়—"এই মানুষের বিকাশের দিকে তাকিয়েই আমি মুগ্ধ হবার, বিস্মিত হবার অধিকার পেয়েছি।"

———

সাহিত্য সংবাদ

যে নায়ক অনুপস্থিত

পবিত্র পাল

সমাজের জন্য যাঁরা ভাবছেন, বিচার করছেন, পরীক্ষা করছেন, পরিবর্তন করছেন—এমন দাবী যাঁরা করতেন তাঁরা এখন আর নেই। আমাদের বলে কথা নেই, বিশ্বময় একই দুর্দশার রাজত্ব। এখন যাঁরা আমাদের সমাজে মাথার মণি, রাষ্ট্র বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিই বলুন আর সংস্কৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞই বলুন, তাঁরা এখন যে-কথাটার তালিম দিচ্ছেন তা হল, নিজের নিজের জন্য গুছিয়ে নাও। এ কথাটা যতটা সহজ এবং নির্দোষ বলে মনে হয়, আসলে তা নয়।

আসলে তা নির্মম এবং নির্মম। আপন স্বার্থসুখের মধ্যে সমাজ নেই, অতএব সমাজের বিবেক, সমাজের চিত্ত বা বিবেকের প্রখর পবিত্রতা বা চিত্তের সজীবতা এসব কথাগুলো তোলা আজ নিরর্থক। ভারতবর্ষ পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা তৈরী করে ধনতান্ত্রিক জীবনের মধ্যে চড়ে 'উন্নয়নের' লক্ষ্যে ধাবিত হয়েছে। 'সমাজতন্ত্র' বলে একটা শব্দ আমরা কেতাবী খোরধার খুঁজে পাই, কিন্তু বাস্তবে আমরা যারা চলি-ফিরি কাজ করি, দেখি চতুর্দিকে যে নিঃসীম অসহায় তাবরাজত্বের দারুণ কথাঘাতে জর্জরিত হতে থাকি তার মধ্যে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের বিন্দুমাত্র প্রতিজ্ঞা নেই। ধনতান্ত্রিক মনোবৃত্তি এমনভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে যে মমত্ববোধ বলে কোন বস্তুই আর আমাদের চিত্তের দারুণ অবসাদগ্রস্ত অবস্থায় কোন রকম শান্তিধারা করতে পারে না। প্রেম, প্রীতি, শ্রদ্ধা, ভক্তি সবই যেন কেমন একটা সংজ্ঞা পেয়ে চলেছে, গভীরে গেলে চাতুর্যের ইঙ্গিত পাই, যে চাতুর্য বাণিজ্য-সেবকের লোভী মনের পৃষ্ঠপোষক।

এমনভাবে যে সমাজ ভেঙে চলেছে, তাকে রোধ করবার জন্য মহৎ বাণী দিতে এ আলোচনায় ঢুকি নি। যে সমস্ত মানবিক গুণগুলোর অভাবের কথা বলা হয়েছে এবং যাদের অভাবের ফলে আত্মসুখসন্ধানে ঘুরিয়াদী, চতুর নতুন মানুষ তৈরী হয়ে চলেছে, সে গুণগুলোকে বাণী দিলেই পুনরায় অর্জন করা যাবে না। সমগ্র সমাজ আমূলপোড়া পাল্টে না গেলে—মূর্খের মত এবম্বিধ আশার ছলনে ভুলে লাভ নেই। এখানে একটা কথা আছে। প্রথমে যা দিয়ে শুরু করেছি, অর্থাৎ সমাজের জন্য ধ্যান, বিচার, পরীক্ষা, পরিবর্তন প্রভৃতি যে কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে আউড়ে গেছি, তা যা করলে কিন্তু আবার সমাজব্যবস্থা পাল্টাবে না। নিজের নিজের 'ক্যারিয়ার' নামক সোনার হরিণের সন্ধানে ঘুরে ঘুরে হতে হয়ে যদি কেউ 'জীবনযাত্রার মান' নামক একটি অস্পষ্ট কথার মান রক্ষায় সফল হতে পারেন, হউন তাতে কিবা এসে যায়। কিন্তু তাকে সমাজের কল্যাণ সাধনের কাজে আশা করবেন, এ—মূর্খ ইচ্ছা যেন আপনার না হয়।

আমাদের দেশের কিছু কিছু রাজনীতি কর্মী আছেন, যাঁরা সযত্নে নিঃশঙ্কে ছাত্রজীবনের তীক্ষ্ণ ঔজ্জ্বল্যে ভবিষ্যতের ছবি খুঁজেন নি। ভবিষ্যতের ছবি—একটি মনোরম চাকরী, যে চাকরী তাকে এনে দেবে সুন্দরী স্ত্রী, একটি সুন্দর কার্পেট মোড়ানো গৃহ, যার কক্ষের দেয়ালে দেয়ালে থাকবে শিল্পবোধের

আকবরসমূহ, একখানা গাড়ী, দুটি সন্তান, রেফ্রিজারেটার, এয়ার কণ্ডিসনড্, ব্যবস্থা, শনিবারে বেড়াতোয়ায় সারারাত কাটিয়ে রোববার বেলা বারোটায় ঘুম থেকে ওঠা ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সে কর্মীরা ধনীর নেতাদের নানা ছলাকলায় মাঝে মাঝে নিজেদের জীবনের ভিত হারিয়ে ফেলেন, সবকিছুর বিনিময়ে যে নির্লোভ রাস্তা তাঁরা বেছে নিয়েছেন তার পরিণতি কি এই? নেতারা জনকল্যাণের নামে আসলে নিজের নিজের সুখ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। এবং ক্ষমতার লোভে অন্ধ হয়ে বার বার নিজেদের রাস্তাকে অপরের 'কিস্তি মাতের' মুখে ফেলে দিয়ে তাদের জিততে সাহায্য করেন।

তাহলে কি সব কিছু শেষ হবে এক অসহায় হাল ছেড়ে দেওয়া নিশীথ অন্ধকারে? আমি এত কথা তুললাম, সাহিত্যিকদের দিকে বিনীত নিবেদনটুকু জানাবার জন্যে। তা হ'ল, নির্মম নির্মম নতুন মানুষরা যখন সমাজের সর্বস্তরে খুঁটি তুলে নেবার চেষ্টা করছে, তাতে তাদের আপাত লাভকেই চরম লাভ বিবেচনা করে আসলে এরা অন্ধ হয়ে আত্মহননের পথে যাচ্ছে। এ নতুন মানুষদের হুবহু অঙ্কন করে, তাতে শিল্পবোধের চরম উৎকর্ষ দেখালেও বৃদ্ধ বয়সে 'শিল্পীর স্বাধীনতা' নামক একটা দুর্বোধ্য শব্দ নিয়ে মাথা ঘামানো ছাড়া সাহিত্যিকদের আর কোন অবলম্বন থাকে না। তারা নৈরাত্মবাদ, নৈরাজ্যবাদ, অস্তিবাদ প্রভৃতি 'বাদ' নিয়ে চীৎকার করেন। কিন্তু আশ্চর্য এ শব্দগুলো সম্পর্কে আমাদের সাহিত্যিকদের কোন ধারণাই নেই। কিন্তু কাম্যু বা সার্ত্রের জীবন তাঁদের আকৃষ্ট করে না বা তাঁদের প্রগাঢ় জীবনবোধ। হতে পারে কাম্যু বা সার্ত্র বহু বিতর্কের ঝড় তোলার মত পুরুষ, কিন্তু তাঁরা যা চিন্তা করেছেন তার মধ্যে শক্তি আছে, জীবনের সার্থকতা সন্ধানে তাঁরা গবেষণাগারের রিসার্চকর্মীর মতই কাজ করেছেন।

কথা হ'ল শিল্পের জন্য তাঁরা যত ইচ্ছা স্বাধীনতার লড়াই তুলুন, কিন্তু সে শিল্পটাকে জীবন-বোধের লক্ষ্যে বাধিত হতে হবে। জীবনবোধটা খুঁজবার জন্য নর্দমায় মুখ থুবড়ে না পড়েন, বরঞ্চ জীবনবোধের পথে যে নর্দমাগুলো আছে সেগুলোকে উড়িয়ে দেবার কথা ভাবুন। এক নর্দমা থেকে ক্লিন্ন দুঃখে মধ্যবিত্ত ভাববিলাসিতায় রসিকতা করে আর এক নর্দমায় পতিত হলে তাতে শিল্পীর স্বাধীনতা অর্জিত হয় না। বরং তাকে বলি, এ শিল্পীর স্বাধীনতা নয়, শিল্পীর বিলম্বগামিতা। সব শেষে যা দাঁড়াল, তা হ'ল, আমরা সে নায়কের উপস্থিতি চাই বাংলাসাহিত্যে; যে নায়ক নয় এ নতুন আত্মসুখপরায়ণ সমাজচেতনাবর্জিত খুঁজিবাদের নষ্ট সন্তান, যিনি আজো আসেন নি, অথচ যাঁর প্রয়োজন প্রতি মুহূর্তে আমরা বোধ করি। এবং তিনি সমাজের মোড় ঘুরাবার জন্য ঝড়ো হাওয়ার দুর্দান্ত বেগে সমাজমঞ্চে উপস্থিত হয়ে সমস্ত অন্ধকার ভস্ম করে দিতে পারবেন। সে নায়ক-যে চলচ্চিত্রের নায়কের মত সুদর্শন হবেন, অথবা ধনীর সন্তান, তা নয়। অলৌকিক অর্থে সমস্ত গুণগুলির সমাবেশ ঘটবে তার মধ্যে এমনও নয়। দোষ ত্রুটি, উত্থান পতনের মাঝেও যিনি জীবনের সমস্ত প্রশ্নগুলোকে সুদৃঢ়ভাবে বিচার করবেন, উত্তর দিবেন, সে প্রশ্নগুলো দিয়ে পরিবর্তনের বহ্নি প্রজ্বলিত করবেন। কিন্তু তিনি পরাজিত হলেও যেন থাকেন বহ্নিমান আগন্তুক। বহ্নিমান আগন্তুক বললাম একারণে, তিনি চলমান জীবনের মাঝে কিছুতে বিলীন হবেন না এবং লক্ষ্যের সন্ধানে পরাজিত হলেও তার ভেতরবহ্নি জ্বলতে থাকবে। সে ভেতরবহ্নির সামান্য ছোঁয়াচ নিয়েই কেন এমনধারা আগন্তুক আরো বহু জন্ম নিতে পারেন। সে বহ্নিমান আগন্তুকের 'কেমনধারা' পুরুষ সো তুমি' ভূমিকা সমাজের কল্যাণের মূর্তিটিকে নষ্ট করবে না বরং শত পরাজয়েও সে মূর্তিটা আরো বেশী উজ্জ্বল, স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

এ নায়ক নতুন পরিবেশে যে এক এবং অভিন্নই হবেন তা নয়। মৌলিক গুণগুলির উপর দাঁড়িয়ে বহু রকম নায়ক হতে পারেন। সাহিত্যিকরা বড় শিল্পী। তাঁরা আমার চেয়ে ঢের ঢের গুণ বেশী বুঝেন, গভীরে যেতে পারেন এবং ব্যাপ্ত হতে পারেন। যে বিরাট অভাবের দুর্দান্ত অনলে সমাজ পুড়ছে, আমি তার বিন্দু রূপ দিতে চেষ্টা করলাম, সাহিত্যিকরা তাকে সিন্ধুতে পরিণত করবেন, এ ত স্বাভাবিক।

এ অনুপস্থিত নায়ক না হলে আমাদের সামনে দারুণ অমানিশা। এবং সাহিত্য-পাঠের প্রয়োজনীয়তাও যেন নিঃশেষিত হতে আজ চলেছে। হ্যাভলক এলিস-ফ্রয়েড যেখানো খিচুড়ি তত্ত্বের জন্য কিছু পাঠক আছেন। কিন্তু আজ তাঁরাও ক্রমান্বয়ে দীর্ঘদিন এ তত্ত্বে মুখ গুঁজে রাখার ফলে তাঁদেরও দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এলিস-ফ্রয়েড ফ্রয়েড তাও যদিবা বৃহত্তর সমাজ সমস্যার কোন রকম সমাধানমূলক প্রচেষ্টা থাকত বঙ্গদেশের বুদ্ধিজীবীমহল অতি আধুনিকদের। তা নেই, তার ফলে তাঁদের উত্তম ক্রমাক্ষয়ে জীবনদর্শনের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছে। কেননা ক্রমাক্ষয়ে জীবনদর্শন আদৌ সম্ভবে না। তাতে মহিলাদের সারায় স্ত্রীলের উপমাই ঘুরেফিরে বার বার আসে।

"ঈশোপনিষদের যে মন্ত্রটীতে পিতৃদেব প্রথমে দীক্ষা পেয়েছিলেন, সেই মন্ত্রটি বারবার নতুন অর্থ নিয়ে আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে, বারবার নিজেকে বলেছি— তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, মা গৃধঃ ; আনন্দ করো তাই নিয়ে যা তোমার কাছে সহজে এসেছে, যা রয়েছে তোমার চারিদিকে, তারি মধ্যে চিরন্তন লোভ করো না। কাব্য সাধনার এই মন্ত্র মহামূল্য। আসক্তি যাকে মাকড়সার মত জালে জড়ায় তাকে জীর্ণ করে দেয়, তাতে গ্লানি আনে, ক্লান্তি আনে। কেননা আসক্তি তাকে সমগ্র থেকে উৎপাটন করে নিজের সীমার মধ্যে বাঁধে—তারপরে তোলা ফুলের মত অল্পক্ষণ পরেই সে ম্লান হয়ে যায়। মহৎ সাহিত্য তোমাকে লোভ থেকে উদ্ধার করে, সৌন্দর্যকে আসক্তি থেকে, চিত্তকে উপস্থিত সন্তোষের দাসত্ব থেকে। রাবণের ঘরে সীতা লোভের দ্বারা বন্দী, রামের ঘরে সীতা প্রেমের দ্বারা-মুক্ত, সেইখানেই তাঁর সত্যপ্রকাশ। প্রেমের কাছে মেয়ের অপরূপ রূপ প্রকাশ পায়, লোভের কাছে তার স্থূল মাংস।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অবশেষে

রেণুকা চক্রবর্তী

এত সাবধানী অতনুর শেষ পর্যন্ত হুঁশ হারালেই। অথচ অতি বড় শত্রুও অতনুকে অসাবধানী বলতে পারবে না। এত সতর্কতা সত্ত্বেও হারানো একেবারেই অতর্কিতে। সে ঠিক করে রেখেছিল, প্রেমে-টেমে কোন দিনই পড়বে না। এ-সব ছাবাদী তার অসহ্য লাগে। ভাবতেই তার হাসি পায়, বুদ্ধিমান মানুষগুলিও প্রেমে পড়লে এমন বোকা হয়ে যায় কি করে? দুজনে যখন কথা বলতে থাকে বিশ্ব সংসার তখন তাদের চোখ হতে একেবারে মুছে যায়। অনর্গল কথা, তার না আছে কোন মাথা না মুণ্ডু। কখনো হাসে, কখনো কাঁদে। উপসর্গ যে কত, আর এক উপসর্গ হল দু'জনে মিলে ঘোরা। আজ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, কাল কার্জন পার্ক। রেস্তরাঁ দিনেরা, এতদ্ভুপরি চিঠির আদান প্রদান। প্রায় প্রতিদিন যাদের দেখা হয় তাদের আবার চিঠি লেখার কি দরকার হতে পারে তা অতনু কল্পনাই করতে পারে না।

প্রেমের পাঁয়তারা অতনুর আর জানতে বুঝতে বাকী নেই, অনেক গল্প পড়েছে, অনেক শুনেছে, চোখেও দু'একটা ঘটনা দেখেছে। চাক্ষুষ সে দেখেছিল প্রাণতোষকে। অতনুরই দূর সম্পর্কের ভাই হয়। শিলিগুড়িতে কাজ করে। জ্যেঠাইমার অসুখ বলে টেলিগ্রাম করে আনানো হয়েছিল, এসেই তার কি ছটফটানি, কেন না কাজ আছে। কাজ যে কি পরে অতনুকে সবই বলেছে। প্রাণতোষ পরিণামী করে সাজত। অতনু সভীর বিস্ময়ে বলত, সেকি তুই পুরুষ মানুষ হয়ে পো পাউডার মাখিস?

প্রাণতোষ মুচকি হেসে বলত, কেন পুরুষ হয়েছি বলে কি চুরি করেছি? সুন্দর করে না সাজলে আরেক জনের চোখে সুন্দর হব কি করে?

অতনু হাঁ করে চেয়ে থাকত।

প্রাণতোষ বলত, বুঝবি নে; এখন বুঝবি নে, সময় আসুক। তারপর প্রাণতোষের কাছে শুনেছিল স্বপ্নার কথা। স্বপ্না মেয়েটির নাম নয়। প্রাণতোষ এই কবিত্বময় নামটি দিয়েছে, 'আমার জীবন-স্বপ্ন।' স্বপ্নার কথা বলতে বলতে প্রাণতোষ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত, ওর মুখ চোখের চেহারাই বদলে যেত। কত কথাই সে বলত শুনতে শুনতে অতনুরও মনে হত বুঝি এক অপরূপ রূপলাবণ্যবতী রাজকন্যার গল্পই শুনছে। প্রাণতোষের পকেটে একখানা রুমাল ভাঁজ করা থাকত। একদিন খুলে অতনুকে দেখিয়ে বলেছিল, দেখ, কি অপূর্ব হাতের কাজ। দেখিয়ে পরম যত্নে রুমালখানা ভাঁজ করে পকেটে রেখেছে, যেন ওখানা রুমাল নয় খাঁটি স্বপ্নাকেই ও পকেটে পুরছে।

অতনু কিন্তু ওই রুমালের বিশেষত্ব কিছুই বুঝতে পারেনি। অতি সাধারণ ছুটি পাতা ফুল, এক কোণে প্রাণতোষের আদ্যাক্ষর। এ রুমাল কি করে এমন মহিমান্বিত হল কে জানে। এতে

অতনুর প্রেমের ব্যাপারটা আগাগোড়াই কাঁকি মনে হয়েছে। এর ভেতর সত্যের কোন স্থানই যেন নেই, কেবল কতগুলি কাল্পনিক বুদ্বুদ্। পাগলামী ছাড়া একে আর কি আখ্যা দেয়া চলে?

মানুষ যে ভাবে প্রেমে পড়ে, যেমন কলেজে মেয়েদের সঙ্গে, অফিসে মেয়ের সঙ্গে, ছাত্রীর সঙ্গে, পাশের বাড়ীর মেয়ের সঙ্গে অতনু এদের থেকে সাত হাত দূরে থাকত। সবক্ষেত্রে শারীরিক দিক থেকে এতটা দূরত্ব রক্ষা করা না গেলেও মনের দিক থেকে পুষিয়ে নিত। আর অতনু স্কুলেও কখনো কোন ছাত্রীকে বিজ্ঞানান করেনি। এভাবেই মর্যাদাটি বাঁচিয়ে চলছে।

মা ছেলেকে নিয়ে গর্ব করেন, আজ কালের দিনেও এমন ছেলে হয়?

'বোনেরা বন্ধুদের নিয়ে দাদার সঙ্গে ঠাট্টা ইয়ার্কি করতে গিয়ে থমকে যায়।

অতনু অফিসে চলছিল, এ্যাক্সিডেন্টে পড়ল। হাসপাতালে ভর্তি হয়ে গেল। পায়ের হাড় ভেঙে গিয়েছে। ডাক্তারেরা যথাকর্তব্য করে প্লাষ্টার করে শুইয়ে দিয়ে চলে গেল। চলল কিছুদিন হুলুস্থুল্, বাড়ীর লোকের টানা-পোড়েন।

আমার পাঠকদের উল্লাস দেখতে পাচ্ছি, আপনারা বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে ভাবছেন, মার্সের সঙ্গে ছয় হারাল এইত? সবিনয়ে নিবেদন করছি, আজ্ঞে না। মার্সরা যখন টেম্পারেচার নিত, পালস্ দেখত বা স্পঞ্জ করাত তখন অতনু শক্ত হয়ে কোন ক্রমে চোখ বুজে শুয়ে থেকে এ উপদ্রব সহ্য করত। সেখানে কোন বিপদ ঘটেনি, ঘটল অপ্রত্যাশিত ভাবে।

আজ কাল প্রেমিক প্রেমিকার বয়সোল্লেখ নিষিদ্ধ। ডাক্তার মালবিকা মিত্র এসে যখন জিজ্ঞেস করলে, 'কেমন আছেন?'

অতনুর মনে হল যেন জলে-তরঙ্গ বেজে উঠল, যেন শত শত কোকিল ডেকে উঠল। সুরের মূর্ছনায় মোহিত অতনুর পালস্ দেখতে অবশ হাতখানা তুলে নিলে অতনুর বিদ্যুৎপৃষ্টের মত অনুভূতি হল। মালবিকা মিত্র যখন হার্ট দেখছিল, তখন হার্ট লাফাচ্ছে। কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল, জলটি ছুঁড়ে মিস্ মিত্র কাবেদ হয়ে বসল। মালবিকা মিত্রই অতনুর ধ্যান জ্ঞান হয়ে উঠল, সমস্ত দিন উন্মুখ হয়ে থাকে কখন মালবিকা আসবে। তাঁর একটু ছায়া দেখলে, কণ্ঠস্বর শুনলে আনন্দের বান ডাকে। কি মিষ্টি নাম 'মালবিকা'। মাঝেই যেন মধু ঝরে। তাদা পা থানাকে অবজ্ঞ করবার দেয়। পা থানাতে হাত বুলিয়ে বলে, তাগো তুই অধম হয়েছিলি। সমস্ত দুনিয়ার চেহারাই বদলে গেল। দুনিয়ায় যে এত হাসি এত গান আছে তা অতনু এমন করে কোনদিন উপলব্ধি করেনি। হাসপাতাল অতনুর কাছে স্বর্গ বলে মনে হয়।

অতনুর যখন এমনি হাবুডুবু অবস্থা, সে সময়ে হল সত্যিকার বিপদ, ডাক্তার অতনুর পা খুলে বললে পা ঠিক হয়ে গিয়েছে, আপনি এখন যেতে পারেন।

অতনুর মাথায় বজ্রাঘাত হল, বললে, এরই ভেতর ছেড়ে দেবে হয়ে গেল?

ডাক্তার হেসে বললেন, আরো কিছুদিন থাকতে চান? আপনি বলছিলেন আপনার ছুটির অসুবিধা হবে?

না—না, ছুটি আমার অনেক জমা আছে, সে জন্য ব্যস্ত হবেন না। আসে আস্তে তারপরে অতিধীরে।

আসলে আরো কিছু দিন রাখার দরকার ছিলই। ডাক্তার বলতে করার জন্যই বলেছিলেন। অতনু যে মিস্ মিত্রের প্রতি আকৃষ্ট তা এঁদের নজর এড়ায়নি। ওরা আরো দু সপ্তাহের জন্য ষ্টাটার করলে।

অতনু আরো কিছুদিন থাকতে পেয়ে বর্তে গেল। তারও হল এ তার কি দুরারোগ্য ব্যাধি হল। মনে মনে অনেকবার তালিম দিলে হাসপাতাল থেকে চলে গেলেই এ সব উৎপাত থাকবে না।

মালবিকা মিত্রের বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা নেই। সে কিছু অদৃষ্টস্পর্শী নয়। মেডিকেল কলেজে দীর্ঘ পাঁচ বছর ছাত্র ছাত্রী মিলে একই সঙ্গে অধ্যয়ন করেছে। তার পরও ছেলেদের সঙ্গেই কাজ করেছে, কোন দিনই কিছু অসুবিধা হয়নি। কিন্তু আজ ক' দিন ধরে তারও মনে হচ্ছে কণী যেন তাকেই বিশেষ ভাবে চাইছে, আর এই সংক্রামক ব্যাধি যেন তাকেও স্পর্শ করতে চাইছে। বন্ধুরা ঠাট্টা করে করেই যেন ব্যাপারটা সত্যে পরিণত করে তুলছে। আজ কাল বহু কাজের মাঝেও চোখের উপর ভেসে ওঠে দুটি আঁখির শঙ্কিত মুগ্ধ দৃষ্টি, দৃষ্টির মালিকও চুম্বকের মতই আকর্ষণীয়। ভাবতে এই নবীনা ডাক্তারও যেন কেমন শিহরণ অনুভব করে।

সেদিন সমস্ত দিনেও মিস মিত্রকে দেখতে না পেয়ে অধীর আগ্রহে অতনু একটি নার্সকে বলেই ফেলল মিস মিত্রকে আজ দেখছি না যে? অসুখ নাকি?

নার্স মুচকি হেসে বললে, ডাক্তারদের কি আর অসুখ হলে চলে, সে ছুটি নিয়েছে।

অতনুর দুনিয়া অন্ধকার হল। হাসপাতাল মুহূর্তে নরক বলে মনে হল। সে দুহাতে মাথা পড়ে রইল।

এঁ ভাবেই ক'দিন কেটে গেল আবার শুনলে সেই সুমধুর সঙ্গীত 'কেমন আছেন'?

অতনুর রুদ্ধশ্বাস নাচিয়ে উঠল। সমস্ত প্রাণমন যেন ব্লটিং পেপারের মত সে স্বরের আনন্দ চুষে নিলে। অভিমান ভরে বললে, আপনি কোথায় চলে গিয়েছিলেন, একবার বলেও যান নি।

'সব কথাই কী সকলকে বলা যায়?'

ক্ষমা করবেন, আপনার ব্যক্তিগত জীবনের কথা জিজ্ঞেস করা আমার যে অধিকার বহির্ভূত, আমে তা বুঝতে পারিনি।' মালবিকা তখন অন্য বেডের রোগীর দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন।

রাউণ্ড দিয়ে ফিরবার পথে অতনুর দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললে, আর খানিকটা বাদেই আপনার ডিসচার্জ সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর একটা উপদেশ দিই, এইবার মেয়ে শুদ্ধে একটা বিয়ে-থা করুন। আর শরীর-মনকে দেখাশুনা করার জন্যে একজন ভালো মেয়ে দরকার—আপনার বাড়িতে বোধ হয় তা নেই।

অতনু দেখলে মালবিকার সিঁথিমূলে সদ্য আঁকা সিঁদুরের রেখা জ্বলজ্বল করছে।

রঞ্জন-রশ্মি

শ্রীরমণীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

অর্ডার সিট থেকে কলম তুলে নিয়ে মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব একবার চাইলেন। তখনও আসামী পক্ষীয় উকিল সত্যব্রতবাবুর অনুরোধ ওর কানে বাজছিল। "স্যার, সাজা দেবার আগে, অনুগ্রহ করে ওর বয়সটা একবার চিন্তা করে দেখবেন।"

আসামীর কাঠগড়ায় আঠার বছরের একটি সুন্দরী মেয়ে। মেয়েটির চোখে মুখে শংকা ফুটে উঠেছে। বড় বড় চোখ দুটো জলে ভরে গেছে। ম্যাজিষ্ট্রেট হুকুম দিতে গিয়েও কেন জানি হুকুম দিতে পারলেন না। স্থির দৃষ্টি নিয়ে তিনি চেয়ে ছিলেন অভিযুক্তের দিকে। তিনি ভাবতে লাগলেন মেয়েটির কথা। এ-রূপ নিয়ে সে যাবে কোথায়? জেলখানায়? ওঁর মন যেন্নায় ভরে উঠল। না—না—না। তাতো হতে পারে না। জেলখানায় পাঠালে সে যে ওখানেই শেষ হয়ে যাবে। কতগুলো ক্রিমিন্যালের মধ্যে তাকে যে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে যে শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যই বিফল হবে।

বাইরে দীপ্ত মধ্যাহ্নের সূর্য তখন ক্ষেপে গিয়েছে। গাছের একটা পাতাও নড়ছে না। রৌদ্রের রঁাঝ তেমনি।

পেস্কারবাবু, প্রোবেশন-অফিসার মিঃ মুখার্জিকে একবার খবর দিলতো। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তখনও ভাবছিলেন মেয়েটির কথা।

মিঃ মুখার্জি এলেন।

"মিঃ মুখার্জি, আসামীকে দেখলেন?"

মিঃ মুখার্জি চাইলেন মেয়েটির দিকে। বিস্মিত হলেন তিনি। বললেন, দেখেছি স্যার।

"আশ্চর্য মিঃ মুখার্জি। শুনানীতে একথা প্রমাণ হয়নি কেন মেয়েটি ওর পাড়াপ্রতিবেশী বয়েসের চোখে মুখে নাইট্রিক এসিড ছুড়ে দিয়েছিল।"

"স্যার, মেয়েটি কি দোষী সাব্যস্ত হয়েছে?"

"সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই মিঃ মুখার্জি। ওকে শাস্তি দিতে গিয়ে একবার আপনার কথা ভাবলাম। দেখুন তো ওকে আপনাদের এক্তিয়ারের মধ্যে আনা যায় কি না। আপনি তদন্ত করে আমাকে রিপোর্ট দিন। দেখা যাক ভয়া-ডুবি থেকে ওকে বাঁচান কতদূর সম্ভব।"

মিঃ মুখার্জি গিয়ে দাঁড়ালেন মেয়েটির সামনে। স্বভাবসিদ্ধ হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? সহানুভূতি নিয়ে আবার বললেন, তুমি আমার মেয়ের বয়সী। তুমি যেমনভাবে রাগ করলে মাত্তো?

কালো মেঘে ঢাকা আকাশের ছোঁয়াচ লেগে বর্ষণ সুরু হল। দু'চোখ ছাপিয়ে চোখের জল নেবে এল মুষ্টিবদ্ধ হাতের উপর। শীলা এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। সে বুঝতে পেরেছিল, ওকে নিয়েই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মিঃ মুখার্জির সাথে কি যেন পরামর্শে ব্যস্ত। আজ প্রায় চার মাস যাবৎ সে জেলখানায় বিচারাধীন কয়েদি। জেলখানার পরিবেশে সে হাঁপিয়ে উঠেছে। সবাই ওর দিকে চেয়ে

থাকে। সবাই জিজ্ঞেস করে, এত ধন পেলে কোথায়? মেয়ে কয়েদিরা ওকে কত পরামর্শ দিয়েছে। জেলখানা থেকে মুক্তি পাবার পর কেউ কেউ বা ঠিকানা মতো দেখা করতে বলেছে। ওর সামনে তুলে ধরেছে জীবনের কত রঙীন স্বপ্ন। ওদের কথাগুলো শুনে সে চিৎকার করে কানে হাত দিয়ে বলেছে, না—না—না। আমি তোমাদের কথা শুনতে পারব না।

চিৎকার করে কারাকক্ষের অন্তরালে সে কাঁদতে থাকে। বাবা বড় রোগা হয়ে গেছেন। একদিন দূর থেকে চোখের জল ফেলে চলে গেলেন। আর তিনি আসতে পারেন নি। হয়তো বা ওর কাছ থেকে মর্মান্তিক আঘাত পেয়েই শেষ দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন। স্বামী একদিনও এলো না, একটু খোঁজও নিয়ে গেল না। আত্মীয় স্বজন, কেউ তো এলো না। তারপর আরম্ভ হল বিচার। একজন নব্য উকিল স্বেচ্ছায় এসে দাঁড়ালেন। কেসটি শুনবার পর তিনি ওর হয়ে যোকদ্দমা লড়তে লাগলেন।

সাক্ষী দিতে এসে ওর স্বামী অনেক কথাই বলে গেল।

অনেকক্ষণ ধরে সে চেয়েছিল তাঁর দিকে কিন্তু একবারও ওর দিকে সে চাইল না। কঠিন আবেষ্টনীর মধ্যে কোথাও সে একটু সান্ত্বনা খুঁজে পায় না। সবাই চায় ওর সৌন্দর্যকে।

এ কাঠিন্যের মধ্যে মিঃ মুখার্জির কাছে একটু সহানুভূতি পেয়ে সে ভেঙে পড়ল। অভিজ্ঞ মিঃ মুখার্জি বুঝতে পারলেন, হয়তো পুকুরের পাঁকে মুক্তা বুকে নিয়ে ঝিনুক কোথাও লুকিয়ে রয়েছে। সে মুক্তা তুলতে গেলে হাতে পায়ে একটু কাদা লাগবে, এতো অতি সাধারণ কথা। মুক্তা যখন ফুটে বেরুবে, তখন ঝিনুকের পরিচয়ে কোন দরকার আছে কি? মুক্তা তার আপন পরিচয়েই হেসে উঠবে। সে হাসিতে হয়তো আরও কত মুক্তা ঝরে পড়বে। আরও হয়তো অনেক কথাই জিজ্ঞেস করার ছিল, কিন্তু শীলার চোখে যে ভাষা স্বভাবসিদ্ধ ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, সেটুকুই মিঃ মুখার্জির পক্ষে যথেষ্ট। মিঃ মুখার্জি মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে কিছু দিনের সময় প্রার্থনা করে বললেন, স্যার, আমি তদন্ত করে শীঘ্রিরই আমার রিপোর্ট পেশ করব।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আদেশ মুলতুবি রেখে, সে দিনের মতো কোর্টের কাজ সমাপ্ত বলে ঘোষণা করলেন।

* * * *

প্রভাতের সূর্যরশ্মি তখনও প্রখর হয়ে উঠে নি। ঘোষপাড়া পল্লীর মধ্যে মিঃ মুখার্জিকে দেখে রঞ্জন চমকে উঠল। সে আরও বিস্মিত হল, যখন মিঃ মুখার্জি ওরই কাছে জানতে চাইলেন, সে শীলাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত কিনা।

রঞ্জন সজোরে দু'হাত নেড়ে বলল, না—না। আপনি কি বলছেন? শেষটায় কি আমাকে মেরে ফেলতে চান?

রঞ্জন, তোমার কী মনে হয়?

উত্তেজিত রঞ্জন একটু লজ্জিত হল। বলল, তা-কি সম্ভব?

মিঃ মুখার্জি চেয়ারে বসে। ওর সামনে ছাব্বিশ কি সাতাশ বছরের যুবক—রঞ্জন কথাগুলি বলছিল।

রঞ্জন বলছিল ওর কথা। স্যার, শীলাকে আমি গ্রহণ করতে পারব না। কিছুতেই না। জোর দিয়েই কথাটা সে বলল। একটু চুপ করে থেকে উদাস দৃষ্টি নিয়ে সে বলতে থাকে। ছোট

বেলা থেকেই অনাদরে এখানে সেখানে ঘুরে ঘুরে বড় হয়েছি। পড়াশুনা বেশী করতে পারিনি। দূর সম্পর্কীয় এক আত্মীয়ের বাড়ি থাকতাম। ওদের সংসারে অনেক কিছু কাজই আমাকে করতে হত। যার চাকরের কাজটুকু পর্যন্ত। জানেন স্যার, কত মার যোর করত ওরা? রঞ্জন যেন একটু মুষড়ে পড়ল। স্কুলে পড়তাম। বেতন লাগত না। ছেলেদের কাছে চেয়ে চিন্তে পুরনো বই নিয়ে পড়তাম। ছাত্র ভাল ছিলাম বলে মাষ্টার মশাইরা ভাল বাসতেন। ফুটবল ভাল খেলতাম, ছেলেরা খুব উৎসাহ দিত। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রঞ্জন আবার বলতে লাগল। স্যার, তখন আমি ক্লাশ টেনে পড়ি। বয়স প্রায় বিশ কি একুশ। চিরদিনই স্বাস্থ্য আমার ভাল। সুযোগ পাইনি, তাই বেশী বয়সে পড়াশুনা আরম্ভ করি। সেখানে কয়েকটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে পড়াতে হতো।

একদিন ভোর বেলা ঘুম হয়ে গেলাম। বাড়ির কর্তার ধাক্কায় সবাই সন্ত্রস্ত। কিছু বোঝবার আগেই বেদম মার খেলাম। অপরাধ? অপরাধ রাত্রিতে বাছুর ছুটে গিয়ে দুধ খেয়ে ফেলেছে। কোন উপায় ছিল না বলে, সে অত্যাচার আমাকে মেনে নিতে হল। নিরিবাদে সহ্য করতে গিয়ে খুব কাঁদলাম। সারাদিন খেলাম না। খেতে ইচ্ছে করল না। পরদিন ভোর হবার আগেই ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। ভাবলাম, রাস্তায় মোট বইব তবুও আর ফিরে যাব না।

পরদিন পথঘাট মানুষের কোলাহলে মুখরিত। গ্রাম্য পরিবেশ ছাড়িয়ে কিছুটা সহর কিছুটা গ্রাম্য আবহাওয়ার ভেতর চলতে শুরু করলাম। বেলা বাড়ার সাথে সাথে বুঝতে পারলাম বেশ ক্ষুধা পেয়েছে। আশ্চর্য, বারীনের সাথে মুখোমুখী দেখা। বারীন দ্রুত চলছিল। কিরে, কোথায় যাচ্ছিস্? চুপ করে থাকতে দেখে বলল, চলনা বেড়িয়ে আসবি।

বললাম, চল্। কোথায় যেতে হবে জানি না।

—তোকে এ সময় পাব ভাবতেই পারিনি। ভালই হল। মামাবাড়ি যাচ্ছি। মামাতো ভাইয়ের বৌভে, বুঝলি? সহসা সে একটু বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞেস করল, কিরে তুই চলছিলি কোথায়?

বললাম, সহরে কাজ আছে। তুই যখন বলছিস্ চল্ তোর সাথে যাই। পরে না হয় সহরে যাব। মাত্র তো তিন মাইল পথ।

তাই হবে। খাওয়া দাওয়া সেরে, যেতে হয় তারপর যাবি।

বারীন আমার সাথে পড়ে। লজ্জায় কথাটা গোপন করে গেলাম।

প্রায় দুপুর বেলা বারীনের মামাবাড়ি পৌছে গেলাম। বাইরে থেকেই মনে হল বারীনের মামার অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। ওকে দেখতে পেয়ে ওর মামাবাবু এগিয়ে এসে বললেন, কী রে এত বেলী যে? আমাকে দেখে বললেন, এ ছেলেটি?

আমার বন্ধু রঞ্জন। পথে দেখা, নিয়ে এলাম। ভাল করিনি মামাবাবু?

হেসে বললেন, বেশ করেছিস বারীন। ওকে নিয়ে বাড়ির ভেতর যা। বারীনের দেখা দেখি ওর মামাকে প্রণাম করলাম। সস্নেহে বললেন, থাক, থাক, সুখী হও বাবা। মামাবাবুর স্নেহে ভেতরটা কেঁদে উঠল। মায়া মমতা বলে কোন কিছুর ছোঁয়াচতো জীবনে কোন দিন পাইনি।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর স্নান করে খেলাম। মনে হল এমন খাওয়া বোধ হয় কোন দিন খাইনি। মামিমার মিষ্টি ব্যবহারে কান্নাই পেল। তিনি বললেন, রঞ্জন, আজকের দিনটা থেকে, কাল সহরে যেও, কেমন? মনে মনে বলেছিলেন, মামিমা যদি তুমি চিরদিন তোমার কাছেই থাকতে বল, তবে আমি না করব না।

কি রঞ্জন, কথা কইছনা যে। মামিমার কথা শুনে বারীন বলল, ওকে আবার জিজ্ঞেস করছ কেন? তোমার কথা কি ও ভুলতে পারে? তারপর আমাকে উদ্দেশ ক'রে বললে, কিরে, কথা কইছিস্ না যে? মাথা নেড়ে বললাম হাঁ, যাব্‌ব। তবে মুখ তুলে চাইতে পারলাম না। চোখের জলে যদি ধরা পড়ে যাই।

উদাস দৃষ্টির মধ্যে ভেসে পরে রঞ্জন বলে উঠল, স্যার, ঐ একটি দিন যার স্মৃতি আজও আমাকে আনন্দ দেয়। বারীনের মামিমাকে আজও আমি ভুলতে পারিনি। মাঝে-মাঝে ওখানে এখনও যাই। সত্যি তিনি আমাকে বারীনের চাইতে কম স্নেহ করেন না। মামাবাবুও আমাকে খুবই ভাল বাসেন। বারীন দিল্লীতে ভাল চাকরী করে। তার পরেই রঞ্জন বেশ উত্তেজিত ভাবে বলে উঠে, জানেন, ঐ মামিমার কথায়ই আমি শৈলাকে বিয়ে ক'রেছিলাম। এখন মামিমা শৈলার কথা শুনলে ক্ষেপে যান। বলেন, ওর কথা আমার কাছে বলিস্ না।

রঞ্জন মাথা নীচু করে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

মিঃ মুখার্জি ধীরে ধীরে রঞ্জনের পিঠে হাত বুলাতে লাগলেন। একটু পরে রঞ্জন আবার বলতে লাগল, খাওয়া-দাওয়ার পর, পরদিন দুপুরের পর সহরের দিকে চলতে শুরু করলাম। সারাটা রাত ভেবেছি, কোথায় যাব, কি করব? কুলির কাজ ক'রে খাব। কথাটা চিন্তা করেছিলাম বটে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বড় কঠিন বলে মনে হলো। সহরে কোনও দিন যাইনি। কোলকাতার নাম শুনেছি, পুঁথি পুস্তকে পড়েছি। শুনেছি লক্ষ লক্ষ লোক সেখানে থাকে। মনে মনে ঠিক করলাম, ভবিষ্যতের অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়ব। আমি বাঁচি কিংবা মরি, এ নিয়ে তো কেউ কাঁদবে না। তবে এত ভয় কিসের?

নীল আকাশ থেকে তখনও তপ্ত ভাস্করের রশ্মি ছুটে আসছিল। রাস্তার পাশে একটা ছোট্ট ঘর। রোদের কাঁজ থেকে রক্ষা পাবার আশায় একটু আশ্রয় নিলাম। ক্লান্তিতে কোন সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নেই। ঘুম ভাঙতেই চেয়ে দেখি একটু দূরে বহু লোক। খেলা হবে বোঝা গেল। ছুট বল নিয়ে ওরা প্র্যাক্‌টিস্ করছিল।

মাঠের চারদিকে লোক জড় হয়েছে। চার কোণায় চারটি লাল নিশান। আনন্দে মন নেচে উঠল। উৎসাহে ছুটে চলে গেলাম। ওদের প্র্যাক্‌টিস্ দেখে পা দুটো খুব সুর সুর করতে লাগল। ভুলে গেলাম আমি কে। সুট্ করে বলটা এগিয়ে এল আমার দিকে। লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। বলটা নিয়ে তীব্রবেগে ছুটে গিয়ে গোল পোষ্টে মেরে দিলাম। গোল-কিপার পরাজিত হল। নেটের ভেতর থেকে বলটা কুড়িয়ে নিয়ে গোল কিপার কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন আমার দিকে। বলটা আমার দিকে গড়িয়ে দিয়ে বললেন, আর একবার মার দেখিনি। এদিক ওদিক চেয়ে দেখলাম। সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখছিল আমার দিকে। আবার মারলাম বল। সাথে সাথে বলটা লুফে নিয়ে সামনের দিকে ছুড়ে মারলেন। তিনি যেন আমাকে উপহাস করলেন। মুগ্ধ ভাবে দাঁড়িয়েছিলাম কতক্ষণ। আবার বলটা তিনি আমার দিকে ছুড়ে দিলেন।

পর পর তিনটে বল মেরে গোল-কিপারকে হারিয়ে দিলাম।

গোলি ছুটে এসে আমাকে দু'হাতে তুলে ধরে বললেন, কোন টিমে খেল তুমি?

বেখলাম গোল-কিপার আমার চাইতে বেশ বড়।

আমায় বললে, তোমার নাম ?

বললাম আমার নাম। হেসে বললেন রঞ্জন, তুমি আমাদের টিমে খেলবে ?

বললাম, খেলতে পারব কি ?

এদিকে মাঠে রেফারী হুইসেল বাজালেন।

সতীশ দা চট করে অমকালো জার্সি আমাকে পরিয়ে দিতে দিতে বললেন, তুমি কি কর রঞ্জন ? বললাম কিছুই না। চাকরী করব। একগাল হেসে সতীশদা বললেন, আজ যদি ভাল খেলতে পার তবে তোমাকে আমিই চাকরী দেব।

সতীশদা চাকরী দেবে। ভবিষ্যতের অন্ধকারে ক্ষীণ হলেও তীব্র আলোর সন্ধান পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। জীবন পণ করে খেলতে লাগলাম। মনে আছে, খেলার মধ্যভাগে বিশ্রামের সময় ক্লান্তিতে হাত পা ছড়িয়ে দিয়ে মাঠের উপর এলিয়ে পড়েছিলাম। সতীশদা এসে বললেন, রঞ্জন, এবার তোমাকে আরও ভাল করে খেলতে হবে। আমাদের খেলা সমান সমান চলছে। ওদের হারাতেই হবে, মনে যেন থাকে। যদি জিততে পারি তবে সাহেবকে বলে তোমায় চাকরী করে দেব, বুঝলে।

খেলা শেষে সতীশদা আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, যাই ডিয়ার রঞ্জন। সবার প্রশংসায় হাবুডুবু খেতে খেতে বললাম, সতীশদা, চাকরী হবেতো ? আমার পিঠ চাপড়িয়ে সতীশদা বললেন, কাল থেকে, খুসী ?

এই সতীশদাই হলেন এ ফুটমিলের কোরম্যান। তখন ছিলেন অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কোরম্যান। ওঁর দৌলতেই আমি আজ সুপারভাইজার। সেদিন আমি একাই দু'টা গোল করেছিলাম। সতীশদা বললেন, তুই আমাকে সতীশদা বলে ডাকবি। সবাই কিন্তু তাঁকে স্যার বলে ডাকত। সেই থেকেই সতীশদা এবং ওঁর স্ত্রী অর্থাৎ বৌদি, আমার সব।

সহসা রঞ্জন বলল, স্যার, একটু অপেক্ষা করুন আমি আসছি। রঞ্জন বাইরে চলে গেল।

মিঃ মুখার্জি ভাবছিলেন তিনি যেন এতক্ষণ কোলকাতার কোনও একটা প্রেক্ষাগৃহে ছবি দেখছিলেন। ইনটারভেল হওয়ায় পরদায় ছেদ নেবে এসেছে।

হাসিমুখে রঞ্জন দু হাতে করে চা ও কিছু খাবার নিয়ে এল। তারপর সুসজ্জিত সিটলেক থেকে চায়ের কাপ এবং ডিস্ বের করে চা এবং খাবার সাজিয়ে দিল।

মিঃ মুখার্জি প্রত্যাখ্যান করে রঞ্জনকে দুঃখ দিতে চাইলেন না। তিনি যে এসেছেন শীলার প্রতিষ্ঠার জন্য। অনিচ্ছুক স্বামীর কাছে স্ত্রীর কাহিনী শোনবার জন্য। রঞ্জনের কথার মধ্যে তিনি খুঁজে চলেছেন কয়েকটি সূত্র। সে সূত্র তিনি কিছুটা আঁচ করতে পেরেছেন। সে সূত্রের সাথে ধীরে ধীরে তিনি গেঁথে তুলতে চাইছেন, রঞ্জন এবং শীলাকে। ওঁর কত আশা, সে সূত্রের বন্ধনে দু'টি প্রাণ সুখী হয়ে উঠবে, জয়যুক্ত হবে।

রঞ্জন, তুমিও খেয়ে নাও।

আপনি আগে, তারপর আমি। চা খাওয়া হল। কাপ ও ডিসগুলো সরিয়ে রেখে রঞ্জন বলল, এ সব জিনিষগুলো সবই শীলা পছন্দ করে কিনেছিল। ঠিক করছি সব বিক্রী করে দেব।

মিঃ মুখার্জি বেশ বুঝতে পারলেন শীলার স্মৃতি রঞ্জনকে বেশ বিচলিত করে তুলেছে।

রঞ্জন, তারপর ?

এর পরের কথাগুলো আর না-ই-বা বললাম। থাক্ স্যার।

রঞ্জন !!!

মাথা নত করে বললে রঞ্জন, ক্ষমা করবেন স্যার। আমি যে ভুলেই গেছলাম আপনি শীলার কথা জানতে এসেছেন। সব কথাই আপনাকে বলব। আপনাকে বললে হয়তো মনে একটু সান্ত্বনা পাব। আচ্ছা স্যার, আমি দেখতে কুৎসিত বলে কি আমি অমানুষ ? আমার মধ্যে কি ভয় মায়া, ভালবাসা কিছুই থাকতে নেই ? শীলা কেন এমন ভাবে নিজেকেও শেষ করল, আমাকেও পথে বসিয়ে দিয়ে গেল ?

মিঃ মুখার্জির দৃষ্টি তখন রঞ্জনের মুখ থেকে খোলা জানালার ভেতর দিয়ে অনেক দূরে কয়েকটা দেবদারু গাছের উপর নিবদ্ধ। বেলা বেড়ে গেছে। তিনি ভাবছিলেন রঞ্জনের কথা। রঞ্জন দেখতে কুৎসিত সন্দেহ নাই। এতটুকু কথা বললেই বুঝা যায় ওর ভেতরটা বড় সুন্দর। অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারি সে। হাসিটি মুখে লেগেই রয়েছে। তবুও কথা বলতে বলতে শীলার স্মৃতি যেন ওকে বড় আঘাত করে। শীলার স্মৃতি সে সহ্য করতে পারে না। ভালবেসেছিল বলেই তো ওর এত দুঃখ। শীলা অপূর্ব লাবণ্যময়ী। অসম পরিস্থিতির ভেতর বর্তমান অবস্থায় শীলার কতটুকু দোষ, কিংবা সে ক্ষেত্রে রঞ্জনই বা কতটুকু দোষমুক্ত, সে কথা জানবার জন্যই তিনি সুষ্ঠু পরিবেশে সব কথা জানতে উদ্‌গ্রীব।

রঞ্জন আবার বলে চলল তার কথা। সওদাগরী চাকরী দিলেন। ফুটবল খেলি। বড় আনন্দে দিন কাটতে লাগল।

বয়স অনুযায়ী আমার শরীরের গড়ন সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করত। মামিমাকে ভুলিনি। মাঝে মাঝে ওঁর কাছে যেতাম। খুবই স্নেহ করেন তিনি। এমনি করে চার পাঁচ বছর কাটিয়ে দিলাম। প্রথম থেকেই ও বাসায় রয়েছি। একদিন মামিমার কথায় শীলাকে বিয়ে করতে হল। খুবই সুন্দরী। আপনি তো ওকে দেখেছেন।

মিঃ মুখার্জি লক্ষ্য করলেন, রঞ্জনের চোখ দুটো অভিমানে ছলছল করে উঠেছে।

তারপর রঞ্জন বলল, শীলাকে মামিমার কাছেই দেখলাম একদিন। মামিমার বোনের মেয়ে শীলা। মামিমা বলছিলেন, রঞ্জন, ছোটবেলা ওর মা মারা যায়। তখন থেকেই সংমার কাছে ও বড় হয়েছে। ওকে আদর করবার কেউ নেই বাবা। তুই যদি ওকে বিয়ে করিস, তবে হয় তো শীলা বেঁচে যাবে। শীলা মাথা নত করে দাঁড়িয়ে নখ খুটছিল। লক্ষ্য করছিলাম শীলা কয়েকবার চাইছিল আমাদের দিকে। কয়েকদিন ঘন ঘন মামিমার ওখানে যাই। শীলাকে আমার ভালই লেগেছিল। সংমার কাছে থেকে কত দুঃখ, তাকে দেখবার কেউ নেই। মামিমার কথাগুলো রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবতাম। বড় দুঃখ হত শীলার জন্য। এতদিন পর হঠাৎ আমার মনে হল, তাইতো, আমিও যে বড় একা। যদি শীলাকে পাই তবে হয়তো জীবনে সুখী হব। সত্যি কথা বলছি স্যার, সেই থেকেই একটু সময় পেলেই মামিমার ওখানে ছুটে যেতাম। একদিন মামিমার কথার উপর বললাম, মামিমা আমার মতো ছেলেকে কি কেউ বিয়ে করতে চাইবে, দেখছেন তো আমার রূপ। মামিমা ধমকিয়ে উঠলেন, রঞ্জন পুরুষের আবার রূপ কিরে ? অটুট স্বাস্থ্য, ভাল চাকরী—এই তো রূপ। তবে স্বভাব সুন্দর হওয়া চাই।

শৈলা কাছেই দাঁড়িয়ে কথাটা শুনছিল।

—একদিন সুযোগ পেয়ে শৈলাকে জিজ্ঞেস করলাম, শৈলা, সত্যি করে বল, আমাকে বিয়ে করতে তুমি রাজী? বিশ্বাস করুন, শৈলা কেঁদে ফেলে বলেছিল, মাসিমা যা বলবেন, তার উপর তো আমার কোন কথা চলে না। কই, আপনার কথা তো বললেন না?

—বলেছিলাম, আমার মতই এক্ষেত্রে বড় নয়। তুমি সুন্দরী! আর আমাকে তো দেখছ।

—লোকে বলে আমি সুন্দরী, কিন্তু এ সৌন্দর্য নিয়ে তো আমি কোথাও সুখী হতে পারলেম না।

তোমার মতামত কিন্তু আমাকে বলছ না। বল, তোমার মত আছে তো? লজ্জায় অতটুকু হয়ে বলেছিল, 'হুঁ'। তারপরই লজ্জায় লাল হয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। বড় ভাল লেগেছিল ওর ছোট উত্তরটুকু।

রঞ্জন সহসা উত্তেজিত ভাবে বলে উঠল, কিন্তু আজ ওর কথা, ওর উপস্থিতি, সহ্য করবার মতো ক্ষমতা আমার নেই। মাথাটা দু'হাতুর উপর রেখে রঞ্জন কেঁদে ফেলল।

মিঃ মুখার্জি রঞ্জনের পিঠে হাত রেখে বললেন, রঞ্জন, তুমি পুরুষ। এমনভাবে ভেঙে পড়লে চলবে কেন?

অশ্রুসিক্ত কণ্ঠেই রঞ্জন বলতে থাকে, বিয়ের কথা শুনে শ্বশুরমা এবং ওঁর স্ত্রী খুবই উৎসাহ দিলেন। বিয়ে করে একদিন শৈলাকে এ ঘরে নিয়ে এলাম। মনে করেছিলাম প্রাণপণে শৈলার মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলব। শৈলা দেখে শুনে সংসার গুছিয়ে নিল। মনে অসীম উৎসাহ নিয়ে কাজকর্ম শুরু করলাম। কয়েক মাসের মধ্যেই শৈলা ঘর দুয়ার সাজিয়ে ফেলল। ওর রুচি ছিল বড় সূক্ষ্ম। মাঝে মাঝে একটু অভিমান করে বলত, তুমি তো সারাটা দিনই বাইরে থাক। তোমার ঘর আগলাবে কে? একবার চিন্তা কর কি? হেসে বলতাম, কেন তুমি। অমনি মুখ ভার করে থাকত। সবাই ঠাট্টা করে বলত, সুন্দরী বৌ পেয়েছ, এবার তোমাকে ভেড়া করে রাখবে। আত্মসম্মানে বড় আঘাত লাগত। প্রতিদিন খেলার আসরে আমার যাওয়া চাই। রাত্রি হয়তো দশটা বেজে যেত। এমনি করে প্রায় এক দেড় বৎসর কেটে গেল। কখনও কখনও শৈলা বেশ জোর দিয়েই বলত, আজ খেলতে গিয়ে কাজ নেই। তখনি মনে পড়ত ওদের কথা, "ভেড়া করে রাখবে"। বলতাম, আমিতো মেয়ে নই যে, ঘরে বসে থাকব।

একদিন সে বলে বসল, এখানে আমার ভাল লাগে না। অন্যখানে বাসা দেখ। ভাবলাম, আমাকে আটকাবার ফন্দি। তা ছাড়া অন্য অসুবিধাও ছিল প্রচুর। বহুদিন যাবত এ পাড়াতে রয়েছি। সবাই আমাকে জানে। নাইট ডিউটীতে শৈলা একা ঘরে থাকে। আমার কোন দুশ্চিন্তা নেই। কিন্তু অন্য পরিবেশে অসুবিধা প্রচুর। বললাম, এখানেই তো ভাল। গম্ভীর হয়ে উঠে শৈলা।

দেখতে দেখতে দু'টা মাস আরও গড়িয়ে গেল। শৈলা আর অন্যত্র যাবার কথা বলে না। মনে করলাম ভালই হল। ডিউটী ছাড়া প্রায়ই এদিক ওদিক যেতে থাকতাম। ইতিমধ্যে শৈলার মধ্যে প্রচুর পরিবর্তন এসে গেছে। রাত যতই হোক, ঘরে থাকত। মান অভিমানে সময় সময় ক্ষুব্ধ হত। দরজায় কড়া নাড়বার সাথে সাথে সে দরজা খুলে দিত। কিন্তু এ সব যেন ধীরে ধীরে কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেল। তখন বুঝিনি। এখন বেশ বুঝতে পেরেছি অনেকদিন থেকেই আমার উপর ওর মায়া মমতা ছিলনা। সেজে গুজে থাকত সে চিরদিনই, কিন্তু ইদানিং যেন ওর সাজ গোছের বহরটা বেশ বাড়াবাড়ি বলে

মনে হত। একদিন বেশ আমার মনে হল কি যেন থেকেও নেই। সুন্দরী বৌ অবশ্য মনের মত নয়। মাঝে মাঝে ছোট খাট ব্যাপারে বেশ বুঝতে পারতাম আমার উপর ওর অবহেলা। আমারও দুর্বলতা ছিল প্রচুর। হয়তো তাই মনে মনে শীলার উপর একটু সন্দেহ হত। পরক্ষণেই লজ্জা এসে বাধা দিত। ভাবতাম এমনভাবে স্ত্রীর উপর সন্দেহ করা ঠিক নয়। তবুও একটু লক্ষ্য রেখে চললাম। হঠাৎ একদিন চমকে উঠলাম। পাশের বাড়ির নরেনের সাথে এত কথা কেন? নরেন আমার সাথেই নাইট শিফ্‌টে কাজ করে। নরেন শিক্ষিত এবং সুপুরুষ। ক্রমেই আমার মধ্যে জ্বালা অনুভব করলাম। নরেন সুপুরুষ—তাই হয়তো শীলা ওর সাথে হেসে হেসে কথা কয়। নরেনের চোখ দু'টো যেন আনন্দে ফেটে পড়ছিল।

মাঝে মাঝেই দেখতাম ডিউটীতে যায়না। অসুখ বলে কৈফিয়ৎ দেয়। আমার মাথার আগুন জ্বলে উঠল। একদিন বাইরে যাবার নাম করে বলে গেলাম একটু বেশী রাতে বাড়ি ফিরব। শীলার চোখে মুখে কোন ব্যতিক্রম দেখলাম না।

মনে শান্তি ছিলনা, তাই লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিলাম। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। নরেন কোনদিন আমার ঘরে যায় না। অবশ্য আমার অবর্তমানে। দেখলাম চুপি চুপি সে আমার ঘরে গেল। মাথার খুন চেপে গেল। আমি তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত। আমাকে দেখে ওরা দু'জনেই হক চকিয়ে গেল। আমি বললাম, কি হে নরেন যে। শীলা পাঁচটা টাকা দাও তো। টাকা নিতে ভুলে গেছি। শীলা টাকা বের করে দিল। লক্ষ্য করলাম টাকা দেবার সময় ওর হাত কাঁপছিল। টাকা নিয়ে দ্রুত চলে গেলাম। আবার দূর থেকে লক্ষ্য রাখলাম নরেন কি করে। দেখলাম নরেন চলে গেল, তবে এদিক ওদিক চাইছিল। বাইরে বাইরে ঘুরলাম। কোথাও মন টিকল না। ছবি দেখতে গেলাম দু'টার শোতে। কিছুক্ষণ পরেই বেরিয়ে এলাম। ক্লাবে গেলাম। কোথাও একটু স্থির হয়ে থাকতে পারলাম না। একবার মনে হল দু'টিকেই কেটে ফেলি। শীলার জন্য দুঃখ হল। ভাবলাম, শীলা হয়তো অন্য কোনও ব্যাপারে নরেনকে ডেকে থাকবে। ভালমন্দ এমন অনেক কথাই আমার মনে উঠা নামা করতে থাকে। তবুও মনের মধ্যে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। অনেক চিন্তার পর ঠিক করলাম বাড়ি গিয়ে শীলাকেই কথাটা জিজ্ঞেস করব। হন্ হন্ করে বাড়ি ছুটে এলাম।

শীলা শুয়েছিল। শব্দ পেয়ে দরজা খুলে দিল। মুখ ভার, কোন কথা বললনা। হাত মুখ ধুয়ে এসে দেখি ভাত বেড়ে সে অপেক্ষা করছে। মাথা গুঁজে খেতে লাগলাম। খাচ্ছিলাম বটে, মনে তখন ঝড় বইছিল। কোন কথা বার্তা হল না। বিছানায় শুয়ে, বুঝতে পারলাম শীলা ঘুমোয়নি। জমাট অন্ধকারে চোখ খুলে চেয়েছিলাম। কান দুটি সজাগ। শীলার দিক থেকে কোন সাড়া নেই। এক সময় ওকে আকর্ষণ করতেই আত্মসমর্পণ করল। বুঝলাম সে কাঁদছিল। আমি আদর করতেই ওর কান্না থেমে যায়। বলতে চাইছিলেম, তুমি নরেনের সাথে মিশনা কিন্তু পৌরুষে লাগল। মনটা ভার হয়ে গেল। কিছুক্ষণ আগেও আমি মরে যেতে চাইছিলাম কিন্তু শীলা যখন নির্দ্বিধায়ে আত্মসমর্পণ করল, তখন সব ভুলে গেলাম।

ব্রটেন

সচিত্র সংযোজন

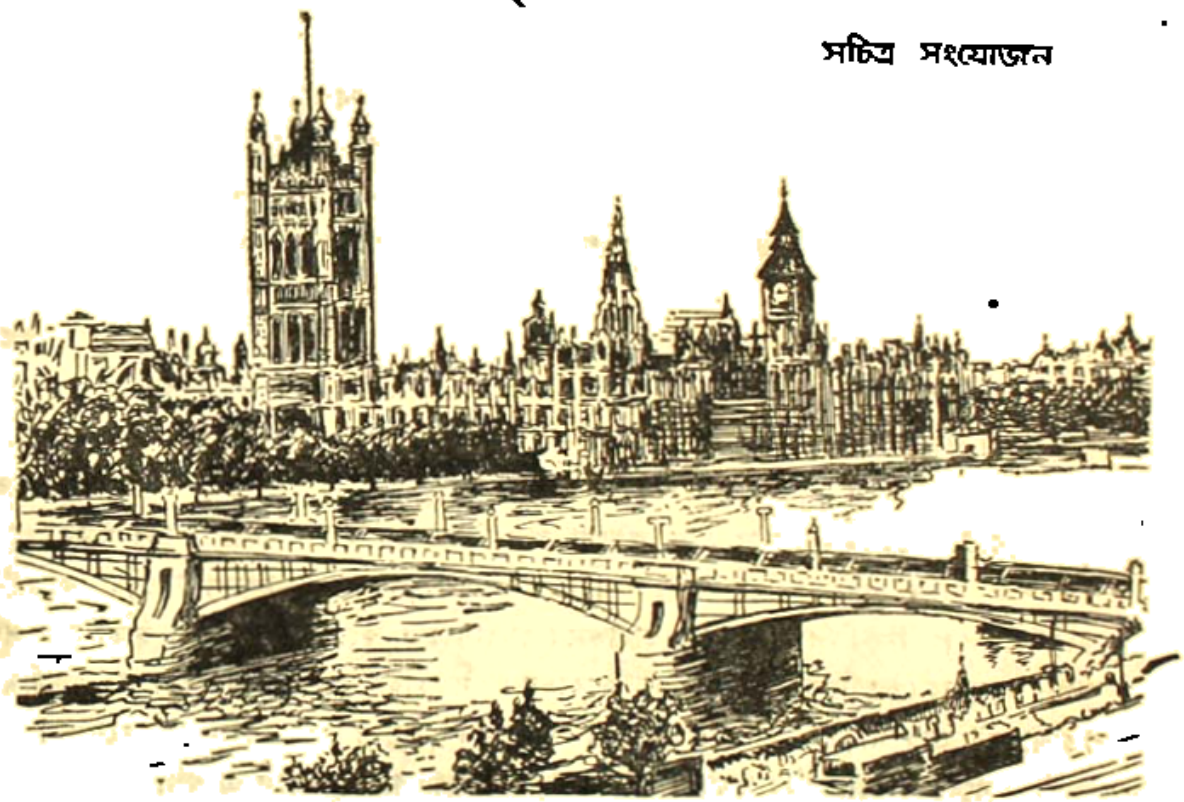

গ্রেট বৃটেন

শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক এবং সামাজিক ক্রমবিকাশের দিক দিয়ে পৃথিবীর প্রথম সারির দেশগুলির অন্যতম গ্রেট বৃটেন আয়তনের দিক দিয়ে মোটামুটি পৃথিবীর চল্লিশ-পঁচিশটি দেশের পরে স্থান পায়—মাত্র ৯৪,২১৪ বর্গ মাইল। ভূতাত্ত্বিকগণের মতে বৃটেন পৃথিবীর প্রাচীনতম ভূখণ্ডগুলির অন্যতম। ভূ-ভাগের প্রায় সমস্ত স্তরের পরিবর্তনের নিদর্শন বৃটেনে পাওয়া যায়।

ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ৫,২১,০০০০০, অধিবাসীগণকে প্রধানত চারটি ভাগে ভাগ করা যায়—ইংরেজ, স্কচ, ওয়েলসীয় এবং আইরিশ। বৃটেনের বর্তমান সভ্যতার বয়স এখনো হাজার বছর পূর্ণ হয়নি। ঐতিহাসিকগণ ১০৬৬ সনকে বৃটেনের বর্তমান সভ্যতার সুরু বলে মনে করেন। কারণ তার পূর্বে বহুবার ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, কখনো বা সম্পূর্ণ পরাভূত হয়েছে; কিন্তু ১০৬৬ সন থেকে মোটামুটি একই জনসমষ্টি বংশানুক্রমে ব্রিটিশ দ্বীপ-পুঞ্জে বসবাস করছে এবং সেখানকার রাজনৈতিক শক্তির অধিকারী রয়েছে। এই জনগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, এদের পূর্ব পুরুষও ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসী নয়। নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক ফ্রান্স প্রশিয়ার উত্তর এবং পশ্চিমাংশ—এই সমস্ত অঞ্চল থেকে কিছু কিছু লোক আক্রমণকারীরূপেই সরাসরি ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের কোন না কোন অংশে এসে পড়েছিল এবং তারপর থেকে গিয়েছিল। এদের পারস্পরিক সংমিশ্রণের ফলেই বর্তমান জনসমষ্টির উৎপত্তি হয়েছিল।

অবশ্য বহিরাগতের আবির্ভাব যে একেবারে বন্ধ হয়েছে তা নয়। ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে—বিশেষ করে রুশিয়া, পোল্যাণ্ড, জর্মনী এবং হাঙ্গারী থেকে বিগত ষাট বছরেও কয়েক লক্ষ মানুষ তাদের পরিবার বর্গ নিয়ে বৃটেনে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে সুরু করেছে। ক্রমে এরা সকলে বৃটেনের নাগরিক অধিকারও লাভ করেছে। এই হারে বহিরাগতের আগমনের ফলেও বৃটেনে যে জনসংখ্যার চাপ কখনো অত্যধিক মনে হয় নি তার কারণ বৃটেন থেকে আবার লক্ষ লক্ষ মানুষ চলে গিয়েছে বাইরে—বিভিন্ন কমনওয়েলথ্ দেশগুলিতে, বিশেষ করে কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ডে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস সুরু করেছে; আর তা ছাড়া লক্ষ লক্ষ ব্রিটিশ নাগরিক যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্বও গ্রহণ করেছেন। সরকারী হিসেব পত্রে দেখা যায় একমাত্র উনবিংশ শতাব্দীতেই প্রায় আড়াই কোটি ব্রিটিশ নাগরিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে বসবাস সুরু করেছে।

বৃটেনের জনসমষ্টির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা করলে এ কথা নিঃসন্দেহের বলা চলে যে, এখানকার জনগণ নানাজাতির সংমিশ্রণের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তা হলেও একটা ব্যাপার লক্ষণীয়। সে হলো ভাষা। ইয়োরোপের প্রায় সব দেশ থেকেই কিছু কিছু মানুষ একেবারে প্রথম যুগ থেকেই বৃটেনে এসে বসবাস সুরু করলেও আজকের বৃটেনে তারা প্রায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ পূর্বপুরুষের ভাষা বলতে গেলে ভুলে গেছে। এমন কি খাস যুক্তরাজ্যের প্রধান অঙ্গরাজ্য স্কটল্যাণ্ডের আদি ভাষা আজকের দিনে এক লক্ষ মানুষও জানে না। ওয়েলস-এর স্থানীয় ভাষা অবশ্য এখনো প্রায় এক তৃতীয়াংশ মানুষ ঘরোয়া কাজকর্মের সময় ব্যবহার করে দেখা যায়। সরকার

আয়ার্ল্যাণ্ডে মূল মাতৃভাষা আইরিশ বলতে বা বুঝতে পারে এরকম পরিবারের সংখ্যা এক শতেরও কম। যুক্তরাজ্যে কার্যত সকলেরই আজ এক ভাষা সে হলো ইংরেজী।

বৃটেনের শিল্প-সমৃদ্ধির মূলে রয়েছে অধিবাসীদের অসাধারণ কর্মক্ষমতা। পুরুষদের মধ্যে ১৫ বছর বয়স পূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে কোনো না কোনো কাজে লিপ্ত হয়ে যায়—সব সময়ের জন্যেই হক বা কিছু সময়ের জন্যেই হক। শতকরা ৯৯ জন পুরুষের পক্ষেই কথাটা সত্যি।

যারা পড়াশুনো চালিয়ে যেতে চায় তাদের পক্ষেও এমন বন্দোবস্ত আছে যে অর্থকরী কাজকর্ম বজায় রেখেও প্রত্যেকে পড়াশুনো করতে পারে। বিবাহিত নারীদের মধ্যেও অর্থকরী কাজকর্মের দিকে প্রবল ঝোঁক দেখা যায়। কারণ সমগ্র বৃটেনে মোট বিবাহিত নারীদের এক তৃতীয়াংশ কোনো না কোনো অর্থকরী কাজে নিযুক্ত রয়েছে দেখা যায়। বৃটেনে সাপ্তাহিক কাজের সময় ৪২ থেকে ৪৬ ঘণ্টা।

প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ বিদেশ থেকে গ্রেট বৃটেনে বেড়াতে আসে। ১৯৬১ সালে দেখা গেছে এই জাতীয় বিদেশী ভ্রমণকারীর সংখ্যা প্রায় সতেরো লক্ষ, যার মধ্যে একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকেই এসেছিল প্রায় পাঁচ লক্ষ।

বৃটেনের জনগণের আমোদপ্রমোদের মধ্যে সিনেমা, থিয়েটার, নানাধরণের খেলা ধুলো ছাড়াও নাচের অভ্যাস একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। সরকারী হিসেবে দেখা যায় ছোট-বড়ো সব রকম মিলিয়ে আজকের বৃটেনে প্রায় ৮০০০ ডান্সিং হল রয়েছে। যার বেশির ভাগ জায়গাতেই যে কোনো সাধারণ নাগরিক অংশ গ্রহণ করতে পারে। সবার শেষে বলতে হয় ক্লাব জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কথা। বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক ক্লাব বা সোসাইটি সমেত সারা বৃটেনে প্রায় পঁচিশ হাজার প্রতিষ্ঠান রয়েছে। গ্রেট বৃটেনের সাধারণ মানুষের ভেতর ক্লাবে যোগদান করার অভ্যাস বহু প্রবাদের সৃষ্টি করেছে।

ইংরাজী সাহিত্য

অরবিন্দ পোদ্দার

কারলাইল একদা তাঁর দানে ও শেক্সপীয়র সম্পর্কিত বক্তৃতায় বলেছিলেন : "Indian Empire, or no Indian Empire, we cannot do without Shakespeare ! Indian Empire will go, at any rate, some day ; but this Shakespeare does not go, he lasts for ever with us····· অর্থাৎ, ভারত সাম্রাজ্য থাক বা যাক, শেক্সপীয়র বিনা আমাদের চলে না। ভারত-সাম্রাজ্য কোন একদিন চলে যাবেই ; কিন্তু এই শেক্সপীয়র যাবে না, তিনি চিরজীবী। শেক্সপীয়র নামটির পরিবর্তে যদি আমরা ইংরেজী সাহিত্য শব্দ দু'টি ব্যবহার করি, তাহলে এ ঘোষণায় কোনো কলঙ্ক নেই—ভারত-সাম্রাজ্য আজ সত্যই অস্তিত্বহীন, কিন্তু শিক্ষিত ভারতীয়ের জীবনে ইংরেজী সাহিত্য গভীরতর সত্যে প্রতিষ্ঠিত, মনতার আসন, অনুভবে সতত জাগ্রত। এই সাহিত্যের মৃত্যু নেই, শেক্সপীয়র নামটির মতোই এই সাহিত্যও এক বিস্ময়কর সৃজন মহিমায় চির সম্ভাবনাময়, যুগযুগান্তরের ব্যবধান ও প্রতিরোধ উত্তীর্ণ হয়ে তার সৃষ্টিসত্তার অনন্তের পথে প্রবাহিত।

রাজনৈতিক আধিপত্য, সাম্রাজ্যবিস্তার, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অথবা ভৌগোলিক অভিযান কোনোটিতেই আমরা ইংরেজ চরিত্রের আসল পরিস্ফুটন লক্ষ্য করিনা, যেমন করি তাদের সাহিত্যে। জাতীয় প্রতিভার অনাবিল প্রকাশ সাহিত্যে বিধৃত বলেই কারলাইল শেক্সপীয়র সম্পর্কে ওই কথা ঘোষণা করতে সাহসী হতে পেরেছিলেন। উচ্চারিত বাণীর মাধুর্য এবং শক্তিতেই একটা গোটা জাতি শক্তিমান, এর মাহাত্ম্যেই জাতির মাহাত্ম্য। যে জাতির সেই বাণী নেই, তার অস্তিত্বও তেমনি মাহাত্ম্যহীন। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের ঐশ্বর্যই সমগ্র জাতিকে ঐশ্বর্যের তিলক পরিয়েছে ; এবং এর স্বীকৃতিতেই পরাধীন ভারতবর্ষ শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে তার শাসকের প্রতি মুখ তুলে তাকিয়েছিল ; বলেছিল, ইংরেজ তার সাহিত্যের মশাল জেলে ভারতবর্ষের মনোভুবন আলোকিত করেছে ; সগর্বে বলেছিল, শেক্সপীয়র মিলটন কি শুধু ইংল্যাণ্ড নামক এক ভৌগোলিক খণ্ডের ? না, শেক্সপীয়র-মিলটন আমাদেরও, ভারতবর্ষেরও। রাজনীতি-চক্রের আবর্তে ইংরেজ ভারত ত্যাগ করেছে, কিন্তু সাহিত্যের যে উপঢৌকন সে ভারতবর্ষে এনেছিল, তা কোনোদিন সে ফিরিয়ে নেবে না—নিতে পারবে না ; তার ঐশ্বর্যে প্রজ্জ্বলিত ভারতবর্ষের মুখ চিরকাল সেই সৌরবের উত্তরাধিকার ঘোষণা করবে।

ইংরেজী সাহিত্যের বিস্তৃত ঐতিহাসিক বিবরণ এখানে উত্থাপন করার অবকাশ নেই, শুধু সংকেতে তার বিবর্তনের রেখাটুকু আমরা অবধারণ করতে পারি।

খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকে চসার-এর আবির্ভাবের কাল থেকে আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যের আরম্ভ ও বিকাশ। কিন্তু, আরম্ভের আগেও যেমন আরম্ভ থাকে, তেমনি চসারের আগেও সাহিত্যের অস্তিত্ব ছিল ; এবং সে অস্তিত্ব স্বল্পকালের নয়—প্রায় সাতশ' বছরের। অবশ্যই, সেই সুদীর্ঘ কাল প্রস্তুতির কাল ; সাহিত্যের চিরহারী সৌন্দর্যলোকে ভুবন ভোলানো প্রতিভার আবির্ভাবের জন্য ভূমি প্রস্তুত করার কাল। তার পূর্বে ইংরেজদের এ্যাংলো-স্যাক্সন শৈশব ফরাসী সংসর্গে যৌবনে সমার্পণ করেছে ; চসারের সাহিত্যে এই যৌবনের দৃপ্ত অহঙ্কার, প্রস্ফুটিত জীবনের আনন্দ সংবাদ। চসার

শুধুমাত্র কবি ছিলেন না। উচ্চ রাজকর্মচারী, পারিষদ, ব্যবসায়ী, পরিব্রাজক, প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিত কবি—তিনি ছিলেন এক ব্যক্তিত্বে সব। সুতরাং, দেশের জটিল রাষ্ট্রিক ও সামাজিক আবর্তে অংশগ্রহণ করার পূর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি, এবং তাঁর কাব্যও হয়েছে সেই আবর্তের বর্ণ সমারোহে উজ্জ্বল একটি দুর্লভ দর্পণ, যেখানে প্রতিবিম্বিত একটা নতুন জীবনবোধ, নতুন মানসভঙ্গি, একটা নূতন পৃথিবী। এই পৃথিবীর গায়ে রং লেগেছে ক্লাসিক এবং ইতালির। চসারই ইংরেজী সাহিত্যে ইউরোপীয় পরিধিতে নিয়ে আসেন, এবং জীবনের রসসাগরে ডুব দেন অমৃতের সন্ধানে।

চসারের মৃত্যুর পর প্রায় দেড়শ বছর ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে অনাবাদী যুগ। চসার সাহিত্যের যে বিপুল বিস্তার ও বিশ্ব সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন, তাকে পত্রে পুষ্পে শ্রীময় করার জন্য কোনো প্রতিভাশালী শিল্পীর আবির্ভাব হলো না এই দীর্ঘ দেড়শ বছরে। এ সময়ে রচিত টমাস মোর-এর Utopia নামক যে গ্রন্থটি বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিল তাও ল্যাটিন ভাষায় রচিত হয়ে ছিল, পরে অবশ্য তা ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়। এই শূন্যতার মধ্যেও একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে গেল যা ইংরেজী গদ্য সাহিত্যের বিকাশে যুগান্তকারী বলে স্বীকৃত; তাহলো ক্যাক্সটন-এর ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা (১৪৭৬ খৃঃ)। ঐ ছাপাখানায় মুদ্রিত গদ্যগ্রন্থের সহায়তায় ক্যাক্সটন একটি নিদিষ্ট ভাষামান সৃষ্টির কাজে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেন।

কিন্তু, এই আমলের সাহিত্য-ভূমির অনাবাদী জমির অন্তরালে ক্রিয়াশীল ছিল এক নব উন্মেষের অন্তঃপ্রাণনা, যা সাধারণ ভাবে রেনেসাঁস নামে আখ্যাত। রেনেসাঁস বলতে আমরা এমন একটা বিশেষ মানসভঙ্গি বুঝি যা মধ্যযুগের সংস্কার ও ধর্মান্ধতার তমিস্রা ভেদ করে অকস্মাৎ আবিষ্কার করল এক অভিনব আলোকে পরিব্যাপ্ত সমগ্র ভুবন। সে আলোক শুধু গ্রহে নক্ষত্রে পত্রে পুষ্পে নয়, মানব হৃদয়ে মানব জীবনে। এই আলোকের সন্ধান লাভ করার পর ইওরোপের মানুষ জীবন সাধনার এক নতুন অধ্যায়ে পদার্পণ করল।

ইংল্যাণ্ডে এই রেনেসাঁসের স্পন্দন কিঞ্চিৎ বিলম্বে অনুভূত হয়, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তার সৃষ্টির ফসল অনুল্লেখ্য নয়। বরং মার্লো, স্পেন্সার, লিলি, শেক্সপীয়র, জনসন, বেকন, সিডনি প্রভৃতি সার্থক নামের উল্লেখে ও কীর্তিতে এলিজাবেথের আমল আজও পর্যন্ত ইংরেজী সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা ঐশ্বর্যশীল কাল বলে চিহ্নিত। এডমাণ্ড স্পেন্সার ছিলেন সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি; তাঁর Faerie Queene কাব্যগ্রন্থ যে কোনো শ্রেষ্ঠ গ্রীক কাব্যগ্রন্থের সমকক্ষ বলে সমকালীন ইংরেজগণ গর্ব বোধ করতেন। আর মার্লো ছিলেন রেনেসাঁসের দুরন্ত দুঃসাহস, স্পন্দিত উচ্চাভিলাষ, এবং নতুন মূল্যবোধের জীবন্ত প্রতীক। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালেই তিনি এমন এক জীবনদর্শন গড়ে তুলেছিলেন যা প্রচলিত ধ্যানধারণাকে অস্বীকার করতে, এমন কি খৃষ্টধর্মের বিরুদ্ধে ব্যবহারিক বিদ্রোহ করতেও দ্বিধাগ্রস্ত হয় নি।

তারপর শেক্সপীয়র—যাঁকে বাদ দিয়ে ইংরেজী সাহিত্যের কল্পনাও অসম্ভব। স্বভাবদত্ত প্রতিভা ও শক্তি এবং নাট্যশিল্পের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়া তাঁর অন্য কোনো সম্বল ছিল না, বিদ্যালয়ের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের। কোনো সাহিত্যদর্শন প্রচারের আকাঙ্ক্ষাও তাঁর ছিল না; নাটকের রসিক দর্শকবৃন্দকে নাট্যরসে মোহিত করার ঐকান্তিক বাসনা নিয়ে তিনি সাহিত্যসৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু, তাঁর প্রতিভার অনায়াসস্ফূর্তের যাদুতে অত্যন্ত সাধারণ বিষয়বস্তুও অসাধারণত্বের দ্যুতিতে

উত্তর হয়ে ওঠে। ১৫৯৯—১৬১১ সাল পর্যন্ত শেক্সপীয়রের সৃষ্টির কাল। এই সময়ের মধ্যে তিনি রচনা করেন ছত্রিশটি নাটক কয়েকটি কাব্য এবং রেড়শতাধিক সনেট। তাঁর সমস্ত নাটকেই তাঁর প্রগাঢ় মানবিক বিশ্বের বোধ, প্রেম প্রীতি-ভালবাসা ও ভালবাসার আনন্দে-গড়া অভিজ্ঞতা, জীবনের বিচিত্র সঞ্চয়, বিস্ময়বিহ্বল রহস্য ও অনুভূতি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাঁর সাহিত্যের অমৃত-ভাণ্ড নিয়ে তিনি তাঁর সমকালীনদের নিকট যেমন আমাদের নিকটও তেমনি জীবিত রয়েছেন, চিরকাল থাকবেন। প্রতিটি যুগের মানুষের কাছে নতুন নতুন সত্যতায়, নতুন নতুন বৈশিষ্ট্যে তাঁর আবেদন, তাঁর উপলব্ধি। চিরকাল তিনি মানবিক পৃথিবীর অপার বিস্ময় বলে স্বীকৃত হবেন।

তাঁর সমকালীন অন্যান্য কবি নাট্যকারদের মধ্যে বেন জনসন ছিলেন সর্বাপেক্ষা শক্তিধর ও সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নাট্যকার। গণ রুচির অপরিশীলিত যুগধর্মের ইন্ধন যোগান তাঁর লক্ষ্য ছিল না; তিনি গ্রীক ও ল্যাটিন নাট্যরীতির অনুসরণে সুষ্ঠির মূল্যের সন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। সেই আমলে নিবন্ধকার ও মননশীল চিন্তানায়করূপে যেমন ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী; আজও তাঁর প্রবন্ধের সমাদর আমাদের দেশে প্রবল।

প্রায় সমসাময়িক ও কিঞ্চিৎ পরবর্তীকালে আমরা আরেক জন শক্তিধর কবির সাক্ষাৎ পাই (ডান) যাকে কেন্দ্র করে একটি কবি-গোষ্ঠী আত্মপ্রকাশ করে। এই কবি গোষ্ঠী metaphysical poets নামে ইতিহাসে আখ্যাত। তাঁরা সকলেই ছিলেন অভিনব বুদ্ধিদর্প বাক্ চাতুর্যের অধিকারী; তাঁদের কাব্যে অত্যন্ত স্থূল বস্তুবোধের সঙ্গে সূক্ষ্ম পারমার্থিকতা, জটিল দার্শনিক জিজ্ঞাসা মিশ্রিত।

এরই অব্যবহিত পরবর্তীকালে অর্থাৎ পিউরিটান যুগে আমরা ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় কবি-বিস্ময় মিলটনের সাক্ষাৎ পাই। তাঁর মহাকাব্য 'প্যারাডাইস লষ্ট' 'প্যারাডাইস রিগেন্ড' ইত্যাদি মহাকাব্যে আমরা এই যুগের নতুন মূল্যবোধের চেতনা, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম, কঠোর নিষ্ঠা এবং ব্যবহারিক জীবনের কলুষের প্রতি অসামান্য ঘৃণা ও অসহিষ্ণুতা, অভিব্যক্ত। তাঁর কাব্য উচ্চ এক আদর্শবাদের জ্যোতিতে ভাস্বর, সত্যের প্রতি নিষ্ঠায় নির্মল, পবিত্র। মিল্টন চরিত্রের এই দিকটাই আমাদের মহাকাব্য-রচয়িতা মধুসূদনকে বিমুগ্ধ করেছিল, এবং এই বাংলাদেশেই একদা এমন অধ্যাপকও ছিলেন যিনি সমগ্র প্যারাডাইস লষ্ট মুখস্থ বলতে পারতেন।

তাঁর সমকালীন সপ্তশিল্পী বুনিয়ানের 'পিলগ্রিম্‌স্ প্রগ্রেস' গ্রন্থপাঠে পৃথিবীর অগণিত ধর্মপ্রাণ মানুষ পরিতৃপ্তি লাভ করেছে; লেখকের তীব্র অনুভূতি ও হৃদয়াবেগের সঙ্গে আত্মিক মিল অনুভব করে আনন্দিত হয়েছে।

এঁদের কাল অতিক্রান্ত হলেই আমরা ইংরেজী সাহিত্যের আধুনিক যুগে প্রবেশ করি। পিউরিটান মূল্যবোধের মানদণ্ডে শাসিত সমাজ ছিল সর্বতোভাবে অবরুদ্ধ—এক্ষণে সেই অবরুদ্ধ আকাশ থেকে মুক্ত হয়ে সমাজ বসন্তবায়ুর হিল্লোলে মেতে উঠল। নাট্যশালাগুলো আবার কলরবে মুখর হলো, এবং নৃত্যগীত ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে আমরা অষ্টাদশ শতকের সৃষ্টিশীলতা প্রবেশ লাভ করি। ক্রান্তি-লগ্নের শিল্পীদের মধ্যে ড্রাইডেন স্মরণীয় হয়ে আছেন।

অষ্টাদশ শতককে সাধারণভাবে ক্লাসিক্যাল বা অগাষ্টান যুগ বলা হয়ে থাকে। এ যুগের মধ্যমণি বা প্রতীক হলেন পোপ। সম্রাট অগাষ্টাসের আমলে রোমে সাহিত্যের যে ঐশ্বর্য ছিল অষ্টাদশ শতকও প্রায় সমতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছিল—যেমন মননে তেমন প্রকাশ ভঙ্গিমায়।

প্রজ্ঞাবাদী মনন এ যুগসাহিত্যের মৌল প্রেরণা, তার সাধনার লক্ষ্য ; সেই সাধনা থেকেই জন্ম নিয়েছে নিয়মনিষ্ঠার ও, সুষম পরিমিতির চেতনা। গোপ অস্তাক দিক থেকে দেহে-মনে ধর্বাকৃতি হলেও ক্ল্যাসিকাল আর্শর বিখুঁত পরিপাটি, বক্তব্যের তীক্ষ্ণ সংক্ষিপ্ততা অর্জনের জন্য তাঁর সাধনা ছিল একনিষ্ঠ। এই সমসোমায়িক পত্র এবং কথাশিল্পের বিস্তার হয় বিপুল। ফলে বহুসংখ্যক নিবন্ধকার, সমালোচক এবং ঔপন্যাসিকের সাক্ষাৎ আমরা এযুগে লাভ করি। তাঁদের মধ্যে আছেন এডিসন, স্টিল, সুইফ্‌ট, ড: ডেন, ডিফো, রিচার্ডসন, ফিল্‌ডিং, স্মলেট, স্টার্ণ প্রভৃতি : উপন্যাসের ক্ষেত্রে এ আমলের সুবর্ণ-ফল সমারোহ সত্যই বিস্ময়কর। তেমনি বিস্ময়কর ডক্টর জনসনের ব্যক্তিত্ব।

কিন্তু এক্সাসিক্যাল আদর্শের নিয়ম ভঙ্গ করেই অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে এ কালের বাণীতে অন্য এক সুরলোকের আনন্দ বেজে ওঠে। সে সুর নতুন ঋতুর গুঞ্জনে, চেনা অচেনায় মেশা সৌন্দর্য-লোকের আকুলি আলোর ঝলকানিতে, আর হৃদয়ের অব্যক্ত আকুতি ও না-পাওয়ার ব্যথিতে জড়ানো ; অর্থাৎ রোমান্টিসিজমের প্রথম আলোর প্রকাশ আমরা দেখতে পাই। যারা এই আবির্ভাবের সূচনা করেন তাঁদের মা রয়েছেন টমসন, কলিন্স, কুপার, বার্নস্, ব্লেক, চ্যাটারটন প্রভৃতি কবি।

এই নোটিক মনোভঙ্গিই পরিপূর্ণ শক্তি, ঐশ্বর্য ও মাধুর্যে উনবিংশ শতাব্দীর উদ্বোধনের সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করে। রোমান্টিক কবির নিকট এই প্রবাহিত হতে-থাকা জীবন যেন এক বিভীষিকাময় বন্দীশালা, সেখানে তাঁদের বন্দী আত্মা ব্যাকুল তীব্রতায় সততই কাঁদে, কোথায় মুক্তি, কোথায় সেই রাঙ্গবন্ধু রক্তোদ্বেল ও জীবন যেখানে কবির কণ্ঠে পাখির সুরন্ত উল্লাস। কিন্তু, সেই বাঞ্ছিত মুক্তি আগে না বলেই তাঁরা আপন অন্তরের গভীরে ডুব দেন হিরণ্ময় সত্যের সন্ধানে ; এবং আপন অভিজ্ঞতা ও অন্তর্গূঢ় চেতনার আলোকে জীবনকে জগৎকে অনির্বচনীয় রূপে আলোকে মণ্ডিত করেন যে আলোকে সংসার কেউ জানে না, 'the light that never was on sea or land'এ যেন এক মোহাবিষ্টদৃষ্টিতে, নতুন প্রত্যয়ে, নতুন সংবেদনশীলতায়, জীবনকে নতুন করে দেখা। এ দেখার শেষ নেই। এমনিভাবে রোমান্টিক কবিত্ব বাস্তব সম্পর্ক-যুক্ত অভিজ্ঞতার জগৎকে অস্বীকার করেন। স্বপ্নাবেশের এক উচ্চতর বাস্তবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায়। যে সব কবির কাব্যে বা উপন্যাসে রোমান্টি মনোভঙ্গির ভিন্ন ভিন্ন দিক উদ্‌ঘোষিত—অর্থাৎ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কোলরীজ, স্কট, শেলি, বাইরণ, কীটস্‌প্রভৃতি—তাঁরা সকলেই আমাদের সুপরিচিত। কেননা, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিবর্তনে তাঁদের সকলের প্রভাব অনস্বীকার্য ; উপন্যাসের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের উপর স্কটের প্রভাবও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথ শেলি-কীটসের কাব্যাকাশে মনের দোসর খুঁজেছেন ; পরবর্তীকালের কবিবৃন্দও শেলির আদর্শবাদ বা কীটসের ইন্দ্রিয়মনোময়তা দ্বারা অতিশয় আকৃষ্ট হয়েছেন। বাঙালী সাহিত্য-রসিকের নিকট এই নামগুলো সেজন্যই অবিস্মরণীয়।

এ আমল শুধু কবিদের জন্য নয়, কয়েকজন অত্যন্ত কৃতী গদ্যশিল্পীর আবির্ভাব এবং তাঁদের সুকুমার বুদ্ধিপ্রকর্ষের জন্যও গৌরবান্বিত। গদ্য শিল্পীদের মধ্যে আছেন চার্লস্ ল্যাম্ব, হ্যাজলিট এবং ডি কুইন্সি। ডি কুইন্সির গদ্যশিল্প অপরূপ, আর ল্যাম্ব তো নিরর্থক বকবকানিকেই শিল্পের মর্যাদা দান করেছেন।

রোমান্টিক যুগ পার হয়ে আমরা উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আরেক যুগ-মানসের সাক্ষাৎ লাভ করি, যার সাধারণ নামকরণ ভিক্টোরীয় যুগ। রোমান্টিক অতিশয়তা বিদায় দিয়ে পুনরায় বস্তু

নিষ্ঠতা, সত্যের প্রতি আকর্ষণ ইত্যাদি সাহিত্যের দিগন্ত আলোকিত করল। উদ্ভ্রান্ত নয় সংযম ও শৃঙ্খলা অভিপ্রেত নয় পরিমিতিবোধ, দিগন্তে উঁকিও কল্পনা নয়, বস্তুনিষ্ঠতা—এ যুগের মধ্যে বৈশিষ্ট্য। আর তার প্রকাশ শুধু সাহিত্য শিল্পের প্রাঙ্গণেই নয়, জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই এই দাবী, এই ধ্যান।

এলিজাবেথের আমলের সাহিত্যের মতোই এই যুগের সাহিত্যও ঐশ্বর্যে বিপুল, প্রকরণে বিচিত্র। বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদির চর্চায় অনুধ্যানে ও বাগ্‌বিতণ্ডায় যেমন সরগরম চকল, তেমনি চকল কাব্য উপন্যাস স্বপ্নতত্ত্ব ইত্যাদি জিজ্ঞাসায়, তেমনি ব্যাকুল ধর্ম ও নৈতিক আচরণবিধির পুনর্বিচারে। তাই, ভিক্টোরীয় আমলের গল্পের এমন বিচিত্র প্রকাশ, এমন বৈভব। এখানে কার্লাইল, রাস্কিন, মিউয়্যাস যেমন আছেন, তেমনি আছেন মেরেডিথ, আর্নল্ড, মরিস, পেটার, হ্যাটলার প্রভৃতি। কেউ হয়তো একটু চড়াসুরে কথা বলেন, কারও কণ্ঠস্বর মৃদু, কারুময় ও মধুর।

কাব্যের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বৈচিত্র্য। টেনিসনের শিল্পপ্রয়াস গভীর অধ্যবসায়, সচেতন প্রচেষ্টায় ও পরিশ্রমে লভ্য; অত্যন্ত ধ্বনি-সচেতন তিনি এবং ছন্দের কানও তাঁর অপূর্ব। কিন্তু, যখনি ব্রাউনিং-এর প্রায় বিশৃঙ্খল লিরিকধর্মী কাব্য যে প্রজ্ঞাময়ী আবেগের স্বাদ রেখে যায়, টেনিসনে তার একান্ত অভাব। ব্রাউনিং-এর লক্ষ্য মানব আত্মার বিকাশ ও অভিব্যক্তিকে তার সমগ্রতায় উপলব্ধি করা; তাঁর dramatic monologue-গুলো বিশাল এক তৃপ্তিতে মন ভরে দেয়। তাছাড়া, বিদ্রূপ ও দুঃখ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য রয়েছে আর্নল্ড বা ক্লিট্‌জেরাল্ডের কাব্য। তাতেও যদি অন্তরের চিত্ত না ভরে তো আমরা Pre-Raphaelite কবি গোষ্ঠী অর্থাৎ রসেটি, মরিস, সুইনবার্ন প্রভৃতির সৌন্দর্য সাধনার মধ্য হতে পারি। তাঁরা প্রায়শঃ কলম দিয়ে ছবি লিখতেন এবং তুলি দিয়ে কাব্য আঁকতেন।

কিন্তু উপন্যাসেই ভিক্টোরীয় সাহিত্য প্রতিভার অধিকতর স্ফূর্তি। এবং এখানে স্রষ্টা সংখ্যাও বহু। সেই বহুর মধ্যে দু'চার জন উত্তমমস্তক উপন্যাস-কার বিশ্ব-সাহিত্যে অমর প্রতিষ্ঠিত। তাঁদের মধ্যে ডিকেন্স অন্যতম। তৎকালীন বর্ধিষ্ণু মধ্যবিত্ত সমাজকে তিনি যে প্রেম প্রীতি স্নেহ ও কৌতুকের দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং যেভাবে তাদের মধ্য দিয়ে চিরন্তন মানবসন্তানটি অভিব্যক্ত হয়েছে, যে কোন দেশের সাহিত্যেই তার তুলনা বিরল। শেক্সপীয়ারের বৈপরীত্য যেমন বেনজনসনে, তেমনি ডিকেন্সের বৈপরীত্য থেকারে-তে। থেকারে ঐ আমলের সামাজিক আচরণের মিথ্যাচার, কপটতা, ভণ্ডামির সাধনা ইত্যাদি তীক্ষ্ণ শ্লেষ ও বিদ্রূপের মধ্যে প্রকাশ করেছেন। এ ছাড়া ছিলেন জর্জ এলিয়ট (মেরি এ্যান্ ইভান্‌স্) মেরেডিথ, মুর, হার্ডি, ব্রণ্টে ভগিনীত্রয়, কিংস্‌লে প্রভৃতি। তাঁরা সকলে মিলে ভিক্টোরীয় উপন্যাসের বিচিত্র ভুবন সৃষ্টি করেন।

পুনরায়, বিংশ শতাব্দী আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্যে নতুন বসন্তের সংবাদ ঘোষিত হলো এবং ঐ নতুন ক্রমে এক ঝড়ো হাওয়ার খবর নিয়ে এল যা স্পষ্টত ভিক্টোরীয় সাহিত্যের ঐতিহ্য-বিরোধী। এ কালের মানস পরিবেশনও পূর্ব কালের রীতিবিরোধের সীমায় আবদ্ধ নেই; আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যের চিন্তা জগতে উন্মুক্ত আকাশের বিশাল উদারতা। সমস্ত সমাজ-সমস্যাই এখানে প্রকাশ্যভাবে আলোচিত ও বিতর্কিত। এই বিংশ শতাব্দী যাঁদের সাহিত্য কৃতিতে ধন্য হয়েছে, তাঁদের নামগুলো একবার স্মরণ করলেই এই সাহিত্যের বিশালতা, বৈচিত্র্য ও অনন্যসাধ্য আমাদের হৃদয়কে অভিভূত করবে। শ, ওয়েলস্, গলস্‌ওয়ার্দি, কনরাড, অয়েল, উলফ্, লরেন্স, হাক্সলি, ইয়েটস্, এলিয়ট,

অডেন, চেষ্টারটন, র‍্যাম্বি, সিঞ্জ—বিবিধ ক্ষেত্র থেকে বহুর মধ্য থেকে আহরিত এ ক'টি নামই বৈচিত্র্যের স্বাদ এনে দিতে যথেষ্ট। তাঁদের সাহিত্য কর্ম নিয়ে কোনো আলোচনা করার অবকাশ নেই। শুধু এ কথা বলাই যথেষ্ট যে, আধুনিক সাহিত্যের শিল্পীবৃন্দ ইংরেজ সাহিত্যের ঐশ্বর্যশীল প্রবাহকে সরস, সজীব ও সমৃদ্ধ করে রেখেছেন। আধুনিক উপন্যাস-শিল্পের জীবনজিজ্ঞাসা, নাটকের জীবন ঘনিষ্ঠতা, কাব্যের বিশ্ববোধ, চিত্রকল্প ও ছন্দোবৈচিত্র্য আমাদের নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, রবীন্দ্রোত্তর বাংলা উপন্যাস ও কাব্য ইংরেজী উপন্যাস ও কাব্য দ্বারা অপেক্ষাকৃত প্রভাবিত। বস্তুত, আধুনিক কাব্যই আধুনিক বাংলা কাব্যের পরোক্ষ স্রষ্টা।

শেষ কথা, সাহিত্যের কোনো দেশ নেই, জাত নেই; সব দেশের মানুষের হৃদয়েই তার আসন। তাই, সাতসমুদ্র তের নদীর ব্যবধান পার হয়ে ইংরেজী সাহিত্য আমাদের পল্লী বাংলার নিভৃতে গুঞ্জরিত হয়ে উঠে এবং আমাদের চিত্তকে বৃহত্তর মানব অভিজ্ঞার সাগরসঙ্গমের দিকে ডেকে নিয়ে যায়। সাহিত্যের এই আহ্বান শাশ্বত, মৃত্যুহীন।

———

গ্রন্থ-পরিচয়

বীর বিবেকানন্দ স্বামী সোমেশ্বরানন্দ দাম—৩৲

প্রকাশক : বিমল কুমার সিংহ, ৫৪, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

স্বামী সোমেশ্বরানন্দ প্রণীত স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে বইটি পড়ে প্রভূত আনন্দ লাভ করলাম। স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্বামীজীর জীবনআলেখ্য বহুজন আলোচিত ও বহু লেখকের রচনায় সুসমৃদ্ধ হয়েছে। সোমেশ্বরানন্দের স্বামীজীর জীবনকাহিনী বহু অজ্ঞাতপূর্ব তথ্য সম্বলিত ও সম্পূর্ণ নূতন আঙ্গিকে লেখা। সোমেশ্বরানন্দের বিবেকানন্দের জীবনকাহিনী পাঠক সমাজে সমাদর লাভ করবে আশা করি।

কালিদাস নাগ

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

হিমালয়ের স্বল্প পরিচিত অঞ্চলের ভ্রমণকাহিনী

হিমালয়ের পথে পথে ৬৷৷০

। নূতন বহুবর্ণ চিত্র সংযোজিত, পরিবর্ধিত নূতন সংস্করণ ॥

শম্ভু মহারাজের গঙ্গোত্রী যমুনোত্রীর ভ্রমণকাহিনী

বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা (১ম মুদ্রণ) ৬৷৷০

'মৈনাক' বিরচিত

নূতন পৃষ্ঠপটে রচিত উপন্যাস

বহ্নিবলয় ৮৷৷০

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

কিরীটী রায় ১০৲

কিরীটী রায় কাহিনীর প্রথম ওমনিবাস ভল্যুম

সুমথনাথ ঘোষের

নূতন ঐতিহাসিক উপন্যাস

রোশনাই ৩৷৷০

প্রশান্ত চৌধুরীর নূতনতম উপন্যাস

নদী থেকে সাগরে ৮৲

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

যাত্রাপথ ৪৷৷০

ডাঃ বিজিতকুমার দত্তের

বাংলাসাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস ৮৷৷০

বিমল করের

নূতন উপন্যাস

পান্থশালা ৩৷৷০

জরাসন্ধের

নূতন উপন্যাস

ছায়াতীর ৫৲

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

নূতন উপন্যাস

মেঘ ও মৃত্তিকা ৫৲

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

আপনার প্রিয় সব কিছু রক্ষার জন্য আরও বেশী সঞ্চয় করুন

আজ যে শিশু
কাল সে জওয়ান
যে কোন কাজেই
সে যোগ দিক না কেন
তার স্বাস্থ্য, লেখাপড়া ও
সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য
আরও বেশী সঞ্চয় করুন

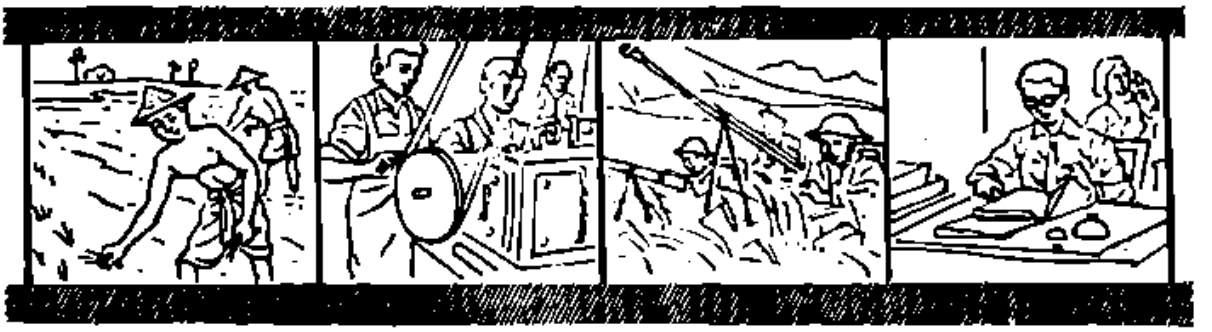

ছেলেমেয়েদের প্রতি আপনার সত্যিকারের ভালোবাসা তখনই প্রকাশিত হয়, যখন আপনি তাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে নিয়মিত সঞ্চয় করেন। সেই সঞ্চয় সর্বাধিক নিরাপত্তার সঙ্গে লাভজনক ভাবে লগ্নী করার বিশেষ সুযোগ রয়েছে জাতীয় সঞ্চয় পরিকল্পনায়।

জাতীয় সঞ্চয় পরিকল্পনায় লগ্নী করুন

- ১২-বছর মেয়াদী জাতীয় প্রতিরক্ষা সার্টিফিকেট : সুদের হার ৬½%.
- ১০-বছর মেয়াদী প্রতিরক্ষা ডিপোজিট সার্টিফিকেট : সুদের হার ৬½%.
- ১৫-বছর মেয়াদী অ্যানুইটি সার্টিফিকেট : সুদের হার ৪·২৫%. (চক্রবৃদ্ধি হারে)
- পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট : সুদের হার ৩%. (মাত্র ২৲ টাকায় অ্যাকাউন্ট খোলা যায়)
- ক্রমবর্ধমান নির্দিষ্ট মেয়াদী ডিপোজিট পরিকল্পনা : সুদের হার ৩·৩%. থেকে ৪·৩%.

এই সব লগ্নীর সুদ আয়কর মুক্ত
সহজে কেনা যায়, সহজে রাখা যায়, সহজে ভাঙানো যায়।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিকটবর্তী পোস্ট অফিসে অনুসন্ধান করুন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

WB-25

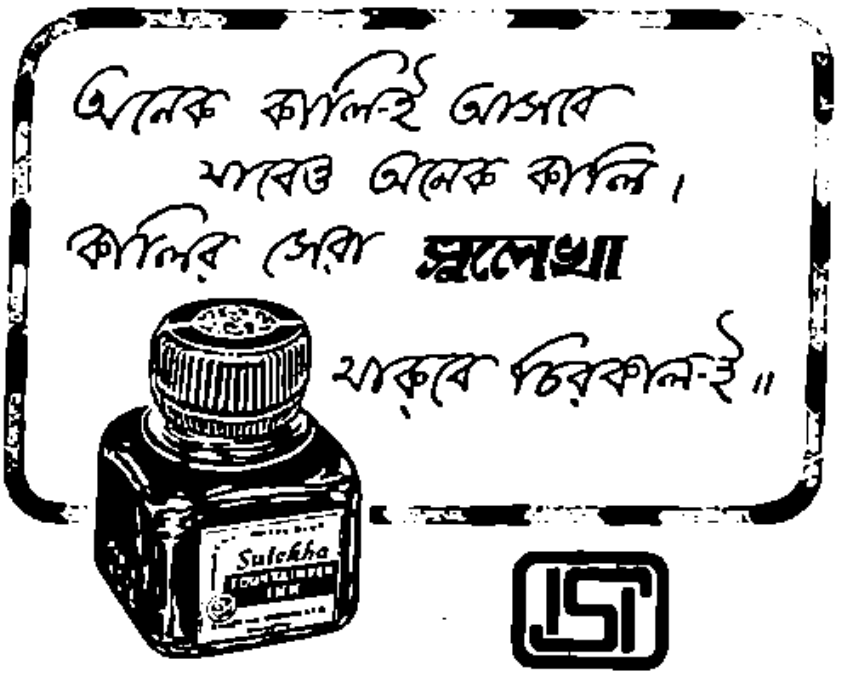

I.S. 1221

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড

কলিকাতা · দিল্লী · বোম্বাই · মাদ্রাজ

SW

ঘর সংসারের সুখ সুবিধের দিকে সুগৃহিনীর সব সময়েই নজর থাকে। অপ্রয়োজনীয় জিনিষের প্রলয় শুধু শুধু খরচ না করে যতদূর সম্ভব তিনি টাকা জমানোর চেষ্টা করেন এবং ভবিষ্যতে নিশ্চিত স্থায়ী আয়ের জন্য সেই জমানো টাকা জাতীয় প্রতিরক্ষা সঞ্চয় পরিকল্পনাতে লগ্নী করেন।

* বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিকটবর্তী পোস্ট অফিসে অনুসন্ধান করুন

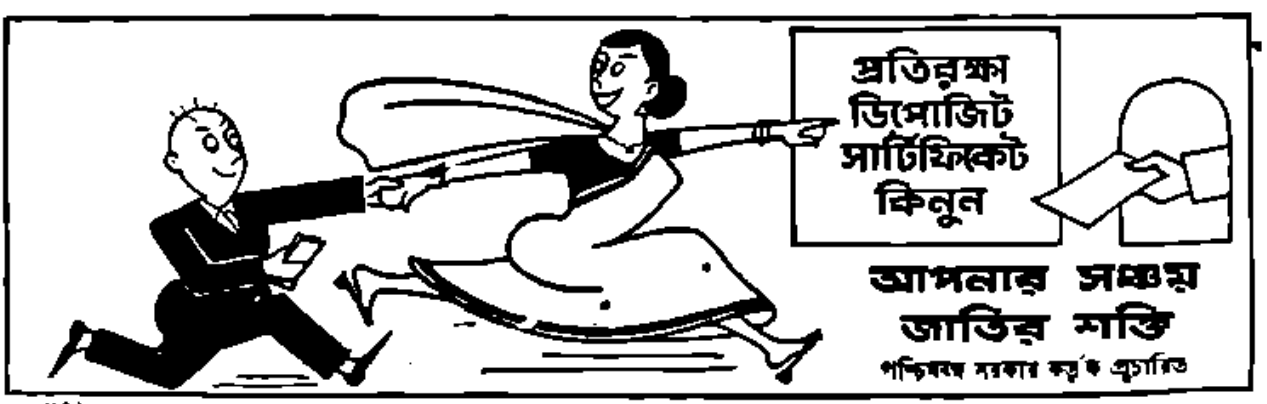

WB-U

CAL

736.3
008/x

তোমরা জাগ্রত হও।
তোমরা অমৃতের পুত্র।
এই সত্যজ্ঞান লাভ করিয়া
বলীয়ান হও।
একবার মোহনিদ্রা ত্যাগ করিয়া
দেশের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি
দৃষ্টিপাত কর।

স্বামী অভেদানন্দ

গল্প-ভারতী

পৌষ, ১৩৬৯

লিলির

রিচ

নোনতা

বিস্কুট

লিলি বিস্কুট কোং.প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-৪

A country which has no national literature, or a literature too insignificant to force its way abroad, must always be, to its neighbours at least, in every important spiritual respect, an unknown and unestimated country.

—*Carlyle*

সাজসরঞ্জাম পাওয়া যায়, সাধারণ লোক সে সব কিনতেও পারে. কিন্তু যাদুকররা তাতে যাবড়ায় না ; তারা বলে দোকানে বাজনা তো অনেক রকম পাওয়া যায়, লোকে তা কেনেও কিন্তু কটা লোক সে সব ঠিকমত বাজাতে পারে ?

সার্কাসের জন্য কংক্রীটের তাঁবু :

বর্তমানে ব্যাভেরিয়ার রাজধানী মিউনিকে একটি সার্কাসের আস্তানা হিসাবে একটি কংক্রীটের তাঁবু তৈরি হচ্ছে। এই তাঁবুটি হবে বিশ্ববিখ্যাত "ক্রোন সার্কাসের" স্থায়ী আস্তানা। এটিই হবে তাদের পাকা বাড়ি ; এর আগে তাদের যে দুটি আস্তানা ছিল, সে দুটিই ছিল কাঠের। একটি আনন্দ উৎসবের মধ্যে সামনের ডিসেম্বরে এই আস্তানাটির উদ্বোধন হবে। এখানে চার হাজার লোক বসে সার্কাস দেখতে পারে। এই কংক্রীটের তাঁবুটির যা নূতনত্ব, তা হচ্ছে এর ঘাবলম্বী ছাদ। নির্মাণকালে সার্কাসের পরিচালক মিসেস ক্রোন-সেদরাথ এটি দেখতে এলে জন্তুজানোয়ারদের তরফ থেকে স্বাগত জানাবার জন্যে একটি শিল্পাঞ্জী তাঁকে একটি ফুলের তোড়া উপহার দেয়।

। ইনটারন্যাশনাল স্টুডেন্টস্ থিয়েটার—মস্কো ।

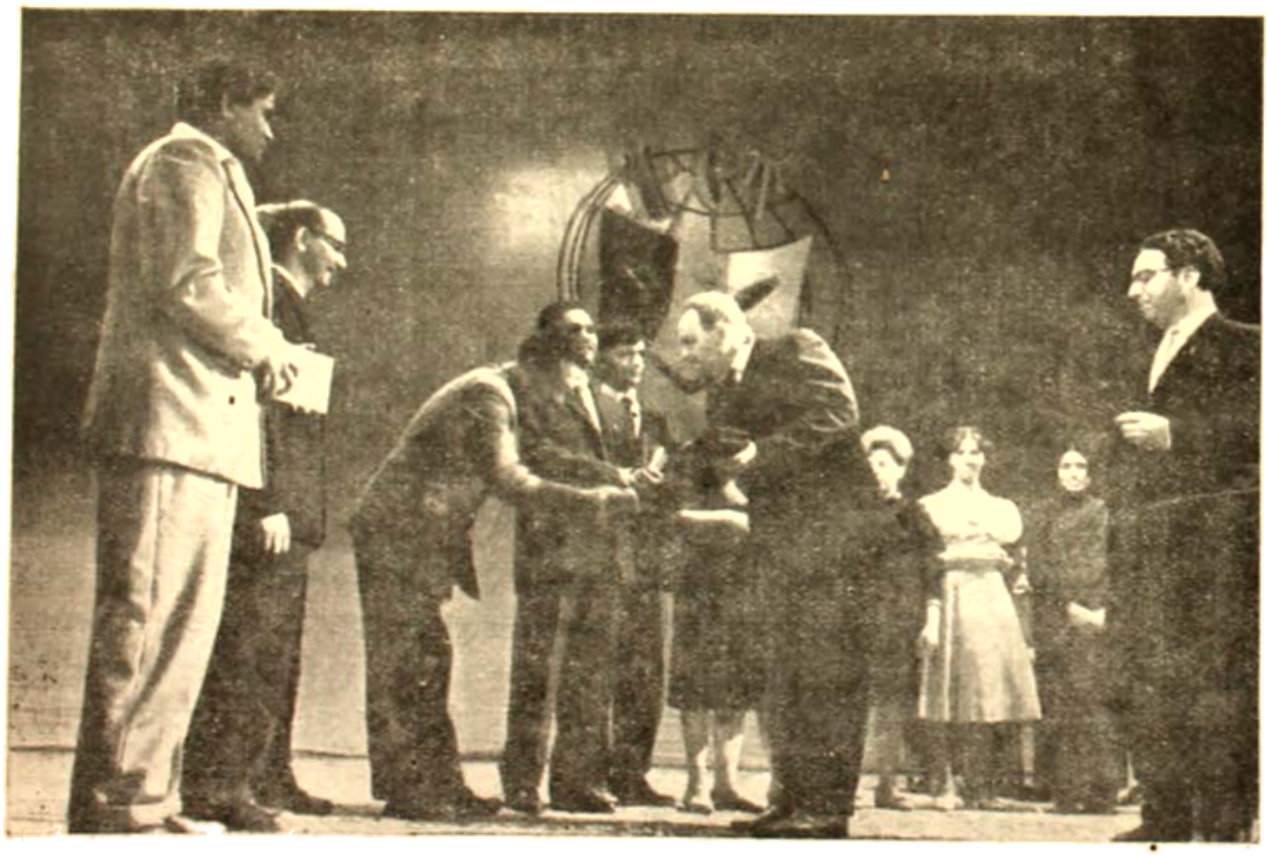

দেশ-বিদেশ :

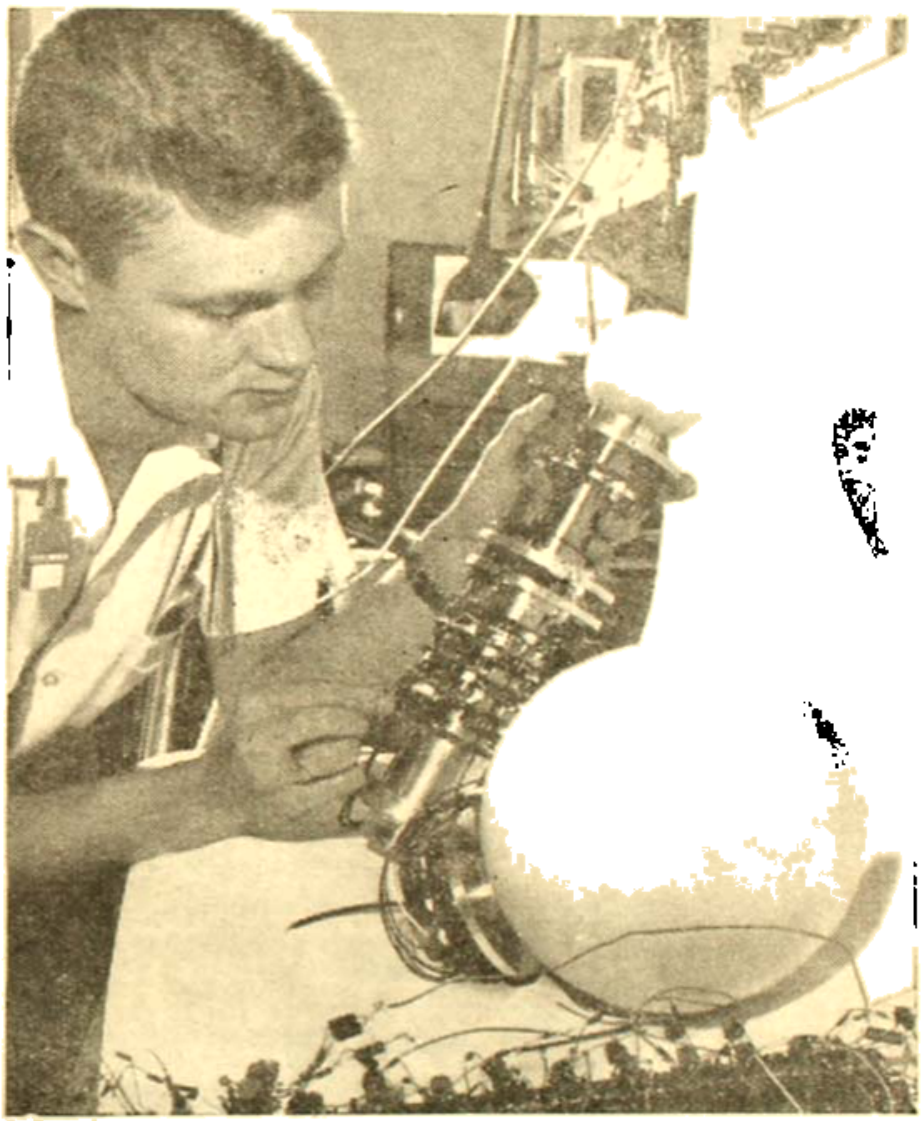

মহাকাশ অভিযানে তেজ বিকীরণ সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য যেসব যন্ত্র মহাপতি কৃত্রিম উপগ্রহের সঙ্গে পাঠানো হয়—
এখানে তারই একটি দেখা যাচ্ছে।

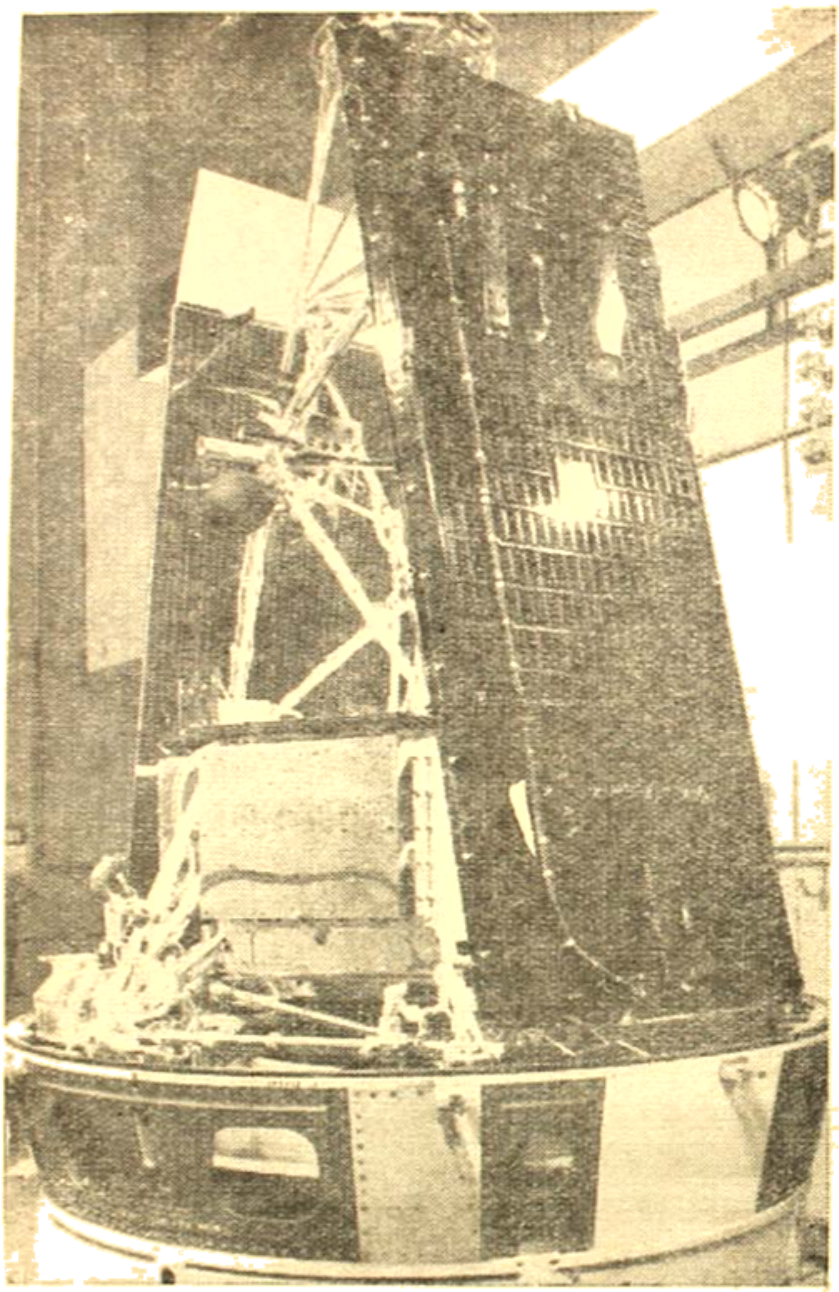

ছয়টি বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার যন্ত্রপাতিসহ ৩৪৭ পাউণ্ড ওজনের ম্যাগিনার—২ মহাকাশ যান। পৃথিবী থেকে নিক্ষিপ্ত হবার চারদিন পর চারটি যন্ত্রের কাজ আরম্ভ হয়।

ক্লিভল্যাণ্ডের লিউস গবেষণাকেন্দ্রে ইঞ্জিনীয়ারগণ সেটার্ণ রকেটের একটি মডেল পরীক্ষা করছেন। ইঞ্জিনীয়ারগণ অগ্নিনিরোধক পোষাক পরে ৮টি মুখবিশিষ্ট একটি রকেটে অগ্নি-সংযোগ করেন। ঐ রকেটে তরল জ্বালানী ব্যবহার করা হয়।

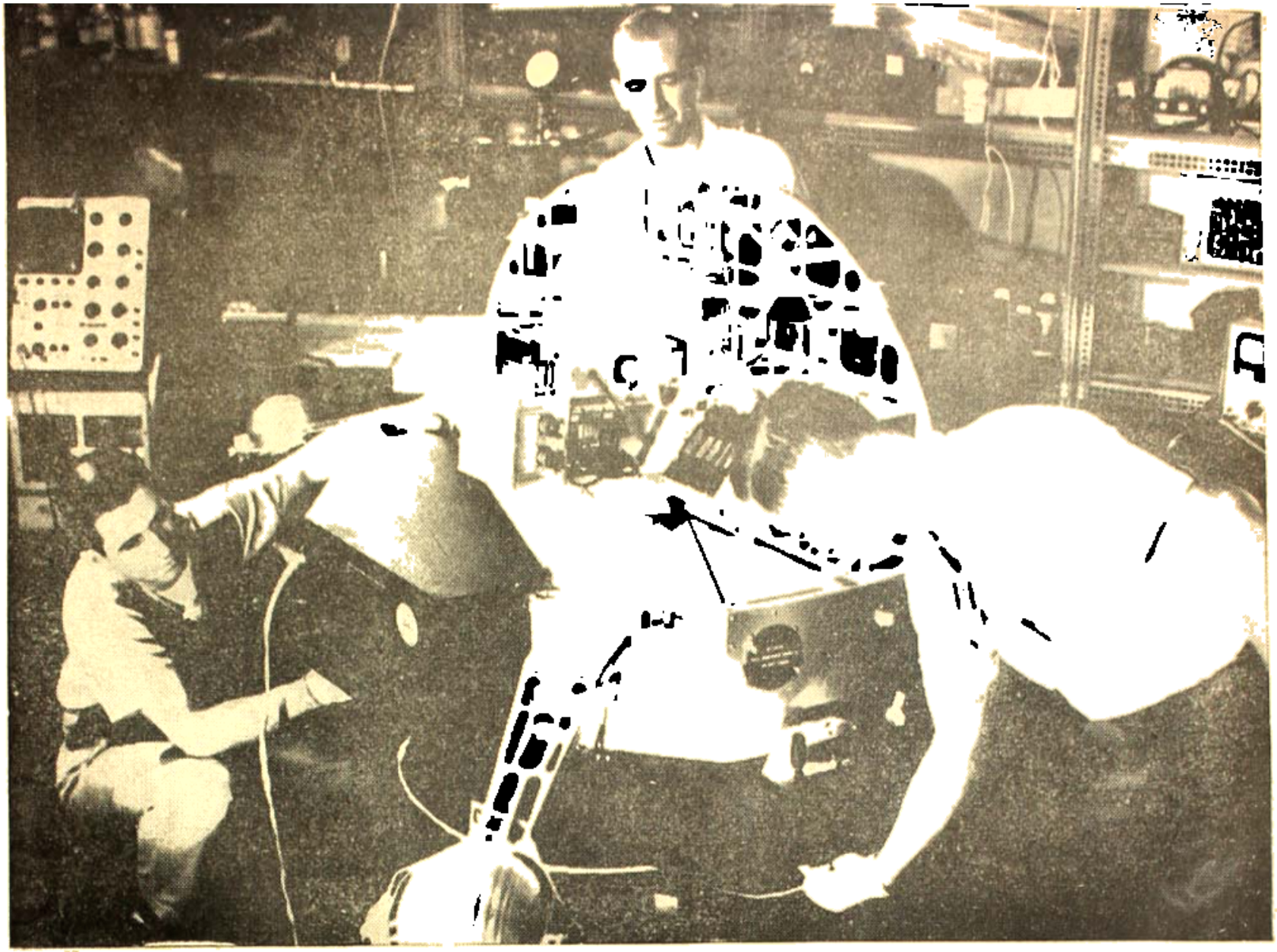

সৌরমণ্ডল পর্যবেক্ষণের জন্য গত ৭ই মার্চ (১৯৬২) একটি কৃত্রিম উপগ্রহকে মহাকাশে প্রেরণ করা হয়। ঐ উপগ্রহটি বেতারে সৌরমণ্ডল সম্পর্কে মূল্যবান তথ্যাদি পৃথিবীতে প্রেরণ করে। ছবিতে ৪৪০ পাউণ্ড ওজনের ঐরূপ একটি কৃত্রিম উপগ্রহ জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার টেক্‌নিশিয়ানগণ কেপ ক্যানাভেরালে পরীক্ষা করছেন।

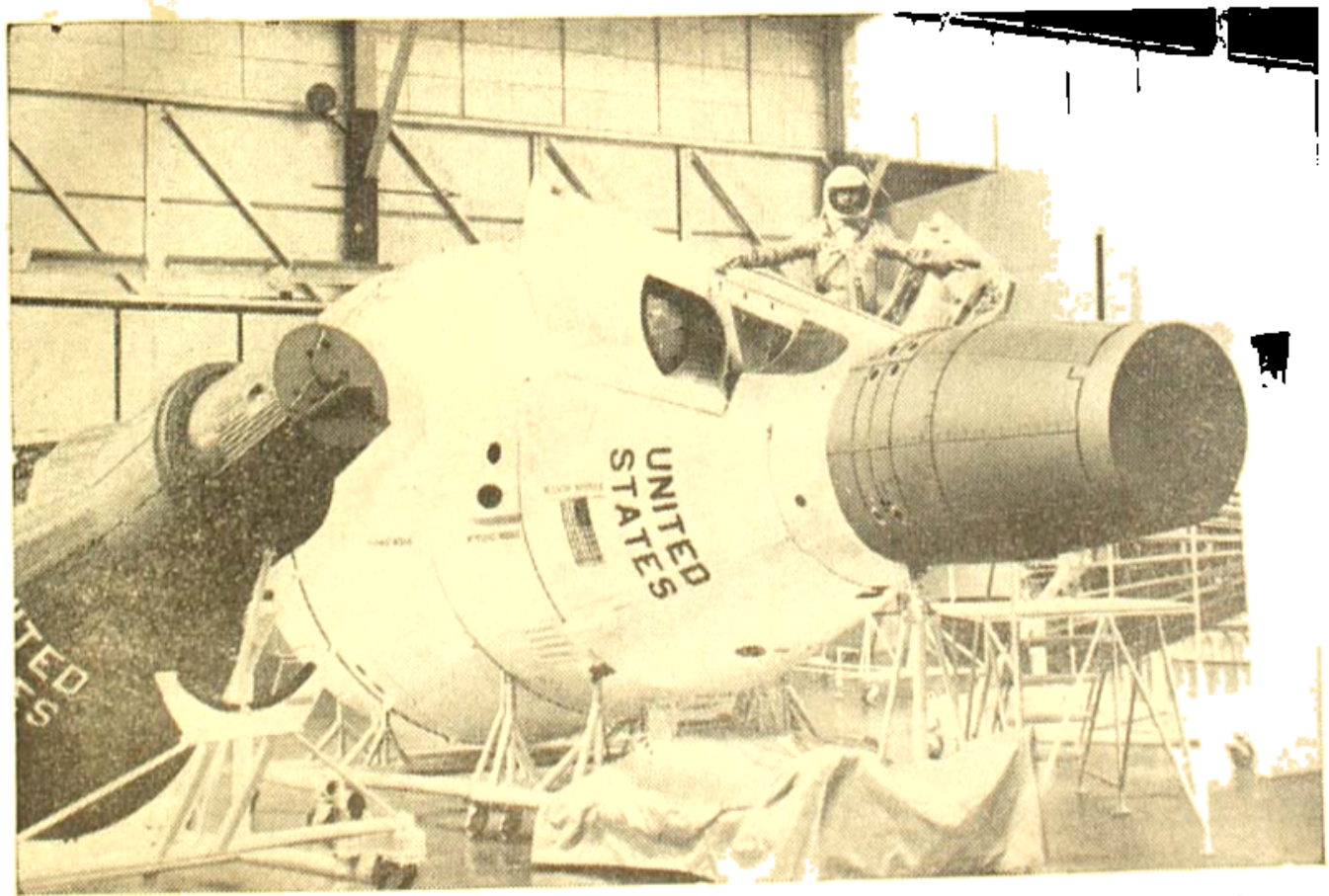

দুইজন মানুষ বহনের উপযোগী ৩ টন ওজনের জেমিনি মহাকাশযানটিকে (ডানদিকে) সেন্ট লুইয়ের একটি বিমান কারখানায় দেখা যাচ্ছে। জেমিনি মহাকাশযানটির ওজন মার্কারী ক্যাপসুলের প্রায় দ্বিগুণ। টাইটান—২ নামক রকেটের সাহায্যে একে কক্ষপথে পাঠান হবে।

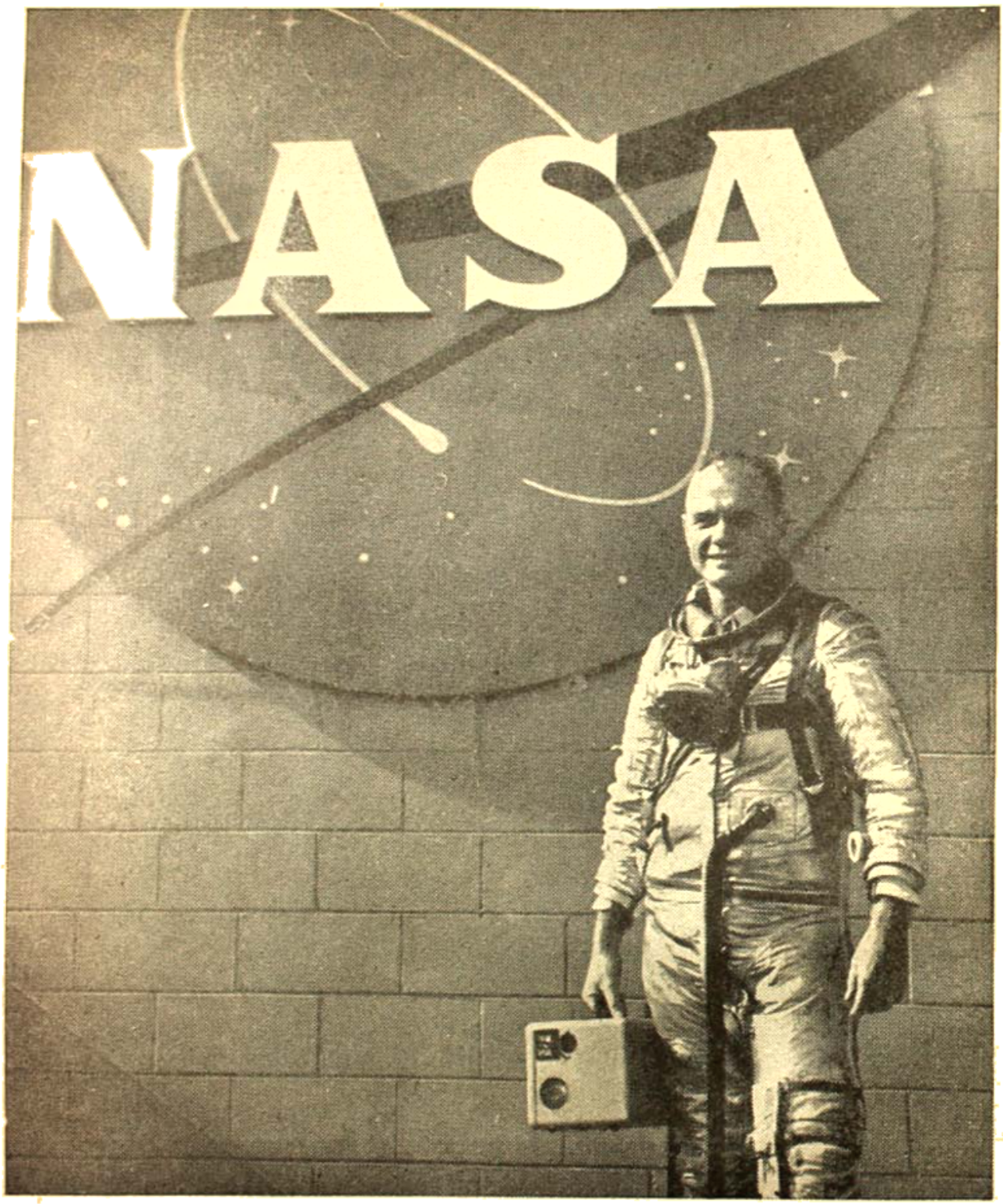

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিমানবিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার প্রতীক চিহ্নের সম্মুখে দণ্ডায়মান মহাকাশচারী জন গ্লেন। আমেরিকার মধ্যে জন গ্লেনই প্রথম মহাকাশচারী।

মহাকাশে অভিযান করার আগে মহাকাশচারীদের মহাকাশ বিজ্ঞানের কত শাখাই না রপ্ত করতে হয়েছে, কত নিখুঁত যন্ত্র ও নক্ষত্রপুঞ্জের মানচিত্র তাঁদের অধ্যয়ন করতে হয়েছে এই পৃথিবীতে বসে।

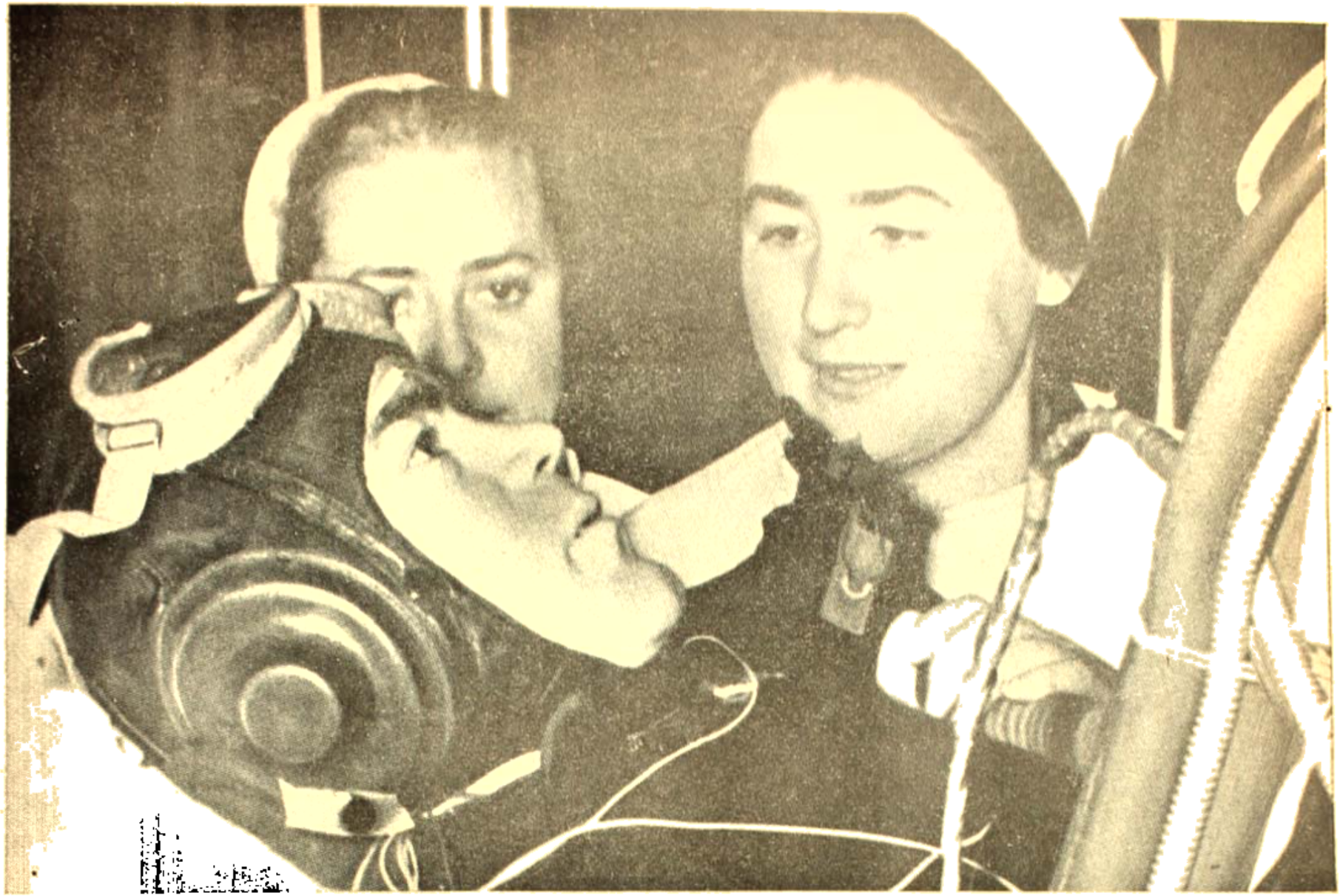

সোভিয়েত রাশিয়ার মহাকাশচারীদের মহাকাশে প্রেরণের পূর্বে ডাক্তারী পরীক্ষা, যাচাই করা এবং নিয়ন্ত্রণ···এবং আবার পরীক্ষা, বিশ্লেষণ এবং যাচাই করা। মহাকাশচারীরা অবশ্য খুবই ঠাণ্ডা মাথার মানুষ।

ভারতীয় পার্লামেন্টারী প্রতিনিধিদল মস্কো বিমান বন্দরে অবতরণ করছেন। সম্মুখভাগে প্রতিনিধিদলের নেতা পার্লামেন্টের স্পীকার সর্দার হুকুম সিং।

খেলাধূলা

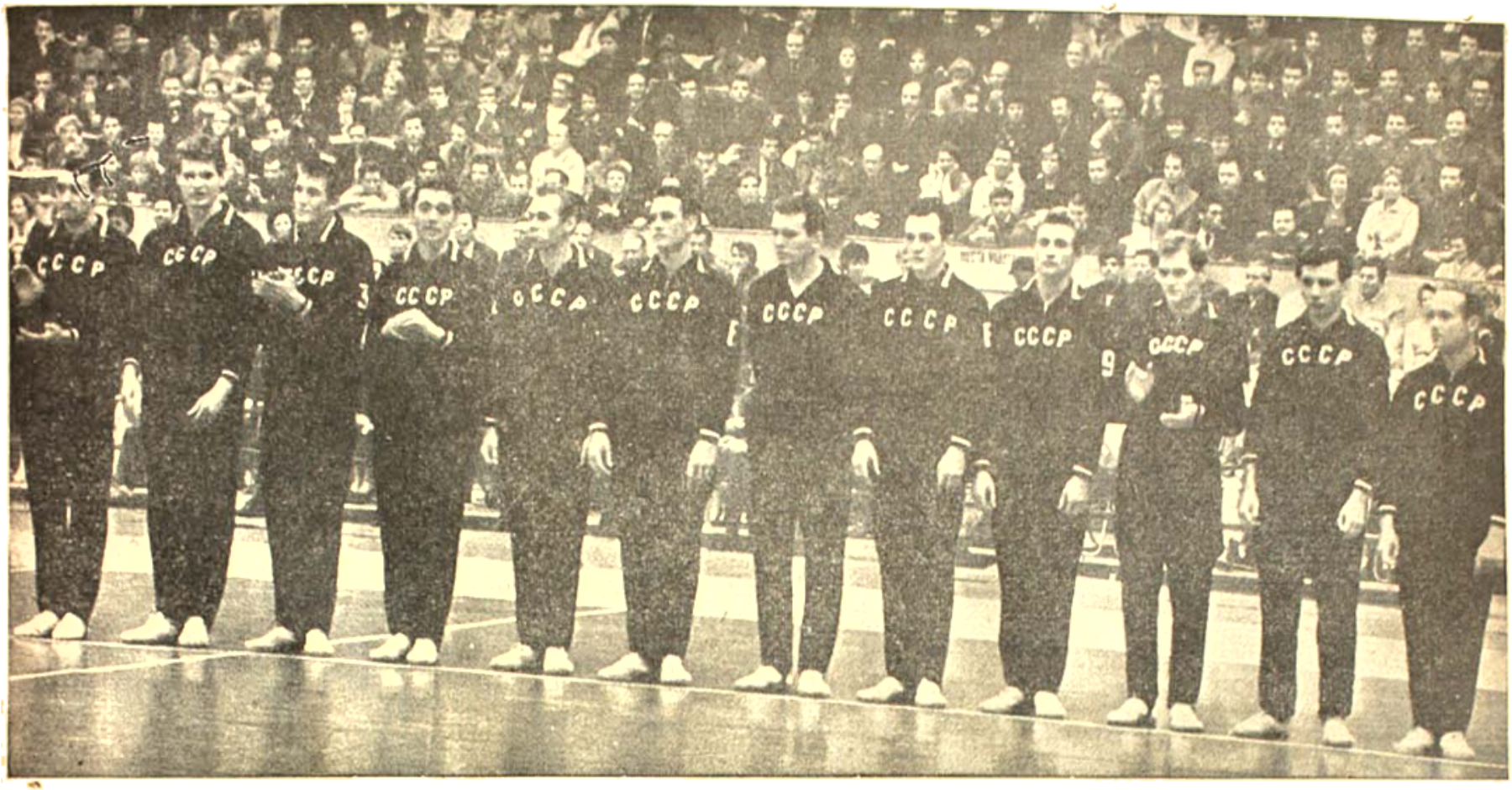

বিশ্ববিখ্যাত সোভিয়েত ভলিবল খেলোয়াড়বৃন্দ।

আলোকচিত্র :

ন্যাশনাল
আর্ট গ্যালারীতে
১৮টি বিখ্যাত
ভাস্কর্যের অন্যতম
নিদর্শন।

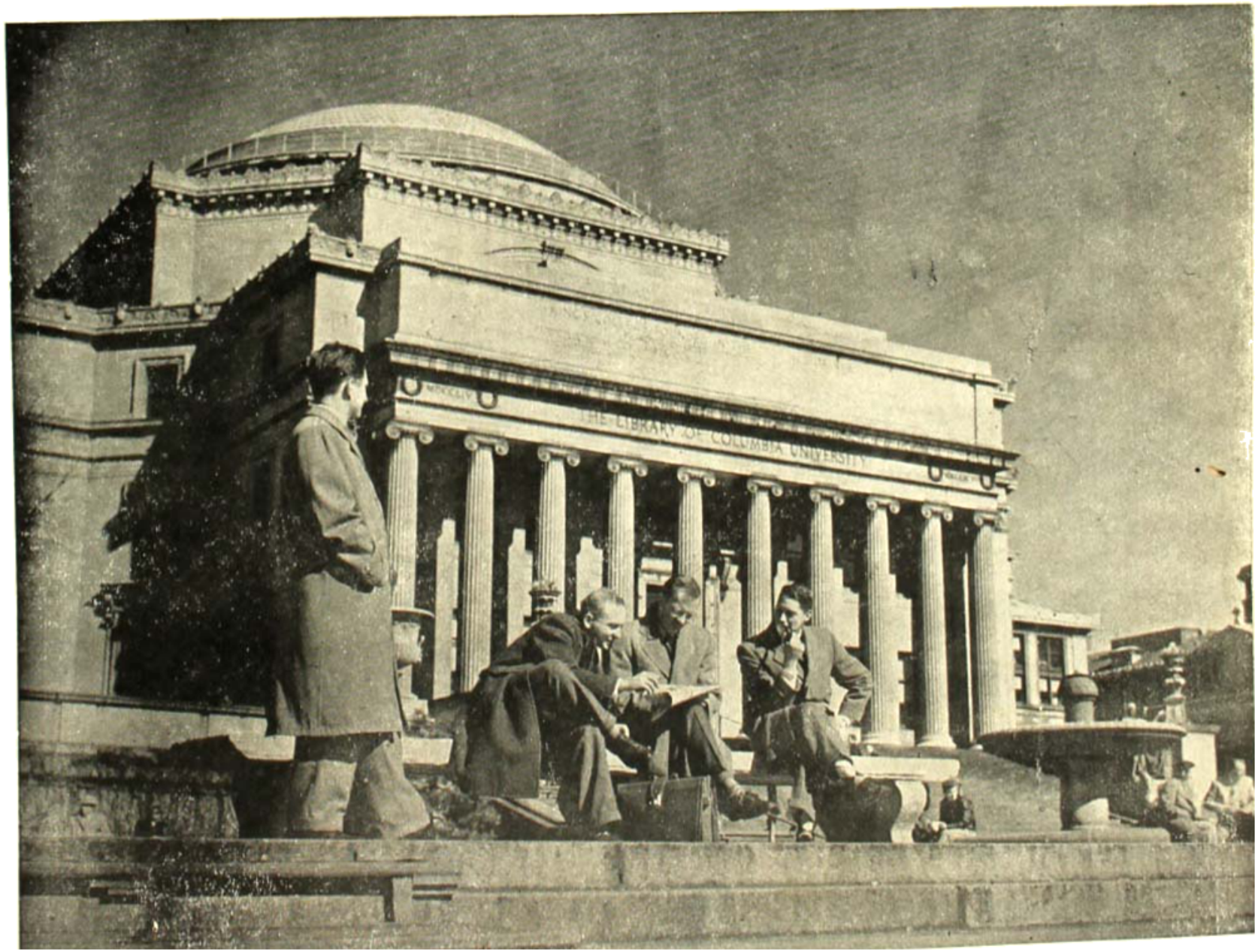

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার গৃহ।

আলোকচিত্রকলা :

বিশ্বখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। আলোকচিত্রে তার ঐতিহ্যের প্রতিফলন।

CALCUTTA UNIVERSITY

Carry the light and the life of Vedanta—to every door and rouse up the divinity that is hidden within every soul.

—Swami Vivekananda

গল্প-ভারতী

মাঘ ॥ ১৩৬৯

লিলির রিচ নোনতা বিস্কুট

লিলি বিস্কুট কোং.প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-৪

দেশ-বিদেশ

কনস্তান্ স্তানিস্‌লাভস্কি

কনস্তান্ স্তানিস্‌লাভস্কির নাম সারা দুনিয়ায় সুবিদিত। এই নামটি উচ্চারণ করলে বোঝায় নাট্য-কলার ক্রমবিকাশের একটি নূতন অধ্যায়। স্তানিস্‌লাভস্কি নাট্য জগতের শ্রেষ্ঠ প্রযোজক ও পণ্ডিতদের অন্যতম। তাঁহারই প্রবর্তিত স্তানিস্‌লাভস্কি পদ্ধতি পৃথিবীর অধিকাংশ রঙ্গমঞ্চে অনুশীলিত হয়। তিনিই ছিলেন মস্কো আর্ট থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধার। স্তানিস্‌লাভস্কি একাধারে বিশ্বসেরা অভিনেতা ও চিন্তানায়ক।

সেক্সপীয়র, চেখভ, ইবসেন ও গোর্কি প্রমুখ বিশ্ব-প্রতিভার সমঝদার ও ভাষ্যকার স্তানিস্‌লাভস্কি ভারতীয় সাহিত্য ও শিল্প-কলারও অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। তাঁহারই উদ্যোগে ১৯১৭-১৯১৮ সালের থিয়েটার মরশুমের সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "চিত্রাঙ্গদা", "ডাকঘর" ও "রাজা" নাটকের মহড়া শুরু হয়। দুঃখের বিষয়, গৃহযুদ্ধের কঠিন, কঠোর অধ্যায়ে ঐ নাটক তিনটি মঞ্চস্থ করা সম্ভব হয় নাই।

কনস্তান্ স্তানিস্‌লাভস্কি (১৮৬৩-১৯৩৮) ছিলেন মহান শিল্পী ও প্রকৃত দেশভক্ত। তাঁর কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর স্বদেশবাসীদেরই সন্ধান করেছেন।

স্তানিস্‌লাভস্কি ও নেমিরোভিচ-দানচেংকো

স্তানিস্‌লাভস্কির কাছে শিল্পের সত্য আর সৌন্দর্য ছিল অবিচ্ছেদ্য। তাঁর মতে, প্রেক্ষাগৃহের উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে গভীর চিন্তাধারা নয়, রঙ্গমঞ্চের উপরের বক্তৃতাও নয়, দর্শকদের প্রভাবিত, অভিভূত করে বাস্তবের প্রতিফলনের সত্য ও অভিনয়নৈপুণ্যের কবিত্বময় শক্তি। তাঁর কাছে সৌন্দর্য বাদ দিয়ে কোনো সত্য নেই, সত্য ছাড়া কোনো সৌন্দর্য নেই।

১৮৯৭ সাল একটি স্মরণীয় বছর। ঐ বছর ভ্লাদিমির নেমিরোভিচ-দানচেংকোর সঙ্গে স্তানিস্‌লাভস্কির আলাপ-পরিচয় হয়। এই ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারের ফলশ্রুতি হল উভয়ের উদ্যোগে ১৮৯৮ সালে মস্কো আর্ট থিয়েটারের জন্ম। নাট্যকলার স্বার্থে উভয়েই তাঁদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে তুচ্ছ জ্ঞান করতেন। শিল্পকলার মন্দিরে তাঁরা নিছক পূজারি ছিলেন না, ছিলেন নতুন আর্টের স্রষ্টা। পুরাতন ব্যাবস্থাপনা পাল্টে দিয়ে বহুমুখ

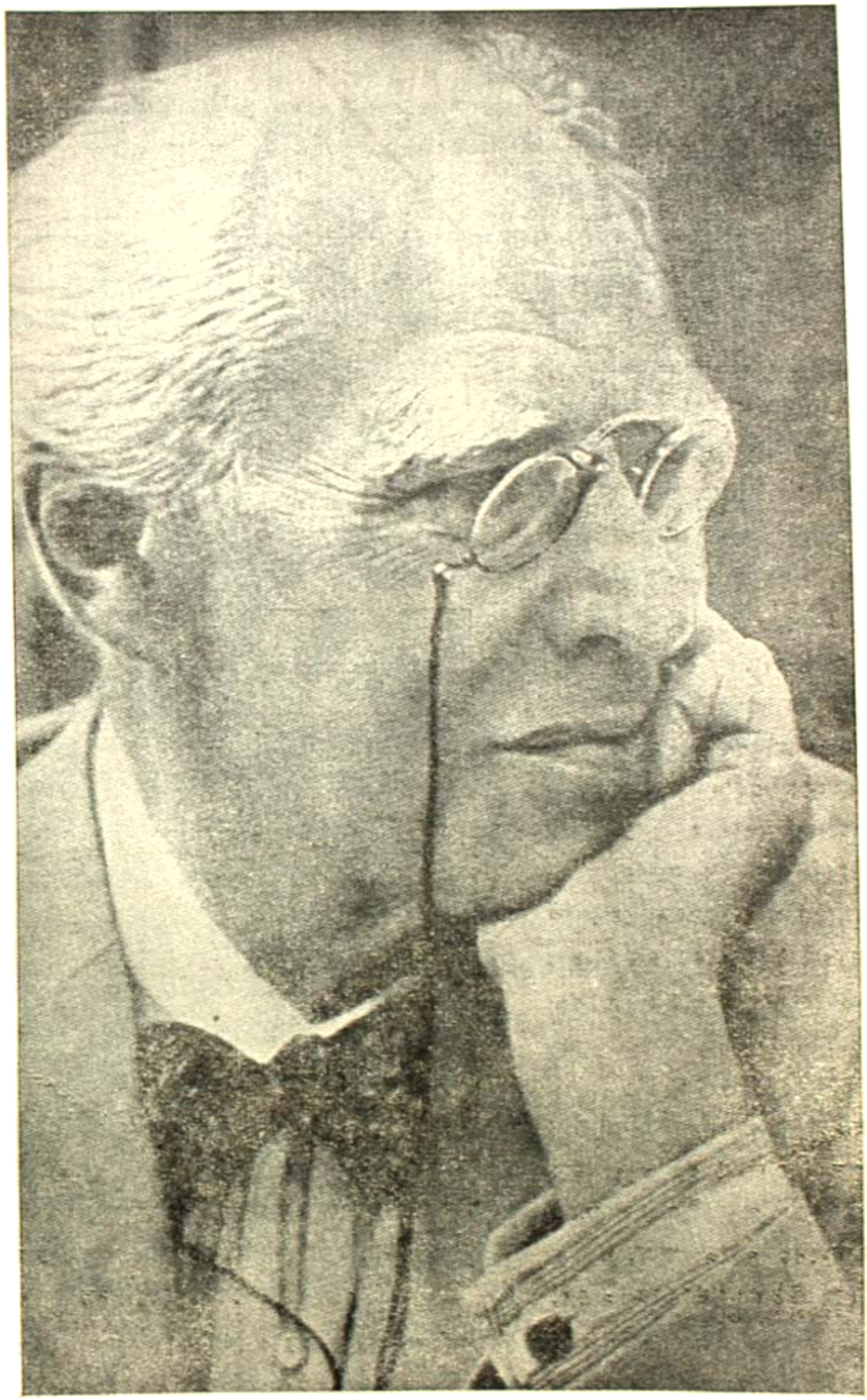

কলকাতায় তাদিস্লাভ হ্রি

সম্ভোগগুলি অস্বীকার করে, সেকেলে রুচি ও অভ্যাস অগ্রাহ্য করে তাঁরা নাট্যকলার ইতিহাসে এক নবযুগের সূত্রপাত করলেন।

নাট্য-জগতে তাঁরাই প্রথম বড় করে তুলে ধরলেন অভিনেতার নীতিবোধের প্রশ্ন, তার বিবেকবুদ্ধির প্রশ্ন, তার ব্যক্তিগত জীবনের ব্যবহার ও সমাজের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্ন। জন্ম নিল "রঙ্গমঞ্চের শিল্পীর" এক আচরণ-বিধি।

এই আচরণবিধি লঙ্ঘিত হলে শান্তস্বভাব স্তানিস্‌লাভস্কি উত্তেজিত হয়ে বলতেন: "নিজেকে যদি অভিনেতা বলে মনে করো, তবে তোমার বৃত্তিগত নিয়মকানুন তোমায় মেনে চলতেই হবে। জনগণের সেবা করো। আর্টের সেবা করো। আর্টকে ভালোবাসো নিজের মধ্যে, নিজেকে আর্টের মধ্যে নয়।"

কোন অভিনেতার পক্ষে উচ্ছৃঙ্খল হওয়া, অলস বা উদাসীন হওয়ার বিরুদ্ধে স্তানিস্‌লাভস্কি ছিলেন খড়্গহস্ত। তিনি ছিলেন নিরলস শ্রমের প্রবক্তা। তাঁরই ভাষায়: "কাজ করে যাও। শ্রান্তক্লান্ত হয়েছ এমন কথা মুখে এনো না।"

তাঁর অনুগামীদের মধ্যে যাঁরা এই শ্রমনিষ্ঠার অনুশাসন অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে পেরেছেন একমাত্র তাঁরাই সগর্বে বলতে পারেন: 'আমি স্তানিস্‌লাভস্কির শিষ্য।'

স্তানিস্‌লাভস্কির অভিমতে, এ ক জ ন অভিনেতাকে হতে হবে সক্রিয় চিন্তাশীল মানুষ, যে পৃথিবীকে দেখবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, অপরের প্রতি হবে সংবেদনশীল —নিজেরও প্রতি। কাজ করতে গিয়ে তাকে হতে হবে একাগ্রমনা, উৎসুক ও নির্ভিক। স্তানিস্‌লাভস্কি নিজে তাই ছিলেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, "সে-লোকের কথায় বিশ্বাস করো না যে-লোক বলে বেড়ায় কঠোর জীবনের চাপে তার প্রতিভা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। প্রতিভা আগুনের মতো। আত্মার আগুন। এই আগুন নিভিয়ে ফেলা যায় না।"

স্তানিস্‌লাভস্কির সাম্প্রতিক মূর্তি সভায় ভাষণ দিচ্ছেন অভিনেতা উৎপল দত্ত

প্রযোজক হিসাবে স্তানিস্‌লাভস্কি ছিলেন অতুলনীয়। তাঁর প্রযোজনায় গুণে নাটকের প্রগতিশীল ভাবধারা দর্শকমনের হৃদয়নের কাছে মোহ্য, প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্ট হয়ে উঠত। তাঁর অভিমতে, নাট্যকার ও দর্শকদের মধ্যে নিছক মধ্যস্থের ভূমিকা গ্রহণ করার অধিকার প্রযোজকের নেই। প্রযোজক হবেন নাটকাভিনয়ের কাঠামোর মধ্যে জনতের সংগঠক। এইখানেই তাঁর আসল।

দেশ-বিদেশ :

বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী :

আমেরিকার নিউ হ্যামশায়ারের পোর্টসমাউথের নিকটবর্তী গ্রীণ একারে স্বামীজী কিছুদিন বাস করেছিলেন। এই গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে স্বামীজী প্রথম আমেরিকায় অদ্বৈতবাদ বেদান্ত দর্শন প্রচার করেন। এই গাছটি "স্বামীজী পাইন গাছ" নামে পরিচিত।

সারাভারতে এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে বৎসরব্যাপী বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের আয়োজন করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সহরে স্বামী বিবিদিষানন্দ গত ৩০শে জানুয়ারী বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যে ও সহরে বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত হবে।

দেশ-বিদেশ :

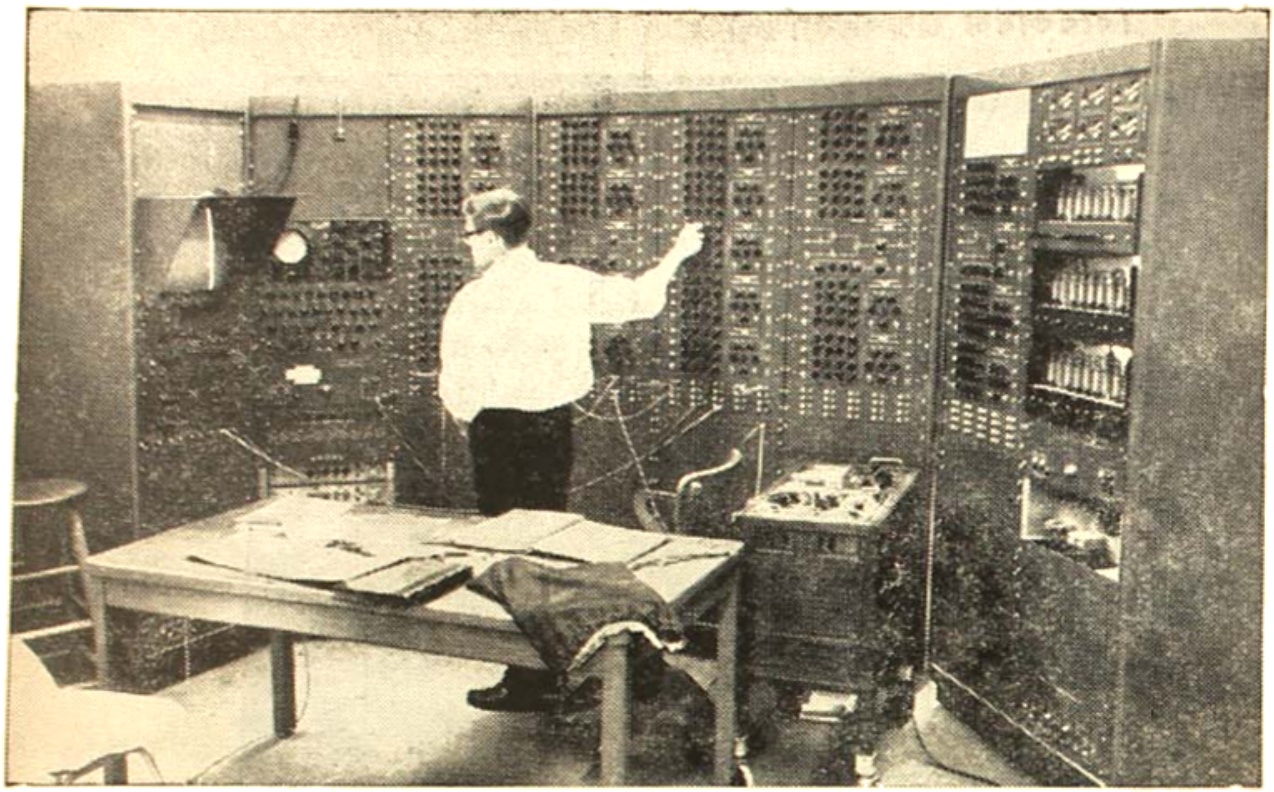

ম্যাসাচুসেটস্ ইন্‌স্টিটিউট অব টেকনোলজী ও ইঞ্জিনীয়ারিং প্রোজেক্ট ল্যাবরেটরীতে কর্মনিরত একজন ছাত্র। গত বৎসর প্রতিষ্ঠিত এই লাইব্রেরীতে ৩জন অধ্যাপক, ৬০জন উপদেষ্টা শিক্ষক এবং গ্রাজুয়েট সহকারী মিলে কাজ করেন। দেড়শতাধিক স্নাতক-পূর্ব পর্যায়ের ছাত্রও এই গবেষণাগার ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে থাকেন।

জার্মাণ গ্রন্থ সংগ্রহশালার প্রদর্শনীকক্ষে গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি

দেশ-বিদেশ :

শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকবার্তা সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনী সভা :

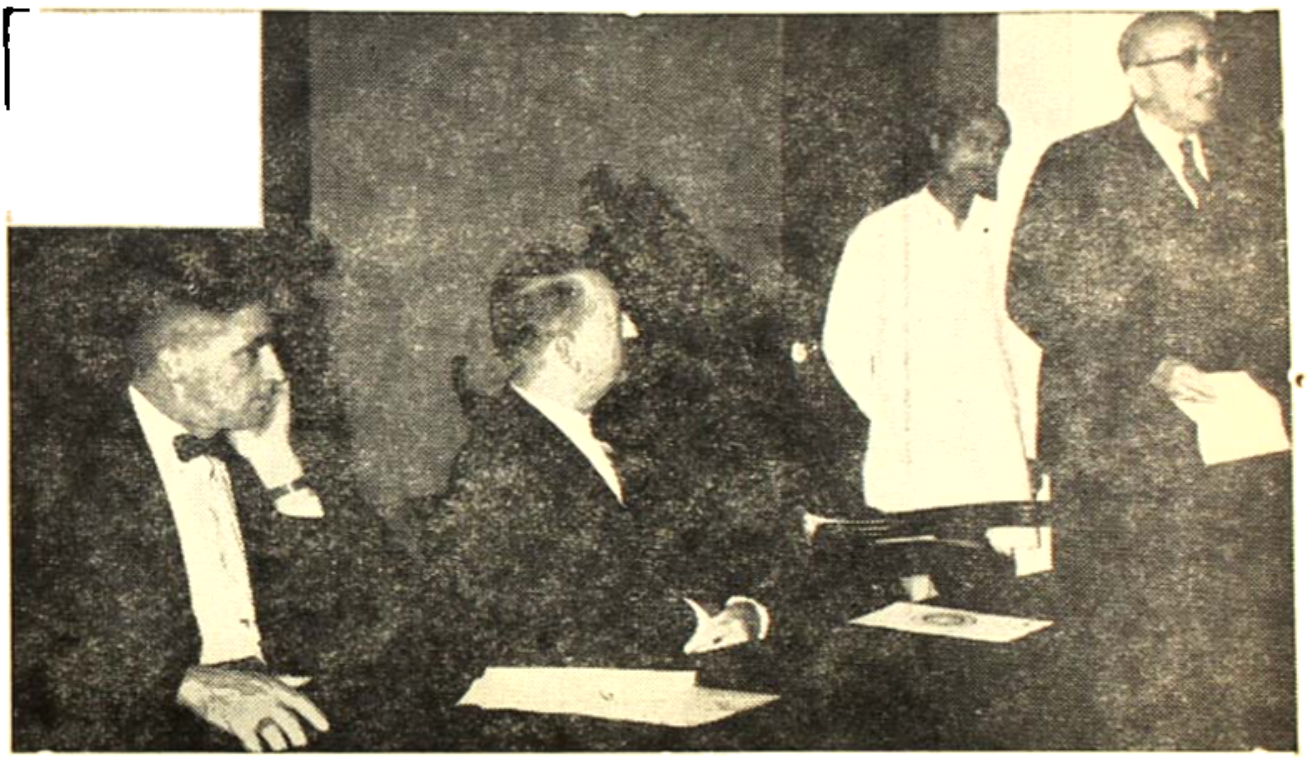

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউ. এস. আই. এসের উদ্যোগে কলকাতার শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা, আলোচনা এবং চলচ্চিত্রপ্রদর্শন প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রী বি. মালিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। অভ্যাগতদের সম্বর্ধনা জানান ইউ. এস. আই. এসের পাবলিক অ্যাফেয়ার্স অফিসার মিঃ সিলবার্ট এফ. অস্টিন। পরিকল্পনাটির প্রধান বিষয় হবে কলকাতা নগর উন্নয়ন সংক্রান্ত পাঁচদিনব্যাপী বৈঠক। রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনার ও বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ছাড়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান, শিল্পশিক্ষা ও সাংবাদিকবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।

দেশ-বিদেশ :

অল্প খরচে টেলিগ্রাম পাঠানো

অল্প খরচে টেলিগ্রাম অফিস

অল্প খরচে তারবার্তা : "গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রয়েছে জনমতের। জনমত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অপরিহার্য্য অঙ্গ।..." ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন টেলিগ্রাফ কোম্পানী নূতন যে জনমত বিভাগটি খুলেছেন তা ঐ মতের কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন রাষ্ট্র বিজ্ঞানী বা পোলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট সিটার এইচ ওডসার্ড। এই নূতন ব্যবস্থার মাধ্যমে যে কোন মার্কিন নাগরিক অতি অল্প খরচে অতি দ্রুত তাঁর অভিমত ও তাঁর কোন প্রশ্ন, টেলিগ্রামের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, সেনেটর অথবা কংগ্রেস সদস্যদের জানাতে পারেন। এই সকল ব্যক্তিগত মতামত সম্বলিত টেলিগ্রাম অতিরিক্ত সামান্য কি নিয়ে হোয়াইট হাউস ও কংগ্রেস সদস্যদের অফিসে দ্রুত বিলি করা হয়। গত মাসে এই ব্যবস্থা স্থায়ী করা হয়েছে ; প্রেরক তাঁর নাম ও ঠিকানা সহ ১৫টি শব্দের বার্তা প্রেরণ করতে পারেন। এই ব্যবস্থায় সরকারের কাজকর্ম সম্পর্কে যে কোন মার্কিন নাগরিক তাঁর ব্যক্তিগত মতামত প্রেসিডেন্ট, ভাইস-প্রেসিডেন্ট অথবা কংগ্রেস সদস্যদের জানাতে পারেন। যাদের বাড়ী টেলিফোন আছে তাঁদের টেলিগ্রাম অফিসে আসারও প্রয়োজন হয় না। টেলিগ্রাফ অফিসকে টেলিফোনেই তাঁরা নির্দেশ দেন এবং যে কথা প্রেসিডেন্ট, ভাইস-প্রেসিডেন্ট অথবা কংগ্রেস সদস্যদের জানাতে হবে টেলিগ্রাফ অফিস ঐ নির্দেশ অনুসারে সেই কথা জানিয়ে থাকেন। গত বছর ফেব্রুয়ারী মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ৫,৬০,০০০ টেলিগ্রাম ওয়াশিংটনে প্রেরিত হয়েছে।

সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের হাতে কাজের জন্য ব্যাপক সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা আছে।
ছবিতে নোভোসিবির্স্ক শহরে সাইবেরিয়া বিজ্ঞান আকাদেমীর
পারমাণবিক রি-অ্যাকটরটি দেখা যাচ্ছে।

প্রতি চার ঘণ্টায় ৩০০ বই। নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরীর বারান্দায় ঘরে ঘরে সাজানো ৩০০ বইয়ের স্তূপ। পরিদর্শন করছেন লাইব্রেরীর ১৯৮২-৮৩ সালের অর্থভাণ্ডারের জন্য আবেদনকারী সমিতির প্রেসিডেন্ট। প্রতি চার ঘণ্টায় প্রতিদিন ৩০০ বই এই লাইব্রেরীতে এসে জমা হয়। নিউইয়র্কে এই রকম ৮০টি লাইব্রেরী আছে। সমস্ত পৃথিবীর ৩০০ ভাষা ও উপভাষায় বিভিন্ন বিষয়ে রচিত ৭০ হাজারেরও উপর বই এই লাইব্রেরীতে সংগৃহীত হয়। জনসাধারণ, প্রাদেশিক সরকার এবং পৌরকর্তৃপক্ষের সাহায্যে লাইব্রেরীর ব্যয় সঙ্কুলান করা হয়ে থাকে। প্রতিদিন লাইব্রেরীতে ৮ হাজারের উপর লোক সমাগম হয়।

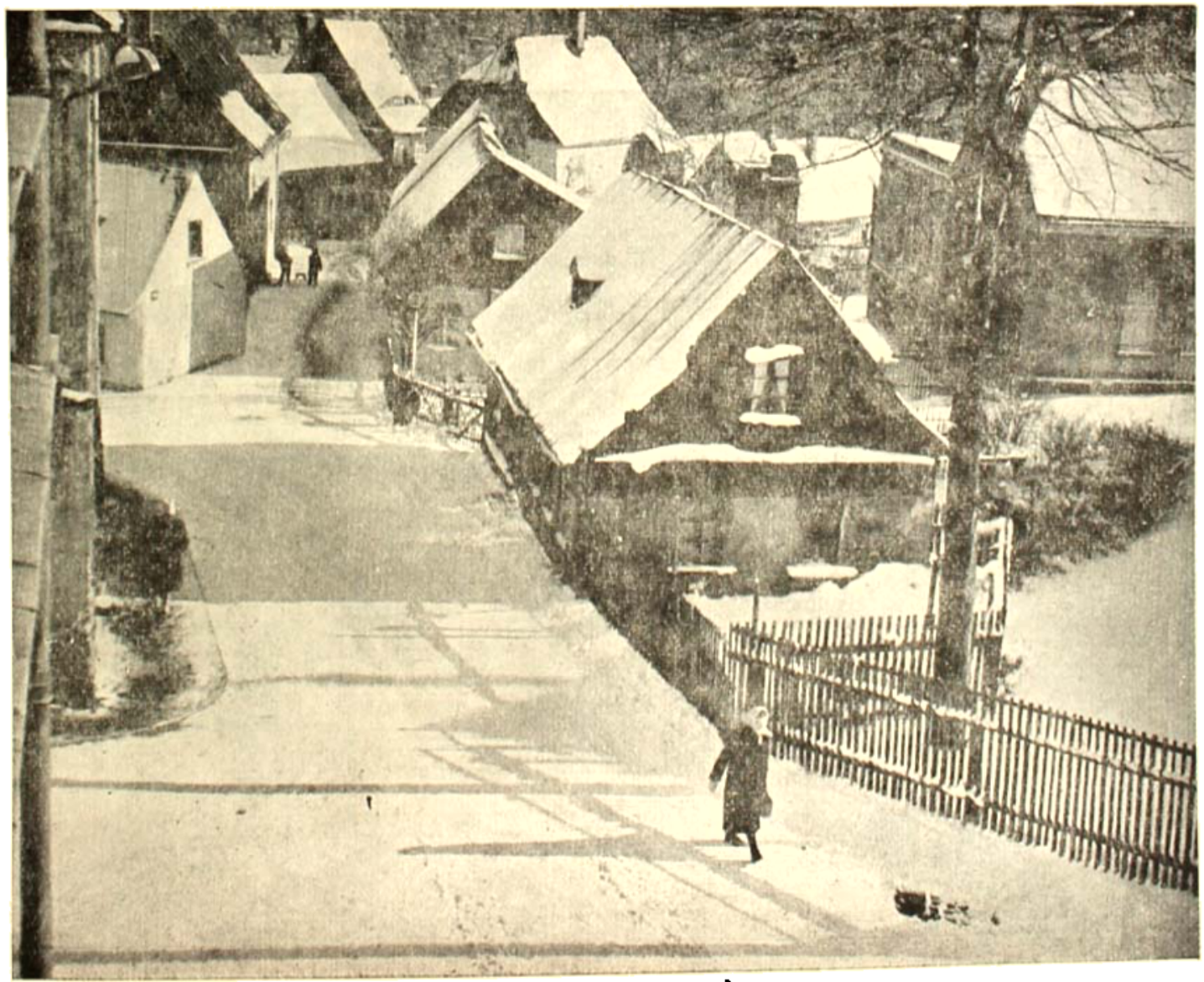

জার্মাণীতে—শীতের সৌন্দর্য্য।

দেশ-বিদেশ :

রুশিয়ার বিখ্যাত মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ভবনের সম্মুখে ছাত্র-ছাত্রী দল।

আমার চিত্রশালা প্রদর্শনী :

অবগাহন
শিল্পী : অধ্যাপক রতোলফ বের্গাণ্ডার (জন্ম—১৯০৯)

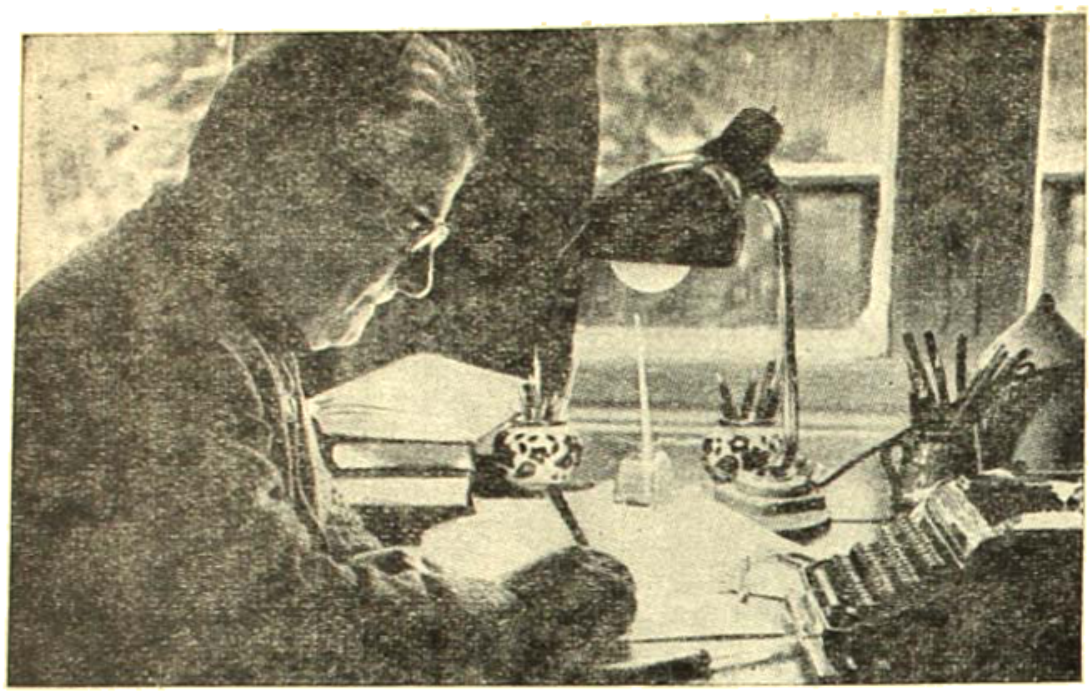

প্রখ্যাত সোভিয়েত শিল্পী লেখক ও বিজ্ঞানী ডক্টর ইয়াকলি আন্‌দ্রোনিকফ্‌। তিনি প্রথমতঃ একজন চমৎকার লেখক ও অভিনেতা এবং অভিনেতা আন্‌দ্রোনিকফের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয় সাহিত্য রচনায়।

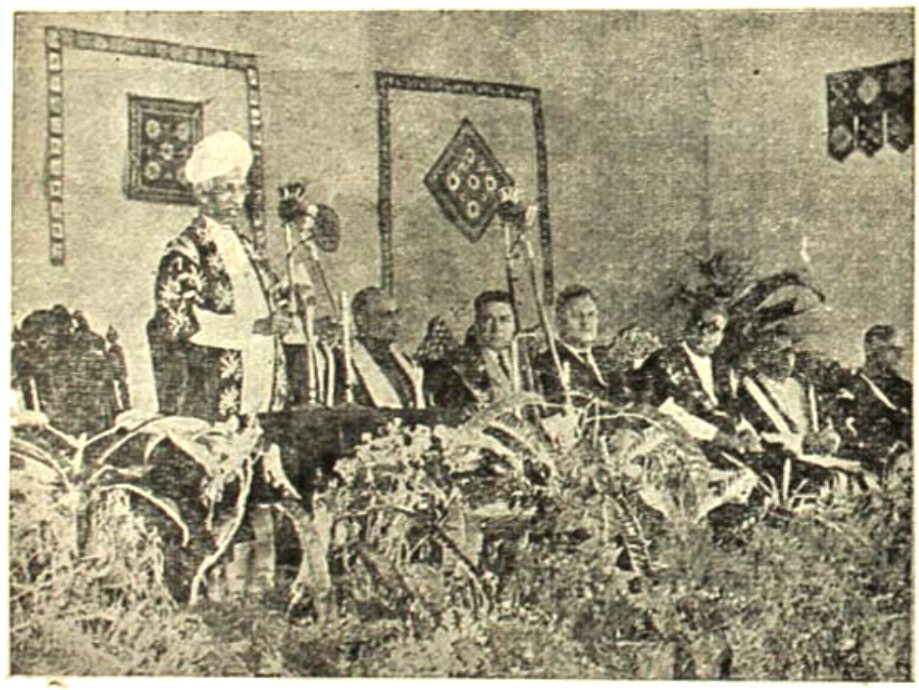

সোভিয়েত সহায়তায় নির্মিত যশের ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট অব্‌ টেকনোলজি ১৯৬২ সালের ২২শে ডিসেম্বর তাহার প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠান সাঙ্গ করে। ১০১ জন ছাত্র টেকনোলজিতে স্নাতকোত্তর উপাধি এবং ৭০ জন স্নাতক উপাধি লাভ করেন। ছবিতে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণকে সমাবর্তন ভাষণ দিতে দেখা যাচ্ছে। ছবিতে ভারতস্থ সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত আই. এ. বেণেদিক্তোফকেও দেখা যাচ্ছে (বাঁদিক থেকে তৃতীয়) তিনিও অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন।

দেশ-বিদেশ:

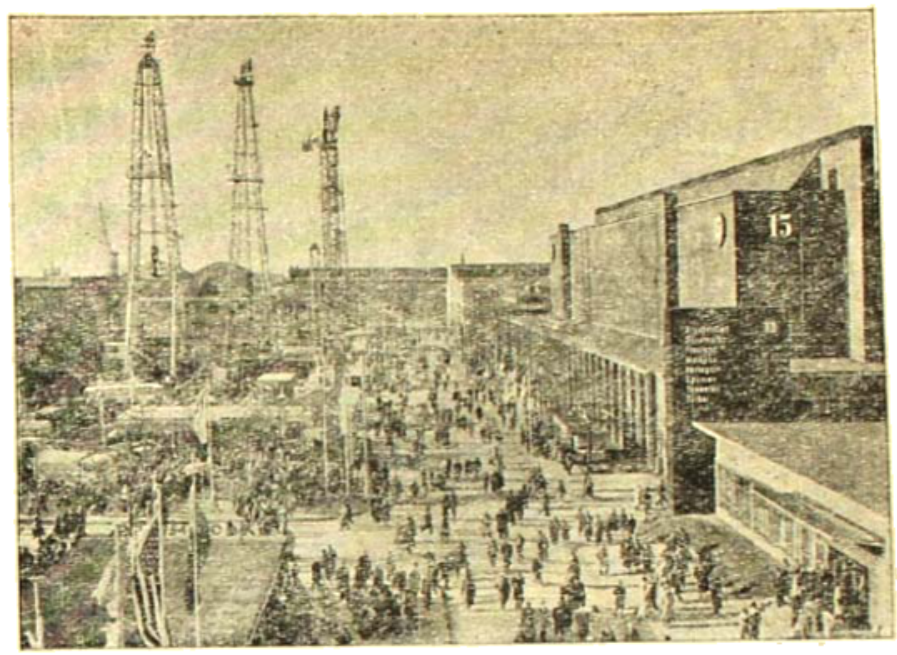

জার্মানীর প্রসিদ্ধ লাইপৎসিক মেলার একাংশ

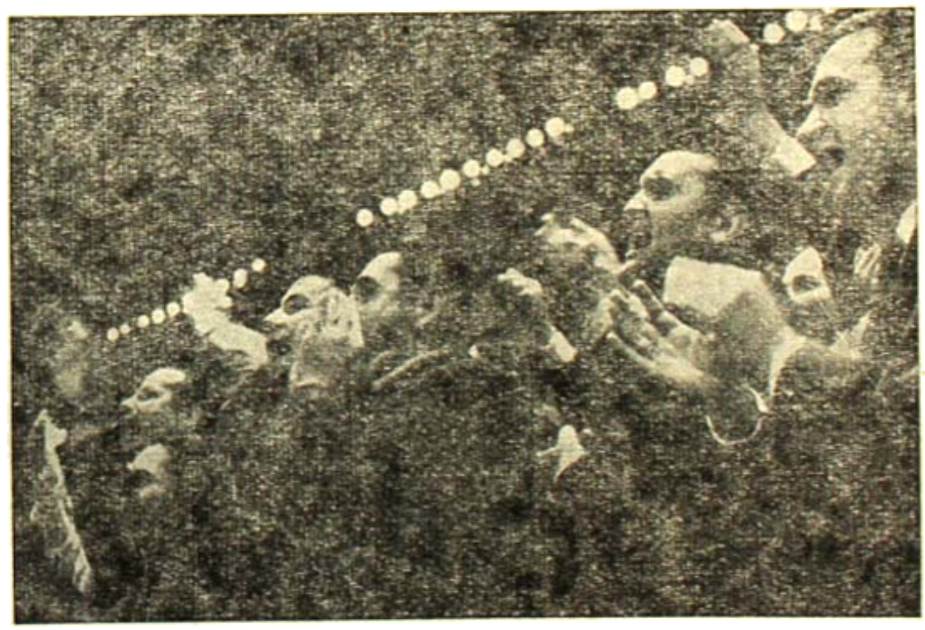

ভলিবল খেলার,খেলোয়াড়দের অভিবাদন জানাচ্ছেন জার্মাণ দর্শকবৃন্দ।

খেলাধুলা :

গণতান্ত্রিক জার্মানীর ক্রীড়াসংগঠন 'কোয়ার্টস্' আয়োজিত স্কি-অনুশীলন কেন্দ্র। সপ্তাহে দু'দিন বা তিন দিন ১০ থেকে ১৪ বছরের বালকদের বিনা-মূল্যে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। প্রত্যেকটি স্কুলেও এমনি ধরণের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। বরফ পড়ার আগেও অনুশীলন বন্ধ হয় না। তখন তৈরী হয় স্কি-জাম্পিং-এর কৃত্রিম ক্ষেত্র —যেমনটি চিত্রে দেখা যাচ্ছে।

পুরুষদের ডাইভিং প্রতিযোগিতায় বিজয়ী কুর্ট মুকভিকা (অস্ট্রিয়া) মহিলাদের ডাইভিং, হাই-ডাইভিং প্রতিযোগিতায় বিজয়িনী ইনগ্রিড ক্রামারকে (গণতান্ত্রিক জার্মানি) অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

ভারত-প্রসঙ্গে

কলকাতার ব্রিটিশ ওল্ড ডিক সম্প্রদায়।

আমেরিকা :

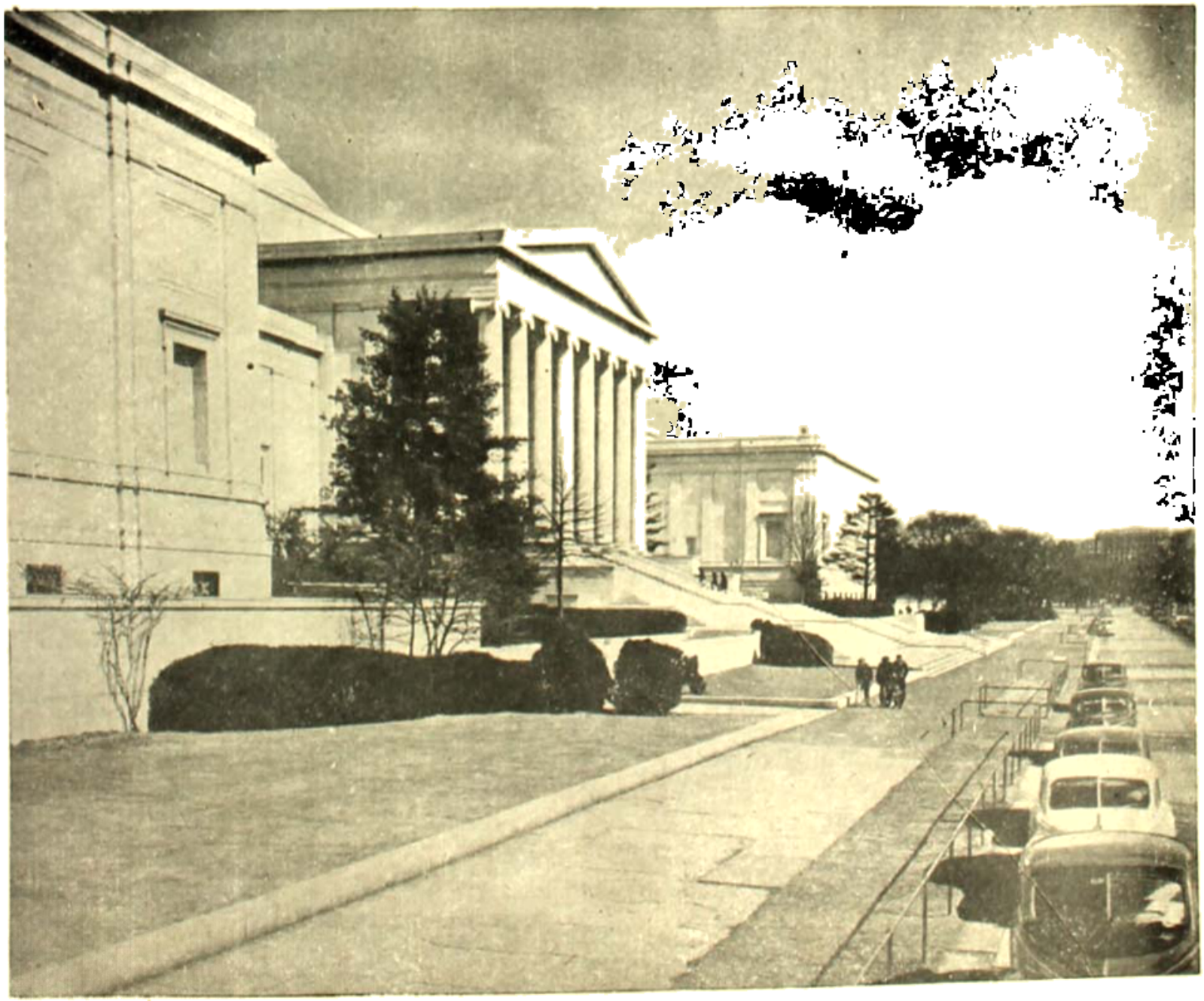

ওয়াশিংটনে অবস্থিত
আমেরিকার বিখ্যাত
ন্যাশনাল
আর্ট গ্যালারী।

আমেরিকার বিখ্যাত ব্যালেট নর্তকী মারিয়া ট্যালচিফ ।

শেক্সপীয়ারের ম্যাকবেথ নাটকের ভূমিকায় মরিস্ ইভ্যানস্ (ম্যাকবেথ) ও জুডিথ এ্যাণ্ডারসন্ (লেডী ম্যাকবেথ)

শেক্সপীয়ারের ম্যাকবেথ নাটকে নায়কের ভূমিকায় বিখ্যাত আমেরিকান্ অভিনেতা অয়সন ওয়েলস্

জাজ ফেস্টিভ্যালের একজন বিখ্যাত শিল্পী চার্লস এলস্‌ওয়ার্থ রাসেল।

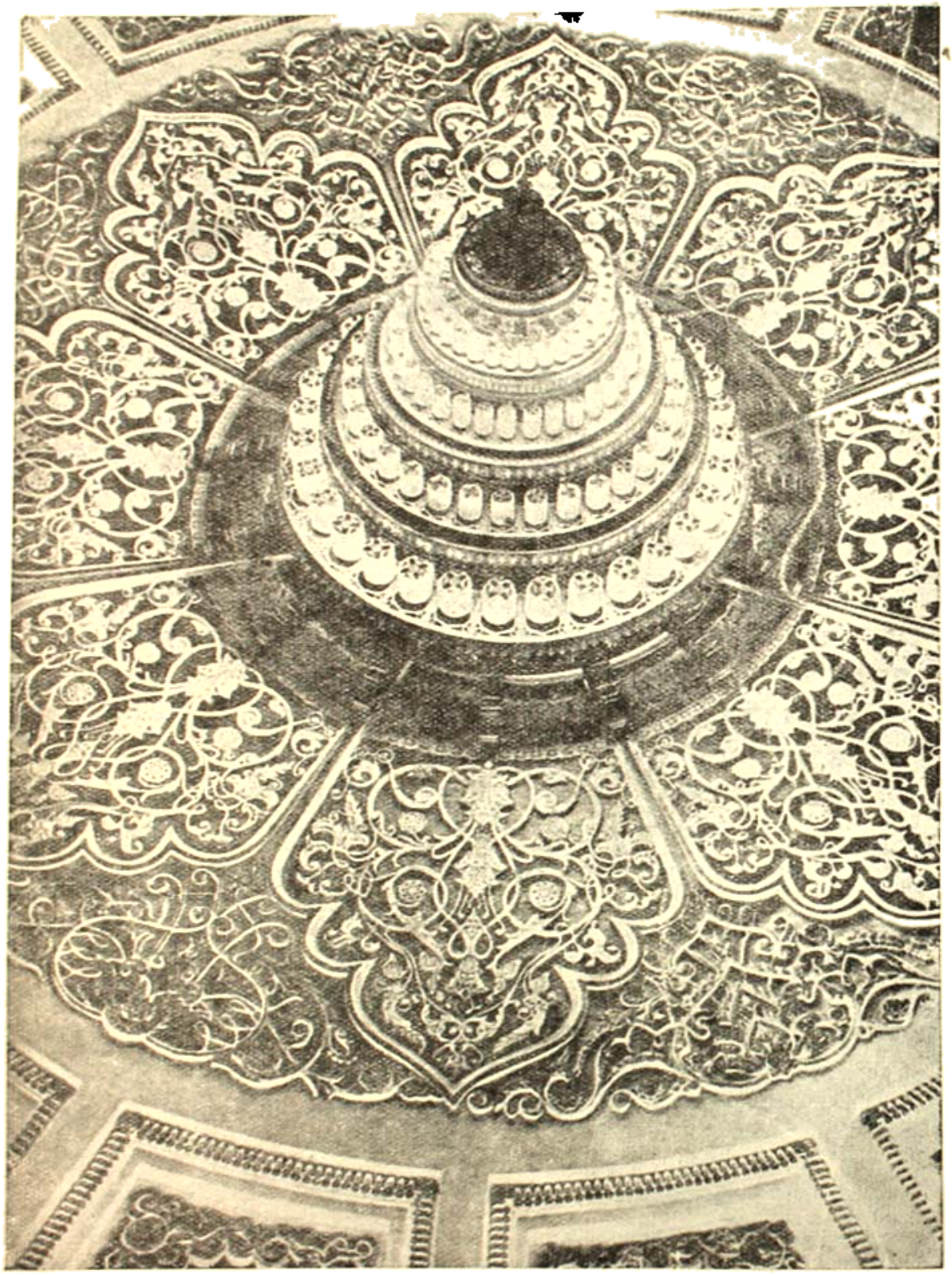

উজবেকিস্তানের রাজধানী তাশখণ্ডের আলিশের বিখ্যাত নাভোই অপেরা অ্যাণ্ড ব্যালে থিয়েটার।
এই থিয়েটার উজবেকিস্তানের বৈভবশালিক ঘোরনশিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন।

দেশ-বিদেশ :

সোভিয়েত দেশের যৌবনের প্রতিমূর্তিরা একটি আনন্দময় নৃত্য ভঙ্গিমা

দেশ-বিদেশ :

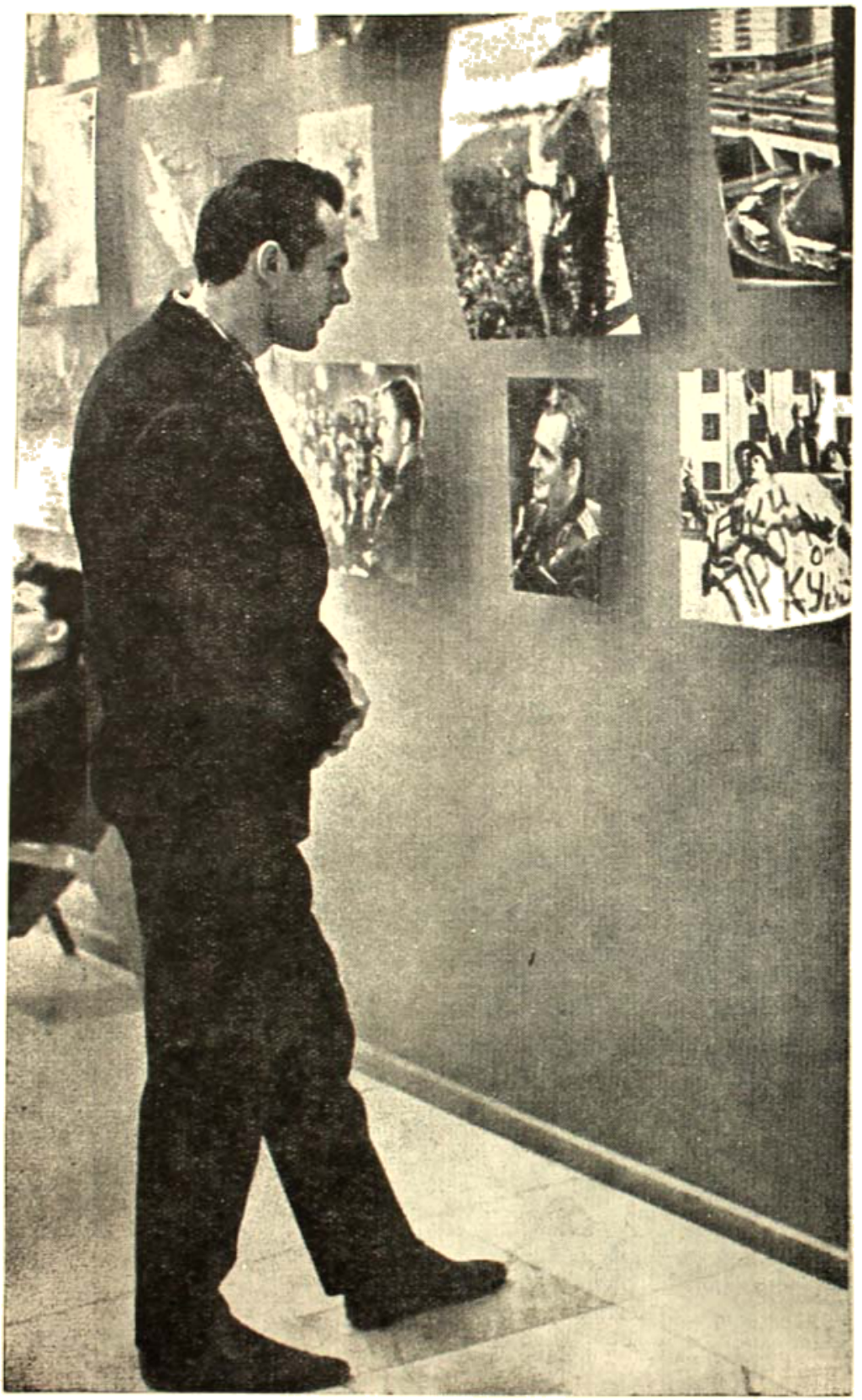

প্রখ্যাত সোভিয়েত খেলোয়াড় তালেরি ক্রমেন। ক্রমেনের বয়স-মাত্র ২০ বৎসর। তালেরি ফটো তোলায় খুবই আগ্রহশীল। তাঁকে প্রায়ই কোন না কোন ফটো প্রদর্শনীতে দেখা যায়।

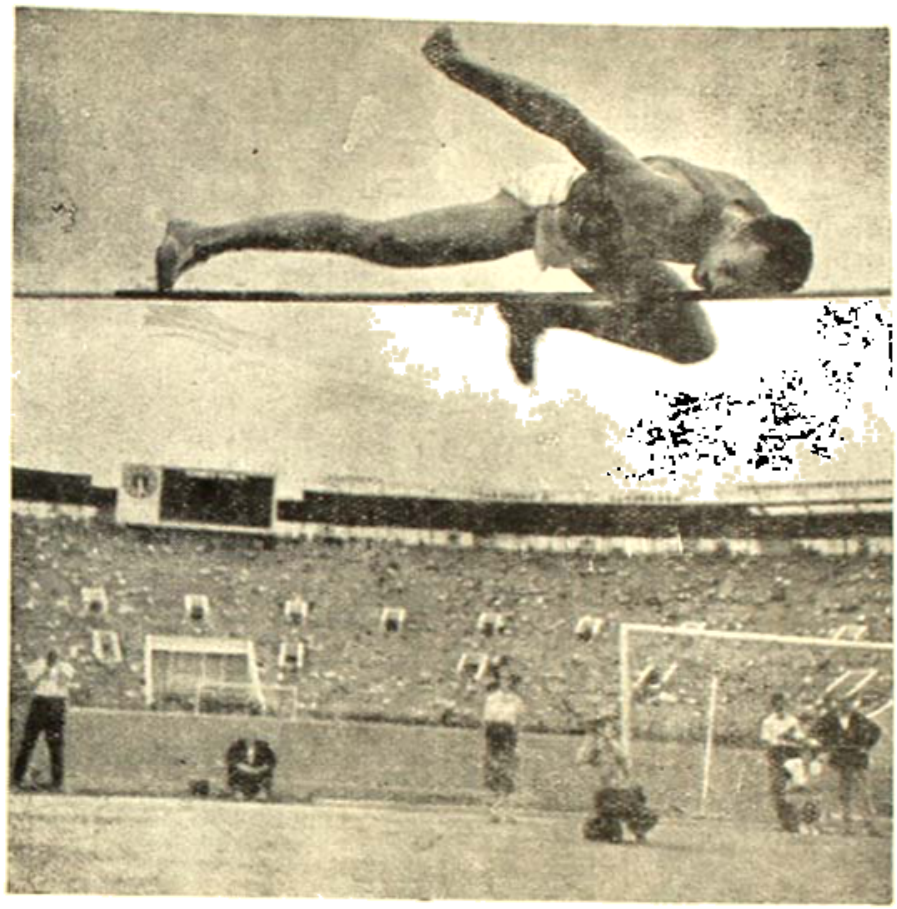

এক মনোরম ক্রীড়া অনুষ্ঠানে বিখ্যাত সোভিয়েত খেলোয়াড় তালেরি ব্রুমেল।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিযোগিতার পূর্বে ভারতীয় ও সোভিয়েত ক্রীড়াবিদগণ বন্ধুত্বমূলক করমর্দন করছেন। ভারতীয় জিমন্যাস্টগণ সম্প্রতি তাশখণ্ডে স্থানীয় ক্রীড়াবিদদের অতিথিরূপে কয়েকদিন কাটিয়েছেন।

পশ্চিম জার্মাণীর (সংযুক্ত সাধারণতন্ত্রী জার্মাণী) শিল্পনগরী ওবার হাউসেন-এর শতবর্ষ জয়ন্তী উৎসবে পৌরমেত্রী ক্রাউ লুইসে আলবার্ৎস ভাষণ দিচ্ছেন। এঁর-ই মত প্রায় পঁচানব্বই লক্ষ নারী আজ দেশের কাজে যোগদান করেছেন, তার মধ্যে প্রায় দশ লক্ষ রয়েছেন সরকারী কাজে। জার্মাণীর নারীগণ ক্রমেই অধিক সংখ্যায় রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন। বুন্দেস্তাগের পাঁচশো একুশজন ডেপুটির মধ্যে তেতাল্লিশ জনই হলেন মহিলা। ১৯৬১ সালে ফেডারেল জার্মাণীর ইতিহাসে এই প্রথম একজন মহিলা আদেনাউয়ার মন্ত্রিসভার অন্তর্ভুক্ত হলেন, এঁর নাম ডাঃ এলিজাবেথ লোরার্দহাউস্ট, ইনি বর্তমানে স্বাস্থ্যমন্ত্রকের প্রধানা।...

জার্মানীর
নারী সমাজ
সম্বন্ধে আরও
জানতে হ'লে

●

স্কালা
ইণ্টারন্যাশানাল
SCALA International
পড়ুন

●

গ্রাহক হওয়ার
যোগাযোগের ঠিকানা
পত্রিকা সিণ্ডিকেট
প্রাইভেট লিমিটেড
১২।১এ, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১৬

ইহুদী লোকনৃত্য শিল্পীগণ লোকনৃত্যের একটি অপূর্ব ভঙ্গিমা

বিশ্বের লোকনৃত্য
গল-ভারতী

ফিনল্যাণ্ডের লোকনৃত্যের একটি মনোরম অনুষ্ঠান।

ভারত-প্রসঙ্গে

ভারতবিদ অধ্যাপক এ. এম. দিয়াকভ

প্রখ্যাত সোভিয়েত ভারতবিদ অধ্যাপক এ. এম. দিয়াকভ ভারত-সোভিয়েত সাংস্কৃতিক সমিতির আমন্ত্রণে কয়েক সপ্তাহের জন্য ভারত-সফরে আসিয়াছিলেন। আধুনিক ভারতের নানাদিক সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে জানিবার জন্য তিনি এখানকার বিভিন্ন শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সংস্থার প্রতিনিধিদের সহিত ও বুদ্ধিজীবীদের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

অধ্যাপক এ. এম. দিয়াকভ, ডি. এল-সি., রাশিয়ার তেরু শহরে ১৮৯৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। এই শহরেই প্রাচীন কালের বিখ্যাত রুশ ভারত-পর্যটক আফানাসি নিকিতিনের জন্ম হইয়াছিল। ১৯২১ সালে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাবিদ্যা বিভাগ হইতে স্নাতক হইয়া বাহির হইবার পর তিনি সোভিয়েত সীমারক্ষী বাহিনীর সহিত যুক্ত চিকিৎসক হিসাবে পামীর অঞ্চলে প্রেরিত হন। এইখানে তাঁহার দুই বৎসরব্যাপী অবস্থানকালেই তিনি ভারতীয় ভাষা ও ভারতের অবস্থা সম্পর্কে আগ্রহী হইয়া ওঠেন। এখানে তিনি উর্দু শিখিতে সুরু করেন। এইভাবেই সুরু হয় তাঁহার প্রাচ্য-বিদ্যা-চর্চা। মধ্য-এশিয়ার তখন জাতীয় সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রগুলি গঠিত হইবার সময়। দিয়াকভ তখন তাজিক সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং দুই বৎসরকাল এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। সেই সঙ্গে তিনি ভারতবিদ্যা চর্চায়ও সময় করিয়া লইতে পারেন। তাঁহার ভারতচর্চা শুধু ভাষার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই; অন্যান্য বিষয়েও—বিশেষতঃ ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে তিনি অনুশীলন করেন। মধ্য-এশিয়ায় তিনি ১১ বৎসর এই বিষয়ে গবেষণার কাজ করেন।

অধ্যাপক এ. এম. দিয়াকভ

১৯৩২ সালে দিয়াকভ মস্কো যান। এর পরেই তিনি পেশা বদল করিয়া ভারতের অর্থনীতি ও ইতিহাস অধ্যয়ন সুরু করেন। ১৯৩৯ সালে তিনি বিজ্ঞান আকাদমিতে যোগ দেন, নিজের গবেষণামূলক প্রবন্ধ পেশ করেন এবং ১৯৪৭ সালে ডক্টরেট ডিগ্রি পান।

ভারতবিদ্যানুশীলনের ক্ষেত্রে অধ্যাপক দিয়াকভের বিষয় হইল ভারত-ইতিহাসে ১৯১৮ সালের পরবর্তী কাল। ১৯৩২ সাল হইতে তিনি ভারতীয় সমভাবলী সম্পর্কে প্রায় ৫০টি নিবন্ধ লিখিয়াছেন এবং প্রধানতঃ ভারতীয় জাতি-অধিজাতির ভাষা-বিভাস সম্পর্কে ও ভারতীয় ভাষা সম্পর্কে গবেষণার কাজ করিতেছেন। ভারতের জাতি-সমস্যা সম্পর্কে অধ্যাপক দিয়াকভের লেখা কতকগুলি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ আছে। বর্তমানে অধ্যাপক দিয়াকভ এশিয়ার জাতিসমূহ সম্ক্রান্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের একজন অভিজ্ঞ ও বিশিষ্ট গবেষক হিসাবে কর্মরত। বর্তমানে তাঁহার বয়স ৬৭ বৎসর। কিন্তু এই বয়সেও অধ্যাপক দিয়াকভ মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানপরিষদের কাজকর্মে অংশগ্রহণ করেন।

ভারত-সুহৃদ অধ্যাপক এ. এম. দিয়াকভ সোভিয়েত-ভারত সাংস্কৃতিক সমিতির উপ-সভাপতি।

দেশ-বিদেশ

সোভোতি প্রেস এজেন্সি :—

ভারতের সাংবাদিক ও সংবাদপত্র-পাঠকরা সোভিয়েত সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান "তাস"এর ("টেলিগ্রাফিক এজেন্সি অফ সোভিয়েত ইউনিয়ন") সঙ্গে সুপরিচিত। বাস্তবিক পক্ষে, এই সেদিন পর্যন্তও, "তাস"ই ছিল সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র যখন ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব অর্জন করে চলেছে, এবং মহাশূন্য দেশ আবিষ্কারে সে যখন বিশ্বের নেতৃত্ব করছে, তখন মাত্র একটি সংবাদ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যুগের চাহিদা মেটানো অসম্ভব। এই প্রয়োজন থেকেই মাত্র ছেঁড় বছর আগে সোভোতি প্রেস এজেন্সি বা এ. পি. এন-এর জন্ম। "তাস"এর মতো এ. পি. এন. রাষ্ট্রের কোনো সরকারী সংস্থা নয়, এটা হল একটা সম্পূর্ণ বেসরকারী সংস্থা। এই সংস্থা গড়ে তোলার পেছনে যেসব প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ-উদ্যম ছিল, সেগুলি হল: সোভিয়েত সাংবাদিকদের ইউনিয়ন, সোভিয়েত লেখকদের ইউনিয়ন, বিদেশের সঙ্গে মৈত্রী ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সোভিয়েত সমিতি-সমূহের ইউনিয়ন এবং বিভিন্ন সোভিয়েত বৈজ্ঞানিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জ্ঞান-প্রসার সমিতি।

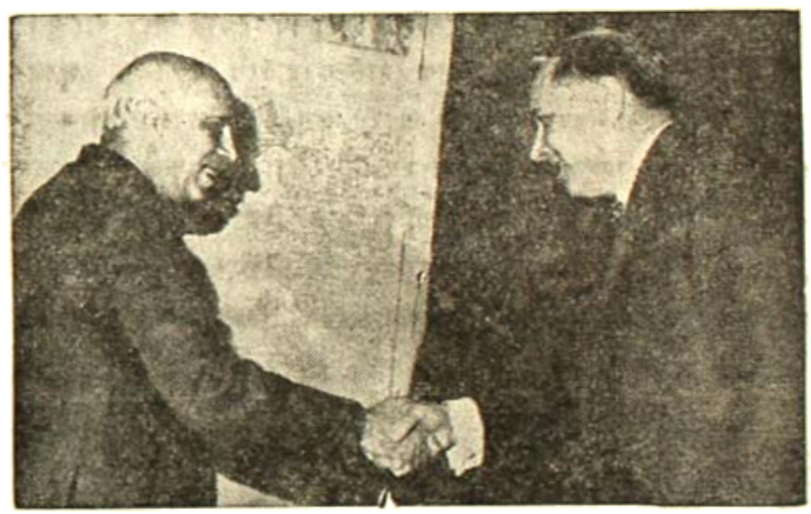

প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরু ও সোভোতি প্রেস এজেন্সীর বোরি বুরকভ

সোভোতি তার মাত্র ছেঁড় বছরের অস্তিত্বকালেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র—সবপ্রজাতন্ত্রের রাজধানীগুলিতে এবং বড়ো বড়ো শ্রমশিল্প ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে এর দপ্তর আছে। এইসব দপ্তর সোভিয়েত সাংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশনকে প্রবন্ধ-বিবরণ, ছবি-ভাষ্য, সংবাদ ও সংবাদ-সমীক্ষা এবং ফটোচিত্র সরবরাহ করে।

বিশ্বের ৫৪ মহাদেশের ৯০টি দেশের রাজধানীতে সোভোতির দপ্তর আছে এবং এইসব দপ্তরের মারফতে সোভোতি সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে সংবাদ বিতরণ করে এবং সেই সব দেশ সম্পর্কে

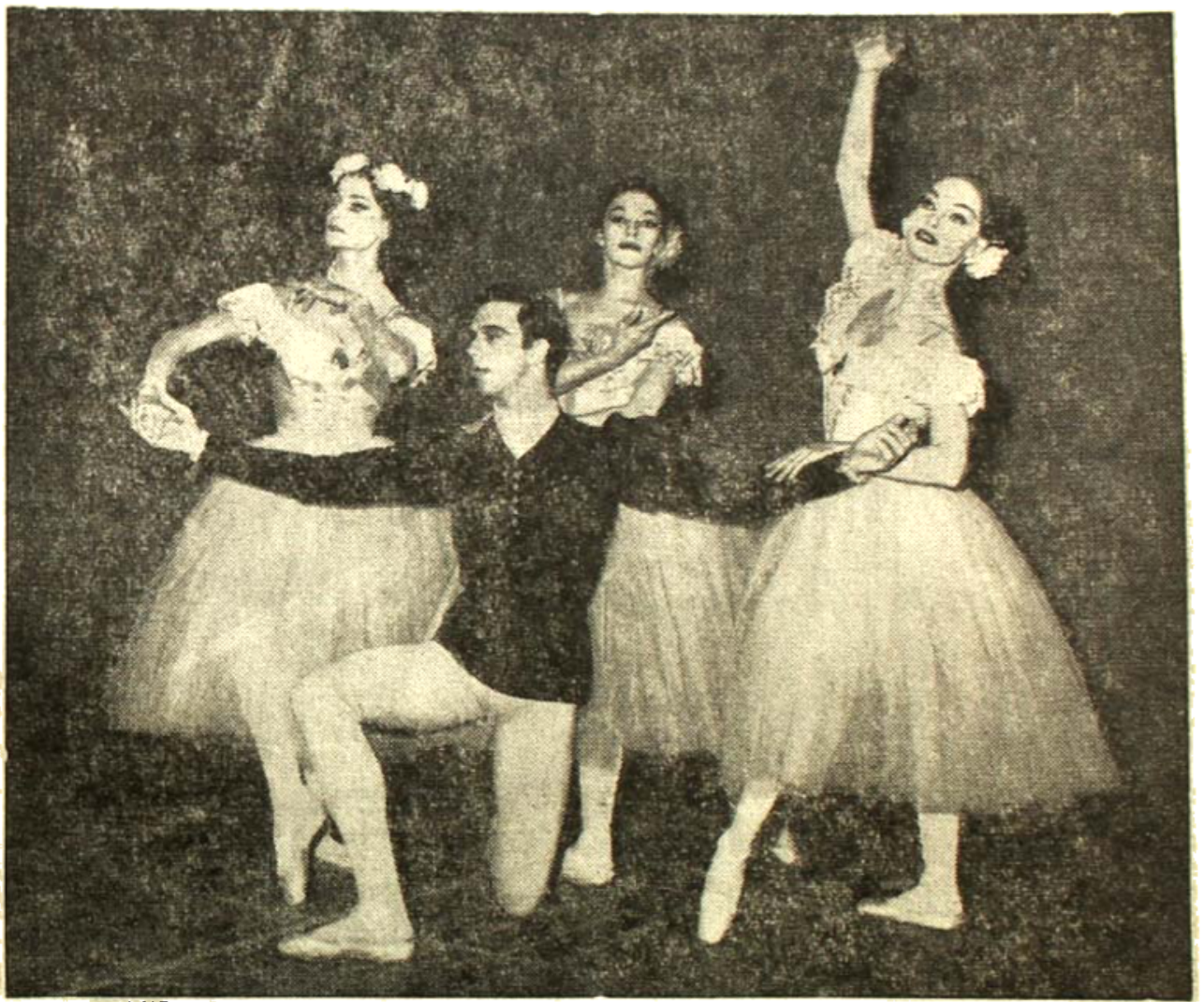

বিচিত্রা নৃত্যভঙ্গিমায় রবার্ট জোকরি ব্যালে দলের শিল্পীগণ।
এই শিল্পীরা সম্প্রতি কলকাতা পরিভ্রমণে এসে
দর্শকসমাজের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছেন।

দেশ-বিদেশ :

সোভিয়েত মহাকাশ-বিজয়ী যুরি গ্যাগারিন।

সোভিয়েত রুশিয়ার তাশখণ্ডের নভোই অপেরা ও ব্যালে থিয়েটারের একক গায়িকা কিম্বা সামিকোভা একটি ভারতীয় সংগীতের মহড়া দিচ্ছেন। মাত্র অর্দ্ধ শতাব্দী আগে সমস্ত রঙ্গমঞ্চে নারীর ভূমিকায় অভিনয় করতেন পুরুষরা। আর আজ বাচ্চা-কাচ্চার শতকরা চল্লিশ জনেরও বেশী হলেন মারী।

দেশ-বিদেশ :

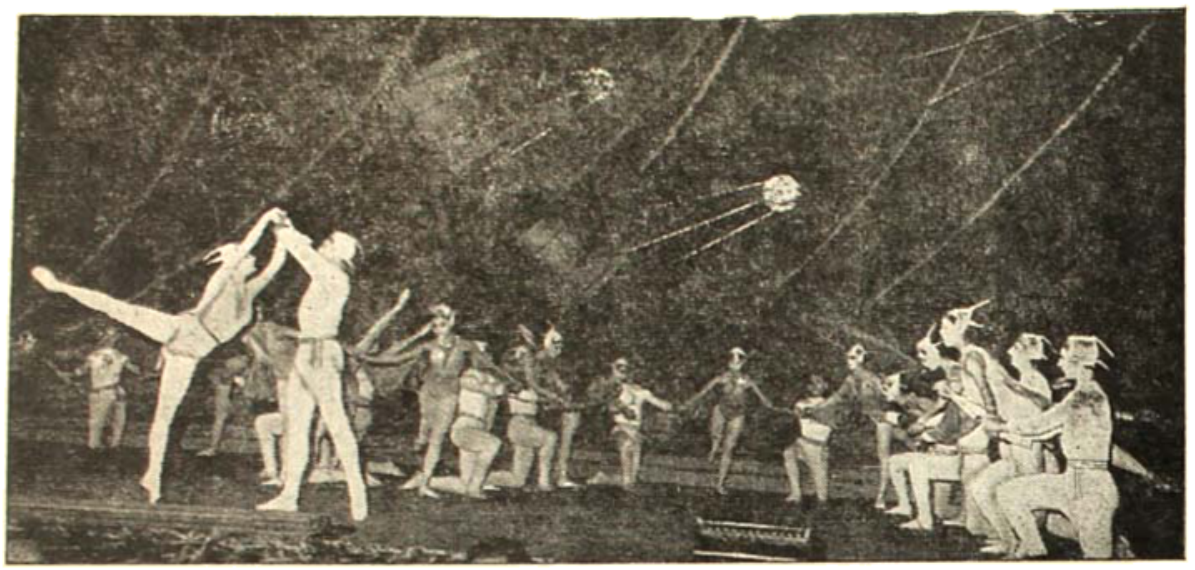

বিয়েলো-রুশ রাষ্ট্রীয় অপেরা ও ব্যালে থিয়েটারের মঞ্চে সোভিয়েত শিল্পীবৃন্দ।

সম্প্রতি ক্রেমলিন কংগ্রেস প্রাসাদে বলশোই থিয়েটার রিমস্কি-কোর্সাকোকের "সাদকো" গীতিনাট্যটি মঞ্চস্থ করে। ছবিতে ব্যালে নর্তকী ওয়াই. রিয়াবিন-কিনা-কে মঞ্চে নৃত্য করতে দেখা যাচ্ছে।

দেশ-বিদেশ ঃ

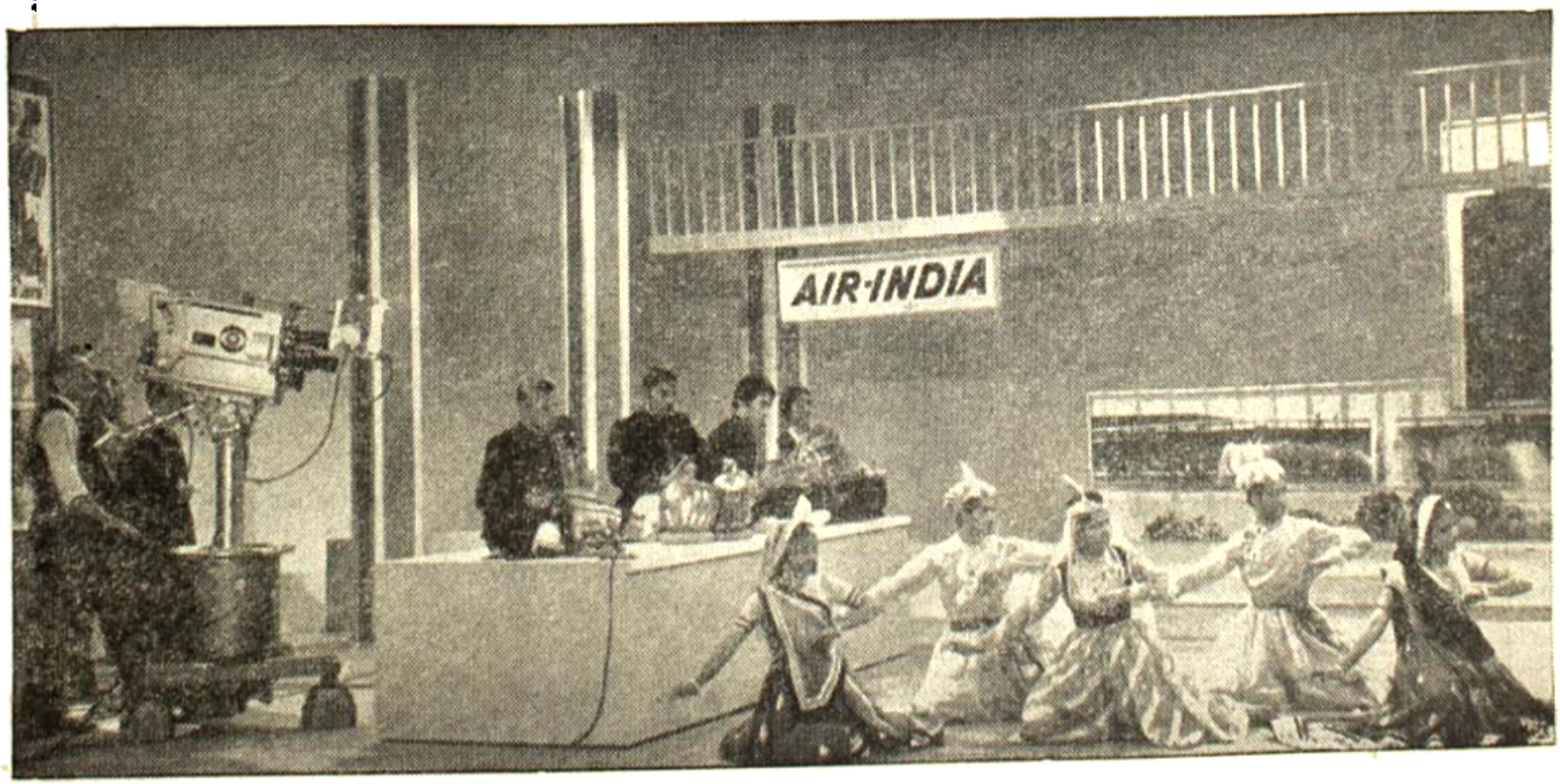

টেলিভিশন সহযোগে প্রাচ্যদেশীয় একটি বিশিষ্ট লোকনৃত্যের অনুষ্ঠানের পরিবেশনার আয়োজন করা হচ্ছে।

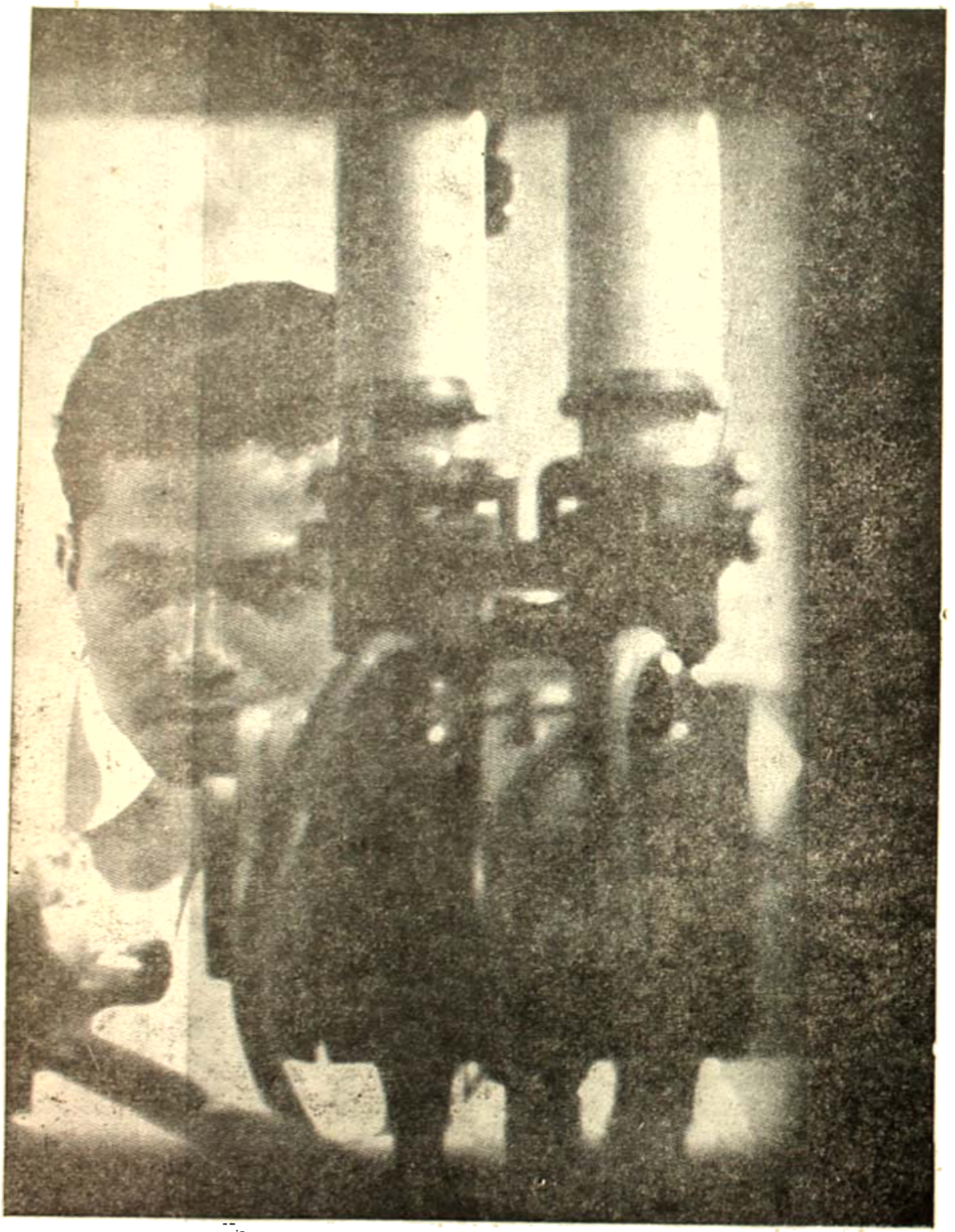

সোভিয়েত রাশিয়ার একটি গবেষণাগারে একজন তরুণ ভারতীয় বিজ্ঞানী।

খেলাধুলা :

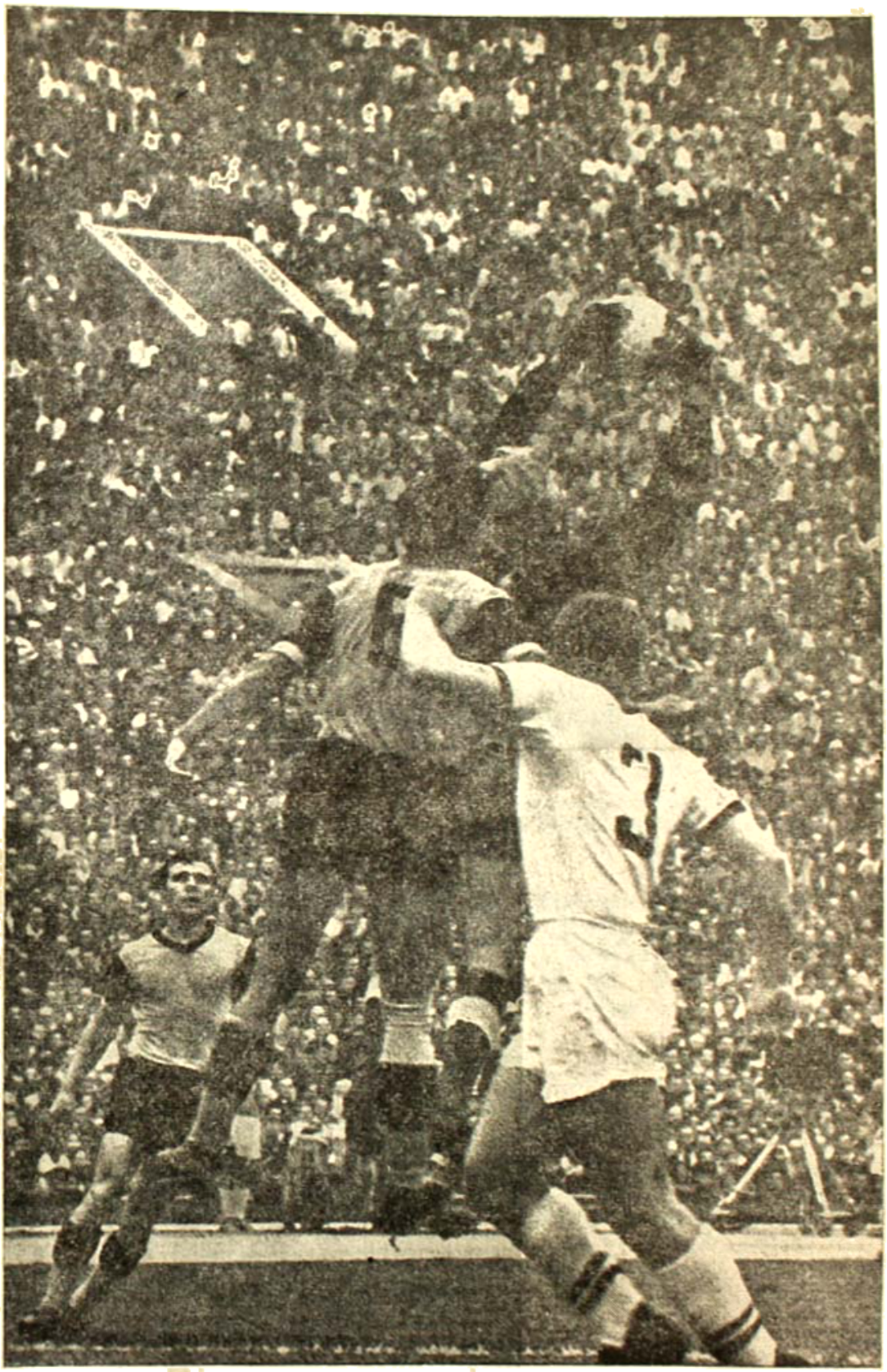

সোভিয়েত রাশিয়ার ২৫তম প্রতিযোগিতার যোগদানকারী
একটি বিশিষ্ট ফুটবল দলের খেলোয়াড়বৃন্দ।

বিখ্যাত সোভিয়েত খেলোয়াড় ভ্যালেরি ব্রুমেল। তিনি সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে ক্রীড়া শিক্ষক ভ্লাদিমির দিয়াচকোকের সাহায্য না পেলে তিনি কিছুতেই ক্রীড়া-জগতে খ্যাতি অর্জন করতে পারতেন না। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী মাস থেকে তিনি দিয়াচকোকের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করছেন।

আনন্দমুখর একটি ক্রীড়া অনুষ্ঠানে ভারতীয় ও সোভিয়েত খেলোয়াড়-বৃন্দ। বিভিন্নক্ষেত্রে এইভাবেই ভারত ও সোভিয়েতের মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র স্থাপিত হচ্ছে।

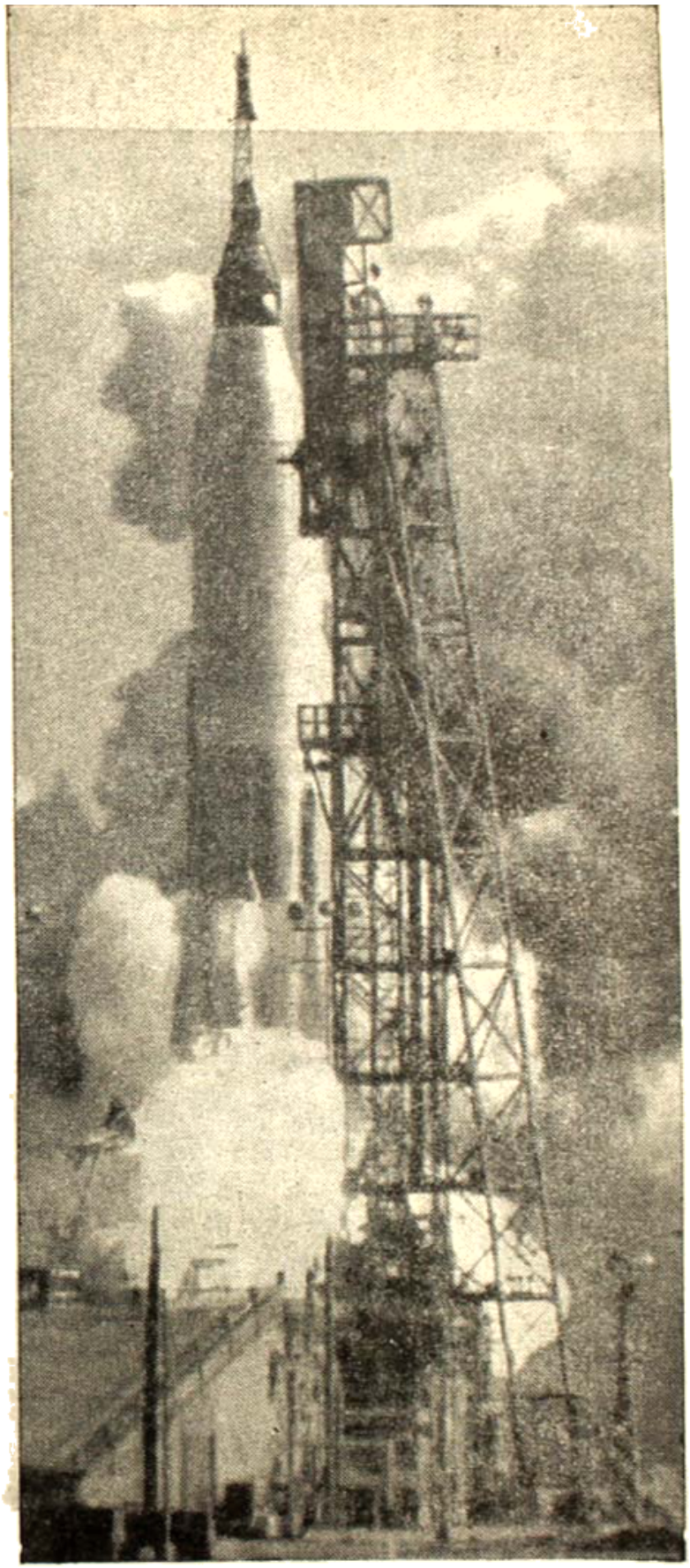

এটলাস বুস্টার রকেটটি অগ্নি উদ্গীরণ করতে করতে মহাশূন্যে ধাবমান হয়েছে ৭নং ফ্রেইন্ড মহাকাশ যানটিকে স্থাপন করতে। এরই মধ্যে রয়েছেন গর্ডন কুপার।

দেশ-বিদেশ :

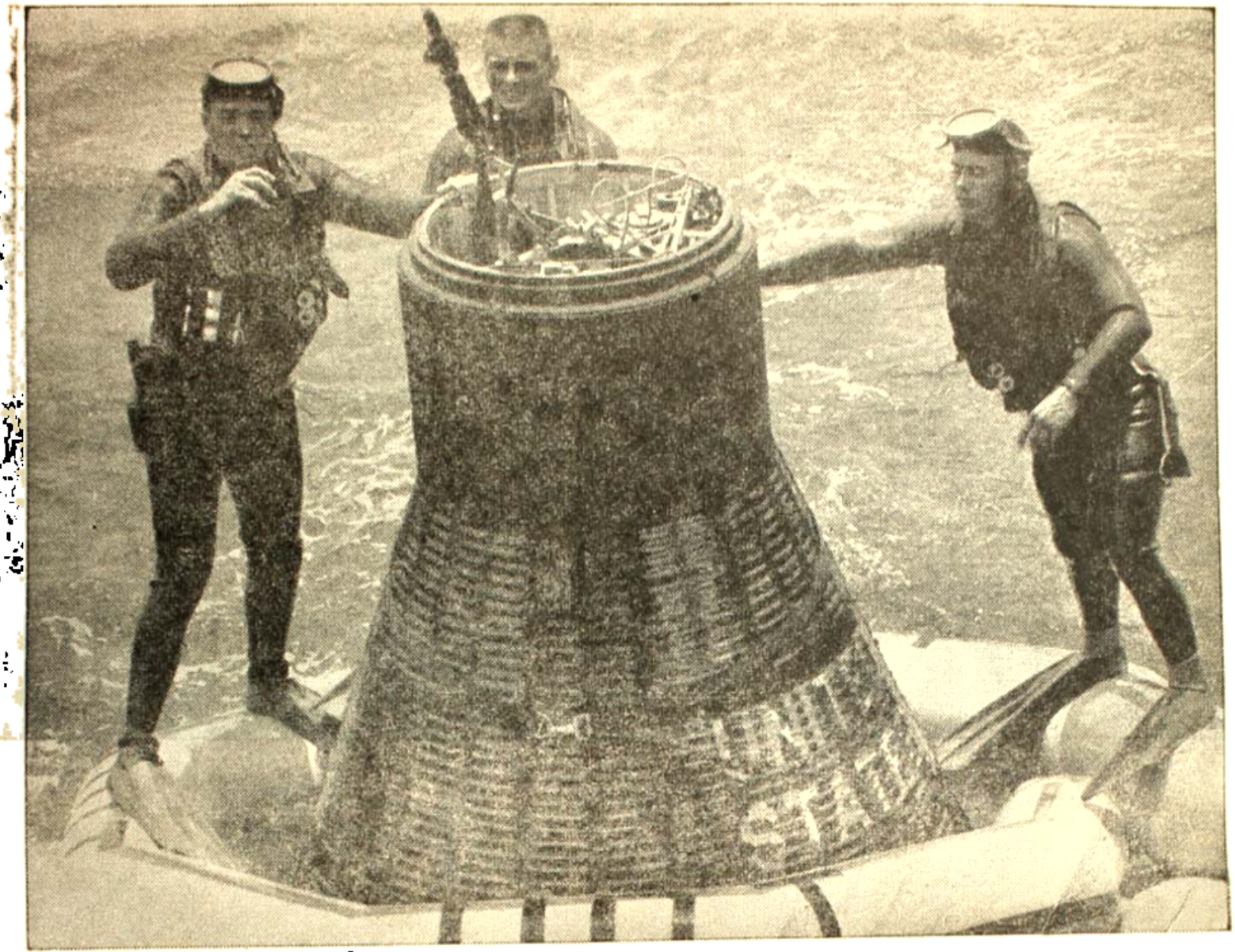

'৭নং কেইথ' নামক মহাকাশযানটি প্রশান্ত মহাসাগরে এসে অবতরণ করলে দুজন "ফ্রগম্যান" একটা ভাসমান বয়ার সঙ্গে সেটাকে আটকে দিচ্ছে।

মহাকাশযাত্রার প্রাক্কালে ছাদার থেকে বেরিয়ে এসে হাসছেন গর্ডন কুপার।

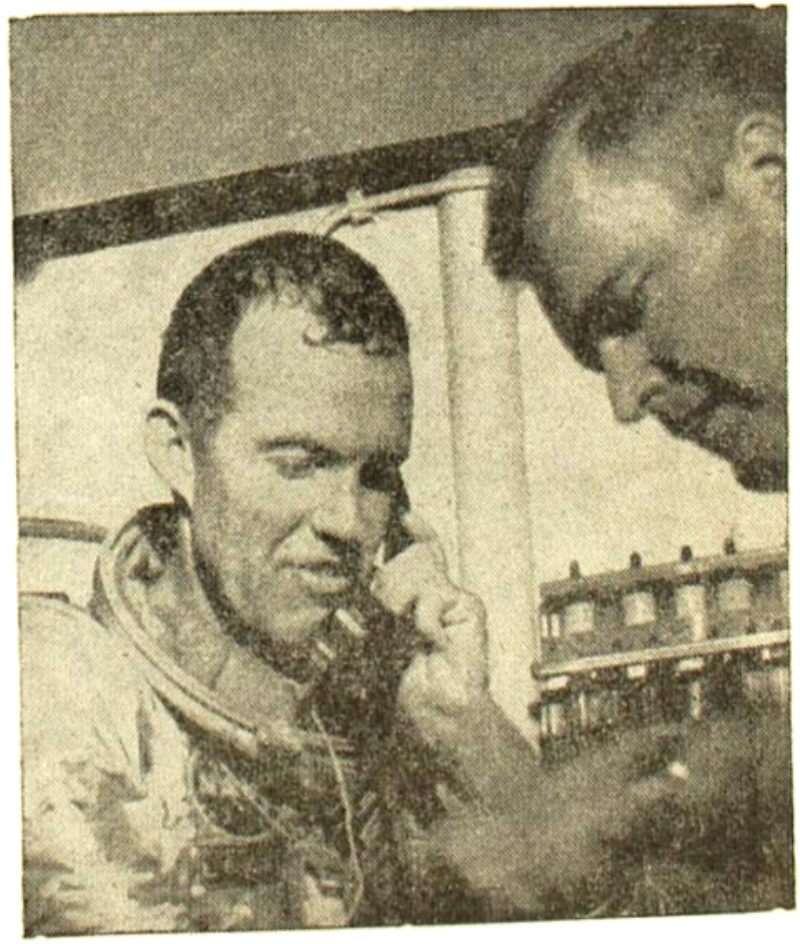

মহাকাশ পরিভ্রমণান্তে বিমানবাহী জাহাজে প্রেসিডেন্ট কেনেডির অভিনন্দনবাণী শ্রবণ করছেন গর্ডন কুপার।

মহাশূন্য যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে মার্কিন মহাকাশচারী গর্ডন কুপার ৭নং কেইপ মহাকাশ যানটির মধ্যে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন। সর্বসমেত ৩৪ ঘণ্টা ২১ মিনিট তিনি মহাশূন্যের কক্ষপথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছেন।

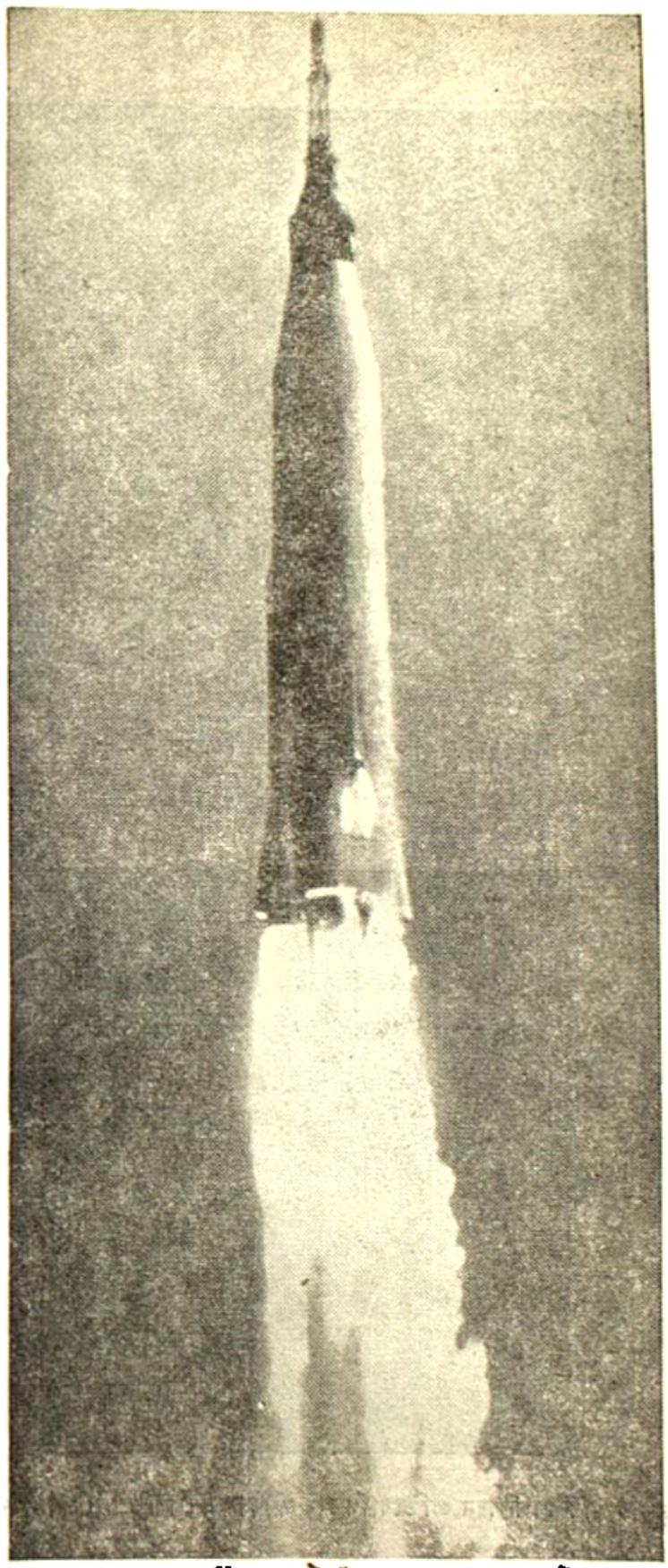

মেজর কুপারসহ "৭নং ফেইথ" নামক মহাকাশযানটিকে
নিখুঁতভাবেই কক্ষপথের দিকে এগিয়ে চলেছে।

খেলাধুলা :

বিশ্বতুষার হকি চ্যাম্পিয়ন সোভিয়েত টীম।

তুষারহকি চ্যাম্পিয়ন প্রতিযোগিতায় বীজয়ী সোভিয়েত বীরাঙ্গনারা।

বিজ্ঞান বার্তা

মহাকাশ অভিযানে নব অধ্যায়

সত্যজিৎ

মানুষের মহাকাশ পরিক্রমার সূচনায় ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল সোভিয়েত মহাকাশচারী য়ুরি গাগারিন সর্বপ্রথম মহাকাশে ভূপ্রদক্ষিণ করে বিশ্ববাসীর মনে যেমন উত্তেজনা ও বিস্ময় সঞ্চার করেছিলেন, ঠিক তেমনি (বা তার চেয়েও বেশি) উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল গত ১৭ জুনের প্রভাতী সংবাদপত্রে বিশ্বের সর্বপ্রথম নারী মহাকাশচারিণী তালেন্তিনা তেরেশকোভার মহাকাশ পরিক্রমার

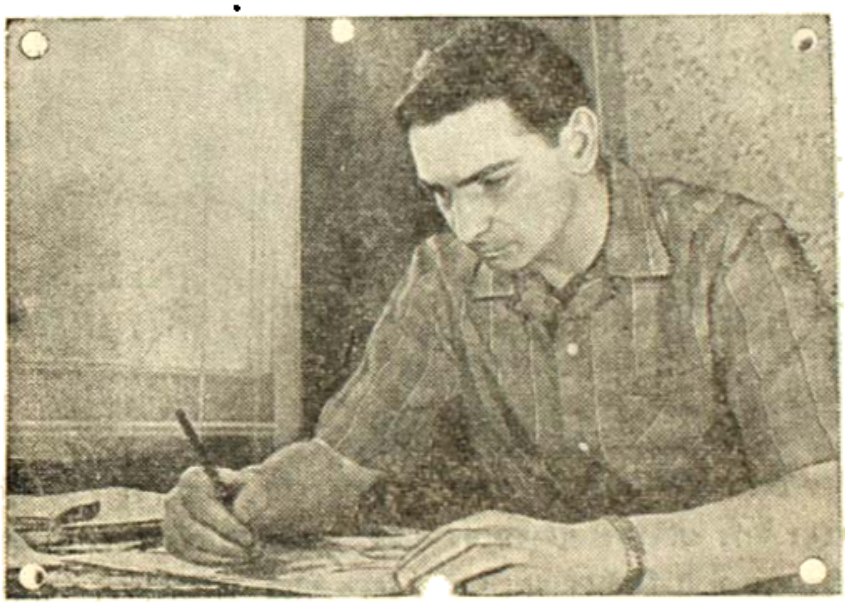

মহাকাশ পরিক্রমায় রেকর্ড সৃষ্টিকারী তালেরি বিকোভস্কি

কথা জেনে। ২৬ বৎসর বয়স্কা এই সুন্দরী আত্মবাহিতা সোভিয়েত নারী মানুষের মহাকাশ অভিযানে এক নতুন অধ্যায় সংযোজনা করলেন। কারণ এর আগে বিশ্বের আর কোনো নারী এই দুঃসাহসিক অভিযানে অবতীর্ণ হয়ে গৌরব অর্জন করেন নি। আজ পর্যন্ত মাত্রজন মর্ত্যের মানুষ মহাকাশের বুকে মানুষের অস্তিত্বের স্বাক্ষর অঙ্কিত করেছেন; তাঁদের মধ্যে ৫ জন সোভিয়েত এবং ৫ জন মার্কিন মহাকাশচারী এবং তেরেশকোভাই হলেন একমাত্র মহাকাশচারিণী।

তেরেশকোভা তাঁর মহাকাশ পরিক্রমায় বিদায় নিলেন না, তাঁর পরিক্রমার দুদিন পূর্বে অর্থাৎ ১৪ জুনে পঞ্চম সোভিয়েত মহাকাশচারী তালেরি বিকোভস্কি যাত্রা করেন। এই মহাকাশ অভিযানে তেরেশকোভা 'শ্বলিন' এবং বিকোভস্কি 'বাজপাখি' নামে অভিহিত হয়েছিলেন। বিকোভস্কি তাঁর 'ভোস্তোক-৫' মহাকাশযানে ৮২ বার কক্ষপথে ভূপ্রদক্ষিণের সময় এবং তেরেশকোভা 'ভোস্তোক-৬' মহাকাশযানে ৪৮তম কক্ষপথে ভূপ্রদক্ষিণ কালে ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করেন। তাঁরা

বিকোভস্কি ৪ দিন ২৩ ঘণ্টা ৫৪ মিনিট এবং কুমারী তেরেশকোভা ২ দিন ২২ ঘণ্টা ৫০ মিনিট মহাকাশে অবস্থান করেন।

মহাকাশে দীর্ঘতম সময় অবস্থানের রেকর্ড স্থাপন করেছেন বিকোভস্কি। তিনি মহাকাশে প্রায় ২০ লক্ষ ৬০ হাজার মাইল পথ অতিক্রম করেছেন। এ পর্যন্ত আর কোনো মহাকাশচারী এত দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করেন নি। আর তেরেশকোভা পরিক্রমা করেন প্রায় সাড়ে ১২ লক্ষ মাইল। এখন পর্যন্ত আমেরিকার দীর্ঘতম মহাকাশ প্রদক্ষিণকারী গর্ডন কুপারের তুলনায় কুমারী তেরেশকোভা প্রায় ৪৩ ঘণ্টা কাল বেশি মহাকাশ পরিক্রমা করেছেন।

মহাকাশ অভিযানে নারীকে প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সোভিয়েত মুখপত্রেরা বলেছেন, নারী দেহের উপর শারীরতাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যেই তেরেশকোভাকে মহাকাশে প্রেরণ করা

বিশ্বের প্রথম মহাকাশচারিনী ভালেন্তিনা তেরেশকোভা

হয়েছিল। শারীরতত্ত্বের দিক থেকে পুরুষ ও নারীর দেহে পার্থক্য আছে বেশ কিছু। একারণে মহাকাশ অভিযানে নারীদেহের উপর প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব আছে অনেকখানি। তা ছাড়া, মহাকাশে 'ভরশূন্যতা' অবস্থার সঙ্গে নারী কিভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং মহাকাশ উৎক্ষেপন-যানে রকেটের প্রচণ্ড ধাক্কা নারী কিভাবে সহ্য করতে পারে তা জানা প্রয়োজন। তেরেশকোভার বেলায় দেখা গেছে, এ দুটি বিষয়ে তিনি 'পুরুষের'- মতোই কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। তাঁর দেহে শারীরতাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার ফলাফল সম্পর্কে এখনও কিছু জানা যায় নি।

মহাকাশ-অভিযানের অগ্রগতি—

বিশ্বের প্রথম মহাকাশচারী ইউরি গাগারিনের মহাশূন্যযাত্রা আর দ্বিতীয় তেরেশকোভার মহাকাশ-অভিযানের মধ্যে সময়ের ব্যবধান মাত্র ২৫ মাস। ১৯৬১ সালের ১২ এপ্রিল আর ১৯৬৩ সালের ১৬ জুন—এই দুটি তারিখ মানুষের ইতিহাসের অবিস্মরণীয় তারিখের তালিকায় যুক্ত হল।

আজ পর্যন্ত ছয়জন মহাকাশচারী-চারিটি মহাকাশ পরিক্রমা করেছেন—তাঁদের মধ্যে তিন সোভিয়েত নাগরিক এবং বাকি দুজন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের।

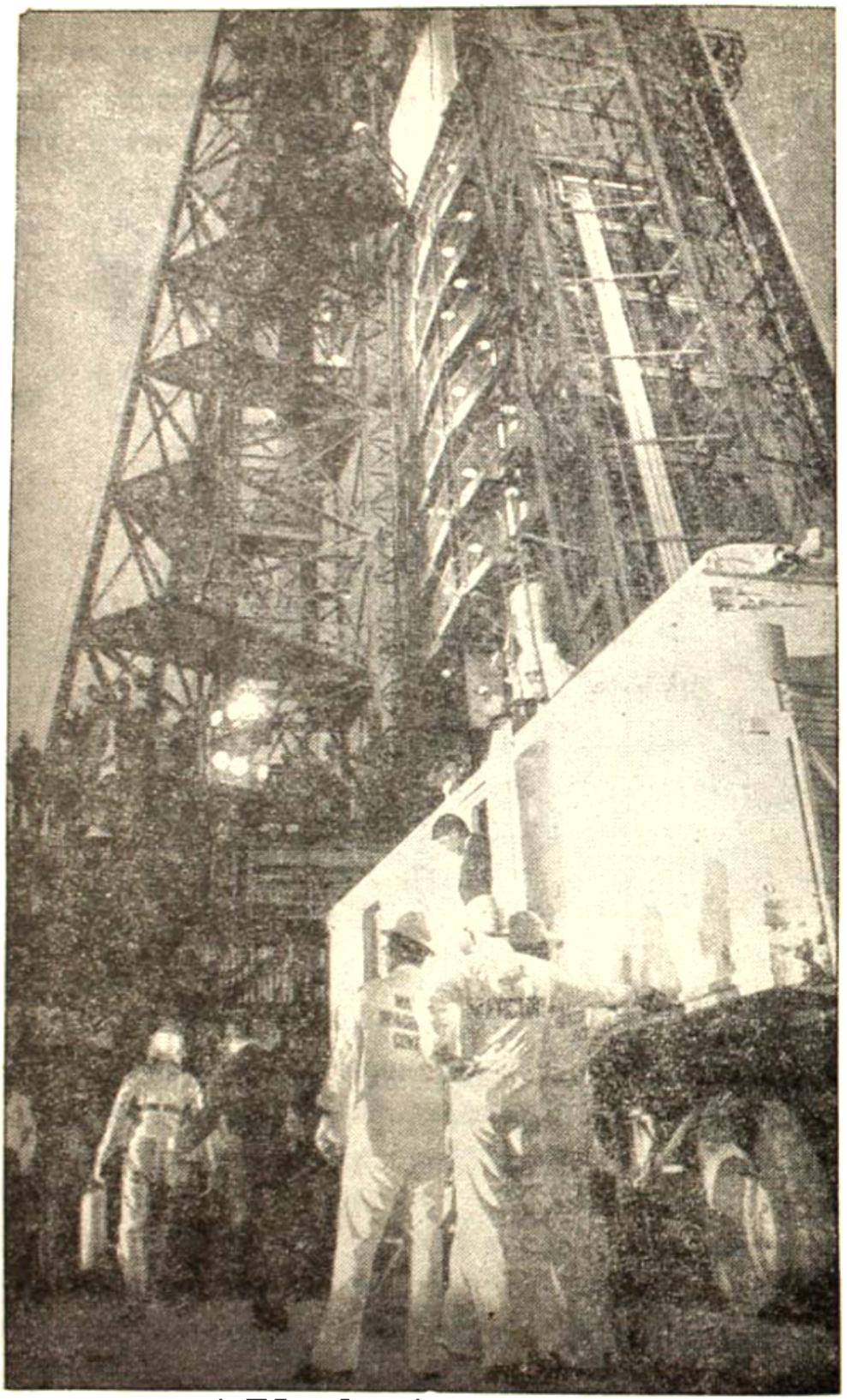

আমেরিকার গর্ডন কুপারের মহাশূন্য যাত্রার প্রস্তুতির একটি দৃশ্য।

দেশ-বিদেশ

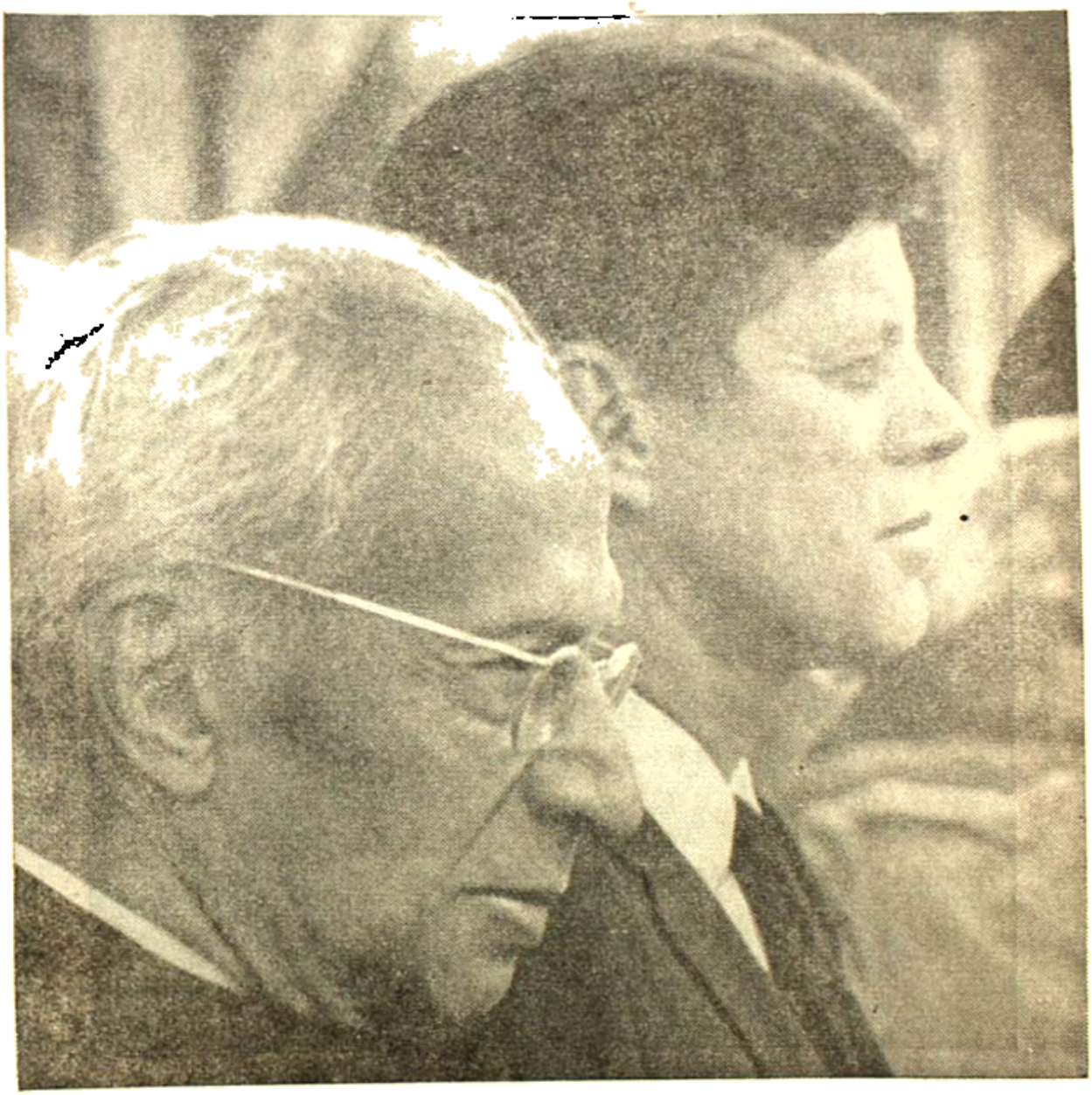

ওয়াশিংটন হোয়াইট হাউসের খরোকায়: রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানকালে দুই রাষ্ট্রনায়ক পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলেন হোয়াইট হাউসের খরোকায়। প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও এই সাড়ম্বর সম্বর্ধনায় যোগদান করেছিলেন ওয়াশিংটনবাসী।

সাদর অভ্যর্থনায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে মার্কিন রাষ্ট্রপতি কেনেডি ও
ভারতীয় রাষ্ট্রপতি-ভবনে রাধাকৃষ্ণণ।

রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ উইলিয়ামসবার্গে পৌঁছলে তাঁকে স্বাগত সংবর্ধনা জানাচ্ছেন
মিঃ উইলিয়াম রকফেলার। ভার্জিনিয়া রাজ্যের এই শহরটির
রূপ এখনও সাবেকী আমলের ছোপ।

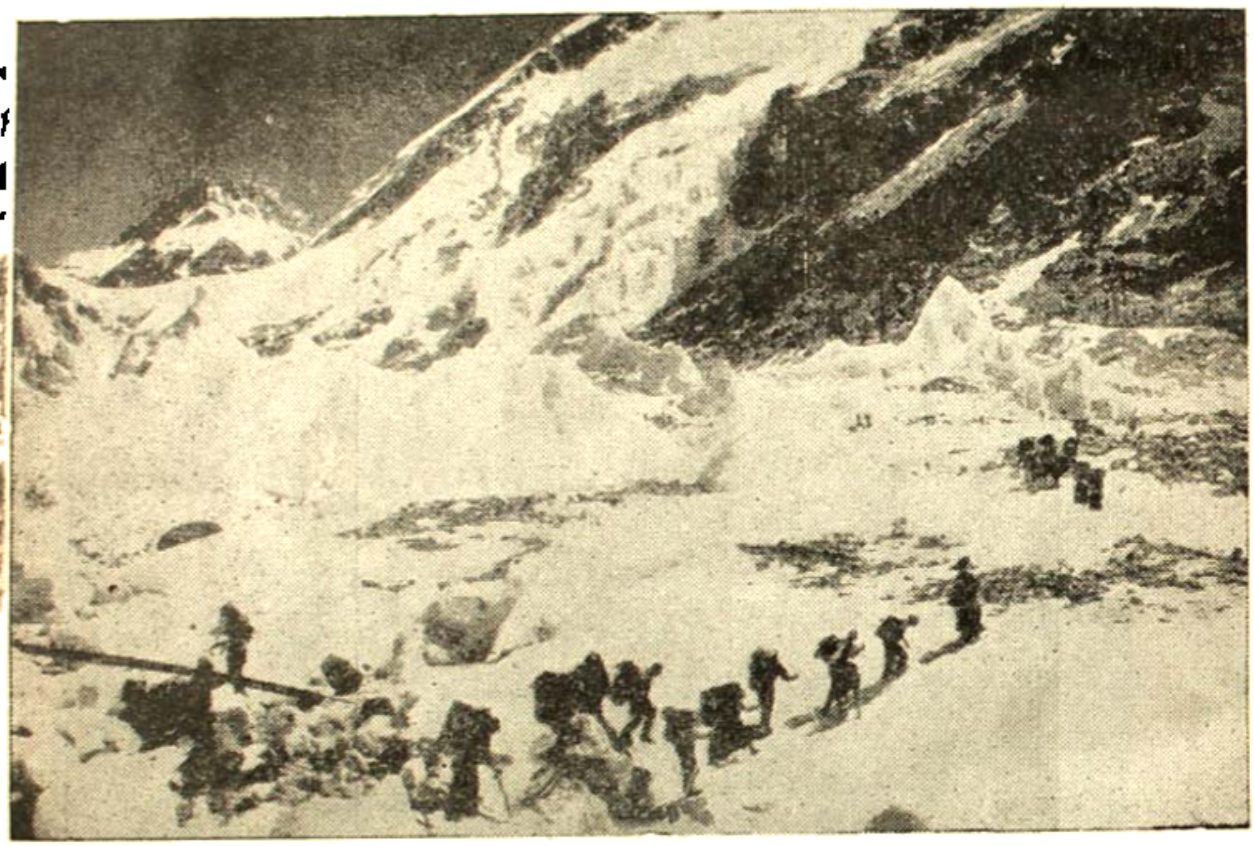

মার্কিণ অভিযাত্রীদলের এভারেস্ট শৃঙ্গ বিজয়ের একটি দৃশ্য। প্রায় ১৮ হাজার ৫০০ ফুট উঁচু
ধাপ্ প্রেসিয়ার দিয়ে অভিযাত্রীরা চলেছেন বরফ আর পাহাড়
ভিঙিয়ে, পিঠের উপর ভারী বোঝা নিয়ে।

দেশ-বিদেশ :

মস্কোয় আন্তর্জাতিক ছাত্র নাট্যসম্মেলন। বিশ্বের প্রায় ৩৪টি দেশের মনোনীত প্রতিনিধি এই সম্মেলনের সহিত সংশ্লিষ্ট।

স্পুটনিক

সোভিয়েত রাশিয়ার সোচির একটি নূতন সিনেমা হাউস।

দেশ-বিদেশ :

ডানদিকে শিল্পী রামকিঙ্কর মহাত্মাজীর সেবক ও বিশ্বাসী
মুলধারবাবা ভাস্কর-মূর্তি নির্মাণের কাজ

দেশ-বিদেশ :

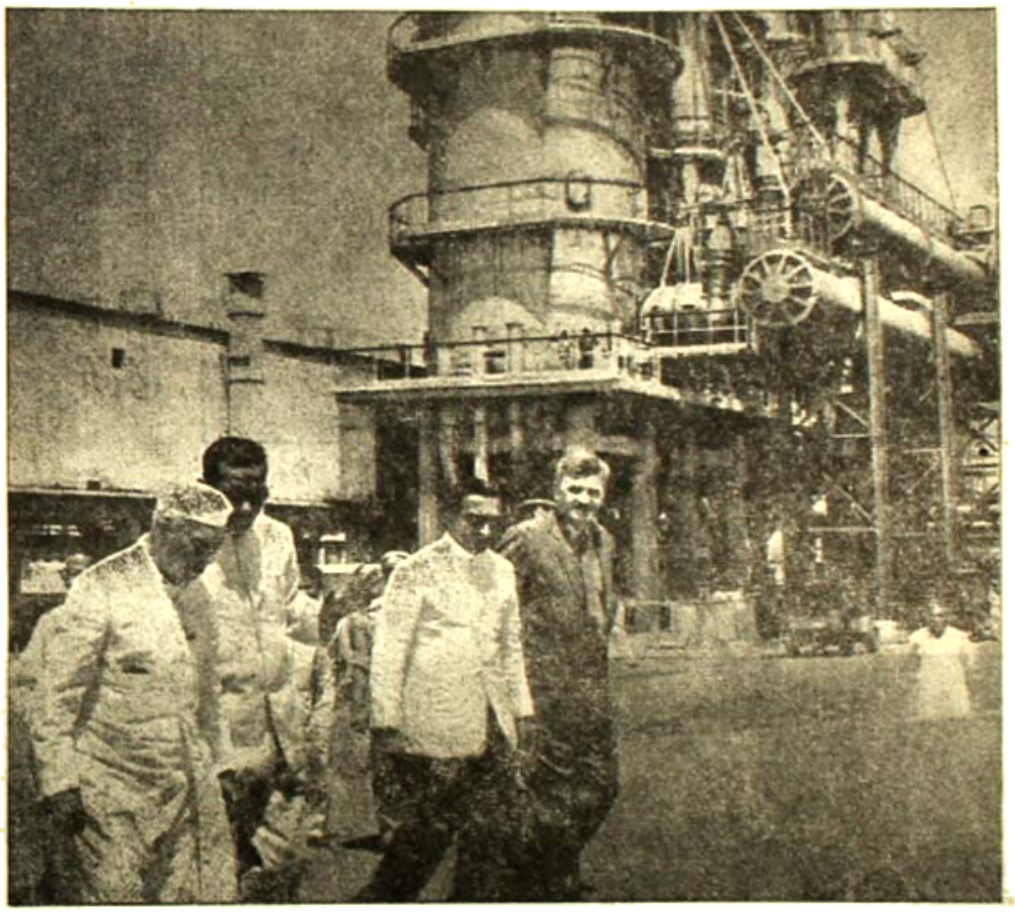

ভিলাই পরিদর্শনকালে প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু
১৪ই মার্চ কারখানাটি ঘুরিয়া দেখেন।

আমেরিকার প্রখ্যাত ক্রীড়াবিদ রেকার জনসন।

আমেরিকার ডেকাথলন চ্যাম্পিয়ন

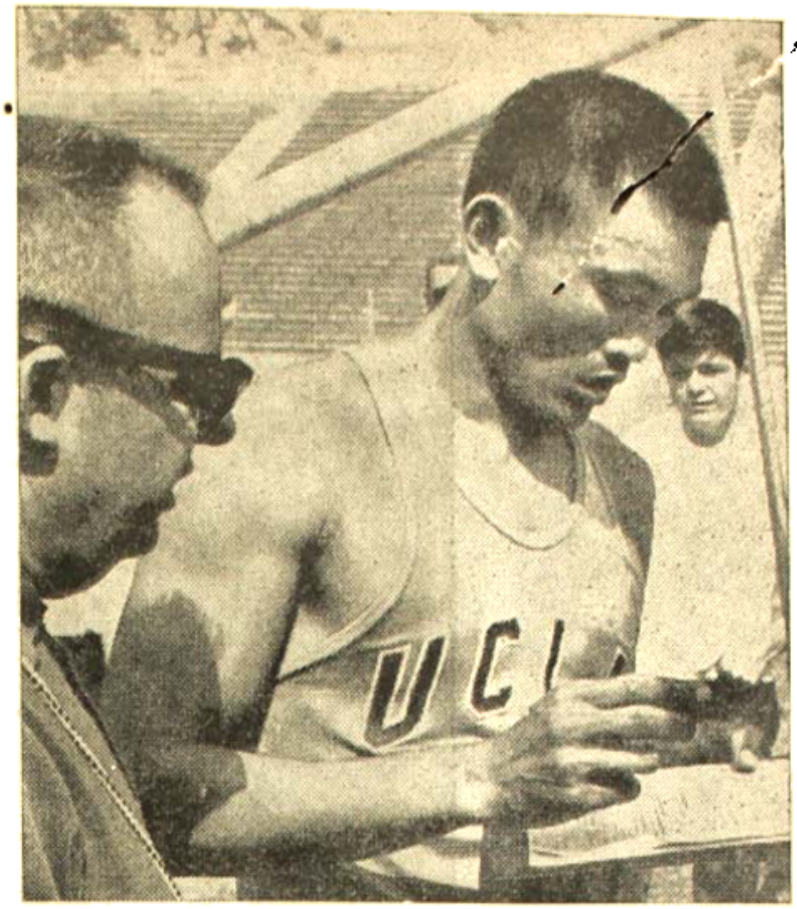

ফরমোজা দ্বীপ নিবাসী তরুণ ক্রীড়াবিদ সি. কে. ইয়াং ডেকাথলন প্রতিযোগিতায় ক্রীড়ানৈপুণ্যের নূতন রেকর্ড স্থাপন করেছেন।

মহাকবি সেক্সপীয়ার

অমরেশ্বর বিশ্ববিদ্যালয়—পূর্বেলাতক ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ
পরীক্ষার্থে হইতে বাহির হইতেছেন।

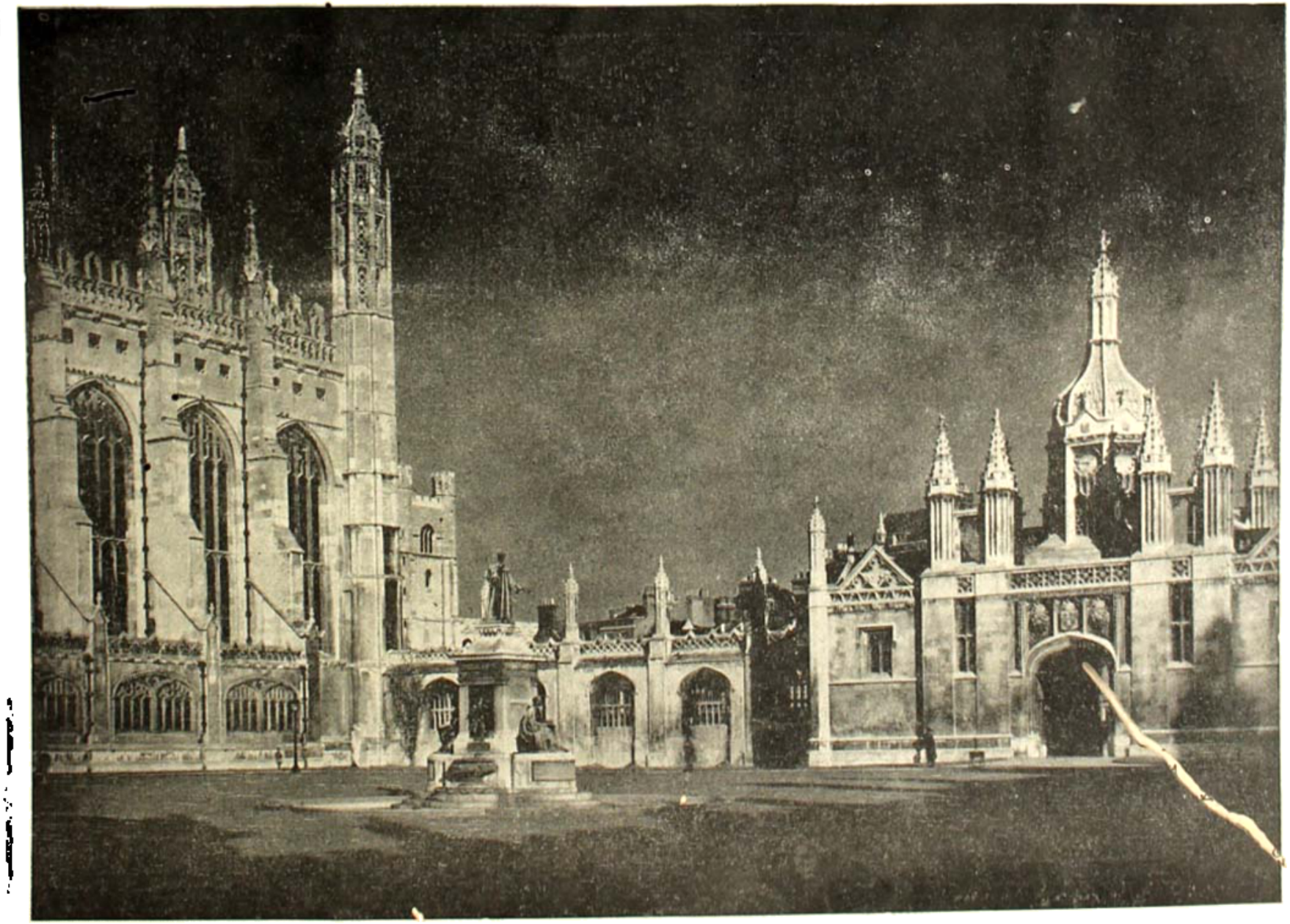

সুপ্রসিদ্ধ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত বার্ষিক নৌ বাইচ প্রতিযোগিতায় প্রস্তুত হইতেছেন।